প্রবাসী

দ্বিতীয় ভাগ | বৈশাখ, ১৩০৯। | ১ম সংখ্যা।

নৈসর্গিক ধর্ম্ম।

আপামরসাধারণ যে আত্মদেহ [illegible] করি, কেহই জীবনের প্রতি সন্তুষ্ট নয়। সকলেই অনুভব করে, এ জীবনটা যাহা হওয়া উচিত ছিল, তাহা [illegible] আমরা বাহির হইতে যে জীবনে পূর্ণতা দেখিতেছি, তাহাতেও এমন কিছু অভাব রহিয়াছে, [illegible] সে জীবনধারীর নিকট অঙ্গহীন বলিয়া অনুভূত হইতেছে। [illegible]

[illegible]

[illegible] আমরা [illegible] কিন্তু [illegible] করি। [illegible] আমরা সকলেই অনুভব [illegible] সমস্তটা চারিদিকে দেখিতেছি, [illegible]

[illegible]

এই যে [illegible] কিছুই নাহে, [illegible]

[illegible]

[illegible] যে [illegible] তাহা [illegible]

প্রমাণিত হয়। যে পতিত হয়, যে ধর্ম্মের আদর্শ হইতে ভ্রষ্ট হয়, সেও মনে মনে বলে,--"আমার না পড়িলেই ভাল হইত।" পতন জন্য তাহার প্রতি লোকের যে অশ্রদ্ধা তাহা সে নিজেই স্বাভাবিক বলিয়া অনুভব করে, এবং তজ্জনিত যে সামাজিক শাস্তি আছে, তাহাকে সে বহন করিতে প্রস্তুত হয়। মানব-হৃদয় স্বাভাবিক ভাবে যদি ধর্ম্মের এরূপ অনুগত না হইত, তাহা হইলে কে মানব-সমাজ মধ্যে শান্তি রক্ষা করিতে পারিত? সকল সমাজেই দেখি অল্পসংখ্যক দুষ্প্রবৃত্তিশাসক ব্যক্তি বহুসংখ্যক শান্তি-প্রিয় মনুষ্যকে উদ্বেলিত করিয়া তুলিতে পারে। একজন তাঁতিয়া ভীল, সমগ্র মধ্যপ্রদেশের মানুষকে উদ্বিগ্ন করিয়া তুলিয়াছিল। অনেকে মনে করে, জনসমাজে পাপী দুরাচার মানুষের সংখ্যাই অধিক। তাহা যদি হয়, তবে দেখা যাইতেছে যে অল্পসংখ্যক সাধু-প্রকৃতির মানুষ বহুসংখ্যক দুষ্প্রবৃত্তিসক্ত মানুষকে ধরিতেছে, বাঁধিতেছে, জেলে লইয়া যাইতেছে, ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলাইতেছে। ইহা কি বিচিত্র দৃশ্য! ইহা কি একটা গভীররূপে চিন্তা করিবার বিষয় নয়? মহাকবি সেক্সপীয়রের মনে সে চিন্তার উদয় হইয়াছিল। তাঁহার প্রণীত "ম্যাকবেথ" নামক নাটকে লেডী ম্যাকডফ ও তাঁহার শিশু পুত্রের কথোপকথনের একটী দৃশ্য আছে, তাহাতে এইরূপ চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। তাহা হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি:—

Son—What is a traitor?
Lady Macd—Why, one that swears and lies.
Son—And be all traitors that do so?
L. Macd—Every one that does so is a traitor and must be hanged.
Son—Must they all be hanged that swear and lie?
Lady Macd—Every one.
Son—Who must hang them?
Lady Macd—Why, the honest men.
Son—Then the liars and swearers are fools; for there are liars and swearers enough to beat the honest men and hang up them.

ঠিক কথা! জগতে অধার্ম্মিকদের সংখ্যা যদি অধিক হয়, তবে শক্তি অধিক হয় না কেন? কেন অধার্ম্মিকগণ দলবদ্ধ হইয়া ধার্ম্মিকদিগকে শাসনে রাখিয়া যথেচ্ছাচার করিতে পারে না? মনুষ্যসমাজ যে আছে, ইহাতেই প্রমাণ যে অধার্ম্মিকগণ শাসনাধীন থাকিতেছে। কুকুরটীর গলায় তুমি বগলসটী দিতে যাইতেছ, সে যদি ঘাড় পাতিয়া সেটী লয়, তাহাতেই প্রমাণ যে সে দেখিয়াছে, যে তোমার এমন শক্তি আছে যাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি লাভের উপায় নাই; তেমনি অধার্ম্মিকগণ কি জানে যে, জনসমাজের অন্তরালে কোথায় এমন শক্তি আছে, যাহার জয় অবশ্যম্ভাবী ও অনিবার্য্য? নতুবা সাজা মস্তক পাতিয়া লয় কেন?

ধর্ম্মের জয়ের এই অবশ্যম্ভাবিতা ও অনিবার্য্যতার জ্ঞান কি মানবের প্রকৃতিনিহিত নয়? রামায়ণ ও মহাভারত এই উভয় গ্রন্থের প্রতি এদেশের সর্ব্বসাধারণের এত শ্রদ্ধা-ভক্তি কেন? তাহা কি এই জন্য নয় যে, এই উভয় গ্রন্থেরই উপদেশ এই—যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ? রামায়ণের কবি দেখাইতেছেন, এক দিকে অরণ্যচারী, রাজ্যভ্রষ্ট ও কতিপয় কপিসৈন্যমাত্রসহায় রাম, অপর দিকে লঙ্কেশ্বর রাবণ, যার প্রতাপে স্বর্গমর্ত্ত্য কম্পিত ও যার দ্বারে ইন্দ্র, চন্দ্র, বায়ু, বরুণ প্রভৃতি দিকপালগণ বাঁধা; পৃথিবীর গণনায়, বিষয়-বুদ্ধির বিচারে, কে ভাবিতে পারিত, কবি দেখাইয়া না দিলে কে সম্ভব বলিয়া মনে করিতে পারিত, যে এই কপিসহায়, অরণ্যচারী রামের হস্তে এই রাবণ সবংশে নিধন প্রাপ্ত হইবে? অথচ তাহাই হইল; নিজ বলদর্পে পাপকে বরণ করিয়া রাবণের এই হইল যে,--

"এক লক্ষ পুত্র তার শোয়া লক্ষ নাতি,
এক প্রাণী না রহিল বংশে দিতে বাতি।"

কি ভয়ঙ্কর শাস্তি! ঋষি মুখে বলিলেন না কিন্তু আমাদিগকে বুঝিতে দিলেন——যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ।

মহাভারতেরও সেই কথা। কুরুপাণ্ডবেরা যুদ্ধোন্মুখ, কৃষ্ণ দ্বারকাপুরীতে বাস করিতেছেন, তিনি উভয় পক্ষের বন্ধু, কুটুম্বিতাসূত্রে উভয়েরই আত্মীয়, উভয় পক্ষই তাঁহার সাহায্যপ্রার্থী হইলেন। কৃষ্ণ কি করেন? তিনি এক কৌশল অবলম্বন করিলেন; এক দিকে আপনাকে ও অপর দিকে নিজের নারায়ণী সেনা রাখিয়া দুর্য্যোধনকে বলিলেন, আমি উভয়েরই বন্ধু, এক পক্ষ আমাকে লউক, অপর পক্ষ আমার নারায়ণী সেনা লউক। দুর্য্যোধন

স্থূলমতি, বিষয়-বুদ্ধির পরবশ, পার্থিব ধনের প্রতিই তাঁহার অধিক দৃষ্টি। তিনি মনে করিলেন একা কৃষ্ণ লইয়া কি করিব? এক বাণের কর্ম্ম বৈত নয়, একা কৃষ্ণ গেলেই ত গেল; আমি নারায়ণী সেনাই লই, ইহারা এক একজন এক একটী বীর, ইহাদের সাহায্যে যুদ্ধে জয়লাভ করিব। ভাবিয়া চিন্তিয়া কুরুরাজ নারায়ণী সেনা লইতে চাহিলেন। কৃষ্ণ বলিলেন, তথাস্তু। পাণ্ডব-সখা পাণ্ডবদিগেরই রহিলেন। কিন্তু অর্জ্জুন কৃষ্ণকে সারথ্যে বরণ করিয়াছেন, শুনিয়া প্রজাবৃন্দের মধ্যে আনন্দধ্বনি উত্থিত হইতে লাগিল।

কৃষ্ণ নারায়ণী সেনা ফেলিয়া গেলেন বটে, কিন্তু এমন কিছু লইয়া গেলেন, যাহা মহা বিশাল সৈন্যদল অপেক্ষাও বলবত্তর, যাহার গুণে একা মানুষ লক্ষাধিক মানুষের অপেক্ষা বলশালী হয়। তাহা কৃষ্ণের চরিত্রের প্রভাব, তাহা কৃষ্ণে প্রজাবৃন্দের প্রগাঢ় বিশ্বাস ও নির্ভর। সেই নির্ভর প্রজাবৃন্দের উক্তিতে প্রকাশ পাইল:—

জয়োস্তু পাণ্ডুপুত্রাণাং যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ।
অর্থ— জয়, জয় স্থির জানি পাণ্ডবের জয়
যে পক্ষে আপনি হরি নিলেন আশ্রয়!

প্রজাদের ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হইল; ভারতসাম্রাজ্যাধিপতি, অতুল বিভবের স্বামী, ভীষ্ম-দ্রোণ-কর্ণ-প্রভৃতি-মহারথিগণপরিবেষ্টিত রাজা দুর্য্যোধন, ঐ বনবাসী, গৃহতাড়িত কতিপয় পাণ্ডবের হস্তে সবংশে নিধনপ্রাপ্ত হইলেন। আর এক ঋষি মুখে বলিলেন না, কিন্তু আমাদিগকে বুঝিতে দিলেন—"যতোধর্ম্মস্ততো জয়ঃ।"

সত্যই কি ধর্ম্মের জয় অবশ্যম্ভাবী? উপনিষৎকার ঋষিগণ বলিতেছেন:—

"সমূলো বা এষ পরিশুষ্যতি যোঽনৃতমভিবদতি"

অর্থ—যে অনৃত, অসত্য বা অধর্ম্মকে বলে বা আশ্রয় করে, সে সমূলে পরিশুষ্ক হয়,—তাহার বিনাশ অবশ্যম্ভাবী।

আমাদের দেশের ঋষিগণ যে সাক্ষ্য দিতেছেন, অপর দেশের ঋষিগণও সেই সাক্ষ্য দিয়াছেন।

A little that a righteous man hath is better than the riches of many wicked. For the arrows of the wicked shall be broken, but the Lord upholdeth the righteous.

অর্থ—ধার্ম্মিক মানুষের যে স্বল্প সম্পত্তি আছে, তাহা বহুসংখ্যক ধার্ম্মিক লোকের প্রচুর বিত্ত অপেক্ষাও শ্রেয়; কারণ অধার্ম্মিকদিগের প্রতাপ চূর্ণ হইবে, এবং প্রভু ঈশ্বর ধার্ম্মিকদিগকে জয়শালী করিবেন।

সর্ব্ব দেশের ঋষিগণের একই সাক্ষ্য। তাঁহারা জনগণকে বলিতেছেন, তোমরা আশান্বিত হও, ধর্ম্মের জয় অবশ্যম্ভাবী।

ধর্ম্মের জয় কি বাস্তবিক অবশ্যম্ভাবী? সংসারী মানুষকে জিজ্ঞাসা কর, তাহারা এরূপ কথা বলে না। চারিদিকে জন-সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, একথার প্রমাণ পাওয়া যায় না। ইতিবৃত্তের পৃষ্ঠা উদ্ঘাটন কর—সর্ব্বস্থলেই ধর্ম্মের জয় দেখা যায় না। প্রতিদিন, প্রতি গ্রামে, প্রতি নগরে, ধনী দরিদ্রকে পীড়ন করিতেছে, অন্যায়পূর্ব্বক পরস্ব হরণ করিতেছে, করিয়া হৃষ্টচিত্তে বাস করিতেছে, উত্তরাধিকারিগণের জন্য সম্পদ ঐশ্বর্য্য রাখিয়া যাইতেছে; গৃহে গৃহে দুরাচার পুরুষ সতী সাধ্বী নারীর প্রতি অত্যাচার করিতেছে, এবং স্বীয় বলদর্পে কাল কাটাইয়া যাইতেছে; জগতের বিস্তীর্ণ বাসভূমির প্রতি দৃষ্টিপাত কর, প্রবল জাতিগণ দুর্ব্বল জাতিদিগের গলে পা দিয়া তাহাদের স্বাধীনতা ও অর্থ হরণ করিয়া আপনাদের সাম্রাজ্যের সীমা বর্দ্ধিত করিতেছে ও সুখে বাস করিতেছে। কৈ জগতের কার্য্যকলাপে ত দেখি না যে সর্ব্বত্র ধর্ম্মই জয়যুক্ত হইতেছে? তবে কি ধর্ম্মের জয় অবশ্যম্ভাবী?

ভাবিয়া দেখ, যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ এ কথাটা মানবপ্রকৃতিতে এমনি নিহিত যে মানুষ এ কথাটী শুনিতেও ভালবাসে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ মনে কর রামায়ণ ও মহাভারত যদি ধর্ম্মের জয় না দেখাইয়া অধর্ম্মের জয় দেখাইতেন, যদি রামায়ণের উপসংহার এই হইত যে রাবণ সীতাকে লইয়া নিরুপদ্রবে সুখে বাস করিতে লাগিলেন, রাম কাঁদিয়া কাঁদিয়া বনে ফিরিয়া গেলেন ও অজ্ঞাতবাসে মরিলেন; অথবা মহাভারত যদি এই দেখাইতেন যে, পাণ্ডবগণ রাজ্যভ্রষ্ট ও গৃহতাড়িত হইয়াই চিরদিন বেড়াইলেন এবং দুর্য্যোধন স্বীয় বলদর্পে চিরদিন রাজলক্ষ্মী ভোগ করিয়া গেলেন—তাহা হইলে উক্ত গ্রন্থদ্বয় ভারতবাসীর এত আদরের জিনিস হইত কি না? তাহা হইলে কাব্যাংশে উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের কি কোনও দোষ স্পর্শ হইত? তাহা হইত না; কারণ তাহা হইলে প্রতিদিন জগতে যাহা ঘটিতেছে, তাহারই

অনুরূপ বর্ণনা হইত। যে উপন্যাস মানবপ্রকৃতিকে ও মানবসমাজকে যথাযথ চিত্রিত করে, তাহারইত প্রশংসা হয়? সে ভাবে উক্ত গ্রন্থদ্বয় হয়ত তখনও প্রশংসনীয় হইত, কিন্তু ইহাও নিশ্চয় যে, তাহা হইলে আমরা রামায়ণ ও মহাভারতের দিকে আর ফিরিয়াও তাকাইতাম না। তাহারা কোন্ কালে বিস্মৃতি-জলে ডুবিয়া যাইত। উক্ত গ্রন্থদ্বয়কে আমরা এতকাল ধরিয়া এই জন্য ভালবাসিতেছি যে উহারা আমাদিগকে সাহস করিয়া বলিয়াছে, যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ! তবেত দেখিতেছি, আমাদের প্রকৃতিতে এমন কিছু আছে, যাহাতে আমরা শুনিতে ভালবাসি—যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ। এ কথা যে বলে, সে আমাদের হৃদয়কে অধিকার করে, সে আমাদের জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করে, সে আমাদিগকে আপনার করিয়া লয়।

মানবমনের উপরে জগতের মহাজনদিগের, ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক সাধুদিগের যে এত প্রভাব তাহার মূলে কি? জগতের দিকে চাহিয়া বল, বুদ্ধ, যীশু, মহম্মদ, নানক, চৈতন্য প্রভৃতির প্রজাসংখ্যা অধিক, কি মহারাণী ভিক্টোরিয়ার বা রুষিয়ার সম্রাটের প্রজাসংখ্যা অধিক? এক রাজ্য মানবের ধনধান্যের উপর, আর এক রাজ্য মানবের প্রাণের উপর। কোন্ রাজ্যের ভিত্তি গভীর স্থানে নিহিত? সিকন্দর, সীজার, নেপোলিয়ান প্রভৃতি পৃথিবীকে জয় করিতে, এবং স্বীয় স্বীয় সাম্রাজ্যের সীমা বিস্তার করিতে ক্রটী করেন নাই; কিন্তু তাঁহাদের সাম্রাজ্যের চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট নাই; কিন্তু দুই সহস্র বৎসর হইল জুড়িয়া দেশের এক অশ্বশালাতে একটী সূত্রধর-তনয় জন্মিয়াছিল বলিয়া পৃথিবীর ইতিবৃত্ত পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে, এখনও জগতের কত রাজার মণিমণ্ডিত মুকুট ঐ সূত্রধর-তনয়ের চরণের উদ্দেশে লুণ্ঠিত হইতেছে। এই সকল সাধুগণের এত প্রভাবের মূল কারণ কোথায়? আরও নিবিষ্ট-চিত্তে চিন্তা করিলে আরও বিস্মিত হইতে হইবে। সিকন্দর, সীজার বা নেপোলিয়ান অনুযাত্রিক সৈন্যদল সংগ্রহ করিবার সময় তাহাদিগকে কত পার্থিব প্রলোভন দেখাইয়াছিলেন; নূতন নূতন দেশ দেখিবে, লুটতরাজ করিতে পারিবে, সমরশ্রী তোমাদিগকে আলিঙ্গন করিবে, গৌরব, সম্মান, বিভব লাভ করিয়া ফিরিতে পারিবে, ইত্যাদি। এত প্রলোভন সত্ত্বেও তাঁহারা আবশ্যকমত সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, এবং সময়ে সময়ে সংগৃহীত সৈন্যদিগকে স্বীয় বশে রাখিতে কষ্ট পাইতে হইয়াছে; কিন্তু মানবের এই গুরুগণ শিষ্যদিগকে বলিয়াছেন, যদি আমাদের অনুবর্ত্তী হইতে চাও, দারিদ্র্যকে বরণ কর, নির্য্যাতনকে মস্তকের ভূষণ কর, আহত ও হত হইবার জন্য প্রস্তুত হও। অথচ লক্ষ লক্ষ লোক সেই পথানুবর্ত্তী হইয়াছে। কি আশ্চর্য্য! স্বার্থ অপেক্ষা স্বার্থনাশের, সুখ অপেক্ষা দুঃখের, সম্পদ অপেক্ষা দারিদ্র্যের আকর্ষণ অধিক! ইহার ভিতরের কারণ কি? মহাজনদিগের কোন্ কথা শুনিয়া লোকে ভুলিয়াছে? কি দেখিয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় আত্মবিস্মৃত হইয়াছে? সে কথাটাও এই কথা, "যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ।" যখন মানুষ চারিদিকে অধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া ম্লান হইয়া পড়িয়াছে; পাপতাপের সহিত সংগ্রামে ক্লান্ত হইয়া গিয়াছে, তখন সাধুরা তাহাদের কর্ণে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছেন "ভয় নাই—যতোধর্ম্মস্ততোজয়ঃ; আশ্বাস্বিত হও, তোমরা মহাবিনাশ প্রাপ্ত হইবে না; ভয়াক্রান্ত, পরিশ্রান্ত যে যেখানে আছ, আমাদের নিকট আগমন কর, আমরা তোমাদিগকে বিশ্রাম ও শান্তি দিব।" হে পৃথিবীর ক্লান্ত জীব মানব! হে পাপপ্রবৃত্তির ক্রীড়ার পুতুল মানব! আজ যদি তোমার কর্ণে সুগম্ভীর নাদে এরূপ তুরীর ধ্বনি আসে, তুমি কি স্থির থাকিতে পার?

তবে আর একদিক দিয়াও দেখিতেছি মানবপ্রকৃতিতে এমন কিছু আছে যাহা ধর্ম্মের জয় দেখিতে চায়, ধর্ম্মের জয় হইবে ইহা শুনিতেও ভালবাসে, ভাবিতেও ভালবাসে, এরূপ কথা যে সাহস করিয়া বলে ও সেই বিশ্বাসে আপনাকে অর্পণ করিতে পারে, তাহার চরণে দাস হইতেও ভালবাসে।

ঈশ্বর মানবপ্রকৃতিকে ধর্ম্মের অনুগত করিয়াছেন। চীন দেশের একজন রাজা একবার মহামতি কংফুচকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"হে বিজ্ঞবর! রাজ্য শাসন ও রাজ্য রক্ষার জন্য কি সময়ে সময়ে দুর্বৃত্ত ব্যক্তিদিগকে হত্যা করা আবশ্যক হয় না?" কংফুচ উত্তর করিলেন—"হে রাজন্! আপনি হত্যার বিষয়ে চিন্তা করিবেন কেন? আপনি ন্যায় ও ধর্ম্ম অনুসারে রাজ্য শাসন করুন, দেখিবেন বায়ুর অগ্রে

শস্যক্ষেত্র যেমন স্বভাবতঃ নত হয়, তেমনি আপনার অগ্রে প্রজাকুল স্বভাবতঃ নত হইবে।” এ কথার অর্থও এই, মানবপ্রকৃতি স্বভাবতঃ ধর্ম্মের অনুগত। সকল জ্ঞানী মানুষ ইহা অনুভব করিয়াছেন, সকল চিন্তাশীল ব্যক্তি ইহা দেখিয়াছেন—সকল গুরুই এ বিষয়ে উপদেশ দিয়াছেন। সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত ইমানুয়েল ক্যাণ্ট একস্থানে বলিয়াছেন—“দুইটী বিষয় আমাকে গভীর বিস্ময়ে পূর্ণ করে, নক্ষত্রখচিত আকাশ ও মানবের হৃদয়নিহিত ধর্ম্ম-বুদ্ধি।” ঠিক! ঠিক! মানবের হৃদয়নিহিত এই ধর্ম্মানুরাগ আকাশের ন্যায় গভীর ও অপরিসীম।

মানবপ্রকৃতি ধর্ম্মের অনুগত ও ধর্ম্মের জয় অবশ্যম্ভাবী, ইহার অর্থ কি? ইহার অর্থ, এই ভৌতিক প্রকৃতির মধ্যে যেমন এমন কিছু আছে যাহার গুণে প্রস্তর খণ্ডটাকে উর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত করিলেই ভূপৃষ্ঠে পড়িবেই পড়িবে ইহা বলা যায়, তেমনি মানবপ্রকৃতির মধ্যেও এমন কিছু নিহিত আছে যাহাতে ধর্ম্মকে শ্রেষ্ঠ স্থান দিবেই দিবে, ধর্ম্মের জয় হইবেই হইবে। ইহার অর্থ কি এই নয় যে মানবের জীবন এক ধর্ম্মাবহ শক্তি বা পুরুষের হস্তে? এই জন্যই উপনিষৎকার ঋষিগণ বলিয়াছেন:—“স সেতুর্বিধৃতিরেষাং লোকানামসম্ভেদায়” তিনিই সেতুস্বরূপ হইয়া লোক সকলকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, ছিন্নবিচ্ছিন্ন হইতে দিতেছেন না।

জনসমাজের স্থিতির মূলে তিনি। তিনিই ধর্ম্মকে প্রতিষ্ঠিত রাখিতেছেন। তুমি যেরূপেই এই ধর্ম্মাবহ পুরুষের হাত এড়াইতে চাওনা কেন, যে কোনও যুক্তি উদ্ভাবন করিয়া আপনাকে ভুলাইতে চাওনা কেন, সংশয় ও নাস্তিকতার দ্বারা আপনাকে যতই আবরণ করিবার প্রয়াস পাওনা কেন, সে কেবল উট পক্ষীর বালুকারাশির মধ্যে মুখ লুকান মাত্র। উটপক্ষীর বিষয়ে এইরূপ কথিত আছে যে, যখন কোনও শত্রু তাহাকে ধরিবার জন্য পশ্চাৎ ধাবিত হয়, তখন কিয়ৎক্ষণ দৌড়িয়া যখন সে দেখে যে তাহার হস্ত হইতে নিষ্কৃতিলাভ করিবার আর উপায় নাই, তখন বালুকারাশির মধ্যে স্বীয় মস্তক লুকাইয়া আপনাকে নিরাপদ মনে করে। তেমনি অনেক লঘুচিত্ত মানুষ এই ধর্ম্মাবহ পুরুষের হাত এড়াইবার উপায় না দেখিয়া, অজ্ঞতা ও চিত্তহীনতার বালুকারাশির মধ্যে মস্তক লুকাইয়া, চক্ষুকে অন্ধ করিয়া, স্বীয় স্বীয় আত্মাকে বলিতে থাকে, ঈশ্বর নাই।

মানব-জীবন যে মহা-ধর্ম্ম-নিয়মের অঙ্গীভূত হইয়া রহিয়াছে, তাহার প্রকৃতি অনুশীলন করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। ক্ষিত্যপ্‌তেজমরুদ্ব্যোম প্রভৃতি পঞ্চভূতের নৈসর্গিক ক্রিয়ার ন্যায় এই ধর্ম্ম-নিয়মের নৈসর্গিক ক্রিয়াও নিরন্তর চলিতেছে। যেমন ভৌতিক শক্তির নৈসর্গিক কার্য্যের ফলেই ভূপৃষ্ঠে কোথাও গিরি-গহন, কোথাও নদ নদী, দ্বীপ-উপদ্বীপ, কোথাও মরু-প্রান্তর প্রভৃতি প্রকৃতির ভীম ও কান্ত দৃশ্যাবলী প্রকাশ পাইয়াছে, তেমনি এই মানবের হৃদয়-নিহিত স্বাভাবিক ধর্ম্ম-ভাবের নৈসর্গিক ক্রিয়ার ফলস্বরূপ ধর্ম্ম-সম্প্রদায়, ধর্ম্ম-কর্ম্ম, ধর্ম্ম-গ্রন্থ, ধর্ম্মাচার্য্য প্রভৃতি প্রকাশ পাইয়াছে। তাহাদিগকে এক আকারে ভগ্ন কর, আর এক আকারে ফুটিয়া উঠিবেই উঠিবে। যদি এরূপ এক দল লোক এখন দেখা দেয়, যাহারা বলে যে, তাহারা বিবাহের বিধি রাখিবে না, নরনারীকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও মুক্ত রাখিবে, তাহা হইলে কি তাহারা প্রণয় ও দাম্পত্য-ধর্ম্ম তুলিয়া দিতে পারে? বরং ইহাই কি সত্য নয় যে, বিবাহের রীতি প্রণালী এক আকারে ভাঙ্গিয়া আর এক আকারে অভ্যুদিত হয়। তখনও দেখা যায় নরনারী প্রণয়ে আবদ্ধ হইতেছে, এক সঙ্গে বাস করিতেছে, গৃহ-পরিবার রচনা করিতেছে, ব্যভিচারকে নিন্দার্হ মনে করিতেছে। মানব-হৃদয় হইতে প্রণয়কে তুলিয়া লইতে না পারিলে বিবাহ ও দাম্পত্য-ধর্ম্মকে তুলিয়া লইবার উপায় নাই; সেইরূপ মানব-হৃদয়ের স্বাভাবিক ধর্ম্ম-ভাবকে বিনষ্ট করিতে না পারিলে, ধর্ম্ম-সম্প্রদায়, ধর্ম্মালয়, ধর্ম্মাচার্য্য প্রভৃতিকে বিলুপ্ত করিবার উপায় নাই। যেমন নদীর কূলস্থিত ভূমি এক আকারে ভাঙ্গিয়া দূরে গিয়া জলস্রোতের নৈসর্গিক ক্রিয়াবশতঃ পুলিনরূপে আর এক-আকারে গড়ে, তেমনি মানব-সমাজের প্রচলিত ধর্ম্ম-সাধনকে, লোকাচারকে ভাঙ্গিয়া ফেলিলেও হৃদয়-নিহিত স্বাভাবিক ধর্ম্মভাবের নৈসর্গিক ক্রিয়াবশতঃ কিয়ৎকালানন্তর আর এক আকারে গড়িয়া উঠিবেই উঠিবে।

অতএব বলি, মানব-জীবন ধর্ম্ম-নিয়ম দ্বারা অনিবার্য্যরূপে শাসিত, ইহা যদি সত্য হয়, তবে যত শীঘ্র পার, ব্যক্তি-

গত জীবনকে ও সামাজিক জীবনকে ধর্ম্মের ভিত্তির উপরে স্থাপিত করিবার চেষ্টা কর। কিছু বজায় রাখিবার জন্য, নিজের মনের মত একটা ঘটাইবার জন্য যাহা আছে, তাহার একটা সুযুক্তি বাহির করিবার জন্য, নিজের স্বার্থের সঙ্গে ধর্ম্মকে মিলাইবার জন্য, বাদবিতণ্ডা কেবল ঢেঁকির কচ্‌কচি মাত্র। ধর্ম্মের একটা সার নিয়ম এই, যাহা অসৎ তাহাকে বর্জ্জন কর, যাহা সৎ তাহাকে বরণ কর। অবশ্য আমি যাহাকে সৎ বলি, তুমি তাহাকে সৎ না বলিতে পার, কিন্তু অন্ততঃ আপনার নিকট খাঁটি থাক। নির্ম্মল হৃদয়ে ঈশ্বরের জগতে বাস কর, অকপট-চিত্তে ধর্ম্মের অনুসরণ কর। কূটতর্ক তুলিয়া আত্মাকে শান্ত করিবার চেষ্টা করা, বা কর্জ্জ করা বিশ্বাস দ্বারা চিত্তকে সন্তুষ্ট রাখিবার প্রয়াস পাওয়া ক্রন্দন-পরায়ণ শিশুকে আফিং খাওয়াইয়া ঘুম পাড়ানর ন্যায়। সে ক্ষণকালের জন্য ঘুমাইতে পারে, কিন্তু তদ্দ্বারা তাহার গুরুতর অনিষ্টই সাধিত হয়।

ধর্ম্মের ভূমি স্বাধীনতার ভূমি। কে কি শিখাইয়াছে, কে কোথায় জীবনকে কিসের সঙ্গে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, কোন্ দিকে স্বার্থের কোন্ ক্ষতি লাভ আছে, তাহা ভুলিয়া ধর্ম্মকে চিন্তা করিতে হয়। আমরা ধর্ম্মকে ও সমাজকে রাখিবার জন্য কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় ব্যস্ত হই। সে জন্য এতটা ব্যস্ত না হইয়া আপনাদিগকে রাখিবার জন্য কিছু ব্যস্ত হইলে ভাল হয়। ধর্ম্ম আপনাকে রাখিতে জানেন। জন-সমাজের জন্যও ভাবিও না, তাহারও একজন রক্ষা-কর্ত্তা আছেন। তুমি আমি বুদ্‌বুদের মত সমাজ-সাগরবক্ষে উঠিয়া মিলাইয়া যাইতেছি। মনে কি কর এই তোমার আমার উপর ধর্ম্মের থাকা-না-থাকা, সমাজের থাকা-না-থাকা নির্ভর করিতেছে? হে বুদ্বুদ! তোমাকে যিনি রাখিতেছেন, তিনি ধর্ম্মকে ও সমাজকে রাখিতেছেন।

ধর্ম্মের সর্ব্বব্যাপিতা, সর্ব্বপ্রাণতা, অনিবার্য্যতা, অনুল্লঙ্ঘনীয়তা আমরা সর্ব্বদা অনুভব করি না বলিয়াই ইহা হইতে ভ্রষ্ট হই। শিশু মায়ের হাত ছাড়াইয়া প্রাঙ্গণে পলাইয়া যায়; যদি মনে থাকিত যে মায়ের সঙ্গে ছুটিয়া পারিবে না, ধৃত হওয়া অনিবার্য্য, তাহা হইলে আর পলাইত না। তেমনি তুমি আমি যদি সর্ব্বদা স্মরণে রাখিতে পারিতাম যে, ধর্ম্ম-নিয়ম অনিবার্য্য, অনুল্লঙ্ঘনীয়, তাহা হইলে আর প্রবৃত্তির হস্তে আপনাদিগকে অর্পণ করিতাম না। ইহা কি সত্য নয়?

মানুষ, হাতের কাছে যাহা, তাহাই দেখে, দূরে যাহা, তাহা দেখে না। ধর্ম্মের আঘাতে পাছে হাতের নিকটস্থ স্বার্থ ভাঙ্গিয়া যায় সেই ভয় পায়। ইহা নিশ্চয়, ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া এ জগতে কাহারও সর্ব্বনাশ হয় নাই। যদি কোনও কিছু ভাঙ্গিয়া থাকে অপর দিকে গড়িয়াছে।

আমরা কি কেহ বসিয়া বসিয়া ভাবি, যদি পৃথিবীটা চূর্ণ হয়, যদি নক্ষত্রে নক্ষত্রে ঘাত-প্রতিঘাত উপস্থিত হয়? নক্ষত্রে নক্ষত্রে ঘাত-প্রতিঘাত বারণ করিবার জন্য অন্য কেহ আছেন; আমি যাহাতে চলিতে চলিতে পড়িয়া না যাই, মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রতি ততটুকু মনোযোগ করি; তেমনি জন-সমাজ ভাঙ্গিয়া চুরিয়া যাইবে সে বৃথা চিন্তাতে সময়ব্যয় করিও না, তুমি যাহাতে পড়িয়া না যাও সেই-টুকু বাচাইয়া চল। ইহা কি শ্রেষ্ঠ উপদেশ নয়? ভাঙ্গুক না তোমার সমাজ-শৃঙ্খলা, ভাঙ্গুক না তোমার জাতিবন্ধন, ধর্ম্মের বন্ধন তোমার জন্য রহিয়াছে; তুমি যাইবে কোথায়? একদিক ভাঙ্গিতেছে, অন্য এক দিকে নূতন শাসন জাগিতেছে। এমন ধর্ম্মের হস্তে কি আমরা আত্মসমর্পণ করিতে পারি না?

কৃষি ও অন্যান্য বৃত্তি শিক্ষা।

সিমলা-শৈলে ১৮৯৩ সালের অক্টোবর মাসে যে কৃষি-বৈঠক বসে, তাহাতে কয়েকটী মন্তব্য গ্রাহ্য হয়। ঐ সকল মন্তব্যের মধ্যে কয়েকটী বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের ১৯০১ সালের ১লা জানুয়ারির নং ১ রেজোলিউশনে সন্নিবেশিত হইয়াছে। বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের এই রেজোলিউশন্ অনুসারে বঙ্গদেশের নিম্ন প্রাথমিক উচ্চ প্রাথমিক, ছাত্রবৃত্তি ও ত্রৈবার্ষিকী পরীক্ষা এবং এই সকল পরীক্ষা উদ্দেশে শিক্ষা পুনর্গঠিত হইতেছে। নূতন নিয়মাবলী অনুযায়ী ত্রৈবার্ষিকী পরীক্ষা এই মাসেই প্রথমে গৃহীত হইবে। কৃষি-বিদ্যা এই পরীক্ষার একটী বিষয় বলিয়া স্থির হইয়াছে। নূতন নিয়মে শিক্ষিত পণ্ডিতগণ সহজেই গ্রাম্য-বিদ্যালয়ে কার্য্যে নিযুক্ত

হইতে পারিবেন, এবং তাঁহাদের সাহায্যে নিম্ন প্রাথমিক, উচ্চ প্রাথমিক এবং মধ্য-বাঙ্গলা ও মধ্য-ইংরাজী বিদ্যালয়গুলিতে কৃষিবিষয়ক নিরূপিত শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হইতে পারিবে। নর্ম্ম্যাল্ বিদ্যালয়গুলিতে ক্রমশঃ শিবপুর কৃষি বিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রগণ কৃষি প্রভৃতি বিষয়ের শিক্ষক নিযুক্ত হইতেছেন। এই সকল বিদ্যালয়গুলির সংশ্রবে কৃষি পরীক্ষা-ক্ষেত্র সন্নিবেশিত হইবারও কথা উত্থাপিত হইয়াছে। গ্রাম্য বিদ্যালয়ে যাহাতে কৃষি-শিক্ষার ক্রমশঃ উন্নতি হইতে থাকে, তাহার সুন্দর ভিত্তি সংস্থাপিত হইয়াছে, এখন ভিত্তি অনুসারে কার্য্য হইয়া গেলেই মঙ্গল।

এক্ষণে দেখা যাউক, সিমলা-শৈলের কৃষি-বৈঠকের যে মন্তব্যগুলি বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের শিক্ষা-বিষয়ক রেজোলিউশনে সন্নিবেশিত হইয়াছে, ঐ গুলি কি এবং ঐ মন্তব্যগুলি কতদূর কার্য্যে পরিণত হইয়াছে, বা হওয়ার সম্ভাবনা।

মন্তব্যগুলি এই :-

১ম মন্তব্য।—কৃষি শিক্ষা ও কৃষির উন্নতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কৃষি বৈঠক এই মন্তব্য প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করেন যে, কৃষিকার্য্যে লপ্ত জনশ্রেণীর মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তৃতি হওয়া বিশেষ আবশ্যক।

২য় মন্তব্য।—সাধারণতঃ, কৃষি-শিক্ষা অন্য শিক্ষার সহযোগে প্রদত্ত হওয়া আবশ্যক, অর্থাৎ এই শিক্ষা কৃষি বিষয়ক বিশেষ কয়েকটা বিদ্যালয় মাত্রের উপর যেন নির্ভর না করে।

৩য় মন্তব্য।—বিশ্ববিদ্যালয়গুলির, কৃষি বিজ্ঞান পাঠ্য বিষয়ের মধ্যে গ্রাহ্য করিয়া লইয়া, উপাধি দান উদ্দেশে, অন্য কোন বিজ্ঞান বিষয়ের পরিবর্ত্তে, এই বিষয়টীর অধ্যয়নেরও অনুমতি দান করা বিশেষ বাঞ্ছনীয়।

৯ম মন্তব্য।—কৃষি বৈঠকের মত এই,—নিম্ন শ্রেণীর বিদ্যালয়গুলিতে এমন কার্য্যকরী ভাবে শিক্ষাদান কার্য্য হওয়া আবশ্যক, যাহাতে বিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া যখন সাহিত্য বা বাণিজ্য বৃত্তির পরিবর্ত্তে ছাত্রগণ কৃষি বা অন্য কোন বৃত্তি অবলম্বন করিবে, তখন যেন বিদ্যালয়ের শিক্ষা উহাদের অন্তরায় না হইয়া বরং সহায়তা করে।

১০ম মন্তব্য।—বিদ্যালয়ে যে সকল পাঠ্য পুস্তক ব্যবহৃত হইবে, তাহাদের ভাষা অতি সরল হওয়া আবশ্যক, যেন সাধারণতঃ সকলে ঐ গুলি বুঝিতে পারে; কেবল পরিচিত বিষয়ের বর্ণনা পাঠ্য-পুস্তকগুলিতে সন্নিবেশিত হওয়া আবশ্যক; ঐ সকল পরিচিত বিষয় সম্বন্ধে আলেখ্য-পটের ব্যবহারও চলিত হওয়া আবশ্যক।

১১শ মন্তব্য।—নর্ম্ম্যাল বিদ্যালয়ের শিক্ষা-প্রণালী এমন ভাবে গঠিত হওয়া আবশ্যক, যাহাতে শিক্ষিত পণ্ডিতগণ নূতন বিষয়গুলির শিক্ষা দিবার উপযুক্ত হইতে পারেন।

১২শ মন্তব্য।—প্রত্যেক প্রদেশে কৃষি-বিভাগাদি বিভাগের কর্ম্মচারী সম্বলিত একটা করিয়া কমিটি সত্বর আহূত হইয়া, উপরোক্ত মন্তব্যগুলি যেন কার্য্যে পরিণত করিতে প্রয়াস পান।

মন্তব্যগুলি সম্বন্ধে দুইটী বিষয় বলিবার আছে।

প্রথমতঃ, দেশীয় ভাষা এবং ইংরাজী ভাষা, উভয় ভাষার দ্বারাই কৃষি ও আর আর বৃত্তি-শিক্ষার উদ্যোগ হওয়া আবশ্যক। এ সম্বন্ধে আমাদের দেশের ভাব আপাততঃ কিছু অব্যবস্থিত। বাঙ্গালা, হিন্দি, উর্দ্দু, উড়িয়া, ইত্যাদি চলিত ভাষা বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিয়া সন্তানদের সময় নষ্ট না হয়, পিতামাতার প্রায় সেই দিকেই লক্ষ্য দেখিতে পাওয়া যায়। ক্রমশঃ ইংরাজী বিদ্যালয়গুলিতে ছাত্র বাড়িয়া যাইতেছে, বাঙ্গালা ইত্যাদি বিদ্যালয়ের ছাত্র কমিয়া যাইতেছে। সম্বাদপত্রে লিখিবার সময় আমরা নিজ নিজ ভাষার পোষকতা করি, কিন্তু নিজেদের সন্তানেরা যাহাতে ইংরাজী লেখাপড়া ভাল করিয়া শেখে, সেদিকে আমাদের সকলেরই দৃষ্টি। পরস্পরের মধ্যে যখন আমরা পত্রাদি লিখি প্রায় ইংরাজীতেই লিখিয়া থাকি, বাঙ্গালা লিখিতে প্রায় কলম সরে না! বস্তুতঃ আমরা যে বাঙ্গালাদি ভাষাকে টানিয়া টুনিয়া রাখিয়া কিছু করিয়া উঠিতে পারিব, এমন মনে হয় না। মাইকেল, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিম, হেমচন্দ্র আর বড় জন্মাইতেছেন না। মোটের উপর কয়েক বৎসর ধরিয়া যেন উন্নতি না হইয়া দেশীয় ভাষার অবনতিই হইতেছে এমন মনে হইতেছে: দেশীয় ভাষার উন্নতি সম্বন্ধে শিক্ষিত লোকদের মধ্যে কিছু অনুৎসাহই দেখিতে পাইতেছি। স্রোতের গতিরোধ করা কাহার সাধ্য? পল্লীগ্রামেও ইংরাজী স্কুল যেখানে সংস্থাপিত হইল, সেইখানেই বাঙ্গালা স্কুল উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইল। ক্রমশঃ এই স্রোত অধিকতর বেগেই বহিবে, এইরূপ অনুমান হয়। কেবল বাঙ্গালা বিদ্যালয়গুলির শিক্ষাপ্রণালীর পুনর্গঠন হইলে চলিবে না। ইংরাজী বিদ্যালয়গুলিতেও কৃষি-শিক্ষা দেওয়া আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। কৃষক বালকগণ ক্রমশঃ বাঙ্গালা স্কুল ছাড়িয়া যদি ইংরাজী স্কুলের দিকে ধাবমান হয়, তবে কেবল বাঙ্গালা স্কুলগুলিতে কৃষি-শিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া লাভ কি? ইংরাজী স্কুলের শিক্ষকগণ প্রায় ত্রৈবার্ষিকী পরীক্ষোত্তীর্ণ নহে। ইঁহারা এণ্ট্রেন্স বা ফার্ষ্ট আর্টস্ পাশ বা ফেল্ করিয়াই প্রায় পল্লীগ্রামস্থ ইংরাজী স্কুলের শিক্ষক নিযুক্ত হয়েন। কার্য্যকরী ভাবে ইংরাজী স্কুলগুলিতে কৃষিবিষয়ক শিক্ষা দিতে হইলে এণ্ট্রেন্স স্কুল ও কলেজগুলিতে কৃষি-শিক্ষার বন্দোবস্ত হওয়া আবশ্যক। বড় বড় সহরের

কোন স্কুল বা কলেজেই কৃষি-শিক্ষার সম্যক্ আয়োজন হওয়ার সম্ভাবনা নাই। এ কারণ সহরের স্কুল বা কলেজে কৃষি-বিজ্ঞানের পরিবর্ত্তে পদার্থ-বিজ্ঞান ও রসায়ন অধ্যয়নের বিষয় ধার্য্য হওয়া কর্ত্তব্য। বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিষয়ক নূতন রেজোলিউশনেও গ্রাম্য বিদ্যালয়গুলিতে কৃষি-শিক্ষা হইবে এবং নগরস্থ বিদ্যালয়গুলিতে পদার্থ-বিজ্ঞান ও রসায়ন শিক্ষা হইবে এইরূপ ব্যবস্থা করা হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয় ও হাই-স্কুল সম্বন্ধেও ঠিক্ এইরূপ ব্যবস্থা আবশ্যক। দেশের শতকরা ৮০ জন লোক যখন কৃষি-জীবী, যখন শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যেও অধিকাংশ লোক কৃষিকার্য্যের উপর অল্পবিস্তর নির্ভর করিতে শিখিয়াছেন, যখন ওকালতি বা চাকুরি করিয়া কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিলেই আজকাল লোকে কিছু জমি-জরাত ক্রয় করিয়া অন্ততঃ তরি-তরকারিটা নিজেদের বাগানের হইলে ভাল হয়, এরূপ ভাবটা দাঁড় করাইতেছেন, তখন ইংরাজী স্কুলে ও কলেজে কার্য্যকরী ভাবে কৃষি-শিক্ষার উদ্যোগ হওয়া আবশ্যক হইয়াছে বলিতে হইবে। কৃষি-বৈঠকেরও এই মন্তব্য। বস্তুতঃ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ও এ সম্বন্ধে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রণী। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় সম্প্রতি কৃষি-বিজ্ঞান অধ্যয়নবিষয়-ভুক্ত করিয়া লইয়াছেন। বোম্বাই ও পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় বৈঠকনির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুমোদন করিয়া, উপাধিলাভার্থ কৃষি-বিজ্ঞান অন্যান্য বিজ্ঞানের সমকক্ষ করিয়া গ্রাহ্য করিয়াছেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলি ঠিক্ গবর্ণমেণ্টের হাতে নাই। কৃষি-বিজ্ঞান ও অন্যান্য বৃত্তি-বিজ্ঞান, মনো-বিজ্ঞান, পদার্থ-বিজ্ঞান, রসায়ন, উদ্ভিদ-বিজ্ঞান, প্রভৃতির সমকক্ষ করিয়া গ্রাহ্য করিয়া লওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যগণের স্বেচ্ছার উপর নির্ভর করিতেছে। গবর্ণমেণ্টের উপরোধ তাঁহারা রাখিতেও পারেন, না রাখিতেও পারেন। গবর্ণমেণ্ট উপরোধ না করিলেও এ বিষয়ে যে সে সদস্য প্রস্তাব উত্থাপন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান নিয়ম পরিবর্ত্তনের প্রয়াস পাইতে পারেন। উদ্যোগ আবশ্যক।

দ্বিতীয়তঃ, উপরোক্ত মন্তব্যগুলি পাঠ করিলে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, কৃষি-বৈঠকের মত এদেশে বৃত্তি-শিক্ষার উদ্যোগ সাধারণশিক্ষার অঙ্গীভূত হওয়া আবশ্যক। এক্ষণে বিবেচ্য, কৃষি-বৈঠকের এই মত কতদূর গ্রাহ্য। সাধারণ শিক্ষার আনুষঙ্গিকভাবে বৃত্তি-শিক্ষা দ্বারা লাভ কি হইবে? একটী উদাহরণ দ্বারা লাভালাভ বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিব। বি, এ বা বি, এস্‌সি পাশ করিয়া শিবপুর এঞ্জিনিয়ারিং কলেজের কৃষি-বিভাগে ছাত্রেরা ভর্ত্তি হইতে পায়। এই সকল ছাত্র দুই বৎসর কাল ধরিয়া নানা বিজ্ঞান বিষয় অনুশীলন দ্বারা কৃষি-বিজ্ঞান শিক্ষা করে। দুই বৎসর পরে, ইহাদের অনেকেই দেশের অবস্থার দোষে কৃষি-কার্য্যে লিপ্ত না হইয়া, কেহবা মাষ্টারি, কেহবা ডিপুটী বা সব্-ডিপুটী-গিরি, কেহবা 'পুনর্মুষিকোভব' বলিয়া বি,এল্ পাশ করিয়া ওকালতি করিতে যাইবে। ইহাদের মধ্যে অনেকেই তখন ভাবিবে "শিবপুর কলেজে কৃষি-শিক্ষা করিয়া আমার লাভ কি হইল? দুই বৎসর হাড়-ভাঙ্গা পরিশ্রম না করিয়া, খরচ-পত্র করিয়া শিবপুরের ন্যায় অস্বাস্থ্যকর স্থানে না থাকিয়া, যদি সময়টা এম, এ বা বি, এল্ পাশের চেষ্টায় এবং চাকুরী অনুসন্ধানে ক্ষেপণ করিতাম, তাহা হইলে অপেক্ষাকৃত অল্প ব্যয়ে ও হয়ত অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ের মধ্যে এই মাষ্টারী, এই ওকালতি, এই ডিপুটী-গিরি, এই সব্-ডিপুটীগিরি পাইতে পারিতাম।" আমাদের দেশের ছাত্রসম্প্রদায় উপাধির একটা আর্থিক মূল্য আছে, এটা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসম্প্রদায়ের প্রায় অনেকেই পুত্র-কলত্র লইয়া বিব্রত। উঁহারা দেশের উন্নতিকল্পে কৃষি বা অন্য কোন বৃত্তি অবলম্বন দ্বারা লাভ করিতে পারা যায় কি না এই পরীক্ষা আপনাদিগের ও আপনাদিগের পরিবারবর্গের উপর দিয়া করিবে, এরূপ আশা করা যায় না। অর্থবান ব্যক্তি বিদ্যার্জ্জন করিয়া দেশের হিতের জন্য সেই বিদ্যার চর্চ্চা ও সময়-ক্ষেপ করিতেছেন, ইউরোপ ও আমেরিকাখণ্ডে ইহার ভূয়োভূয়ঃ উদাহরণ পাওয়া যায়, কিন্তু এদেশের লোককে পরিবার পোষণ ভিন্ন অন্য উদ্দেশে বিদ্যা উপার্জ্জন ও পরিশ্রম করিতে প্রায় দেখা যায় না। দেশের অবস্থা বুঝিয়া শিক্ষাপ্রণালীর নিয়ম করিতে গেলে, বৈঠকনির্দ্দিষ্ট প্রণালীই উপযুক্ত বলিয়া বোধ হয়। "টেক্‌নিক্যাল স্কুলে গিয়া দুই বৎসর সময় নষ্ট করিলাম, চাকুরী মিলিল না; ইহা অপেক্ষা এণ্ট্রান্স বা এল্, এ বা বি, এ বা বি, এল্ পড়িলে কায দেখিত," এরূপ

বস্তুব্য ছাত্রেরা যাহাতে না করিতে পায়, যাহাতে টেক্নিক্যাল স্কুলের অখ্যাতি না হয়, যাহাতে টেক্নিক্যাল স্কুল দ্বারা ছাত্রদের অপকার না হইয়া উপকারই দর্শে, ইহার একমাত্র উপায়, টেক্নিক্যাল শিক্ষা সাধারণশিক্ষার অঙ্গীভূত করিয়া লওয়া। এণ্ট্রান্স পাশ করিতে গেলে যেমন এখন কিছু রসায়ন ও পদার্থবিদ্যা শিক্ষা করা আবশ্যক হইবে, সেইরূপ এই দুইটী বিষয়ের পরিবর্ত্তে কৃষি-বিজ্ঞান বা চা-বিজ্ঞান বা শর্করা-বিজ্ঞান বা নীল-বিজ্ঞান বা তৈল-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কোন পাঠ্য পুস্তকের ব্যবহার বিশ্ববিদ্যালয় কেন না গ্রাহ্য করিতে পারিবেন? ইহার যে কোনটী বিষয়ই হউক না কেন, প্রত্যেকটী সম্বন্ধেই এমন দুরূহ পুস্তক লিখিতে পারা যায় যে, এম, এ পরীক্ষার্থিগণ পর্য্যন্ত ঐ বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষক দ্বারা প্রক্রিয়াদি সম্বলিত শিক্ষাপ্রাপ্তি ব্যতীত উহার উপলব্ধি করিতে পারিবেন না। অর্থাৎ এমন অনেকগুলি যুক্তি আছে, যাহাদের সম্বন্ধে নিম্ন ও উচ্চ সকল শ্রেণীর বিদ্যালয়েরই উপযুক্ত শিক্ষা-পুস্তক ও শিক্ষক নিয়োগ করা যাইতে পারে। কলিকাতা সহরে নীল, বা রেশম, বা শর্করা-বিজ্ঞান সম্বন্ধে কার্য্যকরী ভাবে শিক্ষা দেওয়া হইতে পারে না। কার্য্যকরী ভাবে যে বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে না, সে বিষয় শিক্ষা করিয়া কোন লাভ নাই। পাখী পড়ার ন্যায় কতকগুলা ছাই-ভস্ম মুখস্থ করিয়া পাশ করিবার কারণ অকর্ম্মণ্য লোক কতকগুলা দাঁড়াইয়া যাইবে মাত্র। সহরের উপযুক্ত বিজ্ঞানবিষয় রসায়ন এবং পদার্থবিদ্যা। কিন্তু যে জেলায় ইক্ষুর চাষ, বা নীলের চাস, বা রেশমের চাষ, বা চায়ের চাষ প্রচুর পরিমাণে হইয়া থাকে, সেই জেলার বিদ্যালয়সমূহে হয় ইক্ষু, নয় নীল, নয় রেশম, নয় চা সম্বন্ধে শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারিলে, ছাত্রদের ভবিষ্যৎ উদরান্নেরও সুবিধা হয়, অথচ চিত্তবৃত্তির স্ফূর্ত্তি ঐ সকল বিষয়ের কার্য্যকরী ভাবে সম্যক্ শিক্ষা দ্বারা যেরূপ হওয়া সম্ভব, পল্লিগ্রামস্থ স্কুল ও কলেজগুলিতে যেরূপ ভাবে বিজ্ঞান (অর্থাৎ রসায়ন ও পদার্থ-বিদ্যা) সম্বন্ধে আপাততঃ শিক্ষা দেওয়া হয়, সেরূপ শিক্ষা দ্বারা তাহা কখনই সম্ভব নহে। এই সকল বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার শিক্ষা করিবার অনেক শাখা-প্রশাখা আছে। এই সকল শাখা-প্রশাখা লইয়া সরল ও দুরূহ, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নানা শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক সঙ্কলিত করিতে পারা যায়। বস্তুতঃ মূলপ্রণালী যদি বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা গ্রাহ্য হয়, তাহা হইলে শিক্ষক বা শিক্ষা-পুস্তক সম্বন্ধে কোনই আপত্তি উত্থাপন হওয়া সম্ভব নয়। নীল, চা, রেশম, শর্করা ইত্যাদি চাষে অনেক শিক্ষিত বৈজ্ঞানিক সাহেব লিপ্ত আছেন। ইহাঁরা স্থানীয় কলেজে আপনাপন বিষয় সম্বন্ধে শিক্ষা দিয়া, ছাত্রদিগকে চাষ ও কারখানার কার্য্য শিখাইতে লইয়া গিয়া নিম্নশ্রেণীর বিদ্যালয়ের উপযুক্ত শিক্ষক প্রস্তুত করিয়া দিতে পারেন। যে স্থানে চায়ের কার্য্য নাই, সেই স্থানের স্কুল কলেজে চা সম্বন্ধে শিক্ষা হওয়াতে কোন ফল নাই; কিন্তু যেখানে চায়ের চাষ প্রচুর পরিমাণে আছে, সেখানে চা সম্বন্ধে কার্য্যকরী ভাবে শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত যত অল্প ব্যয়ে ও অনায়াসে হইতে পারে, রসায়ন বা পদার্থ-বিদ্যা সম্বন্ধে শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত কখনই তত স্বল্পব্যয়ে ও সহজে হইতে পারে না। এদেশের মফঃস্বলে গ্যাস্ নাই, গ্যাস্ ভিন্ন রসায়ন বা পদার্থ-বিদ্যার উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া বড়ই কঠিন; কিন্তু সাহেবদের নীল বা চা বা রেশমের কারখানায় শিক্ষার নানা বিষয় আছে দেখা যাইবে। যাঁহারা ঐ সকল বিষয় ভাল বুঝেন, তাঁহারা ঐ সকল বিষয় বুঝাইয়াও দিতে পারেন। যে যে ছাত্র বিষয়গুলি বুঝিতে পারিবে এবং কার্য্যক্ষেত্রে পারদর্শিতা দেখাইতে পারিবে, সেই সেই ছাত্র অনায়াসে সাহেবদের কারখানাতেই চাকুরী করিয়া অর্থোপার্জ্জনের উপায় করিতে পারিবে অথবা স্থানীয় নিম্নশ্রেণীর বিদ্যালয়ে ঐ বিষয়ের শিক্ষক নিযুক্তও হইতে পারে। সাহেবেরা শিখাইতে চাহিবেন কি না, এবং শিক্ষিত ছাত্রদের কারখানায় চাকুরী দিবেন কি না, ইহা বিবেচনার বিষয় বটে, কিন্তু সাহেবদের মধ্যে ভাল মন্দ লোক আছেন, সকলেই কিছু স্বার্থপর বা এদেশীয় লোকদিগের উপর বিদ্বেষী নহেন। শিক্ষা দিবার জন্য ও আপনাদের কারখানায় লইয়া গিয়া ছাত্রদের কার্য্য করিবার সুবিধা করিয়া দিবার জন্য অর্থ পাইলে, তাঁহাদের আপত্তি যে অধিক হইবে, এরূপ বোধ হয় না।

যেমন উচ্চ ও নিম্নশ্রেণীর বিদ্যালয়গুলিতে এক্ষণে সাহিত্য, গণিত, ইতিহাস, ইত্যাদি পাঠ্য বিষয় নির্দ্দিষ্ট আছে, বৃত্তি-শিক্ষা বিজ্ঞান বিষয়ের মধ্যে গ্রাহ্য হইলেও ঐ

সকল পাঠ্য-বিষয়ে হস্তক্ষেপ হইবে না, যেমন এখন ঐ সকল বিষয়ের শিক্ষা হইয়া থাকে, তখনও সেইরূপ হইবে। যেমন এখন এম. এ. বা ডি. এসসি পাশ করিতে গেলে একটী মাত্র বিষয়ে বিশেষ পারদর্শিতা দেখান আবশ্যক হয়, তখনও আর আর বিষয়ের ন্যায় কোন বৃত্তি বিষয়ে পারদর্শিতা দেখাইতে পারিলে এম্. এ. বা ডি. এস্‌সি. উপাধি দত্ত হইতে পারে। এরূপ শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন দ্বারা ছাত্রদের সময় নষ্ট হইবে না। তাহারা যেমন উদ্দেশ্য-বিহীন ভাবে এক্ষণে স্কুলে বা কলেজে পড়িয়া থাকে, তখনও তাহাই করিবে; এখনও যেমন এণ্ট্রেন্স বা এল্. এ. বা বি. এ. বা এম্. এ পাশ করিয়া চাকুরী অন্বেষণ করিয়া থাকে, তখনও সেইরূপ করিবে; একটী মাত্র পাঠ্য-বিষয়ের বিনিময়ে একটী বৃত্তি-শিক্ষা করিবার কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধির মূল্য হ্রাস না হইয়া বৃদ্ধি হওয়াই সম্ভব, চাকুরীর বাজার গরম না হইয়া কিছু নরম হওয়াই সম্ভব—বৃত্তি-শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রদের নিয়োগ করার পক্ষে নানা শ্রেণীর সাহেবদের আগ্রহ জন্মান সম্ভব। এক্ষণে সওদাগর ও কুঠিয়াল সাহেবেরা শিক্ষিত লোকদিগকে অকর্ম্মণ্যই মনে করেন। সেক্সপিয়র, মিল্টন্, কালিদাস, ভবভূতি, বাইনোমিয়াল্ থিওরেম্, সাহেবদের বিশেষতঃ কুঠিয়াল্ সাহেবদের চক্ষুশূল। ইহারা কার্য্যক্ষেত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছে, এরূপ শিক্ষিত লোক ৫০৲।৬০৲ টাকা বেতনে পাইলে ২০০৲।৩০০৲ টাকা বেতন দিয়া সাহেব কেন নিযুক্ত করিতে যাইবেন? কুঠিয়াল্ সাহেবরাও ত লাভের দিকেই দৃষ্টি রাখেন। সাহেব নিযুক্ত করিবার কারণ তাঁহাদের লাভের অংশ কমিয়া যায়; অথচ সাহেবেরা যেরূপ কার্য্যকরী ভাবে শিক্ষা পাইয়া থাকেন, এদেশের লোকে সেরূপ শিক্ষা পান না, এ কারণ অনেক কার্য্যের জন্য অগত্যা তাঁহাদের সাহেব নিযুক্ত করা আবশ্যক হয়। কার্য্যকরী ভাবে শিক্ষাপ্রাপ্ত লোক এদেশে যদি পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয় সাহেবের ভাগ কিছু কম নিযুক্ত করিয়া এদেশীয় লোক নিযুক্ত করিয়া অধিক লাভবান হইতে পারিবেন। বস্তুতঃ সাধারণ শিক্ষার আনুষঙ্গিকভাবে বৃত্তি-শিক্ষার উদ্যোগ হইলে, এদেশীয় লোকদের পক্ষে অনেক সুবিধা ঘটিবে,—চাকুরীর ক্ষেত্র বাড়িয়া যাইবে, চাকুরী না জুটিলেও ছাত্রগণ স্বাধীনভাবে বৃত্তি অবলম্বন করিয়া অর্থোপার্জ্জন করিতে পারিবে।

স্থানে স্থানে পৃথক্ ও বিশিষ্টভাবে বৃত্তি-শিক্ষার ব্যবস্থা হইয়া কোন ফল হয় নাই, এ কথা বলা আমার উদ্দেশ্য নহে। বস্তুতঃ সার্ভে-স্কুল, মেডিকাল্ স্কুল, আর্ট-স্কুল, ভেটেরেনারি স্কুল এবং কৃষি-বিদ্যালয় সংস্থাপনের দ্বারা এক্ষণে অনেক লোকে অনেক রকম উপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে পারিতেছে। এ সকল উপায় পূর্ব্বে ছিল না। কিন্তু এ সকল বিদ্যালয় যদি দুই পাঁচটীর স্থানে দুই পাঁচ হাজারটী স্থাপিত হয়, তাহা হইলে, বি, এ, বা বি, এল্ দের অপেক্ষাও সার্ভেয়ার, ডাক্তার, চিত্রকর, ভেটেরেনারি সার্জ্জন (গো-চিকিৎসক) ও কৃষি-বিজ্ঞানবিৎদের অবস্থা শোচনীয় হইয়া দাঁড়াইবে। বস্তুতঃ বৃত্তি-শিক্ষার পৃথক্ ও বিশিষ্ট বিদ্যালয়, দুই একটীর অধিক হইলে ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই। বৎসরে, দুই সহস্র বি, এ, বা বি, এলের সুবিধামত চাকুরী হইতে পারে, শতাধিক ব্যক্তির এঞ্জিনিয়ার, ওভারশিয়ার বা সার্ভেয়ারের কার্য্য জুটিতে পারে, ২০।৫০ জন চিত্রবিদ্যাবিৎ ব্যক্তির, ১০।১২ জন গো-চিকিৎসকের, ৫।৭ জন কৃষিবিজ্ঞানবিৎ ব্যক্তির চাকুরী জুটিতে পারে, কিন্তু আপাততঃ ইহার অধিক আশা করা যায় না। বঙ্গদেশে একটীর স্থানে যদি দুইটী কৃষি-বিদ্যালয় বা গো-চিকিৎসার বিদ্যালয় সংস্থাপিত হয়, তাহা হইলে প্রত্যেকটীরই ছাত্রসংখ্যা অপেক্ষাকৃত কম হইবে এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া যেরূপ বেতনের গো-চিকিৎসক ও কৃষি-বিজ্ঞানবিৎ ছাত্রগণ এক্ষণে পাইতেছে, তখন তাহাও পাইবে না। আর্ট স্কুলে এক্ষণে বৎসরে ২০০।৩০০ ছাত্র যাইয়া থাকে। উক্ত স্কুলের বর্ত্তমান সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নানা শাখা প্রশাখা সংস্থাপন করিয়া ছাত্রদের নানারূপ কার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারিতেছেন। কিন্তু বরাবর এই সকল ছাত্র যে উপযুক্ত চাকুরী পাইবে, অথবা ছাত্রসংখ্যা আরও অধিক হইলে যে পরে আর্টস্কুলের ছাত্রদের পেট ভরিয়া আহার জুটিবে, এবিষয়ে সন্দেহ আছে। এ কারণ বৃত্তি-শিক্ষা দিবার জন্য যে জেলায় জেলায় বিশিষ্ট ও পৃথক বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়া দেশের মঙ্গল হইবে এরূপ মনে হয় না। তবে এঞ্জিনিয়ারিং, ডাক্তারি, শিল্প-কার্য্য, এ সকল বিষয়ের

শাখা প্রশাখা এত অধিক যে, সম্যক্‌রূপে শিক্ষা দিতে হইলে, এ সকল বিষয়ের পৃথক বিদ্যালয় থাকা নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু প্রয়োজন ভেদে এই সকল বিষয়ে ৫।৭টী বা দুই একটী মাত্র বিদ্যালয় থাকিলেই যথেষ্ট। চা সম্বন্ধে, চিনি সম্বন্ধে, তৈল সম্বন্ধে, নীল সম্বন্ধে, রেশম সম্বন্ধে বা অহিফেন সম্বন্ধে যাহা কিছু শিক্ষা করিবার আছে, সেই শিক্ষা সাধারণ শিক্ষার আনুষঙ্গিক ভাবে দত্ত হইলে যথেষ্ট হইবে। এ সকল বিষয় এত দুরূহ বা শাখা-প্রশাখা-যুক্ত নহে যে, ইহাদের সম্বন্ধে সম্যক্‌ শিক্ষা দিবার জন্য বিশেষ বিশেষ কলেজ বা স্কুল আবশ্যক, অথচ এ সকল বিষয় এত তুচ্ছ বা সামান্য নহে যে, ইহাদের সম্বন্ধে সম্যক্‌ জ্ঞানার্জ্জন করিতে হইলে, এম্‌-এ, পর্য্যন্ত পড়া ও স্থানীয় কল কারখানায় গিয়া কার্য্য করা আবশ্যক না হইবে। যে জেলায় চারিদিকেই অহিফেন বা নীলের চাষ, সে জেলার বালক বালিকাদেরও অহিফেন বা নীল সম্বন্ধে কিছু ব্যুৎপত্তি থাকা আবশ্যক। ইহাতে জেলার বিশেষ কার্য্য অটুটভাবে থাকিয়া যাওয়ার পক্ষে বিশেষ সুবিধা হইবে। আবার এই জেলার কলেজের ছাত্রগণের যদি নীল বা অহিফেন সম্বন্ধে বিশেষ বৈজ্ঞানিক ব্যুৎপত্তি জন্মে, তাহা হইলে জেলার বিশেষ কার্য্যের ক্রমশঃ উন্নতি হওয়াই সম্ভব। যে কলেজে নীল বা অহিফেন সম্বন্ধে শিক্ষা বিজ্ঞান-শিক্ষা বলিয়া গ্রাহ্য হইবে, সেই কলেজের বিজ্ঞানাধ্যাপক নীল বা অহিফেন সম্বন্ধে পৃথিবীর যেখানে যাহা নূতন আবিষ্কার হইতেছে, তৎসম্বন্ধে সংবাদ রাখিয়া ঐ সকল সম্বন্ধে কলেজ ল্যাবোরেটারিতে পরীক্ষা করিয়া ছাত্রদের বুঝাইয়া দিয়া স্থানীয় উন্নতির অনেকগুলি সোপান স্থাপিত করিয়া যাইতে পারেন। পাটনা কলেজে অন্য বিজ্ঞানের পরিবর্ত্তে অহিফেন-বিজ্ঞান শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত হইতে পারে; বহরমপুর ও রাজসাহী কলেজে রেশম-বিজ্ঞান অন্য বিজ্ঞানের পরিবর্ত্তে গ্রাহ্য হইতে পারে, কুচবিহার কলেজে চা-বিজ্ঞান অন্য বিজ্ঞানের পরিবর্ত্তে গ্রাহ্য হইতে পারে; কৃষ্ণনগর কলেজে নীল-বিজ্ঞান অন্য বিজ্ঞানের পরিবর্ত্তে গ্রাহ্য হইতে পারে, বর্দ্ধমান ও মফঃস্বলস্থ অন্যান্য কলেজে কৃষি-বিজ্ঞান প্রবর্ত্তিত হইতে পারে, রাঁচি বা হাজারিবাগের হাই-স্কুলে তৈল ও রং সম্বন্ধে শিক্ষার বিশেষ বন্দোবস্ত হইতে পারে। কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে যেমন পদার্থ বিজ্ঞান ও রসায়ন শিক্ষা দিবার নিয়ম আছে, সেইরূপই নিয়ম থাকুক।

কৃষি বা অন্য কোন বৃত্তির উপযুক্ত পাঠ্য-পুস্তক নির্দ্দিষ্ট ও শিক্ষক নিযুক্ত করিতে পারিলে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে কোন স্কুল বা কলেজকে বিজ্ঞানের পরিবর্ত্তে উক্ত অধ্যয়ন বিষয়ে শিক্ষা দিবার ক্ষমতা দিবেন, যদি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন সদস্যের বিশেষ উদ্যোগ দ্বারা এইমাত্র নিয়ম প্রবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলেই বঙ্গদেশে কৃষি ও আর আর বৃত্তি-শিক্ষার উপযুক্ত ভিত্তি স্থাপিত হইবে।

শিবপুর, ১৮ই মার্চ্চ, ১৯০২। } শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়।

অযোধ্যায় বাঙ্গালী।

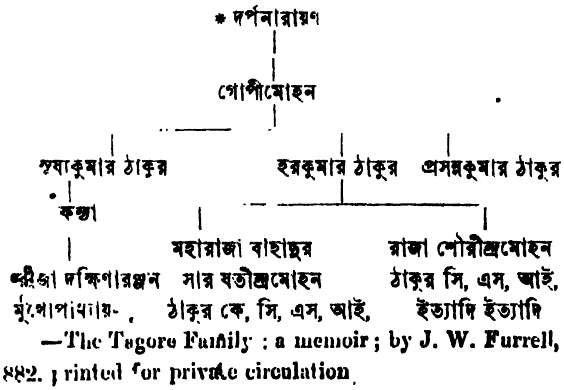
উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ইংরাজাধিকৃত হইবার বহুকাল পরে অযোধ্যা মুসলমানদিগের হস্ত হইতে বিচ্যুত হয়। সুতরাং অযোধ্যা অঞ্চলে বাঙ্গালীর বাস অপেক্ষাকৃত আধুনিক। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যায় প্রথম সেন্সস লওয়া হয়।* তাহাতে দেখা যায় যে সমগ্র অযোধ্যায় স্ত্রী-পুরুষ মিলাইয়া মাত্র ১২৮ জন বাঙ্গালী। দ্বাদশ বৎসর পরে দ্বিতীয়বার সেন্সস গণনার সময় তথায় বাঙ্গালীর সংখ্যা ১৩০৩ দেখা গিয়াছিল। সেই সময়ে উত্তর-পশ্চিমের মধ্যে এক বারাণসীতেই ৮১১৬ জন, এলাহাবাদে ২৪২৪ জন এবং মথুরায় ২৩৩২ জন বাঙ্গালী বাস করিতেছিলেন। ১৮৯১ সালে সমগ্র অযোধ্যায় ১৮৬২ জন বাঙ্গালীর সংখ্যা পাওয়া যায়। তন্মধ্যে শুদ্ধ লক্ষ্ণৌএ ১২০১, ফয়জাবাদে ৩৫৩ এবং ৩০৮ জন অবশিষ্ট ১১টি জেলার স্থানে স্থানে বাস করিতেছিলেন। লক্ষ্ণৌ অযোধ্যা-প্রবাসী বাঙ্গালীর কেন্দ্রস্থল। শুনা যায় বাবু দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় নামে উত্তরপাড়ানিবাসী কোন সম্ভ্রান্ত বাঙ্গালী নবাব আসফউদ্দৌলার তোষাখানার দেওয়ান হইয়াছিলেন। ইহার

* Oudh Census by J. Chas Williams Esq., CS. 1869. Vol I. Page 91. Para 290.

বিশেষ প্রমাণ না পাইলেও ইহাঁর সময়ে যে অন্যান্য দুই একজন বাঙ্গালী এখানে ছিলেন, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে নবাব আসফউদ্দৌলা অযোধ্যার সিংহাসন অধিরোহণ করেন। বাবু চন্দ্রশেখর মিত্র তাঁহার মীরমুন্সীর পদ প্রাপ্ত হইয়া বঙ্গদেশ হইতে লক্ষ্ণৌ আগমন করেন। ইনি মীরমুন্সী থাকিতে থাকিতেই ইহাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বাবু প্রিয়নাথ মিত্র লক্ষ্ণৌএর রেসিডেণ্ট সাহেবের ক্যাশিয়ার হন। চন্দ্রশেখর বাবুর পুত্র বাবু গিরীশচন্দ্র মিত্র ওপিয়ম ডিপার্টমেণ্টে কর্ম্মপ্রাপ্ত হইয়া গাজীপুর প্রবাসী হন। এই সময় হইতে চারি পুরুষ ইহাঁরা গাজীপুরে বাস করিতেছেন। লক্ষ্ণৌ ১৭৭৫ অব্দ পর্য্যন্ত ৬৪টী ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রামের সমষ্টি মাত্র ছিল। নবাব আসফ্‌উদ্দৌলাই প্রথমে ফয়জাবাদ ত্যাগ করিয়া লক্ষ্ণৌএ রাজধানী স্থাপিত করেন। লক্ষ্ণৌএর যে ইতিহাসবিশ্রুত ঐশ্বর্য্য, সে সমুদয় এই সময় হইতে। নবাব ওয়াজীদ আলীসাহ যখন বন্দী হন, তখনও এই সহরে প্রায় ৯ লক্ষ * লোকের বসতি ছিল। নবাব আসফ্‌উদ্দৌলা অতি দূরদেশ হইতে নানাজাতীয় শিল্প-ও-বাণিজ্যব্যবসায়ীদিগকে স্বীয় রাজ্যে আনয়ন করিতেন এবং তাঁহাদের প্রতি বহু অর্থ ব্যয় করিয়া সমাদরে নিজ রাজ্যে তাহাদের বাসনির্দ্দেশ করিয়া দিতেন। ইহাঁর বদান্যতা সুপ্রসিদ্ধ। এদেশে একটী প্রবাদ আছে, "জিসকো ন দে মৌলা উসকো দেয় আসফ্‌উদ্দৌলা" অর্থাৎ ভগবান যাহাকে বঞ্চিত করেন আসফ্‌উদ্দৌলা তাহাকে দান করেন। এই উদারমতি নবাবের সময় বাঙ্গালী দুর্গাচরণ বাবু অথবা অপরাপর বাঙ্গালী নবাবসরকারে কর্ম্ম করিবেন, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে?

প্রাচীন রাজধানী ফয়জাবাদে সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালীর আগমন হইয়াছিল কি না তাহা নির্দ্ধারণ করিবার উপায় নাই। তবে এখনও এখানে কয়েক ঘর অতি প্রাচীন বাঙ্গালী পরিবার আছেন। তাঁহাদের প্রায় সকলেই কমিসরিয়টের কর্ম্মচারী হইয়া অযোধ্যাপ্রবাসী হন। লক্ষ্ণৌ এবং ফয়জাবাদ ব্যতীত অযোধ্যার স্থানে স্থানে বাঙ্গালী আছেন বটে, কিন্তু দুই চারি ঘর ভিন্ন বোধ হয় কেহ স্থায়ী নহেন। অযোধ্যার শেষ নবাব ওয়াজীদ আলী সাহের সময় কলিকাতার প্রসিদ্ধ জমিদার সূর্য্যকুমার ঠাকুরের দৌহিত্র * রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় সিপাহী যুদ্ধের পূর্ব্বে লক্ষ্ণৌ-প্রবাসী হন। অযোধ্যার তালুকদারগণের মধ্যে ইনিই একমাত্র বাঙ্গালী তালুকদার। রাজা দক্ষিণারঞ্জন অবধ তালুকদার সভার সম্পাদকের কার্য্য বহুকাল ধরিয়া অতি দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ইহাঁর পৌত্র কুমার শ্রীযুক্ত ভুবনরঞ্জন মুখোপাধ্যায় বর্ত্তমান অযোধ্যার একমাত্র বাঙ্গালী তালুকদার। ইহাঁদের পর অনেক গণ্যমান্য বাঙ্গালী লক্ষ্ণৌএ স্থায়ী বাস স্থাপন করিয়াছেন। তন্মধ্যে অনেকেই মূল অধিবাসিগণের নিকট সুপরিচিত ও সম্মানিত হইয়াছেন। অযোধ্যা-প্রবাসে থাকিয়া যাঁহারা বাঙ্গালী জাতির মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন, এমন দুই একজনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় নিম্নে প্রদত্ত হইল।

খুলনার জমিদারবংশীয় টাকীনিবাসী আনন্দলাল রায় চৌধুরী † সিপাহী বিদ্রোহের অব্যবহিত পূর্ব্বে পশ্চিম যাত্রা করেন। তখন বঙ্গদেশ হইতে আসিতে জলপথেই আসিতে হইত। আনন্দবাবুও নৌকা করিয়া আসিয়াছিলেন। সুতরাং জাহ্নবী-কূলবর্ত্তী প্রধান প্রধান সহরগুলিতে বিশ্রাম করিতে করিতে আইসেন, এবং এই সূত্রে প্রথমে উত্তর-পশ্চিম, পরে অযোধ্যাপ্রবাসী হন। যখন বিদ্রোহীদিগের ভয়ে ইংরাজ ও বাঙ্গালীগণ ইতস্তত পলায়ন করিতেছিলেন, আনন্দবাবু তখন কাণপুরে গিয়া উপস্থিত হন। এখানে তাঁহার পূর্ব্বপরিচিত প্রসিদ্ধ ডাক্তার চণ্ডীচরণ ঘোষের সহিত সাক্ষাৎ হয়। উভয়ে তখন লক্ষ্ণৌএ আসিয়া স্থায়ী বাস স্থাপন করেন।



—The Tagore Family : a memoir ; by J. W. Furrell, 1882. printed for private circulation.

* A Brief History of Lucknow, 1868.

† ইহাঁর পদবী "বসু"।

এ অঞ্চলে সে সময় পাশ্চাত্য শিক্ষা-প্রণালী বড় প্রবেশ লাভ করে নাই। বিশেষতঃ তালুকদার এবং স্থানীয় রাজন্যবর্গের মধ্যে শিক্ষা-নীতি এবং উদার জ্ঞানের অতীব শোচনীয় অভাব ছিল। নিরবচ্ছিন্ন আমোদপ্রমোদে কালাতিপাত করাই ধনী সম্প্রদায়ের এবং তাঁহাদের অনুকরণে জন-সাধারণের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া জ্ঞান ছিল। কিন্তু সেই তামসিক সমাজের যাবতীয় কুসংস্কার রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায় এবং বাবু আনন্দলাল রায় প্রমুখ কতিপয় বাঙ্গালীর সংশ্রবে বিদূরিত হয়। এমন কি এই সকল বিলাসী জমিদারবর্গের জীবনের স্রোত এককালে ভিন্নপথগামী হয়। উক্ত প্রবাসিগণের বিশেষ উদ্যোগে এবং গবর্ণমেণ্টের অনুমোদনে অযোধ্যার জমিদারসম্প্রদায়ের শিক্ষার জন্য ১৮৬৪ সালে লক্ষ্ণৌএ "Wards' Institution" স্থাপিত হয়। রাজা দক্ষিণারঞ্জন উক্ত বিদ্যালয়ের পরিদর্শক (visitor) এবং আনন্দবাবু গবর্ণর নিযুক্ত হন। উভয়েই স্বীয় কর্ত্তব্য এরূপ দক্ষতার সহিত সম্পাদিত করেন যে, লক্ষ্ণৌর তাৎকালীন কমিষনর বাহাদুর অযোধ্যার রাজস্ব কমিষনর এবং অযোধ্যার চীফ্ কমিষনর প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজপুরুষগণ সরকারী রিপোর্টে উভয়ের ভূরি ভূরি প্রশংসা করেন। অযোধ্যার হিন্দু মুসলমান ধনী সম্প্রদায়ের মধ্যে অনেকেই আনন্দবাবুর শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তন্মধ্যে ভীঙ্গার রাজা উদয়প্রতাপ সিংহ, সীতাপুরের অন্তর্গত মহম্মদাবাদের তালুকদার নবাব আমীর হোসেন খাঁ বাহাদুর এবং রাজা রামপাল সিংহের নাম উল্লেখযোগ্য। অযোধ্যার জমিদার সম্প্রদায় আনন্দবাবুর নিকট সুতরাং বাঙ্গালীর নিকট কতদূর ঋণী তাহা তাৎকালিক সরকারী রিপোর্টে প্রকাশিত গবর্ণমেণ্টের মন্তব্যগুলি পাঠ করিলে জানা যায়। অযোধ্যার ভূতপূর্ব্ব কমিষনর ও পঞ্জাবের ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট সার্ হেনরি ডেভিস্ বাহাদুর লক্ষ্ণৌর কমিষনর সাহেবকে এ সম্বন্ধে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার কিয়দংশ উদ্ধৃত হইল :—

"Para 4:—It is extremely pleasing to me to learn that the habits and behavior of the Wards have so much improved. Their emancipation from the sloth and stupid pomp in which it is too much the custom to rear them, and their entry upon a simple, active, regular, varied and dignified way of life, afford hopes of their future happiness and true distinction * * * * * You will be so good as to communicate to Governor and Visitor my entire appreciation of their successful exertions * * * *."* ১৮৬৮ সালের ২৯শে এপ্রিল তারিখে লক্ষ্ণৌএর কমিষনর উইলিয়ম ক্যাপার সাহেব আনন্দবাবুর সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন :—

"* * * * * * * The Governor has performed his duties with ability, with energy and with tact. The Wards * * * * are both taught and encouraged to contract habits more manly than the indolence and self-indulgence which too often characterises the youth of Orientals in their social position. And their moral as well as physical education has been well attended to. The Governor of this Institution will have the proud satisfaction of looking on a large proportion of the Oudh Territorial aristocracy as having been brought up under his superintendence and much of what they have of good they will have learnt from him. * * * *"

আনন্দ বাবু গবর্ণমেণ্ট হইতে এরূপ অনেক প্রশংসাপত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন; আমরা বাহুল্য ভয়ে অধিক উদ্ধৃত করিলাম না। ইঁহার সমসাময়িক প্রসিদ্ধ প্রবাসী বন্ধুগণ প্রায় সকলেই গত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের বংশাবলী এ প্রদেশের চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছেন। রাজা দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, লক্ষ্ণৌএর বিখ্যাত বাগ্মী রেভারেণ্ড রামচন্দ্র বসু, এম, এ, বারাণসী হইতে প্রকাশিত ষ্টারপত্রের সম্পাদক ৺ঈশ্বরচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, বিলুপ্ত ইণ্ডিয়ান ইউনিয়নের সম্পাদক শ্রীযুক্ত ব্রহ্মানন্দ সিংহের পিতা ৺ হেমচন্দ্র সিংহ, এবং ৺ কৃষ্ণেন্দ্র সান্যাল† প্রভৃতি আনন্দ বাবুর বিশিষ্ট বন্ধুগণ তাঁহার সহিত ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন।

নবাব ওয়াজীদ আলী তাঁহার আনন্দকানন কৈসরবাগের পূর্ব্বদিকস্থ একটি সুবৃহৎ অট্টালিকা ক্রয় করেন। ঐ অট্টালিকা তাঁহার ক্ষৌরকার আজীম উল্লা খাঁর সম্পত্তি ছিল। নবাব উহার মূল্যস্বরূপ আজীমকে চারিলক্ষ টাকা দিয়াছিলেন। তখন হইতে ইহার নাম হইল চৌলক্ষি

* Extract from a letter dated 26/28th July 1865 (Financial Department from R. H. Davies Esq., Financial Commissioner, Oudh, to the Commissioner of the Lucknow Division

† ইনি কাবুল-যুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুহস্তে জীবন বিসর্জ্জন করেন।

মহল। * এই মহলে পরে নবাব বাস করায় ইহা প্রধান মহলে পরিণত হয় এবং "চৌলক্কি মহল সরাই ইজ্জৎমহল" এই নামে অভিহিত হয়। এখানে বিদ্রোহী বেগম স্বীয় দরবার করিতেন এবং কয়েক সপ্তাহের জন্য এখানে ইংরাজদিগের বন্দিগণ রক্ষিত হইয়াছিল। আনন্দবাবু এই অট্টালিকা ক্রয় করেন। আনন্দবাবু কিছুকাল রাজা ডিঙ্কার প্রাইভেট্ সেক্রেটরির কাজ করিয়াছিলেন এবং দেওয়ান রণবিজয় বাহাদুর সিংহের খুদুক্ক তালুকের প্রধান কার্য্যাধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। ইংরাজী সাহিত্যে ইহাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ও যথেষ্ট অধিকার ছিল।

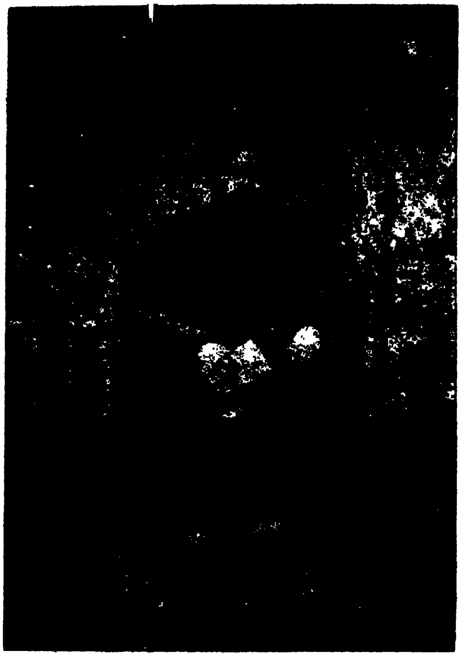
অযোধ্যার ইন্স্পেক্টর অব্ স্কুলস্ বাবু রামচন্দ্র সেনের পরিচয় ইতিপুর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। অযোধ্যার প্রসিদ্ধ বাঙ্গালীগণের মধ্যে যাঁহারা বর্ত্তমান তন্মধ্যে ডাক্তার রামলাল চক্রবর্ত্তী রায় বাহাদুরের নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। ইনি ১৮৭১খৃষ্টাব্দে কলিকাতা হইতে কলভিন হাঁসপাতালের ভারপ্রাপ্ত হইয়া এলাহাবাদে আইসেন, এবং মোরাদাবাদ ও বারাণসীতে বদলি হওয়ার পর-১৮৭৯খৃষ্টাব্দে লক্ষ্ণৌ আগমন করেন। তদবধি ইহাঁর হস্তে উত্তর-পশ্চিমের মধ্যে প্রধান চিকিৎসালয় বলরামপুর হাঁসপাতালের ভার ন্যস্ত রহিয়াছে। বলরামপুরের মহারাজা দ্বিগ্বিজয় বাহাদুর কে, সি, এস, আই, ব্যাঘ্রশিকার কালে হস্তিপৃষ্ঠ হইতে হিমালয়ের শৈলপাদমূলে পতিত হইয়া মরণাপন্ন হন। গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া ডাক্তার মহাশয় তাঁহার চিকিৎসা করেন। ইহাঁর সুচিকিৎসাগুণে মহারাজা পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া কৃতজ্ঞতার-নিদর্শন স্বরূপ ডাক্তার মহাশয়কে বহুমূল্য উপহার এবং মাসিক একশত টাকা চিরস্থায়ী বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিয়া দেন। রামলাল বাবু উত্তর-পশ্চিমের যে যে স্থানে অবস্থান করিয়াছেন, সেই সেই স্থানে তিনি সর্ব্বসাধারণের ভক্তি শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিয়াছেন।

যখনই গবর্ণমেন্ট তাঁহাকে স্থানান্তরিত করিয়াছেন তখনই স্থানীয় প্রধান ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ প্রকাশ্যে সভা করিয়া দুঃখ প্রকাশ এবং শতমুখে তাঁহার গুণগান করিয়াছেন। স্থানীয় হিন্দু মুসলমান এবং ইউরোপীয় সম্প্রদায় তাঁহার গুণের কিরূপ পক্ষপাতী, ১৮৭৬ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর এবং ১৮৭৭ সালের ৩র সেপ্টেম্বর তারিখের পাইওনিয়র পত্রপাঠে তাহা জানা যায়। তৎকালে হিন্দুস্থানী ও মুসলমান সম্প্রদায়ের ভিতর ডাক্তারী চিকিৎসার আদর ছিল না। হাকিমী ও বৈদ্যক ভিন্ন আর কিছুর প্রতি সাধারণের শ্রদ্ধা ছিল না। বৈদ্যক চিকিৎসা আয়ুর্ব্বেদ মতে হইলেও বাঙ্গালী কবিরাজগণের দ্বারা এই শাস্ত্রীয় চিকিৎসাপ্রণালী যেরূপ উৎকর্ষ লাভ করে, হিন্দুস্থানী 'বএদ' গণের মধ্যে সাধারণতঃ তাহার কিছুই ছিল না॥ বাঙ্গালী ডাক্তার এবং কবিরাজগণের দ্বারাই এতদঞ্চলের চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত এবং জনসাধারণের প্রধান অভাব মোচন হইয়াছে। ইংরাজ বাহাদুর বহু চেষ্টাতেও এদেশীয়গণের মধ্যে বসন্তের টীকা দিবার প্রথা প্রচলিত করিতে পারেন নাই কিন্তু একজন বাঙ্গালী এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন কর্ত্তৃক তাহা হইয়াছিল। ডাক্তার চন্দ্রনাথ বিশ্বাস * তাহাতে প্রথম কৃতকার্য্য হন। রামলাল বাবুর দ্বারাও সেইরূপ দুই একটি ইউরোপীয় চিকিৎসা-প্রণালীর প্রবর্ত্তন হয়। পূর্ব্বে এদেশে বড় কেহ চক্ষুর ছানি কাটাইত না। চক্ষুর ছানি কাটান ইহাঁর সময় হইতে একপ্রকার আরম্ভ হয়। † এ প্রদেশে স্ত্রী-চিকিৎসার একান্ত অভাব ছিল। এই প্রণালী ইহাঁরই উদ্যোগে প্রবর্ত্তিত হয়। গবর্ণমেন্টের

* A Brief history of Lucknow with an account of its principal buildings etc; prepared and printed by the Municipal Committee, Lucknow, 1868.

* মিউটিনির সময় ইনি সর্ব্বস্বান্ত হইয়া সন্ন্যাসীর বেশে পদব্রজে কলিকাতায় প্রত্যাগত হন ইহাঁর জনৈক বন্ধু বিদ্রোহীদের হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্য "জুতা ক্রষ" বেশ ধারণ করিয়া পলায়ন করিতেছিলেন। পথিমধ্যে সাক্ষাৎ হওয়ায় উভয়ে উভয়কে চিনিতে পারেন এবং গোবানে পলায়ন করেন।

† 'The first circumstance of note in connection with his useful service in the Colvin Hospital was that before 1871 the eye operation for cataract was seldom performed in these Provinces, and it was through the labour and industry of Drs J. Jones and Ram Lall a large number of cataract cases were operated on. This gave an impetus to the kind of surgical relief which has since been adopted on a large scale in several dispensaries in these Provinces. The second circumstance of note was * * * * training of midwives for the benefit of women of these Provinces, which was a great want. Ram Lall took this matter into his hand and opened the



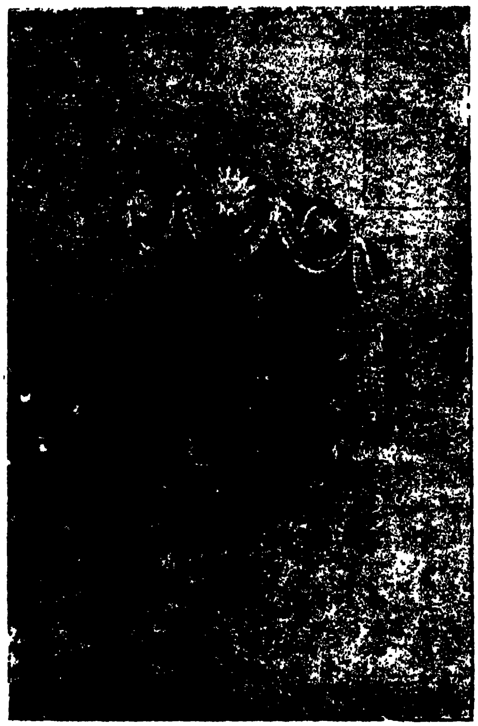
স্বর্গীয় আনন্দলাল রায়।



শ্রীচন্দ্রশেখর সেন।



ডাক্তার শ্রীরামলাল চক্রবর্ত্তী রায়-বাহাদুর



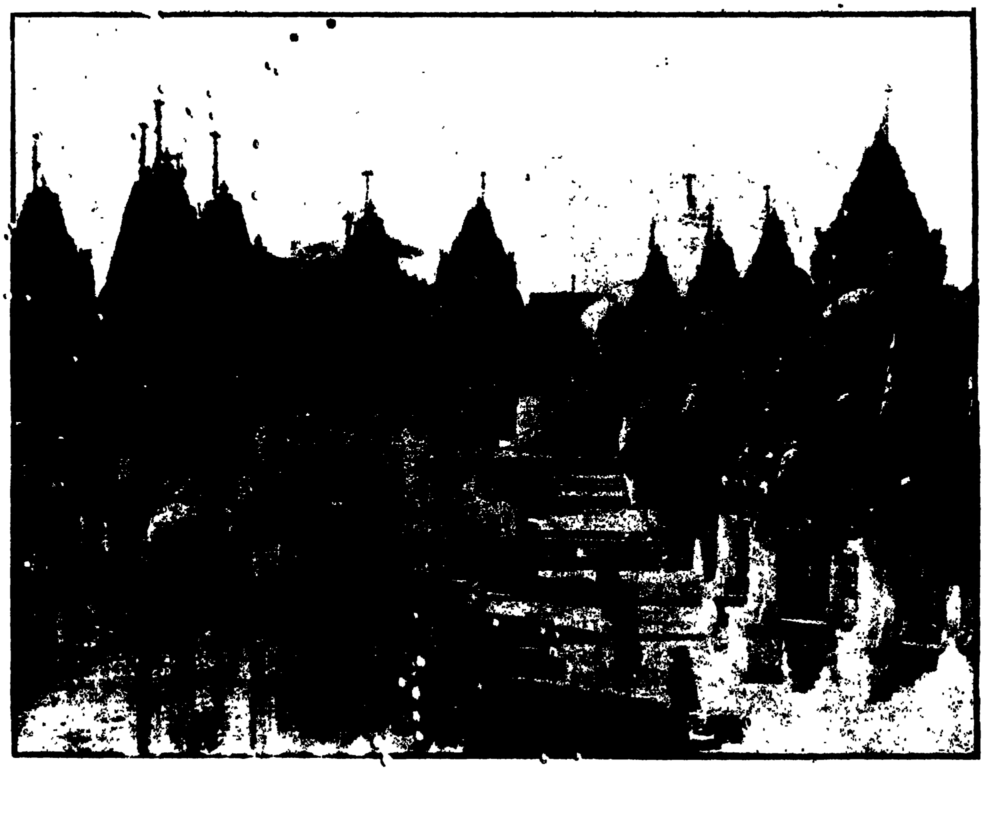
ঠাকুর সাহেব মানসিংহজী।





জৈনমন্দির





নিকট এজন্য ইনি বিশেষ প্রশংসাভাজন হইয়াছিলেন। এ প্রদেশে রামলাল বাবু স্বজাতির গৌরব কিরূপ বৃদ্ধি করিয়াছিলেন; কেহ তাহার বিশদ বিবরণ জানিতে ইচ্ছা করিলে তাঁহার সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত* পাঠ করিতে পারেন।

†"ভূপ্রদক্ষিণ" প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা সুপ্রসিদ্ধ পরিব্রাজক ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন মহাশয় সম্প্রতি ফয়জাবাদ-প্রবাসী হইয়াছেন। কুড়ি একুশ বৎসর পূর্ব্বে তিনি আর একবার এতদঞ্চলে বাস করিয়া গিয়াছেন। এলাহাবাদ হইতে "সাহস" নামে একখানি সংবাদপত্র প্রকাশিত হইত। চন্দ্রশেখর বাবু কিছুকাল তাহার সম্পাদকতা করেন। ইহাঁর বহুঘটনাপূর্ণ জীবনের কিয়দংশ উত্তর-পশ্চিম-প্রবাসী বাঙ্গালীর সংবাদপত্রের সহিত জড়িত থাকায় প্রবাসীর গৌরব বৃদ্ধি হইয়াছে সন্দেহ নাই। চন্দ্রশেখর বাবু মালদহ জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। এইখানেই প্রথমে স্কুল-মাষ্টারী ও পরে গবর্ণমেন্টের চাকরী করেন এবং সরকারী কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতা মেডিকেল কলেজে প্রবেশ করেন। ডাক্তারী শিক্ষার পর ইনি আসামের সীমান্ত প্রদেশে মেডিকেল অফিসার হইয়া কিছুকাল অতিবাহিত করেন। ১৮৮৯ সালে ইনি ইউরোপ ভ্রমণে বহির্গত হইয়া নানা দেশ পর্য্যটন করতঃ ১৮৯১ সালে ব্যারিষ্টারি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পুনরায় ভ্রমণে বহির্গত হন। বাল্যকাল হইতেই দেশভ্রমণের প্রতি চন্দ্রশেখর বাবুর আন্তরিক অনুরাগ জন্মে। ইনি ইউরোপ, আমেরিকা, আফ্রিকা, চীন, জাপান, সিঙ্গাপুর, পিনাং, আসিয়ার প্রধান প্রধান স্থান এবং পৃথিবীর সীমান্ত দেশসমূহ পরিভ্রমণ করিয়া তাঁহার আজন্মের পর্য্যটন-স্পৃহা একপ্রকার পরিতৃপ্ত করিয়াছেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধ এবং ভ্রমণবৃত্তান্ত বঙ্গ-সাহিত্য ভাণ্ডারের অমূল্য সামগ্রী। বহুকাল হইতে ইনি সাহিত্য-সেবা করিতেছেন। মাতৃভাষার প্রতি যে তাঁহার ঐকান্তিক অনুরাগ আছে, তাহা তৎপ্রণীত ভূপ্রদক্ষিণ পাঠে উপলব্ধি করিতে পারা যায়। উক্ত গ্রন্থের ইংরাজী ও মাতৃভাষা সম্বন্ধীয় কৌতূহলপ্রদ অংশটুকু প্রত্যেক প্রবাসী বঙ্গ-সন্তানের পাঠ করা আবশ্যক। আধুনিক ভারতবর্ষীয় পৃথিবী-পর্য্যটকগণের মধ্যে ইনি সর্ব্বপ্রধান। চন্দ্রশেখর বাবু এক্ষণে ফয়জাবাদ জেলা আদালতে ব্যারিষ্টারি করিতেছেন।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।

midwifery class which was entirely under his control. * * * He worked for this class without any remuneration and it was only through his exertions that the whole native community was induced to subscribe towards its maintenance."—Page 149, Bengal Celebrities.

*A General Biography of Bengal Celebrities by R. G. Sanyal; Vol I, 1889, Page 140.

† ভূপ্রদক্ষিণ—১৮৯৭—পৃষ্ঠা—১৩৫—১৩৮।

শত্রুঞ্জয় পর্ব্বত।

বারাণসী যেরূপ হিন্দু শৈবসম্প্রদায়দিগের তীর্থস্থান এবং যেরূপ ঐ সম্প্রদায়ের লোকেরা তথায় শিব-মন্দির স্থাপন করা মহা পুণ্যের কাজ মনে করেন, সেইরূপ জৈনমতাবলম্বীদিগের পক্ষে শত্রুঞ্জয় পর্ব্বত একটী তীর্থস্থান ও সেই স্থলে মন্দির স্থাপন করা তাঁহাদের মতে অত্যন্ত পুণ্যের কাজ। এখানে ইহাঁদের প্রথম তীর্থঙ্কর ঋষভদেব তপস্যা করিয়াছিলেন। এই পর্ব্বত এত মন্দিরে আচ্ছাদিত যে, তজ্জন্য ইহাকে সচরাচর City of Temples (অর্থাৎ মন্দিরের সহর) বলা হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষের পশ্চিম অঞ্চলে কাঠিয়াবাড় প্রদেশে পালিতানা নামক একটী ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ-সংস্থান আছে। সেই রাজ্যে শত্রুঞ্জয় পর্ব্বত। পালিতানার রাজা রাজপুতবংশজাত এবং তাঁহার উপাধি "ঠাকুর সাহেব"। তাঁহার রাজ্যের বাৎসরিক আয়কর প্রায় ছয় লক্ষ টাকা। পালিতানার বর্ত্তমান রাজার নাম ঠাকুর সাহেব মানসিংহজী। তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি এই সংখ্যাতে প্রদত্ত হইল।

পালিতানা সহরে যাইতে হইলে সোনগড় নামক রেলওয়ে ষ্টেসনে নামিতে হয়। সোনগড় বোম্বাই হইতে প্রায় ২৪ ঘণ্টায় রেলে করিয়া পৌঁছান যায়। সোনগড় হইতে পালিতানা প্রায় ১৪ মাইল দূরে অবস্থিত; পথ প্রশস্ত ও পাকা এবং তাহার দুই ধারে বড় বড় অশ্বত্থ প্রভৃতি গাছ শোভিত আছে। এতদ্দেশীয় লোকেরা প্রায় গরুর গাড়িতেই সোনগড় হইতে পালিতানার যাতায়াত করেন।

কিন্তু ঘোড়ার গাড়ীতে যাওয়া সুবিধাজনক। পালিতানা হইতে শত্রুঞ্জয় পর্ব্বত প্রায় দুই মাইল দূরে অবস্থিত। কেহ কেহ পাল্কী করিয়া এই পর্ব্বতের উপর উঠেন, কিন্তু জৈনসম্প্রদায়ের লোকেরা তাহা পুণ্য কাজ মনে করেন না। পর্ব্বতের উপর উঠিবার জন্য তাহার গায় গায় সিঁড়ি নির্ম্মিত করা হইয়াছে।

এই পর্ব্বতে যে সকল মন্দির আছে, তাহা ভালরূপে দেখিতে হইলে অনেক দিন লাগে। একদিনের কাজ নহে। এই সকল মন্দির তৈয়ারি করিতে নির্ম্মাণকারীরা যেরূপ পরিশ্রম ও উচ্চ-শিল্পের আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা অত্যন্ত প্রশংসনীয়।

এই পর্ব্বতের উপরে যে কেবল জৈনদিগের মন্দির আছে, তাহা নহে। হিন্দুদিগের পূজার নিমিত্ত হনুমানেরও একটী ক্ষুদ্র মন্দির আছে। এই স্থলে অনেক হিন্দুযাত্রীরা আসিয়া তাহার গাত্রে সিন্দুর মাখাইয়া দিয়া থাকেন।

হেঙ্গর পীরের দরগা বলিয়া বিখ্যাত একটী মুসলমানদিগের উপাসনা করিবারও স্থান এই পর্ব্বতের উপরে আছে।

জৈনদিগের প্রসিদ্ধ তীর্থস্থলে হিন্দু ও মুসলমানদিগের মন্দির ও দরগা থাকিবার কি উদ্দেশ্য তাহা এই স্থলে বলা আবশ্যক। এইরূপ প্রবাদ প্রসিদ্ধ আছে যে, যখন ভারতবর্ষে আর জৈন রাজা ছিল না, তখন তাহাদের উপর মহা অত্যাচার হইত। বৌদ্ধসাম্প্রদায়িক লোকেদের উপর কিরূপ অত্যাচার হইয়াছিল এবং কিরূপে হিন্দুরা বুদ্ধদেবের ধর্ম্মকে এদেশ হইতে বিতাড়িত করিয়াছিল তাহা প্রায় সকলেই বিদিত আছেন। সম্ভবতঃ হিন্দুরা ঐরূপ অত্যাচার জৈনদিগের উপরও করিতে ক্রটী করেন নাই; কারণ জৈন ও বৌদ্ধ ধর্ম্মে অতি অল্পই প্রভেদ আছে। কেহ কেহ এইরূপ বলিয়া থাকেন যে, বৌদ্ধ ধর্ম্ম হইতেই জৈন ধর্ম্মের উৎপত্তি হইয়াছে। যে দেশে জৈনদিগের এই মহা তীর্থস্থল, তাহা বহু শতাব্দী হইতে হিন্দু রাজাদিগের অধীন। অতএব তাহাদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবার জন্য জৈনরা ঐ হনুমানের মন্দির স্থাপিতে কোন আপত্তি করেন নাই।

মুসলমানেরা কোনকালেই মূর্ত্তিপূজক ছিলেন না। তাঁহারা মূর্ত্তিভঙ্গ করাই প্রধান ধর্ম্ম বলিয়া মনে করিতেন। এই শত্রুঞ্জয় পর্ব্বতে যে তাঁহারা কতবার লুটপাট করিয়া গিয়াছেন, তাহার ঠিক নাই। তাঁহাদিগের লুটপাট নিবারণ করিবার নিমিত্ত এবং তাঁহাদিগের অত্যাচারের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিবার জন্য জৈনরা নিজের তীর্থস্থলে এই পীরের দরগা নির্ম্মাণ করিয়া দিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

পর্ব্বতের উপরস্থ মন্দিরের চারিদিকে দুর্গের ন্যায় মোটা ও পুরু দেওয়াল ও তাহা ভেদ করিয়া স্থানে স্থানে বড় বড় দ্বার আছে। প্রত্যেক মন্দিরের ভিতর একটী জৈনদিগের উপাস্য তীর্থঙ্কর দেবতার মূর্ত্তি আছে। ঐ সকল মূর্ত্তি শ্বেত মার্ব্বল প্রস্তর হইতে নির্ম্মিত এবং বহুমূল্য অলঙ্কার দ্বারা সুশোভিত। শত্রুঞ্জয় পর্ব্বতের উপর উঠিলে কেবল প্রকৃতির সৌন্দর্য্যেই নহে পরন্তু মনুষ্যনির্ম্মিত চিত্র নৈপুণ্যেও মন পুলকিত ও আহ্লাদিত হয়। ইহা জগতে একটী অত্যন্ত রমণীয় স্থান। ডাক্তার বর্গেস ইংরাজী ভাষায় শত্রুঞ্জয় পর্ব্বতের বর্ণনা করিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন:—

"It is truly a wonderful, a unique place—a city of temples,—for except a few tanks, there is nothing else within the gates. Through court beyond court the visitor proceeds over smooth pavements of grey *Chunam* visiting temple after temple—most of them built of stone quarried near Gopnath, but a few marble; all elaborately sculptured, and some of striking proportions. And, as he passes along, the glass-eyed images of pure white marble, seem to peer out at him from hundreds of cloister cells. *Such a place is surely without a match in the world*: and there is a cleanliness withal about every square and passage, porch and hall, that is itself no mean source of pleasure."

আমরা এই জৈন মন্দিরগুলির মধ্যে চারিটির চিত্র দিলাম।

শ্রীবামনদাস বসু।

মধ্যপথে।

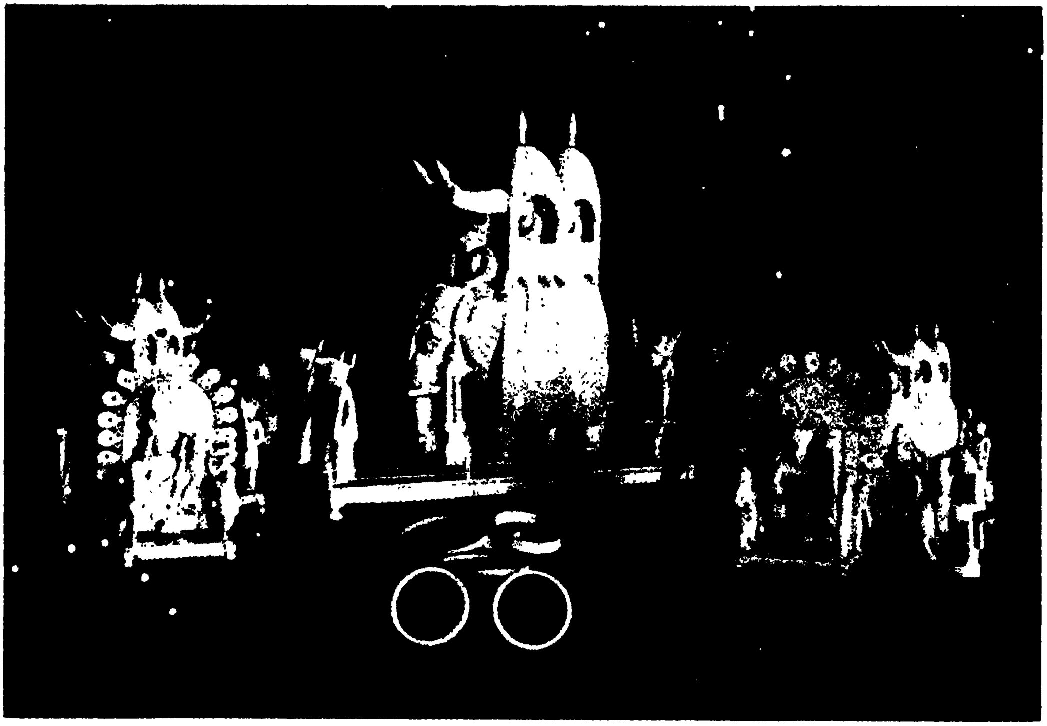
"হে পথিক! আরো কত দূরে তব দেশ?
সুদূর কল্পনামত দূরে অতি দূরে
মিশায়ে পশ্চাতে মোর স্বদেশের রেখা;
সেথাকার শেষধ্বনি যায় ক্রমে সরে,
নিরাশ প্রেমের শেষ দীর্ঘশ্বাস মত।



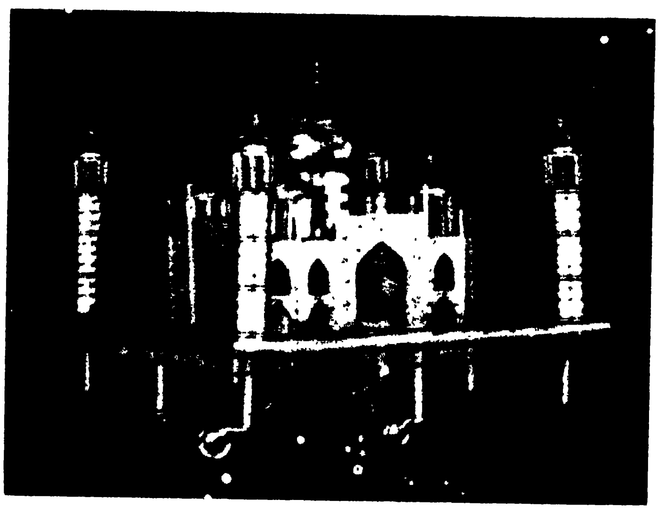
মুরাদাবাদ ও কাশীর পিত্তল]　　ধাতব শিল্প।　　[রৌপ্য ও জার্ম্মেন রৌপ্যের দ্রব্য।



গজদন্ত ও পিতল প্রতিবপন করা কাঠের আসবাব। হোশিয়ারপুর



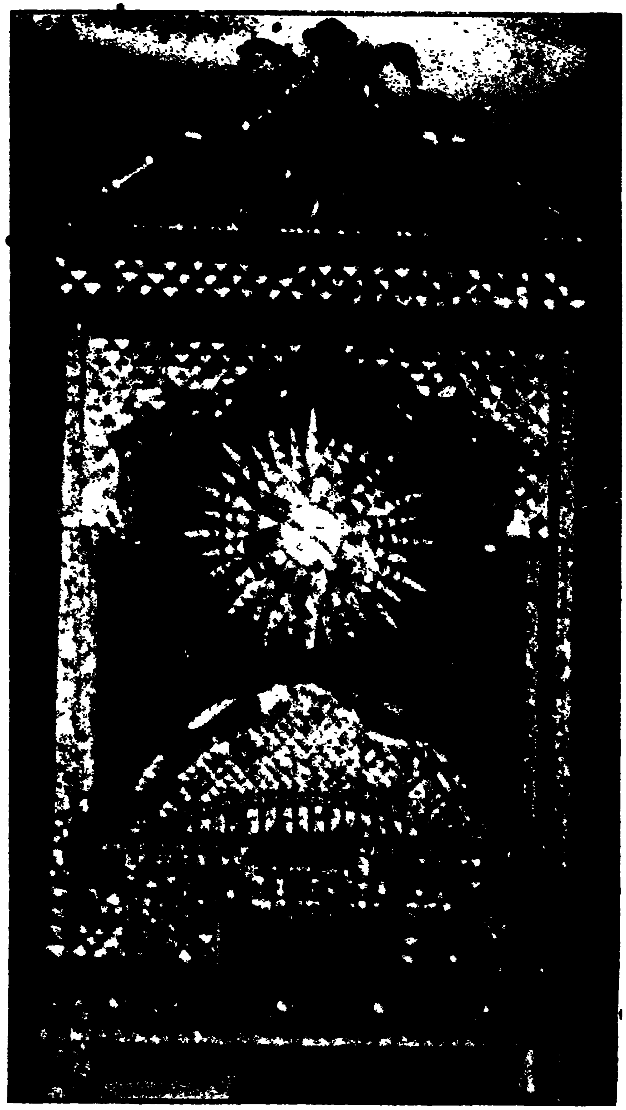
[বহরমপুর] গজদন্ত পুতুল। [মুরশিদাবাদ



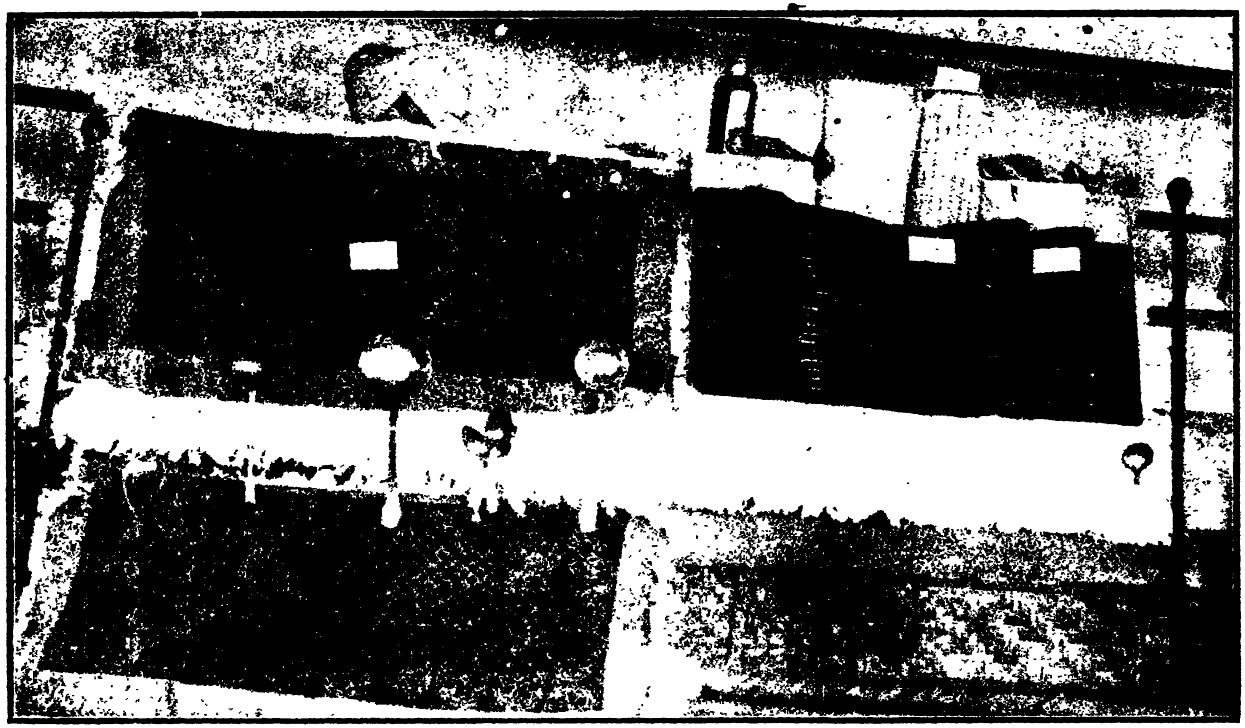
কটক] রৌপ্যতাজ। [উড়িষ্যা



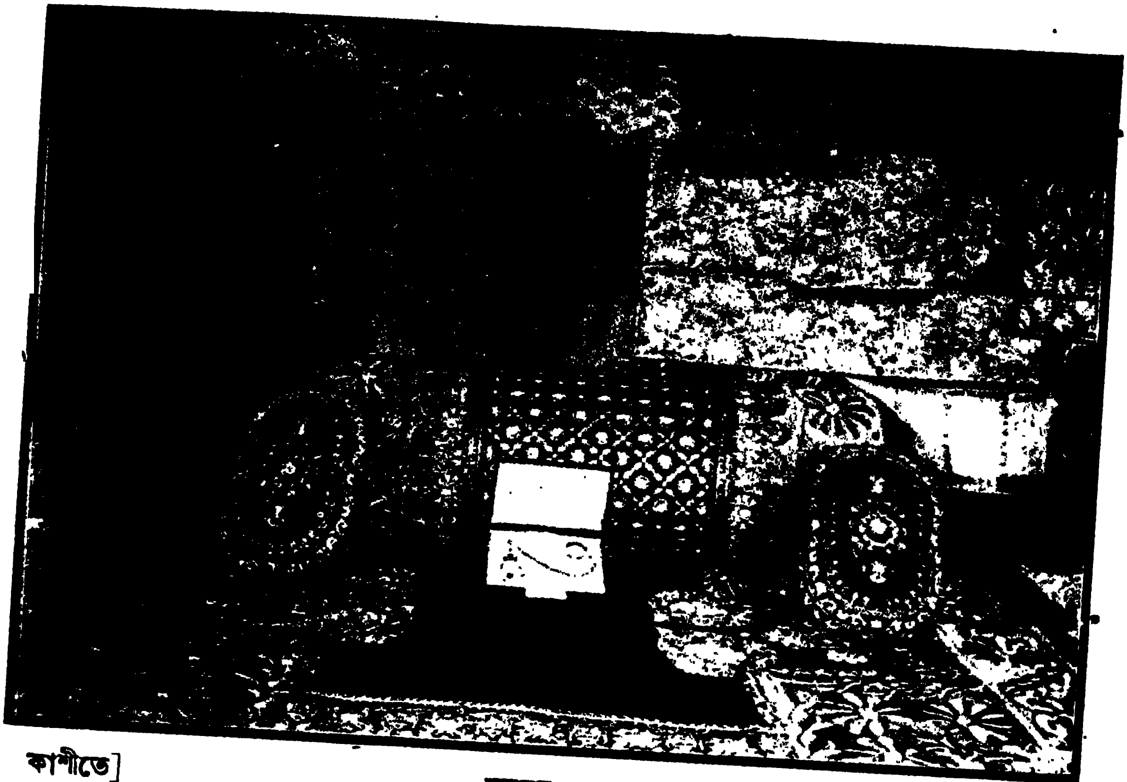
গজদন্তপ্রতিবপন দারুশিল্প। [করা। জালন্ধর।



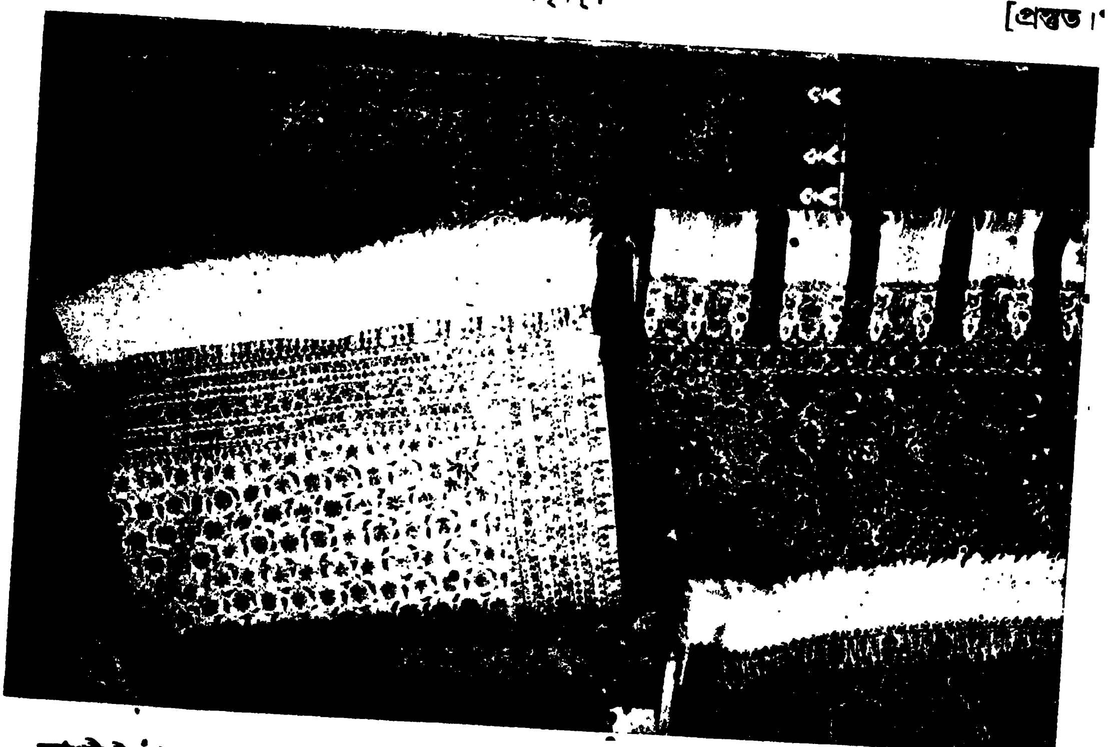
দর্পণযুক্ত] স্ফাটিক চতুর্দ্দোল [কলিকাতা।



মালদহের] সূচিনৈপুণ্য। সুজনী ও বস্ত্র



কাশীতে] মসূনদ্। [প্রস্তুত।



কাশ্মীরী শাল।] সূচি-নৈপুণ্য। [বারাণসী।

সম্মুখেতে চুপে জাগে বিজন নিশীথ,
স্বপনপ্রবাহ মত পড়ে আছে পথ,
নিশীথ-বিহগ-স্বর হয় চমকিত ?
শিরোপরে আপনার সুবিজন স্বরে।
নীরব প্রহরী মত আঁধারের ছায়া
দাঁড়াইয়া হেথা হোথা আছে ঘনীভূত ;
তন্দ্রাবেশে পথদীপ আছে মিলাইয়া
আপনার সকম্পিত ম্লানজ্যোতি ছায়ে ;
ঘুমাবেশ শ্রান্ত চোখে পড়িছে ঢলিয়া ;—
হে পথিক ! আরো কত দূরে তব দেশ ?
কোন্ নিশি মাঝে লও ?" কহিনু ডাকিয়া।
আধস্বপ্নভঙ্গ যেন ফিরিল পথিক।
তন্দ্রামগ্ন দীপালোক নিবিল তথন ;
মধ্যপথে নিশিযাত্রা হ'ল অবিচল ;
দোঁহাকার ফিরে এল দিন জাগরণ।

লজ্জাবতী বসু।

ভারত শিল্প-সম্ভার।

যাঁহারা কংগ্রেস উপলক্ষে কলিকাতার শিল্প-প্রদর্শনীতে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা দেখিয়া আসিয়াছেন—এখনও ভারতীয় শিল্প-নৈপুণ্য সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয় নাই। কোন কোন বিষয়ে অনন্যসাধারণ কলা-নৈপুণ্য বিলক্ষণ দেদীপ্যমান। তজ্জন্য আমরা কিয়ৎ পরিমাণে আত্মশ্লাঘা প্রকাশে সক্ষম হইলেও, সে শ্লাঘা বড় অধিক দিন সম্ভোগ করিবার সম্ভাবনা আছে বলিয়া বোধ হয় না। সভ্য জগৎ নিত্য নূতন শিল্প-কৌশল আবিষ্কারে নিযুক্ত থাকিয়া নিরন্তর সম্মুখে অগ্রসর হইতেছে ; আমরা কেবল পশ্চাৎ হইতে আরও পশ্চাতে পিছাইয়া পড়িতেছি !

শিল্পের আদর অবসন্ন হইয়া পড়িতেছে ; শিল্পীর সংখ্যাও দিন দিন ক্ষীণ হইয়া উঠিতেছে। দেশের লোকে উৎসাহদানে কৃপণতা করিলে শিল্পের অধোগতি উপস্থিত হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। সেই স্বাভাবিক নিয়মে ভারতীয় শিল্প-সম্ভার ক্রমে পূর্ব্ব-গৌরব ও পূর্ব্ব-সৌভাগ্য হারাইতে বসিয়াছে !

কলিকাতার মত ধনাঢ্য রাজধানীতে কিয়দ্দিবসের জন্য যে বিচিত্র শিল্প-সম্ভার সজ্জীভূত হইয়া লোক-লোচনের আনন্দবর্দ্ধন করিয়াছিল, লোকে অর্থব্যয় করিয়া ক্রয় করিবার জন্য যথাযোগ্য আগ্রহ প্রকাশ না করায়—তাহার অধিকাংশ দ্রব্যই শূন্যগর্ভ সাধুবাদ ও ক্ষুদ্রকায় পুরস্কার-পদক উপার্জ্জন করিয়া শিল্পিগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইয়াছে।

দেশ বড় দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছে। এখন আর ব্যয়-বাহুল্য করিয়া বহুমূল্য শিল্প-দ্রব্য ক্রয় করা সম্ভব নহে,—ইত্যাদি বাঁধি বোলের আবৃত্তি করিয়া কৈফিয়ৎ সৃষ্টি করা কঠিন নহে। কিন্তু তাহা সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বোধ হয় না। অর্থ-দৈন্য অপেক্ষা রুচি-দৈন্যই অধিক পরিস্ফুট। তজ্জন্য দেশীয় শিল্পে অনাস্থা ও বিদেশের কাচখণ্ডে আসক্তি উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতেছে।

ভারতীয় আচারব্যবহারের পার্থক্যবশতঃ যে সকল বিদেশের শিল্পদ্রব্যের কিছুমাত্র প্রয়োজন অনুভূত হইত না, এখন তাহা ব্যবহার করিবার জন্য আচারব্যবহারও পরিবর্ত্তিত হইতেছে ! ধনাঢ্যের গৃহসজ্জার মধ্যে পৃথিবীর সকল দেশের কলানৈপুণ্য পুঞ্জীকৃত,—কেবল তাঁহার স্বদেশই সেখানে হতমান !

দেশে যে উপযুক্ত উপকরণের অভাব আছে, তাহা সত্য বলিয়া বোধ হয় না। তাহার প্রধান দোষ এই যে, তাহা বিলাতী নহে, স্বদেশী। বিলাতী-মোহে জনসমাজ অন্ধ হইয়া উঠিয়াছে, তজ্জন্য দেশীয় শিল্প বিলুপ্ত হইয়া পড়িতেছে।

হর্ম্ম্যতল আচ্ছাদন করিবার জন্য বিলাতী "কার্পেট" ব্যবহৃত হইতেছে। অল্প দিন পূর্ব্বে বিলাতের লোকে "কার্পেট" চিনিত না ; আমাদের ও পারস্যের আদর্শ লইয়াই তাহারা কার্পেট প্রস্তুত ও ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে। কার্পেট শীতপ্রধান দেশের পক্ষে আবশ্যক ; গ্রীষ্মপ্রধান দেশে অনাবৃত হর্ম্ম্যতলই সমধিক সুখকর ; মর্ম্মর-খচিত হইলে আরও সুখকর। তথাপি যদি বিচিত্র চারুশিল্পে হর্ম্ম্যতল আচ্ছাদন করিতে হয়, তাহার নানা উপকরণ দেশে প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব। কুশ কাশ সর্ব্বত্র প্রাপ্ত হওয়া যায় ; তাহার দ্বারা বর্ণ-সমাবেশ ও রচনা-

কৌশলে অতি উৎকৃষ্ট আস্তরণ প্রস্তুত হইতে পারে;—কাশ্মীরাঞ্চলে ইংরাজের কৃপায় এরূপ আস্তরণ অনেক প্রস্তুত হইতেছে। মাদুর কত সুন্দর, কত সূক্ষ্ম, কত বিচিত্র শিল্প-চাতুর্য্যের পরিচয় প্রদানে সক্ষম, এবার মান্দ্রাজী মাদুর তাহার সাক্ষ্যদান করিয়াছিল;—তাহা যেমন কোমল, তেমনি মসৃণ; ধনীর হর্ম্ম্যতল আচ্ছাদন করিবার পক্ষে সর্ব্বাংশেই সুন্দর। গালিচা, দুলিচা, কার্পেট, সতরঞ্চ এখনও পর্য্যাপ্ত প্রস্তুত হইয়া থাকে; তাহার প্রস্তুত-কৌশলও নিতান্ত সহজ। শণ, পাট, মেষ-লোম, তুলা ও রেশমের দ্বারা সাধারণ কার্পেট এবং জরি মিশাইয়া বহুমূল্য কার্পেট প্রস্তুত করিবার কৌশল লোকে এখনও বিস্মৃত হয় নাই। কিন্তু দেশীয় কার্পেটের আদর ক্রমে বিলুপ্ত হইতেছে।

দরবারে, বিবাহ-সভায় ও ধনীগৃহে যে বহুমূল্য কারুকার্য্য-খচিত "মসলন্দ" নামক আসন ব্যবহৃত হইত, তাহার আদর তিরোহিত হইতেছে; বিলাতী চেয়ার, সোফা ইত্যাদি সে স্থান অধিকার করিতেছে। যাহারা "মসলন্দ" প্রস্তুত করিয়া জীবিকার্জ্জন করিত, তাহারা শিল্পচর্চ্চা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইতেছে। ধনীগৃহে "মসলন্দের" ন্যায় বহুমূল্য বিলাতী আস্তরণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সেই সকল প্রয়োজন সাধনার্থ পুরাতন "মসলন্দ" ব্যবহৃত হইলে ক্ষতি কি? "মসলন্দের" ন্যায় সিংহাসনও এখন বিলাতী আকার ধারণ করিয়াছে। রাজারাজড়ার জন্য বিলাতী দোকানে বিলাতী আদর্শে সিংহাসননামধেয় চেয়ার প্রস্তুত হইতেছে; পুরাতন আদর্শের সিংহাসন এখন আর সমাদরলাভ করিতেছে না।

এ সকল ধনাঢ্যের ব্যবহার্য্য শিল্পদ্রব্য। জনসাধারণের ব্যবহার্য্য শিল্পদ্রব্যও যথেষ্ট আছে; কিন্তু ক্রমে তাহাও বিলুপ্ত হইতেছে। বিলাতী রুচি জনসাধারণকেও আক্রমণ করিয়াছে। তাহারাও ফরাস ছাড়িয়া টেবিল চেয়ার ধরিতেছে; মোড়া ছাড়িয়া আরাম-চৌকি খুঁজিতেছে; হাত-পাখা ভুলিয়া টানা-পাখা ঝুলাইতেছে; ধুতি চাদর শাল বনাত ফেলিয়া হ্যাটকোট ধরিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিতেছে! তজ্জন্য দেশীয় তন্তুশিল্পের অবনতি হওয়া অবশ্যম্ভাবী। ভাল ধুতি, ভাল চাদর, ভাল শাল রুমাল জামিয়ার ক্রমে দুর্ল্লভ হইয়া উঠিতেছে; তৎসঙ্গে ভারতীয় শিল্পের একাংশ নিতান্ত নিষ্প্রভ হইয়া পড়িতেছে! ভারতীয় তাঁতের সূক্ষ্মশিল্প ও সূচীর সূক্ষ্মশিল্প ইতিহাসবিখ্যাত;—তাহা ক্রমেই খ্যাতিহীন হইতেছে।

শিল্পদ্রব্য উৎপাদন প্রণালী দ্বিধাবিভক্ত;—গৃহজাত ও কারখানাজাত এই দ্বিবিধ দ্রব্য দ্বিবিধ উৎপাদনপ্রণালীর পরিচয় প্রদান করে। বহু লোকের সমবেত শক্তিতে কল কারখানার সহায়তায় যাহা উৎপন্ন হয়, তাহাকে কারখানা-জাত শিল্পদ্রব্য বলা যায়। ইহাতে পর্য্যাপ্ত মূলধন আবশ্যক। গৃহজাত শিল্পদ্রব্য সেরূপ নহে। একজন বা এক পরিবার-ভুক্ত অল্পসংখ্যক লোকে সামান্য মূলধন লইয়া সংসারের দশ কাজের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পদ্রব্য উৎপাদন করিতে পারে। ভারতীয় শিল্পদ্রব্য এই উপায়েই উৎপাদিত হইত। প্রায় প্রতি গ্রামে, প্রতি গৃহে লোকে কোন না কোন শিল্পকার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া অর্থোপার্জ্জন করিত। অদ্যাপি যে সকল শিল্পদ্রব্যের জন্য ভারতবর্ষ বিশ্ববিখ্যাত, তাহাও এই প্রণালীতে উৎপাদিত হইয়া থাকে। এরূপ উৎপাদনপ্রণালীর কতকগুলি অসুবিধা আছে। শিল্পী গৃহকোটরে আবদ্ধ থাকিয়া নূতন আদর্শ-সংগ্রহ করিতে পারে না, সভ্য জগতের রুচিপরিবর্ত্তনের সঙ্গে কত নূতন ফ্যাসানের সৃষ্টি হইতেছে, তাহার সন্ধান প্রাপ্ত হয় না; কালে তাহার পুরাতন ফ্যাসানের বস্তু আর কাটিতেছে না কেন—তাহা বুঝিতে না পারিয়া শিল্পালোচনা ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। ইহাদিগকে যৎসামান্য উপদেশ দিতে পারিলে নূতন রুচির উপযোগী শিল্পদ্রব্য উৎপাদন করিতে বিশেষ অসুবিধা না হইতেও পারে। দৃষ্টান্ত স্থলে ধাতুনির্ম্মিত পাত্রাদির উল্লেখ করা যাইতে পারে। ধাতুনির্ম্মিত পাত্রনির্ম্মাণে ভারতবর্ষ নানা শিল্পকৌশলের পরিচয় প্রদান করিয়াছে। স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, সীসক, পিত্তল প্রভৃতি ধাতু সংযোগে ভারত-বর্ষে নানা দ্রব্য প্রস্তুত হইত। এই সকল দ্রব্যে চিত্রকার্য্য, খোদাই ও ঢালাইকার্য্য সংযুক্ত হইয়া দ্রব্যগুলি মনোজ্ঞ করিয়া তুলিত। রুচিভেদে সে সকল দ্রব্য এখন আর ব্যবহৃত হয় না। এখন থালির স্থলে প্লেট, রেকাবির স্থলে পিরিচ, বাটীর স্থলে পেয়ালা, ভৃঙ্গারের স্থলে ডিক্যাণ্টর, পুষ্পপাত্রের স্থলে ফুলদানি, প্রদীপের স্থলে সামাদান, পান-

বাটার স্থলে মাখনদান, চন্দনাধারের স্থলে নিমকদান, ইত্যাদি ইত্যাদি বহু দ্রব্য প্রচলিত হইয়া বিদেশ হইতে ভারতবর্ষে প্রেরিত হইতেছে। ইহার সকল দ্রব্যই ভারতবর্ষে প্রস্তুত হইতে পারে। কেবল পুরাতন শিল্পিগণকে নূতন ফ্যাসানের উপদেশ দিবার লোকের অভাবে তাহারা এ কালের উপযোগী দ্রব্যাদি প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইতেছে না। যেখানে এরূপ উপদেশ পাইয়াছে, সেখানে পিত্তলাদি দ্বারা ভারতীয় শিল্পী কিরূপ উৎকৃষ্ট শিল্পদ্রব্য উৎপাদন করিতেছে, তাহা কলিকাতার প্রদর্শনীতে অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছেন।

শিল্পসংক্রান্ত তর্কবিতর্ক দূরে রাখিয়া অতি সহজ উপায়ে ভারতীয় শিল্পের উন্নতি সাধন করা সম্ভব। শিল্পোন্নতির কারণপরম্পরার মধ্যে ক্রেতা সংগ্রহ করা সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান। যদি ক্রেতা না থাকে, তবে সমস্ত চেষ্টাই বিফল হইয়া যায়। ভারতবর্ষ বহুকোটী নরনারীর আবাসভূমি বলিয়া সভ্যজগত ইহাকে ক্রেতার দেশে পরিণত করিয়া ফেলিয়াছে। আমরা যাহা ক্রয় করি, তাহাতে পৃথিবীর বহু দেশের শিল্পী বাঁচিয়া যায়। দরিদ্র হইলেও আমরাই বহু ধনাঢ্য দেশের অন্নদাতা।

কি চাও? যদি ধনী হও, প্রয়োজনীয় শিল্পদ্রব্যের একটি তালিকা করিয়া দেখ, তাহার সকল দ্রব্যই দেশে প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব। তুমি বিদেশ হইতে সে সকল দ্রব্য ক্রয় করিয়াছ কেন? বিদেশের দ্রব্যে একটা চাকচিক্য আছে, তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু তাহা স্থায়ী বলিয়া বোধ হয় না। বিদেশের শিল্প-রুচি ভারতীয় শিল্প-রুচির সমকক্ষ নহে, তাহা যেন কঠিন, কর্কশ—আড়ম্বরময়! ভারতীয় শিল্পদ্রব্যে গৃহসজ্জা সম্পাদন করিয়া তাহার সহিত বিলাতী গৃহসজ্জার তুলনা না করিলে সে পার্থক্য বুঝিতে পারা যায় না। ধনকুবেরগণ দেশের নানা স্থানে স্বদেশীয় গৃহসজ্জা ব্যবহার করিলে রুচিবিকার দূর হইতে পারে। ধনাঢ্য আমেরিকা ও জর্ম্মাণি অদ্যাপি পঞ্জাব হইতে ভারতীয় শিল্পদ্রব্য ক্রয় করিতেছে;—, ভারতবর্ষ সে সকল দ্রব্যের সমাদর করে না কেন?

বিলাতী দ্রব্য বড় সস্তা,—এই ধুয়া ধরিয়া দরিদ্র লোকে বিলাতী দ্রব্যের জন্য লালায়িত হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু বিলাতী দ্রব্য সস্তা বলিয়া বোধ হয় না। আপাততঃ দেখিতে গেলে, এক জোড়া দেশী ধুতির মূল্যে হয় ত দুই জোড়া বিলাতী ধুতি ক্রয় করা সম্ভব; কিন্তু মোটের উপর বৎসরে বিলাতী কাপড়ে বেশী টাকা খরচ করিতে হয়। এক বৎসরের শীতবস্ত্র অন্য বৎসরে ব্যবহার করা যায় না; রং জ্বলিয়া যায়, ধোলাই করিলে সৌন্দর্য্য একেবারে বিনষ্ট হয়।

কলিকাতার প্রদর্শনীতে আর কোন ফল না হউক,—ভারতীয় শিল্পের বর্ত্তমান অবস্থা কিরূপ, তাহার যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। ভারতীয় শিল্পের এখনও আশা আছে বলিয়া স্বীকার করা যায়। এখনও দেশের লোকে দেশের দ্রব্যে অনুরাগী হইলে, ভারতীয় শিল্প রক্ষা পাইতে পারে। ভারতীয় শিল্পে দুই শ্রেণীর পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইতেছে। নূতন উদ্ভাবনের চেষ্টা পরিলক্ষিত হইতেছে; যাহারা এই কার্য্যে অগ্রসর, তাহারা উপযুক্ত উৎসাহ লাভ করিলে বিলাতী কলকারখানার সহায়তায় অনেক দ্রব্য দেশেই উৎপাদন করিতে পারিবে বলিয়া ভরসা করা যায়। পুরাতনের সংস্কার আরব্ধ হইয়াছে। যাহারা তাহাতে অগ্রসর, তাহারা উপযুক্ত উপদেশ পাইলে পুরাতন প্রণালীতেই অনেক অভিনব প্রয়োজনসাধনোপযোগী দ্রব্য উৎপাদন করিতে সক্ষম হইবে।

সভ্যজগতের শিল্পোন্নতির ইতিহাস নানা বিচিত্র কাহিনীতে পরিপূর্ণ। সুশিক্ষিত লোকে শিল্পোন্নতির জন্য অগ্রসর না হইলে নিরক্ষর শ্রমজীবিগণ কদাচ উন্নতিসাধনে সক্ষম হইত না। সকল দেশেই শিল্পোন্নতির মূলে শিক্ষিত সমাজের চেষ্টা দেদীপ্যমান। ভারতবর্ষের শিল্প এখনও কেবল নিরক্ষর লোকের চেষ্টার উপর নির্ভর করিয়া রহিয়াছে। তাহারা যে সভ্যজগতের সহিত শিল্প-সংগ্রামে ক্রমে পরাভূত হইবে, তাহাতে আর সংশয় কি? শিল্পোন্নতি সাধন করিতে হইলে নানাবিধ পরীক্ষা করা আবশ্যক। শিল্পী দরিদ্র সে পরীক্ষা করিয়া সময় নষ্ট করিতে পারে না। শিক্ষিত লোকে পরীক্ষা করিয়া পরীক্ষালব্ধ নূতন তথ্য শ্রমজীবীকে শিখাইয়া না দিলে শিল্পোন্নতি সাধিত হইতে পারে না। এদেশের শিক্ষাপ্রণালী যে ভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহাতে শিক্ষিতসম্প্রদায় শ্রমজীবীদিগের সহায়তা সাধন করিতে সম্পূর্ণ অক্ষম!

কলিকাতা শিল্পপ্রদর্শনীর স্মৃতি এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। এখনও অনেকে শিল্পোন্নতি সাধনের প্রকৃত পন্থা আবিষ্কার করিবার জন্য নানাবিধ আলোচনায় ব্যাপৃত রহিয়াছেন। এসময়ে দেশের লোকের সমবেত চেষ্টা আবশ্যক। সকলে মিলিয়া চেষ্টা করিলে প্রকৃত পন্থা আবিষ্কৃত হইতে বিলম্ব ঘটিবে না। সাধ্যমত স্বদেশের বস্তু ব্যবহার করিব,— এই প্রতিজ্ঞা প্রতিপালিত না হইলে ফল হইবে না।

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

কালিদাস।

(আবির্ভাবকাল ও গ্রন্থাবলী)

১। আবির্ভাবকাল।

বিলাতি পণ্ডিতদিগের কৃপায় কবি কালিদাসের আবির্ভাবকাল এক প্রকার নিরূপিত হইয়াছে, বলিতে পারা যায়। প্রাচীন মালবদেশের প্রচলিত সংবৎ বিক্রমাদিত্য-প্রতিষ্ঠিত ভাবিয়া অনেকে এ সময়টি খৃঃ পূঃ ৫৭ বলিয়া মনে করিতেন। সে কথা এখন অগ্রাহ্য।

কানিংহাম এবং ফ্লীট সাহেবের আবিষ্কার ও মীমাংসার সহিত যাঁহারা পরিচিত নহেন, তাঁহাদিগের জন্য এবিষয়ে চ'চারি ছত্র লিখিব; সুপণ্ডিত পাঠকগণ আমাকে ক্ষমা করিবেন।

চন্দ্রগুপ্তাদি মৌর্য্য রাজগণ, পুষ্পমিত্রাদি সুঙ্গ রাজগণ এবং বাসুদেবাদি কণ্ব রাজগণ খৃঃ পূঃ ৩২০ হইতে ২৬ পর্য্যন্ত মগধে রাজত্ব করেন। ইহাঁদের রাজত্বকালের কথা দূরে থাকুক, পরবর্ত্তী অন্ধ্ররাজাদিগের কয়েক পুরুষের রাজত্বের মধ্যেও, কালিদাস প্রভৃতি কবিদিগের ব্যবহৃত প্রাকৃত ভাষার জন্ম হয় নাই। একালে যে ভাষা পালি নামে বিখ্যাত, সেই ভাষা এ যুগে প্রবল ছিল। দেশের দূরতার হিসাবে এই পালি ভাষা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যৎসামান্য বিভিন্নতার সহিত ব্যবহৃত ছিল। পঞ্জাবাদি পশ্চিম প্রদেশের পালির নাম হইয়াছে পাশ্চাত্য পালি, উজ্জয়িনী এবং মধ্যপ্রদেশের নাম মাধ্য পালি এবং পূর্ব্ব দেশসমূহের ভাষা প্রাচ্য পালি। এই গেল কানিংহাম সাহেবের সিদ্ধান্ত।

নাটকাদিতে ব্যবহৃত প্রাকৃত ভাষা যখন প্রচলিত হইয়াছিল, তখন গুপ্ত রাজাগণের রাজত্ব। এই গুপ্তবংশীয় প্রথম রাজা মহারাজ গুপ্তের পৌত্র, চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য ৩১৯ খৃষ্টাব্দে প্রাদুর্ভূত হয়েন। এই বংশের দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের রাজত্বকাল ৪০১ হইতে ৪১৪ খৃষ্টাব্দ। ইহাঁকেই কেহ কেহ কালিদাসের গৌরবে গৌরবান্বিত বিক্রমাদিত্য বলিয়া ভুল করিয়াছেন। ইহাঁর পুত্র কুমার গুপ্ত বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন বলিতে পারা যায়; কারণ, ইহাঁর কোন কোন দান-লিপি বুদ্ধদেবকে নমস্কার করিয়া আরব্ধ হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায়। এই যুগে হিন্দুধর্ম্ম এবং বৌদ্ধধর্ম্ম সমান ভাবে প্রচলিত ছিল; রাজাদিগের মধ্যে কেহবা হিন্দু, কেহবা বৌদ্ধ, এইরূপ দেখা যাইত। কালিদাসের সময়ে বৌদ্ধধর্ম্মের সেরূপ প্রবলতা আর ছিল না। কেহ হয়ত বৌদ্ধ ছিলেন, বা বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগী ছিলেন, এইমাত্র। তখন হিন্দুধর্ম্মের একাধিপত্য সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে; এবং প্রাকৃত ভাষা সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ হইয়াছে। হর্ষ বিক্রমাদিত্যই কালিদাসের বিক্রমাদিত্য; ইনি কাশ্মীরের রাজা হিরণ্যের সমসাময়িক। কাশ্মীরের ইতিহাস রাজ-তরঙ্গিণীতে আছে যে, হিরণ্যকের পর উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্য কর্ত্তৃক প্রেরিত মাতৃগুপ্ত, কাশ্মীরে রাজা হইয়াছিলেন। মাতৃগুপ্তের রাজত্বকাল আনুমানিক ৫৫০ খৃষ্টাব্দ। বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভা যে কল্পিত কথা নহে, তাহা সবিশেষ প্রমাণিত হইয়াছে। যে সকল পণ্ডিত লইয়া এই নবরত্নসভা গঠিত ছিল, তাঁহাদের মধ্যে বরাহমিহিরের তিরোভাবকাল ৫৮৭ খৃষ্টাব্দ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। কাজেই হর্ষ বিক্রমাদিত্যকেই নবরত্ন সভার প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে। রাজতরঙ্গিণীর গণনাদির উপর ফ্লীট সাহেবের সম্পূর্ণ আস্থা নাই; কিন্তু চারিদিক মিলাইয়া স্থির করিতে গেলে ইংরেজী ৫৫০ সালই কালিদাসের আবির্ভাব কাল বলিয়া ধরা যাইতে পারে। যাঁহারা বিশেষ বিবরণ এবং অকাট্য প্রমাণ চাহেন, তাঁহারা Corpus Inscriptionum Indicarumএর কানিংহামকৃত ১ম ভাগ এবং ফ্লীটকৃত তৃতীয় ভাগ পড়িতে পারেন।

২। গ্রন্থাবলী।

অনেকগুলি গ্রন্থ কবি কালিদাসের নামে নামাঙ্কিত দেখিতে পাওয়া যায়। রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত, ঋতুসংহার, পুষ্পবাণ-বিলাস, নলোদয়, অভিজ্ঞান-শকুন্তল, মালবিকাগ্নিমিত্র, বিক্রমোর্ব্বশী প্রভৃতি নানা গ্রন্থ কালিদাসবিরচিত বলিয়া উল্লিখিত আছে।

যাঁহারা সংস্কৃত ভাষার সহিত অতি অল্পমাত্র পরিচিত, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন যে, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব (অন্ততঃ প্রথম সাত সর্গ) মেঘদূত এবং শকুন্তলা এক হাতের রচনা। এ কয়েকখানি, মহাকবি কালিদাসরচিত, এ বিষয়ে কোন বিবাদ নাই। অন্যান্য গ্রন্থ মহাকবি কালিদাসের বলিয়া অনেকে স্বীকার করেন না। কিন্তু আমার মনে হয়, ঋতুসংহার ও মালবিকাগ্নিমিত্রও মহাকবির রচনা ঋতুসংহারের কবিত্ব তত উৎকৃষ্ট না হইলেও ঐ কাব্যখানি যে রঘুবংশাদি গ্রন্থ-প্রণেতার কীর্ত্তি, তাহা ভাষা এবং রচনাভঙ্গী হইতেই উপলব্ধ হয়।

কর্ণেষু যোগ্যং নব কর্ণিকারং
চলেষু নীলেষলকেষশোকঃ
শিখাসু মালা নবমল্লিকায়াঃ
প্রযাতি কান্তিং প্রমদাজনস্য।

অর্থাৎ—

কর্ণে নব কর্ণিকার; অশোক কুসুমসার
দোদুল্য সুনীলালকে শোভাভরে দুলিল;
খোঁপায় পরিল বালা নব-মল্লিকার মালা,
চারু-কান্তি প্রমদার চারুতর হইল।

অথবা—

শিরোরুহৈঃ শ্রোণিতটাবলম্বিভিঃ
কৃতাবতংসৈঃ কুসুমৈঃ সুগন্ধিভিঃ—
স্তনৈঃ সহারৈ র্বদনৈঃ সসীধুভিঃ
স্ত্রীয়ো রতিং সংজনয়ন্তি কামিনাম্।

অথবা—

নিতম্ববিম্বৈঃ সদুকূল মেখলৈঃ
স্তনৈঃ সহারাভরণৈঃ সচন্দনৈঃ
শিরোরুহৈঃ স্নানকষায়বাসিতৈঃ
স্ত্রিয়ো নিদাঘং শময়ন্তি কামিনাম্।

যতই দোষ থাকুক, এ রচনা কোন নকল-কালিদাসের নহে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নামের দোহাই দিয়া বলিতে পারি যে, এ রচনা মহাকবির বাল্য-রচনা।

মালবিকাগ্নিমিত্রও কালিদাসের বাল্য-রচনা, অপরের নহে। দৃশ্যকাব্যের মধ্যে এখানি যে প্রথম রচিত, তাহা সূত্রধারের কথাতেই জানা যায়।

পুরাণমিত্যেব নসাধু সর্ব্বং
নচাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যং
সন্তঃ পরীক্ষ্যান্যতরদ্ভজন্তে
মূঢ়ঃ পর প্রত্যয়নেয় বুদ্ধিঃ।

অর্থাৎ—

যাহা কিছু পুরাতন, নহে ভাল কদাচন;
নব্য বলি কাব্য কভু দোষযুত হয় না।
হ'লে কাব্য পরীক্ষিত, হয় সুধীসমাদৃত;
মূঢ় জন পরবুদ্ধি করে অনুধাবনা।

গলার আওয়াজে যেমন পরিচিত লোক চিনিতে পারা যায়, এই রচনাতেও তেমনি কালিদাসকে চিনিতে বাকি থাকে না। ভোজপ্রবন্ধে যে কালিদাসের নাম পাওয়া যায়, তিনি মালবিকাগ্নিমিত্রের বা ঋতুসংহারের রচয়িতা বলিয়া কুত্রাপি উল্লেখ নাই। এই দৃশ্যকাব্যে যে প্রাকৃতের ব্যবহার, তাহার সহিত শকুন্তলার প্রাকৃতের প্রভেদ নাই। হূন্ এবং শাকদিগের সহিত বিক্রমাদিত্যের যুদ্ধ হইয়াছিল; এই কাব্যে সে কথারও আভাস পাওয়া যায়। কালিদাস নিঃসন্দেহ রাজার সহিত বহুদেশ পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন, এবং অনেক মনোহর দৃশ্য দেখিয়াছিলেন। রঘুবংশের ৪র্থ এবং ত্রয়োদশ সর্গে; কুমারের প্রথম এবং তৃতীয় সর্গে তাহা সম্পূর্ণ বুঝিতে পারা যায়। মালবিকার প্রসঙ্গেও দূরদেশ দর্শনের অভিজ্ঞতার পরিচয় আছে। এ কাব্যের রচনায় এমন কোন দোষ দেখিতে পাওয়া যায় না, যাহাতে ইহাকে মহাকবির প্রথম দৃশ্যকাব্য বলিলে তাঁহার যশোহানির সম্ভাবনা হইতে পারে।

নলোদয় ও পুষ্পবাণ-বিলাস যে রঘুবংশ-রচয়িতার রচনা নহে, তাহা প্রায়শঃ সর্ব্ববাদিসম্মত। এই জন্য এই কথা লইয়া অধিক বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন দেখি না। সাহিত্যের অধোগতির সময়ে যে প্রকার যমক এবং অনুপ্রাসাদির চলন হইয়াছিল, কালিদাসের রচনায় তাহার ছায়া পর্য্যন্ত নাই। রঘুবংশের নবম সর্গে যে দু'চারিটি যমক এবং অনুপ্রাস আছে, তাহা এত সরল যে, তাহার সহিত এ সকল শব্দাড়ম্বরের তুলনা করা অযথা কথা বাড়ান মাত্র।

ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা মালবিকাগ্নিমিত্র খানি কালিদাসের রচিত বলিয়া স্বীকার করেন না; অথচ বিক্রমোর্ব্বশী কালিদাসরচিত বলিয়া উল্লেখ করেন। সংস্কৃত সাহিত্যের বিষয়েও উঁহাদিগের নিকটে অনেক কথা শিখিয়াছি, কিন্তু এ সিদ্ধান্তটি কোনও রূপে গ্রহণ করিতে পারি-

লাম না। বিক্রমোর্ব্বশী পড়িতে পড়িতে এমনও মনে হইয়াছে যে, কোন নিকৃষ্ট গ্রন্থকার, কাব্য-গৌরব বাড়াই-বার জন্য কালিদাসের নামের ছাপ দিয়া এই দৃশ্যকাব্যখানি রচনা করিয়াছেন।

আসল এবং নকলের প্রভেদ বুঝিতে বিলম্ব হয় না। কয়েকজন সুযোগ্য লেখক, যখন বঙ্গদর্শনে কমলাকান্তের অনুকরণে কয়েকটি রচনা মুদ্রিত করিয়াছিলেন, তখন আমি খুব অল্পবয়স্ক। কিন্তু স্মরণ আছে যে, সে সময়ে বালকবৃদ্ধ সকলেই বঙ্গদর্শন পড়িত—যাহারা কিছু বুঝিত না, তাহারাও পড়িত। অনুকরণের লেখা প্রকাশিত হইবার পর কয়েকজন ভদ্রলোক বলিয়াছিলেন যে, ঐ রচনা কদাপি বঙ্কিমবাবুর নহে। কোনও রচনা ভাল হয়, কোনটি বা মন্দ হয়, সে এক রকমের কথা। কিন্তু ঐগুলির চেহারা দেখিয়াই তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন যে, সেগুলি অন্য লোকের লেখা। নকলের আর একটি অতি পরিচিত দৃষ্টান্ত দিতেছি। "ভারতী" পত্রিকায় নাম না দিয়া এমন অনেক কবিতা প্রকাশিত হইয়া গিয়াছে যে, যাহাতে নয়ান, বয়ান, ফুলবালাটি, কি জানি কোথাকার কথা, প্রভৃতির অতিমাত্রায় ছড়াছড়ি দেখিয়াছি; প্রদীপ-খানি প্রভৃতি অদ্ভুত বাঙ্গালা কথার অনেক প্রয়োগ দেখিয়াছি; কিন্তু কখনও সেগুলি প্রতিভাশালী কবি রবীন্দ্রনাথের রচনা বলিয়া মনে করি নাই—কেহ মনে করে নাই। রচনাগুলি ঠাকুরবাবুদের বাড়ীর, এই পর্য্যন্ত বরং লোকে বলিয়াছে; তাহার বেশী নহে। সর্ব্বত্রই নকলনবিসেরা দোষ টুকুই নকল করে; সাহিত্যের বাজার হইতে পরপুচ্ছধারীদিগের চিড়িয়াখানা পর্য্যন্ত সর্ব্বস্থলেই ইহার প্রমাণ পাই। নকল-কবিদিগের রচনায় ঠাকুর বাবুদিগের দোষের বিশেষত্ব টুকু, ভাঙ্গা সুর, নাকি কথা, প্রভৃতি যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু আসল ও নকল বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হয় না। এখানে একটা অবান্তর কথা বলিবার জন্য আমি দায়ী। রবীন্দ্রনাথের একালের ভাষা পারিবারিক গণ্ডীর বাহিরে আসিয়া পড়িয়াছে; অতি-সুমার্জ্জিত সুন্দর ভাষায় তাঁহার কবিত্ব অভিব্যক্ত হইতেছে।

বিক্রমোর্ব্বশীর প্রারম্ভেই রহিয়াছে—"বেদান্তেষু যমাহুরেক পুরুষং"; এটা "যা সৃষ্টি স্রষ্টুরাদ্যা"র নকল। কালিদাসের লেখায় দর্শনাদির মীমাংসার কথা অনেক থাকিত, কিন্তু কখনও বেদান্তের নামকরা বা দোহাই দেওয়া তাঁহার অভ্যাস ছিল না। দুষ্মন্ত রাজার রথবেগের কথায় যে দুইটি মনোহর কবিতা রচিত আছে, "অগ্রে যান্তি রথস্য রেণু পদবীং" তাহারই অসার নকল।

চিত্রে নিবেশ্য পরিকল্পিত সত্ত্ব যোগা
রূপোচ্চয়েন মনসা বিধিনা কৃতানু
স্ত্রীরত্ন সৃষ্টিরপরা প্রতিভাতি সামে
ধাতুর্বিভুত্বমনুচিন্ত্য বপুশ্চ তস্যাঃ।

অর্থাৎ—

চিত্রপটে তুলিকায় আঁকিয়া সেরূপ হায়
বুঝি বিধি প্রাণ তাহে করিলেন যোজনা।
অথবা সৌন্দর্য্যসার সংগ্রহি' মানসে তাঁর,
ক'রেছেন প্রজাপতি রূপসীর রচনা।
অঙ্গের সৌষ্ঠব হেরি, বিধির কৌশল স্মরি,
অতুল্য এরত্ন সৃষ্টি; করি মনে ভাবনা।

ইহারই অনুকরণে বিক্রমোর্ব্বশীতে দেখিতে পাই—

অস্যাঃ সর্গবিধৌ প্রজাপতিরভূচ্চন্দ্রোনকান্তিপ্রদঃ
শৃঙ্গারৈক রসঃ স্বয়ংনুমদনো মাসোনুপুষ্পাকরঃ
বেদাভ্যাস জড়ঃ কথংনুবিষয়ব্যাবৃত্ত কৌতূহলো
নির্ম্মাতুং প্রভবেন্মনোহর মিদং রূপং পুরাণোমুনিঃ।

ইহার পূর্ণ অনুবাদ দিবার প্রয়োজন দেখিলাম না। ব্রহ্মাটা বেদাভ্যাসে জড়বুদ্ধি, এমন সৃষ্টি তাঁহার কর্ম্ম নয়; এরূপ কথায় বাচালতা বা চলিত ভাষায় 'ফক্কুড়ি' প্রকাশ পায়। কোন সুকবির বাল্য-রচনায়ও এ রকমের লেখা সম্ভবে না। শকুন্তলার অনুকরণে উর্ব্বশীরও লতা-বিটবে আঁচল বাঁধিয়া গিয়াছিল। ত্রুটি কোথাও নাই। এই দেখুন:—

"নখলু শক্নোমি শকুন্তলা ব্যাপারাদাত্মানং নিবর্ত্তয়িতুম্।

মমহিঃ—

গচ্ছতি পুরঃ শরীরং ধাবতি পশ্চাদসংস্থিতং চেতঃ
চীনাংশুকমিব কেতোঃ প্রতিবাতং নীয়মানস্য।

অর্থাৎ—

আজি যে আমার মন নাহি মানে নিবারণ
পাশরিব শকুন্তলা কথা আমি কেমনে?
অঙ্গ সুধু অগ্রে যায়, চলচিত্ত পিছু ধায়
কেতন বসন সম অভিমুখ পবনে।

এই কথায় শকুন্তলার প্রথম অঙ্কের শেষ। বিক্রমোর্ব্বশীতেও দেখিতে পাই যে, প্রথম অঙ্কের শেষে রাজা বলিতেছেন:—

এবা মনো মে প্রসভং শরীরাৎ
পিতুঃ পদং মধ্যমমুৎপতন্তি

সুরাঙ্গনা কর্ষতিখণ্ডি তাঁগ্রাৎ
সূত্রং মৃণালাদিব রাজহংসী।

অর্থাৎ—

শরীর হইতে মন করি বেগে আকর্ষণ
লয়ে যায় সুরাঙ্গনা সুর্দপুর ভবনে ;
খণ্ডিত মৃণাল হ'তে সূত্রলয়ে শূন্য পথে
রাজহংসী উড়েযায় যথা ঊর্দ্ধ গগনে।

ভোজ রাজার সময়ে এক কালিদাস ছিলেন ; নলোদয় প্রভৃতি কাব্য তাঁহারই রচনা বলিয়া কথিত আছে। ইংরাজ প্রত্নতত্ত্ববিৎদিগের সিদ্ধান্ত অনুসারে ইনি খৃষ্টাব্দের একাদশ শতাব্দীর রাজা। জয়দেব প্রভৃতিও প্রায় এই সময়ের বলিয়া অনুমিত হয়েন। এই সময়ের রচনা, খাঁটি প্রচলিত ভাষা রচনাকালের কিঞ্চিৎ পূর্ব্ববর্ত্তী মাত্র। কালিদাস এবং ভবভূতি প্রভৃতি ষষ্ঠ এবং সপ্তম শতাব্দীর কবিদিগের রচনায় কবিতায় মিলের সৃষ্টি হয় নাই। ভাষা রচনার অল্প সময় পূর্ব্বে যে এই মিলের প্রথম সৃষ্টি, তাহা নিঃসন্দেহ। শঙ্করাচার্য্যের সময় হইতেই কবিতার মিল দেখিতে পাওয়া যায়। যে প্রকার ছন্দ ও কথার মিল জয়দেবের মধুর রচনায় প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে, বিক্রমোর্ব্বশী গ্রন্থে তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। এই প্রকারের রচনা নূতন বলিয়া সাহিত্যদর্পণকার পর্য্যন্ত তাহার প্রতি কটাক্ষ করিতে ছাড়েন নাই। সাহিত্য দর্পণের ৭ম পরিচ্ছেদে এক স্থানে আছে,—"অয়ি ময়ি মানিনি মা কুরু মানং ইদং বৃত্তং গাস্তরসস্তৈবাহুকূলং।" বিক্রমোর্ব্বশী হইতে জয়দেবী সুরের কয়েকটি রচনা উদ্ধার করিতেছি। ছন্দ এবং প্রাকৃত ভাষার প্রকৃতি দেখাইবার জন্য পদগুলি তুলিলাম বলিয়া, অনুবাদ দিবার কোন প্রয়োজন দেখিলাম না।

(১) পরভুঅ মহুর পলাবি'ন কন্তি
নন্দন বন সচ্ছন্দ ভমন্তি।
(২) কই পই দিকপিঅ এগই লালস
সা পই দিটি জহণ ভরালস।
(৩) ফলিঅ সিলাঅল নিম্মল নিজ্ঝর
বহুবিহ কুসুমে বিরইঅ সে অঙ্গ।

কালিদাসের সময়ে গান, কেবল আর্য্যাভাঙ্গা 'গীতি'তে বা উদ্গাথায় রচিত দেখা যায় ; তাহাও স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য।

যে কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলিয়াছি, তাহাতেই পাঠকেরা দেখিতে পাইবেন যে, এই প্রাকৃত ভাষা কালিদাসের সময়ের বহু পরবর্ত্তী। অবিঅল অর্থ অবিরল, কালিদাসের সময়ে ছিল না। বররুচির প্রাকৃত ব্যাকরণ যখন রচিত, তখন "হত্তি পত্তি পুচ্ছিমি" প্রচলিত ছিল না। এই সকল কথার উপর যখন রচনার নিকৃষ্টতা দেখিতে পাই, তখন বিক্রমোর্ব্বশী, মহাকবির রচনা বলিয়া স্বীকার করিতে পারা যায় না।

সংক্ষিপ্ত কথা এই যে, কালিদাসের আবির্ভাবকাল ৫৫০ খৃষ্টাব্দ ; এবং দৃশ্যকাব্যের মধ্যে শকুন্তলা এবং মালবিকাগ্নিমিত্র, ও শ্রব্যকাব্যের মধ্যে রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, মেঘদূত এবং ঋতুসংহার তাঁহার রচনা। কুমারসম্ভবের সপ্তমপরবর্ত্তী সর্গগুলি সম্বন্ধে নানা প্রকার প্রবাদ প্রচলিত আছে। মল্লিনাথ হয়ত দেবতার সম্মানরক্ষার প্রতি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন, এবং সেই জন্য ঐ সর্গগুলির টীকা লেখেন নাই। কিন্তু কালিদাসের অন্যান্য রচনায় যে প্রকার দেবভক্তি দেখিতে পাওয়া যায়, এবং সপ্তম সর্গ পর্য্যন্তও হরগৌরীর কথায় যে প্রকার পবিত্রতা রক্ষা করিয়াছেন ; তাহাতে ৮ম এবং নবম সর্গ তাঁহার রচনা কি না সন্দেহ হয়। গ্রন্থের নাম কুমারসম্ভব। একদিকে যেমন ৭ম সর্গ পর্য্যন্ত কেবল বিবাহের কথা ; অন্য দিকে আবার কুমারের জন্মের পরবর্ত্তী কথাও পরবর্ত্তী সর্গগুলিতে বর্ণিত হইয়াছে। ৮ম সর্গ হইতে সপ্তদশ পর্য্যন্ত কাব্যখানি যে প্রকার ভাষায় রচিত, সে ভাষা কালিদাসের বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু ৭ম সর্গ পর্য্যন্ত রচনার যে বাঁধুনি, তাহার পরবর্ত্তী কোন সর্গে তাহা দেখিতে পাওয়া যায় না। যে "উপমা কালিদাসস্য" তাঁহার সকল রচনারই বিশেষত্ব ; ঋতু-সংহারেও যাহা পদে পদে দেখিতে পাই ; কুমার-সম্ভবের শেষ অংশে তাহা কদাচিৎ দৃষ্ট হয় মাত্র। কোন প্রকার সৌন্দর্য্য সৃষ্টির প্রয়াস নাই, কেবল কথা ; এরূপ রচনা কালিদাসের কি না সন্দেহ হয়। একটি প্রবাদ এই যে, ঐ অংশ কালিদাস ধ্বংস করিয়াছিলেন। হইতে পারে যে অন্য কোন কবি ধ্বংসের উদ্ধারের ভাণ করিয়া স্বীয় রচনা চালাইয়া দিয়াছেন। অথবা কালিদাস যে একখানি অসম্পূর্ণ কাব্য লেখেন নাই, তাহারই বা প্রমাণ কি ? অন্যদিকে আবার ৭ম সর্গের ৯৪ এবং ৯৫ শ্লোকে যাহা লিখিত আছে, এবং তদ্দ্বারা যাহা ধ্বনিত হয়, ৮ম সর্গের রচনার উদ্দিষ্ট

বিষয় তাহার অনুরূপই দেখিতে পাওয়া যায়। সন্দেহের কথায় কাজে কাজেই সন্দেহই রহিল। কেবল এইমাত্র বলিতে পারি যে, কুমারসম্ভবের অষ্টম হইতে সপ্তদশ সর্গগুলির রচনা, কবি কালিদাসের হইলেও, ঐ রচনা কাব্যাংশে অতি নিকৃষ্টশ্রেণীর।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

মাতৃভুমির পূজা।

ভগবানের অনন্ত ঐশ্বর্য্যকে আমরা যুগযুগান্তর হইতে বিভিন্নভাবে এবং বিভিন্ন আকারে পূজা করিয়া আসিতেছি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বররূপে তাঁহারই সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারকারিণী শক্তিকে আমরা পূজা করি। বাগ্দেবতা তাঁহারই জ্ঞানের এবং কমলা তাঁহারই ঐশ্বর্য্যের অধিষ্ঠাত্রীরূপে আমাদের পূজা প্রাপ্ত হন। সূর্য্যে ও অগ্নিতে তাঁহারই জ্যোতি দর্শন করিয়া এবং গঙ্গা-গোদাবরীতে তাঁহারই করুণা প্রত্যক্ষ করিয়া আমরা পূজা করিয়া থাকি। অশ্বত্থ বৃক্ষে, তুলসীকুঞ্জে, প্রস্তরে, মৃত্তিকায়, ঘটে, পটে, তিনি অধিষ্ঠিত ভাবিয়া আমরা তাহাদিগকে আরাধনা করি। কিন্তু কই, মাতৃভুমিরূপে ত কেহ কখন তাঁহার পূজা করি না! ভারতসন্তান কত ভাবেই যে তাঁহার পূজা করিয়াছেন, তাহার সংখ্যা নাই। নন্দযশোদা তাঁহাকে পুত্রভাবে, দেবী রুক্মিণী তাঁহাকে পতিভাবে, অর্জ্জুন তাঁহাকে সখাভাবে, রামপ্রসাদ তাঁহাকে মাতৃভাবে, তুলসীদাস তাঁহাকে রাজাভাবে, শঙ্করাচার্য্য তাঁহাকে আত্মভাবে এবং শ্রীচৈতন্য তাঁহাকে প্রাণেশ্বরভাবে আরাধনা করিয়াছিলেন। তাঁহারই উদ্দেশে অভ্রভেদী হিমাচল এবং গণ্ডশৈল গোবর্দ্ধন, মহাকায় অশ্বত্থ এবং ক্ষীণদেহ তুলসী, এদেশে পূজা প্রাপ্ত হইতেছে। কিন্তু কই, ভারতসন্তানদিগের মধ্যে কেহ কখন কি তাঁহাকে মাতৃভুমিরূপে পূজা করিয়াছেন? যিনি প্রত্যেক পরমাণুতে বর্ত্তমান, তিনি আমাদিগের এই মাতৃভুমিতেও ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন; অথচ আমরা কেহ কখন তাঁহাকে সে ভাবে উপলব্ধি করিয়া তাঁহার পূজা করি না।

সামাজিক অবস্থা অনুসারে এবং দেশকালভেদে হিন্দুধর্ম্মে নূতন নূতন দেবদেবীর পূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। যে দেবতার যে নামই প্রদত্ত হউক, বা যে পূজার যেরূপ পদ্ধতিই হউক, সকলই সেই এক এবং অদ্বিতীয় মহেশ্বরের উদ্দেশে অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। তথাপি শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে, বিশেষ দেবতার আরাধনায় বিশেষ ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়। বর্ত্তমান যুগে, সর্ব্বমঙ্গলময়ী, সর্ব্বার্থসাধিকা, সর্ব্বৈশ্বর্য্যস্বরূপিণী জননী জন্মভূমির পূজার প্রয়োজন হইয়াছে। মাতৃস্তন্যের সঙ্গে যাঁহার ফলে জলে আমাদিগের দেহ পরিপুষ্ট হইতেছে, জননীর ন্যায় যিনি আমাদিগকে অঙ্কে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, অন্তিমে যাঁহার ক্রোড় আমাদিগের চির-বিশ্রাম স্থান, বহু দেবদেবীর উপাসক হইয়াও যে আমরা সেই অন্নপূর্ণারূপিণী জগদ্ধাত্রী জন্মভূমিকে পূজা করিতে বিস্মৃত হইয়া রহিয়াছি, ইহা আমাদিগের ধর্ম্মভাবের পরিচায়ক নহে। শুভকাল সমাগত হইয়াছে। শান্ত ও সমাহিত চিত্তে আমাদিগের দেহ-মন পবিত্র করিয়া, আসুন, আমরা সকলে জননী জন্মভূমির পূজায় প্রবৃত্ত হই।

ভক্ত আপনার অভিলাষানুসারে নিজের আরাধ্য দেবের রূপ কল্পনা করিয়া তাঁহাকে ধ্যান করিয়া থাকেন। আসুন, আমরাও একবার জননী ভারতভূমির রূপ ধ্যান করি। হিমাচল তাঁহার মস্তকের কিরীট; জাহ্নবী তাঁহার কণ্ঠহার; ঘনশ্যাম তরুরাজী তাঁহার বিচিত্র বসন; মৃগমদ-মলয়জে তাঁহার দেহ সুরভিত; মহাসমুদ্র তাঁহার অতুল চরণ-যুগল ধৌত ও লাক্ষারাগে রঞ্জিত করিয়া অবিরাম কলকল স্বরে তাঁহাকে বন্দনা করিতেছে। নব-প্রস্ফুটিত শতদল তাঁহার শ্রীকণ্ঠে শোভা পাইতেছে, এবং নবোদিত অরুণ কিরণে তাঁহার সুচারু মুখমণ্ডল উদ্ভাসিত হইতেছে। এমন "ভুবন-মন-মোহিনী" দেবী যাহাদিগের জননী, তাহারা কি সত্যসত্যই চিরদিন মাতাকে বিস্মৃত হইয়া থাকিবে? তাঁহার আরাধনায়, বন্দনায় যে সুখ, জগতে আর কিছুতে ত তাহা প্রাপ্ত হইবার নয়। কি বলিয়া তাঁহাকে পূজা করিতে হইবে, এবং তাঁহার পূজার জন্য কোন্ কোন্ সামগ্রীর প্রয়োজন, জননীর কৃতী সন্তানগণ তাহার বিচার করুন। সংক্ষেপে এই বলিলেই হইবে। সন্তান মাতাকে যাহা বলিয়া সম্বোধন করে, তাহাই তাঁহার পূজার মন্ত্র হইবে,

এবং সন্তান মাতাকে সুখী ও তাঁহার মুখ উজ্জল করিবার জন্য যাহা করে, তাহাই তাঁহার পূজার আয়োজন হইবে। আমাদিগের যাহা কিছু আছে, বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, মান, বাক্য, সকলই তাঁহার পূজার উপকরণরূপে অর্পিত হউক। আমাদিগের গৃহে গৃহে তাঁহার প্রতিমা বিরাজিত হউক। আমাদিগের মধ্যে যিনি দরিদ্রতম, তাঁহাকেও জননীর পূজার আয়োজনের জন্য চিন্তিত হইতে হইবে না। পারস্য দেশের কোন সম্রাট ভ্রমণে বহির্গত হইলে একবার এক কৃষক হঠাৎ তাঁহার সম্মুখে পতিত হইয়াছিল। রিক্ত-হস্তে নৃপতিকে দর্শন করিতে নাই জানিয়া, কৃষক সম্রাট্‌কে উপহারপ্রদানার্থ এক অঞ্জলি জল লইয়া তাঁহার সমীপস্থ হইয়াছিল। প্রবলপ্রতাপান্বিত ও অতুল ঐশ্বর্য্যশালী সম্রাট সরল-হৃদয় কৃষকের অকপট রাজভক্তি বুঝিতে পারিয়া সেই সামান্য জলাঞ্জলিও সাদরে গ্রহণ করিয়াছিলেন। দরিদ্র ও দুর্ব্বল হইলেও জননী জন্মভূমিকে অন্ততঃ এইরূপ ভক্তি-পূত জলাঞ্জলি প্রদান করিবারও আমাদিগের শক্তি আছে। প্রাতঃস্মরণীয়া রাজ্ঞী অহল্যা বাঈ যখন তীর্থ-পর্য্যটনে বহির্গত হইতেন, তখন কতকগুলি করিয়া ফলের বীজ সঙ্গে লইয়া যাইতেন, এবং রাজপথের পার্শ্বে, বিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যে এবং জলাশয়ের তটে তাহা রোপণ করিয়া আসিতেন। তিনি বলিতেন, "এই সকল বীজ অঙ্কুরিত এবং বৃক্ষরূপে পরিণত হইলে, কত পক্ষী তাহাদিগের শাখায় কুলায় নির্ম্মাণ করিবে, কত পথিক তাহাদিগের ছায়ায় বিশ্রাম করিবে এবং কত ক্ষুধার্ত্তজন তাহাদিগের ফলে পরিতৃপ্ত হইবে। সুতরাং আমার পরিশ্রম নিষ্ফল হইবে না।" আমরা প্রত্যেকে যদি রাজ্ঞী অহল্যার এই কথাগুলি স্মরণ রাখি, তাহা হইলে আমাদের জননী জন্মভূমির পূজা কতই সহজে সম্পন্ন হইতে পারে। আমাদিগের কবিগণ তাঁহার যশোগান করুন, চিত্রকরগণ তাঁহার মূর্ত্তি অঙ্কিত করুন, শিল্পী ও ব্যবসায়িগণ তাঁহার সমৃদ্ধি বর্দ্ধন করুন; বিদ্বান মূর্খ, ধনী দরিদ্র, যাহার যেমন সাধ্য, সেইরূপে জননী জন্মভূমির পূজায় প্রবৃত্ত হউন। জননী জন্মভূমির কার্য্য করিতেছি বলিয়া, যিনি একটি ক্ষুধার্ত্তকে অন্নদান করেন, একটি ব্যাধিগ্রস্তকে নিরাময় করেন, একটি মূর্খকে বিদ্যাদান করেন. একটি মুদ্রা দ্বারাও স্বদেশকে সমৃদ্ধিমান্ করেন; তিনিই জননীর পূজা করিয়া থাকেন। এ পূজায় জাতিভেদ নাই, ধর্ম্ম-ভেদ নাই; সকলেই এপূজার অধিকারী। উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্ব্বে, পশ্চিমে, সর্ব্বত্রই জননীর মূর্ত্তি বিরাজিত; ভক্ত, যখনই ইচ্ছা, মাতাকে দর্শন করিয়া এবং তাঁহার পূজা করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারেন।

প্রিয় পাঠক! আপনি সাকারবাদী হউন, বা নিরাকারবাদী হউন, যদি কখনও আপনি আপনার ইষ্টদেবতাকে পিতা, মাতা, বা গুরুরূপে ধ্যান করিয়া থাকেন, তবে একবার তাঁহাকে জননী জন্মভূমিরূপেও ধ্যান করুন। ভক্ত ভগবানকে ঘটে, পটে, অন্তরে, বাহিরে, সর্ব্বত্র বিরাজিত দেখিয়া কৃতার্থ হন। আপনিও এই বহুসাধুজননিষেবিতা, বহুপুণ্যময়ী জননী ভারতভূমিতে আপনার প্রাণারামকে অধিষ্ঠিত দেখিয়া জীবন সার্থক করুন। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছিলেন যে, পরব্রহ্মকে দর্শন করিলে সমস্ত জগৎ নন্দনবন, সকল বৃক্ষই কল্পবৃক্ষ এবং সকল বারি গঙ্গা-বারি বোধ হইয়া থাকে। জননী জন্মভূমিকেও ইষ্টদেবতারূপে দর্শন করিলে আপনার স্বদেশ নন্দনবনে এবং প্রত্যেক স্বদেশবাসী দেবদেবীতে পরিণত হইবে। হায়! সেদিন কবে আসিবে, যেদিন ভারতবাসী ভগবান্‌কে মাতৃভূমিরূপে এবং মাতৃভূমিকে ভগবন্মূর্ত্তিরূপে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হইবেন। ভগবানের নামে আত্ম-সমর্পণের কথা এদেশের ইতিহাসে দুর্ল্লভ নয়। কিন্তু তাঁহার প্রত্যক্ষগোচর মূর্ত্তি মাতৃভূমির নামে আত্মসমর্পণ আমরা বহুদিন হইল বিস্মৃত হইয়াছি! কে তাহা পুনরুজ্জীবিত করিবেন? ভারতের যে সাধুসন্তানগণ ভগবানের এক একটি ঐশ্বর্য্যকে দেবতারূপে পূজা করিতে শিক্ষা দিয়াছিলেন, তাঁহারা আজ কোথায়? এমন কি কেহ নাই, যিনি এদেশে মাতৃভূমির পূজা প্রবর্ত্তিত করিতে পারেন? শাস্ত্রে কথিত আছে যে, ভক্তের আরাধনায় প্রীত হইয়াই ভগবান্ আপনার এক একটি বিশেষ মূর্ত্তি প্রকটিত করিয়াছিলেন। এদেশে এমন কি কেহ নাই, যিনি নিজের তপস্যাবলে ভগবানকে আমাদিগের মানসপটে মাতৃভূমিরূপে অবতারিত করিতে পারেন? ভগবন্! ভারতবাসী জ্ঞানে হউক, অজ্ঞানে হউক, যুগে যুগে তোমারই ঐশ্বর্য্যের

পুজা করিয়া আসিতেছে; সেই পুণ্যফলে তুমি কৃপা করিয়া অবতীর্ণ হও। তোমাকে মাতৃভূমিরূপে এবং মাতৃভূমিকে তোমারূপে পুজা করিয়া আমরা কৃতার্থ হই। ইতি।

আল্‌মোরা। ১৫।৯।১৯০১। } শ্রীযোগীন্দ্রনাথ বসু।

আশীর্ব্বাদ।

গার্গীসমা হও বাছা সু-ব্রহ্মবাদিনী,
অমরত্ব-খনি;
সীতাসমা সাধ্বী হও, সতীত্বের মণি,
অমরনন্দিনী।
মৈত্রেয়ীর সমা হও সার ধনে ধনী,
নারীশিরোমণি।
আর্য্যনারী সমা হও সেবা, ধৈর্য্যে ধনী
মহামূল্য মণি।
বিভুর করুণাধারা বর্ষুক তেমনি,
যথা নির্ঝরিণী।

৩রা শ্রাবণ, ১৩০৮। } শ্রীলীলাবতী মিত্র।

ল্যাণ্ডোরার জাল রাজা।

বিলাতে টিচবোর্ণ মোকদ্দমার বিষয় হয়ত অনেকেই শুনিয়াছেন, কিন্তু এদেশে যে একটি সেইরূপ মোকদ্দমা হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় অনেকের জানা নাই। আজ এই ভারতীয় মোকদ্দমাটির একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ আমি লিপিবদ্ধ করিতেছি।

ভারতের উত্তর-পশ্চিমাংশের প্রান্তে হরিদ্বারের সন্নিকট ল্যাণ্ডোরা রাজ্য স্থিত। এ রাজ্য বেশী বড় নহে, কিন্তু অনেক সাধারণ জমিদারী বা তালুক অপেক্ষা বড়। একশত বৎসরেরও অধিক হইল রামদয়াল সিংহ নামক এক গুজর যুবক এই রাজ্য সংস্থাপিত করেন। পশ্চিম দেশে গুজর একটি criminal tribe অর্থাৎ দুষ্কর্ম্মজীবী জাতি; তাহাদের ব্যবসায় চুরি ডাকাইতি করা। রামদয়ালের পিতা ও প্রপিতামহ শুনা যায় ভাল-মন্দ উপায়ে কিঞ্চিৎ জমিদারী করিয়াছিলেন, কিন্তু রামদয়ালই প্রথম রাজা হইয়া বসেন এবং মৃত্যুকালে বিপুল সম্পত্তি রাখিয়া যান। কথিত আছে যে তিনি হরিদ্বার হৃষীকেশ প্রভৃতি তীর্থের পথে কতকগুলি পান্থনিবাস সজ্জিত করিয়া রাখিয়াছিলেন, এবং যাত্রীদিগকে বিশেষ সৎকারের সহিত সেখানে রাখিতেন। কিন্তু সিংহের গুহার ভিতরে অনেক জীব যায়, বাহিরে বড় আর ফিরে না। সেইরূপ সেই যাত্রীরা সে বাটী আর বড় ছাড়িতে পারিত না। রাত্রে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যদি প্রাণ লইয়া পলাইতে পারিত, তাহা হইলে সে শুদ্ধ অদৃষ্টের বলে। এ সকল কিম্বদন্তি কতদূর ঐতিহাসিক সত্যের মধ্যে পরিগণিত হইতে পারে, আমি তদ্বিষয়ে কোন স্থির মন্তব্য প্রকাশ করিতে প্রস্তুত নহি; কিন্তু এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই যে, এক শতাব্দী পূর্ব্বে আমাদের দেশে নানারূপ অত্যাচার সংঘটিত হইত, এবং আধুনিক অনেক সম্ভ্রান্ত জমিদারের ঐশ্বর্য্য নরকঙ্কালরূপ ভিত্তির উপর নির্ম্মিত হইয়াছে। রাজা রামদয়ালের বিষয় যে সম্পূর্ণ সদুপায়ে উপার্জ্জিত হয় নাই, লোকে তাহার আরও এই এক প্রমাণ দেখাইয়া থাকে যে, রামদয়ালের পর কোন রাজা এ বিষয় বড় ভোগ করিতে পারেন নাই, এবং এখন এ রাজবংশ প্রায় লোপপ্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছে। এ বংশে চিরকাল রাণীদের প্রাদুর্ভাব, কুমারেরা বেশী দিন বাঁচেন না। রামদয়াল সিংহ ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে মৃত্যুকালে কুশল সিংহ নামক এক অতি শিশুসন্তান রাখিয়া যান। রাজা কুশল সিংহের আবার সাবালক হইতে না হইতেই প্রাণ বিয়োগ হয়। তাঁহার মৃত্যুর কিছুদিন পরে তাঁহার এক পুত্র ভূমিষ্ঠ হয়। ইনি পরে রাজা হরিবংশ সিংহ নামে পরিচিত হন, কিন্তু ইনিও বিশ বৎসর বয়সের মধ্যেই ইহলোক পরিত্যাগ করেন। রাখিয়া যান এক স্ত্রী-রাণী কমলাকুয়র * এবং এক শিশু সন্তান কুমার রঘুবীর সিংহ। সে পঞ্চাশ বৎসরের উপরের কথা। এই কুমারও অষ্টাদশ বৎসর বয়সে রাজ্যভার গ্রহণ করিবার অত্যল্পকাল পরেই কালকবলে পতিত হন। শুনা যায় ইঁহার সহধর্ম্মিণী রাণী

---

* "কুয়র" কথাটি পশ্চিমে মেয়েদের নামের অন্তে প্রায়ই ব্যবহৃত হয়। ইহা কি "কুমারী"র অপভ্রংশ?

ধর্ম্ম-কুয়র স্বামীর মৃত্যুর মাস আটেক পরে এক পুত্রসন্তান প্রসব করেন, কিন্তু সেই বালক এক বৎসরের মধ্যেই মারা যায়। মোটের উপর রাজা রঘুবীর সিংহকেই ল্যাণ্ডোরার শেষ রাজা বলা যাইতে পারে। ৩৪ বৎসর হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। রাণী ধর্ম্ম-কুয়রের বয়স তখন অল্প ছিল বলিয়া রাণী কমলাকুয়রই সমস্ত বিষয়ের ভারগ্রহণ করেন। তিনি বড় তীক্ষবুদ্ধি স্ত্রীলোক ছিলেন, এবং তাঁহার চেষ্টায় বধূরাণী ধর্ম্ম-কুয়র কয়েকবার পোষ্যপুত্র গ্রহণ করেন। কিন্তু পোষ্যপুত্র একটিও বাঁচিল না। পরে বড় রাণী অর্থাৎ কমলা কুয়র স্বয়ং ৭।৮ বৎসর হইল, জীবলীলা সম্বরণ করেন। রাণী ধর্ম্ম-কুয়র ১৮৯৯খৃষ্টাব্দে বলবন্ত সিংহ নামক একটি বালককে শেষ দত্তকপুত্র স্বরূপ গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু বালকটি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া রাণীর সহিত কলহ করিয়া বসিয়াছিলেন। আদালতে বিরাট সংগ্রাম উপস্থিত হইয়াছিল, এবং সে মোকদ্দমার জের এখনও মিটে নাই। রাণীর এখন বয়সও হইয়াছে, তাঁহার অনেক নিন্দাবাদও অনেক লোকে করিয়া থাকে। ল্যাণ্ডোরারাজ বোধ হয় এইবার উৎসন্ন যাইবে। লোকে ঠিকই বলে যে, অধর্ম্মের কড়ি কেহ স্বচ্ছন্দে ভোগ করিতে পারে না।

আমি উপরে বলিয়াছি যে, রাজা রঘুবীর সিংহকেই ল্যাণ্ডোরার শেষ রাজা ধরা যাইতে পারে। ভারতীয় টিচ্‌বোর্ণ মোকদ্দমা ইঁহাকে লইয়াই হইয়াছিল। সেই জন্য ইঁহার জীবনীই আমাদের আলোচ্য।

রাজা রঘুবীর সিংহ ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের ২০শে সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। অতি শৈশবাবস্থায় পিতৃবিয়োগ হওয়ায় ইঁহার মাতা রাণী কমলাকুয়র এবং মাতুল পধান* সাহেব সিংহ ইঁহাকে মানুষ করেন। ইনি বাল্যাবস্থায় বাড়ীতেই কিছু উর্দ্দু শিক্ষালাভ করেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁহার শ্রীমতী ধর্ম্মকুয়রের সহিত বিবাহ হয়। সেই বৎসর আগষ্ট মাসে তিনি নাবালকদের স্কুলে (Wards Institute) অধ্যয়ন করিবার জন্য কাশী প্রেরিত হন। সেখানে তিনি প্রায় ২॥০ বৎসর ছিলেন। মধ্যে কেবল একবার বধূর 'গৌণা' বা দ্বিরাগমনের জন্য ল্যাণ্ডোরায় আসিয়াছিলেন। পরে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দের ৩১শে জানুয়ারি তিনি সাবালক হইয়া স্কুল ছাড়িয়া ল্যাণ্ডোরায় প্রত্যাগমন করেন। সে সময় তাঁহার মাতা রাণী কমলাকুয়র স্বীয় ভ্রাতা রাও সাহেব সিংহের সাহায্যে রাজকার্য্য অতিবাহিত করিতেন। রঘুবীর সিংহ কাশী হইতে আসিয়া সেই কার্য্যের কিঞ্চিৎ ভার লইলেন। কিন্তু জগদীশ্বর তাঁহার অদৃষ্টে বেশীদিন রাজসুখ লিখেন নাই। দুই বৎসরের মধ্যে তাঁহাকে কালযক্ষ্মায় আক্রমণ করিল এবং মাস কতক কষ্ট পাইয়া ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রেল তিনি মর্ত্ত্যধাম পরিত্যাগ করিলেন।

এই ত রাজা রঘুবীর সিংহের জীবনের যথার্থ ইতিহাস। আমরা সকলেই কিন্তু জানি যে, বড়ঘরে কেহ এরূপ অল্পবয়সে অল্পদিন ভুগিয়া মরিলে কেমন পাঁচটা কথা উঠে। এস্থলেও তাহাই হইল। লোকে নানারূপ কথা বলিল, সদরে হাকীমদের কাছেও দু'চারখানা দরখাস্ত পড়িল যে, ইহার ভিতর কিছু গোল আছে, হয় ত বিষ খাওয়ান হইয়াছিল, তদন্ত করা হউক। কলেক্টর ও ডাক্তার সাহেব কিছু তদন্তও করিলেন, কিন্তু অনুসন্ধানে কিছু বাহির হইল না। পরে রাণী ধর্ম্মকুয়রের একটি পুত্রসন্তানও জন্মিল, সরকারি কাগজপত্রে তার নামও চড়িল, কিছুদিন পরে সে মরিয়াও গেল। তখন দুই রাণীতে মিলিয়া বিষয়ের বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন। দেখিতে দেখিতে ৫।৬ বৎসর কাটিয়া গেল, ছোট রাণী একটি পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিলেন, সেটিও বিনষ্ট হইল। এমত সময়ে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের ২২শে জুন একজন ফকীরবেশধারী লোক রুর্কীর অন্তঃপাতী মংলৌর নামক স্থানে উপস্থিত হইয়া আপনাকে রাজা রঘুবীর সিংহ বলিয়া প্রকাশ করিল। তাহার মস্ত দাড়ি, মাথায় লম্বা লম্বা জটা, পরিধানে গেরুয়া বস্ত্র। সে বলিল যে তাহাকে মারিবার চেষ্টা হইয়াছিল বটে কিন্তু সে মরে নাই, ভগবৎপ্রসাদে রক্ষা পাইয়াছে, এবং নিজের স্বত্ব দাবী করিতে আসিয়াছে। চতুর্দ্দিকে একটা হুলস্থূল পড়িয়া গেল; ম্যাজিষ্ট্রেটের পক্ষে সহরে শান্তি রক্ষা করা দায় হইয়া পড়িল। সেই ফকীরকে প্রথম অজ্ঞাতনিবাস বদমাইশ্‌ বলিয়া গেরেফ্‌তার করা হইল। হাকীমদিগের ধারণা হইল যে, লোকটা জুয়াচোর। তাহার উপর পুলিশে কয়েকটা ফৌজদারী মোকদ্দমা খাড়া করিয়া ফেলিল।

* গুজরদিগের মধ্যে একটি মান্যের উপাধি, "প্রধান"এর অপভ্রংশ।

শেষ চতুর্দ্দিকে নানারূপ গোলযোগ হওয়ায় হাইকোর্টের হুকুমে এই মামলার বিশেষ তদন্ত করিবার জন্য জয়েন্ট্ ম্যাজিষ্ট্রেট্ মার্থ্যাম্ সাহেবকে নিযুক্ত করিয়া সাহারণপুরে পাঠান হইল। তাঁহার সমক্ষে রীতিমত ফৌজদারী মোকদ্দমা চলিল, এবং অনেক অনুসন্ধান করিয়া মার্থ্যাম্ সাহেব বিচার করিলেন যে, ঐ ফকীরবেশধারী পুরুষটি পঞ্জাবী, তাহার যথার্থ নাম মহাসিংহ এবং তাহার পিতার নাম কানসিংহ রামদাসী, তাহাদের নিবাস হোশিয়ারপুর-অন্তঃপাতী খেড়া মহালপুর গ্রামে। ফলতঃ ঐ জাল্‌রাজার প্রতি ভারতের দণ্ডবিধি আইনের ৪১৯ ধারা অনুসারে প্রতারণা অপরাধে (cheating by false personation) সশ্রম কারাবাসের অনুজ্ঞা হইল, এবং এই হুকুম আপীলেও বাহাল রহিল।

ফকীর কিন্তু সহজে ছাড়িবার পাত্র নহে। সে জেল হইতেই সাহারণপুর দেওয়ানি আদালতে দাবী করিয়া বসিল। ফৌজদারী আদালতের বিচারে স্বত্ব নির্ণয় হয় না। রুর্কী ও সাহারণপুর অঞ্চলে সাধারণ লোকের মন এই অসাধারণ মামলা লইয়া বড়ই উত্তেজিত হইয়া পড়িয়াছিল। সেই জন্য হাইকোর্ট এই দেওয়ানি মোকদ্দমার বিচার অন্য জেলায় হওয়া যুক্তিসিদ্ধ বিবেচনা করিয়া উহা মিরটে জজের আদালতে পাঠাইয়া দিলেন। এই দাবী কিন্তু কিছু আইনসম্পৃক্ত দোষের দরুণ খারিজ হইয়া গেল। তখন ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে সেই ফকীর মিরটে সব্-জজের আদালতে মুফলিস্ (pauper) হইয়া দাবী করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিল। তাহা গ্রাহ্য হইল না। পরন্তু তাহার অদ্ভুত-কাহিনী শুনিয়া অনেকেরই চিত্ত আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং অনেক চতুরবুদ্ধি লোক যে ভাবীলাভের আশায় প্রচুর অর্থ লইয়া তাহাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সমস্ত প্রদেশে মহা আন্দোলন উপস্থিত হইল। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারি রাজা রঘুবীর সিংহের নামে পুরাষ্ট্যাম্প্ লাগাইয়া মিরটে সব্-জজের আদালতে নালিশ রুজু হইল। প্রতিবাদিনী হইলেন দুই রাণী—কমলাকুয়র ও ধর্ম্মকুয়র। দাবী—সমস্ত তালুকার দখল পাইবার। এই মোকদ্দমার বিচার করিলেন, স্বনামখ্যাত সব্-জজ শ্রীকাশীনাথ বিশ্বাস রায় বাহাদুর। প্রায় দেড় বৎসর কাল ধরিয়া তাঁহার কোর্টে মোকদ্দমা চলিল, দুই পক্ষই এলাহাবাদ হইতে বড় বড় উকীল ব্যারিষ্টার লইয়া গেল, অনেক সাক্ষীর জবানবন্দী লিখিত হইল। পরে এই মোকদ্দমার অদ্ভুত বৃত্তান্ত সঙ্কলিত করিয়া উর্দ্দু ভাষায় একখানি ৩০০।৪০০ পৃষ্ঠা পরিমিত পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল। আমরা এখানে বাদীর সাক্ষ্যের কিঞ্চিৎ আভাস মাত্র দিব।

সে অবশ্য রাজা রঘুবীর সিংহ বলিয়া নিজের পরিচয় দেয় এবং বলে যে, তাহার মা ও মামার চক্রান্তে পড়িয়া সে প্রায় প্রাণ হারাইতে বসিয়াছিল। সে বারাণসী হইতে ল্যাণ্ডোরায় প্রত্যাগমন করিলে দেখিল যে, তাহার মাতা রাণী কমলাকুয়রের চরিত্রে কলঙ্ক স্পর্শিয়াছে এবং তাহার মাতুল এই অবৈধ-প্রেমের প্রবর্ত্তক। সে স্বীয় মাতার সহিত এই বিষয় লইয়া একটা তুমুল কলহ করিল, এবং পুত্রের এই আচরণে রাণী কমলাকুয়র এবং তাঁহার ভ্রাতা পধান সাহেব সিংহ দুই জনেই অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন। তাহার পর হইতে রাজপ্রাসাদে মনান্তর এবং বিবাদ প্রবেশ করিল। রাজা রঘুবীর সিংহ অনেক দিন প্রবাসের পর বাড়ী আসিয়াছেন, তখনও বালক, নিজের মা ও মামার সহিত কি করিয়া যুঝিয়া উঠিবেন? তাহারা সুবিধা খুঁজিতেছিল, শীঘ্র সুবিধাও জুটিল। রঘুবীর সিংহ পীড়িত হইলেন। তখন তাঁহার শত্রুরা তাঁহাকে একদিন ঔষধের সহিত কি খাওয়াইয়া দিল। তাহা খাইয়া তিনি সংজ্ঞাহীন হইলেন। সেই অজ্ঞান অবস্থায় তাঁহাকে হরিদ্বারের সন্নিকটস্থ কঙ্খল-ধামে গঙ্গাবক্ষে ভাসাইয়া দেওয়া হয়। তাড়াতাড়িতে দগ্ধ করা হয় নাই, তাই মরেন নাই। ১০।১২ ঘণ্টা নদীর জলে ভাসিতে থাকেন, কিন্তু ডুবেন নাই। পরদিন প্রাতে গোমানি নামক এক রজক গঙ্গাস্নান করিতে আসিয়া তাঁহাকে দেখিতে পায় এবং আসন্ন বিপদ হইতে উদ্ধার করে। তখন রাজার অল্প জ্ঞান হইয়াছে। যখন তাঁহাকে পাড়ে টানিয়া তোলা হইল, তখন তিনি ইঙ্গিতে একটু জল খাইতে চাহিলেন। মহুয়া গাছের পাতা ভাঙ্গিয়া ঠোঙ্গা তৈয়ার করিয়া ধোপা তাঁহাকে জল খাওয়াইতে চেষ্টা করিল, কিন্তু জল মুখের ভিতর গেল না, পাশ বাহিয়া পড়িয়া গেল। তখন গোমানি দেখিল যে, রাজার মুখের মধ্যে তুলা ঠাসা রহি-

রাছে। সে তুলা বাহির করিয়া ফেলিল এবং পরে রাজাকে জল খাওয়াইল। এহেন সময়ে এক গোসাঁই সেখানে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি জাতিতে ব্রাহ্মণ,—মিশ্র। তাঁহার হস্তে রাজাকে সমর্পণ করিয়া রজক অন্তর্হিত হইল। যাইবার সময় কিন্তু রাজা তাহার নাম ও নিবাস জিজ্ঞাসা করিয়া লইলেন। পরে সেই গোসাঁই রাজাকে নিজ কুটীরে লইয়া গেলেন এবং তাঁহার চিকিৎসা করিলেন। কণ্ঠদেশের একস্থান চিরিয়া শরীরস্থ বিষ বাহির করিয়া দিলেন। এই কাটা-ঘা নালিশের সময় পর্য্যন্ত শুকায় নাই। রাজা সুস্থ হইয়া গোসাঁইজীর নিকটে রহিলেন। একদিন দেখেন যে ল্যাণ্ডোরার একটি সওয়ার সেখানে আসিয়া উপস্থিত। রাজা কুটীরের মধ্যে লুকাইলেন; সওয়ার গোসাঁইজীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া চলিয়া গেল। তখন রাজা গোসাঁইকে বলিলেন যে, ঐ সওয়ার বোধ হয় তাঁহাকেই অন্বেষণ করিতেছে। গোসাঁই এই কথা শুনিয়া রাজার হাত দেখিলেন এবং গণিয়া বলিলেন যে, সম্মুখে ৭॥০ বৎসর রাজার সময় বড় খারাপ, গ্রহেরা বিমুখ, এই সময়টা আত্ম-পরিচয় না দেওয়াই ভাল, ছদ্মবেশে কাটান উচিত। রাজা গোসাঁইজীর পরামর্শ অনুসারে গোপনে দেশভ্রমণে প্রবৃত্ত হইলেন। মাসেক দু'মাস হরিদ্বারের সন্নিকট ধারাপুর, হৃষীকেশ এবং শিববনে ঘুরিলেন, তাহার পর আরও উত্তরের দিকে গেলেন। ২॥০ বৎসর কাল টিহরি, সফেদমণ্ডি এবং অমৃতসরে কাটিল। তাহার পর পাটিয়ালার মহারাজার রাজ্যে প্রায় ২॥০ বৎসর পর্য্যটন করিলেন। এই সময় ফরিদকোট ও নাভা দেখিলেন। অবশেষে হরিদ্বারে ফিরিয়া আসিয়া নীলধারার তটস্থ এক বৈরাগীর আশ্রমে রহিলেন। এই সময়ে তিনি গুরু শিবরামপুরীর দ্বারা দীক্ষিত হন, এবং শুদ্ধ গ্রহদোষ কাটাইবার জন্য আত্ম-প্রকাশ করেন নাই।

বাদী এইরূপ একটি অতীব আশ্চর্য্য কাহিনী আদালতের সমক্ষে প্রচার করে। তাহাকে সুদীর্ঘ জেরা করা হয়, এবং সে ল্যাণ্ডোরাপ্রাসাদের কথা, রাণী কমলা-কুয়রের কথা, রাণী-ধর্ম্মকুয়রের কথা নানারূপ ব্যক্ত করে। এমন কি, ছোট রাণীর শরীরের কোন্ অংশে তিল কিম্বা ক্ষতের দাগ আছে, তাহা পর্য্যন্ত প্রকাশ করে। অনেক লোক আসিয়া বাদীর পক্ষে সাক্ষ্য প্রদান করে এবং বলে, "এই রাজা রঘুবীর সিংহ, ইহাকে আমরা চিনিতে পারিয়াছি।" এই সাক্ষীদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য রাণী ধর্ম্মকুয়রের দুই পিশী এবং কাশীর নাবালক স্কুলের (Wards' Institute) ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক শ্রীকেদারনাথ রায় চৌধুরী। প্রতিবাদিনীদের পক্ষ হইতে অনেক সুসম্ভ্রান্ত লোক সাক্ষ্যপ্রদান করেন এবং একবাক্যে বলেন যে, বাদীর চেহারা, কথাবার্ত্তা এবং রকমসকমে প্রকাশ যে, সে রাজা রঘুবীর সিংহ নহে;—একটা জালিয়াৎ জুয়াচোর। এস্থলে বিশেষ করিয়া বলা উচিত যে, রাণী কমলাকুয়র ও রাণী ধর্ম্ম-কুয়র বাদীকে বেশ ভাল করিয়া ঠাহর করিয়া দেখিয়া শপথ করেন যে, সে কখনই রাজা রঘুবীর সিংহ নহে।

১৮৭৮ খৃষ্টাব্দের ২৬শে মে তারিখে সব্-জজ শ্রীকাশীনাথ বিশ্বাস মহাশয় তাঁহার রায় প্রচার করেন। তাঁহার রায়সলাটিকে একটি ক্ষুদ্র পুস্তক বলিলেও চলিতে পারে। সব্-জজ বাহাদুর মোকদ্দমার সুবিস্তৃত আলোচনা করিয়া বিশদরূপে বুঝাইয়া দেন যে, বাদীর কাহিনী যে শুদ্ধ বিস্ময়কর ও কল্পিত তাহা নহে, উহা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব। তিনি দাবী নামঞ্জুর করেন। বাদী হাইকোর্টে আপীল করিয়াছিল, কিন্তু উক্ত আদালতের মাননীয় বিচারপতিরা কাশী বাবুর সহিত একমত হয়েন, আপীল খারিজ হয়। এইখানে ল্যাণ্ডোরার জাল-রাজার মোকদ্দমার ইতি।

পাঠক দেখিবেন যে এরূপ বিশাল জালচক্রের কথা পৃথিবীতে খুব কমই শুনিতে পাওয়া যায়। এই ল্যাণ্ডোরার মোকদ্দমা যে কতকগুলি খুব চতুর লোকে মিলিয়া একটা প্রকাণ্ড তালুক আপনাদের করতলগত করিবার চেষ্টায় করিয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তাহারই অনতিপূর্ব্বে ইংলণ্ডে টিচ্বোর্ণ মোকদ্দমা হয়, এবং বোধ হয় ঐ বিখ্যাত বিলাতি জুয়াচুরির কথা শুনিয়াই আমাদের ভারতীয় জুয়াচোরদিগের মাথায় একটা নূতন বুদ্ধি প্রবেশ করে। সৌভাগ্যক্রমে হাকীম অতি বিচক্ষণ ছিলেন। তাঁহার প্রখরদৃষ্টি প্রতারণার জাল ভেদ করিয়া ফেলে। তবে এস্থানে বলা আবশ্যক যে, টিচ্বোর্ণ মোকদ্দমার জুরীসম্ভাষণকালে প্রধান বিচারপতি কোবর্ণ (Cockburn)

যে অসামান্যপ্রতিভাব্যঞ্জক বক্তৃতা করেন, তাহা পাঠ করিয়া কালী বাবু অনেক সাহায্য পাইয়াছিলেন। ভারতবর্ষে রাজ্যলুট করিবার প্রয়াস দুইবার হইয়াছে;—একবার বর্দ্ধমানে জাল-প্রতাপচাঁদের দ্বারা, এবং আর একবার ল্যাণ্ডোরায় জাল-রঘুবীর সিংহের দ্বারা। আশা করা যায়, দুইবারই সত্যের জয় হইয়াছে।

শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ।

প্রাণী ও উদ্ভিদ্।

গত বারের "প্রবাসী"তে "প্রাণী ও উদ্ভিদ্" নামক প্রবন্ধে উহাদের আহার্য্যের যে পার্থক্য বলা হইয়াছে, তদ্বিষয়ে দুই একটা কথা জিজ্ঞাস্য আছে। দুঃখের বিষয়, প্রথমেই শব্দ-বিচার করিতে হইল। প্রত্যেক লেখক তাঁহার মনোগত ভাব শব্দরূপ সঙ্কেত দ্বারা পাঠকের নিকট ব্যক্ত করিতে চান। কিন্তু সঙ্কেতের দোষে সে ভাব প্রকাশিত না হইলে লেখকের পরিশ্রম পণ্ড হইয়া যায়।

দুই একটী দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। উল্লিখিত প্রবন্ধে 'অঙ্গারক বাষ্প' ও 'অঙ্গার' শব্দগুলি দেখিতেছি। অঙ্গার বা অঙ্গারক সকলেই জানেন, এবং অঙ্গারক বাষ্প এ পর্য্যন্ত রাসায়নিকেরা প্রস্তুত করিতে না পারিলেও অঙ্গারকের বাষ্প বুঝিতে পারি। কিন্তু বোধ করি, উক্ত প্রবন্ধলেখক 'অঙ্গারক বাষ্প' অর্থে অঙ্গারকের বাষ্প নহে, অঙ্গারক্ ও অক্‌সিজেন্ যোগে জাত একটি স্বতন্ত্র যৌগিক পদার্থের উল্লেখ করিয়াছেন। বাঙ্গলায় অনেকেই ইহাকে অঙ্গারকাম্ল বাষ্প বা বায়ু বলিয়া থাকেন, এবং কেহবা ইংরাজির মত কার্বনদ্ব্যক্সাইড বলিয়া থাকেন। অতএব এই অর্থে অঙ্গারক বাষ্প লেখা বাঙ্গলায় সম্পূর্ণ নূতন। আবশ্যক স্থলে নূতন শব্দ-সঙ্কলনে কেহই দোষ দেয় না। কিন্তু সে স্থলে শব্দটির অর্থ বলিয়া দেওয়া আবশ্যক।

'অঙ্গারক বাষ্প' যেন বিজ্ঞানের সাঙ্কেতিক শব্দ হইল। কিন্তু 'মুক্ত' বিশেষণ পদটিকে এরূপ বলিতে পারা যায় না। উল্লিখিত প্রবন্ধে আছে, "বিজ্ঞানবিদ্গণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, উদ্ভিদ্দেহ মাত্রেই প্রচুর পরিমাণে হাইড্রোজেন ও অঙ্গার মুক্তাবস্থায় বিদ্যমান থাকে।" এইরূপ, "তৃণখণ্ডে যে হাইড্রোজেন মুক্তাবস্থায় ছিল", "আর সেই মুক্ত অঙ্গার" ইত্যাদি স্থলে মুক্ত অর্থে বাস্তবিক মুক্ত (পরিত্যক্ত বা উন্মুক্ত) বুঝিতে হইবে কি? জিজ্ঞাসার কারণ এই যে, এ পর্য্যন্ত কোন উদ্ভিদ্দেহে হাইড্রোজেন বায়ু কিংবা অঙ্গার বিন্দুমাত্রও পৃথক্ পৃথক্ দেখিতে পাওয়া যায় নাই। বোধ করি, মুক্তাবস্থা অর্থে যুক্তাবস্থা বুঝিতে হইবে। যদি "প্রবাসী"র মুদ্রাকর যুক্তকে মুক্ত করিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাকে মুদ্রাকর্ম্ম হইতে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়া আবশ্যক। প্রবন্ধের অন্যত্র আরও মুক্ত শব্দ আছে; কিন্তু সকল স্থলেই মুক্ত অর্থে যুক্ত কি না, বুঝা গেল না।

বোধ হয়, প্রবন্ধের বিষয় ব্যাখ্যাতে লেখক স্থানে স্থানে নিজের কল্পনাকে বৈজ্ঞানিক সত্য বলিয়া বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন, "তৃণখণ্ড পোড়াইলে কেবল সোডা, ফস্ফরস্, নাইট্রোজেন্ ও গন্ধক মিশ্রিত একটা যৌগিক পদার্থ ভস্মাকারে" পাওয়া যায়। বাস্তবিক তাই কি? একটা যৌগিক পদার্থ এবং ঐ চারিটি পদার্থ মিশ্রিত যৌগিক পদার্থ পাওয়া যায়? পুনশ্চ, লেখক বলেন, "পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে, সৌরালোক উদ্ভিদ্পত্রে পতিত হইলে, পত্রশোষিত সেই অঙ্গারক বাষ্প তাহার গঠনোৎপাদন অক্‌সিজেন ও অঙ্গারে বিশ্লিষ্ট হইয়া যায়; এবং তারপর উদ্ভিদ্ সকল দেহপোষণের জন্য আবশ্যক মুক্ত অঙ্গারটাকে রাখিয়া অব্যবহার্য্য অক্‌সিজেন বাষ্প বায়ুতে ছাড়িয়া দেয়। মূলশোষিত জলকেও ঠিক্ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে হাইড্রোজেন্ ও অক্‌সিজেনে বিশ্লিষ্ট হইতে দেখা গিয়া থাকে, এবং এস্থলে উদ্ভিদ্ সকল দেহগঠনে ব্যবহার্য্য হাইড্রোজেন্‌টাকে ধরিয়া রাখিয়া অনাবশ্যক অক্‌সিজেনকে পূর্ব্ববৎ বাতাসে ছাড়িয়া দেয়।" এই সকল উক্তির মধ্যে কতটুকু পরীক্ষিত সত্য; এবং কতটুকু কল্পনা, তাহা লেখককেই বিচার করিতে বলি। তা'ছাড়া, যদি এইরূপই হইয়া থাকে, তাহা হইলে উদ্ভিদ্দেহের প্রচুর অক্‌সিজেনের উৎপত্তি কোথায়? বস্তুতঃ লেখক যত সহজে বিষয়টি বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, উহা আদৌ তত সহজ নহে।

শেষে লেখক বলিয়াছেন, "উদ্ভিদ্ ও প্রাণী উভয়েই জীবশ্রেণীভুক্ত হইলেও, তাহাদের সম্বন্ধ বাস্তবিকই বিপরীত। উদ্ভিদ্ স্রষ্টা, প্রাণী সংহারক, উদ্ভিদ্ উৎপাদক, প্রাণী ভক্ষক"—ইত্যাদি। এই প্রকার ভাষা অলঙ্কারশাস্ত্রে চলিতে পারে, কিন্তু বিজ্ঞানে চলিতে পারে কি না, সন্দেহ। উদ্ভিদ্ স্রষ্টা—এই অর্থে যে কতকগুলি উদ্ভিদ্—যাহাদের অঙ্গ হরিদ্বর্ণ—তাহারা চারিদিকের বায়ু জল মাটী লইয়া নিজেদের আহার্য্য বা খাদ্য সৌরতেজঃ সাহায্যে নিজেরা প্রস্তুত করিয়া লয়। বস্তুতঃ এই সকল উদ্ভিদকে দুইটি কর্ম্ম করিতে হয়;—পাচকের কর্ম্ম ও ভক্ষকের কর্ম্ম। অন্য উদ্ভিদ্ সকল পাক করে না, অন্যের পক্ক অন্ন ভোজন করে। ভক্ষণের দ্বারা উদ্ভিদেরও দেহ বৃদ্ধি হয়, প্রাণীরও হয়। বস্তুতঃ ভক্ষ্যদ্রব্য বিনা কি উদ্ভিদ্ কি প্রাণী কেহই বাঁচে না। যেহেতু উভয়েরই জীবনাধার (protoplasm) এক, দ্বিবিধ নহে। যদি অলঙ্কারই আনা গেল, তবে বলিতে দোষ নাই যে, উভয়েই ভাঙ্গে ও গড়ে, এবং গড়ে ও ভাঙ্গে। তবে কি উদ্ভিদ্ ও প্রাণীর আহার্য্যে (যাহাকে আহরণ করা হয়) প্রভেদ নাই? আছে, কতকগুলির আছে, কতকগুলির নাই; কিন্তু আহার বিষয়ে সকলেই প্রায় সমান।

ফলসংখ্যা বৃদ্ধি।

সে বৎসর "প্রদীপে" প্রকাশিত "কুষ্মাণ্ডচিন্তা" পাঠ করিয়া কয়েকজন পাঠক কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছিলেন। অন্যান্য চিন্তার মধ্যে কুষ্মাণ্ডের ফলসংখ্যা বৃদ্ধি করিবার উপায়চিন্তা ছিল। সেই চিন্তা আবার করা যাইতেছে।

সকলেই দেখিয়া থাকিবেন, কুমড়ার সকল ফুলেই ফল হয় না। কতকগুলি ফুলে হয়; সেগুলি স্ত্রী। অপরগুলিতে হয় না, সেগুলি পুং। কুমড়াগাছের কিছু বয়স হইবার পর ডাঁটা ও প্রত্যেক পাতার মধ্যবর্ত্তী কোণে ফুল হয়। কিন্তু যদি ৪।৫টা পুং-ফুল হয়, তবে একটা স্ত্রী-ফুল হয়। বাড়ীতে খড়ের চালে যে বিলাতী কুমড়াগাছ উঠে, তাহারই কথা বলা যাইতেছে। কুষ্মাণ্ডচিন্তায় ফলসংখ্যা বৃদ্ধির দুইটি উপায়ের ইঙ্গিত করা গিয়াছিল; একটি এই যে, কুমড়ার সকল ফুলই যদি স্ত্রী-ফুল (ফলধারী ফুল) হইত, তাহা হইলে যত পাতা তত ফল পাইবার সম্ভাবনা থাকিত। অর্থাৎ যদি কোন উপায়ে পুং-ফুলের জন্ম রহিত করিয়া কেবল স্ত্রী-ফুলের জন্ম ঘটাইতে পারা যায়, তাহা হইলে ফলের সংখ্যা চারি পাঁচ গুণ বাড়িতে পারে।

আর একটি পন্থার উল্লেখ করা গিয়াছিল। যদি কুমড়ার প্রথম পাতা হইতেই ফুল ধরাইতে পারা যায়, তাহা হইলেও ফলের সংখ্যা বাড়িতে পারে। প্রায়ই দেখা যায়, গাছের কিছু বয়স না হইলে ফুল ধরে না। একটা গাছ ৫ হাত লম্বা হইল, অথচ একটিও ফুল ধরিল না। সেই ৫ হাত ডাঁটায় অনেক পাতা হয়; যত পাতা তত ফুল পাওয়া সম্ভবপর। এই সকল ফুলের মধ্যে কতকগুলি স্ত্রী-ফুল নিশ্চিত হইত; কাজেই ফলসংখ্যা বৃদ্ধির সম্ভাবনা হইত।

এলাহাবাদ হইতে কোন পাঠক আর একটি উপায়ের উল্লেখ করিয়াছিলেন। সকলেই জানেন, যত স্ত্রী-ফুল হয়, তাহাদের সকলগুলিই ফলে পরিণত হয় না। তাহাদের অনেকগুলিই পচিয়া শুকাইয়া যায়। বিশেষতঃ প্রথম যে সকল স্ত্রী-ফুল হয়, তৎসমুদয় প্রায়ই পচিয়া বা শুকাইয়া যায়। যদি কোন উপায়ে এই সকল ফলধারী ফুলকে ফলে পরিণত করিতে পারা যায়, তাহা হইলেও অনেক লাভ। বস্তুতঃ ইহা উক্ত পাঠক বলিয়াছিলেন, অন্য নূতন উপায় আবিষ্কার ছাড়িয়া দিয়া যত স্ত্রী-ফুল পাওয়া যায়, ততগুলিকেই যদি ফলাইতে পারা যাইত, তাহা হইলেও পরম লাভ।

শেষোক্তটি লইয়া তবে তিনটী উপায়ের সন্ধান আবশ্যক। (১) কুষ্মাণ্ডের পুং-ফুল আমরা চাই না; কোন উপায়ে পুং-ফুলের পরিবর্ত্তে স্ত্রী-ফুল জন্মাইতে পারা যায় কি না। (২) কুষ্মাণ্ডের বয়োবৃদ্ধি আমরা অপেক্ষা করিতে পারি না; কোন উপায়ে তাহাকে অল্পবয়সেই ফুল ধরাইতে পারা যায় কি না। (৩) যত স্ত্রী-ফুল হয়, সকলগুলিকেই ফলাইতে পারা যায় কি না।

তিনটি প্রশ্ন সম্বন্ধেই বিস্তর কথা বলিবার আছে। কিন্তু সে-সকল তত্ত্ব খাঁটি বৈজ্ঞানিক, সাধারণ পাঠকের নিকট নীরস। এ জন্য এখানে দুই একটার সূচনা করিয়াই ক্ষান্ত হওয়া যাইবে।

(১) এই প্রশ্নটির যখন ঠিক সমাধান হইবে, তখন

কুষ্মাণ্ড-সমাজে কেন, মানব-সমাজেই যুগান্তর উপস্থিত হইবে। এখন কে না কন্যাদায়গ্রস্ত পিতার দুঃখের কাহিনী শুনিয়াছেন? যদি এমন কোন কৌশল আবিষ্কৃত হয় যে, লোকের ইচ্ছামত কেবল পুত্র কিম্বা কন্যা কিম্বা একটি কন্যা আর সব পুত্র জন্মিবে, তাহা হইলে কন্যাদায়ের পরিবর্ত্তে পুত্রদায়ের কথাও উঠিতে পারিবে। এই কথা যেমন, কুষ্মাণ্ডের কেবল কন্যা জন্মানও তেমন। অর্থাৎ সন্তানের লিঙ্গভেদের কারণ কি? কারণ জানিলে উপায় আবিষ্কৃত হইলেও হইতে পারে। এ বিষয়ের কিছু কিছু অনুসন্ধান হইয়াছে, কিন্তু আরও আবশ্যক। যতটুকু জানা গিয়াছে তাহাতে বলা যাইতে পারে যে, শরীর পোষণাভাবে পুত্র এবং পোষণাধিক্যে কন্যা জন্মে। পোষণ অর্থে খাইয়া পরিয়া সুখে স্বচ্ছন্দে থাকিয়া দেহকে স্থূল করা। এই অনুমানের অনেক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। মনুষ্যসমাজের দুইটি প্রমাণ বলা যাইতেছে। দুর্ভিক্ষের সময় পুত্র অধিক জন্মে, কন্যা অল্প; দরিদ্র নীচজাতীয় লোকের পুত্রসন্তান অধিক, কন্যা অল্প। দুর্ভিক্ষের সময় পুরুষেরাই কষ্টে স্থষ্টে বরং দু'মুটা খাইতে পায়, স্ত্রীলোকদিগের ভাগ্যে তাহা কচিৎ জুটে। দরিদ্র নীচ জাতীয় স্ত্রীলোকদিগকে বিলক্ষণ কায়ক্লেশ করিতে হয়, অর্থাৎ পুরুষদিগের মত তাহারা আহার করিতে পায় না। ইহাদিগের মধ্যে কন্যাদায় নাই, বরং কন্যাবিক্রয় বা কন্যাপণ দ্বারা দু'পয়সা রোজগার আছে। অন্য পক্ষে বড় মানুষদের ঘরে কিম্বা বর্ত্তমান সমাজের সহরে মধ্যবিত্ত বাবুদের ঘরে কন্যাদায় বিলক্ষণ দেখা যায়। এ সকল কথা স্থূলভাবে বলা গেল। অপর কতকগুলি বিশেষ বিধি আছে। তৎসমুদয় প্রায়ই অজ্ঞাত। *

যাহা হউক, কুষ্মাণ্ডের কথা হইতেছিল। উদ্ভিদের পুং-স্ত্রী-ফুল জন্ম সম্বন্ধে উপরি উক্ত নিয়ম কতকটা দেখা গিয়াছে। প্রথমে ক্লেবস্ সাহেব দেখান, এবং অল্পদিন হইল গালার্ডো সাহেব অনেক একলিঙ্গ গাছ পুরুষানুক্রমে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে, পোষণের আধিক্যে স্ত্রী-ফুল এবং অভাবে পুং-ফুল জন্মে। যাঁহারা উদ্যানকর্ম্মে রত, তাঁহারা এই উক্তি পরীক্ষা করিতে পারেন। কতকগুলা কুমড়ার গাছ লইয়া দুই ভাগ করিয়া এক ভাগে সার গোবর জল ইত্যাদি দিয়া এবং অন্য ভাগের গাছগুলিকে অনেকটা জীবন্মৃত অবস্থায় রাখিয়া পুং ও স্ত্রী-ফুলের গণনা করিতে হইবে। এ বিষয়ে লেখকের অভিজ্ঞতা লাউ গাছ লইয়া হইয়াছিল। তাহাতে উপরের উক্তি কতকটা সত্য বলিয়া বোধ হইয়াছে।

দ্বিতীয় প্রশ্নটি এই যে, কুমড়া গাছকে অধিক বাড়িতে না দিয়াই ফুল ধরাইতে পারা যায় কি না। ইহাও অসম্ভব নয়; বীজভেদে কুমড়ার এরূপ ঘটিতে দেখা যায়। বড় বড় ক্ষেত্রে চাষের কুমড়া গাছ দেখিলে এই প্রভেদ প্রত্যক্ষ হয়। এই সকল কুমড়া গাছ তত লম্বা হয় না, কিন্তু কুমড়াও মন্দ ফলে না। এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখিয়া বীজ নির্ব্বাচন করিলে উপরোক্ত প্রশ্নের সমাধান হইতে পারিবে।

তৃতীয় প্রশ্ন এই যে, কুষ্মাণ্ডের সকল স্ত্রী-ফুলকেই ফলাইতে পারা যায় কি না? অর্থাৎ সকল স্থলে কেন ফলে না, এবং ফলাইতে কি আবশ্যক। এবিষয়ে অনেক কথা আছে। তৎসমুদয়ের বর্ণনা এখানে আবশ্যক নাই। ফলাইবার পক্ষে একটি বিশেষ কারণ, স্ত্রী-ফুলের সহিত পুং-ফুলের পরাগের সংযোগ। অর্থাৎ স্ত্রী-ফুলে পরাগ পতিত হইলে যেমন বীজের উৎপত্তি হয়, তেমনই ফল অর্থাৎ বীজাধার বৃদ্ধি পাইতে থাকে।

যাঁহারা সৃষ্টির প্রত্যেক বিষয়ে প্রয়োজন খুঁজিয়া বেড়ান, তাঁহাদিগের নিকট এই উক্তির বিশেষ প্রমাণ আবশ্যক হইবে না। কেন না, যদি বীজই হইতে না পারিল, তবে বীজের আধারে প্রয়োজন কি? প্রকৃতি এমন অনাবশ্যক কাজে স্বশক্তি ব্যয় করিবে কেন? বীজের জন্যই ত ফল, ফলের জন্য বীজ নহে।

কিন্তু আমরা এসকল কূটতর্ক শুনিতে চাই না। কুমড়ার ফলেই আমাদের দরকার, বীজে তত দরকার নাই। পেয়ারার বীজ, কলার বীজ, আমের আঁঠি কে চায়? যদি বলেন, বীজ না হইলে অন্য গাছ জন্মাইবার উপায় থাকে না।

* এই বিষয় আলোচনার নিমিত্ত বহুসংখ্যক অবস্থা লইয়া বিচার করা আবশ্যক। লেখক।

যদি "প্রবাসী"র প্রত্যেক গ্রাহক এবং তাঁহার বন্ধু বান্ধব সাহায্য করেন, তাহা হইলে লেখককে এই তত্ত্বটি অনুসন্ধান করিতে অনুরোধ করা যাইবে। অনেক গ্রাহকের ইচ্ছা জানিতে পারিলে এবিষয়ে কর্ত্তব্যস্থির করা যাইবে। প্রঃ সং।

তাই বা কই। আমের কলম করিয়া বীজের প্রয়োজন ব্যর্থ করা যাইতেছে, কলার মূল-গ্রন্থি হইতে অপর্য্যাপ্ত কলার গাছ হইতেছে। তা'ছাড়া, সকল গাছের ফল বীজ-শূন্ত করিতে চাই না। আমের কত গাছ আছে। তাহাদের মধ্যে দুই পাঁচ শত গাছের ফলে আঁঠি না থাকিলে আমগাছ নিঃশেষ হইবে না। বাস্তবিক, বীজ উৎপন্ন না হইলেও ফল পুষ্ট হইতে পারে। অনেক কলার, কয়েক প্রকার লেবুর ও আঙ্গুরের বীজ হয় না, অথচ ফল পুষ্ট হয়।

এসকল কিন্তু বহু চেষ্টার ফল। প্রকৃতি সহজে তাহার নিয়ম ভাঙ্গিতে দেয় না। তাহার নিয়মই এই যে, স্ত্রী-পুষ্প পরাগনিষিক্ত না হইলে ফল পুষ্ট হয় না। পরাগস্পর্শ ও উত্তেজনায় গর্ভকোষের নানাবিধ পরিবর্ত্তন ঘটে। অধিকাংশ স্থলে বীজ না হইতে পারিলে ফল শুকাইয়া যায়, ফল পাকে না। বীজের পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বীজাধারের পুষ্টি হইতে থাকে। ইহাই সাধারণ নিয়ম।

কুমড়ার স্ত্রী-ফুল ফলাইতে এই নিয়ম অনুসরণ করা আবশ্যক। উহার প্রত্যেক ফুল একলিঙ্গ। বাতাস কিম্বা পতঙ্গ পুং-ফুলের পরাগ আনিয়া স্ত্রী-ফুলের মধ্যস্থিত গর্ভকোষের মস্তকে ফেলে। তাহাতেই স্ত্রী-ফুলের নিষেকক্রিয়া সম্পাদিত হয়। কিন্তু এইরূপে সকল স্ত্রী-ফুলেই পরাগ পড়ে না। অন্যান্য কারণের মধ্যে পরাগপতনাভাব স্ত্রী-ফুল শুকাইবার একটা প্রধান কারণ। এরূপ স্থলে ফলধারী ফুলকে ফলাইতে ইচ্ছা করিলে সেই ফুলে পরাগপাতন আবশ্যক। পতঙ্গ যাহা করে, আমরা তাহা করিতে পারি। পুং-ফুলের পরাগকেশর কাটিয়া লইয়া কিংবা তুলা দ্বারা পরাগ তুলিয়া লইয়া গর্ভকোষের পিণ্ডাকার মস্তকে পরাগপাতন সহজ কাজ। এরূপ করিয়া প্রায় সকল ফলধারী ফুলকেই ফলাইতে পারা গিয়াছে।

সেদিন আর এক গাছে এই উপায় অবলম্বন করা গিয়াছিল। বঙ্গদেশে পটোল সুলভ বটে, কিন্তু উড়িষ্যায় উহা দুর্লভ। এজন্য কেহ কেহ নিজের নিজের বাড়ীতে দুই একটা পটোলগাছ করিয়া থাকেন। এ সকল গাছে পটোল প্রায়ই ধরে না, তবে পটোলপাতাটা পাওয়া যায় মাত্র। পটোল ফুল হয়, 'জালী' লইয়া উঠে, কিন্তু ফল হয় না। এই সকল পটোলগাছে কখন কখন দুই একটা পটোল ধরে। এসকল স্থলে পরাগ পড়ে কিনা, বলিতে পারি না। তবে, পরাগ না পড়িলে ফল যে একবারে হয় না, এমন নহে। কোন বন্ধু ফলের আশা করিয়া লেখককে কারণ জিজ্ঞাসা করেন। বিশেষ না ভাবিয়াই তাঁহাকে 'জালীর' মাথায় পরাগ ফেলিতে বলি। সুখের বিষয়, এইরূপে তিনি পটোল ফলাইতে পারিয়াছেন।

বাড়ীতে রোপিত পটোল গাছে পটোল না ফলিবার কারণ আছে। পটোলগাছ একলিঙ্গ, কুমড়াগাছের মত দ্বিলিঙ্গ নহে। অর্থাৎ কুমড়ার একই গাছে পুং ও স্ত্রী-ফুল হয়, কিন্তু পটোলের কোন গাছে কেবল পুং এবং কোন গাছে বা কেবল স্ত্রী-ফুল হয়। বাড়ীতে লোকে দুই একটা মাত্র পটোলগাছ করিয়া থাকে, এবং তাহারা সকলেই হয় পুং-গাছ, কিংবা স্ত্রী গাছ। এরূপ হইবারও কারণ আছে। পটোলগাছের মূল লইয়া অপর গাছ করা হয়, এবং প্রায়ই একটি গাছের (প্রায়ই স্ত্রী) মূল লইয়া দুই একটি নূতন গাছ রোপিত হয়। ফলে, কোন বাড়ীতে পুং-স্ত্রী দ্বিবিধ গাছ প্রায় থাকে না। কাজেই ফলও পাওয়া যায় না। বিস্তীর্ণ পটোলক্ষেত্রে উভয়বিধ গাছই থাকে, কাজেই ফলিবার বিঘ্ন হয় না।*

প্রবাসের প্রেম।

১।

সে ত সেদিনের কথা, বাক্যহীন যবে
এসেছিনু প্রবাসীর মত এই ভবে
বিনা কোন পরিচয়ে, রিক্ত শূন্য হাতে,
একমাত্র ক্রন্দন সম্বল ল'য়ে সাথে!
আজ সেথা কি করিয়া মানুষের প্রীতি
কণ্ঠ হ'তে টানি লয় যত মোর গীতি!

---

* যাঁহারা উপরোক্ত উপায় অবলম্বন করিতে চান, তাঁহাদের মনে রাখা আবশ্যক যে, পুং-পটোল স্ত্রী-পটোলের গাছ দেখিতে একই রূপ। উহাদের ফুল দেখিয়া পুং স্ত্রী বুঝিতে হয়। স্ত্রী-গাছে 'জালী' লইয়াই ফুল উঠে, পুং-গাছের ফুলে 'জালী' থাকে না, একটা ছোট বোঁটা থাকে। স্ত্রী-ফুলের মধ্যে ত্রিভক্ত মাথা থাকে, তাহাতেই পরাগ ফেলিতে হইবে। পুং-ফুলে তিনটি পরাগকেশর ঊর্দ্ধাধঃ বক্র হইয়া থাকে। পটোলের পরাগ ছোট ও শাদা, বিলাতী কুমড়ার পরাগ বড় ও হলদে।

এ ভুবনে মোর চিত্তে অতি অল্প স্থান
নিয়েছ, ভুবননাথ! সমস্ত এ প্রাণ
সংসারে ক'রেছ পূর্ণ! পাদপ্রান্তে তব
প্রত্যহ যে ছন্দে বাঁধা গীত নব নব
দিতেছি অঞ্জলি, তাও তব পূজাশেষে
লবে সবে তোমা সাথে মোরে ভালবেসে
এই আশাখানি মনে আছে অবিচ্ছেদে!
যে প্রবাসে রাথ সেথা প্রেমে রাথ বেঁধে!

২।

নব নব প্রবাসেতে নব নব লোকে
বাঁধিবে এমনি প্রেমে। প্রেমের আলোকে
বিকশিত হব আমি ভুবনে ভুবনে
নব-নবস্ফুট দলে; প্রেম-আকর্ষণে
যত গূঢ় মধু মোর অন্তরে বিলসে
উঠিবে অক্ষয় হ'য়ে নব নব রসে
বাহিরে আসিবে ছুটি'; —অন্তহীন প্রাণে
নিখিল জগতে তব প্রেমের আহ্বানে
নব নব জীবনের গন্ধ যাব রেখে',
নব নব বিকাশের বর্ণ যাব এঁকে!
কে চাহে সঙ্কীর্ণ অন্ধ অমরতা-কূপে
এক ধরাতলমাঝে শুধু একরূপে
বাঁচিয়া থাকিতে? নব নব মৃত্যুপথে
তোমারে পূজিতে যাব জগতে জগতে।

মণিমালা।

(আখ্যায়িকা।)

পূর্ব্বাভাষ।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর একটি ঘটনা লইয়া এই আখ্যায়িকা রচিত। বঙ্গের পশ্চিম বিভাগ তখন কর্ণ-সুবর্ণ নামে খ্যাত ছিল, এবং শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্ত কর্ণ-সুবর্ণের রাজা ছিলেন। কনোজে রাজ্যবর্দ্ধন রাজা, মগধে গুপ্তবংশীয় মাধব গুপ্ত রাজা, এবং শিলাদিত্য প্রতাপশীল মালব প্রদেশের রাজা। ইহাঁদের সকলের সঙ্গেই বৈবাহিক সম্বন্ধ ছিল। রাজ্যবর্দ্ধনের পিতামহী গুপ্তবংশীয় মহাসেনগুপ্তের ভগিনী ছিলেন। রাজ্যবর্দ্ধনের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা সুপ্রসিদ্ধ হর্ষবর্দ্ধন কনোজের রাজা হয়েন; ইহাঁরই সভাপণ্ডিত কর্ত্তৃক নাগানন্দ, রত্নাবলী প্রভৃতি রচিত। খ্রীষ্টীয় ৬০৭ অব্দে সুগতভক্ত রাজ্যবর্দ্ধন, শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্তের সহিত যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। একালে হর্ষবর্দ্ধনের যে দানলিপি পাওয়া যায়, তাহাতে রাজ্যবর্দ্ধনকে পরম ভট্টারক পরম সৌগত বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। পণ্ডিত পাঠকগণ এই ঐতিহাসিক কথা কয়েকটির সহিত পরিচিত হইলেও, অতি প্রাচীন কথা বলিয়া, সর্ব্বসাধারণের জন্য একবার তাহার উল্লেখ করিয়া রাখিলাম।

প্রথম অধ্যায়।

সঙ্কল্প।

মহারাজা রাজ্যবর্দ্ধনের রাজপ্রাসাদের মুক্ত বাতায়ন পার্শ্বে দেবী মণিমালা উপবিষ্টা। মণিমালা গ্রন্থপাঠ করিতেছেন, এবং অদূরে দেবালয়ের উচ্চ মঞ্চে বসিয়া সোমদত্ত তাঁহার অপরাহ্নসূর্য্যকিরণপ্রভাসিত মুখমণ্ডলের দিকে চাহিয়া আছেন। সোমদত্তের অপরাধ কি? বিধাতা যে উপাদানে চক্ষু গড়িয়াছেন, তাহার চরম সার্থকতা সৌন্দর্য্য-দর্শনে। মণিমালা মহারাজার একমাত্র দুহিতা—স্নেহের পুত্তলি। মালবের এক রাজপুত্রের সহিত দ্বাদশ বর্ষ বয়সে ইহাঁর বিবাহ হইয়াছিল। কনোজ হইতে মালব যাইবার পথে গঙ্গাতীরে রাজকুমারের আকস্মিক মৃত্যু হয়। কাজেই এই বাল-বিধবা, চিরদিন পিতৃগৃহেই রহিয়াছেন। সন্ধান করিয়াছিলাম; কিন্তু রাজকুমারটির নাম অবগত হইতে পারি নাই।

কেহ কেহ বলেন যে, কন্যার বালবৈধব্যই মহারাজার বৌদ্ধধর্ম্মানুরাগের হেতু। যাহাই হউক, মহারাজা দুহিতাকে নানা গ্রন্থপাঠে নিয়োজিত করিয়াছিলেন। এই মনস্বিনীও অল্প বয়সেই অনেক পড়িয়াছিলেন, এবং নিরন্তর পাঠে ব্যাপৃত থাকিতেন। মণিমালা এখন ঊনবিংশ বর্ষ বর্ষীয়া। তাঁহার গৈরিকাচ্ছাদিত পৃষ্ঠতলে, বেণীনির্ম্মুক্ত কুন্তলরাশি, পশ্চিমগগনের অন্তর্বিচ্ছিন্ন তাম্ররাগরক্ত মেঘপৃষ্ঠে নীলাম্বরের মত শোভা পাইতেছিল। রূপসাগরে যৌবন-তরঙ্গ উথলিয়া উঠিতেছিল। গৈরিকবসনের ক্ষীণাবরণ কি সৌন্দর্য্য ঢাকিয়া রাখিতে পারে? বরং সেই আচ্ছাদন যেন তাঁহার অনবদ্য সৌন্দর্য্য অধিকতর মনোহর করিয়া তুলিয়াছিল। বোধ হয়, সোমদত্ত ভাবিতেছিলেন, যে "মলিনমপি হিমাংশোর্লক্ষ্ম লক্ষ্মীং তনোতি"।

মণিমালা নির্ব্বাণ-মাহাত্ম্য পড়িতেছিলেন। পড়িতে

পড়িতে একবার সোমদত্তের দিকে দৃষ্টি পড়িল; এবং সোমদত্তকে দেখিয়াই ভ্রূ-কুঞ্চিত করিলেন। বোধ হয় এই ভ্রূ-কুঞ্চনে তিরস্কার ছিল; কেন না সোমদত্ত কাতর-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, অবিলম্বে সে স্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন। সোমদত্ত চলিয়া গেলেন; মণিমালাও গ্রন্থ রাখিয়া দিয়া নির্ব্বাণ-ধ্যান করিতে বসিলেন। অনেকক্ষণ ধ্যান করিলেন; অবশেষে যখন পরিচারিকাগণ আসিয়া গৃহে প্রদীপ জ্বালিল, তখন গৃহমধ্যে একাকিনী পাদচারণ করিতে লাগিলেন।

একজন পরিচারিকা আসিয়া সংবাদ দিল যে, মহারাজা তাঁহার তত্ত্ব লইবার জন্য আসিতেছেন। মণিমালা স্বহস্তে পিতার জন্য আসন স্থাপন করিলেন। মহারাজা কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মা, মালবদেশ হইতে আমার সভায় ভবভূতি নামে একজন কবি আসিয়াছেন, শুনিয়াছ?" মণিমালা বলিলেন "হাঁ, সোমদত্ত তাঁহার তিনখানি নাটক পড়িতে দিয়াছিলেন। আমি তাঁহার গ্রন্থ পাঠ করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি।" এখানে বলিয়া রাখি যে, সোমদত্ত মহারাজার আত্মীয়, প্রিয়পাত্র এবং সৈন্যাধ্যক্ষ। রাজা হাসিয়া বলিলেন যে, সোমদত্ত তাঁহাকে বলিয়াছেন যে, কালিদাসের কবিত্ব অপেক্ষাও যেন কোন কোন অংশে ইহার কবিত্বশক্তি অধিক। মণিমালার বোধ হয় কথাটা ভাল লাগিল; তিনি বলিলেন যে উত্তর-চরিতের মত নাটক এবং মালতী-মাধবের মত প্রকরণ দুর্ল্লভ সামগ্রী। কবি ভবভূতি দেশ-পর্য্যটনে বাহির হইয়াছেন, কনোজে আর অধিক দিন থাকিবেন না, প্রভৃতি নানা কথার প্রসঙ্গের পর, মণিমালা পিতার সম্মুখে যুক্তকরে প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, "আজ আমি একটি ভিক্ষা চাহিতেছি।" রাজ্যবর্দ্ধনের বিস্তৃতরাজ্যে এমন কি আছে, যাহা মণিমালাকে ভিক্ষা করিয়া লইতে হইবে? রাজ্যবর্দ্ধন দুহিতার শিরোদেশ চুম্বন করিয়া বলিলেন, "তুমি যাহা চাহিবে, তাহাই দিব; যাচ্ঞার অপেক্ষা কি?" মণিমালা গম্ভীরস্বরে বলিলেন, "আমি ভিক্ষুণী-ব্রত গ্রহণ করিব; রাজপ্রাসাদে আর থাকিব না; আমাকে প্রসন্নমনে বিদায় দিতে হইবে।"

যাঁহার অস্ত্রের শব্দভয়ে পৃথিবী কাঁপিত, তাঁহার হৃৎকম্প হইল। রাজা উদ্দেশে সুগতকে প্রণাম করিয়া কহিলেন, "মা, সংসারে থাকিয়া কি ত্যাগিনী হওয়া যায় না? তোমার সংকল্পে বাধা দিলে মহাপাপ হইবে; কিন্তু একবার ভাবিয়া দেখ, এই দুরূহ কার্য্য তুমি করিতে পারিবে কি না?" মণিমালা স্থিরস্বরে কহিলেন, "এ সংসারে থাকিলে বাসনার নির্ব্বাণ হয় না; সুগত আমাকে কৃপা করিবেন, আমি ভিক্ষুণী হইব। আপনি অনুমতি করিলে আর তিন দিন পরেই রাজপ্রাসাদ পরিত্যাগ করিব।"

একদিকে ধর্ম্মানুরাগ,—অন্য দিকে স্নেহবন্ধন; এক দিকে সমগ্র রাজ্য, অন্য দিকে মণিমালা। রাজার মর্ম্মোচ্ছেদী ভাষা মর্ম্মে মর্ম্মে বলিতেছিল, "তোমাকে না দেখিলে বাঁচিয়া থাকিতে পারিব না", কিন্তু বাক্যস্ফূর্ত্তিও হইল না। অনেকক্ষণ পরে ঊর্দ্ধনেত্রে চাহিয়া বলিলেন, "ধর্ম্মং শরণং গচ্ছামি"; অমনি মণিমালা বলিয়া উঠিলেন "সংঘং শরণং গচ্ছামি; বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি।"

রাজপ্রাসাদের সুখ ফুরাইল; রাজত্বের সুখ ফুরাইল। রাজ্যবর্দ্ধন কন্যাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া চলিয়া গেলেন; এবং একটি বিজন কক্ষে বসিয়া বালকের মত কাঁদিতে লাগিলেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

রাজসভা।

মণিমালা ভিক্ষুণীব্রত গ্রহণ করিয়া সংসারত্যাগিনী হইবার পর, মহারাজা তদীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্দ্ধন এবং সৈন্যাধ্যক্ষ সোমদত্তকে সঙ্গে লইয়া, সভাগৃহে উপস্থিত হইলেন এবং অন্যান্য লোকদিগকে বিদায় দিয়া বহুবিধ বিষয়ে কথোপকথন আরম্ভ করিলেন। সোমদত্ত উন্মনা, কোন কথাই কহিতেছেন না; কেবল রাজার অনুরোধে বসিয়া আছেন এই পর্য্যন্ত। রাজা বলিলেন, "হর্ষবর্দ্ধন, যে ব্যক্তি রাজ-প্রাসাদে বসিয়া সুখভোগের লালসায় রাজত্ব করে, সে দস্যু এবং প্রজাঘাতক। প্রতি মুহূর্ত্তে মনে হইতেছে, যেন আমি চৌর্য্যবৃত্তি করিয়া জীবন ধারণ করিতেছি।" হর্ষবর্দ্ধন বলিলেন, "মহারাজ, আপনার মত প্রজাবৎসল কে আছে! আপনার মত অধীশ্বরলাভ

কোন্ রাজ্যের অদৃষ্টে ঘটে ?" রাজ্যবর্দ্ধন মাথা নাড়িলেন : এবং বলিলেন, "আত্মশ্লাঘায় সুখ আছে বটে কিন্তু সে সুখ ক্ষণিক মাত্র। ভারতবর্ষের হিতকামনায় কিছু করিতে হইবে। আমি যাহাতে আত্মসুখে জলাঞ্জলি দিয়া সুগতের কৃপায় ভারতবর্ষের সেবা করিতে পারি, তাহার উদ্যোগ করিব।" এই কথা শুনিয়া হর্ষবর্দ্ধন এবং সোমদত্ত উভয়েই রাজার মুখের দিকে চাহিলেন। রাজা কহিতে লাগিলেন, "দেখ, ঐই ভারতবর্ষ দিন দিন অধোগতিপ্রাপ্ত হইবে, তাহার চিহ্ন দেখা যাইতেছে। কাশ্মীর, পঞ্জাব, মালব, সর্ব্বত্র স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রাজা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। আমরা যে যাহার মত রাজা হইয়া, করসংগ্রহ করিয়া উদরপূর্ত্তি করিতেছি। ইহা অপেক্ষা অধিক স্বার্থপরতা আর কি আছে ? এই প্রকার রাজত্বকেই আমি দস্যুবৃত্তি বলি। অশোক রাজার পর আর এদেশে একছত্র রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইল না। একছত্র রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে হইলে, যদি আমার রাজ্যের ধ্বংস হয়, ক্ষতি নাই। কিন্তু ইহা ভিন্ন ভারতের স্থায়ী উন্নতির আর অন্য পন্থা নাই।" সোমদত্ত জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনি এই রাজ্য মগধ কিম্বা উজ্জয়িনীপতিকে দিলে কি ভারতে একছত্র রাজত্ব হইবে ?" রাজা কহিলেন, "তাহা নহে ; পূর্ব্বকালে দিগ্বিজয়ের প্রথা ছিল, এখন আবার তাহাই করিতে হইবে। ইহাতে রাজ্যের মধ্যে আশু অশান্তি উৎপন্ন হইবে বটে, কিন্তু দেশময় সামরিক-ভাব জাগ্রত হইবে। রাজাগণ আলস্য পরিত্যাগ করিবেন এবং এই সময়ে যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বলবান, তাঁহারই রাজত্ব স্থাপিত হইবে। আমি দিগ্বিজয় করিব।" সোমদত্ত হাসিয়া কহিলেন, "মহারাজ, রাজত্ব হইল দস্যুবৃত্তি, আর দিগ্বিজয়টা পুণ্যকর্ম্ম ?" রাজা কহিলেন, "পুণ্যকর্ম্ম বৈ কি ? যাহাতে সমগ্র ভারতবাসী একসূত্রে গ্রথিত হয় এবং একই জাতীয় বন্ধনে বদ্ধ হয়, তাহা অপেক্ষা পুণ্যকর্ম্ম আর কি আছে ? এই যুদ্ধে হয়ত কনোজের নাম চিরদিনের মত লুপ্ত হইবে ; হউক, ক্ষতি কি ? দেশহিত-যজ্ঞে আমরা সকলে ইন্ধন হইব ; এবং যজ্ঞভস্ম হইতে ভারত-মঙ্গল নব-রাজ্যের অভ্যুদয় হইবে। সোমদত্ত, তুমি সৈন্যদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দাও ; হর্ষবর্দ্ধন, তুমি রাজ্য-শাসন-ভার গ্রহণ কর।"

হর্ষবর্দ্ধন কহিলেন, "মহারাজ, আপনার মনস্কামনা পূর্ণ হউক ; আমি আপনার অনুপস্থিতিকালে ভৃত্যস্বরূপে রাজকার্য্য করিব। জিজ্ঞাসা করিতে পারি কি, আপনার জৈত্রযাত্রা প্রথমে কোন্ দিকে হইবে ?" রাজা বলিলেন, যে কর্ণসুবর্ণে এক নূতন রাজা শশাঙ্ক নরেন্দ্র নামগ্রহণ করিয়া উৎকল, তাম্রলিপ্ত এবং বঙ্গদেশ শাসন করিবার উদ্যোগ করিতেছে। প্রথমে তাহার সহিত যুদ্ধ করিবেন ; কারণ নূতন রাজার বিরুদ্ধে যাত্রা করিলে অন্য কাহারও আপত্তি হইবে না। সোমদত্ত মনে মনে ভাবিলেন যে, মণিমালা-বিহীন-সংসারে যুদ্ধই শ্রেষ্ঠ অবলম্বন। যাহা হউক, স্থির হইল যে, শীঘ্রই মহারাজার দিগ্বিজয় আরম্ভ হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়।

গঙ্গাতীরে।

সোমদত্তের নির্ভীকতা এবং বীর্য্যের সম্মুখীন হইতে পারে, এমন সেনা কর্ণসুবর্ণে ছিল না। শশাঙ্ক নরেন্দ্র গুপ্তের সৈন্যেরা পরাজিত হইয়া পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়াছিল ; কিন্তু যুদ্ধক্ষেত্রে শরবিদ্ধ হইয়া মহারাজা রাজ্যবর্দ্ধন অশ্ব পৃষ্ঠ হইতে ভূপতিত হইয়াছিলেন। সকলে ব্যস্ত হইয়া মহারাজাকে গঙ্গাতীরস্থিত শিবিরে লইয়া গেল। শিবিরে গিয়া মহারাজা একজন চরকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমাকে যে কার্য্যে পাঠাইয়াছিলাম, তাহার ফল কি হইল ?" চর ইঙ্গিতে উত্তর দিয়া কহিল, "তিনি আসিয়াছেন।" রাজা তখন সকলকে শিবিরের বাহিরে যাইতে আদেশ করিলেন। সকলে চলিয়া গেল ; তখন একজন বৃদ্ধ-ভিক্ষুর সহিত মণিমালা রাজার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন, "মণিমালা, ভাল আছ ?" মণিমালা রাজার চরণ স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "সুগত কৃপায় আমার কুশল। কিন্তু আমি তোমাকে কত কষ্ট দিয়াছি !" রাজা বৃদ্ধ সন্ন্যাসীকেও বাহিরে পাঠাইয়া দিয়া মণিমালাকে বক্ষে ধারণ করিয়া কহিলেন, "তুমি যখন ভিক্ষুণীব্রত গ্রহণ করিয়াছিলে, তখন বড়ই কষ্ট হইয়াছিল। কিন্তু বুঝিতে পারিয়াছি যে, আলস্যময় জীবন অপেক্ষা এই ব্রহ্মচর্য্যই তোমার শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। সুগত তোমার মঙ্গল

করিবেন; আমি তোমাকে সৎপথগামিনী দেখিয়া আনন্দে মরিব।" মণিমালা, মৃত্যুর কথা শুনিয়া চমকিয়া উঠিল; দেখিল তাহার বসন রাজদেহ সংস্পর্শে রক্তাক্ত হইয়াছে। মণিমালা কাঁদিয়া উঠিল। রাজা তাহাকে বুঝাইয়া বলিলেন যে, তাঁহার মৃত্যু, সুখের মৃত্যু। মণিমালা তাহা বুঝিল না। চীৎকার করিয়া উঠিল; সকলে আসিল; মণিমালা তখন পিতার অবসন্ন মস্তক ক্রোড়ে করিয়া মুখচুম্বন করিতে লাগিল। কন্যার ক্রোড়ে মাথা রাখিয়া সুগত নাম স্মরণ করিতে করিতে মহারাজা রাজ্যবন্ধন জীবন নির্ব্বাণলাভ করিলেন।

মহারাজার সৎকারাদির পর, মণিমালা বৃদ্ধ ভিক্ষুর সহিত কোথায় যে নিরুদ্দিষ্টা হইলেন, সোমদত্ত তাহা জানিতে পারিলেন না। তিনি ভাবিলেন যে, ভবভূতি-কল্পিত মাধব যেমন মালতীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, আমিও তেমনি মণিমালাকে উদ্ধার করিব। এই প্রতিজ্ঞা করিয়া সোমদত্ত সৈন্যদল পরিত্যাগ করিলেন; এবং নৈশ অন্ধকারে একাকী শিবির পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

রাজ-গৃহ।

মগধাধিপতি মাধবগুপ্ত শৈব ছিলেন, কিন্তু বৌদ্ধদিগের প্রতি সর্ব্বদাই সদ্ব্যবহার করিতেন। তাঁহা সাহায্যে এবং অনুগ্রহে, রাজগৃহে বৌদ্ধদিগের প্রভাব পূর্ব্বকালের মত অক্ষুণ্ণ ছিল। পাঠকেরা জানেন যে, এখনও রাজগৃহে অনেক পুরাতন বৌদ্ধকীর্ত্তি আছে। আজ রাজগৃহে বৌদ্ধদিগের একটি সভা আহূত হইয়াছে; এবং ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে ভিক্ষু ভিক্ষুণীগণ আসিয়া সমবেত হইয়াছেন। ভিক্ষুবেশধারী ভিক্ষুব্রতাবলম্বী সোমদত্ত, রাজগৃহে বসিয়া ভাবিতেছেন, মণিমালা কি এখানে আসিবেন না? এমন সময়ে সদাভিক্ষু নামক একজন বৃদ্ধ ভিক্ষু আসিয়া তাঁহাকে বলিলেন, "মুমুক্ষু, উদয়গিরিবাসিনী সংঘদাসী ভিক্ষুণীর নাম শুনিয়াছ? তিনি আজ অশোকচরিত গান করিতেছেন, শুনিবে চল।" সোমদত্তের মনে একই ভিক্ষুণীর নাম জাগরিত, তবুও তিনি বৃদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে গেলেন। দেখিলেন ভিক্ষুণী গাহিতেছিলেন:—

অশোককর সশোক হৃদি,
কর এ প্রাণ শান্ত রে!
আমি চরণে দলি বাসনা গুলি,
নির্ব্বাণ লভি অন্তরে।

সোমদত্ত আর দাঁড়াইয়া থাকিতে পারিলেন না; অভিভূত চিত্তে ভূতলে বসিয়া পড়িলেন। ভিক্ষুগণ সোমদত্তের ভাবপ্রবণতা দেখিয়া মনে মনে তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, সকলেরই দৃষ্টি সোমদত্তের দিকে পড়িল। ভিক্ষুণী দেখিলেন, ভিক্ষুবেশধারী ব্যক্তি সোমদত্ত। তিনি আর গান গাহিলেন না; সহসা মণ্ডলীর মধ্য হইতে চলিয়া গেলেন। মণিমালা ভিক্ষুণী হইয়া সংঘদাসী নামগ্রহণ করিয়াছেন। সংঘদাসী চলিয়া যাইবার পর, অন্য ভিক্ষু ভিক্ষুণীগণ গান গাহিলেন; সোমদত্ত জড়পুত্তলির মত কিছুক্ষণ সেখানে বসিয়া, পরে উঠিয়া গিয়া, একাকী চারিদিকে বিচরণ করিতে লাগিলেন। দেখিলেন, সংঘদাসী একাকিনী বৃক্ষতলে বসিয়া বসনাঞ্চলে মুখ আবৃত করিয়া রহিয়াছেন। নির্জ্জনতার সুবিধা পাইয়া, ধীরে ধীরে তাঁহার পার্শ্বে গিয়া ডাকিলেন, "মণিমালা!"। মণিমালা উঠিয়া দাঁড়াইতে পারিলেন না; কম্পিতস্বরে, কাতর দৃষ্টিতে, সোমদত্তের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "তুমি এই ভিক্ষুবেশ ধারণ করিয়াছ কেন?" সোমদত্ত বলিলেন, "মণিমালা, আমি তোমার জন্য বনচারী।" মণিমালা কহিলেন "আমি বিধবা; আমার পক্ষে সুখস্পৃহা লোকাচার বিরুদ্ধ এবং নিন্দনীয়। আমি আত্মসুখের জন্য নিন্দা কুড়াইব না বলিয়া, সংসারত্যাগ করিলাম; তুমি এখানে আসিয়া দেখা দিলে কেন? কতবার বলিয়াছি আমি তোমার দাসী, আমি তোমার প্রণয়প্রার্থিনী। তুমি জানিয়া শুনিয়াও নিরপরাধিনী রমণীর ব্রহ্মচর্য্যে বাধা দাও কেন?" সোমদত্ত বলিলেন, "তুমি আমার মোক্ষ, তুমি আমার নির্ব্বাণ; তোমাকে পরিত্যাগ করিলে আমার সদগতি কোথায়?" ভিক্ষুণী তখন বৃক্ষের একটা লুণ্ঠিত শাখা দুই হস্তে জোর করিয়া ধরিলেন; এবং সেই শাখায় মাথা রাখিয়া বলিলেন, "আমি বাসনা-বিনাশ করিবার জন্য এই ব্রত গ্রহণ করিয়াছি; তোমাকে ভুলিবার জন্য নির্ব্বাণসাধনা

করিতেছি।" সোমদত্ত একটুখানি অগ্রসর হইতেছেন দেখিয়া কাতরস্বরে কহিলেন, "আমাকে স্পর্শ করিও না, আমি অবলা, আমি রমণী ; আমি আত্মসংবরণ করিতে পারিব না।" সোমদত্ত বলিলেন, "তুমি যখন বৈদিক ধর্ম্ম মান না, তখন বিধবার বিবাহ হয় না, একথা স্বীকার করিবে কেন ?" মণিমালা বলিলেন, "আমি ভিক্ষুণী।" উভয়ে কথোপকথন হইতেছিল, এমন সময় সদাভিক্ষু আসিয়া বলিলেন, "ভিক্ষু ভিক্ষুণী, নির্জ্জনে পুরুষ ও রমণীর একত্র অবস্থান নীতিবিরুদ্ধ। তোমরা যে যাহার আশ্রমে গমন কর।" উভয়েই কম্পিত দৃষ্টিতে সদাভিক্ষুর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিহারে গমন করিলেন।

রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় রাজগৃহের বিহারপতি, সোমদত্তকে আসিয়া বলিলেন, "মুমুক্ষু, তোমাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। যতদিন চিত্তসংযম না হয়, আমার অনুমতি ভিন্ন এই গৃহ হইতে বাহির হইয়া কোথাও যাইতে পারিবে না।" সোমদত্ত নীরবে আদেশ শ্রবণ করিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়।

নির্ব্বাণ-সাধনা।

বসন্তের নবপল্লব প্রভাত-সমীরণে কাঁপিতেছিল ; কিন্তু কোথাও পত্রের মর্ম্মর ধ্বনি নাই। পাখীরা বুঝি গান গাহিয়া উড়িয়া গিয়াছিল ; কচিৎ কপোতকূজন ভিন্ন অন্য কিছু শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল না। খণ্ডগিরি এবং উদয়গিরির শৈলগুহা বৌদ্ধ পরিব্রাজক পূর্ণ ; কিন্তু কোথাও মনুষ্যের কণ্ঠ বা পদধ্বনি নাই। ঊষার অস্ত হইল ; অরুণোদয় হইল ; প্রভাত-সূর্য্য, তরল আলোকে বিশ্ব প্লাবিত করিল ; তখনও ভিক্ষুভিক্ষুণীগণ একাগ্রচিত্তে নির্ব্বাণ-ধ্যান করিতেছিলেন। সকলেই ধ্যানমগ্ন, কেবল শৈলপাদমূলে দেবী মণিমালা একজন পরিণতবয়স্কা ভিক্ষুণীর সহিত মৃদুকণ্ঠে কথোপকথন করিতেছিলেন। বৃদ্ধা ভিক্ষুণী বলিলেন, "তুমি সমস্ত রাত্রি একাকিনী এখানে বসিয়া ধ্যান করিয়াছ ; এত কঠোর তপস্যা কেহ কখনও করে নাই। ভগবান সিদ্ধার্থ তোমাকে সিদ্ধিদান করুন।" মণিমালা কহিলেন "মুক্ত-ভিক্ষুণী, আমার অন্তঃকরণ বাসনামগ্ন ; আমি নির্ব্বাণ-ধ্যান করিতে পারিতেছি না।" বিজনে বৃক্ষতলে সোমদত্তের সহিত মণিমালার কথোপকথনের কথা, সদাভিক্ষুর মুখে সকলেই শুনিয়াছিল। সেই কথার প্রসঙ্গ-উত্থাপন করিবার জন্যই মুক্ত-ভিক্ষুণী কথা পাড়িয়াছিলেন। একটু ভাবিয়া চিন্তিয়া বলিলেন, "ভিক্ষুণী, সোমদত্ত ছদ্মভিক্ষুবেশধারী। বিহারপতির সহিত তাঁহার যে তর্ক হইয়াছিল, তাহাতে তিনি বলিয়াছিলেন যে, সুগত মনুষ্য মাত্র, এবং উপনিষদের ধর্ম্মই চরম ধর্ম্ম। তিনি বলিয়াছিলেন যে, সুগত ঋষি, কেননা তিনি মন্ত্রদ্রষ্টা ; তিনি ঈশ্বর নহেন, কিন্তু অনন্ত করুণাময়। সে কথা শুনিয়া বিহারপতি তাঁহাকে ভিক্ষুশ্রেণী হইতে অন্তর করিয়া দিয়াছেন ; তিনি এখন সামান্য শিক্ষার্থী ধর্ম্ম-সেবক মাত্র।" মণিমালা একবার মুখ মুছিলেন ; এবং তাহার পর বলিলেন, "সেশ্বর ধর্ম্ম কি সৌগতের অগ্রাহ্য ?" বয়স্কা অনেক ভাবিয়া কহিলেন, "হয়ত সেশ্বর ধর্ম্মের সহিত আমাদের তত বিরোধ নাই ; কিন্তু সোমদত্ত কামিনী-কাঞ্চন প্রয়াসী।" মণিমালার অন্তঃকরণে ক্ষোভের সঞ্চার হইল ; তিনি কহিলেন, "যে একথা আপনাকে বলিয়াছে, সে কুদ্রষ্টা। আপনাদিগের সমগ্র বৌদ্ধ-বিহারে যদি কাঞ্চন লোভশূন্য কেহ থাকে, সে সোমদত্ত ; যদি কেহ পরম সৌগতের মত জিতেন্দ্রিয় থাকে, তবে সে সোমদত্ত।" মুক্ত-ভিক্ষুণী বলিলেন "মা, তোমার অন্তঃকরণ সোমদত্তময়। সোমদত্ত তোমার নির্ব্বাণ-ধ্যানের বিঘ্ন ; এই কথাই তোমাকে বলিতে আসিয়াছিলাম। তুমি সুগতের চরণ-ধ্যান কর, সোমদত্তকে ভুলিয়া যাও। যাও, রাণী গুহার সম্মুখে যে প্রস্তরময় সুগত-মূর্ত্তি আছে, সেখানে বসিয়া ধ্যান কর।" মণিমালা তখন মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "আমার জ্ঞানোন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে, যৌবন-প্রভাতে, যাহাকে ভাল বাসিয়াছি, তাহাকে ভুলিতে পারিব না। আমি আজ পর্য্যন্ত কখনও নির্ব্বাণ-ধ্যান করিতে পারি নাই। জাগরণে ও স্বপ্নে সেই পবিত্র-মূর্ত্তি ধ্যান করিতেছি।" প্রকাশ্যে কহিলেন "তপস্যা করিলে সিদ্ধিলাভ করিতে পারিব আশা ছিল ; কিন্তু দিন দিন চিত্তবেগ অসংবরণীয় হইয়া উঠিতেছে।" কথা কয়েকটি বলিতে বলিতে মণিমালার চক্ষু দিয়া জল পড়িল। মুক্ত-ভিক্ষুণী

বোধ হয় সম্পূর্ণ জীবন্মুক্ত জীব ছিলেন না; নারীহৃদয়-সুলভ করুণায় তাঁহার অন্তঃকরণ পরিপূর্ণ হইল। আদর করিয়া মণিমালাকে বক্ষ-সংলগ্ন করিয়া, তাঁহার পদ্মপর্ণোপম করতলে অঙ্গুলিসঞ্চালন করিতে লাগিলেন। সকলের নগর-ভ্রমণের সময় উপস্থিত হইল; উদয়গিরির নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া, প্রণাম উচ্চারিত হইল। সর্ব্বত্র একই ধ্বনি উত্থিত হইল:—"প্রণমামি সুগত তব চরণে"

এই দুইটি ভিক্ষুণীও আসনত্যাগ করিয়া উঠিলেন। একজন নগর-ভ্রমণে বাহির হইলেন, এবং অন্যজন প্রস্তরময় সুগত মূর্ত্তির উপাসনায় শৈল-আরোহণ করিলেন। মণিমালা প্রস্তরমূর্ত্তির সম্মুখে গিয়া বসিলেন, অনেক ধ্যান করিলেন; কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। তখন চক্ষুর জল ফেলিয়া সেই বিজন শৈলে একাকিনী গান গাহিতে লাগিলেন:-

তুমি থাকগো হৃদয় মাঝে হৃদয়সখা প্রাণপতি।
মুদিয়া আঁখি নিরখি আমি প্রেমময় ও মূরতি।
(আমি) পাষাণে তোমারে নাথ, গড়িতে পারিব না ত;
কোমল অতি তোমার চিত, পাষাণে গড়া আমারি মতি।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

চিল্কা-তটে।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, তখনও খণ্ডগিরির অদূরবর্ত্তী মালভূমে ভুবনেশ্বরের মন্দির নির্ম্মিত হয় নাই। হয়ত আরব্ধ হইয়াছিল মাত্র। প্রথম কেশরী রাজার পৌত্র, অনন্ত কেশরী, তখন উৎকলের রাজা। চালুক্য রাজপুতগণ অল্প দিন মাত্র রাজমহেন্দ্রি নগরীতে সিংহাসন স্থাপন করিয়াছেন; নর্ম্মদা এবং কৃষ্ণার মধ্যবর্ত্তী সমগ্র দেশ তখনও করায়ত্ত হয় নাই। কলিঙ্গ-রাজগণ রক্তবাহুর আক্রমণে পূর্ব্ব হইতেই হীনপ্রভ হইলেও, গোদাবরী হইতে চিল্কা পর্য্যন্ত ভূ-ভাগ শাসন করিতেছিলেন। এমন কি, এই সময়ের ১৫০ বৎসর পরেও, কলিঙ্গ-রাজার সমুদ্র-গামী পোত, চিল্কার বন্দরে থাকিত বলিয়া, চীন পরিব্রাজক উল্লেখ করিয়াছেন। তখন পর্য্যন্তও চিল্কা হ্রদে পরিণত হয় নাই; দেশমধ্যবর্ত্তী উপসাগররূপেই ছিল। একদিকে কেশরী রাজা, অন্য দিকে চালুক্য রাজা, নবোদ্যমে কলিঙ্গ-রাজকে পরাভূত করিতে চেষ্টা করিতেছিলেন। রাজাও এই সময়ে চিল্কা-তটে শিবির-সন্নিবেশ করিয়া অবস্থান করিতেছিলেন।

সোমদত্ত অধিক দিন রাজগৃহে বাস করিতে না পারিয়া, বৌদ্ধদল পরিত্যাগ পূর্ব্বক উৎকলক্ষেত্রে তাঁহার জীবনের আরাধ্যা মণিমালার উদ্দেশে চলিয়া আসিলেন। কিন্তু হায়! কোথায় তাঁহার মণিমালা? বৌদ্ধ পরিব্রাজকদিগের অভেদ্য দুর্গে, তাঁহার আর প্রবেশাধিকার নাই।

যেখানে পোতমালা-শোভিতা চিল্কা, তরঙ্গভঙ্গচঞ্চলা, সেই স্থানে দাঁড়াইয়া, সোমদত্ত একবার ভাবিলেন, "মরিলে হয় না?" উপসাগরের অবর্ণনীয় শোভা দেখিতে দেখিতে উপনিষদের ঋষিবাক্য মনে পড়িল—

অসুর্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনোজনাঃ।

তিনি যখন চিন্তাপরায়ণ, তখন একজন সৌম্যমূর্ত্তি যুবক তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিলেন। সোমদত্ত যখন দেখিলেন যে, এই যুবক কলিঙ্গাধিপতি, তখন আত্ম-পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হইলেন না। অনেক কথোপকথনের পর জানা গেল যে, যে বংশে সোমদত্তের জন্ম, সেই বংশেরই একজন পূর্ব্বপুরুষ, সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে, কলিঙ্গে প্রথম রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। ইতিহাস-অভিজ্ঞেরা জানেন যে, খৃঃ পূঃ ৫৫৩ সংবৎসরে, বুদ্ধদেবের দন্তগৃহীতা ব্রহ্মদত্ত কলিঙ্গ জয় করেন। সোমদত্ত রাজার অতিথি হইলেন, এবং অল্প দিনের মধ্যেই একাত্ম বন্ধুত্বে উভয়ে সম্বদ্ধ হইলেন। সোমদত্তের যুদ্ধকুশলতা তৎকালে কোথাও অবিদিত ছিল না; রাজা তাঁহাকে সেই জন্যও আদর করিয়া রাখিয়াছিলেন। সোমদত্তের প্রশান্ত মুখকান্তি ছায়াযুক্ত ছিল; রাজা সর্ব্বদাই তাহা লক্ষ্য করিতেন; কিন্তু গভীর বন্ধুত্বসত্বেও কারণ অবগত হইতে পারেন নাই।

একদিন সোমদত্ত রাজশিবির হইতে বাহির হইয়া সন্ধ্যার প্রাক্কালে লোকচারণভূমি হইতে বহু দূরে গিয়া চিল্কা তটে বসিয়া, তরঙ্গ-বিক্ষোভ-শীতল সমীরণ সেবন করিতেছিলেন। তিনি যেখানে বসিয়াছিলেন, সেখানে একটি ক্ষুদ্র শিলার আবরণ ছিল; কেহ সেখানে আসিলেও তাঁহাকে দেখিতে পাইত না। এমন সময় একজন দীর্ঘ-পক্কশ্মশ্রুধারী ব্যক্তি, একখানি নৌকা বাহিয়া, সাগর-জল-মগ্ন একটি ক্ষুদ্র শিলার উপর গিয়া দাঁড়াইল এবং ধীরে ধীরে নৌকাখানি সমুদ্র জলে ডুবাইয়া দিল। আপনার প্রত্যাগমনের পথ আপনি বন্ধ করিয়া এমন সময় কি অভিপ্রায়ে বৃদ্ধটি শিলার উপর দাঁড়াইল, বুঝিতে পারিলেন না। নানা সন্দেহ উপস্থিত হইল। সৌভাগ্যক্রমে ধীবর-দিগের আর একখানি ক্ষুদ্র নৌকা সেইখানে ছিল। নিঃশব্দে তাহাতে উঠিয়া শিলার পার্শ্বে চলিয়া গেলেন। দেখিলেন, লোকটি চিন্তামগ্ন; তাঁহাকে লক্ষ্যই করিতেছে না। পা টিপিয়া টিপিয়া তাহার পশ্চাতে গিয়া বসিলেন। লোকটি ধ্যান করিতেছিল; ধ্যান-শেষে সুগত এবং ব্রহ্মকে নমস্কার করিয়া জলে ঝাঁপ দিবার উপক্রম করিল। সোম-দত্ত দৃঢ় মুষ্টিতে তাহাকে ধরিয়া ফেলিলেন। সমুদ্র-তরঙ্গ উভয়েরই পদতল ধৌত করিতেছিল। ধৃত ব্যক্তি কহিল, "আমি আত্মত্যাগ করিয়াছি, ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছি,

আমার জীবন-নির্ব্বাণে বাধা দিবার তুমি কে?" সোমদত্ত কণ্ঠস্বর শুনিয়া চমকিয়া উঠিলেন; বলিলেন, "মণিমালা, মণিমালা, মরিও না।" চন্দ্রোদয় হইয়াছিল; চন্দ্রকিরণ-সমুজ্জ্বল সমুদ্র-তরঙ্গ, আবার আসিয়া তাঁহাদের চরণ ধৌত করিয়া দিল। কৃত্রিম পক্ককেশ সমুদ্রজলে নিক্ষিপ্ত হইল; এবং সোমদত্তের বাহুবেষ্টনবদ্ধা মণিমালা, কূলে নীতা হইলেন।

প্রবাদ আছে যে কলিঙ্গপতি, সোমদত্ত এবং মণিমালাকে বিবাহ দিয়া, কয়েকখানি গ্রামদান করিয়াছিলেন। যে গ্রামে প্রধানতঃ তাঁহাদের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল, রাজার অনুমতি লইয়া, তাঁহারা সেই গ্রামকে ব্রহ্মপুর নামে অভিহিত করিয়াছিলেন। এই কি এ কালের ব্রহ্মপুরম্?

নব-দম্পতি, স্বীয় আবাস-গৃহের পুরোভাগে একখানি প্রস্তরে একটি শ্লোক খোদিত করিয়া রাখিয়াছিলেন। সেই শ্লোকটি আর পাওয়া যায় না; কিন্তু শুনিয়াছি যে, তাহার ভাবার্থ এই যে, প্রেমই ধর্ম্ম—প্রেমেই মুক্তি।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

একটি তারকার প্রতি।

১

মেল—মেল আঁখি ঢাল, ঢাল গো সন্ধ্যার আলো—
রজত হিল্লোল আসি লাগুক পরাণে।
স্বপ্ন-স্মৃতি জাগাইতে, জাগরণে নিবাইতে,
অপার্থিব জ্যোতি তব পড়ুক নয়ানে।
কোথা আছ, অয়ি তারা, সুদূর কিরণধারা
ঢালিতেছ কার তরে—কত দিন ধরি?
কার প্রাণ পরশিছ, কারে তুলি জাগাইছ,
দেখাইছ জীবনের অপার লহরী?
সংসারের ভাঙ্গা ঘরে— আমি আছি একা পড়ে
সংসারেরই ধূলি মাঝে নিদ্রিত পরাণ,
ধরা পানে নত সৃষ্টি— দেখিনা বিশাল সৃষ্টি—
প্রাণের স্ফটিক মোর ক্রমশই ম্লান।
দিবার প্রচণ্ড আলো আমারে লাগে না ভাল,
আমি চাই নিমীলিত প্রচ্ছন্ন গোধূলি—
তোর ও সুদূর ধারা, নভ-মাঝে পথ হারা,
চির সন্ধ্যাসম রাজে হৃদয় আকুলি'।
কি মোহ আছে যে তার!— কি সম্বাদ আনি' দেয়!
ভেঙ্গে যেন দিবসের মিথ্যা জাগরণে!
ভাষাহীন কি যে কথা,— নামহীন কি যে ব্যথা,—
সুদূর বীণার বাণী চমকে জীবনে।

২

প্রীতিতে ডুবিয়া গেছে— দেখিয়াছি মা'র মুখ
অনিমেষ চেয়ে আছে তনয়ের পানে,
আঁখিতে রাখিয়া আঁখি— দেখিয়াছি গলে গেছে
প্রেমিক দম্পতী—মিশিয়াছে প্রাণে প্রাণে।
ফুলের সৌরভ হ'তে— পেয়েছি যে প্রাণে মোর
কত কি লুকান—কত অস্ফুট বারতা,
পাখীদের কলতান— আনিয়া দিয়াছে কানে
কতদূর—ওরে কত যে দূরের কথা।
কেঁদেছে আকুল হয়ে— সন্ধ্যার বাতাস হায়,
মোর হৃদয়ের ভাঙ্গা ঘরে,
রজনীর অন্ধকার— মোহময় কোলে তুলে
কত কি যে বলেছে আমারে।
শুনেছি হেমন্ত রাতে স্তব্ধ বিজনতা মাঝে
মন যবে গেছে মোর মনেরই ভিতর
শুষ্ক পত্র খসিতেছে, পশিতেছে প্রাণে যেন
মরণের পথ হ'তে অস্ফুট মর্ম্মর।
যেন মোর কানে কানে— অতিশয় সঙ্গোপনে,
তুলিয়া ফেলিয়া শ্রান্ত—কাতর নিশ্বাস
কে যেনরে বলিতেছে— "নাই, নাই,—সে যে নাই"
তার পর হু হু করে বহেছে বাতাস।
কিন্তু কভু শুনি নাই হেন অপার্থিব ভাষা
যথা তোর জ্বল জ্বল দোদুল কিরণে,
প্রেমের সন্ধান হেন মধুর -উজ্জ্বল—পূর্ণ
দেখি নাই কোথা' কোন নয়নের কোণে।
সুদূর বারতা হেন এনে কেহ দেয় নাই
যথা তোর নিব নিব ছায়াল কিরণ
উদ্ঘাটিয়া এইরূপে সৃষ্টির মরম স্থান
জীবন-রহস্য কেহ করেনি জ্ঞাপন।

৩

দিবার সে উগ্র চণ্ড— অশ্রান্ত প্রখর আলো
দেখাতে পারে না কভু যাহা,
কম্পিত, কোমল, লোল আলোক পরশে তোর
জাগিয়া উঠিছে ধীরে তাহা।
স্বপ্নময় সে আলোকে যে ছবিটি পড়িয়াছে
আমার নিথর স্বচ্ছ-প্রাণে,
পূর্ণ প্রতিবিম্ব হেন— কোথাও ফোটেনি তোর,
ত্রিজগতে আর কোন খানে।
আছে কোন জলাশয় সুপ্ত-পদ্ম স্থির-হ্রদ,
কেলিসর সংগীত মুখর,
যাহার তরল প্রাণ— ধরে তোর ছায়াখানি
স্পষ্ট যথা আমার অন্তর?

ভাবে বিভোর মোর— অতল অসীম প্রাণ,
যে আনন্দ তরঙ্গের ব্যথা,
টিল অনন্ত এই, মানব জীবন ছাড়া
ক্রীড়া পরিসর তার কোথা?

৪

নে হয়, ওরে তারা, তোরই কিরণের তলে
কবে—কোথা—কোন্ দূর দেশে,
মনই এ সন্ধ্যাকালে,— কোন্ সাগরের ধারে,
পূর্ণপ্রাণ উদার বাতাসে
রেখেছিনু কার কোলে কুসুমে জড়ান মাথা,
চেয়েছিনু কার মুখপানে,
মুদ্রের উর্ম্মি সহ হৃদয়ের উর্ম্মি মিশাইয়া
মেতেছিনু কোন মহাগানে।

৫

আলোকে আঁধারে এই— স্মৃতির গোধূলিপুরে
বেজে ওঠে শত শঙ্খধ্বনি—
কান দৃশ্য এসে পড়ে বিহ্বল নয়নপাতে?
ভেসে যায় কোথায় অবনী!
কাথাকার বিশ্ব এই,— কোন মহা নভ শিরে,
কোন দীপ্ত গ্রহ উপগ্রহ?
মাংসল—পরশপূর্ণ— কোন মহাপ্রাণ বায়ু
অসীম বিরাট মহীরুহ?
একিরে কাহার মায়া!— সম্মুখে—কালের স্রোত!
ভয়াল—প্রখর—উর্ম্মিহীন—
বিরাট বিশ্বের মূর্ত্তি অসীম হৃদয়ে তার
ফুটিছে—নিবিছে চিরদিন,
কোথা তার জ্বলিতেছে প্রখর অসীম আলো
ভানুর হৃদয় উথলয়,—
আলোকে—আঁধারে কোথা— কায়াতে মিশায়ে কায়
জাগিয়া রয়েছে যেন ভয়!

৬

হের, শ্যাম-কেশ ধরি কোন ঘুম-লোক হতে
শান্তগতি আসে নিশীথিনী!
কোথাকার স্বপ্ন-রাশি— আধ ফুটো-ভাঙ্গা ভাঙ্গা—
অনির্দ্দেশ জীবন-কাহিনী,
তারই আলোকের মত, জড়িত রহেছে তার
ছায়াময়—মায়াময় প্রাণে,
রে দুরান্তের কথা— যুগ মহাযুগ পরে—
জেগে ওঠে আধ-ঘুম' জ্ঞানে
দেখিয়া এ নিশীথিনী- বিশাল উদারকায়া
সীমাশূন্য আকাশের আগে
তরঙ্গিয়া ওঠে প্রাণ— জীবন গরজি ওঠে
নিজের দেবত্ব মনে জাগে,—

ফেলে দিই দূরে আমি তুচ্ছতা হীনতা দীন
ভেঙ্গে ফেলি পৃথিবীর কারা,
প্রদীপ্ত সন্ধানে মোর নয়ন ভাস্কর যুগ
অন্ধকারে করে প্রাণহারা!
মায়াময়ী প্রকৃতির কেশরাশি ধরি আনি
খাড়া করি সমুখে আমার,
তরন্ত নয়ানে তার স্থির আঁখি রাখি, করি
একে একে কথা তার বার।
অয়ি নিশীথিনী, ওগো অসীম বিরাট নভঃ,
তোরা অয়ি জ্যোতির সংহতি!
জানিরে তোদের আমি— পুরাণ কুটুম্ব তোরা,
জানি আমি তোদের যে গতি!
তোদের প্রাণের মাঝে— আছেরে আমার প্রাণ—
তোদের দেহেতে আছে দেহ,
কিসে তবে মাতি বল দেখিলে তোদের মুখ?
কিসে মোর উথলায় স্নেহ?
মহান্ প্রকৃতি মাঝে যা'-কিছু মহান্ আছে
সবই আমি ছিনু একদিন,—
মহান্ অচল ছিনু— মহান্ জ্যোতিষ্ক ছিনু—
ছিনু আমি নভঃ সীমাহীন!
তাইত শিহরে মন দেখিলে তোদের মায়া,
পূর্ব্ব কথা হয়রে স্মরণ,—
তোদের জীবন ডাকে মোর গত জীবনেরে,
সুর করে সুরে আবাহন,
সুদীর্ঘ জীবন পথে, যেখানেতে যেই ভাগে,
ছিনু আমি তোদের মতন,
জীবনের সেই ভাগে লাগেরে তোদের মায়া
সমানে সমানে সম্মিলন!
তানেতে মিলায়ে তান মহান মহানে ডাকে
পরাণ বাড়িয়া উঠে মোর—
বিগত জীবন দিয়ে তোদের জীবনে মিশি,
টুটে যায় ক্ষুদ্রতার ডোর।

৭

তোরই পানে চেয়ে আছি—দেখিনা দেখিনা কোন দিক,
তোরই পানে গিয়েছেরে প্রাণ;
বিশাল অনন্ত উদার এ আকাশের এতটুকু
ক্ষুদ্র এ গবাক্ষ করিতেছে দান;
বাহিরেতে চারি ধারে— গাছে গাছে ফুটে আছে ফুল,
চারিধারে বেণু বীণা গান,
ভিতরেতে তা' চেয়ে মধুর মানব-কলিকাগুলি
আধ ভাবে সুধা করে দান;
গগনের নিবিড় প্রাঙ্গণে ঘেরিয়া ঘেরিয়া তোরে
ছুটিয়াছে তারায় তারায়—

আলোকের দীপ্ত কোলাহল, ভাই বোনগুলি তোর
আনন্দেতে জগতে তাকায়;
কেহ যে তাদের পায় নাক কোন স্থান কোন সাড়া
মন্ত্রমুগ্ধ পরাণের মাঝে,
দৃষ্টির অতীত কি অনন্ত - কি চির-রহস্য স্রোত
ক্ষীণালোকে তোররে বিরাজে।

৮

এ জগতে ধূলিমাঝে— অন্ধ কারাগারে তবে
র'বনা র'বনা আর বাধা,—
মহান উদ্দেশ্য দেখি— অনন্ত জীবন ব্যাপ্ত
আজ সব ঘুচিয়াছে ধাঁধা।
দৌড়াবার স্থান এত গগন সম্মুখে মোর,
অনন্ত উচ্ছ্বাস যবে প্রাণে,
সীমা হ'তে সীমান্তরে উধাও ধায়রে প্রাণ
কেন বাঁধা রব এইখানে?
এ ধরার শুধু আমি? এই মর্ত্ত্য মাঝে বদ্ধ?
হেথায় উদয় হেথা শেষ?
ছিল না অতীত মোর? ভবিষ্যৎ নাহি কোন?
তোর আলো দেখাল বিশেষ!
আলোড়িয়া প্রাণ তাই বেদ-মন্ত্র-সম আজ
সংগীত-তরঙ্গ উথলায়,
নক্ষত্র গবাক্ষ দিয়া— দেখিরে অসীম সৃষ্টি
কাল স্রোতে গড়ি ভাঙ্গি যায়।

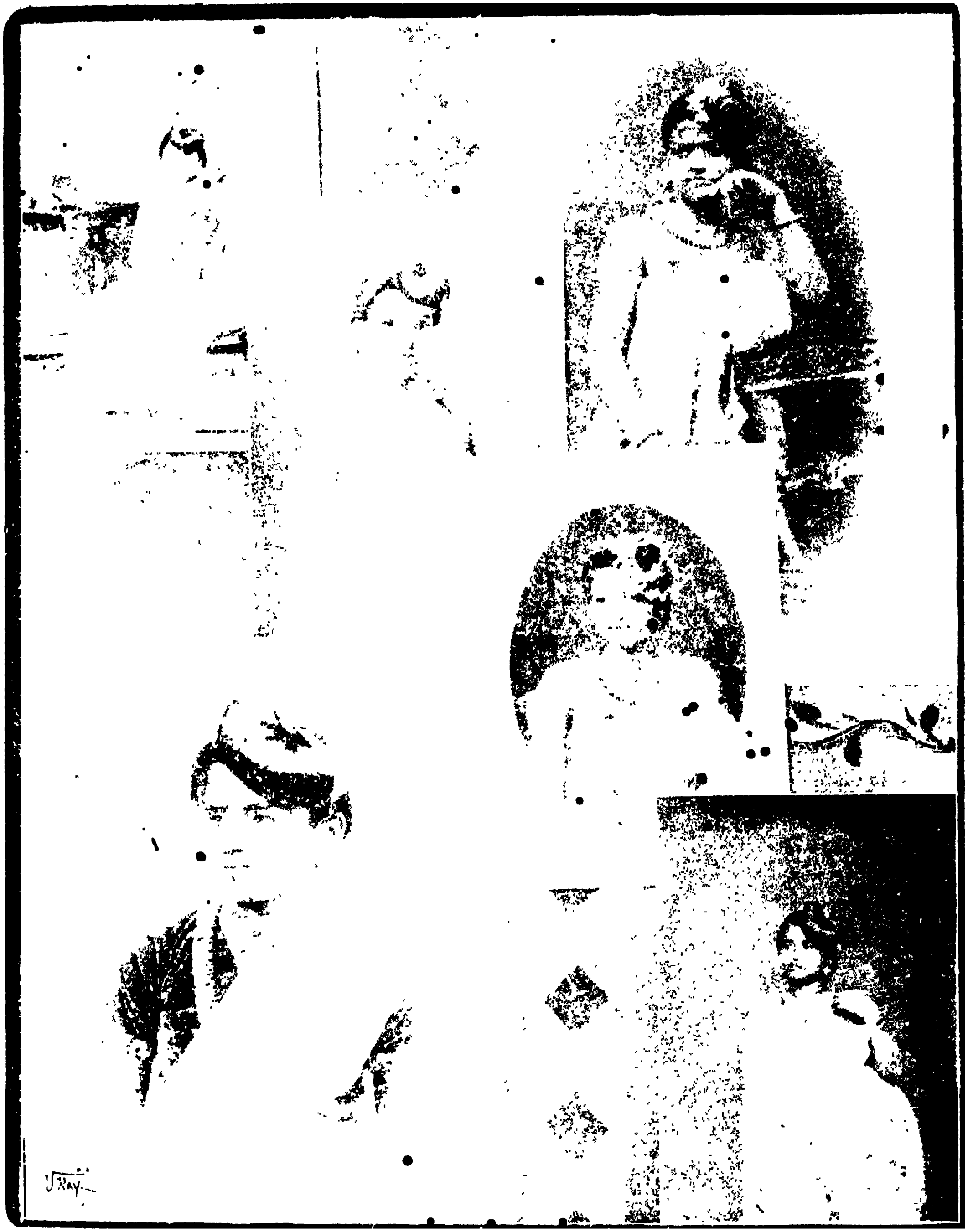
শ্রীপ্রিয়নাথ সেন।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

গত কলিকাতা কংগ্রেসের সময় শিল্প-প্রদর্শনীতে যে সকল দ্রব্য প্রদর্শিত হইয়াছিল, তাহার কয়েকটির চিত্র প্রবাসীর বর্ত্তমান সংখ্যাতে মুদ্রিত হইল। প্রদর্শনীর উদ্যোক্তারা বিখ্যাত শিল্পী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রকিশোর রায় মহাশয় দ্বারা প্রদর্শিত দ্রব্যগুলির ফটোগ্রাফ্ করাইয়াছিলেন। প্রদর্শনীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র চৌধুরী মহাশয় ফটোগ্রাফগুলি ব্যবহার করিতে আমাদিগকে অনুমতি দেওয়ায় আমরা তাঁহার নিকট সাতিশয় কৃতজ্ঞ রহিলাম। "ভারত শিল্প-সম্ভার" প্রবন্ধে শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় বলিয়াছেন, দেশীয় শিল্পের উন্নতির জন্য ক্রেতা-সংগ্রহ একান্ত আবশ্যক। কেমন করিয়া ক্রেতা-সংগ্রহ এবং আবশ্যক হইলে ক্রেতার সৃষ্টি করিতে হয়, ইংরাজ চা-করেরা তাহার দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। এণ্ড্রুযুল কোম্পানী তাঁহাদের হইয়া ভারতের প্রধান প্রধান সহরে এক পয়সা মূল্যের এক এক মোড়ক চা বিক্রয় করিয়া চা-খোর সৃষ্টি করিতেছেন। এখন লোকসান্ করিয়া এই কার্য্য চলিতেছে, পরে লাভ হইবে, এই আশা। কিন্তু আমাদের দেশী শিল্পীরা এই দৃষ্টান্তের অনুকরণ করিতে অসমর্থ। চা-করেরা ধনী, তাহারা নির্ধন; চা-করেরা একতামন্ত্রে দীক্ষিত, দল বাঁধিতে জানে, আমাদের শিল্পীদের সে দীক্ষা ও শিক্ষা নাই। সুতরাং আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়কেই এই কার্য্য করিতে হইবে। এজন্য কয়েকটী কার্য্যের অনুষ্ঠান হওয়া আবশ্যক। দেশী জিনিষ কোথায় কি দরে পাওয়া যায়, তাহার একটি তালিকা (সচিত্র হইলে ভাল হয়) প্রস্তুত করা উচিত। তৎপরে সমুদয় দ্রব্যের একটা স্থায়ী প্রদর্শনী-গৃহ হইলে ভাল হয়। প্রত্যেক বড় বড় সহরে স্বদেশী দ্রব্য-বিক্রয়ের একটা দোকান থাকা উচিত। কারণ, দূর হইতে ডাকে, রেলে, বা ষ্টীমারে কয়জন লোক জিনিষ কিনিয়া আনাইতে পারেন? আজকাল কয়েকটি সহরে স্বদেশী বস্ত্র-বিক্রয়ের দোকান হইয়াছে। সেই সকল দোকানে অন্যান্য দ্রব্যও কিছু কিছু রাখিলে ভাল হয়।

গত বৎসর "কোচিন ও ত্রিবাঙ্কোর" শীর্ষক প্রবন্ধে মালাবারের নেয়ার রমণীদের কিছু কিছু বৃত্তান্ত দেওয়া হইয়াছিল। বর্ত্তমান সংখ্যায় আমরা তাহাদের সুন্দর কেশ-রচনার ছয়খানি ছবি মুদ্রিত করিলাম। মালাবারের নেয়ারেরা সাধারণতঃ সঙ্গতিপন্ন লোক। প্রত্যেক নেয়ার-রমণীরই যথেষ্ট খাঁটি সোণার অলঙ্কার আছে। ইহারা সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে এবং চুলের খুব যত্ন করে। দাক্ষিণাত্যে হিন্দুদের মধ্যে অবরোধ-প্রথা নাই। সুতরাং রমণীগণ নিঃসঙ্কোচে প্রকাশ্য রাজপথে বাহির হইয়া থাকেন। নেয়ার রমণীগণ মালাবারের অন্যান্য জাতীয় নারীগণ অপেক্ষা সুন্দর বলিয়া বিখ্যাত।

এবার এলাহাবাদ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এণ্ট্রেন্স্ পরীক্ষায় ৪৪ জন বাঙ্গালী ছাত্র ও ৩ জন বাঙ্গালী ছাত্রী উত্তীর্ণ হইয়াছে। ছাত্রদের মধ্যে ৭ জন এবং ছাত্রীদের মধ্যে ২ জন প্রথম শ্রেণীতে পাশ হইয়াছেন। একটী বালিকা গুণানুসারে দ্বাদশ-স্থান অধিকার করিয়াছেন। স্কুল ফাইন্যাল্ পরীক্ষায় ২৩ জন ছাত্র পাশ হইয়াছেন; তন্মধ্যে ৪ জন ১ম বিভাগে। ১ জন ২য় স্থান-অধিকার করিয়াছেন। এ প্রদেশে বাঙ্গালীর সংখ্যা মূল অধিবাসীদিগের তুলনায় অল্প হইলেও, তাঁহাদের মধ্যে লেখাপড়া-জানা লোক খুব বেশী। এই জন্য অতি অল্প বাঙ্গালী পাশ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। গত বৎসর এণ্ট্রান্সে ৫০ ও স্কুল ফাইন্যালে ৩২ জন পাশ হইয়াছিল। এবার মোটের উপর ১২ জন কম পাশ হইয়াছে।



নেয়ার রমণীগণের কবরী

INDIAN PRESS.



প্রবাসী

দ্বিতীয় ভাগ। | জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৯। | ২য় সংখ্যা

কোলারের স্বর্ণখনি।

কোলার জেলা মহীসুর রাজ্যের অন্তর্গত। মাদ্রাজ রেলওয়ের বাউরিংপেট নামক ষ্টেশন হইতে স্বর্ণ-খনির দিকে দশ মাইল লম্বা একটী সোজা রেল লাইন গিয়াছে। এই লাইনটীর নাম কোলার গোল্ড ফীল্ড্স্ ষ্টেট রেলওয়ে। এই লাইনের শেষ পাঁচ মাইলের আশে পাশে সমস্ত স্বর্ণখনি। খনিসমূহের মধ্যে মহীসুর এবং চ্যাম্পিয়ন রীফ খনিই প্রসিদ্ধ। অন্যান্য খনিতে এই দুই খনির সমান লাভ হয় না। খনিসমূহ হইতে প্রতি মাসে প্রায় ৩০।৩২ মন সোণা উত্তোলিত হইয়া থাকে। মহীসুর গবর্ণমেণ্ট উত্তোলিত সোণার শতকরা পাঁচ ভাগ রাজস্বস্বরূপ প্রাপ্ত হন। ইহাতে মহীসুর গবর্ণমেণ্টের বৎসরে ১৪ লক্ষ টাকা লাভ হয়। মহীসুর এবং চ্যাম্পিয়ন রীফ্ খনিতে অত্যন্ত লাভ। এই দুই খনির অংশীদারগণের বাৎসরিক লাভের হার শতকরা ১২৫ হইতে ১৫০। অর্থাৎ এক বৎসরেই অংশীদারগণ মূল ধনের প্রায় দেড়গুণ লাভ পাইয়া থাকেন।

লোহার খনিতে লোহা পাওয়া যায় যথেষ্ট, কিন্তু তাহা অক্সিজেন প্রভৃতি অন্যান্য বস্তুর সহিত মিশ্রিত হইয়া রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই মিশ্র পদার্থ হইতে উত্তাপ দ্বারা এবং অন্যান্য উপায়ে লোহাকে পৃথক করিয়া লইতে হয়। অন্যান্য ধাতু সাধারণতঃ বিভিন্ন দ্রব্যের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে। সোণা কিন্তু অন্য কোন বস্তুর সহিত মিশ্রিত হইয়া কোন রাসায়নিক মিশ্রপদার্থ ভাবে খনিতে থাকে না। অনেক খনির ভিতর সোণার বড় বড় টুকরা (nugget) পাওয়া যায়। ক্লণ্ডাইক নামক স্থানের খনিতে সোণার টুকরা সর্ব্বদা পাওয়া যায়। কোলারে বড় বড় টুকরা এক রকম পাওয়া যায় না বলিলেই হয়, কিন্তু ছোট টুকরা অনেক সময় পাওয়া গিয়াছে। খনির অধিকাংশ সোণা কিন্তু এই ভাবে বহির্গত হয় না। সোণা অন্য বস্তুর সহিত মিশ্রিত হইয়া রাসায়নিক মিশ্র পদার্থ না হইলেও ইহার অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণাসমূহ কোয়ার্টস্ (quartz) প্রভৃতি অতি কঠিন পাথরের রেণু (particles) সকলের সহিত মিশ্রিত হইয়া থাকে। এই পাথর হইতে সোণার কণাগুলিকে বাহির করিয়া লওয়া খনির একটী প্রধান কাজ। কোলারের খনি-সমূহে স্বর্ণমিশ্রিত কোয়ার্টস্ পাথর ৩০০ হইতে ২০০০ ফুট নীচে পাওয়া যায়। প্রত্যেক খনিতে নীচে যাইবার জন্য ২।৪ বা ততোধিক গর্ত্ত বা কূপ আছে। এই গর্ত্তের এক পাশে দুই খানা করিয়া মই আছে। এক খানা নীচে যাইবার জন্য, অপর খানা উপরে উঠিবার জন্য। গর্ত্তের অপর পার্শ্বে একটী লোহার বাক্স কলের সাহায্যে উপরে উঠে এবং নীচে নামে। এই বাক্সে দাঁড়াইয়া লোক উপরে নীচে যাতায়াত করে। তা ছাড়া নীচে থেকে পাথরও এই বাক্সে পুরিয়া উপরে উঠান হইয়া থাকে।

খনির ভিতর অন্ধকারময়। খনক এবং মজুরগণ হাতে কিম্বা টুপির উপর চর্ব্বির বাতি রাখিয়া কাজ কর্ম্ম করে। কয়লার খনিতে যেমন নানা রকম গ্যাস (fire damp etc) জ্বলিয়া উঠিবার ভয় আছে, স্বর্ণখনিতে তাহা নাই। সুতরাং

স্বর্ণখনিতে কোন রকম সেফটী ল্যাম্পের (আপন্নিবারক আলোকের) ব্যবস্থা নাই। স্বর্ণখনির নিম্নের গর্ত্ত কয়লার খনির মত বহুবিস্তৃত নহে। যে দিকে স্বর্ণসংযুক্ত কোয়ার্টস্ প্রভৃতি পাওয়া যায়, কেবল সেই দিকেই গর্ত্ত করিয়া সুড়ঙ্গের মত করা হয়। খনির ভিতর যাইবার যে ২।৪ টী কূপ বা গর্ত্ত আছে, তাহার একটী হইতে অপর গুলিতে যাইবার জন্য সুবিধা আছে।

যে পাথরে সোনার পরিমাণ এত আছে যে তাহা বাহির করিলে ব্যয় কুলাইয়া লাভ দাড়াইবে, সেই সব পাথর খনি হইতে উত্তোলিত হইয়া উপরে কলঘরে যায়। এই খানে এই পাথরকে কলের সাহায্যে ময়দার মত করিয়া গুঁড়া করা হয়। এই গুঁড়ার ভিতর সোনার গুঁড়াও আছে। পাথরের গুঁড়া হইতে সোনার গুঁড়া পৃথক করিবার জন্য প্রথমতঃ মিশ্রিত গুঁড়াকে জলের সহিত মিশান হয়, পরে এই জল বড় বড় পাত্রে রক্ষিত পারার উপর নীত হয়। এক জন ইংরেজ কর্ম্মচারী পাথরের গুঁড়া মিশ্রিত জল ও পারা উভয়কে কিছুকাল উলট পালট করিয়া নাড়াচাড়া করেন। ইহার ফলে সোনার রেণুগুলি পারার সহিত মিশ্রিত হইয়া যায়। জল ও পাথরের গুঁড়া পারার উপর ভাসিতে থাকে, এবং পরে তাহা ফেলিয়া দেওয়া হয়। ক্রমান্বয়ে কিছুকাল এই রকম করিলে সোনার সহিত মিশ্রিত হইয়া পারা ক্রমেই গাঢ় হইতে থাকে। এই গাঢ় পারার নাম (amalgam) এমালগাম। এই গাঢ় পারায় যথেষ্ট সোণা থাকে। এমালগাম এখন রাসায়নিক গৃহে নীত হয়। এইখানে পারা হইতে সোণাকে পৃথক করা হয়, এবং সোণার সহিত অপর কোন ধাতু মিশ্রিত হইয়া থাকিলে সে সমস্ত পৃথক করিয়া সোনার নির্দ্দিষ্ট আকারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইট প্রস্তুত হয়। এই সব সোনার টুকরা বা ইটে প্রত্যেক খনির নাম নম্বর প্রভৃতি থাকে।

সোণা কোলারে বা ভারতবর্ষের কোথাও বিক্রয় হয় না; কোলার হইতে বোম্বাই হইয়া সোজাসুজি বিলাত যায়। প্রস্তাব হইয়াছিল বোম্বাইয়ের টাঁকশালে সভারিন প্রস্তুত হইবে। তাহা হইলে এই সোণা বোম্বাই সহরেই ব্যবহৃত হইত। কিন্তু সে প্রস্তাব কার্য্যে পরিণত হয় নাই। যে গাড়ীতে (ব্রেকভানে) সোণা বোম্বাই যায়, তাহা বিশেষ সতর্কতার সহিত প্রস্তুত। লোহার সিন্দুক গাড়ীর ফ্রেমের সহিত একত্র তৈয়ারী। দুই জন রিভলবারধারী গার্ডকে সোণার গাড়ীতে (ব্রেকভানে) সর্ব্বদা সতর্ক হইয়া থাকিতে হয়।

আমাদের দেশে প্রবাদ আছে, "লঙ্কায় সোণা সস্তা"। স্বর্ণ-লঙ্কাপুরীতে সোণা সস্তা কিনা জানিনা, তবে সাধু লোকের পক্ষে কোলারের সোণা তো সস্তা নয়ই, বরং দুষ্প্রাপ্য। তবু এক শ্রেণীর লোকের নিকট সোণা সস্তা বটে। যেখানে টাকা পয়সা কাপড় চোপড়, সেইখানেই চোর ও চুরী দেখিতে পাই; আর সোনার খনিতে কি চোর নাই?

স্বর্ণখনির চোরের বৃত্তান্ত অদ্ভুত। কি প্রকারে খনির মজুরেরা সোণা চুরি করে তাহা সবিস্তার লিখিতে গেলে পুথি বাড়িয়া যায় এবং বীভৎস রসেরও অবতারণা করিতে হয়। সুতরাং সে সমস্ত লিখিবার দরকার নাই। শুধু যে "নেটিব" কুলিই চোর তা নয়। অনেক ইংরেজ, এমন কি খনির উচ্চপদস্থ ইংরেজ কর্ম্মচারীকে চৌর্য্যাপরাধে শ্রীমন্দির দর্শন করিতে হইয়াছে।

দেশী রাজ্যে ইংরেজের মূল ধনে সোণার খনির কাজ হয়; সুতরাং তথায় বহু ইংরেজের বাস। ইহাতে সময় সময় দেশীয় রাজদরবারকে, বৃটিশ গবর্ণমেণ্টকে এবং মাদ্রাজ হাইকোর্টকেও ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। কোন দেশীয় রাজার ক্ষমতা নাই যে বৃটিশ বরন্ (British-born) প্রজার বিচার করেন। সুতরাং বৃটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে কোলার স্বর্ণখনির স্পেশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট, জষ্টিশ অব্ দি পীস্ (Justice of the Peace) নিযুক্ত হইয়াছেন। ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে ইনি রাজার ভৃত্য, সুতরাং ইঁহার ক্ষমতা নাই যে ইংরেজের বিচার করেন। তবে বৃটিশ-গবর্ণমেণ্ট-নিযুক্ত জষ্টিশ অব দি পীস্ বলিয়া ইংরেজ অপরাধীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অপরাধের বিচার করেন। বড় অপরাধের বিচার মাদ্রাজ হাইকোর্টে হয়। খনির অধ্যক্ষদিগের অনুরোধে মহীসুর গবর্ণমেণ্ট নিয়ম করিয়াছেন যে যে ব্যক্তির খনিজ পদার্থ উত্তোলনের লাইসেন্স (অনুমতি) নাই, অর্থাৎ যে খনির মালিক বা কর্ম্মচারী নয়, তাহার নিকট কোন খনিজ পদার্থ (যথা স্বর্ণময় কোয়ার্টস্ অথবা এমালগাম প্রভৃতি) পাওয়া গেলে সে ব্যক্তিকে নিজের নির্দ্দোষিতা প্রমাণ করিতে হইবে, নতুবা সে চোরাই মালের গৃহীতা বলিয়া শাস্তি পাইবে। বৃটিশ

ভারতবর্ষে এই রকম মাল যদি অন্য কোন ব্যক্তি সনাক্ত করিতে না পারে, তবে অপরাধীর দণ্ড হয় না। স্বর্ণখনিতে চুরি দমনের জন্যই কেবল কোলার জেলায় এই নিয়ম প্রচলিত হইয়াছে।

এক জন ইংরেজের টুপীটী অত্যন্ত ভারী বলিয়া সন্দেহ হওয়াতে টুপীটী পরীক্ষা করা হইলে দেখা গেল টুপীর ভিতর এক রাশ এমালগাম বা স্বর্ণমিশ্রিত পারা। সাহেব যে চুরি করিয়াছেন, তাহার প্রমাণ নাই। সাহেব টুপী খুলিয়া রাখিয়া কাজ করেন, অন্যে শত্রুতা করিয়াও এমালগাম টুপীতে রাখিতে পারে। জষ্টিশ অব্ দি পীস্ সাহেবকে চুরি অপরাধে চালান দিয়া মহীসুরের বিধান অনুসারে চোরাই মালের গৃহীতা বলিয়া শাস্তি দিলেন। সাহেব আপীল করিলেন মাদ্রাজে। হাইকোর্ট সাব্যস্ত করিলেন, হাকিম মোকদ্দমার বিচার করিয়াছেন জষ্টিশ অব্ দি পীস্ রূপে। জষ্টিশ অব দি পীস্ ভারত গবর্ণমেণ্টের ভৃত্য, তাঁহার ক্ষমতা নাই যে তিনি মহীসুরের আইনমত কাহাকেও দণ্ড দেন। অথচ হাইকোর্ট ইহাও সাব্যস্ত করিলেন যে মহীসুরের আইন অনুসারে আসামীর দণ্ড হওয়া উচিত। সাহেবের বিচার করিবে কে? ম্যাজিষ্ট্রেট রাজার ভৃত্য, ইংরেজের বিচার করিবার অধিকার তাঁহার নাই, সুতরাং চোরাই মাল গৃহীতা সাহেব বেকসুর খালাস পাইলেন।

আজ এক গাড়ীওয়ালার নিকট ২০০০ টাকার সোণা পাওয়া গিয়াছে, কাল এক কুলীর নিকট ৫০০ টাকা মূল্যের সোণার টুকরা পাওয়া গিয়াছে, এসব সংবাদ কোলার স্বর্ণখনিতে সর্ব্বদাই শুনিতে পাওয়া যায়। মহারাজার গবর্ণমেণ্ট হইতে বহু পুলিশ নিযুক্ত আছে। তা ছাড়া খনির মালিকদিগের পক্ষ হইতে কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব পুলিশ কমিশনার সর্ জন্ ল্যাম্বর্ট প্রধান পুলিশ আফিসার নিযুক্ত আছেন। বহুসংখ্যক ডিটেকটিভ ও চৌকীদার তো আছেই।

যে সব পাথরের গুঁড়াতে সোণার ভাগ কম এবং যে গুঁড়া হইতে পারার সাহায্যে অধিকাংশ সোণা বাহির করিয়া লওয়া হইয়াছে, তাহা হইতে অনেক খনিতে রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা অবশিষ্ট সোণা বাহির করা হয়। এই নূতন প্রণালীটি আবিষ্কার হওয়াতে যে সব খনিতে লোকসান হইত তাহাতেও এখন লাভ হইতেছে। পূর্ব্বে পারা দ্বারা সোণা বাহির করিবার পর অবশিষ্ট সোণা বাহির করিবার কোনও উপায় ছিল না।

আজ কাল খনির কল কারখানা সব ষ্টীমের সাহায্যে চলিতেছে। কিন্তু মহীসুর গবর্ণমেণ্ট কাবেরী নদীর জলপ্রপাত বান্ধিয়া সেই জলের বেগ হইতে তাড়িত উৎপন্ন করিবার বন্দোবস্ত করিতেছেন। কাবেরীর তাড়িতশক্তি তারের সাহায্যে কোলার স্বর্ণখনিতে আনীত হইবে এবং অল্প ব্যয়ে ষ্টীমের পরিবর্ত্তে স্বর্ণখনির কলকারখানাসমূহ তাড়িত শক্তিতে চালিত হইবে। এই বিষয় শিক্ষার জন্য মহীসুর গবর্ণমেণ্ট শিক্ষিত যুবকদিগকে আমেরিকা পাঠাইতেছেন।

কোলারের স্বর্ণখনিসমূহ আজ কাল খুব জাঁকিয়া উঠিয়াছে সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও কোলারে খনি হইতে সোণা উঠান নূতন ব্যাপার নহে। বর্ত্তমান খনিসমূহের কাজ করিতে করিতে অনেক সময় প্রাচীন খনির নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রাচীন খনির যে সব নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে দেখা যায় যে প্রাচীন হিন্দুগণ কল কারখানার সাহায্যব্যতীত ৩০০ ফুট নীচে পর্য্যন্ত পঁহুছিয়াছিলেন। মাইকেল লাভেল্লী নামক যে ইংরেজ সৈনিক খনিজ পদার্থ উত্তোলনের জন্য প্রথম অনুমতির প্রার্থনা করিয়া তাহা প্রাপ্ত হন, তিনিও নাকি লোকের মুখে প্রাচীন কালে এই খান হইতে সোণা উঠিত এই কিম্বদন্তী শুনিয়াই অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

প্রাচীনেরা ৩০০ ফুট নীচে হইতেও সোনা উঠাইয়া লাভবান হইতেন। কিন্তু প্রথম প্রথম যে সব ইংরেজ কোম্পানী সোনা তুলিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহার অধিকাংশই ২০০ ফুট নীচে যাইয়াই দেউলিয়া হইতে বাধ্য হন। কেবল মাত্র মহীসুর কোম্পানী ওষ্ঠাগত প্রাণ হইয়া কারবার চালাইতে থাকে। মহীসুর কোম্পানীর ম্যানেজার অত্যন্ত তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন লোক ছিলেন। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন আরও কিছু নীচে সোণা আছে। কোম্পানীর ১পাউণ্ড অর্থাৎ ১৫ টাকার অংশের দাম তখন হইয়াছিল ১০ পেনী অর্থাৎ দশ আনা। অংশীদারদের অধিকাংশই কোম্পানী উঠাইয়া দিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু ম্যানেজারের পীড়া-

পীড়িতে আরও কিছু মূলধন বৃদ্ধি করিয়া কাজ চালাইতে অনুমতি দেন। অল্প দিনেই অত্যন্ত স্বর্ণময় একটী স্তর পাওয়া গেল। উৎসাহে মত্ত হইয়া ম্যানেজার এই স্তরটীর নাম রাখিলেন চ্যাম্পিয়ন রীফ (Champion reef)! যে এক পাউণ্ড অংশের দাম এক দিন দশ আনা ছিল, আজ কাল সেই এক পাউণ্ড অংশের দাম ১১।১২ পাউণ্ডের কম নহে, অর্থাৎ দশ আনা হইতে অংশের দাম এখন ১৮০ টাকা হইয়াছে।

চ্যাম্পিয়ন রীফ নামক স্তরের পাথরে সোণা স্যাকরাদের কষ্টি পাথরের গায়ের সোণার মত চক্ চক্ করে। লেখকের সম্মুখে এক জন মজুর চ্যাম্পিয়ন রীফের ২ইঞ্চি লম্বা ২ইঞ্চি চওড়া এবং ১ইঞ্চি পুরু পরিমাণের এক টুকরা পাথর লইয়া পলাইতেছিল। পুলিশ তাহাকে ধৃত করিল। যাঁহারা এবিষয়ে অভিজ্ঞ তাঁহারা অনুমান করিলেন পাথরের টুকরাটাতে ৪।৫ টাকার সোণা আছে। স্বর্ণখনির আশ পাশের পাহাড়ে জঙ্গলে সোণাচোরদের নানা রকম আড্ডা আছে। অনেক জায়গায় পারা এবং রাসায়নিক প্রক্রিয়ার উপকরণাদিও চোরদের নিকট পাওয়া গিয়াছে।

যে স্থানে স্বর্ণখনি, সে স্থান অত্যন্ত অনুর্ব্বর; প্রস্তরময় মরুভূমি ব্যতীত আর কিছুই নহে। কিন্তু আজ কাল এই মরুভূমিতে রেল, টেলিগ্রাফ, টেলিফোন, বৈদ্যুতিক আলো, ট্রামওয়ে, হোটেল, বাজার, দোকান, প্রভৃতি বসিয়াছে। হাজার হাজার লোক এইখানে জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছে। মহীসুর গবর্ণমেণ্ট ৫ মাইল লম্বা ১ মাইল চওড়া মরুভূমি হইতে বৎসরে ১৪ লক্ষ টাকা রাজকর পাইতেছেন।. তা ছাড়া গোল্ড্‌ফীল্ডস্ রেলওয়ের আয় আছে।

কোন কোন স্বর্ণখনির ভিতরের কয়েকটি চিত্র দেওয়া গেল। ম্যাগ্নীশিয়ামের ক্ষণিক আলোকের সাহায্যে গৃহীত তমসাচ্ছন্ন খনিগর্ভের ফোটোগ্রাফ হইতে চিত্রগুলি প্রস্তুত হইয়াছে। কোন চিত্রে চাপসংযোগে ঘনীকৃত বাতাসের (compressed air) সাহায্যে প্রস্তর বেধক (rock drill) দ্বারা পাথরে ছিদ্র করা হইতেছে, কোনটীতে পাথর উপরে উঠাইবার জন্য লোহার বাক্স রহিয়াছে, ইত্যাদি।

শ্রীসতীশচন্দ্র মৌলিক।

বৈশ্যবর্ণ।

[১]

মহর্ষি মনুর কাল হইতে ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চতুর্ব্বর্ণে বিভক্ত হইয়াছেন। এই চতুর্ব্বর্ণের অনুলোম ও প্রতিলোম যৌন সংমিশ্রণে কাল ক্রমে কতকগুলি 'স্পৃশ্য' বা 'অস্পৃশ্য' শঙ্কর জাতির উৎপত্তি হয়। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বর্ণ ব্যতীত বর্ত্তমানকালে ভারতবর্ষে জাতির সংখ্যা অগণ্য।

চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে শূদ্রের সামাজিক অবস্থা অতীব হীন। 'স্পৃশ্য' বা জলাচরণীয় শূদ্রজাতি হইতে 'অস্পৃশ্য' শূদ্রজাতি পর্য্যন্ত সকলেই শূদ্র নামে অভিহিত হইয়া থাকে। তবে যাঁহারা স্পৃশ্য, তাঁহারা অস্পৃশ্য শূদ্রজাতি হইতে আপনাদের পার্থক্যরক্ষার জন্য, প্রায়শঃ আপনাদিগকে "সৎশূদ্র" নামে পরিচিত করিয়া থাকেন।

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য, এই তিন বর্ণই শাস্ত্রে ও সমাজে দ্বিজাতি বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। সমাজে ইঁহাদের প্রভূত প্রতিপত্তি, সম্মান ও অধিকার। এই বর্ণত্রয়েরই বেদাদি শাস্ত্রাধ্যয়নে এবং দান ও যজ্ঞে সমান অধিকার আছে। কিন্তু তাহা হইলেও বৈশ্য হইতে ক্ষত্রিয় শ্রেষ্ঠ এবং ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণই চতুর্ব্বর্ণের গুরু এবং শাস্ত্রে "ভূদেব" নামে আখ্যাত হইয়াছেন। সমাজে ব্রাহ্মণের প্রতিপত্তি, সম্মান ও অধিকারের সীমা নাই।

এই বর্ণত্রয় ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই দৃষ্ট হইয়া থাকেন এবং যথাসাধ্য স্ব স্ব ধর্ম্মও পালন করেন। বঙ্গদেশে আর্য্যগণের শুভাগমনের সময় এই বর্ণত্রয়ও যে এদেশে আসিয়া বসতি করেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু নানাকারণে, বর্ত্তমানকালে বঙ্গদেশে এক ব্রাহ্মণবর্ণ ব্যতীত, শাস্ত্রোক্ত সমগ্র লক্ষণদ্বারা ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য বর্ণকে সহজে চিনিবার উপায় নাই। পরন্তু এই দুই বর্ণ যে এদেশে বিদ্যমান আছেন, তাহা নিঃসন্দেহ রূপে বলা যাইতে পারে। হয়ত তাঁহারা সামাজিক ও রাজনৈতিক নানা প্রকার বিপ্লববশতঃ স্ব স্ব ধর্ম্ম ও বৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া শূদ্রাচারী হইয়াছেন। শূদ্রাচারে অভ্যস্ত হইয়া তাঁহারা এতাবৎকাল আপনাদের ক্ষত্রিয়ত্ব ও বৈশ্যত্ব প্রতিপাদনের কোনও আব-



সিঁড়ি।　　　　　　　　　　　　　　　　প্রস্তর-বেধক।



চিত্রের দক্ষিণ পার্শ্বে পাথর তুলিবার লৌহ বাক্স।



চাপযুক্ত বায়ুচালিত প্রস্তর-বেধক।

[Comprssed air rock-drill.]



মজুরেরা হাতুড়ি দিয়া পাথর ভাঙ্গিতেছে

শুকতা অনুভব করেন নাই। কিন্তু তাহা হইলেও, শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ, জাতীয় বৃত্তি এবং কিম্বদন্তী প্রভৃতি দ্বারা তাঁহারা যে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যবংশসম্ভূত, তাহা প্রমাণিত হইতে পারে।

বঙ্গদেশে কায়স্থজাতি আপনাদিগকে ক্ষত্রিয় বলিয়া প্রমাণিত করিতে যত্নবান্ হইয়াছেন। এতদুদ্দেশ্যে, ইঁহারা সভাসমিতির অনুষ্ঠান করিয়া নানা প্রকার শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি সংগৃহীত করিতেছেন। সামাজিক প্রতিপত্তি স্থাপনই এই আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য হইলেও, সাংতিতিক ভাবে যে ইহার কিছু মাত্র মূল্য নাই, তাহা স্বীকার করা যায় না। কায়স্থজাতি ক্ষত্রিয় কি না, তাহা সঙ্কলিত শাস্ত্রীয় প্রমাণাদির আলোচনা করিয়া সুধীবর্গই বিচার করিবেন। কিন্তু কায়স্থজাতি যদি বঙ্গদেশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া গণ্য হয়েন, তাহা হইলে কোন্ জাতি, বা কোন্ কোন্ জাতি, বঙ্গদেশীয় বৈশ্যবর্ণের অন্তর্গত, তাহাও বিচার্য্য। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিবার ইচ্ছা আছে। কিন্তু এই আলোচনায় সহসা প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে বর্ত্তমান জাতিবিভাগতত্ত্বের মূলানুসন্ধান করা, বোধ করি, নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। এই কারণে সর্ব্বাগ্রে আমরা আর্য্যসমাজের আদিম ইতিহাসের যৎসামান্য আলোচনা করিব।

বৈদিক যুগ।

ঋগ্বেদসংহিতাই যে আর্য্যগণের প্রাচীনতম গ্রন্থ, তাহা সর্ব্বদেশীয় পণ্ডিতবর্গ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। এই পবিত্র গ্রন্থে, প্রাচীন আর্য্যসমাজের যে একটী সুন্দর মনোজ্ঞ চিত্র অঙ্কিত আছে, বৈদিক পণ্ডিতেরা বহু গবেষণাদ্বারা তাহা উদ্ধার করিয়া লোকসমাজে প্রকটিত করিয়াছেন। সেই চিত্রদর্শনে আমরা বুঝিতে পারি যে, প্রাচীন আর্য্যসমাজে বর্ত্তমান কালের ন্যায় কোনও বর্ণবিভাগ ছিল না। ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের তখনও সৃষ্টি হয় নাই। সকলেই এক জাতি ছিলেন। সকল কর্ম্মেই সকলের সমান অধিকার ছিল। স্ত্রী পুরুষে সকলেই উপবীত ধারণ করিতেন।* সকলেরই দেবোপাসনায় সমান অধিকার ছিল। উপাস্য দেবতাকে ইঁহারা প্রথমে অসুর * বলিতেন। কালক্রমে গৃহবিবাদসূত্রে আর্য্যগণ দুইদলে বিভক্ত হইলে, একদল আপনাদের উপাস্য দেবতাকে কেবলমাত্র "অসুর" এবং অপর দল (অর্থাৎ ভারতীয় আর্য্যগণের পূর্ব্বপুরুষেরা) আপনাদের উপাস্য দেবতাকে কেবলমাত্র "দেব" বলিতে লাগিলেন। এইরূপে ইঁহারা দুইদলে বিভক্ত হইলেন বটে, কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে কোনও জাতিবিভাগ হইল না। সকলেই আর্য্যনামে অভিহিত হইতেন। আর্য্য ব্যতীত তৎকালে আর একটী জাতি ছিল; তাহারা অনার্য্য জাতি। এই জাতিকে আর্য্যেরা রাক্ষস, দস্যু প্রভৃতি নামে অভিহিত করিতেন। ইহারা নরখাদক ও অতিশয় দুর্ব্বৃত্ত ছিল এবং সর্ব্বদাই নানা প্রকার অত্যাচার দ্বারা কুশলতাপ্রিয় আর্য্যগণকে উপদ্রুত করিত। আর্য্যেরা ইহাদের বিনাশ বা পরাভবের নিমিত্ত দেবগণের নিকট প্রার্থনা করিতেন এবং অস্ত্রধারণ করিয়া প্রায়শঃ ইহাদের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইতেন।

দেবোপাসনা ও যুদ্ধ ব্যতীত আর্য্যগণ কৃষি এবং পশুপালন কার্য্যেও ব্যাপৃত থাকিতেন। প্রকৃত প্রস্তাবে, এই দুই কার্য্যই ইঁহাদের প্রধান কার্য্য ছিল। পণ্ডিতবর্গ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, যে ধাতু হইতে "আর্য্য" শব্দের বুৎপত্তি হইয়াছে, তাহার অর্থ কৃষিকার্য্য। সুতরাং আপনাদের বৃত্তি হইতেই যে ইঁহারা আপনাদিগকে "আর্য্য" নামে পরিচিত করিতেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। অসভ্য অনার্য্যজাতিরা কৃষিকর্ম্ম না করিয়া মনুষ্য ও পশুহনন দ্বারা উদরপূর্ত্তি করিত। এই কারণে সভ্য আর্য্যগণ ইহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন এবং "মনুষ্য" নামেও অভিহিত করিতেন না। আর্য্যেরা মনুষ্যকে "কৃষ্টয়ঃ" বলিতেন। † কৃষ্টয়ঃ অর্থে কৃষকও বুঝায়। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে "আর্য্য", "কৃষ্টয়ঃ" প্রভৃতি শব্দ দ্বারা কেবল কৃষিকর্ম্মকারী সভ্য মনুষ্যই বুঝা যাইত। ঋগ্বেদে সভ্য মনুষ্য অর্থে "বিশঃ" শব্দও প্রযুক্ত হইয়াছে। স্মৃতির যুগে এই বিশ শব্দ কেবল যে বৈশ্য অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহারও সুস্পষ্ট প্রমাণ আছে।

পশুপালনই সভ্যতার প্রথম সোপান বলিয়া বিবেচিত হয়। মনুষ্য অসভ্যাবস্থায় যদৃচ্ছাক্রমে বন হইতে বনান্তরে

* আর্য্যজাতির একটী শাখা পারসীকগণ। ইঁহাদের মধ্যে স্ত্রীপুরুষে আজিও উপবীত ধারণ করিয়া থাকেন।

* ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলের, ২৪শ সূক্তের ১৪শ ঋক্ দেখুন।

† প্রথম মণ্ডলের ৪র্থ সূক্তের ৬ষ্ঠ ঋক্ দেখুন।

ভ্রমণ করিয়া পশুহননপূর্ব্বক কোনও রূপে প্রাণধারণ করে। কিন্তু পশুহনন বহু আয়াসসাধ্য এবং সর্ব্বসময়ে ও সর্ব্বত্র পশু সুলভও নহে। এই কারণে, বুদ্ধিজীবী মানব প্রথমতঃ পশুদিগকে বশতাপন্ন করিয়া পালন করিবার চেষ্টা করিয়া থাকিবে। কতকগুলি পশু পালিত হইলে, জীবনযাত্রানির্ব্বাহের জন্য সর্ব্বদা হাহাকার করিয়া বেড়াইতে হয় না। পশুর দুগ্ধ ও মাংসে ক্ষুন্নিবৃত্তি হইতে পারে, তাহার পুরীষে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইতে পারে, এবং তাহার চর্ম্মে শীতের দারুণ প্রকোপও নিবারিত হইতে পারে।* অতএব পশুপালনজন্যই যে আদিম মনুষ্য তৎপর ও যত্নবান ছিল, তাহা বেশ বুঝা যাইতেছে। পশুপালন ও পশুরক্ষাই তাহার সর্ব্বপ্রধান কার্য্য ছিল। পশুদিগকে লইয়া সে একস্থান হইতে অন্যস্থানে যাইত। যেখানে সুস্বাদু জল ও "শোভনীয় তৃণযুক্ত" ভূমি আছে, সেই স্থানেই সে পশুদিগকে লইয়া গমন করিত এবং যাহাতে দস্যুরা তাহার পশুগণকে হরণ বা বিনাশ না করে, তজ্জন্য সে দেবতাগণের নিকট প্রার্থনা করিত।

কালক্রমে মানব যখন কৃষিকর্ম্ম শিক্ষা করিল, তখন পশুপালন তাহার পক্ষে আরও অধিকতর রূপে প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল। পশুর সাহায্য ব্যতিরেকে ভূমি কর্ষিত হয় না; পশুর পুরীষ ব্যতিরেকে ভূমির উর্ব্বরা শক্তি বৰ্দ্ধিত হয় না এবং পশুর সাহায্য ব্যতিরেকে শস্যও গৃহাগত হয় না। অতএব আদিম সমাজের মনুষ্যের পক্ষে পশু যে নিতান্ত প্রয়োজনীয়, তাহা বিলক্ষণ বুঝা যাইতেছে। * ঋগ্বেদে আর্য্যসমাজের যে বিবরণ আছে, তাহাতে দেখা যায় যে আর্য্যগণ কৃষি ও পশুপালনকেই জীবনযাত্রানির্ব্বাহের পক্ষে প্রধান কর্ম্ম বলিয়া গণ্য করিতেন এবং যাহাতে তাঁহাদের পশুকুল রক্ষিত ও বৰ্দ্ধিত হয় এবং যবাদি শস্যসকল নির্ব্বিঘ্নে গৃহাগত হয়, তজ্জন্য তাঁহারা দেবগণের নিকট নিরন্তর প্রার্থনা করিতেন। নিম্নে এ সম্বন্ধে কতিপয় প্রমাণ উদ্ধৃত হইতেছে। যথা—

"আইস, আমরা গাভী অভিলাষে ইন্দ্রের নিকট গমন করি; তিনি হিংসক রহিত এবং আমাদিগের প্রকৃষ্ট বুদ্ধি প্রেরণ করেন; অনন্তর তিনি এই গোরূপ ধন সম্বন্ধে আমাদিগকে উৎকৃষ্ট জ্ঞান প্রদান করেন।"

—১ অষ্টক, ৪ অধ্যায়, ১ মণ্ডল, ৫৬ সূক্ত।

"স্বামিরূপ ইন্দ্র যাহাকে ইচ্ছা করেন, তাঁহার নিকট গাভী প্রেরণ করেন। হে প্রকৃষ্টবুদ্ধিযুক্ত ইন্দ্র, আমাদিগকে প্রভূত ধনদান করিয়া আমাদিগের নিকট ব্যাপারীর মত হইত না। (অর্থাৎ গাভীর মূল্য চাহিও না। সায়ন)।"—ঐ ঐ

"বিঘ্নকারী শত্রুদিগকে অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে লইয়া যাও। সুখগম্য শোভনীয় পথ দ্বারা আমাদিগকে লইয়া যাও। শোভনীয় তৃণযুক্ত দেশে আমাদিগকে লইয়া যাও; পথে যেন নূতন সন্তাপ না হয়।"—১ মণ্ডল, ৪২ সূক্ত, পূষা দেবতা।

"অদিতি আমাদিগের জন্য, পশুর জন্য, মনুষ্যের জন্য, গাভীর জন্য এবং আমাদিগের অপত্যের জন্য রুদ্রীয় ঔষধি প্রদান করেন।

"আমাদিগের অশ্ব, মেষ, মেষী, পুরুষ, স্ত্রী ও গোজাতিকে সুখ প্রদান করেন।"—১ মণ্ডল, ৪৩ সূক্ত, রুদ্র দেবতা।

"হে উষা, আমাদিগকে প্রভূত ও বহুবিধ রূপযুক্ত ধনদান কর এবং গাভীদান কর।"—১ মণ্ডল, ৪৮ সূক্ত, উষা দেবতা।

"হে ইন্দ্র, তুমি অশ্ব দান কর, গো দান কর, যবাদি ধান্য দান কর। হে ইন্দ্র, এই দীপ্ত হব্যসমূহ ও এই সোমরসসমূহে তুষ্ট হইয়া গো এবং অশ্বযুক্ত ধনদান করিয়া আমাদিগের দারিদ্র্য দূর করিয়া প্রসন্নমনা হও।"—১ মণ্ডল, ৫৩ সূক্ত, ইন্দ্র দেবতা।

---

* আফ্রিকা মহাদেশের মহারণ্যসমূহে মানবজাতির ক্রমোন্নতির ইতিহাস সঙ্কলনের বিশেষ সুবিধা আছে। এই মহারণ্যসমূহে গৃহহীন অরণ্যচারী দুর্দ্দান্ত রাক্ষস হইতে আরম্ভ করিয়া গোপালক ও কৃষিকর্ম্মকারী অপেক্ষাকৃত সভ্য মানব পর্য্যাপ্ত দৃষ্ট হয়। রাক্ষসেরা দলবদ্ধ হইয়া অরণ্যমধ্যে বিচরণ করে এবং অসহায় মনুষ্য বধ করিয়া কিম্বা গবাদি পশু হরণ করিয়া তদ্দ্বারা কোনওরূপে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। গোপালক ও কৃষকেরা ইহাদের উপদ্রব ও অত্যাচারে সর্ব্বদাই জর্জ্জরিত হয় এবং সশঙ্ক থাকে। বৈদিক আর্য্যগণও দস্যু ও রাক্ষসগণের অত্যাচারে এইরূপ সশঙ্ক থাকিতেন এবং তাহাদের বিনাশের নিমিত্ত দেবতাগণের নিকট প্রার্থনা করিতেন। বৈদিক যুগে আর্য্য ও অনার্য্যের যেরূপ সংঘর্ষ হইয়াছিল, বর্ত্তমানকালে আফ্রিকা মহাদেশেও সভ্য ও অসভ্য মানবের সেইরূপ সংঘর্ষ হইতেছে। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ অবগত হইবার নিমিত্ত পাঠকবর্গ H. Stanley প্রণীত In Darkest Africa প্রভৃতি গ্রন্থ পাঠ করিবেন। লেখক।

"আমাদিগের গৃহ হইতে দুগ্ধবতী গাভীসমূহ যেন বৎস হইতে পৃথক্ হইয়া কোন অগম্য স্থানে যায় না।"—১ মণ্ডল, ১২০ সূক্ত, অশ্বিদ্বয় দেবতা।

"হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা আর্য্য মনুষ্যের জন্য লাঙ্গলদ্বারা (চাষ করাইয়া), যব বপন করাইয়া ও অন্নের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া এবং বজ্র দ্বারা দস্যুকে বধ করিয়া, তাহার প্রতি বিস্তীর্ণ জ্যোতিঃ প্রকাশ করিয়াছ।"—ঐ, ১১৭ সূক্ত, অশ্বিদ্বয় দেবতা।

(হে অগ্নি) "শোভনীয় ক্ষেত্রের জন্য, শোভনীয় মার্গের জন্য এবং ধনের জন্য তোমাকে অর্চনা করি।"—ঐ, ৯৭ সূক্ত, অগ্নিদেবতা।

"হে অগ্নি ও সোম, যে তোমাদিগকে স্তুতি অর্পণ করিতেছে, তাহাকে বলবান গো ও সুন্দর অশ্ব প্রদান কর।"—ঐ ৯৩ সূক্ত, অগ্নি ও সোম দেবতা।

"হে দস্র অশ্বিদ্বয়, আমাদের গৃহ গাভীপূর্ণ ও রমণীয় ধনপূর্ণ করিবার জন্য সমান মনোযোগী হইয়া তোমাদের রথ আমাদের গৃহাভিমুখে প্রবর্ত্তিত কর।"*—ঐ ৯২ সূক্ত, অশ্বিদ্বয় দেবতা।

আমরা ঋগ্বেদ সংহিতা হইতে যদৃচ্ছাক্রমে উদ্ধৃত অনুবাদগুলি সংগৃহীত করিলাম। যদি অনুবাদ যথার্থ হইয়া থাকে, তাহা হইলে, কৃষি ও পশুপালনকেই পূজ্যপাদ আর্য্যগণ যে আপনাদের প্রধান কর্ম্ম বলিয়া গণ্য করিতেন, তাহা পাঠকবর্গ নিঃসন্দেহরূপে বুঝিতে পারিবেন। যে মহাভাগ ঋষিগণ পূর্ব্বোক্ত ঋকসমূহ রচিত করিয়াছিলেন, তাঁহারাই গাভীর জন্য, যবাদি শস্যের জন্য, অশ্ব ও মেষ মেষীর জন্য এবং শোভনীয় তৃণযুক্ত ক্ষেত্রের জন্য দেবতাগণের নিকট প্রার্থনা করিতেছেন। সুতরাং তাঁহারাও যে কৃষিকর্ম্ম ও পশুপালন করিতেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ কি?

ফলতঃ প্রাচীন আর্য্যসমাজে কৃষি ও গোপালন যে নিন্দনীয় কর্ম্ম ছিল না, তাহা পূর্ব্বোক্ত কতিপয় ঋকের উদ্ধৃত অনুবাদ হইতে সুস্পষ্ট বোধগম্য হইতেছে। যখন কোনও জাতিবিভাগ নাই, তখন সকলেই সকল কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে কোনও সঙ্কোচ অনুভব করেন না। যিনি পশুপালন ও কৃষিকর্ম্ম করিতেছেন, তিনিই আবশ্যক হইলে অস্ত্র ধারণ করিয়া শত্রুর সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতেছেন। আবার দেশে যখন শান্তি বিরাজ করিতেছে, তখন তিনিই আবার ঋক্ সূক্ত রচনা করিয়া দেবগণের উদ্দেশে স্তুতিগান করিতেছেন কিম্বা সোমরস প্রস্তুত করিয়া যজ্ঞবেদীর উপর অগ্নি প্রজ্বালন পূর্ব্বক দেবগণকে তাহা প্রদান করিতেছেন। আবশ্যক হইলে, ইঁহারাই প্রয়োজনের অতিরিক্ত কৃষিলব্ধ শস্যাদি অপরকে বিক্রয় করিতেছেন, কিম্বা তৎসমুদায় নৌকা বা পোতের সাহায্যে বাণিজ্যার্থ ভিন্ন দেশে লইয়া যাইতেছেন। ঋগ্বেদে সমুদ্রযাত্রী বণিকের উল্লেখ অনেক স্থলে দৃষ্ট হয়। যথা—

"ধনার্থী বণিকেরা যেরূপ (সকল দিকে) সঞ্চরণ করিয়া সমুদ্র ব্যাপিয়া থাকে, হব্যবাহী স্তোতাগণ সেইরূপ সেই ইন্দ্রকে সকলদিকে ব্যাপিয়া রহিয়াছে।"—১ মণ্ডল, ৫৬ সূক্ত।

"ধনলুব্ধ লোক যেরূপ সমুদ্রে নৌকা প্রেরণ করে, ঊষার আগমনে যে রথসমূহ সজ্জীকৃত হয়, ঊষা তাহা সেইরূপে প্রেরণ করেন।"—ঐ৪৮ সূক্ত, ঊষা দেবতা।

"কোনও ম্রিয়মাণ মনুষ্য যেরূপ ধনত্যাগ করে, সেইরূপ তুগ্র অতি কষ্টে তাহার পুত্র ভুজ্যুকে সমুদ্রে পাঠাইলেন। হে অশ্বিদ্বয়, তোমরা আপনাদের নৌকাসমূহ দ্বারা তাহাকে ফিরাইয়া আনিয়াছিলে। সে নৌকা জলে ভাসিয়া যায়; তাহাতে জল প্রবেশ করে না।"—ঐ ১১৬ সূক্ত ৩য় ঋক্।

"হে অশ্বিদ্বয়, শতদাঁড়যুক্ত নৌকায় ভুজ্যুকে রাখিয়া তাহাকে গৃহে আনিয়াছিলে।"—ঐ ঐ ৫ম ঋক্।

উদ্ধৃত অনুবাদ হইতে দেখা যাইতেছে যে প্রাচীন আর্য্যগণ বাণিজ্যার্থ সমুদ্রযাত্রাও করিতেন। এইরূপে প্রয়োজনানুসারে আর্য্যগণ সূত্রধর, কর্ম্মকার, তন্তুবায় প্রভৃতিরও কর্ম্ম করিতেন। বস্ত্রবয়ণ, সূত্রকর্ত্তন প্রভৃতি কার্য্য প্রায়শঃ মহিলাদিগের দ্বারাই সম্পাদিত হইত। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে বৈদিক যুগে কর্ম্মানুসারে জাতিবিভাগ হয় নাই। সুতরাং আর্য্যগণ এই সমস্ত কার্য্যসম্পাদনকে হীনতার পরিচায়ক মনে করিতেন না। কর্ম্মানুসারে কিরূপে জাতিবিভাগ প্রবর্ত্তিত হইল, তাহা প্রবন্ধান্তরে আলোচনা করিব। এক্ষণে অস্মদ্দেশীয় ও য়ুরোপীয় পণ্ডিতবর্গ ঋগ্বেদের আলো-

* এই সমস্ত অনুবাদ শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র দত্তের কৃত ঋগ্বেদের বঙ্গানুবাদ হইতে গৃহীত হইল।

চনা করিয়া জাতিবিভাগসম্বন্ধে কিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহারাই যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

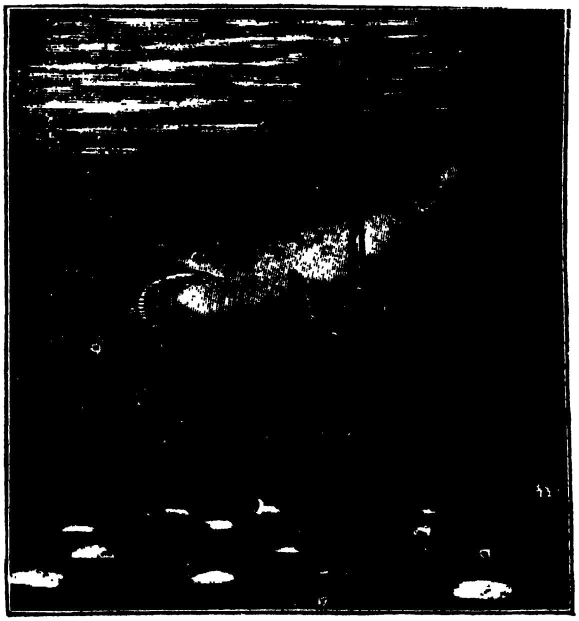
পণ্ডিত রমানাথ সরস্বতী ১২৮৪ সালে ঋগ্বেদের যে অনুবাদ করেন, তাহার প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় খণ্ডে (৩৬।৩৭২) স্পষ্টই বলিয়াছেন যে "প্রাচীন কালে ইদানীন্তন জাতিবিভাগের কোনও নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায় না।" প্রখ্যাতনামা পাশ্চাত্য পণ্ডিত ওয়েবর (Weber) ঋগ্বেদরচনাকালের সামাজিক অবস্থার উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, "এই সময়ে, জাতিবিভাগ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। সকলেই এক জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন এবং আপনাদিগকে "বিশ" নামে অভিহিত করিতেন।" * সুবিখ্যাত পাশ্চাত্য পণ্ডিত মোক্ষমূলর আজীবন সংস্কৃত সাহিত্যালোচনায়, বিশেষতঃ বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যয়নে, ব্যাপৃত ছিলেন। জাতিবিভাগ সম্বন্ধে তাঁহার মত সকলের বিদিত হইলেও, এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ করা যাইতেছে। তিনি বলিয়াছেন—"প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদির আলোচনা করিয়া যদি এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা যায় যে, মনুসংহিতায় এবং বর্ত্তমানকালে যেরূপ জাতিবিভাগ দৃষ্ট হয়, সেইরূপ জাতিবিভাগ কি বেদাদি শাস্ত্রেও লক্ষিত হইয়া থাকে? তাহা হইলে, তদুত্তরে আমাদিগকে নিশ্চিত "না" বলিতে হয়।" †

বৈদিক সময়ে জাতিবিভাগ সম্বন্ধে অন্যান্য পণ্ডিতবর্গ যাহা বলিয়াছেন, তাহার উল্লেখ এস্থলে আর না করিলেও চলে।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

মুক্তা।

এক প্রকার ঝিনুকের ভিতর হইতে মুক্তা পাওয়া যায়। সকলেই জানেন, ঝিনুকেরা একটি কঠিন খোলার ভিতর বাস করে। এই খোলার উপরের দিক্‌টা মসৃণ নয়, কিন্তু ভিতরের দিক্ বেশ মসৃণ ও উজ্জ্বল। ভিতরের দিক্‌টা বন্ধুর বা কর্কশ হইলে, ঝিনুকদের কোমল দেহে ব্যথা লাগিত। ঝিনুকেরা এক প্রকার রস নিঃসারণ করিতে পারে। এই রসের দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া তাহারা তাহাদের খোলার অভ্যন্তর বেশ মসৃণ ও উজ্জ্বল করিয়া লয়। তাহারা এই রস খুব পাত্‌লা পাত্‌লা পরদায় লাগায়। মুক্তার উপাদানও এই রস বলিয়া অনুমান করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। আমাদের চক্ষুর ভিতরে যদি একটি বালুকণা ঢুকিয়া যায়, তাহা হইলে আমরা চোখ রগড়াইয়া বা চোখ ধুইয়া তাহা বাহির করিয়া ফেলি। কিন্তু



হাঙ্গরের সম্মুখীন ডুবুরি।

ঝিনুকের শরীরের ভিতর যদি ঐরূপ একটি বালুকণা প্রবেশ করে, তাহা হইলে ঝিনুক তাহা বাহির করিয়া ফেলিতে পারে না, অথচ কোন প্রতীকার না করিলে বালুকণাটি সর্ব্বদাই তাহার কোমল দেহে যন্ত্রণা উৎপাদন করে। এই জন্য ঝিনুক পেঁয়াজের খোলার মত স্তরে স্তরে পূর্ব্বোক্ত রস দ্বারা বালুকণাটিকে আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে। তখন তাহা মসৃণ ও গোলাকার হওয়ায় আর তাহাকে কষ্ট দিতে পারে না। এইরূপে মুক্তার উৎপত্তি হয়। বালুকণা ব্যতীত শুক্তির কোন পরজীবী (parasite), বা ক্ষুদ্র সামুদ্রিক উদ্ভিদ্-

---

* "There are no castes as yet; the people is still one united whole and bears but one name, that of Visas."—*Indian Literature* (Translation) P. 38.

† "If then, with all the documents before us, we ask the question, does caste, as we find it in Manu and at the present day, form part of the most ancient religious teaching of the Vedas? We can answer with a decided No."—*Max Muller's Chips from a German Workshop*, Vol. II (1867), p. 307—308.

বিশেষের অনুবৎ অংশ প্রভৃতিও ঝিনুকের শরীরে প্রবেশ করিলে মুক্তার জন্মের কারণ হইতে পারে। কখন কখন শুক্তির নিজের ডিম্বই এইরূপে মুক্তার কেন্দ্রের কাজ করে।

পৃথিবীর প্রাচ্য বিভাগের মুক্তাসমূহই বিশেষ বিখ্যাত। প্রাচীনকালে লোকে সিংহল দ্বীপ ও পারস্য উপসাগর হইতেই মুক্তা সংগ্রহ করিত। এখনও অনেক শ্রেষ্ঠ মুক্তা এই দুই স্থান হইতে আসিয়া থাকে। সুলু দ্বীপপুঞ্জ, নিউগিনির সন্নিহিত সাগর, অষ্ট্রেলিয়ার উপকূলের নিকটবর্ত্তী সমুদ্রের কোন কোন অংশ, এবং পলিনেশীয় দ্বীপপুঞ্জের কোথাও কোথাও বর্ত্তমানকালে মুক্তা আহরণ করা হয়।

সিংহলদ্বীপে গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে মুক্তা আহৃত হয়। সকল বৎসর বা বৎসরের সকল সময়ে মুক্তা আহরণ করিতে দেওয়া হয় না। যখন আহরণ করিতে দেওয়া হয়, তখন এই কার্য্য ক্রমান্বয়ে চারি হইতে ছয় সপ্তাহ পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। সিংহলে মুক্তা আহরণের রীতি এই প্রকার। প্রত্যেক ডুবুরির জন্য এক একটি প্রায় আধ মন ভারি পাথর থাকে। সমুদ্রের তলা পর্য্যন্ত পৌঁছিতে পারে এরূপ লম্বা একগাছি দড়ির একদিকে এই পাথর বাঁধিয়া দেওয়া হয় এবং ডুবুরির পা গলাইবার জন্য দড়িতে একটা ফাঁস থাকে। দড়ির অপর দিক্‌টা নৌকার লোকেরা ধরিয়া থাকে। এই পাথরটার সাহায্যে ডুবুরিগণ খুব অল্প সময়ের মধ্যে সমুদ্রের তলে পৌঁছিতে পারে। মুক্তাহরণকারী প্রত্যেক নৌকায় সাধারণতঃ তেরজন মাঝি ও দশজন ডুবুরি থাকে। পর্য্যায়ক্রমে পাঁচজন করিয়া ডুবুরি জলে ডুবিয়া ঝিনুক কুড়াইয়া থাকে। ঝিনুক কুড়ান কাজ খুব শীঘ্র শীঘ্র করিতে হয়। কারণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট ডুবুরিরাও সাধারণতঃ ৮০ সেকেণ্ডের অধিক কাল জলের নীচে থাকিতে পারে না; খুব কম লোকেই এক মিনিটের অধিক সময় থাকিতে পারে। ডুবুরিরা সাধারণতঃ ৩৬ হাত গভীর জলে ডুবে; ৫২ হাতের চেয়ে নীচে তাহারা যাইতে পারে না। যখন ডুবুরি দড়ি টানিয়া ইসারা করে, তখন নৌকার লোকেরা তাহাকে তাহার জাল ও সংগৃহীত ঝিনুকসহ সত্বর টানিয়া তুলে। হাঙ্গরের দ্বারা ডুবুরিদের প্রাণনাশের কথা প্রায় শুনা যায় না, তাহার কারণ বোধ হয় মুক্তাহরণ কালে জল অত্যন্ত আন্দোলিত হওয়ায় এবং সমুদ্রের সেই অংশে অতিশয় কোলাহল হওয়ায় হাঙ্গরেরা ভয়ে তথায় থাকে না। ডুবুরিরা কখন কখন নির্দ্দিষ্ট বেতন পায়, কখন বা আহৃত মুক্তার চতুর্থাংশ পায়। ঝিনুকে নৌকা পূর্ণ হইয়া গেলে উহা তীরের নিকটে আসে। এক এক নৌকায় প্রায় বিশ হইতে ত্রিশ হাজার ঝিনুক থাকে। শুক্তিগুলিকে নৌকা হইতে ডাঙ্গায় ঢালিয়া ফেলা হয়। তথায় তাহাদের মৃত্যুর পর শরীর পচিতে দেওয়া হয়। এই উপায়ে মুক্তাগুলি সহজেই খুঁজিয়া পাওয়া যায়। সিংহলে ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে



ডুবুরি পোষাক পরিধান।

পঞ্চাশ জন ডুবুরি বাইশ দিনে এককোটি দশ লক্ষ ঝিনুক কুড়াইয়াছিল। উহা হাজারকরা ১৮৲ টাকা দরে বিক্রী হইয়াছিল। উহা হইতে গবর্ণমেণ্টের দেড় লক্ষ টাকা এবং ডুবুরিদের আটচল্লিশ হাজার টাকা আয় হইয়াছিল। শক্ত খোলার ভিতরের জীবদেহ যথেষ্ট পরিমাণে পচিয়া গেলে প্রক্ষালন আরম্ভ হয়। ঝিনুকের ভিতর কতকগুলি

মুক্তা খোলার সঙ্গে সংলগ্ন থাকে, কতকগুলি স্বতন্ত্র অর্থাৎ আলগাভাবে থাকে। এই আলগা মুক্তাগুলিই অধিক দামী। ঝিনুক ধুইবার সময় এই মুক্তাগুলির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হয়। এই গুলি সংগৃহীত হইলে ঝিনুকের



"সার্দার্ন-ক্রস্" নামক মুক্তাগুচ্ছ।

গায়ে কোন মুক্তা সংলগ্ন আছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখা হয়। এরূপ মুক্তা থাকিলে তাহা হাতুড়ি দ্বারা বা অন্য উপায়ে ছাড়াইয়া লওয়া হয়। "অসংলগ্ন" মুক্তাগুলি সাধারণতঃ সম্পূর্ণ গোলাকার হয়। এই গুলিতে ছিদ্র করিয়া মালা গাঁথিয়া পরা চলে। "সংলগ্ন" মুক্তা কেবল অলঙ্কারের গায়ে বসাইবার জন্যই ব্যবহৃত হয়।

মুক্তা ছোট বড় নানা আকারের হইয়া থাকে। যেগুলি বড় মটরের মত, সম্পূর্ণ গোলাকার, এবং যাহাদের রং সুন্দর, সেইগুলিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। কখন কখন খুব বড় মুক্তাও পাওয়া যায়। বিলাতের সৌথ কেনসিংটনে বেরিস্ফোর্ড হোপ সাহেবের মুক্তাসমষ্টির মধ্যে একটি চারি ইঞ্চি পরিধি বিশিষ্ট ২ ইঞ্চি লম্বা মুক্তা আছে। উহার ওজন এক তোলা। যতদূর জানা গিয়াছে ইহাই পৃথিবীর মধ্যে অদ্বিতীয়। খুব ছোট ছোট মুক্তাকে ইংরাজীতে Seed Pearls (বীজ মুক্তা) বলে। বহুসংখ্যক "বীজমুক্তা" চীনদেশে চালান হয়। চীনেরা উহা ভস্ম করিয়া ঔষধ প্রস্তুত করে। প্রাচীন রোমকেরা বড় মুক্তাপ্রিয় ছিল, এবং ভাল মুক্তার জন্য প্রভূত অর্থব্যয় করিত। মিসরদেশের রাণী ক্লিওপেট্রা একটি মুক্তা দ্রবীভূত করিয়া পান করিয়াছিলেন। ঐ মুক্তাটির মূল্য বার লক্ষ দশ হাজার নয়শত পঁয়ত্রিশ টাকা ছিল। ঐ দামের আর একটি মুক্তা কাটিয়া রোমের প্যান্থিয়নস্থিত বীনস (রতি) দেবীর মূর্ত্তির কাণের দুল নির্ম্মাণ করা হইয়াছিল।

আকৃতি, আয়তন, বর্ণ, উজ্জ্বলতা, এবং খুঁতবিহীনতার উপর মুক্তার মূল্য নির্ভর করে। সম্পূর্ণ গোলাকার মুক্তারই মূল্য আজকাল সর্ব্বাধিক। ২৫ গ্রেণ (১ তোলার প্রায় এক সপ্তমাংশ) অপেক্ষা অধিক ওজনের সম্পূর্ণ গোলাকার মুক্তা বড় দুর্লভ ও বহুমূল্য। হারের মধ্যমণি করিবার জন্য এইরূপ মুক্তার খুব আদর।

নিম্ন-কালিফর্ণিয়ার নিকটবর্ত্তী সমুদ্রেই আমেরিকার বৃহত্তম মুক্তাক্ষেত্র অবস্থিত। বাজারের বৃহত্তম ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট কৃষ্ণমুক্তা এইখান হইতেই আইসে। স্কটল্যাণ্ড, ওয়েল্‌স্‌, আয়ারলণ্ড, রুশিয়ার কোন কোন প্রদেশ, জার্ম্মেনী, কানাডা ও আমেরিকার কোন কোন নদীতে এবং বনগ্রামের নিকটস্থ ইচ্ছামতী নদীতেও মুক্তাশুক্তি পাওয়া যায়।



ডুব দিবার জন্য প্রস্তুত ডুবুরি।

সিংহলে মুক্তা আহরণের যে পদ্ধতি বর্ণিত হইয়াছে, বর্ত্তমান কালে প্রায় সর্ব্বত্রই উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রণালী অনুসারে ডুবুরিরা মুক্তা আহরণ করে। আধুনিক ডুবুরির পোষাক ওয়াটারপ্রুফ অর্থাৎ উহার ভিতর জল প্রবেশ করিতে পারে



অক্টোপস্ দ্বারা আক্রান্ত ডুবুরি।

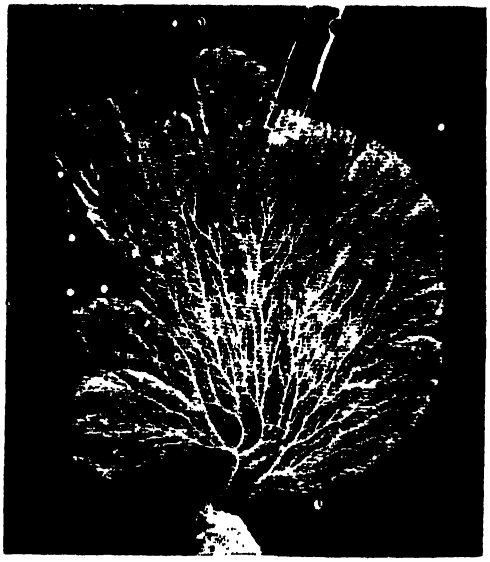
না। ডুবুরি প্রথমে ফ্লানেলের ছটা পোষাক পরে। ইহাতে ঘাম চুষিয়া লয়। তাহার উপর "ডুবুরি পরিচ্ছদ" পরে। ডুবুরির বুটের তলা সীসা নির্ম্মিত। এরূপ একজোড়া বুটের ওজন ১৬ সের। ডুবুরির বুকে পিঠে যে ভার লাগাইয়া দেওয়া হয়, তাহার ওজন একমণ। ডুবুরির নাক মুখ চোখ সমস্তই একটি শিরস্ত্রাণে আবৃত থাকে। দমকল এবং একটি লম্বা নলের সাহায্যে সমুদ্রের নীচেও তাহাকে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য বিশুদ্ধ বায়ু দিতে পারা যায়। পুরাতন প্রথা অনুসারে জলে ডুবিয়া ডুবুরিরা ৮০ সেকেণ্ডের বেশী জলের নীচে থাকিতে পারিত না। কিন্তু ডুবুরিপোষাকপরিহিত লোকেরা অনেক অধিক সময় ডুবিয়া থাকিতে পারে। শিরস্ত্রাণের যে অংশ চক্ষুর সম্মুখে থাকে তাহাতে একখানা বিবর্দ্ধক কাচ (magnifying glass) লাগান থাকে উহাতে সমুদ্রের নীচের জিনিষ বড় বড় দেখায়।

সমুদ্রের কোন্ অংশে শুক্তি আছে তাহা নির্ণয় করিবার জন্য এক প্রকার সামুদ্রিক দূরবীক্ষণ ব্যবহৃত হয়। উহার সাহায্যে সমুদ্রতলে মুক্তাক্ষেত্র আবিষ্কৃত হইলেই "ডুবুরি-পোষাক"পরিহিত লোকেরা নৌকা হইতে ডুব দেয়। আজ কাল ৩০ হইতে ৭২ হাত পর্য্যন্ত গভীর সমুদ্রতলে মুক্তা আহৃত হয়। ৭২ হাত নীচে জলের চাপ অধিক হওয়ায় তথায় ডুবুরিরা ১০ মিনিটের অধিকক্ষণ থাকিতে পারে না। কিন্তু ২৫।৩০ হাত নীচে ডুবুরিরা বিশেষ কষ্ট অনুভব না করিয়া ২ ঘণ্টা পর্য্যন্ত থাকিতে পারে। সমুদ্রের জল পরিষ্কার থাকিলে ডুবুরিরা জলের মধ্যে ৩০।৩৫ হাত দূরবর্ত্তী জিনিষ দেখিতে পায়, কিন্তু জল ঘোলা হইলে হাতে পায়ে হামাগুড়ি দিয়া সমুদ্রতল অন্বেষণ করিতে হয়। ২০০ জোড়ার অধিক ঝিনুক পাইলেই এক জন ডুবুরির একদিনের বেশ কাজ হইয়াছে মনে করা যাইতে পারে; যদিও কখন কখন একজন ডুবুরি একদিনে ১০০০ জোড়াও কুড়াইয়া থাকে। ঝিনুকের ভিতর মুক্তা পাওয়া না পাওয়া ভাগ্যের উপর নির্ভর করে। হয়ত তুমি ৪০।৫০ মণ ঝিনুক খুলিয়া কেবল কয়েকটা "বীজমুক্তা" পাইলে, আর একজন একদিনেই বড় মানুষ হইয়া গেল।



সমুদ্রগর্ভের একটি দৃশ্য।

সম্প্রতি অষ্ট্রেলিয়াতে যে সকল মুক্তা পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে "সাদার্ণক্রস্" নামক মুক্তাগুচ্ছই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। ইহা ক্রুসের আকারে সজ্জিত নয়টি মুক্তার নৈসর্গিক গুচ্ছ। ইহা নানা হাত ফিরিয়া শেষে দেড়লক্ষ টাকার কিছু অধিক মূল্যে বিক্রীত হইয়াছে।



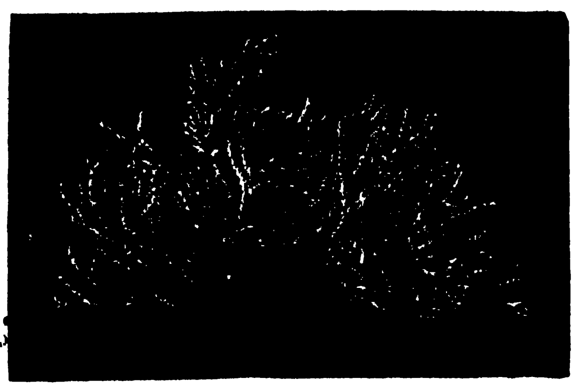
"সামুদ্রিক ব্যঞ্জন"।

ডুবুরির কার্য্য বড় বিপদসঙ্কুল। সমুদ্রতলে এত প্রকার বিপদ ও আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটিতে পারে যে পূর্ব্ব হইতে তন্নিবারণের উপায় করা অসম্ভব। তীক্ষ্ণ পাথর বা প্রবালে লাগিয়া ডুবুরির পোষাক ছিড়িয়া গেলে তাহার প্রাণ যাইতে পারে। দমকল কোন প্রকারে খারাপ হইয়া গেলে, কিম্বা দমকল হইতে ডুবুরির নিকট বাতাস চালাইবার নল খুলিয়া বা ফাটিয়া গেলে, নিশ্বাস বন্ধ হইয়া তাহার প্রাণ যায়। ডুবুরি উপরে উঠিবার জন্য সঙ্কেত করিলে উপরের লোকে তাহা বুঝিতে না পারিলে অনেক সময় ডুবুরির প্রাণ যায়। সকল গুণের চেয়ে ডুবুরির প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের অধিক প্রয়োজন। এই গুণ না থাকিলে কাহারও ডুবুরি হওয়া উচিত নয়।

সমুদ্রের নীচে নির্জ্জনতা প্রযুক্ত কেমন এক প্রকার অনির্ব্বচনীয় ভয়ের উদ্রেক হয়, যাহা স্থলচর মানুষেরা কল্পনাও করিতে পারে না। ডাঙ্গায় ভয় পাইলে ভীরু মানুষ চীৎকার করিয়া গান গায়, শীষ দেয়, রাম নাম করে; কিন্তু ডুবুরির পোষাক পরিয়া শীষ দেওয়া যায় না। গান করা চলে বটে, কিন্তু তাহাতে বৃথা অনেকটা নিশ্বাস খরচ হইয়া যায়।

ডুবুরিদের ব্যবসা স্বাস্থ্যকর নয়। তাহাদের প্রায়ই বধিরতা, বাত এবং পক্ষাঘাত হয়। যাহাদের ফুস্ফুস্ বা হৃদ্রোগ হইবার বিন্দুমাত্র পূর্ব্বলক্ষণ থাকে, তাহারা কয়েক মাসের মধ্যেই মারা যায়।

হাঙ্গরেরা কখন কখন ডুবুরিদের প্রাণ নাশ করে বটে, কিন্তু ডুবুরি-পোষাক পরা থাকিলে কাহাকেও আক্রমণ করে না। তাহা হইলেও হাঙ্গরের সম্মুখে পড়িলে ডুবুরির ভয় পাইবার কথা। একেত হাঙ্গর, তাহার উপর আবার জলের, এবং চক্ষুর সম্মুখস্থ বিবর্দ্ধক কাচের বিবর্দ্ধন-শক্তিবশতঃ হাঙ্গরকে খুব বড় দেখায়। একজন ইংরেজ ডুবুরি লিখিয়াছেন যে হাঙ্গরের সম্মুখে পড়িলে প্রথমেই উপরের লোকদিগকে, টানিয়া তুলিবার সঙ্কেত করিতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু তাহা করা উচিত নয়। কারণ কোন জিনিষ অপসৃত হইতেছে দেখিলেই অন্যান্য মাছের ন্যায় হাঙ্গরেরাও তাহা ধরিয়া উদরসাৎ করিবার চেষ্টা করে। এই জন্য হাঙ্গরের সম্মুখে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকাই সর্ব্বাপেক্ষা নিরাপদ। ডুবুরি নিশ্চল হইয়া থাকিলে তাহার চারিদিকে দলে দলে নানাবিধ মাছ জুটিয়া যায়। তাহারা বিস্মিত পাড়াগেঁয়ে লোকের মত হাঁ করিয়া চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া ডুবুরিকে দেখিতে থাকে। ছোট মাছগুলা তাহার আঙ্গুলে এক আধটা কামড়ও দেয়। কিন্তু ডুবুরি হাত নাড়িবা মাত্র মাছেরা কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যায়।



সামুদ্রিক উদ্ভিদ্‌বিশেষ।

অষ্ট্রেলীয় সমুদ্রে অক্টোপস্ অর্থাৎ "অষ্টাপদ" প্রায় দেখা যায় না, কিন্তু কখন কখন ডুবুরিদের সহিত অষ্টাপদের যুদ্ধের বিষয় শুনা যায়। সাধারণ অষ্টাপদের "হাত"গুলা ৮ ফুট করিয়া লম্বা হইতে পারে। ইহাদের কখন কখন দশটা হাত থাকে। এইরূপ একটা দশভুজ জীব আমেরিকায় প্রদর্শিত হইয়াছিল। তাহার শরীরটা সাড়ে ৯ ফুট এবং এক একটা হাত ৩০ ফুট লম্বা ছিল। আর একটার শরীর ইহার দ্বিগুণ লম্বা ছিল।

স্থলে যেমন প্রাকৃতিক দৃশ্যের সৌন্দর্য্য ও বৈচিত্র্যে আমরা মোহিত হই, সমুদ্রগর্ভে ডুবুরিরাও তদ্রূপ নানাবিধ বিস্ময়কর পদার্থ দেখিয়া চমৎকৃত হন। কত প্রকারের সুরঞ্জিত প্রবাল, বিচিত্র উদ্ভিদ্, অপূর্ব্ব জীবজন্তু যে তাহার নয়নগোচর হয়, তাহা বর্ণনা করা যায় না।

বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ।

গত চন্দ্রগ্রহণ।

গত ৯ই বৈশাখের চন্দ্রগ্রহণ অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন, এবং কেহ কেহ স্পর্শ ও মোক্ষকাল ঘড়ী ধরিয়া জানিতে চেষ্টা করিয়া থাকিবেন। কিন্তু অত্যল্প লোকই ঠিক সময় বলিতে পারেন। না বলিতে পারিবার দুইটি প্রধান কারণ দেখা যায়। ঠিক কোন্ সময়ে চন্দ্রকে ছায়ারূপ রাহু স্পর্শ করিল, তাহা নির্দ্ধারণ করা সহজ নহে। এ নিমিত্ত এক দিকে যেমন প্রখর দৃষ্টি থাকা আবশ্যক, অন্যদিকে তেমনই গ্রহণ দেখিবার অভ্যাস থাকা আবশ্যক। ঠিক এই সময়ে আরম্ভ বা শেষ হইল, বিশেষ অভ্যাস না থাকিলে তাহা বলা দুষ্কর। সূর্য্যগ্রহণের আরম্ভ ও শেষ নিশ্চয় করা অপেক্ষাকৃত সহজ বোধ হয়। দ্বিতীয় কারণ অধিকাংশ লোকের, বিশেষতঃ কলিকাতা ভিন্ন অন্য স্থানের লোকের ঘড়ী প্রায় ঠিক থাকে না। কলিকাতায় ঘড়ী মিলাইবার যেমন সুবিধা আছে, অত্যল্প স্থানে সেরূপ আছে। কাজেই ঘড়ীতে ৫।৭ মিনিট ভুল প্রায়ই থাকে। এমন অবস্থায় গ্রহণ আরম্ভ ও শেষ কাল নিরূপণের চেষ্টা বৃথা। আরও একটি কারণের উল্লেখ করিতে পারা যায়। অনেকেই জানেন না যে বিশেষ বিশেষ স্থানের নিমিত্ত পঞ্জিকা গণিত হইয়া থাকে। এবিষয়ে বাঙ্গলা পঞ্জিকাকারেরও ত্রুটি আছে। কোন্ পঞ্জিকা কোন্ স্থানের নিমিত্ত গণিত, তাহা পঞ্জিকায় প্রায় লেখা থাকে না। সাধারণ লোকে মনে করেন বাঙ্গলা পাঁজী বাঙ্গলা দেশে অবশ্য ঠিক। কিন্তু বাঙ্গলা দেশটি ছোট নহে; মেদিনীপুর হইতে চট্টগ্রামে যাইলে ঘড়ীতে ২০।২২ মিনিটের প্রভেদ ঘটে। যদি মনে করা যায়, সকল বাঙ্গলা পাঁজী কলিকাতার নিমিত্ত গণিত, তাহা হইলে পাঁজীতে লিখিত গ্রহণ স্পর্শ ও মোক্ষকাল কেবল কলিকাতার পক্ষেই ঠিক মনে করিতে হইবে। কলিকাতার পূর্ব্বে বা পশ্চিমে যাঁহাদের বাস, তাঁহাদিগের পক্ষে সেই কালে কিছু কিছু সংস্কার আবশ্যক। এই সংস্কার বা সংশোধনকে দেশান্তর সংস্কার বলে। বলা বাহুল্য, কলিকাতার ঠিক উত্তর বা দক্ষিণ স্থিত স্থানে এই সংস্কার আবশ্যক নহে।

এই সংস্কারটি অনেকেই জানেন, কিন্তু কার্য্যকালে প্রায়ই ভুলিয়া যান। গ্রহণারম্ভ কাল পাঁজীতে রাত্রি ১০টা ৫১ মিনিট লেখা আছে। অতএব তাঁহারা সেই সময়ের প্রতীক্ষায় বসিয়া থাকেন। তাঁহারা দুইটি বিষয় অঙ্গীকার করিয়া বসেন। (১) পাঁজীর গণনায় ভুল থাকিতে পারে না; (২) ঘড়ী যখন ঠিক করা আছে, তখন সেই ঘড়ী দেখিলেই গ্রহণের কাল নিরূপণ করিতে পারা যাইবে। বাস্তবিক, পাঁজীর গণনায় ভুল থাকিতে পারে, এবং ঘড়ীতে দেশান্তরাদি আবশ্যক সংস্কার করিতে হয়। যদি সকল পাঁজীতেই একই সময় লেখা থাকিত তাহা হইলে গণনায় সন্দেহ না হইতে পারিত। কিন্তু যখন ভিন্ন ভিন্ন পাঁজীতে বিভিন্ন সময় লিখিত দেখা যায়, তখন ত নিশ্চয়ই সন্দেহ হইবার কথা। সেই সন্দেহ কতকটা দূর করিবার একটা উপায়, গ্রহণ দেখিয়া তাহার কাল নির্ণয় করা। ঘড়ীতে আবশ্যক সংস্কার করিয়াও যদি দেখা যায় যে, পাঁজীর গণনার সহিত দৃষ্ট কাল মিলিল না, তাহা হইলে পাঁজীর গ্রহণগণনায় ভুল আছে। আর যদি গ্রহণগণনাতেই ভুল থাকে, তাহা হইলে অন্যান্য গণনাতেও ভুল থাকিবার সম্ভাবনা। কারণ গ্রহণ গণনার সময় গণক যত সাবধান হইয়া থাকেন, ৩৬৫ দিনের তিথিনক্ষত্রাদি গণনার সময় তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অসাবধান হওয়া আশ্চর্য্যের কথা নহে।

কিন্তু এমনও হইতে পারে, যে গ্রন্থানুসারে গ্রহণ গণিত হইয়াছে, তদনুসারে দৈনিক তিথ্যাদি গণিত না হইয়া অন্য গ্রন্থ সাহায্যে গণিত হইয়াছে। তথাপি কোন্ পাঁজীর গণনা ঠিক, গ্রহণ প্রত্যক্ষ করিলে তাহা কতকটা নিরূপিত হইতে পারে। আজকাল অনেকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়, "পাঁজী লইয়া কি একটা গোলমাল চলিতেছে, আমি কিন্তু অমুক পাঁজীর মতেই চলি।" চলুন, তাহাতে অন্যের ক্ষতি-বৃদ্ধি নাই। তবে, কি বিষয়ে গোলমাল, এবং গোলমালের কোন হেতু আছে কি না, তাহারও একটা মীমাংসা করা ভাল। পাঁজীতে যে সকল কথা লিখিত থাকে, তৎসমুদয় দুই ভাগে বিভক্ত। একভাগ গণিত জ্যোতিষ; অপরভাগ স্মৃতির ব্যবস্থা। গণক বলিয়া দেন, আজ একাদশী কিনা, এবং একাদশী হইলে আজ কত বেলা পর্য্যন্ত থাকিবে। স্মৃত্যাচার্য্য বলেন, আজি যদি একাদশী এত দণ্ড পর্য্যন্ত থাকে, তাহা হইলে আজি ইহা করা উচিত; তবেই প্রথমে গণিত, তার পর স্মৃতির ব্যবস্থা। ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে স্মৃতির ব্যবস্থা ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু গণিতে সকলেরই ঐক্য হইবার কথা। গণিতের মূল, গ্রহসমূহের পরস্পর স্থিতি। এই স্থিতি প্রত্যক্ষযোগ্য। অতএব গণিত মিথ্যা হইলে প্রত্যক্ষের সহিত তাহার বিরোধ দেখা যাইবে। বৎসরে যে দুইবার চন্দ্রগ্রহণ হইয়া থাকে, অন্ততঃ তাহাদের কালগণনা ঠিক হইয়াছে কি না, তাহা পরীক্ষা করা কঠিন নহে।

যাহারা কলিকাতায় থাকেন, তাঁহারা সূর্য্যগ্রহণ গণনাও পরীক্ষা করিতে পারেন। অন্যত্র পরীক্ষা করা সহজ নহে। কারণ দেশভেদে চন্দ্রগ্রহণ কালে দেশান্তর সংস্কার করিলেই চলে, সূর্য্যগ্রহণকালে অন্যান্য সংস্কার আবশ্যক হয়। দেশান্তর সংস্কার সকলেই জানেন। সকলেই জানেন, কলিকাতার ঘড়ী মাদ্রাজে লইয়া গেলে সে ঘড়ীতে ৩৩ মিনিট অধিক দেখাইবে; মাদ্রাজের ঘড়ী কলিকাতায় লইয়া গেলে সে ঘড়ীতে ৩৩ মিনিট কম দেখাইবে। এইরূপ, কলিকাতার কোন পাঁজীতে কোন চন্দ্রগ্রহণারম্ভ কাল যদি রাত্রি ১০ ঘণ্টা ৫৩ মিনিট লেখা থাকে, তাহা হইলে মাদ্রাজে থাকিয়া সেই গ্রহণ দেখিতে হইলে মাদ্রাজের ঘড়ীতে ৩৩ মিনিট কম করিতে হইবে। অর্থাৎ মাদ্রাজের ঘড়ীতে যখন ১০টা ২০ মিনিট হইবে, সেই সময় গ্রহণ আরম্ভ হইবার কথা। অন্য পক্ষে, যদি কলিকাতার পঞ্জিকা গণনা ঠিক হয়, এবং মাদ্রাজে রাত্রি ১০।২০ মিনিটের সময় সেই গ্রহণ আরম্ভ হইতে দেখা যায়, তাহা হইলে কলিকাতা হইতে মাদ্রাজের অন্তর ৩৩ মিনিট। এইরূপে চন্দ্রগ্রহণ দেখিয়া আমাদের প্রাচীন জ্যোতিষিগণ উজ্জয়িনী হইতে অন্যান্য স্থানের দেশান্তর নিরূপণ করিতেন। আজ কাল অন্যান্য উপায়ও অবলম্বিত হইয়া থাকে।

তিথ্যাদিতে দেশান্তর সংস্কার।

প্রতিবৎসর দুর্গোৎসবের সময় সন্ধিক্ষণ লইয়া গণ্ডগোল হইয়া থাকে। অষ্টমী ১৫ দণ্ড ৫৫ পল থাকবে, কি তাহার ঊনাধিক হইবে, তাহা গণিতে জানা যায়। ঊনাধিক হইলে ত বিষম গোলের কথা। কিন্তু ইহা ছাড়া আর একটি গোলযোগ ঘটিতে দেখা যায়। আজকাল বিলাতী ঘড়ীর প্রচলন বশতঃ পঞ্জিকায় ঘড়ীর ঘণ্টা মিনিট দেওয়া হইতেছে। ইহাতে বিশেষ সুবিধাই হইয়াছে। পূর্ব্ব কালের তাম্রঘটী বা শঙ্কুযন্ত্রের ব্যবহার প্রায় নাই। সুতরাং দণ্ডপলের ব্যবহারও লোপ পাইতে বসিয়াছে। পঞ্জিকায় দেখা গেল, মহাষ্টমী ১৫।৫৫ দণ্ডাদি বা ১২ ঘণ্টা ১৮ মিনিট। অর্থাৎ বেলা ১২টা ১৮ মিনিটের সময় মহাষ্টমীর শেষ, এবং তাহার পরেই সন্ধিবলিদান। অবশ্য কলিকাতার ঘড়ীর ১২টা ১৮ মিনিটে অষ্টমী শেষ হইবে, কেন না কলিকাতার নিমিত্ত পঞ্জিকা গণিত হইয়াছে। কিন্তু দেখা যায়, কলিকাতার পূর্ব্বে ও পশ্চিমে স্থিত স্থানের লোকেরাও ১২টা ১৮ মিনিটের সময় সন্ধিবলিদান করিয়া বসেন। তাঁহারা নিজের নিজের ঘড়ীতে স্ব স্ব স্থানের সময় জ্ঞাপন জন্য ঘড়ী ঠিক করিয়া রাখেন। কিন্তু তিথ্যাদির স্থিতির বেলায় কলিকাতার সময় অপেক্ষা করিয়া থাকেন। সন্ধিক্ষণ গণনায় ভুল থাকুক আর নাই থাকুক, দেশান্তর সংস্কার অভাবে গণিত কালের উপর নিজেদের একটা ভুল চাপাইয়া দেন। এইরূপে মৈমনসিংহের লোকও ১২টা ১৮ মিনিটে সন্ধিবলিদান করেন, এবং কলিকাতার লোকও সেই সময়ে করেন। বলা বাহুল্য, যদি গণনা ও ঘড়ী ঠিক থাকে, তাহা হইলে কলিকাতায় ১২টা ১৮ মিনিটে সন্ধিবলিদান

সময় বটে; কিন্তু গণনা ও ঘড়ী ঠিক থাকিলেই কলিকাতার পূর্ব্ব ও পশ্চিমস্থিত স্থানে ঠিক ১২।১৮ মিনিটে সন্ধিবলিদান সময় হইবে না। কলিকাতা হইতে মৈমনসিংহের দেশান্তর প্রায় ৮ মিনিট, এবং কলিকাতার পূর্ব্বে মৈমনসিংহ, অতএব দেশান্তর ধন। তবেই মৈমনসিংহে, ১২টা ২৬ মিনিটের সময় সন্ধিবলিদান করিবার কথা।

বলা বাহুল্য, অমাবস্যা, পূর্ণিমা, একাদশী প্রভৃতি সকল তিথির বেলাই এইরূপ দেশান্তর সংস্কার আবশ্যক। কিন্তু এই সামান্য সংস্কারেই যখন লোকে উদাসীন, তখন পঞ্জিকা সংস্কারের আবশ্যকতা না বলাই ভাল।

ঘড়ী মিলাইবার উপায়।

লগ্নকালই হউক, তিথ্যাদির স্থিতিকালই হউক, আজ কাল ঘড়ীর উপরই ঐ নিরূপণ নির্ভর করিতেছে। এসকল ছাড়া দৈনিক নানাবিধ কাজে ঠিক সময় জানা আবশ্যক। কিন্তু অত্যল্প ঘড়ীই ঠিক চলে, রীতিমত দম পাইলেও অত্যল্প ঘড়ী অনেক দিন পর্য্যন্ত ঠিক সময় দেখায়। সামান্য ঘড়ীর ত কথাই নাই; উহা কখন দ্রুত কখন বা মন্দ চলিতে থাকে। কলিকাতায় সূর্য্যবেধ করিয়া প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট সময়ে তোপ দাগা হইয়া থাকে। কাজেই সেখানে ঘড়ী মিলাইবার ভাবনা নাই। কিন্তু অন্যত্র যেখানে বেধালয় নাই, সেখানে ঘড়ী মিলাইবার বিশেষ অসুবিধা। তন্মধ্যে যেখানে টেলিগ্রাফ আফিস আছে, সেখানে সেই আফিসের ঘড়ীতে ঠিক সময় জানিতে পারা যায়। রেল ও টেলিগ্রাফ আফিসে মাদ্রাজের সময় রাখা হইয়া থাকে, কিন্তু দেশান্তর জানিলে মাদ্রাজের সময়ে ঋণ ধন করিয়া স্বদেশের সময় অবগত হইতে পারা যায়। কিন্তু রেল বা টেলিগ্রাফ আফিস নগরের প্রায়ই বাহিরে থাকে। দুই এক জন মাত্র ঐ সকল আফিসে গিয়া নিজের নিজের ঘড়ী মিলাইয়া আনিয়া থাকেন। কিন্তু পল্লীগ্রামাদি, যেখানে রেল বা টেলিগ্রাফ আফিস নাই, সেখানে ঘড়ী মিলান দুরূহ ব্যাপার। কদাচিৎ কোথাও শঙ্কুযন্ত্র (Sun-dial) আছে। কিন্তু বঙ্গদেশের অসংখ্য নগরের তুলনায় শঙ্কুযন্ত্র নাই বলিলেই হয়। এ সকল স্থলে দেখা যায়, পঞ্জিকালিখিত সূর্য্যোদয়াস্ত কাল দেখিয়া লোকে ঘড়ী ঠিক করিয়া থাকেন, কিন্তু এইরূপে ঘড়ী মিলাইতে গিয়া প্রায়ই দুই প্রকার ভুল করিয়া থাকেন। সূর্য্যের উদয় বা অস্ত অর্থে সূর্য্যের সম্পূর্ণ বিম্বের উদয় বা অস্ত বুঝিলে ভুল হয়। পঞ্জিকায় যে সময় লেখা থাকে, তাহা সূর্য্যের বিম্বার্দ্ধের বা সূর্য্যের মধ্যবিন্দুর উদয় বা অস্তকাল। ক্ষিতিজের (horizon) উপর সূর্য্যবিম্বের উদয় হইতে, কিংবা উহার নীচে অস্ত যাইতে প্রায় ২ মিনিট সময় লাগে। সুতরাং সূর্য্যবিম্বার্দ্ধ না ধরিলে ঘড়ীতে ১ মিনিট প্রভেদ থাকিয়া যায়। তদ্ভিন্ন, স্থির জলাশয়ে সূর্য্যের উদয় বা অস্ত দেখিতে পাইলে উদয়াস্ত অনেকটা ঠিক বুঝিতে পারা যায়। উচ্চনীচ ভূমিভেদে, দূরস্থ গ্রামের গৃহ বৃক্ষাদির অন্তরালে সূর্য্যের উদয়াস্ত দেখিয়া ঘড়ী ঠিক করা সকলের সাধ্য নহে।

আর এক প্রকারে ভুল হইয়া থাকে। বঙ্গদেশের প্রচলিত পাঁজীগুলি কলিকাতার নিমিত্ত গণিত। সুতরাং কলিকাতার তুল্য অক্ষাংশে (latitude) যে সকল স্থান অবস্থিত, সেই সকল স্থানের পক্ষে কলিকাতার পঞ্জিকাদত্ত সূর্য্যোদয়াস্ত কাল ঠিক। কিন্তু উহার উত্তর বা দক্ষিণে যে সকল স্থান আছে, তৎসমুদয়ের পক্ষে সেই কাল ঠিক নহে। রঙ্গপুর ও কলিকাতার অক্ষান্তর প্রায় ৩ অংশ। এস্থলে সহজেই বুঝা যাইবে যে, কলিকাতা ও রঙ্গপুরের দিবামান কখন সমান হইতে পারে না এবং সূর্য্যোদয়াস্তও সমান হইতে পারে না। উভয়ের মধ্যে কত প্রভেদ হইবে, তাহা দেশান্তরের ন্যায় অপরিবর্ত্তনীয় নহে। কারণ, সূর্য্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ণ আছে। প্রতিদিন সূর্য্য একই পরিমাণে উত্তরে বা দক্ষিণে গমন করেন না। কাজেই উক্ত প্রভেদ প্রত্যহ সমান থাকে না।

উপরে ধরিয়া লইয়াছি যে, কলিকাতার মুদ্রিত সকল পাঁজীতেই সূর্য্যোদয়াস্তের প্রত্যক্ষ কাল লিখিত থাকে। বস্তুতঃ সকল পাঁজীতেই তাহা থাকে না। পূর্ব্বে অনেক পাঁজীতেই ১০ই আশ্বিন ও চৈত্র সূর্য্যোদয়াস্তকাল ৬ঘণ্টা লিখিত থাকিত। এখন কোন কোন পাঁজীতে ৭ই বা ৮ই লিখিত হইতেছে। কেবল গণিতানুসারে ইহা ঠিক বটে, কিন্তু সূর্য্যবিম্ব ক্ষিতিজের উপরে উঠিতে না উঠিতেই আবহ বশতঃ দৃষ্ট হয়, এবং নীচে নামিবার কিছু পরেও হয়। ফলে এই কারণে দিবামান বড় হইয়া থাকে।

সূর্য্যোদয়াস্ত দেখিয়া ঘড়ী ঠিক করিলে কত রকমে ভুল হইতে পারে, তাহা মোটামুটি দেখান গেল। যেখানে বেধালয় নাই, সেখানে শঙ্কু স্থাপন করিলে ঘড়ী অনেকটা ঠিক মিলাইতে পারা যায়। কেবল ঘড়ী মিলাইবার নিমিত্ত শঙ্কু-স্থাপনে ব্যয় বাহুল্য নাই; আবশ্যক কেবল একবার একটু উদ্যোগ, এবং আরও আবশ্যক কালকর্ত্তনে অবধান।

ধূমকেতু-বার্ত্তাবহ।

তাড়িত-বার্ত্তাবহ প্রচলিত হইবার আগে সমস্ত সভ্য জগতে দূত দ্বারা বার্ত্তা প্রেরণের প্রথা প্রচলিত ছিল। রাজা তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীদিগের নিকট কোন সংবাদ পাঠাইতে ইচ্ছা করিলে দূত প্রেরণ করিতেন; কর্ম্মচারীরা রাজার কাছে কোন প্রয়োজনীয় সংবাদ প্রেরণের আবশ্যকতা বোধ করিলে দূত প্রেরণ করিতেন। সৌরজগতে সূর্য্য রাজা; এবং গ্রহগণ তাঁহার কর্ম্মচারী। ইহাঁদের মধ্যে কোন সংবাদের আদান প্রদান করিতে হইলে এক জাতীয় বার্ত্তাবহের সাহায্য গ্রহণ করা হয়; তাহার নাম ধূমকেতু। অনেক সময় এই জাতীয় বার্ত্তাবহের গতিবিধি আলোচনা করিতে গেলে "হর্ষচরিতে" বর্ণিত উড্ডীয়মান-কেতন ধূলি-ধূসরিত রাজদূতের তীব্র গতি মানসপটে চিত্রিত হয়। প্রকৃত পক্ষে ধূমকেতু বার্ত্তাবহ কিনা, এবং তাহারা কি বার্ত্তা বহন করিয়া সৌরজগতে যাতায়াত করে, তাহার আলোচনা করা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

সাধারণতঃ তিনজাতীয় ধূমকেতু দেখা যায়। প্রথম, কতকগুলি ধূমকেতু সৌরজগতের অন্তর্গত থাকিয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে একবার করিয়া সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া পরিভ্রমণ করে; দ্বিতীয়, কতকগুলি ধূমকেতু এমন আছে যে যদিও তাহারা বহু বৎসর পরে একবার করিয়া সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া যায়, কিন্তু তাহাদের গতি সৌরজগতের বহির্ভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, তৃতীয়, কোন কোন সময় এমন এক একটী ধূমকেতু দেখা দেয় যাহারা একবার মাত্র সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়াই চলিয়া যায়, আর কখনও তাহারা সৌরজগতের সংস্পর্শে আসিবে বলিয়া জানা যায় না। ইহাদের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় জাতীয় ধূমকেতু প্রকৃতপক্ষে দূতের কার্য্য করিয়া থাকে। তৃতীয় জাতীয় ধূমকেতু পরিব্রাজকের ন্যায় কিছু দিনের জন্য সৌরজগতের আতিথ্যগ্রহণ করিয়া, অবার অসীম বিমানে কোথায় বিলীন হইয়া যায়, ধরাবাসী তাহার তত্ত্ব জানিতে পারে না।

গণিতের ভাষায় বলিতে গেলে প্রথম দুইজাতীয় ধূমকেতুর ভ্রমণপথ 'অবক্ষেত্রাকার' (elliptic), এবং তৃতীয় জাতীয় ধূমকেতুর ভ্রমণপথ 'অতিক্ষেত্রাকার' (hyperbolic or parabolic); অর্থাৎ প্রথম দুইজাতীয় ধূমকেতুর কক্ষ অতিশয় লম্বিত হইলেও গ্রহদিগের কক্ষের ন্যায় সসীম; কিন্তু তৃতীয় জাতীয় ধূমকেতুর কক্ষ অসীম বিলম্বিত। একটী ডিম্বকে কোন নির্দ্দিষ্ট প্রকার আরকে কিছুকাল ভিজাইয়া রাখিলে তাহার কঠিন আবরণ ক্রমে কোমল হইয়া যায়; তখন তাহাকে সহজে একটী সরু গলাবিশিষ্ট বোতলে প্রবেশ করান যাইতে পারে। ঐ প্রকারে একটী সরু গলা-বিশিষ্ট বোতলে প্রবিষ্ট হইবার সময় ডিম্ব যে লম্বিতাকার ধারণ করে, তাহাই সসীম অতিলম্বিত কক্ষের অনুরূপ। ঐ রূপ কক্ষে বিচরণ করাতে ধূমকেতুগণ ঘুরিয়া ফিরিয়া আপন আপন নির্দ্দিষ্ট সময়ে এক একবার সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিয়া যায়। কিন্তু যে সকল ধূমকেতু অসীম লম্বিত কক্ষে বিচরণ করে, তাহাদের এক আবর্ত্তন পূর্ণ করিয়া পুনরায় সৌরজগতে আসিতে অনন্ত কাল লাগিয়া যাইবে। ইহারা কি উদ্দেশ্যে কোথা হইতে আসিয়া সূর্য্যের কাণে কাণে কি বার্ত্তা কহিয়া চলিয়া যায়, তাহা আমাদের জানিবার কোন উপায় নাই। একারণে ইহাদিগকে সাধারণ দূতজাতীয় ধূমকেতু হইতে স্বতন্ত্র জাতি বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

সূর্য্য আপন জগতের সীমা আমাদিগকে বলিয়া দিতেছেন না। এ কারণ আমরা যতদূর জানিতে পারিতেছি, তত দূর পর্য্যন্ত সৌরজগতের সীমা অনুমান করিয়া প্রথম দুই জাতীয় ধূমকেতুর স্বাতন্ত্র্য নির্দ্দেশ করিয়াছি। কিন্তু সূর্য্যের হিসাবে ধরিতে গেলে ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে যতদূর পর্য্যন্ত কোন গ্রহ কিম্বা দূতজাতীয় ধূমকেতুর গতি-বিধি জানা যাইতেছে, ততদূর সৌরজগৎ বিস্তৃত। আমরা বর্ত্তমান জ্ঞানের হিসাবে বরুণ গ্রহের কক্ষকে সৌরজগতের সীমা গ্রহণ করিয়া দ্বিতীয় জাতীয় ধূমকেতুর বিশেষত্ব প্রতিপাদন করিতেছি। এই বিশেষত্বের সার্থকতা আছে। আমা-



রাজা রবিবর্ম্মা] কৃষ্ণবিরহিনী রাধা [কর্ত্তৃক অঙ্কিত

দের পরিজ্ঞাত' সীমাকে সৌরজগতের প্রান্ত মনে করিয়া লইলে তাহার বহির্ভাগে বিচরণকারী ধূমকেতুকে "দূত" (messenger) না বলিয়া "চর" (explorer) বলা যাইতে পারে, এবং ইহাদের নিকট সৌরজগতের বহির্ভাগস্থ স্থানের বার্ত্তা পাওয়া যাইতে পারে।

রাজার কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে দেখা যায় যে যিনি যত উচ্চপদস্থ, তাঁহার অনুচর বা দূত সংখ্যা তত বেশী। সৌরজগতেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায় না। গ্রহজগতে বৃহস্পতির প্রাধান্য সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। এ কারণ দেখা যায় যে অন্যূন নয়টী ধূমকেতু বৃহস্পতি ও সূর্য্যের মধ্যবর্ত্তী স্থানে যাতায়াত করিতেছে। এই সকল ধূমকেতুর কক্ষ সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া বৃহস্পতির কক্ষ পর্য্যন্ত বিস্তৃত; এবং ইহাদের আবর্ত্তনকাল, কক্ষের পরিসরানুসারে যথাক্রমে ৩·৫ হইতে ৭·৫ বৎসর পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। ইহাদের কক্ষ যে সকল স্থলে বৃহস্পতির কক্ষকে স্পর্শ করে কিম্বা তাহার সর্ব্বাধিক নিকটবর্ত্তী হয়, সে সকল স্থলের সন্নিধানে বৃহস্পতি স্বয়ং উপস্থিত থাকিলে ধূমকেতুর আবর্ত্তন কালে বৈষম্য ঘটিতে দেখা যায়; যেন বৃহস্পতি বার্ত্তাগ্রহণ জন্য ধূমকেতুকে ডাকিয়া তাহার সহিত কথা কহিয়া কিঞ্চিৎ সময় কাটাইয়াছেন। বস্তুতঃ বৃহস্পতির সান্নিধ্যহেতু তাহার আকর্ষণ প্রবল হওয়াতে ধূমকেতুর সূর্য্যাভিমুখী গতির খর্ব্বতা ঘটে।

ধূমকেতুগণ দূতরূপে গ্রহ ও সূর্য্যের মধ্যে বার্ত্তাবহন করিয়া যাতায়াতের সময় যখন পৃথিবীর দৃষ্টিশক্তির অন্তর্ভূত হয়, তখন আমরা তাহাদিগকে দেখিতে পাই। তাহারা কি বার্ত্তা বহন করে, তাহা আমরা জানিতে পারি না বটে, কিন্তু তাহাদের গতি দেখিয়া আমরা বুঝিতে পারি যে কোন কোন আবর্ত্তনকালে তাহারা গ্রহের সাক্ষাৎ পাইয়াছিল।

যে সকল ধূমকেতুকে বৃহস্পতির দূত বলা হইল, তাহারা কেবল ঐ গ্রহেরই বার্ত্তা বহন করিয়া থাকে। একবার একটী ধূমকেতু আমাদের দৃষ্টিক্ষেত্রে প্রকাশিত হইবার কিছু কাল পরে দেখা গেল যে প্রথমে সে যে গতিতে চলিয়া আসিতেছিল, হঠাৎ কয়েক দিনের মধ্যে তাহাতে বৈষম্য ঘটিয়াছে। অনুসন্ধানে জানা গেল যে সে স্থলে বুধগ্রহের সহিত তাহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। বুধ ঐ ধূমকেতুদ্বারা কি বার্ত্তা প্রেরণ করিয়াছিল, তাহা আমরা জ্ঞাত নহি, কিন্তু বুধের সান্নিধ্যে ঐ ধূমকেতুর গতিবিপর্য্যয় লক্ষ্য করিয়া লাবেরিয়ে নামক জগদ্বিখ্যাত ফরাশি জ্যোতির্ব্বিদ, লাপ্লাশের গণনার এক স্থলে ভ্রম দর্শাইয়া, তাঁহার "বুধতত্ত্ব" সংশোধন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

"বায়েলা" নামে একটী ধূমকেতু বহুকাল বৃহস্পতির দৌত্য করিয়া আসিতেছিল। একবার কুক্ষণে ইহা পৃথিবীর কবলে পতিত হয়, এবং (পৃথিবীর দৌত্য অস্বীকার করায়, অথবা অন্য কি কারণে তাহা জ্ঞাত নহি,) তাহার ধৃষ্টতায় পরিণামস্বরূপ দ্বিখণ্ডিত হইয়া জরাসন্ধের দশা প্রাপ্ত হয়। কিন্তু ধূমকেতু জাতিতে অমর; তাই লাঞ্ছনা সহ্য করিয়াও মৃত্যু হইল না দেখিয়া সে অবশেষে এক "উল্কাশয়ে" আত্মবিসর্জ্জন করিয়া নিজের কলঙ্কের অবসান করিল। (এই ধূমকেতুর বিশেষ বিবরণ, ১৩০৫ সালের 'ভারতী', ভাদ্র ও পৌষ সংখ্যাতে, "বায়েলিদ্" এবং "উল্কাস্রোত" শীর্ষক প্রবন্ধদ্বয়ে পাওয়া যাইবে।)

বৃহস্পতির ন্যায় একটী প্রধান গ্রহ যে কেবল কয়েকটী নিয়োজিত দূত রাখিয়াই নিরস্ত আছেন তাহা নহে, কোন কোন সময় সান্নিধ্যে কোন পরিব্রাজকজাতীয় ধূমকেতু পাইলে তাহাকেও দৌত্যে নিযুক্ত করিতে ছাড়েন না। একবার একটী নিরুদ্দেশ ধূমকেতু দৈবদুর্ব্বিপাকে তাঁহার সান্নিধ্যে আসিয়া পড়িয়াছিল। বৃহস্পতি অমনি তাহাকে মাধ্যাকর্ষণবলে ধরিয়া সৌরজগতের কার্য্যে নিযুক্ত করিয়া লইলেন; কিন্তু একবার মাত্র বার্ত্তা বহন করাইয়াই, কিছুদিন আপনার অন্তঃপুরে রাখিয়া পুনরায় তাহাকে কোন অনির্দ্দেশ্য পথে ছাড়িয়া দিলেন। (এই ধূমকেতুর প্রতি বৃহস্পতির অত্যাচারের কাহিনী ১৩০৫ সালের 'প্রদীপ' বৈশাখ সংখ্যায়, "বৃহস্পতির কলঙ্ক" শীর্ষক প্রবন্ধে পাওয়া যাইবে।)

ধূমকেতুগণ একান্তই নিঃসম্বল জাতি। তাহারা জড়ত্ব হেতু যে কোন গ্রহদ্বারা আকৃষ্ট ও লাঞ্ছিত হইতে পারে; কিন্তু তাহাদের আভ্যন্তরীন জড়মান এত সূক্ষ্ম অথবা সম্বলবিহীন যে তাহারা কাহারও কেশাগ্রও স্পর্শ করিতে সক্ষম হয় না। সৌরজগতে যত ধূমকেতু দৌত্যকার্য্যে নিয়োজিত আছে, তাহারা যে আজন্মকাল হইতে এইরূপ

নিয়োজিত রহিয়াছে, তাহা অনুমান করিবার কোন কারণ নাই। অধিকাংশ ধূমকেতুই যে পরব্রাজকের ন্যায় আসিয়া আপনাদের নিঃসম্বল অবস্থা বিজ্ঞাপিত করিয়া প্রধান গ্রহদিগের দাসত্বগ্রহণ করিয়াছে, তাহা সহজে অনুমান করা যাইতে পারে। ইহাদের মধ্যে কোন কোন ধূমকেতু গ্রহগণকর্তৃক বিপর্য্যস্ত হইয়া অবসর গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিতেছে;—তাহারা যতই বিপর্য্যস্ত হইতেছে ততই উত্তরোত্তর সূর্য্যের নিকটবর্ত্তী হইতেছে। ইহার অবশ্যম্ভাবী ফল এই হইবে যে ঐ সকল ধূমকেতু একদিন সূর্য্যের আলয়ে নিবদ্ধ হইয়া অনন্ত দহনরূপ 'পেনসান' লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে।

বৃহস্পতির দূতগুলির গতিবিধি পর্য্যালোচনা করিয়া ইহা জানা যাইতেছে যে, যখনই তাহাদের কক্ষের সীমান্তভাগে তাহাদের গতিবিপর্য্যয়ের লক্ষণ দেখা যাইতে থাকে, তখনই ইহা অনুমান করা যুক্তিসিদ্ধ যে তাহারা ঐ সকল স্থলে গ্রহের সাক্ষাৎ পাইয়াছে। আমরা যদি বৃহস্পতির অস্তিত্ব জ্ঞাত না থাকিতাম তাহা হইলে এই সকল ধূমকেতুর ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে গতিবিপর্য্যয় ঘটিতে দেখিয়া তাহার কারণানুসন্ধান করিতে গিয়া বৃহস্পতিগ্রহ আবিষ্কার করিতে সক্ষম হইতাম। গত মাঘের প্রবাসীতে "বরুণাবিষ্কারের" বিষয় যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে ইহা প্রতিপন্ন হইবে যে ধূমকেতুর বিচলন দেখিয়া গ্রহাবিষ্কার অপেক্ষাকৃত সহজ ব্যাপার; কারণ ধূমকেতু স্বয়ং কাহাকেও আকর্ষণ করিতে অক্ষম। অতএব ধূমকেতুর প্রতি কোন গ্রহের আকর্ষণ গণনা করিবার সময় ঐ গ্রহের প্রতি ধূমকেতুর প্রত্যাকর্ষণ গণনায় আসিবে না।

"হ্যালী" নামক একটী ধূমকেতু প্রায় ৭৬ৎ বৎসরে একবার আপন কক্ষাবর্ত্তন পূর্ণ করে। বৃহস্পতির দূতগণের তুলনায় ইহা চর-জাতীয়। এযাবৎ ইহার পাঁচ আবির্ভাব পর্য্যবেক্ষিত হইয়াছে, এবং ইহার পুনরাবির্ভাবের কাল ১৯১২ খৃঃঅঃ ধার্য্য করা হইয়াছে। ১৮৩৫ খৃঃঅব্দে যখন এই ধূমকেতু দেখা গিয়াছিল, তখন ইহার গতিকাল পূর্ব্ববর্ত্তী গতিকাল সমূহের সহিত মিলাইয়া দেখা গিয়াছিল যে সৌরজগতে তৎকালে যে সকল গ্রহ পরিজ্ঞাত ছিল তাহাদের আকর্ষণ বাদ দিয়া অপর কোন অনির্দ্দিষ্ট কারণে এই ধূমকেতু তৃতীয় আবর্ত্তনে একবার করিয়া বিপর্য্যস্ত হইতেছে। এই ধূমকেতুর গতিবিপর্য্যয় হইতে তৎকালে বহু বাদানুবাদের সূত্রপাত হইয়াছিল; এবং এক জন জ্যোতির্ব্বিদ এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে ধূমকেতুর কক্ষের সীমান্তপ্রদেশ যত দূরে অবস্থিত সূর্য্য হইতে প্রায় ততদূরে থাকিয়া কোন অজ্ঞাত গ্রহ প্রায় ২০০ বৎসরে সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতেছে; তাহারই আকর্ষণে "হ্যালী" বিপর্য্যস্ত হইতেছে। ইহার দশ বৎসর পরে অন্য উপায়ে বরুণগ্রহ আবিষ্কৃত হয়। তখন দেখা গেল যে এই গ্রহই "হ্যালী"কে মাঝে মাঝে দৌত্যকার্য্যে নিয়োজিত করিয়া থাকে! কিন্তু ইহাও দেখা যাইতেছে যে বরুণের এক আবর্ত্তনকাল হ্যালীর তিন আবর্ত্তনকাল হইতে অনেক কম; এবং তাহার কক্ষের সীমান্তভাগ বরুণের কক্ষ ছাড়াইয়া অনেক দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। আডাম্‌স্ ও লাবেরিয়ে (গত মাঘের প্রবাসীতে "বরুণা বষ্কার"বিষয়ক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য) যে গ্রহফল গণনা করিয়াছিলেন, সেই ফলানুযায়ী যদি কোন গ্রহ আবিষ্কৃত হইত, অর্থাৎ বরুণগ্রহ যথার্থ প্রত্যক্ষগোচর গ্রহ না হইয়া যদি উক্ত জ্যোতির্ব্বিদদ্বয়ের গণিত গ্রহ হইত, তাহা হইলে হ্যালীর গতিবিপর্য্যয়ের কারণ তাহাতে সম্যক আরো প্রত হইতে পারিত।

হ্যালী ছাড়া বরুণের আর পাঁচটী দূত আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহাদের গতিবিধি পর্য্যালোচনা করিয়া জানা যাইতেছে যে, "বরুণাবিষ্কারের" প্রবন্ধোক্ত উপায়ে ঐ গ্রহ আবিষ্কৃত না হইলেও এককালে ধূমকেতু-বার্ত্তাবহের বার্ত্তাবহনকুশলতায় বরুণ আবিষ্কৃত হইবার সম্ভাবনা ছিল।

সকল দূতজাতীয় ধূমকেতুর কক্ষ গণনা করিয়া দেখা যাইতেছে যে তাহাদের কক্ষের সীমান্তভাগ সৌরজগতের কোন না কোন গ্রহকক্ষের নিকটবর্ত্তী যেন। কোন নির্দ্দিষ্ট গ্রহ ও সূর্য্যের মধ্যে বার্ত্তার আদান প্রদান জন্যই ঐ সকল বার্ত্তাবহ নিয়োজিত রহিয়াছে এবং অবস্থিতি করিতেছে। এইরূপে দেখা যায় যে বৃহস্পতির নয়টী, শনির একটী, ইন্দ্রের দুইটী এবং বরুণের ছয়টী দূত রহিয়াছে। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে যে সকল ধূমকেতুকে চর-জাতিভুক্ত করা হইয়াছে, প্রকৃতপক্ষে তাহারা কোন অতি দূরস্থ অপরিজ্ঞাত গ্রহের বার্ত্তা বহন করিয়া যাতায়াত করিতেছে।

দুইটী ধূমকেতু এরূপ জানা গিয়াছে যাহারা সীমাবদ্ধ কক্ষে বিচরণ করিতেছে; কিন্তু তাহাদের কক্ষের সীমান্তভাগ সূর্য্য হইতে যতদূরে অবস্থিত তাহা পৃথিবীর দূরত্বের ৪৮ গুণ। যদি ইহাদিগকে দূত মনে করা যায় তবে ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে, বরুণের কক্ষের বহির্ভাগে ঐ ধূমকেতুদ্বয়ের সীমান্তভাগের সন্নিধানে কোন অজ্ঞাত গ্রহের কক্ষ রহিয়াছে। অনেক পণ্ডিত এই গ্রহের অস্তিত্ব বিষয়ে এত আস্থাবান হইয়াছেন যে ইহার একটী স্বতন্ত্র নাম পর্য্যন্ত দেওয়া হইয়াছে। কয়েক জন ইংরেজ জ্যোতির্ব্বিদ বিশ্বাসী ইহার নাম "ভিক্টোরিয়া" রাখিয়া রাজভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। যদি কখনও "ভিক্টোরিয়া" গ্রহ মানবজ্ঞানের আয়ত্ত ও ধরাবাসী মনুষ্য কর্ত্তৃক আবিষ্কৃত হয়, তবে ইহা নিশ্চয় জানিতে হইবে যে ধূমকেতু-বার্ত্তাবহ ইহার সংবাদ ধরাতলে প্রথম প্রচার করিয়াছিল।

শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত।

পঞ্জাবে বাঙ্গালী।

ঐতিহাসিক প্রবন্ধলেখক শ্রীযুক্ত হরিসাধন মুখোপাধ্যায় মহাশয় "গুরুনানক ও শিখজাতির অভ্যুদয়" শীর্ষক প্রবন্ধে * লিখিয়াছেন, "নানকের বাঙ্গালা পরিভ্রমণ সময়ে এতদ্দেশে বিদ্যাশিক্ষার 'স্বর্ণযুগের' আবির্ভাব হইয়াছিল। বড় বড় নৈয়ায়িক, দার্শনিক ও কবিরা তখন বঙ্গমাতার মুখোজ্জ্বল করিতেছিলেন। অবশ্য তাঁহাদের সহিত নানকের কোন না কোন সংঘর্ষণ হইয়াছিল। কিন্তু ইহার কিকোন লিখিত ইতিবৃত্ত আছে?" নানক যে তালকণ্ডী নগরবাসী জনৈক মৌলবীর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার অনেক প্রমাণ আছে এবং জাতিভেদের উচ্ছেদকারী শিখধর্ম্মপ্রবর্ত্তক সমসাময়িক উদারমত চৈতন্যসম্প্রদায়ের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান করিবারও যথেষ্ট কারণ আছে। "গৌরাঙ্গলীলা", "শ্রীবৃন্দাবন রহস্য" প্রভৃতি প্রণেতা ও 'সাবিত্রী' নাম্নী মাসিকপত্রিকা-সম্পাদক ডাক্তার শ্রীরামযাদব বাগচী মহাশয়কে এ বিষয়ে আমরা জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। উপস্থিত শিখ ধর্ম্মগ্রন্থ অথবা অন্য প্রমাণ অভাবে আমরা তাঁহার পত্রখানি * ফুটনোটে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। সম্প্রতি "সজ্জনতোষিণী"র সম্পাদক এবং বিবিধ বৈষ্ণবগ্রন্থপ্রণেতা শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত কেদারনাথ ভক্তিবিনোদ মহাশয়কে এবিষয় জিজ্ঞাসা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু তাঁহার প্রমুখাৎ কোন নিশ্চয় বাক্য না পাওয়ায় আপাততঃ আমাদের সন্দেহ রহিয়া গেল। পাঠকগণের মধ্যে কেহ অনুসন্ধান করিলে আমরা বাধিত হইব। তবে নানকের সময়ে পঞ্জাবে চৈতন্যপ্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম প্রবেশ লাভ করে, তাহার ইতিহাস আছে। ইতিপূর্ব্বে সনাতন শিষ্য পঞ্জাবী রামদাস কর্পূরের কথা বলা হইয়াছে। তিনি মুলতানে বৃন্দাবনের "মদন গোপালে"র অনুরূপ একটি মন্দির ও বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত করেন। † মুলতানে ইহার প্রভাবে অনেক পঞ্জাবী চৈতন্যসম্প্রদায়ভুক্ত হন। সম্ভবতঃ এই সময় হইতে পঞ্জাবে বাঙ্গালীপ্রবাসের সূত্রপাত হইয়া থাকিবে।

ইংরাজের প্রভাবে বাঙ্গালী প্রথমে পাশ্চাত্য জ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হয়। কিন্তু সে প্রখর রশ্মি অনেকের চক্ষু ঝলসাইয়া দিল। খ্রীষ্টীয় মিশনারিগণ বঙ্গের কত জনকজননীর গৃহ অন্ধকার করিয়া প্রতিভাশালী যুবকগণকে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মে দীক্ষিত করিতেছিলেন। খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী বেগম সমরুর ‡ সাহায্যে উত্তরপশ্চিমে এবং রেভারেণ্ড গোলোকনাথের সাহায্যে পঞ্জাবে এই নবধর্ম্ম প্রচারিত হইতে লাগিল। এই গোল-

* স্বচিন্তা ২য় ভাগ, শ্রাবণ ও ভাদ্র সংখ্যা, ১০৩ পৃষ্ঠা, ১৩০০ সাল।

* "শ্রীপাদ শ্রীনিত্যানন্দ বিষয়ে জানিতে চাহিয়াছেন। সে সম্বন্ধে আমি যেটুকু জ্ঞাত আছি তাহা লিখিতেছি। গুরু নানক শ্রীপাদ নিত্যানন্দের মন্ত্রশিষ্য, এবিষয় শ্রীগুরুনানক লিখিত তাঁহার স্বীয় জীবনীতেও আছে। আর শ্রীগ্রন্থসাহেবেও তাহার আভাস আছে। শ্রীকৃষ্ণদাস গুরুমালী শ্রীপাদ নিত্যানন্দের মন্ত্রশিষ্য। শ্রীকৃষ্ণদাস এবং গুরুনানক সমসাময়িক। গ্রন্থসাহেবের শেষখণ্ডে নামমাহাত্ম্য প্রস্তাবে শ্রীনানক শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভুর নাম অনেক করিয়াছেন এবং "আমার নামশিক্ষার গুরু শ্রীপাদ নিতাই" এই বার বার ইঙ্গিত করিয়াছেন। আমি গ্রন্থ সাহেব হইতে সেই text টী দিবার চেষ্টা করিব. . . ." (বরহানপুর-নিবাসী প্রেমদাস নামক জনৈক কবীরপন্থী সাধুও সুপণ্ডিত বাগচী মহাশয়ের উক্তি সমর্থন করিয়াছেন)।

† বৃন্দাবন রহস্য—রামদাস ও সনাতন—শ্রীরামযাদব বাগচী, এম. ডি., প্রণীত।

‡ The Life and Times of Carey, Marshman and Ward, the Serampore missionaries, 1864.

যোগের সূত্রপাতসময়ে মহাত্মা রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ না করিলে শিক্ষিত সম্প্রদায়ে খৃষ্টধর্ম্মের আরও বিস্তার হইত। রাজা রামমোহন রায় যে ভারতের যুগাবতার হইয়া আসিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার প্রতি কার্য্যে প্রকাশ পাইয়াছে। তিনি কিরূপ যুক্তিবলে ভারতের শিক্ষাস্রোত ফিরাইয়াছিলেন,* কি অপার্থিব শক্তিবলে খ্রীষ্টীয় মিশনারিগণের তর্কজাল ছিন্ন করতঃ হিন্দুর পরধর্ম্মপ্রবণতা রহিত করেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তাঁহার একখানি পত্রে সমগ্র ভারতে শিক্ষাবিষয়ে যুগান্তর আনয়ন করে। বৈষ্ণব উপনিবেশের পর এই সময় বঙ্গীয় উপনিবেশের আর একটা পথ উন্মুক্ত হইল। সনাতন গোস্বামী যেমন রাজপুতানায় আধ্যাত্মিক শক্তি সঞ্চার করিয়া জয়পুর, করৌলী, খেৎড়ী প্রভৃতির পতিত অধিবাসিগণের মতিগতি ফিরাইয়াছিলেন, ব্রাহ্মধর্ম্ম পঞ্জাবে প্রায় সেই কার্য্য সাধন করিল। পঞ্চনদের সামরিক জাতিকে বাঙ্গালী, চরিত্র ও অধ্যাত্মবলে কিরূপ অনুগত করিয়াছিল, তাহা পঞ্জাবপ্রবাসী কয়েকজন প্রধান প্রধান বাঙ্গালীর জীবনচরিত অধ্যয়ন করিলে জানা যাইবে। বর্ত্তমান প্রবন্ধে তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় মাত্র প্রদত্ত হইবে।

উত্তর-পশ্চিম ও অযোধ্যা প্রবাসের বহু কাল পরে পঞ্জাবে বাঙ্গালীর আবির্ভাব হয়। দিল্লীতে যদিও শতবর্ষের পুরাতন বাঙ্গালী পরিবারের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তথাপ রাজধানীতে বাঙ্গালীর বাস অপেক্ষাকৃত আধুনিক। প্রথম শিখযুদ্ধ ১৮৪৫ অব্দে হইয়াছিল। সেই সময় এখানে ইংরাজ প্রবেশ লাভ করেন। ১৭৫৭ সালে বঙ্গে যেমন নবাবের সহিত ইংরাজদের ভাগ্যপরীক্ষা হয়, ১৮৪৯ সালে পঞ্চনদপ্রদেশে তদ্রূপ শিখশক্তির সহিত তাঁহাদের ভাগ্যপরীক্ষা হইল। এক শতাব্দীর ভিতর ভারতে উত্তর এবং দক্ষিণের দুইটা যুদ্ধে সমগ্র ভূখণ্ড ইংরাজের করতলগত হইল। ১৮৪৯ অব্দে পঞ্জাব ব্রিটিশ গভর্মেণ্টের একটা প্রদেশ হইলে সার জন লরেন্স ১৮৫৩ অব্দে ইহার প্রথম চীফ কমিশনর হইলেন এবং "বোর্ড অব আডমিনিষ্ট্রেশন" উঠিয়া গেল। ১৮৪৯ অব্দ হইতে এখানে বাঙ্গালী কেরাণীর আবির্ভাব হইয়াছে, কিন্তু এপ্রদেশেও কেরাণীগিরির জন্য বাঙ্গালী প্রথম প্রবাসী হন নাই। পঞ্জাব ইংরেজাধিকৃত হইবার প্রায় অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বে এখানে বাঙ্গালী ছিলেন। মহাত্মা কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী বহুকাল হইল এই প্রদেশ স্বীয় কর্ম্মক্ষেত্র করিয়াছিলেন। ইনি ১৮৮২ অব্দে ৯২ বৎসর বয়সে প্রয়াগধামে দেহত্যাগ করেন। ব্রহ্মচারী অতি তরুণ বয়সে গৃহত্যাগ করতঃ উত্তর-পশ্চিম, পঞ্জাব, মধ্যভারত প্রভৃতি স্থান পরিভ্রমণ করেন। পঞ্জাবে যে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রাচীন কালীবাড়ীগুলি দৃষ্ট হয়, যাহা দেখিয়া মহাত্মা অলকট সাহেব থিয়সফিষ্ট পত্রিকায় অনেক প্রশংসা করিয়াছেন, যাহা বিদেশীয় বাঙ্গালীগণের একমাত্র আশ্রয়স্থল, বাঙ্গালীর সেই জাতীয় অনুষ্ঠান উক্ত ব্রহ্মচারীর কীর্ত্তি। এই মহাত্মা হাবড়া জেলায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। ইনি বিবাহ করেন নাই। ইনি ভারতবর্ষের নানা স্থান পর্য্যটন করিয়া শেষজীবনে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে প্রবাসী হন। ব্রহ্মচারী মহাশয়ের ভ্রমণের সম্পূর্ণ বিবরণ নাই; তবে স্থানে স্থানে তাঁহার স্থাপিত মঠ, দেবমন্দির, আশ্রম প্রভৃতি হইতে এবং তাঁহার সমসাময়িক বিশিষ্ট বন্ধুগণের নিকট হইতে তাঁহার মহৎ জীবনের অনেক সত্য উদ্ধার করা যাইতে পারে। কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী শক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত ছিলেন। এজন্য শক্তি-উপাসনার প্রধান প্রধান স্থানগুলিতে ইনি জীবনের অধিকাংশ কাল ক্ষেপণ করিয়াছিলেন। ইনি কামরূপ, নেপাল, জ্বালামুখী, হিংলাজ প্রভৃতি স্থানে গিরিগুহায়, নদীতটে, কুঞ্জমধ্যে কঠোর তপস্যা করেন এবং আরাবল্লপর্ব্বতশিখরে ও বারাণসীধামে গঙ্গাতীরে তপঃসাধনার জন্য কুটীর নির্ম্মাণ করেন। ব্রহ্মচারী মহাশয় পর্য্যটন ও কঠোর সাধনার বলে বহুদর্শন এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার সমসাময়িকগণের মধ্যে যাঁহারা এখনও জীবিত রহিয়াছেন, তাঁহাদের অনেকের নিকট শুনা যায়—"ব্রহ্মচারী দেবজানিত পুরুষ" ছিলেন। তাঁহার কি এক অলৌকিক শক্তি ছিল, কেমন একটা দৃঢ়প্রতিজ্ঞার ভাব ছিল, বক্তৃতা ও যুক্তিদ্বারা লোকের চিত্ত বশীভূত করিবার কেমন এক আশ্চর্য্য ক্ষমতা ছিল। তিনি যে সভায় কিম্বা যে ব্যক্তির নিকট গমন করিয়াছেন, তথায় জয়ী হইয়াছেন, যে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, তাহাতেই কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

* শ্রীনগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত মহাত্মা রাজা রামমোহনরায়ের জীবনচরিত, ১০১ পৃষ্ঠা, এবং ৺ অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত ভারতবর্ষীয় উপাসকসম্প্রদায়, ২য় ভাগ, ৩০ পৃষ্ঠা, দ্রষ্টব্য।

তাঁহার তেজঃপুঞ্জময়মূর্ত্তির সম্মুখে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী তিষ্ঠিতে পারে নাই। ব্রহ্মচারী রাজপুতানা, পঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, অযোধ্যা, মধ্যভারত, বেলুচিস্থান এবং হিমালয়ের পার্ব্বত্য প্রদেশে সর্ব্বশুদ্ধ ৩২টী কালীবাড়ী নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। নিঃস্ব অবস্থায় নগ্ন ও ভগ্নপদে * দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া এবং ঘোরতর আন্দোলনে প্রবাসী বাঙ্গালীগণকে উত্তেজিত করিয়া স্বজাতিবৎসলতা ও নিঃস্বার্থতার এই আদর্শ মহাপুরুষ কিরূপে নিরাশ্রয় বিদেশী বাঙ্গালীদের স্থায়ী আশ্রয়স্থল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলেও শরীর পুলককণ্টকিত হইয়া উঠে। ব্রহ্মচারী মহাশয় জীবনের অধিকাংশকাল উত্তর-পশ্চিমে কাটাইয়াছিলেন, কিন্তু পঞ্জাবপ্রবাসী বাঙ্গালীদের প্রথমে তাঁহার নাম উল্লিখিত হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। মহাত্মা কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী হইতেই বাঙ্গালীর জাতীয় কীর্ত্তি পঞ্চনদ প্রদেশে চিরস্থায়ী হইয়াছে। ইঁহারই চরিত্রবলে বহুপূর্ব্বে বাঙ্গালীর প্রতি পঞ্জাবীর শ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল। কৃষ্ণানন্দের শেষ কীর্ত্তি এলাহাবাদের কালীবাড়ী। প্রয়াগেই ইনি দেহত্যাগ করেন।

এই মহাপুরুষের পরবর্ত্তী আর একজন অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন বাঙ্গালী পঞ্জাবপ্রবাসী হন। তাঁহার আবির্ভাবে বাঙ্গালীর গৌরব পঞ্চনদ প্রদেশে অধিকতর প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার কর্ম্মক্ষেত্র অধিকতর বিস্তৃত ছিল। তাঁহার নাম গোলোকনাথ চট্টোপাধ্যায়। গোলোকনাথের পিতা কলিকাতায় নীলের কুঠিতে কর্ম্ম করিতেন। গোলোকনাথ ডফ সাহেবের স্কুলে পড়িতেন। তথাকার শিক্ষায় তাঁহার খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রবণতা জন্মিতে দেখিয়া তাঁহার পিতা তাঁহাকে স্কুল ছাড়াইয়া দিলেন। গোলোকনাথের তখন বিবাহ হইয়াছিল। স্কুল ছাড়াইলে কি হইবে? প্রথম হইতেই তাঁহার হিন্দুধর্ম্মে অনাস্থা জন্মিয়াছিল; তাহার উপর দুর্দ্দমনীয় ধর্ম্ম ও জ্ঞানপিপাসা গোলোকনাথের তরুণ হৃদয়ে ঘোর অশান্তি আনয়ন করিল। † অতঃপর ১৮৩৪ খৃঃ অব্দে সপ্তদশবৎসর বয়সে তিনি কয়েকটী মাত্র টাকা সম্বল করিয়া সন্ন্যাসীর বেশে গৃহত্যাগ করিলেন এবং পদব্রজে বহুকষ্টে কাশীতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথা হইতে ভিক্ষা * সম্বল করিয়া উত্তর-পশ্চিমের নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া পঞ্জাবের লুধিয়ানা নগরীতে অবস্থান করিলেন। এখানে সামান্য কর্ম্ম করিয়া কোন প্রকারে জীবন ধারণ করিতে



স্বর্গীয় রেভারেণ্ড গোলোকনাথ চট্টোপাধ্যায়।

লাগিলেন। পরে ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগে অল্প বেতনে একটী কর্ম্ম প্রাপ্ত হইলেন। তাঁহার কর্ত্তব্যসম্পাদনে উদ্ধতন সাহেব কর্ম্মচারিগণ সাতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া গোলোকনাথের পক্ষপাতী হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা বলিতেন, "এই দূরদেশীয় বাঙ্গালী যুবা সাধুতার আদর্শ," ইত্যাদি †। ১৮৩৬ অব্দে গোলোকনাথ খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করেন। এই সময় হইতে

* কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী বাতরোগে আক্রান্ত হইয়া ঈষৎ খঞ্জ হইয়াছিলেন।

† মধ্যভারত—১৩০৩—পৃ—১৫৯।

* গোলোকনাথ স্বীয় দিনলিপিতে লিখিয়াছিলেন, "সাহারানপুর আসিতে আসিতে দুই দিন নিরম্বু উপবাসী ছিলাম, কাশীতে এক বাঙ্গালীর বাটীতে ভিক্ষা করিতে গিয়া কপোলে চপেটাঘাত সহ্য করিয়াছিলাম। আমি সেই ভিখারী কাঙ্গালী বাঙ্গালী গোলোক ঈশ্বরপ্রসাদে এখন মানুষের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছি।"—সঞ্জীবনী ১৩০২, পৃ ২০৩।

† সঞ্জীবনী, ১৩০২

তাঁহার কর্ত্তব্যের পথ উন্মুক্ত হইল। তখনও পঞ্জাব শিখ-শাসনাধীন। তখন পঞ্জাবে যে কয়জন ইংরাজ মিশনারি ছিলেন, তাঁহারা স্বীয় গণ্ডীর বাহিরে একপদও অগ্রসর হইতে পারিতেন না। মাংসভোজী মদ্যপায়ী শিখদিগের অত্যাচার, কুসংস্কার, ধর্ম্মহীনতা এবং মূর্খতায় পঞ্চনদে যখন চতুর্দ্দিক অশান্তিময় হইয়া উঠিয়াছিল, যখন কি স্বদেশীয় কি বিদেশীয়, যে কোন খৃষ্টান শতদ্রুপার হইলে শিখ-তরবারিতে দ্বিখণ্ডিত হইত, যখন শিখভিন্ন অপর কাহারও শতদ্রুপার হইবার অধিকার ছিল না, এমন সময়ে বাঙ্গালী গোলোকনাথ শতদ্রু পার হইয়া পঞ্জাবের সমাজসংস্কার ও সুশিক্ষা-বিস্তাররূপ ব্রত ধারণ করিয়া তথায় খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার আরম্ভ করিলেন। শতদ্রু পার হইয়া গোলোকনাথ দুইদিন "বিদ্যাশিক্ষার আবশ্যকতা ও নির্ম্মল চরিত্রের গুণ" সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন। সেই ওজস্বিনী বক্তৃতা শুনিয়া পঞ্জাবীগণ তাঁহার শতমুখে প্রশংসা করিল। কিন্তু তৃতীয় দিবস তিনি "খৃষ্টের উদার চরিত্র ও খৃষ্টে ঈশ্বরাবতার" এই বিষয়ে বক্তৃতা করায় তাহারা তাঁহার অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়া হিন্দু, মুসলমান ও শিখ একত্র মিলিত হইয়া ভয়ানক প্রহার করতঃ তাঁহাকে ফিলোর দুর্গে বন্দী করিয়া রাখিল। উপাসনা ও সঙ্কীর্ত্তনে তাঁহার সে রাত্রি কাটিয়া গেল। তাঁহার অসামান্য ধর্ম্মভাবে মুগ্ধ হইয়া শিখগণ তাঁহাকে পরদিন প্রভাতে মুক্তিদান করিল। ১৮৪৭ অব্দে গোলোকনাথ রেভারেণ্ড উপাধি প্রাপ্ত হইয়া জালন্ধরে অবস্থিত হইলেন। গোলোকনাথের আগমনে জঙ্গলময় জালন্ধর দিব্যনগরীতে পরিণত হইল। গির্জ্জাঘর, মিশনবাড়ী, পুস্তকালয়, অনাথাশ্রম, চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপিত হইল। গোলোকনাথ তখন পঞ্জাবের চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিয়া সমাজসংস্কার ও শিক্ষা বিস্তার বিষয়ে ঘোর আন্দোলন করিতে লাগিলেন ও বহুসংখ্যক পঞ্জাবীকে খৃষ্ট ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। গোলোকনাথের চেষ্টায় পঞ্জাবের নানা স্থানে ইংরাজী স্কুল, দেশীয়ভাষা শিক্ষার পাঠশালা, পুস্তকালয়, বক্তৃতাগৃহ, চিকিৎসালয়, অনাথাশ্রম এবং বালিকা-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। অনেক বড় বড় লোক আসিয়া গোলোকনাথের শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন। ইহাঁর সুপ্রসিদ্ধ শিষ্যবর্গের মধ্যে কপূরতলার মহারাজের জ্যেষ্ঠপুত্র প্রিন্স হরনাথসিংহ বাহাদুর, জি এস. আই., ও রেভারেণ্ড আবদুল্লা এবং তাঁহার সহধর্ম্মিণীর নাম উল্লেখযোগ্য। রেভারেণ্ড আবদুল্লার এক কন্যা পঞ্জাব গভর্ণমেণ্ট বালিকাবিদ্যালয় সমূহের ইনস্পেক্‌ট্রেস। অপর কন্যা পঞ্জাবের সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক। কপূরতলার রাজকুমার রেভারেণ্ড গোলোকনাথের শিষ্য এবং জামাতা। ইহাঁর পুত্র ও রাজবংশীয় দৌহিত্রগণ এক্ষণে কৃতী হইয়াছেন। গোলোকনাথ পঞ্জাবের নানা স্থানে অনেক ভূসম্পত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। ১৮৯১ খৃঃ অব্দে ২রা আগষ্ট, ৭৬ বৎসর বয়সে জালন্ধরে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার সমাধির সময় তিন সহস্র লোক উপস্থিত হইয়াছিলেন। পঞ্জাবের হিন্দু মুসলমান শিখ খৃষ্টান সকল সম্প্রদায়ের লোক চাঁদা তুলিয়া "Goloknath Memorial Church" প্রতিষ্ঠিত করিয়া পাদরি গোলোকনাথের স্মৃতি চিরস্থায়ী করিয়া রাখিয়াছেন। গোলোকনাথের ক্ষমতা পঞ্জাবে এরূপ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল যে তিনি লাট হইতে নিম্নতম শ্রেণীর লোক পর্য্যন্ত জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে সকলের নিকট সম্মানিত হইয়াছিলেন। তাঁহার অত্যাধিক ক্ষমতার কথা এক্ষণে প্রবাদস্বরূপ হইয়াছে। সিপাহীবিদ্রোহের সময় যখন শতশত দেশী ও ইউরোপীয় খৃষ্টানগণকে বিদ্রোহিগণ হত্যা করিয়াছিল, তখন বাঙ্গালী খৃষ্টান গোলোকনাথের একটী কেশও কেহ স্পর্শ করে নাই। এই সময়ে কপূরতলার মহারাজা বিদ্রোহীদিগের সহিত যোগদান করিতে উদ্যত হন, কিন্তু গোলোকনাথের কথায় শত্রু না হইয়া গভর্ণমেণ্টের সহায় হন। গোলোকনাথ পরে গভর্ণমেণ্টের দ্বারা মহারাজাকে পুরস্কৃত করেন। গোলোকনাথ হইতেই পঞ্জাবে সর্ব্বপ্রথম শিক্ষার সূত্রপাত হয় এবং ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দ ছোটলাট সার রবার্ট মণ্ট্‌গোমারীর সাহায্যে স্ত্রীশিক্ষা প্রথম প্রবর্ত্তিত হয়। তাঁহার জীবনচরিতলেখক মহাশয় লিখিয়াছেন, "পঞ্জাবের আজিকালিকার শিক্ষিত যুবকেরা তাঁহার চেষ্টার ফলস্বরূপ। পঞ্জাবের স্ত্রীশিক্ষা, পুরুষশিক্ষা, ধর্ম্মচর্চ্চা, সমাজসংস্কার, এ সকলের গোলোকনাথই মূল। পঞ্জাবের দাতব্যালয়সমূহের তিনিই প্রথম উৎসাহদাতা। পঞ্জাবে গোলোকনাথের নাম কখনও লুপ্ত হইবে না; Goloknath was the pioneer of Education in the land of the five waters, (Mr. Mackenzies' Journal)। পঞ্জাব প্রদেশে কোনও

বিদেশী পুরুষ গোলোকনাথের স্থানাধিকার করিতে পারে নাই; ***** খৃষ্টধর্ম্ম ও খৃষ্টীয় সমাজ সম্বন্ধে পঞ্জাবে গোলোকনাথ যাহা করিয়া গিয়াছেন, ইউরোপীয় মিশনরির শতবৎসরের চেষ্টায় তাহার অৰ্দ্ধ অংশ হওয়াও সুকঠিন। *** বঙ্গদেশের বাহিরে দেশীয় খৃষ্টানসমাজে গোলোকনাথ ভিন্ন আর কোনও বাঙ্গালী খৃষ্টান বিদেশে এত বড় মহাপুরুষ হইতে পারেন নাই।"* গোলোকনাথ যখন পঞ্জাবে আগমন করেন, তখন সামান্য বাঙ্গালা ও সামান্য ইংরাজী ব্যতীত আর কিছু জানিতেন না; উত্তরকালে কিন্তু দশটি ভাষায় মহাপণ্ডিত, অতি উচ্চদরের বক্তা, সুলেখক ও গভীর চিন্তাশীল পুরুষ বলিয়া হিন্দু মুসলমান ও খৃষ্টান শিক্ষিতসমাজে আদৃত হইয়াছিলেন। সকলেই একবাক্যে বলিতেন, তাঁহার সমকক্ষ কেহই ছিলেন না। এই গোলোকনাথের নাম কয়জনবাঙ্গালী জানেন? মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যাহা ভারতের জন্য করিয়া গিয়াছেন, রেভারেণ্ড গোলোকনাথ তাহা পঞ্জাবের জন্য করিয়াছেন। বাঙ্গালীর গৌরব প্রবাসী গোলোকনাথের জীবনের বিশদ বিবরণ পাঠকগণ ১৩০২ সালের সঞ্জীবনী ও ১৩০৩ সালের নব্যভারত দেখিতে পারেন। [ক্রমশঃ।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।

ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ।

মৃচ্ছকটিকম্।

(ক) আখ্যায়িকা।

[ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ শীর্ষক প্রবন্ধ অধিকদূর অগ্রসর না হইতেই শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। তাঁহাকে শেষপর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে অসম্মত দেখায় এই প্রবন্ধ যথাস্থানে বিন্যস্ত না হইয়া পূর্ব্বাংশেই মুদ্রিত হইল। ইহাতে ক্রমভঙ্গদোষ ঘটিল বলিয়া পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন।]

মৃচ্ছকটিক রূপক শ্রেণীর অন্তর্গত প্রকরণ নামধেয় দৃশ্যকাব্য, দশ অঙ্কে পরিসমাপ্ত। ইহার আখ্যানবস্তু কবিকল্পিত লৌকিকবৃত্ত হইতে সংকলিত বলিয়া, এই নাট্যগ্রন্থ লোকব্যবহারের বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় আদ্যন্ত সমুজ্জ্বল; হাস্য ও করুণ ও শৃঙ্গার রসের আতিশয্যে, সুললিত পদবিন্যাসকৌশলে নিরতিশয় সুখপাঠ্য। এরূপ গ্রন্থ ভারতীয় নাট্যসাহিত্যে বিরল। যে দেশের লিখিত ইতিহাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সে দেশের পক্ষে এরূপ গ্রন্থ ঐতিহাসিক রত্নভাণ্ডার।

ইহার আখ্যায়িকা বড় মর্ম্মস্পর্শী। বাহ্যরূপে আদ্যন্ত হাস্য ও শৃঙ্গার রসের সমাবেশ; কিন্তু অভ্যন্তরে কেবল করুণরসের প্রবল প্লাবন। তাহাতে গল্পাংশ সরস ও সুখপাঠ্য হইয়াই নিরস্ত হয় নাই; দরিদ্রের সুখদুঃখ, হাস্য ক্রন্দন, বিপৎ সম্পৎ যথাযথ বর্ণনা করিয়া লোকব্যবহারের বিচিত্র ইতিহাস উদ্ঘাটিত করিয়াছে।

উজ্জয়িনী নগরে পালক নামক নরপালের শাসনসময়ে নাগরিক সুখসমৃদ্ধির অভাব ছিল না, কিন্তু নরপতি ন্যায়নিষ্ঠ প্রজাপালক বলিয়া পরিচিত ছিলেন না। তিনি সন্দেহস্থলে সিংহাসন রক্ষার্থ অকার্য্য করিতেও ইতস্ততঃ করিতেন না। আর্য্যকনামধেয় কোন অজ্ঞাতকুলশীল গোপালযুবক রাজা হইবেন বলিয়া সিদ্ধগণ ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করিয়াছেন,— এই জনরবে পালক তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া শৃঙ্খলাবদ্ধ করেন। আর্য্যক দরিদ্র হইলেও জনসাধারণের সহানুভূতি লইয়া কারাপ্রবেশ করিয়াছিলেন। তৎকালে উজ্জয়িনী নগরে চারুদত্তনামধেয় এক দরিদ্র যুবা বাস করিতেন। তিনি চিরদিন দরিদ্র ছিলেন না। ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া অর্থোপার্জ্জনের জন্য বাণিজ্য ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়া, আর্য্য চারুদত্ত দ্বিজ সার্থবাহ নামে পরিচিত থাকিয়া শ্রেষ্ঠিচত্বরে প্রাসাদতুল্য বাসভবনে কাল যাপন করিতেন। অভ্যুদয়কালে সে বাসভবন হাস্যকৌতুকে উচ্ছৃঙ্খল, দয়াদাক্ষিণ্য ও পুণ্যকর্ম্মে সমুজ্জ্বল ছিল। তখন তিনি দীনজনের কল্পবৃক্ষ বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার বিপুল ঐশ্বর্য্যভাণ্ডার "পুরস্থাপন-বিহারারাম দেবালয়তড়াগকূপযূপে" উজ্জয়িনীকে নিরতিশয় অলঙ্কৃত করিয়া রাখিয়াছিল।

ভাগ্যবিপর্য্যয়ে চারুদত্তের সে অতুল ঐশ্বর্য্যরাশি ধূলিপটলের ন্যায় উৎক্ষিপ্ত ও বিপর্য্যস্ত হইয়া গেলে, একে একে বন্ধুজন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র প্রস্থান করিয়াছিলেন। গৃহাঙ্গণ তৃণপুঞ্জে সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, তৈলাভাবে প্রদীপ জ্বালিবার সামর্থ্য পর্য্যন্তও বিলুপ্ত হইয়াছিল। একটি মাত্র ভৃত্য বৰ্দ্ধমানক এবং একটি মাত্র দাসী রদনিকা সে বিপুল প্রাসাদের সংরক্ষণকার্য্য সুসম্পন্ন করিতে

*নব্যভারত, ১৩০৩।

পারিত না। দরিদ্র চারুদত্ত তন্মধ্যে বধূ ও শিশুপুত্র রোহসেনকে লইয়া কায়ক্লেশে দিনযাপন করিতেন। যাহারা সৌভাগ্যের দিনে মধুচক্রবৎ পরিবেষ্টন করিয়া নিরন্তর ভন্ ভন্ রবে চারুদত্তের প্রাসাদকক্ষ শব্দায়মান করিয়া তুলিত, তাহারা উড়িয়া চলিয়া গেলেও, চারুদত্তের সর্ব্বকালমিত্র মৈত্রেয় নামধেয় বিদূষক মহাশয় অকৃত্রিম সুহৃৎ ও সহচররূপে বর্ত্তমান ছিলেন। তিনি দিবাভাগে এখানে ওখানে সেখানে—"যত্র তত্র চরিত্বা"—(নিমন্ত্রণ রক্ষা করিয়া) রজনীমুখে গৃহপারাবতের ন্যায় চারুদত্তের নিকট উপনীত হইয়া শয়নোপবেশন ও কথোপকথনে চিত্তবিনোদন করিতেন। চারুদত্ত বিভবনাশে অবসন্ন না হইয়া, দুঃখের দিনেও চরিত্রগত উদারতার জন্য সকলের নিকট সম্মানাস্পদ ছিলেন।

এই সময়ে উজ্জয়িনী নগরে রাজশ্যালক সংস্থানকের প্রবল প্রতাপে লোকে নিরতিশয় উদ্বিগ্ন থাকিত। সে রাজার অনূঢ়া ভার্য্যার ভ্রাতা,—দুষ্কুলজাত দুর্ম্মুখ—অশিক্ষিত, উচ্ছৃঙ্খল,—নিয়ত নীচসঙ্গপ্রয়াসী দুষ্টাত্মা! বিট ও চেট সমভিব্যাহারে সায়াহ্নে রাজপথে বহির্গত হইলে "শকার" মহাশয়কে দেখিয়া ভয়ে জড় সড় হইয়া লোকে ভাল করিয়া পথ চলিতে পারিত না! উজ্জয়িনীর সমৃদ্ধিশালিনী বারবিলাসিনীপল্লীতে তৎকালে বসন্তশোভার ন্যায় সৌরভসৌন্দর্য্যসুগঠিতকলেবরা বসন্তসেনা নাম্নী গণিকাদারিকা বাস করিতেন। তখন তাঁহার যৌবনোদ্গমকাল, সৌন্দর্য্যের সঙ্গে কলাচাতুর্য্যের সমাবেশে বসন্তসেনার নাম সর্ব্বত্র সুপরিচিত, ঐশ্বর্য্যের অবধি ছিল না; হস্তী, অশ্ব, বলীবর্দ্দ, প্রবহণ, তোরণ, তড়াগ, বৃক্ষবাটিকা এবং প্রকোষ্ঠের পর প্রকোষ্ঠ;—কোথায়ও পানশালা, কোথায়ও সঙ্গীতশালা, কোথায়ও বা রন্ধনশালার সমাবেশে সে বেশ্যানিকেতন রাজভবনকে পরাভূত করিয়া নন্দনকাননের ন্যায় প্রতিভাত হইত। শ্যালক মহাশয় বসন্তসেনার রূপাগ্নিতে পতঙ্গবৎ দেহ সমর্পণ করিবার জন্য উন্মত্ত হইয়াও সফলকাম হইতে পারেন নাই; গুণানুরক্তা বসন্তসেনা তাঁহার প্রেরিত বহুমূল্য রত্নালঙ্কারে প্রলুব্ধ না হইয়া দরিদ্র চারুদত্তের প্রেমাকাঙ্ক্ষায় তন্ময় হইয়া উঠিয়াছিলেন।

এই প্রেমানুরাগ দরিদ্র চারুদত্তকেও স্পর্শ করিয়াছিল; কিন্তু দরিদ্র বলিয়া চারুদত্ত সে কথা দন্তস্ফুট করিতেন না। ঘটনাক্রমে বসন্তসেনার সঙ্গে সম্মিলন হইবামাত্র সে বালির বাঁধ ভাসিয়া গিয়া পরস্পরের প্রেমপ্রবাহ পরস্পরকে প্রেমাভিষিক্ত করিয়া দিল। তখন বসন্তসেনা চারুদত্তের হৃদয়রাজ্যের রাজ্যেশ্বরী হইয়াও আপনাকে "গুণনির্জ্জিতা দাসী" বলিয়া ঘোষণা করিয়া তাঁহার দারিদ্র্যপীড়িত তমসাচ্ছন্ন জীবনে বিদ্যুল্লতার ন্যায় প্রতিভাত হইতে লাগিলেন।

উজ্জয়িনীর ধনকুবেরগণ শ্রেষ্ঠিচত্বরে প্রতিবসতি করিতেন। তাঁহাদের বালকবালিকাগণ সুবর্ণশকট লইয়া ক্রীড়া করিত। দরিদ্র চারুদত্তের শিশুপুত্র রোহসেন সুবর্ণ ক্রীড়নক না পাইয়া রোরুদ্যমান বলিয়া দাসী রদনিকা তাহাকে একখানি মৃণ্ময় শকট প্রস্তুত করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু শিশু তাহাতে শান্ত হয় নাই:—সে নিরন্তর সুবর্ণ শকটের জন্যই রোদন করিত। এই মৃণ্ময় শকট হইতেই মৃৎ + শকটিক = মৃচ্ছকটিক বলিয়া কবি গ্রন্থের নামকরণ করিয়াছেন। ইহার সহিত চারুদত্ত ও বসন্তসেনার ইতিহাস আশ্চর্য্যরূপে জড়িত হইয়া গিয়াছিল।

বসন্তসেনা রোহসেনের রোদনের কারণ অবগত হইয়া তাহাকে একখানি সুবর্ণ শকট নির্ম্মাণ করিয়া দিবার জন্য নিজ অঙ্গ হইতে অলংকার মোচন করিয়া দিয়াছিলেন। চারুদত্ত তাহা জানিতেন না। বসন্তসেনা স্বগৃহে প্রত্যাগমন করিলে চারুদত্ত ইহা জ্ঞাত হইবামাত্র ঐ সকল অলংকার প্রত্যর্পণজন্য বিদূষককে বসন্তসেনাগৃহে প্রেরণ করিলেন।

বসন্তসেনা গৃহপ্রত্যাগমনে সক্ষম হইলেন না। পথিমধ্যে রাজশ্যালকের সঙ্গে সাক্ষাৎ হইল। সে তখন তাহার পুষ্পকরণ্ডক নামক জীর্ণোদ্যানে এক বৌদ্ধভিক্ষুকে নিগ্রহ করিতেছিল। পাপাত্মা একাকী বসন্তসেনাকে প্রাপ্ত হইয়া প্রথমে অনুনয় বিনয় ও পরে বলপ্রয়োগ করিল। কণ্ঠপীড়িতা বসন্তসেনা মূর্চ্ছিতা হইলে, রাজশ্যালক তাঁহাকে মৃতা মনে করিয়া শুষ্কপত্রে আচ্ছাদিত করিয়া অভিযোগ উপস্থিত করিবার জন্য অধিকরণমণ্ডপে উপনীত হইল।

বাদী রাজশ্যালক এই মর্ম্মে অভিযোগ উপস্থিত করিল যে অলংকারলোভে কে যেন বসন্তসেনাকে নিহত করিয়া চলিয়া গিয়াছে। বিচারে চারুদত্তের সংস্রব প্রকাশিত হইয়া পড়িল। বসন্তসেনার মাতার সাক্ষ্যে প্রমাণ হইল, বসন্তসেনা চারুদত্তগৃহে গমন করিয়াছিলেন, প্রত্যাগমন করেন নাই।



রাজা রবিবর্ম্মা] সীতা ও স্বর্ণমৃগ [কর্ত্তৃক অঙ্কিত।

চারুদত্ত বলিলেন, বসন্তসেনা গৃহাভিমুখে প্রত্যাগতা হইয়াছেন। বিচারকলহে চারুদত্তের বিরুদ্ধে যখন স্ত্রীহত্যার অপরাধ ক্রমে সন্দেহমূলে সংস্থাপিত হইবার সম্ভাবনা হইতেছিল, সেই সময়ে বিদূষক মহাশয় ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার কুক্ষিতল হইতে বসন্তসেনার অলংকার নিপতিত হইয়া চারুদত্তের অপরাধ সংস্থাপিত করিয়া দিল। চারুদত্ত ব্রাহ্মণ, অতএব অবধ্য এই মর্ম্মে বিচারপতি নির্ব্বাসনদণ্ড প্রদানের জন্য রাজাকে অনুরোধ করিলেও ফল হইল না, পালক প্রাণদণ্ডের জন্যই আদেশ প্রদান করিলেন।

এদিকে বৌদ্ধ ভিক্ষুর শুশ্রূষায় বসন্তসেনা জীবন লাভ করিয়া চারুদত্তের প্রাণদণ্ডাজ্ঞার কথা শুনিবামাত্র বধ্যভূমির উদ্দেশে ধাবিতা হইলেন। গোপযুবক আর্য্যক কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া চারুদত্তের কৃপায় নগরের বাহিরে প্রস্থান করিয়াছিলেন। তিনি ও তাঁহার সহচরগণ রাজাকে নিহত করায়, আর্য্যক সিংহাসনে আরোহণ করিবামাত্র বধ্যভূমিতে দূত প্রেরণ করিলেন। চণ্ডালের উদ্যত খড়্গ চারুদত্তের স্কন্ধে নিপতিত হয় হয়, এমন সময়ে একদিক হইতে বসন্তসেনা, অন্যদিক হইতে রাজদূত, অগ্রপশ্চাৎ বধ্যভূমিতে উপনীত হইয়া এই নৃশংস নরহত্যা হইতে ধর্ম্মাধিকরণকে কলঙ্কমুক্ত করিলেন। রাজাজ্ঞায় বসন্তসেনা বধূপদবী লাভ করিয়া চারুদত্তের সহিত সুসঙ্গতা হইলেন।

এই গল্পাংশ নানা লতাপল্লবে সুসজ্জিত করিবার জন্য কবি যে সকল পাত্র পাত্রীর অবতারণা করিয়া নাগরিক নরনারীর প্রতি দিবসের কার্য্যাকার্য্য বিবৃত করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে সেকালের জনসাধারণের শিক্ষা দীক্ষা আচার ব্যবহার প্রত্যক্ষবৎ প্রতিভাত হইতেছে। শাস্ত্র এবং লোকব্যবহার একরূপ হয় না বলিয়াই লোকব্যবহারকে সুসংযত করিবার জন্য শাস্ত্র নানা শিক্ষা, দীক্ষা ও দণ্ড পুরস্কারের অবতারণা করিয়া থাকেন। তাহা আদর্শরূপে জনসমাজের সম্মুখে সামাজিক জীবনের কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করে। তথাপি জনসমাজ সর্ব্বথা শাস্ত্রশাসন প্রতিপালন করিতে অক্ষম হইয়া নানারূপে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট হইয়া থাকে। কোন যুগে শাস্ত্রশাসন ও লোকব্যবহারের আদর্শ কিরূপ ছিল, তাহা শাস্ত্রপাঠে সহজে অবগত হওয়া যায়। কিন্তু কোন্ যুগে লোকব্যবহার প্রকৃতপক্ষে কিরূপ দাঁড়াইয়াছিল, কেবল শাস্ত্রপাঠে তাহা নিঃসংশয়ে নির্ণয় করা যায় না। কাব্যে প্রসঙ্গক্রমে তাহার সে সকল সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহা ইতিহাসপাঠকের নিকট এই সকল কারণে বহুমূল্য বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। এই কারণে মৃচ্ছকটিক ঐতিহাসিক রত্নভাণ্ডার।

(খ) প্রাচীনত্ব।

কোন্ সময়ে এই নাট্যগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করিতে না পারিলে, ঐতিহাসিক তথ্য সংকলনের সুবিধা হইতে পারে না। ইহাতে যে সকল লোকব্যবহারের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা কোন্ যুগের কথা? গ্রন্থমধ্যে রচনাকাল লিখিত না থাকায়, নানা তর্ক বিতর্ক প্রচলিত হইয়া সত্যোদ্ধারের পথ নিতান্ত কণ্টকাকীর্ণ করিয়া তুলিয়াছে। কাহারও মতে মৃচ্ছকটিক অতি পুরাতন গ্রন্থ; কাহারও মতে নিতান্ত আধুনিক। একদল মধ্যস্থ বলেন,—ইহা খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর রচনা। কোন্ পণ্ডিত কোন্ মতের পক্ষপাতী, তাহার তালিকা সংগ্রহের চেষ্টায় প্রবৃত্ত না হইয়া, গ্রন্থপাঠে রচনাকাল নির্দ্দেশের চেষ্টা করাই সঙ্গত।

মৃচ্ছকটিকের রচনাপ্রণালী ইহার প্রাচীনত্ব সংস্থাপনে সক্ষম বলিয়াই বোধ হয়। ইহাকে বাঙ্গালীর প্রাচ্য মত বলিয়া অবজ্ঞা না করিয়া, এই মত পোষণ করিবার কারণ কি, তাহারই আলোচনা করা উচিত। পূর্ব্বাচার্য্যগণ মত প্রকাশকালে কারণের উল্লেখ না করায়, বংশপরম্পরায় বাঙ্গালী পণ্ডিতসমাজে মৃচ্ছকটিক অতি পুরাতন গ্রন্থ বলিয়া পরিচিত থাকিলেও, কি জন্য পুরাতন গ্রন্থ বলিয়া স্বীকার করিব,—তাহার কারণগুলি সুপরিচিত নাই। তজ্জন্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী দুই একটি একদেশদর্শী কারণের উল্লেখ করিয়া মৃচ্ছকটিকের আধুনিকত্ব প্রতিপাদনে অগ্রসর হইবামাত্র, আমরা তাহা খণ্ডিত করিবার উপায় না পাইয়া, স্বদেশের পুরাতন মতকে বিনা বিচারেই প্রত্যাখ্যান করিয়া থাকি। আমরা মৃচ্ছকটিকের প্রাচীনত্ববিজ্ঞাপক বঙ্গীয় মতের পক্ষপাতী। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মতের সমালোচনায় প্রাচ্য মতকেই সমীচীন বলিয়া স্বীকার করিতে ইচ্ছা হয়। মৃচ্ছকটিকের রচনাপ্রণালীর মধ্যে দুই শ্রেণীর বিশেষত্ব এই প্রাচীনত্ব সূচিত করে। এক অন্তরঙ্গ;—অন্য বহিরঙ্গ। এই দুই শ্রেণীর বিশেষত্বের কথা সর্ব্বাগ্রে আলোচনা করা আবশ্যক।

বিশেষত্বের অন্য নাম অনন্যসাধারণত্ব। সমশ্রেণীর অন্যান্য গ্রন্থে যাহা লক্ষ্য করা যায় না, তাহাকেই মৃচ্ছকটিকের রচনা-প্রণালীর বিশেষত্ব বা অনন্যসাধারণত্ব বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। রচনাপ্রণালী একরূপ ব্যাপার হইলেও, চিরদিন একরূপ রীতির অনুসরণ করে না। সুতরাং রীতির পার্থক্য রচনাকালের পার্থক্য সূচিত করিতে সক্ষম। সংস্কৃত রচনারীতির ইতিহাস সুপরিচিত হইলে, গ্রন্থপাঠমাত্রেই তাহার রচনাকালনির্দ্দেশের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইত। পুরাতন বাঙ্গলা পয়ার ও আধুনিক অভিনব কবিতা পাঠ করিবামাত্রই রচনারীতি কালনির্দ্দেশে সহায়তা করিয়া থাকে। সংস্কৃতেও এইরূপ হইবার কথা।

সংস্কৃত সাহিত্য প্রথমে সরল ও সুললিত ছিল। সহজে জনসমাজের বোধগম্য হইবে, সর্ব্বত্র সুনিয়মে সুসংযত থাকিবে, এই জন্যই পুরাতন ভাষা সংস্কৃত হইয়াছিল। ক্রমে তাহাকে লতাপল্লবে সুসজ্জিত করিবার আশায় লেখকগণ নানা কৃত্রিমতার আবরণে সরল ভাষাকে সমাচ্ছন্ন করিয়া রচনাকে নিতান্ত দুর্বোধ করিয়া তুলিয়াছিলেন! শব্দাড়ম্বর ও ভাবাড়ম্বর যতই ঘনঘটা বিস্তার করিয়াছে, সাহিত্যাকাশ ততই দুনিরীক্ষ্য হইয়া উঠিয়াছে। ইহা অবশ্যই একদিনে সহসা সংঘটিত হয় নাই; ক্রমশঃ অজ্ঞাতসারে এই পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে। কোন যুগের কবিকুল এক শ্রেণীর ভাব প্রকাশের জন্য কোন্ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর শব্দ অলংকার ও রচনারীতি অবলম্বন করিতেন, তাহার দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করিলেই, ইহা সুব্যক্ত হইয়া পড়ে।

বহিরঙ্গে মৃচ্ছকটিকের রচনারীতির যে বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়, তাহা এইরূপ—(১) নান্দ্যন্তে সূত্রধার রঙ্গ প্রবেশ করিয়া প্রথমেই কহিতেছেন, "অলমনেন পরিষৎকুতূহলবিমর্দ্দকারিণা পরিশ্রমেণ।" (২) প্রস্তাবনান্তে অন্যান্য দৃশ্যকাব্যে যে স্থানে লিখিত আছে—"ইতি প্রস্তাবনা", মৃচ্ছকটিকের সেই স্থলে লিখিত আছে—"আমুখম্"। (৩) প্রত্যেক অঙ্কান্তে অঙ্কবর্ণিত আখ্যানবস্তুর সংক্ষিপ্তপরিচয়বিজ্ঞাপক—"ইতি মৃচ্ছকটিকে অলংকারন্যাসো নাম প্রথমোহঙ্কঃ" ইত্যাদি লিখিত হইয়াছে। (৪) অন্যান্য নাট্যগ্রন্থের ন্যায় গর্ভাঙ্ক, প্রবেশক, বিষ্কম্ভকাদি ব্যবহৃত হয় নাই। দশ অঙ্কে পরিসমাপ্ত সুবৃহৎ গ্রন্থে কেবল অঙ্কের পর অঙ্ক ব্যবহৃত হইয়াছে। এই সকল অনন্যসাধারণত্ব নিতান্ত আকস্মিক ঘটনা বলিয়া স্বীকার করিতে না পারিলে, এরূপ বিশেষত্ব প্রবিষ্ট হইবার কারণ অনুসন্ধান করা আবশ্যক। প্রচলিত টীকা টিপ্পনীতে এই সকল বিশেষত্ব লক্ষিত ও সমালোচিত না হওয়ায় সাধারণ পাঠকবর্গের নিকট ইহা সচরাচর প্রতিভাত হয় না; তজ্জন্য অনুসন্ধিৎসাও দেখিতে পাওয়া যায় না। তাঁহারা টীকাসহায়তায় বাক্যার্থের মর্ম্মগ্রহণে কথঞ্চিৎ সক্ষম হইলেই সর্ব্বথা পরিতৃপ্ত হইয়া গ্রন্থান্তরে মনঃসংযোগ করেন।

বহিরঙ্গের ন্যায় অন্তরঙ্গে যে সকল বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে (১) কার্য্য ও প্রয়োগবশতঃ ভাষাব্যতিক্রম, (২) বৃত্তনির্ব্বাচনপ্রণালী, (৩) দৃষ্টান্ত ও কিংবদন্তি এবং (৪) রচনারীতির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নান্দ্যন্তে সূত্রধার রঙ্গপ্রবেশ করিয়া প্রথমেই কহিয়াছেন—"অলমনেন পরিষৎকুতূহলবিমর্দ্দকারিণা পরিশ্রমেণ"। এই কথায় সূত্রধার কোন্ "পরিশ্রমের" উল্লেখ করিয়াছেন, গ্রন্থমধ্যে তাহার উল্লেখ না থাকায়, "অনেন পরিশ্রমেণ" বলিতে কি বুঝিব, তাহা চিন্তার বিষয় হইয়া রহিয়াছে। জীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের টীকায় "নান্দীপাঠজনিতপ্রয়াসেন" বলিয়া ব্যাখ্যা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা টীকাকারমনঃকল্পিত- নাট্যশাস্ত্রবিরুদ্ধ—অনুমান মাত্র। নান্দী দেবস্তুতি। তাহা পাঠ করাকে "পরিশ্রম" বলা অতিশয়োক্তি। তাহাকে 'পরিষৎকুতূহলবিমর্দ্দকারী" বলা নিতান্ত নিন্দাবাক্য। এরূপ ব্যাখ্যা ভারতীয় নাট্যশাস্ত্রের নিকট শ্রদ্ধালাভে সক্ষম হইতে পারে না। অতএব সূত্রধারের প্রথম উক্তির প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, তাহার অনুসন্ধান করা আবশ্যক। সে অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলে, একটি ঐতিহাসিক তথ্যের রহস্যোদ্‌ঘাটন করা প্রয়োজন। ভারতীয় নাট্যসাহিত্যের প্রথম প্রচারসময়ে অভিনয়ারম্ভের পূর্ব্বে "পূর্ব্বরঙ্গ" নামে নৃত্যগীতবাদ্যোত্থমাত্মক অনেকগুলি শ্রমসাধ্য ব্যাপার অনুষ্ঠিত হইত। তদ্দ্বারা পরিষদের অভিনয়দর্শন-কৌতূহল বিমর্দ্দিত হইত বলিয়া, প্রথমে তাহা নিন্দিত, ক্রমে সংক্ষিপ্ত ও অবশেষে একেবারে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। মৃচ্ছকটিকের সূত্রধারোক্তির "পরিষৎকুতূহলবিমর্দ্দকারিণা পরিশ্রমেণ" বলিতে সেই ব্যাপার স্মরণ

করিলে, আর কোন সংশয় উপস্থিত হইতে পারে না। এই বাক্যে বুঝিতে পারা যায়,—মৃচ্ছকটিক রচিত হইবার সময়ে "পূর্ব্বরঙ্গশ্রম" পরিষৎকুতূহলবিমর্দ্দকারী বলিয়া নিন্দিত হইলেও, একেবারে পরিত্যক্ত হয় নাই; সূত্রধার "অলমনেন" বাক্যে তাহাকে সংক্ষিপ্ত করিবার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া কথারম্ভ করিয়াছেন। উত্তরকালে নান্দ্যন্তে সূত্রধার রঙ্গপ্রবেশ করিয়াই কহিতেন—"অলমতি প্রসঙ্গেন।" তদ্দারা "পূর্ব্বরঙ্গ" না করিবার কথা ব্যক্ত হইত। এই সকল কারণে মৃচ্ছকটিকের সূত্রধারোক্ত প্রথম বাক্যই ইহার প্রাচীনত্বসূচক।

সংস্কৃত সাহিত্যে "অলং" শব্দ নানা অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। অমরকোষের "অলংভূষণপর্য্যাপ্তিশক্তিবারণবাচকম্" তাহার পরিচয় প্রদান করে। ভূষণার্থে অলংকার শব্দের ব্যবহার সুপরিচিত। শক্তি অর্থে "অলং মল্লো মল্লায়" প্রসিদ্ধ উদাহরণ। পর্য্যাপ্তি ও বারণ বাচক "অলং" শব্দের উদাহরণ নাট্যসাহিত্যে বহুবার প্রাপ্ত হওয়া যায়। মৃচ্ছকটিকের সূত্রধারোক্ত প্রথম কথা "অলমনেন পরিষৎকুতূহলবিমর্দ্দকারিণা পরিশ্রমেণ" বলিতে পর্য্যাপ্তিবাচক "অলং" শব্দের প্রয়োগ প্রাপ্ত হওয়া যায়। "অলমলমায়াসেন" বলিয়া মদনতাপতপ্তা শকুন্তলার গাত্রোত্থানচেষ্টায় বাধা দিয়া দুষ্মন্ত বারণবাচক "অলং" শব্দের প্রয়োগ প্রদর্শন করিয়াছেন। "অলং" যেখানে পর্য্যাপ্তিবাচক, সেখানে অর্থ এইরূপ,—"যাহা হইয়াছে, তাহাই পর্য্যাপ্ত, আর না।" পক্ষান্তরে, "অলং" যেখানে বারণবাচক, সেখানে অর্থ এইরূপ,—"করিয়া কাজ নাই।" মৃচ্ছকটিকের সূত্রধারোক্তির অলং, অনেন, কুতূহলবিমর্দ্দকারিণা এবং পরিশ্রমেণ, এই কয়েকটি কথায় পর্য্যাপ্তি বুঝাইয়া বলা হইয়াছে—"পূর্ব্বরঙ্গ পরিশ্রমসাধ্য, তদ্দারা অভিনয়দর্শনকৌতূহল বিমর্দ্দিত হয়, অতএব আর অধিকক্ষণ এরূপ শ্রমে প্রয়োজন নাই, যাহা হইয়াছে, ইহাই যথেষ্ট।" ইহাতে মৃচ্ছকটিকের রচনাকালে যে পূর্ব্বরঙ্গ অনুষ্ঠিত হইত, তাহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। উত্তরকালের নাট্যসাহিত্যে এইরূপ স্থলে কেবল "অলমতি প্রসঙ্গেন" পাঠ দেখিতে পাওয়া যায়। সে প্রসঙ্গ এই "পূর্ব্বরঙ্গ"। এইরূপ স্থলে "অলং" শব্দে বুঝা যায়,—"পূর্ব্বরঙ্গ করিবার প্রয়োজন নাই।" একথা বলায়, তৎকালে যে "পূর্ব্বরঙ্গ" রহিত হইয়া গিয়াছিল, তাহার আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়। উত্তরকালের সূত্রধারগণ নান্দীকে পূর্ব্বরঙ্গের স্থলাভিষিক্ত করিয়া নান্দীপাঠান্তে দোষ ক্ষালনের জন্য,—"অলমতি প্রসঙ্গেন" বিস্তৃত পূর্ব্বরঙ্গ করা নিষ্প্রয়োজন বলিতে বাধ্য হইতেন।

পূর্ব্বরঙ্গাবসানে যে অভিনয়ের আরম্ভ হইত, তাহার প্রথমাংশই এক্ষণে "প্রস্তাবনা" নামে পরিচিত। এই নাম আধুনিক। পূর্ব্বে মুখং বা "আমুখং" নাম প্রচলিত ছিল। তাহা নাট্যসন্ধিবিশেষ। নাটক ও প্রকরণ পঞ্চসন্ধিসমন্বিত। তাহার নাম

"মুখং প্রতিমুখং গর্ভো বিমর্শশ্চ তথৈব হি।
তথা নির্বহণং চেতি নাটকে পঞ্চসন্ধয়ঃ॥

এই মুখং বা "আমুখং" শব্দ উত্তরকালে ক্রমশঃ অপ্রচলিত হইয়া "প্রস্তাবনা" শব্দ প্রচলিত হয়। শকুন্তলাদিতে প্রস্তাবনাই ব্যবহৃত হইয়াছে, "আমুখং" ব্যবহৃত হয় নাই। "আমুখং" শব্দ অপ্রচলিত হইবার পর, উহার ব্যাখ্যা করিতে হইলে, সমধিক প্রচলিত "প্রস্তাবনা" শব্দ প্রতিশব্দরূপে উল্লেখ করিতে হইত। তর্কবাচস্পতি মহাশয়ের অভিধানে "আমুখং তদ্বিজানীয়াৎ বুধৈঃ প্রস্তাবনা মতা" এইরূপ ব্যাখ্যা প্রদত্ত হইয়াছে। সাহিত্যদর্পণেও "আমুখং" বুঝাইবার জন্য "প্রস্তাবনা" শব্দের উল্লেখ করিতে হইয়াছে। এই সকল কারণে মৃচ্ছকটিকে ব্যবহৃত "আমুখং" শব্দ ইহার প্রাচীনত্বের নিদর্শন।

সংস্কৃত কাব্য দৃশ্য শ্রব্য ভেদে দুই ভাগে বিভক্ত; উভয় শ্রেণীর গ্রন্থই সাধারণতঃ "কাব্য" নামে কথিত হইবার যোগ্য হইলেও, উত্তরকালে এই শ্রেণীবিভাগ স্মরণ করিয়া লোকে কেবল শ্রব্য কাব্যকেই কাব্য, ও দৃশ্যকাব্যকে 'নাটক' নাম দিয়া 'কাব্য ও নাটক' বলিয়া পার্থক্য প্রচলিত করিয়াছিল। শ্রব্য কাব্যমাত্রেই সর্গ শেষে "ইতি অমুক কাব্যে অমুক নামক অমুক সর্গ" ইত্যাদি বাক্য ব্যবহৃত দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথম প্রথম দৃশ্য কাব্যেও এই রীতি প্রচলিত ছিল; কিন্তু কালে কাব্য ও নাটক নামক বিভাগ নাটককে কাব্য হইতে স্বতন্ত্র নাম প্রদান করায়, দৃশ্যকাব্য হইতে এই সংক্ষিপ্ত পরিচয়-বিজ্ঞাপক "অমুক নাটকে অমুক নামক অমুক অঙ্ক" ইত্যাদি বাক্য পরিত্যক্ত হইয়াছিল। প্রচলিত নাট্য

সাহিত্যের মধ্যে কেবল মৃচ্ছকটিকে ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থের প্রত্যেক অঙ্কান্তে শ্রব্যকাব্যের ন্যায় লিখিত আছে—"ইতি মৃচ্ছকটিকে অলংকারন্যাসো নাম প্রথমোঽঙ্ক" ইত্যাদি। ইহাও মৃচ্ছকটিকের প্রাচীনত্ব-সূচক।

নাট্যসাহিত্যের প্রথমাবস্থায় গর্ভাঙ্ক, বিষ্কম্ভক, প্রবেশক প্রভৃতি বিভাগ বর্ত্তমান ছিল না। প্রথমে কেবল অঙ্ক; তাহার পর প্রবেশক ও অঙ্ক, এবং ক্রমে অন্যান্য বিভাগ পরিকল্পিত হইয়াছিল। মৃচ্ছকটিকের ন্যায় দশ অঙ্কে পরিসমাপ্ত সুবৃহৎ প্রকরণে প্রবেশক, বিষ্কম্ভক বা গর্ভাঙ্কের কোন নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় না; কেবল অঙ্কের পর অঙ্ক। উত্তরকালে রচিত নাট্যগ্রন্থে এই বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাকে মৃচ্ছকটিকের প্রাচীনত্বের প্রমাণ বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে।

বহিরঙ্গের এই সকল বিশেষত্বের কথা সম্যক্ সমালোচনা না করিয়া, কেবল প্রাকৃতভাষার মধ্যে অনেক আধুনিক শব্দ লক্ষ্য করিয়া, মৃচ্ছকটিককে আধুনিক গ্রন্থ বলা সঙ্গত বোধ হয় না। প্রাকৃতভাষায় যে সকল শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহাতে অনেক আধুনিক শব্দ আছে, এরূপ উক্তি ন্যায়-সঙ্গত বা সত্য বলিয়াও স্বীকার করা যায় না। বরং এইরূপ বলা যায়, আধুনিক অনেক বাঙ্গলা, উড়িয়া ও মরাঠীশব্দ যে বহু পুরাতন, মৃচ্ছকটিকে তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

মৃচ্ছকটিকে ব্যবহৃত প্রাকৃত শব্দগুলির বিশেষত্ব আছে,—তাহা সরল ও সুললিত। পুরাকালে এক একটি সংস্কৃত শব্দের বহুসংখ্যক অপভ্রংশ বা গ্রাম্য অপশব্দ প্রচলিত ছিল। ভগবান্ পতঞ্জলি মহাভাষ্যে তাহার উল্লেখ করিয়া দুই চারিটি উদাহরণ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। এই সকল অপভ্রংশ বা অপশব্দের সকলগুলি সমান শ্রুতিসুখকর নহে। কবি রসানুরোধে বা পদলালিত্যবিস্তারকামনায় শ্রুতিমধুর শব্দগুলি নির্ব্বাচন করিয়া লইয়াছেন। অন্য কবি সে স্থলে ভিন্ন শব্দ নির্ব্বাচন করিলে, মৃচ্ছকটিকে ব্যবহৃত প্রাকৃত শব্দের আধুনিকত্ব প্রতিপাদিত হয় না। ইহা ছাড়া, নাট্যানুরোধে নানা দেশভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। তজ্জন্য মৃচ্ছকটিকে দাক্ষিণাত্য ও প্রাচ্য শব্দ ও রচনারীতির বাহুল্য লক্ষিত হয়। নাট্যশাস্ত্রের নির্দ্দেশে সেনা, প্রহরী প্রভৃতির দাক্ষিণাত্য ও বিদূষকাদির প্রাচ্য ভাষা প্রয়োগ করা আবশ্যক। মৃচ্ছকটিকে এই দুই শ্রেণীর অধম পাত্রের আধিক্য থাকায়, দাক্ষিণাত্য ও প্রাচ্য শব্দের আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। নাট্যসাহিত্যনিহিত প্রাকৃতভাষা ব্যবহারের পদ্ধতি ও নিয়ম আলোচনা করিলে ইহা সুব্যক্ত হইবে। সংস্কৃত শব্দ সর্ব্বত্র একই নিয়মের অধীন বলিয়া, শব্দগঠনে পার্থক্য ঘটিতে পারে নাই, কেবল রচনারীতিতে পার্থক্য প্রবিষ্ট হইয়াছিল। প্রাকৃত শব্দ দেশভেদে ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করায় প্রাকৃত পাঠে নানা বিভিন্নতা প্রবিষ্ট হইবার অবসর লাভ করিয়াছিল।

নাট্যসাহিত্যের অভ্যুদয়সময়ে ভারতবর্ষে "সপ্তদেশভাষা" প্রচলিত থাকার কথা ভরতবিরচিত নাট্যশাস্ত্রে লিখিত আছে। তাহা কোথায় কোন্ পাত্রের মুখে কিরূপে প্রযুক্ত হইবে, তাহারও নিয়ম নির্দ্দিষ্ট আছে। তাহার বিচার না করিয়া, মৃচ্ছকটিক ও শকুন্তলাদির প্রাকৃতভাষার পার্থক্য লক্ষ্য করিয়া কোন সিদ্ধান্ত করা যায় না। আর, পার্থক্যের কথাও বিশেষভাবে বিচার করিয়া দেখিলে বলিতে হইবে, কাব্যানুরোধে মৃচ্ছকটিকে প্রতিদিবসের ব্যবহার্য্য সাধারণ কথাবার্ত্তা যত ব্যবহার করা প্রয়োজন হইয়াছে, শকুন্তলাদি অন্যান্য নাট্যগ্রন্থে তত হয় নাই। মৃচ্ছকটিকে ঘিয়ং (ঘৃতং) দহীং (দধি) ব্যবহার করিতে হইয়াছে। শকুন্তলাদিতে যদি ঐ সকল শব্দ ব্যবহার করা প্রয়োজন হইত, এবং ঘিয়ং দহীং ব্যবহৃত না হইত, তাহা হইলে তর্ক চলিতে পারিত। শকুন্তলের প্রাকৃতোক্তিতে যে সকল কথা ব্যবহৃত হইয়াছে, মৃচ্ছকটিকের প্রাকৃতোক্তিতে তাহা যে ব্যবহৃত হয় নাই তাহা নহে;—তাহা ছাড়া অনেক নূতন কথাও ব্যবহৃত হইয়াছে;—তাহা শকুন্তলাদিতে ব্যবহার করার প্রয়োজন ঘটে নাই।

"কার্য্য ও প্রয়োগবশতঃ ভাষাব্যতিক্রম" বলিতে, ভাষা ব্যতিক্রমের দুইটি কারণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। উত্তম পাত্রে প্রাকৃত ও অধম পাত্রে সংস্কৃত পাঠ সংযোগ করাকে ভাষা-ব্যতিক্রম কহে। ইহা রীতিবিরুদ্ধ। কেবল দুইটি কারণে এই রচনারীতির ব্যতিক্রম ঘটিবার ব্যবস্থা ছিল। কার্য্য অথবা প্রয়োগবশতঃ বিশেষ বিধি ভাষাব্যতিক্রমের অধিকার দান করিত। কার্য্যের অর্থ "প্রয়োজন"; প্রয়ো-

গের অর্থ "অভিনয়লালিত্য"। স্ত্রীজনের পক্ষে সুখবোধ্য হইবে বলিয়া প্রয়োজনবশতঃ স্ত্রীজনের সহিত কথোপকথনে উত্তমপাত্রও প্রাকৃতভাষা ব্যবহার করিতে পারেন। এরূপ ব্যবহারকে "কার্য্যবশাৎ" বলে। যথা—"কার্য্যতশ্চোত্তমাদীনাং কার্য্যো ভাষাব্যতিক্রমঃ।" কোন কোন স্থলে সংস্কৃত অপেক্ষা প্রাকৃত পাঠ ব্যবহার করিলে স্বর-লালিত্য বর্দ্ধিত হইয়া বাচিকাভিনয় সমধিক শ্রুতিসুখকর হইবে বলিয়া উত্তমপাত্রও প্রাকৃত ভাষা ব্যবহার করিতে পারেন। এরূপ ব্যবহারকে "প্রয়োগবশাৎ" বলে। মৃচ্ছকটিকের সূত্রধার সংস্কৃত ভাষা ব্যবহার করিতে করিতে গৃহিণীকে আহ্বান করিবার পূর্ব্বে হঠাৎ প্রাকৃত ভাষা ব্যবহার করিতে গিয়া তাহার কারণ উল্লেখ করিবার জন্য স্পষ্টই বলিয়াছেন—"এষোঽস্মি ভোঃ কার্য্যবশাৎ প্রয়োগবশাচ্চ প্রাকৃতভাষী সংবৃত্তঃ।"

কার্য্য ও প্রয়োগবশতঃ ভাষা ব্যতিক্রম করিবার জন্য কবিলেখনীর স্বাধীনতা ছিল। এই স্বাধীনতা বর্ত্তমান থাকিলেও, কালক্রমে কবিকুল ইহার ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়া ছলেন। ভাষা ব্যবহারের সাধারণ নিয়ম,—উত্তম পাত্রে সংস্কৃত ও অধমপাত্রে বা স্ত্রীজনে প্রাকৃত। বিশেষ নিয়ম—প্রয়োজনবশতঃ উত্তম পাত্রে প্রাকৃত ও অধমপাত্র বা স্ত্রীজনে সংস্কৃত। অন্যান্য নাট্যগ্রন্থে এই ভাষাবিপর্য্যয়ের অধিক দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায় না। তখন বিশেষ বিধি ক্রমশঃ, পরিত্যক্ত হইয়া, সাধারণ নিয়মই প্রচলিত হইয়াছিল। মৃচ্ছকটিক রচনাকালে রচনারীতি সেরূপ গণ্ডীবদ্ধ হয় নাই; সুতরাং কবি সূত্রধারের ন্যায় উত্তম পাত্রের মুখে প্রাকৃতভাষা, বসন্তসেনার মুখে সংস্কৃত ভাষা প্রয়োগ করিয়া, ভাষাবিপর্য্যয়সাধনে কবিজনের স্বাধীনতা বহুবার প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। ইহা প্রাচীনত্বের বিশিষ্ট নিদর্শন।

সংস্কৃত কাব্য ছন্দোনিবদ্ধ কবিতাসমষ্টি। ছন্দের মধ্যে সকলগুলি সমান পুরাতন নহে;—অনুষ্টুপ্ সমধিক পুরাতন। ইহা সরল, পুরাতন ও রচনাচাতুর্য্যহীন বলিয়া কবিকুলকর্ত্তৃক ক্রমশঃ পরিত্যক্ত হইয়াছিল। উত্তরকালে রচিত শ্রব্য ও দৃশ্যকাব্যে অনুষ্টুভের বাহুল্য দেখিতে পাওয়া যায় না। কিন্তু মৃচ্ছকটিকে অনুষ্টুপ্ বৃত্ত বড় অধিক ব্যবহৃত হইয়াছে।

মৃচ্ছকটিকে প্রসঙ্গক্রমে যে সকল কিম্বদন্তি আখ্যায়িকা বা দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হইয়াছে, তাহারও বিশেষত্ব আছে। তাহা মৃচ্ছকটিকের রচনাকাল নির্ণয়ের সহায়তা সাধন করে।

ভাষা ও রচনারীতির বিশেষত্ব মৃচ্ছকটিকের প্রাচীনত্বের অন্যতম প্রমাণ। ইহার প্রাকৃতাংশ ও সংস্কৃতাংশের শব্দ ও পদবিন্যাসপ্রণালী স্বতন্ত্র। বাহুল্যভয়ে দুই একটি মাত্র দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইতেছে—

(১) "অলে কাকপদসীসমথকা চুট্টবড়ুকা।"—এই শকার-বাক্যের সংস্কৃত পাঠ এইরূপ—"অরে কাকপদশীর্ষমস্তক দুষ্ট বটুক!" এই বাক্যে শকার বিদূষককে অবজ্ঞাসূচক সম্বোধন করিয়াছেন। এই "কাকপদশীর্ষমস্তক" শব্দের অর্থ কি? আধুনিক টীকাকার জীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয় লিখিয়াছেন "কাকপদবৎ শীর্ষং শিখা যস্য তাদৃশং মস্তকং যস্য তৎ সম্বোধনে।" বলা বাহুল্য বাক্যার্থ অবলম্বন করিয়া ইহার অধিক ব্যাখ্যা করা অসম্ভব। কিন্তু ইহা প্রকৃত ব্যাখ্যা বলিয়া স্বীকার করা যায় না। সেকালের নাট্যাভিনয়ে কাহাকে কিরূপ সাজাইতে হইত, ভরতবিরচিত নাট্যশাস্ত্রে তাহার নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়। তদনুসারে বিদূষকের মস্তক "খলতি বা কাকপদ" করিবার কথা অবগত হওয়া যায়। যথা—"বিদূষকস্য খলতিঃ স্যাৎ কাকপদমেব বা।" এই কাকপদ কেশরচনা কিরূপ ছিল, তাহা গ্রন্থমধ্যে লিখিত নাই। কাকপদের বাক্যার্থ কাক পক্ষীর পদকে সূচিত করিলেও এই পদ রূঢ় শব্দে পরিণত হইয়াছিল। হস্তলিখিত পুস্তকে লিপিকর যে সকল স্থানে পাঠোদ্ধারে অক্ষম হইয়া কিয়দংশস্থান ফাঁক রাখিতেন ঐ সকল স্থানে × × × এইরূপ চিহ্ন ব্যবহৃত হইত। এই চিহ্নের নাম ছিল—কাকপদ চিহ্ন; উহার অর্থ "পরিত্যক্ত বা শূন্যস্থান।" ইহাতে বিদূষকের টাকবিশিষ্ট মস্তক সূচিত হয়। কিরূপ আকৃতিবিশিষ্ট পাত্র নির্ব্বাচন করিয়া বিদূষক সাজাইতে হইবে, তাহার নির্দ্দেশ করিবার সময়ে নাট্যাচার্য্য স্পষ্টই লিখিয়াছেন—

"বামনো দন্তুরঃ কুব্জো দ্বিজন্মা বিকৃতাননঃ।
খলতিঃ পিঙ্গলাক্ষশ্চ স বিধেয়ো বিদূষকঃ॥"

সুতরাং বিদূষকের মস্তকের কেশদারিদ্র্য প্রসিদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল। মৃচ্ছকটিকের বিদূষক মহাশয় নিজেও তাহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। চারুদত্ত ও বসন্তসেনার প্রথম

দর্শন সময়ে উভয়ে উভয়কে নতমস্তকে অভিবাদন করিতেছেন দেখিয়া বিদূষক বলিতেছেন—

"ভো! দুবেবি তুহ্মে সুখং পণমিঅ কলমকেদারা অগ্নোগ্নং সীসেন সীসং সমাঅদা। অহং পি ইমিণা করহজানুসরিসেণ সীসেণ দুবেবি তুহ্মে পসাদেমি।" ইহার সংস্কৃত পাঠ এইরূপ "ভো! দ্বাবপি যুবাং সুখং প্রণম্য কলমকেদারৌ অন্যোন্যং শীর্ষেন শীর্ষং সমাগতৌ, অহমপি অনুনা করভজানুসদৃশেন শীর্ষেণ দ্বাবপি যুবাং প্রসাদয়ামি।" ইহার অর্থ এইরূপ "আপনারা উভয়ে সুখে প্রণাম করায়, আপনাদের পরস্পরের শীর্ষ ধান্যক্ষেত্রের ন্যায় পরস্পরের সহিত সংলগ্ন হইয়াছে; আমি বেচারা আর কি করিব? আমার এই করভজানুসদৃশ শীর্ষ লইয়া আমিও আপনাদের দুজনকেই প্রসন্ন করি।" বেচারা বিদূষকের মস্তকে যে চুল ছিল না, তাহা বুঝাইবার জন্য "করভজানুসদৃশ শীর্ষ" পদ ব্যবহৃত হইয়াছে। করভজানুর অর্থ উষ্ট্রশিশুর জানু। মাথায় প্রচুর চুল ছিল বলিয়া, অভিবাদন উপলক্ষে চারুদত্তের চুল বসন্তসেনার চুলে সংলগ্ন হইয়া উভয়কেই স্পর্শসৌভাগ্য প্রদান করিয়াছিল। বিদূষক বেচারার চুল না থাকায়, সে সৌভাগ্য সম্ভোগের আশা ছিল না; তাহা জ্ঞাপন করিয়া বিপ্র কেবল শিষ্টাচার রক্ষার্থ অভিবাদনে অগ্রসর হইয়াছিল। এই বিদূষক ভরতবিরচিত প্রাচীন নাট্যশাস্ত্রানুসারে সজ্জিত। শকুন্তলের বিদূষক সেরূপ সজ্জিত ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না; তিনি শিখা আকর্ষণের ভয়ে সরিসম্ভাষণে গমন করিতেও ইতস্ততঃ করিতেন। কাকপদশীর্ষমস্তক শব্দ এইরূপে মৃচ্ছকটিকের প্রাচীনত্ব প্রতিপাদন করিতেছে।

(২) "তৎকথং (মৈত্রেয়ঃ চিরয়তে?" এই উক্তিতে চারুদত্ত "চিরয়তি" স্থলে "চিরয়তে" প্রয়োগ করিয়াছেন। পরবর্ত্তী কাব্যে এরূপ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহা ব্যাকরণসম্মত হইলেও রীতিসম্মত নহে। ইহার কারণ কি? এখানে ছন্দানুরোধের দোহাই দিবার উপায় নাই। ইহা গদ্যাংশের কথা। পুরাকালে সংস্কৃত রচনায় লেখকের যে স্বাধীনতা ছিল, রচনারীতি দৃঢ়বদ্ধ হইয়া উত্তরকালে সে স্বাধীনতা ক্রমশঃ বিলুপ্ত করিয়া দিয়াছিল। সুতরাং পরবর্ত্তী যুগের নাট্যসাহিত্যে "চিরয়তি" পদেরই প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। "চিরয়তে" প্রাচীন রীতির পরিচয় বিজ্ঞাপক।

(৩) "খল! চরিতনিকৃষ্ট! জাতদোষঃ
কথমিহ মাং পরিলোভসে ধনেন?" ইত্যাদি।

এই শ্লোকার্দ্ধের "পরিলোভসে" পদ কিরূপে নিষ্পন্ন হইল? সমস্ত প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণদিগের মতে লুভ ধাতু পরস্মৈপদী। পরি উপসর্গ যোগেও পরস্মৈপদী। কাহারও মতে লুভ ধাতু দিবাদি ও তুদাদি গণীয়; কেহ কেহ ইহাকে ভ্বাদির মধ্যেও স্থান দান করিয়াছেন। দিবাদি ও তুদাদি গণীয় হইলে, লুভ ধাতু হইতে লোভ অর্থাৎ "গুণ" হয় না। দিবাদিতে "লুভ্যসি" ও তুদাদিতে "লুভসি" হয়। ভ্বাদি হইলে "লোভসি" হইতে পারে; কিন্তু "লোভসে" হয় না। উত্তরকালে রচিত সংস্কৃত সাহিত্যে লুভ ধাতুর আত্মনেপদের ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায় না। এখানে কবি ইচ্ছাবশতঃ পরস্মৈপদীয় ধাতুকে আত্মনেপদীয় করিয়া লইয়াছেন।* এই স্বাধীনতাও প্রাচীনত্ববিজ্ঞাপক। এইরূপ বিশেষত্ব মৃচ্ছকটিকে এত অধিক যে তাহা উদ্ধৃত ও ব্যাখ্যা করিয়া পাঠকগণের ধৈর্য্য পরীক্ষা করা অসঙ্গত। জীবানন্দ বিদ্যাসাগর মহাশয় এই সকল স্থলের টীকা করেন নাই।

(৪) "নমো বুদ্ধস্য।"—এই উক্তিতেও একটু বিশেষত্ব আছে। বৌদ্ধগণের পুরাতন শিলালিপিতে "নমো বুদ্ধস্য" ও "নমো বুদ্ধায়" এই উভয় পাঠই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ফলকলিপির সময় নিরূপণ করিলে দেখা যায়, "নমো বুদ্ধায়" পাঠের পূর্ব্বে "নমো বুদ্ধস্য" পাঠ প্রচলিত ছিল। ইহাও মৃচ্ছকটিকের প্রাচীনত্ব সূচনা করে।†

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

চরণ।

নিরমল নীল নভোজলে,
কোটি কোটি গ্রহ স্বর্ণ দলে

---

* এইরূপ একটি প্রাচীন প্রয়োগ বিষ্ণুশর্ম্মা কর্ত্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছে, যথা—"অসম্ভবং হেমমৃগস্য জন্ম, তথাপি রামো লুলুভে মৃগায়।" পরবর্ত্তী যুগে এরূপ প্রয়োগ ক্রমে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছিল।

† এই প্রবন্ধের তৃতীয় অংশ "রচনাকাল" আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হইবে।

'বিকশিত, বিশ্বপদ্ম মাঝে
বাণী-চরণযুগল রাজে!
সুবিমল সুস্নিগ্ধ শিশিরে
নিশি তাহা ধোয়ায় সুধীরে,
অরুণ অলক্ত লেখা দিয়া
উষা দেয় যত্নে রাঙাইয়া;
মধ্যাহ্ন আলোক আস্তরণ
তারি তলে দেয় বিছাইয়া;
সন্ধ্যা আসি কণক অঞ্চলে
স্বর্ণরেণু লয় মুছাইয়া।
তারি তলে চির উদ্ঘাটিত
প্রকৃতির চারু রঙ্গালয়,
জগতের মহাকাব্য যেথা
হইতেছে নিত্য অভিনয়;
ছয় ঋতু ধরিতেছে আসি
একে একে দৃশ্যপট নব:
শীতের কুহেলি ঘেরা দেশ,
বসন্তের পুষ্পিত বিভব,
নিদাঘের ফল ভরা বন,
অশ্রুপ্লুত রাজ্য বরষার,
শরতের শ্যাম গৃহতল,
হেমন্তের সোনার ভাণ্ডার।
সে দুটি দুর্ল্লভ পদ ঘেরি'
কবি, তব ছন্দের নূপুর,
অপরূপ গতি তালে তালে
তুলিতেছে কি ধ্বনি মধুর!
লীলাময় চরণ ক্ষেপণে
সপ্ত সুরে উঠিয়া মূর্চ্ছনা,
হৃদি যন্ত্রে বিচিত্র রাগিণী
শ্লোকছলে করিছে রচনা!
সেই দুটি চরণছায়ায়
সঙ্গীতের অমর জগৎ,
কবি, তব কল্পনা মাথায়
শোভা পায় স্বপ্নলোকবৎ!

কমলা।

[মহারাষ্ট্রীয় সমাজচিত্র]

নাসিক জেলার যে অংশ অনুপমপ্রাকৃতিকসৌন্দর্য্য-সম্পন্ন পর্ব্বতমালায় সুশোভিত, তাহারই সন্নিকটে, পশ্চিমঘাট পর্ব্বতশ্রেণীর অনতিদূরে, পবিত্রা শিবগঙ্গা নগরী। ইহার কিয়দ্দূরে অঞ্জিনীগড় নামক স্থানে একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের উপর নারায়ণ নামে এক সন্ন্যাসী বাস করিতেন। তাঁহার একমাত্র কন্যা কমলা পিতার পরম যত্নে ও আদরে প্রতি-পালিত হইতেছিল। শৈশবদশায়ই কমলার মাতৃবিয়োগ হয়। মায়ের অস্ফুট স্মৃতি মাত্র কখনও কখনও তাহার মনে উদয় হইত; সন্ন্যাসীও তাহার নিকট তাহার জননীর জীবনকাহিনী অনেকদিন প্রচ্ছন্ন রাখিয়াছিলেন।

কমলার শৈশবজীবনে বিশেষ কোনও ঘটনা ঘটে নাই। প্রত্যহ ভোরে নিকটস্থ দেবমন্দিরে ঘণ্টাধ্বনি, ব্রাহ্মণগণের দেবস্তুতিগান ও পূজারিগণের মন্ত্রোচ্চারণ শুনিয়া কমলার নিদ্রাভঙ্গ হইত। বিহঙ্গকূজন শ্রবণ করিতেও কমলা ভাল বাসিত, কিন্তু এই সকল স্তুতিগানই তাহার সমধিক প্রিয় ছিল। এই সকলের মর্ম্ম পরিগ্রহ করিবার শক্তি তাহার না থাকিলেও শ্রবণমাত্রেই তাহার হৃদয় ভক্তিরসে পরিপ্লুত হইত। এক বৃদ্ধা সন্ন্যাসীর গৃহকর্ম্মে নিযুক্তা ছিলেন। কমলা তাঁহাকে পিতামহী বলিয়াই জানিত। তাঁহারই নির্দেশমত কমলা তাঁহার এই সকল কাজে সাহায্য করিত। কমলা পিতার জলপাত্র ভরিয়া রাখিত, তাঁহার আহারার্থ কলার পাত বিছাইত ও তুলসীগাছে জল দিত। যে সকল শূদ্রকন্যাগণ বাড়ীর পাশে গরু ও ছাগল চরাইত, তাহাদিগকে কমলা বড়ই ভালবাসিত। তাহারাও আগ্রহ-সহকারে গৃহকার্য্যে কমলার সাহায্য করিত। কমলার জীবনে ইহাদিগের প্রভাব বড় কম ছিল না। পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহে যে সকল ঘটনা ঘটিত, তাহার অতিরঞ্জিত বিবরণ ইহাদিগেরই মুখে সে শুনিতে পাইত, ইহাদিগেরই কথা-বার্ত্তা শুনিয়া তাহার বিস্তৃত সংসারের জ্ঞান লাভ হইত, ইহাদিগের সহিত আলাপ করিয়া সে অনেক কুসংস্কারও হৃদয়ে পোষণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। যেসী নাম্নী একটী শূদ্রকন্যাকে কমলা এরূপ প্রাণের সহিত ভালবাসিত যে কখনও কখনও তাহাকে প্রাণের আবেগভরে আলিঙ্গন করিয়া স্নান করিতেও ভুলিয়া যাইত। পিতারই সংসর্গে তাহার দিনের বেশী ভাগ কাটিত। নারায়ণ নামে মাত্র সন্ন্যাসী ছিলেন না, শাস্ত্রজ্ঞানেও তিনি বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন। কমলা তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া তাঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ কথাবার্ত্তা শুনিত। পিতৃগতপ্রাণা কমলা মাঝে মাঝে পিতার পৃষ্ঠোপরি আরোহণ করিয়া নগরস্থ বাজারেও যাইত।

এইরূপে প্রকৃতির ক্রোড়ে প্রতিপালিত হইয়া কমলা সাতিশয় নিরীহা ও লজ্জাশীলা হইয়া উঠিল। লোকের সম্মুখীন হইতে তাহার সাহসে কুলাইতনা, তাহাদের সমক্ষে সমানে মুখ ফুটিয়া কথা কহিতে পারিতনা।

প্রতি দশ বৎসর অন্তে এই পাহাড়ে অঞ্জিনী দেবীর (অঞ্জনা বা পবনাধিষ্ঠাত্রী দেবীর) উৎসব হইত। আজ সেই উৎসব। কমলার জীবনে ইহা একটি অতীব অভিনব ব্যাপার। উৎসবোপযোগী বেশভূষায় ভূষিতা হইয়া আজ অতি প্রত্যূষে বৃদ্ধা ও বিধবাগণের সমভিব্যাহারে বালিকাগণ দেবার্চ্চনার জন্য পাহাড়োপরিস্থ মন্দিরে আসিয়া উপস্থিত হইল। সরলপ্রাণা কমলা মনে করিত মন্দিরটী তাহারই; কাজেই আজিকার উৎসবব্যাপারে বিশেষ ভাবে যোগ দান করিবার জন্য উৎকৃষ্ট বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিতা হইয়া সে বাহির হইল; কিন্তু মন্দিরসমীপে এত জনসমাগম দেখিয়া স্তম্ভিতা হইয়া দাঁড়াইল। অভ্যাগতা বালিকারা "তুমি কেগা? তুমি নিশ্চয়ই সন্ন্যাসীর মেয়ে; নয়? তোমার বয়স কত? তোমার কেন এখনও বিবাহ হয় নাই গা?" ইত্যাদি প্রশ্ন করিয়া কমলাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। কাশীনাম্নী একটী অপেক্ষাকৃত বয়স্থা বালিকা তাহাকে উৎপীড়নকারিণী বালিকাগণের হস্ত হইতে মুক্ত করিল এবং অন্যান্য বিষয়েও তাহার সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া ক্ষণকালের মধ্যেই তাহার চিত্ত আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইল। অবশেষে কমলাকে সহরে যাইয়া তাহার সহিত দেখা করিতে প্রতিশ্রুত করাইয়া কাশী বিদায় হইল।

কাশীর পিতার সহিত সন্ন্যাসী ঠাকুরের পরিচয় ছিল। কমলা আসিয়া একদিন কাশীর সহিত সাক্ষাৎ করিল। কাশীও কমলাকে একটী অত্যাশ্চর্য্য অভিনব বস্তু মনে করিয়া সাহঙ্কারে নগরের ব্রাহ্মণপল্লীতে বাড়ী বাড়ী ঘুরিয়া তাহাকে দেখাইতে লাগিল। গঙ্গী নাম্নী একটী বালিকার কিন্তু কাশীর এই কাজ মোটেই ভাল লাগিলনা। গঙ্গীর নিজের রূপগুণের জন্য তত সুখ্যাতি ছিলনা; কাজেই কাশীর মুখে কমলার প্রশংসাবাদ শুনিয়া তাহার ঈর্ষানল প্রজ্বলিত হইল। এই গঙ্গী কোনও শাস্ত্রীর কন্যা। যেমন বিধির লিখন, এই শাস্ত্রীরই পুত্র গণেশের সহিত কমলার বিবাহ হইল। বিবাহের পূর্ব্বেই ভবিষ্যৎস্বামিগৃহে কমলার কয়েকবার গতিবিধি হইয়াছিল; তাহার ভবিষ্য শ্বশ্রূ ঠাকুরাণীও অনেক সময়ে সন্ন্যাসীর গৃহে আসিয়া কমলার অনবধানতা ও অজ্ঞতার জন্য তাহাকে তিরস্কার করিতে ত্রুটি করেন নাই। কাজেই স্বামিগৃহে কমলার যে গতি হইবে, তাহার কিঞ্চিৎ আভাস সে পূর্ব্বেই পাইয়াছিল বলিতে হইবে।

বিবাহান্তে কমলা শ্বশুরালয়ে আসিল; তাহার স্বামী অধ্যয়নার্থ নিকটস্থ রামপুর নগরে চলিয়া গেল। কমলার শ্বশুরগৃহ প্রথম প্রথম ভালই বোধ হইতে লাগিল। গঙ্গী তাহাকে অবজ্ঞা ও ঘৃণার চক্ষেই দেখিত সন্দেহ নাই; কিন্তু শ্বশুর শাশুড়ী উভয়েই তাহার প্রতি সদয় ব্যবহার করিতেন। শাস্ত্রী মহাশয় কতকটা কমলার পিতারই মত ছিলেন; তাঁহারই মত পুরাতন শাস্ত্রগ্রন্থাদি পাঠ করিতে ভাল বাসিতেন। কাজেই কমলা তাঁহার কাছে একটুকু বেশী ঘনাইতে চাহিত,—যদিও এরূপ করা সমাজের চক্ষে সম্পর্কবিরুদ্ধ কাজ। সামাজিক ব্যবহারানুসারে শ্বশুরকে ভয় করিয়াই চলিতে হইবে, তিনি কদাচ ভালবাসার পাত্র হইতে পারেন না। শাস্ত্রী মহাশয়ের পাঠের ঘরে অপর কেহ প্রবেশ করিতে সাহস না করিলেও সরলমতি কমলা নির্ভয়ে সেখানে যাইয়া তাঁহার পুঁথিপত্র গোছাইয়া রাখিত, কিম্বা তিনি যখন অধ্যয়নে নিবিষ্টচিত্ত থাকিতেন, তখন নির্নিমেষ লোচনে তাঁহার পানে তাকাইয়া থাকিত। শাস্ত্রী মহাশয়ের জানিতে বাকী রহিলনা যে, কমলা তাহার পিতার নিকট কিছু কিছু পড়িতে অভ্যাস করিয়াছে এবং তিনি যে সকল গ্রন্থ পাঠ করিতেন তদভ্যান্তরস্থ বিষয়সকলের সহিতও কমলার কিছু পরিচয় হইয়াছে।

পিতার আদরটুকু কমলা দিন দিন সবই অধিকার করিয়া বসিবে, ইহা গঙ্গীর প্রাণে সহিবে কেন? "কমলা বড়ই নির্লজ্জা ও পুরুষঘেঁষা, অপরের কাছে যে সে বিনয়নম্রতা দেখায় তাহা ভাণ মাত্র। সে যে এত কাজ করে, শ্বশুরের সংসর্গে বিচরণ করিবার ও তাহার কাছে আমার বিরুদ্ধে সব কথা লাগাইবার সুযোগ খোঁজাই তার উদ্দেশ্য"—এই বলিয়া সে পুনঃপুনঃ মায়ের নিকট অভিযোগ করিতে লাগিল। প্রথম প্রথম গঙ্গীর কথায় তাহার মা আমল দিতেন না, বলিতেন, "আহা, বেচারার বাপ নাই, শ্বশুরের আদর ও



স্বর্গীয়া কৃপাবাঈ সত্যনাথম্

ভালবাসা যত পায় ততই ভাল" ; কিন্তু তিনি বড়ই সোজা মানুষ ছিলেন, লোকের কথায় সহজেই পরিচালিত হইতেন এবং একবার বিচলিত হইলে কিঞ্চিৎ কর্কশভাষাতেই মনোভাব ব্যক্ত করিতেন। পুনঃপুনঃ গঙ্গীর মুখে কমলার নামে অভিযোগ শুনিয়া তিনি এক দিন চুপে চুপে ভৎর্সনার স্বরে স্বামীকে বলিলেন যে, ইহাতে তাঁহার কন্যা গঙ্গীর সমূহ অপকার। তাহার প্রতি তাঁহার স্নেহ ও আদরের দিন দিন হ্রাস হইতেছে, তিনি তাহাকে বস্ত্রালঙ্কার দানে ও তাহার বিবাহবিষয়ে উদাসীন হইয়া পড়িতেছেন ; উজ্জ্বলকান্তি কমলার পার্শ্বে গঙ্গী এরূপ হীনপ্রভা হইয়া পড়িতেছে যে, প্রতিবেশিগণও তাহাকে উপেক্ষা করিয়া কমলারই গুণের পক্ষপাতী হইয়া পড়িতেছেন ; কমলা তাঁহাকে যেরূপ পাইয়া বসিয়াছে, তাঁহাদের ছেলেকেও যদি তদ্রূপ বশীভূত করিয়া ফেলে, তবে পিতা মাতার প্রতি তাহার আর সেরূপ প্রাণের টান থাকিবে কি? গৃহিণীর এইরূপ বিষপ্রয়োগের ফল অচিরাৎ ফলিল। শাস্ত্রীমহাশয় মনে মনে জানিতেন, কমলার স্বভাবে কিছু বিশেষত্ব আছে, সে অপর সাধারণ বালিকাগণের ন্যায় নহে। তথাপি তিনি স্ত্রীর কথা একেবারে উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। পূর্ব্বে তিনি কমলাকে মন্দির দর্শন করিতে যাইবার সময় সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতেন ; এখন সেরূপ করিতে বিরত হইলেন। কখনও কখনও কমলা সোল্লাসে শ্বশুরসমীপে দৌড়িয়া গিয়া উপস্থিত হইলে তিনি কোনও কাজের ভার দিয়া তাহাকে দূরে অপসারিত করিয়া দিতেন ; আর বলিতেন যে, গুরুজনেরা যখন কাজে ব্যস্ত থাকে, তখন বালিকাদের চুপ করিয়া থাকাই উচিত। হায়! কমলার সরল হৃদয়ের সহজ উচ্ছ্বাস এইরূপে দিন দিন প্রতিহত হইতে লাগিল।

ভাগীরথী, হরিণী, ভীমা ও রুক্মা নামে চারিজন প্রতিবেশিনীর সহিত কমলার বিশেষ সখ্য জন্মিল। কিন্তু তাহাদের সহিত আলাপ করিয়া সে যাহা জানিতে পারিল তাহাতে তাহার প্রাণ শুকাইয়া গেল, সংসারের বিভীষিকাময় চিত্রই তাহার মানসচক্ষুর সম্মুখে প্রতিভাত হইতে লাগিল। এক কথায় বলিতে গেলে, তাহারা তাহাকে বুঝাইয়া দিল যে, স্ত্রীলোকের জন্মই হয় শাশুড়ী ননদ ও স্বামীর গঞ্জনা ও উপদ্রব উৎপীড়ন সহ্য করিতে।

রমাবাঈ নাম্নী আর একটি ননদিনী নিজ স্বামী সমভিব্যাহারে আসিয়া গঙ্গী ও মাতার সহিত যোগ দিল। কুসুমকোমলা কমলা সাতিশয় নির্দ্দয়রূপে দলিতা হইতে লাগিল। আহারের পূর্ব্বে শ্বশুরের হস্তমুখপ্রক্ষালনার্থ জল প্রদান ও আহারের সময়ে শ্বশুরের সান্নিধ্যে উপবেশন এই সকল এখনও কমলার দৈনন্দিন কার্য্যের তালিকাভুক্ত ছিল। কিন্তু রমাবাঈ যে দিন আসিল সেই দিন হইতে কমলার এই কাজও বন্ধ হইল। একদিন অপরাহ্নে বিচিত্র বেশভূষায় সজ্জিতা হইয়া ভগিনীদ্বয় কোনও উৎসব দর্শনে চলিল। কমলাকেও সঙ্গে লইয়া যাইবার কথা উঠিলে তাহারা বলিল যে, কমলা কাহাকেও জানেনা, কাজেই তাহার যাইয়া কাজ নাই। কমলা কিন্তু নিজের গা হইতে গহনাগুলি খুলিয়া দিল, গঙ্গী তাহাই পরিয়া চলিল। পরক্ষণেই কাশী আসিয়া, কিছু রুষ্টস্বরেই কমলাকে বলিল, "কে তোমাকে মূর্খের মত নিজের গহনাগুলি গঙ্গীকে দিতে বলিয়াছিল? আমি তোমাকে উৎসবে লইয়া যাইবার জন্যই আসিয়াছিলাম, কিন্তু এখন লইয়া যাই কি প্রকারে?" কমলা বলিল, "আমি ভাই কোথাও যাইতে চাইনা, শুধু তুমি আমার কাছে একটুকু থাক, ইহাই আমি চাই। আমার মনটা আজ বড়ই খারাপ বোধ হইতেছে। বাবার কাছে যাইতে বড়ই ইচ্ছা হইতেছে।" পরে কাশী কমলার শাশুড়ীর অনুমতি লইয়া নিজের গলা হইতে দুই গাছি হার খুলিয়া কমলাকে পরাইয়া তাহাকে উৎসবে লইয়া গেল।

রমাবাঈর স্বামী তাহার কোনও সঙ্গতিপন্ন আত্মীয়ের ঘরে গণেশের বিবাহ দেওয়ার মনন করিয়াছিল। সেখানে গণেশের বিবাহ না হওয়াতেই সে জাতক্রোধ। সে কেবলই বলিত, এমন খ্যাতনামা লোকের এক মাত্র পুত্র গণেশ, তাহার কিনা বধূ হইল কপর্দ্দকশূন্য ভিখারীর মেয়ে! কমলার মায়ের জীবনবৃত্তান্ত লোকের বিদিত না থাকায় সে কমলার জন্মসম্বন্ধেও সন্দেহাত্মক বাক্য উচ্চারণ করিতে ছাড়িতনা। কমলা কিছু লেখা পড়া জানিত, তাহা লইয়াই বা তাহার কত পরিহাস চলিত। এই বিবাহ ভঙ্গ করিয়া স্থানান্তরে গণেশের বিবাহ দেওয়ার অভিমত প্রকাশ করিতেও পাপিষ্ঠ সঙ্কুচিত হইতনা। আজ উৎসবদর্শনান্তে সকলে বাড়ী ফিরিয়া আসিলে রমাবাঈর স্বামী পত্নীর সহিত

এইরূপ কথাবার্ত্তা কহিতেছিল শুনিয়া কমলা আর ধৈর্য্য ধরিতে পারিলনা। শ্বশুরের নিকট গিয়া তাঁহার পায়ে পড়িয়া বলিতে লাগিল, "কেন আপনি আমার সহিত আপনার পুত্রের বিবাহ দিয়াছিলেন? দিয়াছিলেন তো টাকা চাহিয়াছিলেন না কেন? আপনি কি জানিতেন না যে আমি ভিখারীর মেয়ে? এখন আমাকে এই সকল যন্ত্রণা ভুগিতে হইতেছে। কেহ আমাকে দেখিতে পারে না। আমাকে বাবার নিকট পাঠাইয়া দিন।" শ্বশুর বলিলেন, "ছিঃ! ওরূপ কথা বলিতে নাই। কে বলিল তুমি গরীব? তুমি এই সকল কথা মনে স্থান দিওনা! তোমার বাপ এরূপ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, তোমার কি এরূপ করা উচিত? যাও, তোমার কাজ কর্ম্মে তোমার শাশুড়ী যাহাতে সন্তুষ্ট হন, তাহাই কর গে।" কমলা ভাবিল, "আমার কষ্ট ইনি কি বুঝিবেন? বাবাও হয়তো এইরূপ কথাই বলিবেন।" পরে নিজের ঘরে গিয়া কাঁদিয়া বুক ভাসাইল।

বিবাহের দুই বৎসর পরে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া গণেশ রামপুর কালেক্টরীতে একটা চাকরী পাইল। তৎপরে বিদায় লইয়া গৃহে প্রত্যাগমনের উদ্যোগ করিতেছে এমন সময় একদিন রঙ্গালয়ে অভিনয় দর্শন করিতে গিয়া সঙ্গী নাম্নী একটা ভয়ানকচরিত্রা কুলটা স্ত্রীর হাব ভাব দেখিয়া তাহার একটুকু চিত্তচাঞ্চল্য জন্মিল। এই স্ত্রীলোকটার অশেষ ক্ষমতা ছিল। সে দেশের যাবতীয় ঘটনার সংবাদ সংগ্রহ করিবার জন্য গুপ্তচর নিযুক্ত রাখিত। এমন কি চোর ডাকাতের অনুসন্ধান করিবার জন্য গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণও তাহার পরামর্শ লইত। যাহা হউক সত্বর বাড়ী চলিয়া আসাতে সঙ্গী হইতে গণেশের সমূহ কোনও অনিষ্ট হইল না।

গণেশ বাড়ী আসিলেও কমলার অদৃষ্টচক্র ফিরিল না। দিনব্যাপী কঠোর পরিশ্রম, তদুপরি শাশুড়ী ননদের তাচ্ছিল্য ও নির্য্যাতন পূর্ব্ববৎই চলিতে লাগিল। প্রথমতঃ কমলা মনে করিয়াছিল, এরূপ আগ্রহের সহিত গৃহকার্য্যাদি করিলে সে অবশ্যই তাহাদিগের মন পাইতে পারিবে; কিন্তু তাহার সে আশা পূর্ণ হইল না। তাহার শাশুড়ী বলিতেন, "কাজ করিতে করিতে গঙ্গীর পিঠ ভাঙ্গিল। কমলার তাহার কাজের ভার লাঘব করা তো দূরের কথা, তাঁহার নিজের সেবার জন্য একজন লোক হইলে ভাল হয়। কাহারও জন্য তাহার মায়া মমতা নাই।" রমাবাঈ বলিত, "কমলাকে যে খাবার দেওয়া হয়, তাহা সে সব খায় না। এইরূপ করিয়া সে লোককে দেখাইতে চায় যে আমরাই তাহাকে উপবাসে রাখি।" কমলা নীরবে এই সকল মিথ্যা রটনা শুনিত এবং নিজের মর্ম্মজ্বালায় নিজেই জ্বলিয়া মরিত। বাল্যকাল হইতেই তাহার অদৃষ্টবাদে বিশ্বাস জন্মিয়াছিল। এই বিশ্বাসের বলেই সে ক্রমে ক্রমে এই সকল নিদারুণ অত্যাচার নীরবে সহ্য করিতে শিখিল। সে জানিত পাপের শাস্তি ও পুণ্যের পুরস্কার এই জন্মে না হউক, জন্মান্তরে হইবেই হইবে।

কমলা নিজের সুখ দুঃখ লইয়াই ব্যস্ত ছিল না। এই অবস্থায়ও সখীগণের সুখে সুখ ও দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিতে সে ত্রুটি করিত না। শিক্ষিতা ভাগীরথীর উপর তাহার মূর্খ স্বামীর নিদারুণ অত্যাচার দেখিয়া কমলা মর্ম্মাহত হইত। একদিন ভাগীরথী স্বামীর কোনও কথামত কাজ না করায় তাহার স্বামী একটা বেশ্যাকে ঘরে লইয়া আসিল। ভাগীরথী ক্রোধভরে সধবার চিহ্ন হাতের বালা দুইগাছি ভাঙ্গিয়া গায়ের সমস্ত গহনা খুলিয়া রাখিয়া মায়ের নিকট চলিয়া গেল। তার মা পরক্ষণেই তাহাকে স্বামিগৃহে রাখিয়া যাইতে লইয়া আসিলেন। ভাগীরথী একান্ত অনিচ্ছাসত্বেও পুনরায় স্বামীর ঘরে প্রবেশ করিতে বাধ্য হইল। ইহার পর যে স্বামী ও শাশুড়ীর উৎপীড়ন তাহাকে রোজ সহ্য করিতে হইত, তাহা আর বিচিত্র কি?

হরিণী বড়ঘরের মেয়ে হইলেও শাশুড়ীর মন পাইবার জন্য চাকরাণীর মত খাটিত। হরিণীর স্বামী তাহাকে খুব ভালবাসিত। কোপনস্বভাবা মায়ের হাত হইতে হরিণীকে রক্ষা করিবার কোনও চেষ্টা করিলে মা তাহাকেই আক্রমণ করিত। কাজেই বেচারাকে ভয়ে ভয়ে প্রায়ই বাড়ী ছাড়িয়া পলাইতে হইত।

কাশী ও কৃষ্ণা উভয়েরই কিন্তু সুখের ঘর ছিল। উভয়েই স্বামিসোহাগিনী। শাশুড়ীননদের অত্যাচারও কাহাকেই সহিতে হইত না। উৎপীড়িত সহচরীগণের নিকট যাইয়া কিম্বা তাহাদগকে নিজেদের ঘরে আনাইয়া সান্ত্বনা দিতে উভয়েই যথাসাধ্য চেষ্টা করিত। একদিন সখীগণ সকলে

একযায়গায় সম্মিলিত হইলে কালী প্রস্তাব করিল যে একদিন তাহারা সকলে মিলিয়া ভূত সাজিয়া হরিণীর শাশুড়ীকে ভয় দেখাইলে তাহার কিছু শিক্ষা হইতে পারে। বলা বাহুল্য ধরা পড়িবার ভয়ে কেহই এই উৎকট কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে সাহস করিল না।

কমলা শাশুড়ীর ঘরেই শয়ন করিত। স্বামীর সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে সে তত ঔৎসুক্য প্রকাশ করিত না। কারণ তাহার মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হইয়াছিল যে তাহার স্বামীও অন্যান্য সকলের ন্যায় তাহাকে অবজ্ঞার চক্ষেই দেখিবেন ; সে নীচ ও গরীব, তাহাকে তাহার স্বামী ভাল বাসিবেন কেন ?

গণেশ মাকে অনেক সময়ে বলিতে শুনিয়াছে যে সন্ন্যাসীর কন্যা বলিয়া কমলার হৃদয়ে লোকসমাজোচিত স্বাভাবিক বৃত্তিনিচয়ের স্ফূর্ত্তি হয় নাই, তাহার আচার ব্যবহার অন্যান্য বালিকাগণের ন্যায় নহে। তবে কি কমলা সত্য সত্যই হৃদয়-হীন ? কমলার মুখ দেখিলে মনে হয় তাহাতে যেন কোনও রূপ হৃদয়ের ভাব প্রকটিত হয় না, তাহার দৃষ্টিও ঔদাসীন্যব্যঞ্জক। এরূপ হওয়ার কারণ কি ? গণেশ বিশেষ-রূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বুঝিতে পারিল যে কমলার চরিত্রে স্বাভাবিক নিয়মের কোনও বৈলক্ষণ্য নাই, শুধু তাহার ভগিনীগণের দীর্ঘকালব্যাপী নির্য্যাতনের ফলেই তাহার মুখাবয়ব এরূপ বিসদৃশ ভাব ধারণ করিয়াছে। তাহার মা যে কন্যাগণের প্ররোচনায় অতি সহজেই চালিতা হইতেন একথা তার বেশ জানা ছিল। গণেশ স্পষ্টই দেখিতে পাইল যে, তাহার ভগিনীগণ কমলাকে অনবরত খাটায়। তাহারা তাহার কাছে বলে যে কাজে দৃঢ়তা শিক্ষা দেওয়ার জন্যই কমলাকে এত কাজ করিতে দেওয়া হয়। অপর লোকের কাছে বলে, তাহারা নিজেরাই সব করে, অজ্ঞাত-কুলশীলা ভিখারীর মেয়ে কমলা কাজ জানিলে তো করিবে?

অতঃপর একদিন কমলার জ্বর হইল। অপরাহ্নে বাটীর পশ্চাদ্‌ভাগবর্ত্তী একটী ভগ্নমন্দিরের অন্তরালে বসিয়া জানুদ্বয়-মধ্যে মস্তক বিন্যস্ত করিয়া কমলা রোগের যন্ত্রণায় ছটফট্ করিতেছিল, এমন সময় গণেশ তথায় উপস্থিত হইয়া কহিল, "তোমার কি কোনও অসুখ করিয়াছে ? তুমি এখানে বসিয়া আছ কেন ?" কমলা ভীত চকিত নয়নে চাহিয়া দেখিল, যাহার মুখপানে তাকাইতে সে এতদিন সাহস করে নাই, সেই স্বামীই তাহার কাছে দাঁড়াইয়া আছে। কমলা ভয়ে ও লজ্জায় জড়সড় হইল। গণেশ পুনরায় বলিল, "পাগলামি করিও না, আমি তোমাকে খাইয়া ফেলিব না। ভয় কি ? দেখি তোমার কি অসুখ হইয়াছে ?" এই বলিয়া গণেশ অগ্রসর হইলে কমলা মুখ ফিরাইয়া বলিল, "তোমার আমাকে স্পর্শ করিতে নাই, আমার সহিত কথা কহিতে নাই।" এই বলিয়াই কমলা পলায়নের উপক্রম করিল। গণেশ তাহাকে বাধা দিয়া বলিল "তোমাকে এই সব কথা কে শিখাইয়াছে ? বোকামি করিওনা। যাও বাড়ীর ভিতর গিয়া শরীরের যত্ন করগে। আমি আজ সারাটা দিন তোমাকে দেখিতে পাই নাই, তাই খুঁজিতে খুঁজিতে এখানে আসিয়াছি।" গণেশের স্নেহপূর্ণ কথা কয়টা শুনিয়া কমলার প্রাণে একটুকু ভরসা হইল ; বলিল, "আমি গরীব, কোথাও যাইব এমন স্থল আমার নাই, তাইত কেহ আমার খোঁজ করে না। তুমি আমাকে খুঁজিয়া বেড়াইতেছ, তবু ভাল।" কথা কয়টী বলিয়াই কমলা দরবিগলিতধারে অশ্রু মোচন করিতে লাগিল। গণেশ কমলার সাড়ীর অঞ্চল দ্বারা তাহার চোখ মুছাইয়া বলিল, "তুমি টাকার কি জান ? তোমার টাকায় আমার প্রয়োজন কি ? তোমারই জন্য বরং আমাকে তাহা অর্জ্জন করিতে হইবে। যাও, কেহ ওরূপ কথা বলিলে তুমি দুঃখিত হইও না।" এই বলিয়া গণেশ নদীর ধারে বেড়াইতে চলিয়া গেল। আজ কমলা তাহার প্রতি স্বামীর অনুরাগের কিছু পরিচয় পাইয়া এই জ্বরের অবস্থায়ও অননুভূতপূর্ব্ব আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল।

কমলার জ্বর ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া তাহার চৈতন্য লোপ করিল। সংজ্ঞা লাভ করিয়া কমলা দেখিল, তাহাকে কোনও অপরিচিত পর্ব্বতময় স্থানে আনা হইয়াছে ; স্বামী ও শাশুড়ী ব্যতীত কালীও তাহার সঙ্গে আছে। কালী তাহাকে বলিল, "তোমাকে ভূতাবিষ্ট মনে করিয়া এখানে ওঝার নিকট আনা হইয়াছিল। পরে যাহা শুনিতে পাইলাম তাহা বলিতে এখনও আমার প্রাণ কাঁপিতেছে। শুনিলাম তোমার বাঁচিবার আশা নাই। অমনি কালবিলম্ব না করিয়া বাবা ও একজন চিকিৎসক সঙ্গে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলাম। তাই তোমার প্রাণ রক্ষা হইয়াছে।"

কমলা আরোগ্য লাভ করিলেও গণেশ অক্লান্তভাবে তাহার সেবা শুশ্রূষা করিতে লাগিল। অন্য সময় হইলে লোক-গঞ্জনার ভয়ে কমলা স্বামীকে কখনই এরূপ করিতে দিত না, কিন্তু এখন সে একান্ত নিরুপায়। গণেশও মাতা ও ভগিনী-দের বাধা কিছুতেই মানিল না।

ত্র্যম্বকস্থল হিন্দুদিগের একটী অতি মনোরম তীর্থস্থান। প্রতি বৎসর শিবগঙ্গা হইতে একদল যাত্রী এখানে আসিত। কমলা যখন প্রকৃতিস্থ হইতেছিল, তখনই এই তীর্থযাত্রার সময় উপস্থিত হইল। গণেশ, কমলা, কাশী প্রভৃতি কমলার সখীগণের অনেকে, এবার এই যাত্রিগণের সঙ্গ লইল। পথিমধ্যে অন্যান্য স্থান দর্শন করিয়া প্রায় আটদিন পরে সকলে ত্র্যম্বকস্থলে উপস্থিত হইল। এই স্থানের প্রাকৃতিক শোভা অনির্ব্বচনীয়। বেগবতী গঙ্গাগোদাবরী একটা পাহাড়ের উপর হইতে প্রস্তরময় গহ্বরে পতিত হইয়া অতীব মনোহর একটা জলপ্রপাতের সৃষ্টি করিয়াছে; দেখিলে মনে হয় যেন নদীটী অকস্মাৎ ভূগর্ভে বিলীন হইয়া গেল। জলরাশি একখণ্ড বিস্তৃত প্রস্তরের উপর পতিত হইয়া প্রভূত ফেনোদ্গীরণ করিতেছে, উৎ-পতিষ্ণু ফেনপুঞ্জ দূর হইতে দেখিলে ধুনিত-কার্পাস-ধবল তরল মেঘখণ্ড বলিয়া প্রতীয়মান হয়। স্বভাবের সৌন্দর্য্য সম্ভোগ করিতে কমলা স্বভাবতই অতিমাত্র ব্যগ্রতা প্রকাশ করিত। আজ এই দৃশ্য দেখিয়া কমলার হৃদয়ে অতীত স্মৃতি জাগিয়া উঠিল। তাহার মনে হইতে লাগিল পূর্ব্বে যেন সে এই স্থান দেখিয়াছে। ভাবিতে ভাবিতে কমলা আত্মহারা হইল। এই অবস্থায় তাহার মনে হইতে লাগিল যেন কোনও লাবণ্যময়ী হীরকবলয়পরিহিতা রমণী তাহার হস্ত ধারণ করিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন। এমন সময় হঠাৎ তাহার পদস্খলন হওয়াতে গহ্বরস্থ ঘোর গর্জ্জনকারী সলিল-রাশির মধ্যে পতিত হইয়া সে ভাসিয়া চলিল; অমনি সেই রমণী চীৎকারসহকারে জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন এবং সজোরে আকর্ষণপূর্ব্বক তাহাকে উত্তোলন করিলেন। এইরূপ স্বপ্না-বিষ্ট অবস্থায় কমলা পিতার কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইয়া চাহিয়া দেখিল, জনতার মধ্যে তাঁহার মূর্ত্তি মিলাইয়া গেল। তখনি জনতা ভেদ করিয়া সে তাঁহার সন্ধানে ছুটিল। পিতার তো সন্ধান পাইল না, দেখিল জনতার দূরপ্রান্তে ঘোর অরণ্য-মধ্যস্থ একটী দেবমন্দিরের সোপানোপরি আসিয়া সে উপস্থিত হইয়াছে। যখন সে ভাবিল তাহার স্বামী ও শাশুড়ী এরূপ স্থানে তাহাকে একাকিনী দেখিলে কি মনে করিবেন, তখন তাহার মনে বড়ই ভয় হইল; শরীর অবসন্ন হইয়া পড়াতে সে একেবারে বসিয়া পড়িল। ঠিক সেই সময়ে এক যুবক তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইয়া বলিল, "তোমার পিতা চলিয়া গিয়াছেন, তাঁহার সহিত তোমার দেখা হইবে না। তিনিই তোমাকে যথাস্থানে রাখিয়া আসিতে আমাকে আদেশ করিয়াছেন। চল তোমাকে রাখিয়া আসি।" কমলা দেখিল, যাহার চিকিৎসাগুণে সে রোগমুক্ত হইয়াছিল, এ সেই যুবাপুরুষ। কমলাকে কাশী ও তাহার সঙ্গিগণ যেখানে ছিল সেখানে রাখিয়া যুবক চলিয়া গেল। কমলা এই ঘটনার কথা কাহাকেও সাহস করিয়া বলিতে পারিল না।

এই তীর্থপর্য্যটন ব্যাপারের মধ্যে কমলার প্রকৃত স্বভাবের পরিচয় পাইতে গণেশের বিশেষ সুযোগ হইল। গৃহের সেই বাধাবাধি এখানে আর কিছুই ছিল না; গোপনে কমলার সহিত আলাপ করিবারও সে অনেক সুবিধা পাইল। সে দেখিল, অন্যান্য বালিকাদিগের চেয়ে কমলা রূপবতী সভ্যা ভব্যা ও সুরুচিসম্পন্না; তাহার জ্ঞানপিপাসা ও ধারণাশক্তিও খুব বলবতী। গণেশের নিজের মনেও ইংরাজীশিক্ষার প্রভাব এই সময়ে বিশেষ প্রবলই ছিল। তাই কমলাকে শিক্ষাদান করিতে তাহার বলবতী ইচ্ছা হইল।

ত্র্যম্বকস্থল হইতে গৃহে ফিরিয়াই গণেশ সঙ্কল্পানুযায়ী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল। বলা বাহুল্য ইহাতে তাহাকে ভগিনীগণের, মাতার, এমন কি অবশেষে পিতারও বিরাগভাজন হইতে হইল। মাতার বিষণ্নমুখ দেখিয়া গণেশ বড়ই মনে ব্যথা পাইল। লেখা পড়ায় কমলার বিনয় শিক্ষা হইবে, প্রাতঃকালে এক আধ ঘণ্টা লেখা পড়া করিলে গৃহকর্ম্মেরও বিশেষ হানি হইবে না, ইত্যাদি কথা বলিয়া সে মাকে অনেক প্রবোধ দিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। ছেলের আহারের সময়েও মা আর তাহার কাছে আসেন না। কমলা পাঠান্তে কোনও কাজ করিতে গেলেও তাহাকে কিছুই করিতে দেওয়া হয় না। একদিন অভাগিনী

ভোজনার্থ রন্ধনগৃহে যাইয়া দেখিল তাহার জন্য খাবার রাখা হয় নাই। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করিয়া ক্ষুধায় কাতর হইয়া সে ফিরিয়া আসিল, তথাপি কাহারও নিকট মুখ ফুটিয়া খাবার চাহিতে তাহার সাহস হইল না। সায়াহ্নে কূপ-সমীপে সহৃদয়া কৃষ্ণার সহিত সাক্ষাৎ হইলে এই সকল কথা তাহাকে বলিতে বলিতে কমলা কাঁদিয়া ফেলিল। কৃষ্ণা দৌড়িয়া গিয়া নিজেদের ঘর হইতে কিছু পিষ্টক আনিয়া সনির্বন্ধে কমলাকে খাইতে অনুরোধ করিল। বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠা কমলা অতিকষ্টে কিঞ্চিৎ গলাধঃকরণ করিল। কৃষ্ণা তাহাকে বলিল রোজই যদি এইরূপ হয় তবে রোজই সে তাহাকে এইরূপে খাওয়াইবে। আহা! যে কমলা পিতৃগৃহে কখনও কোন অভাবের মুখ দেখে নাই তাহার এই কি শোচনীয় পরিণাম? তাহাকে অনাহারে পর্য্যন্ত থাকিতে হইল? তাহার পিতা ত তাহার কোন তত্ত্ব লয়েন না। কন্যা একবার সম্প্রদান করিলে হিন্দু পিতামাতা এইরূপেই তাহাকে চিরতরে বর্জ্জন করেন।

কমলা পরে চাকরাণীর মুখে শুনিতে পাইল যে পুরুষদিগের আহারের ঘরে তাহার পাত হইয়াছিল! সে স্বামীর নিকট সব নিবেদন করিয়া বলিল, তাহার আর লেখাপড়া শিখিয়া কাজ নাই। গণেশ কিন্তু কিছুতেই ছাড়িবার পাত্র নহে। এত বাধা বিঘ্ন সত্ত্বেও সে কমলার শিক্ষাকার্য্য হইতে বিরত হইল না।

রমাবাঈর স্বামীই পরিবারের মন্ত্রী। স্ত্রীর প্রতি যে গণেশের এইরূপ ভাব হইবে একথা ত সে পূর্ব্বেই সকলকে বলিয়াছিল। এখন সে-ই গণেশের মতিগতি ফিরাইবার উপায় উদ্ভাবন করিল। সে বলিল, "তোমরা গণেশের কার্য্যে বাধা না দিয়া সে যাহা করিতে চায় তাহাই করিতে দাও, কমলার প্রতি তোমাদের বিদ্বেষভাব গোপন করিয়া চল। একটা মানুষের স্ত্রীর প্রতি আসক্তি নষ্ট করিবার তো কতই উপায় আছে। আমি দেখিতেছি গণেশ বেশ আমোদপ্রিয়, উহাকে মন্দিরাদি দর্শন ও উৎসবাদিতে যোগদান করাইতে হইবে।"

কমলার দুরদৃষ্টক্রমে এই সময়ে সঙ্গী আসিয়া শিবগঙ্গায় উপস্থিত হইল। তাহার সহিত রমাবাঈর স্বামীর পরিচয় ছিল। সে সুযোগ বুঝিয়া এক দিন গণেশের সহিত তাহার আলাপ করাইয়া দিল এবং সঙ্গীকে কমলার সহিত সাক্ষাৎ করিতেও অনুরোধ করিল। গঙ্গীর বিবাহোৎসব উপলক্ষে সঙ্গী কমলার সহিত দেখা করিতে আসিল। কমলা তাহাকে দেখিয়া চিনিতে পারিল না, মনে করিল অভ্যাগতা কোনও রমণী হইবে। কিন্তু সঙ্গী গণেশের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিলে কমলা ভাবিল, "আমার স্বামীকে দিয়া এই স্ত্রীলোকটার কি প্রয়োজন?" একবার কমলা সঙ্গীর দিকে তাকাইয়া দেখিল যেন সাক্ষাৎ পাপের মূর্ত্তি সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার মনে হইতে লাগিল যেন পাপীয়সীর দর্শনেও চিত্ত কলুষিত হয়। তাই সে প্রশ্নোত্তরের অপেক্ষা না করিয়া ঘৃণার সহিত সেখান হইতে প্রস্থান করিল। চতুরা সঙ্গীর কমলার মনের ভাব বুঝিতে বাকি রহিল না। এই ঘটনা হইতেই কমলার সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হইল। কমলার এত গর্ব্ব এত আস্পর্দ্ধার প্রতিশোধ কি সঙ্গী না লইয়া ছাড়িতে পারে?

গণেশ অল্পে অল্পে কমলার সংসর্গ পরিত্যাগ করিতে লাগিল। কমলাকে পড়াইতে আর সে আসে না, নানা কথার ছলনায় কমলাকে ভুলাইয়া রাখে। তার পর যখন দেখিল কমলাকে আর ভুলাইয়া রাখা যায় না, তখন তাহার কাছেই যাওয়া বন্ধ করিল। রমাবাঈর স্বামীর চক্রান্তেই যে গণেশ সঙ্গীর কুহকে ভুলিয়াছে, কমলাও ক্রমে ক্রমে তাহা জানিতে পারিল। কমলার অবস্থাবিপর্য্যয় দেখিয়া তাহার শাশুড়ী ননদেরা সকলেই মনে মনে খুসী। গণেশের এখন যত্ন আদর দেখে কে? ইহাতে কমলাও সুখী। তাহাকে পড়াইবার জন্যইতো তাহার স্বামীকে তাহার সঙ্গে সঙ্গে কত লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল; তাইতো উভয়ে প্রাণে প্রাণে বাঁধা পড়িয়াছিল। অকস্মাৎ সে বন্ধন ছিন্ন হইয়া গেল, তাইতো কমলার দুঃখ। তাহার প্রাণে ভালবাসার আগুন জ্বালিয়া কেন তাহার স্বামী তাহাকে পরিত্যাগ করিলেন? গণেশের চরিত্র বুঝিয়া উঠা ভার। অশেষ সদ্গুণের সঙ্গে সঙ্গে তাহার চরিত্রে অনেক দোষও ছিল; সে অলস ও স্বার্থপর, কমলাকে সে উপভোগের সামগ্রী মাত্র বলিয়াই জানিত। কিন্তু কমলা তো তাহার চরিত্রে কোনও দোষ দেখিতে পাইত না। কমলা উদারহৃদয়া, তাহার চরিত্রে স্বার্থের লেশস্পর্শ ছিল না। সে সকলেরই

চরিত্রে গুণের ভাগই দেখিত। সে মনে করিত তাহার যেমন স্বামী জুটিয়াছে, অপরের ভাগ্যে তেমন ঘটেনা। তাহার এমন স্বামীকে পাঁচভূতে মিলিয়া নষ্ট করিল। তাহার এই দুঃখ রাখিবার স্থান কোথায়? কমলা স্বামীর মন ফিরিয়া পাইবার জন্য দেবদেবীর মন্দিরে যাইয়া মাথা কুটিতে লাগিল।

এই সময় পিতার পীড়ার সংবাদ শুনিয়া কমলা উভয় সঙ্কটে পড়িল। গণেশকে এই অবস্থায় সঙ্গীর হাতে সঁপিয়া যাইতেও তাহার মন সরে না, অসহায় পিতারই বা সেবাশুশ্রূষা সে না করিলে আর কে করিবে। কমলা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়া হইয়া কাঁদিয়া বুক ভাসাইল। শেষে পিতারই নিকট যাইতে হইল। [ক্রমশঃ।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

শ্রীযুক্ত বাবু জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস "প্রবাসী"তে প্রবাসী বাঙ্গালীগণের যে বৃত্তান্ত লিখিতেছেন, তজ্জন্য তাঁহাকে গুরুতর পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। কিন্তু বিষয়টি এরূপ, যে প্রভূত পরিশ্রম করিলেও এই বৃত্তান্তে অনেক অসম্পূর্ণতা ও ভ্রম থাকিবার সম্ভাবনা। যদি "প্রবাসী"র পাঠকগণ এই সকল ত্রুটি নির্দ্দেশ করিয়া বৃত্তান্তটিকে নির্ভুল ও সম্পূর্ণ করিবার পক্ষে আমাদের সাহায্য করেন, তাহা হইলে আমরা চিরকৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিব।

***

সম্রাট্ সপ্তম এডোয়ার্ডের অভিষেক উপলক্ষে আমরা বর্ত্তমান সংখ্যায় তাঁহার একটি নানাবর্ণে রঞ্জিত চিত্র দিলাম। আগামী সংখ্যায় মহারাণী আলেকজান্দ্রার এই প্রকার একখানি ছবি দেওয়া যাইবে। আমরা যতদূর জানি, বাঙ্গালা মাসিকপত্রে এইরূপ ছবি এই প্রথম প্রকাশিত হইল। রাজা রবিবর্ম্মার মত শ্রেষ্ঠ দেশীয় চিত্রকরের প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত চিত্রও বাঙ্গালা মাসিকপত্রে আমরা প্রথম মুদ্রিত করিয়াছি। গতবৎসর তাঁহার ছয়খানি অপ্রকাশিত ছবি আমরা মুদ্রিত করিয়াছিলাম। বর্ত্তমান বৎসরেও তাঁহার প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত অনেক ছবি "প্রবাসী"তে মুদ্রিত করিব। অন্যান্য উৎকৃষ্ট ছবি ছাপিবারও আয়োজন করা যাইতেছে।

***

এবৎসর এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইণ্টারমীডিয়েট অর্থাৎ এফ্ এ পরীক্ষায় ৪০ জন বাঙ্গালী ছাত্র উত্তীর্ণ হইয়াছে। গতবৎসর ৩০ জন হইয়াছিল। বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বাঙ্গালী ছাত্রের সংখ্যা ২১ এবং ছাত্রীর ১; মোট ২২। গতবৎসর ছিল ২৪। এবৎসর ৪ জন বি. এস্ সির মধ্যে একজন বাঙ্গালী। বাঙ্গালী এম্. এর সংখ্যা ইংরাজী সাহিত্যে ২জন এবং সংস্কৃতে ১জন। তদ্ভিন্ন রসায়নে এক জন বাঙ্গালী প্রথম ডি. এস্‌সি ও একজন দ্বিতীয় ডি. এস্‌সি. পাশ করিয়াছেন।

***

বঙ্গদেশে যেমন তরুদত্তের নাম শিক্ষিতব্যক্তি মাত্রেরই সুপরিচিত, দক্ষিণভারতে কৃপাবাঈ সত্যনাথমের নাম তেমনি প্রসিদ্ধ। কৃপাবাঈ মান্দ্রাজের প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক মিঃ সত্যনাথমের পত্নী ছিলেন। ৩২ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি হরিপন্ত এবং রাধাবাঈয়ের ত্রয়োদশ সন্তান। হরিপন্ত এবং রাধাবাঈ বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে সর্ব্বপ্রথম ব্রাহ্মণত্ব ত্যাগ করিয়া খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করেন। "সগুণা" নামক স্বরচিত উপন্যাসে কৃপাবাঈ পিতৃগৃহের এবং নিজ জীবনের একটি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। "কমলা" তাঁহার অন্যতর উপন্যাস। উভয় উপন্যাসই ইংরাজীতে লিখিত। আমরা "কমলা"র আখ্যানবস্তু এবং স্বর্গীয়া কৃপাবাঈর চিত্র পাঠকবর্গকে উপহার দিতেছি। অনেক সুযোগ্য ইংরাজ সমালোচক কৃপাবাঈর ইংরাজী রচনার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বর্ণনায় সিদ্ধহস্ত ছিলেন। উল্লিখিত উপন্যাসদ্বয় মান্দ্রাজের শ্রীনিবাস বরদাচারী এবং কোম্পানীর দোকানে পাওয়া যায়।

***

আমরা নানা কারণে নিয়মিতরূপে গ্রন্থ সমালোচনা করিতে পারি না। সুতরাং গ্রন্থকারগণ আমাদিগকে পুস্তক না পাঠাইলে বাধিত হইব।



প্রবাসী।] মহারাণী আলেক্‌জান্দ্রা। [এলাহাবাদ।

প্রবাসী

দ্বিতীয় ভাগ। আষাঢ়, ১৩০৯। ৩য় সংখ্যা।

ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ।

মৃচ্ছকটিকম্।

(গ) রচনাকাল।

মৃচ্ছকটিক বৌদ্ধযুগের নাট্যগ্রন্থ। তজ্জন্য কেহ কেহ বলেন,—ইহা নিতান্ত আধুনিক। বৌদ্ধযুগের ইতিহাস স্মরণ করিয়া মৃচ্ছকটিক পাঠে প্রবৃত্ত হইলে, এরূপ সিদ্ধান্তের পক্ষ সমর্থন করা যায় না।

সচরাচর প্রচলিত ইতিহাসে যাহা ভারতীয় বৌদ্ধযুগ নামে খ্যাতিলাভ করিয়াছে, তাহার প্রকৃত নাম—শাক্যযুগ। শাক্যসিংহের আবির্ভাবের পূর্ব্বেও ভারতীয় দার্শনিকদলের নিকট বৌদ্ধমত একেবারে অপরিজ্ঞাত ছিল না। শাক্যসিংহ সেই মত অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করায়, শাক্যশিষ্যগণ তাহাকে নানা লতাপল্লবে সুসজ্জিত করিয়া তুলিয়াছিলেন। এই শাক্যযুগ দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে আধিপত্য রক্ষা করিতে সক্ষম হয় নাই। যখন আধিপত্য ছিল, তখনও সকল প্রদেশে সকল সময়ে সমান আধিপত্য বর্ত্তমান থাকার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। শাক্যমত খৃষ্টাবির্ভাবের পঞ্চশত বৎসর পুর্ব্বে প্রবর্ত্তিত হইয়া, খৃষ্টোত্তর দশম শতাব্দীর পর ক্রমে তিরোহিত হইয়া গিয়াছে। খৃষ্টাবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী পঞ্চশত বৎসর শাক্যমতের "অভ্যুদয়কাল", খৃষ্টাবির্ভাবের পরবর্ত্তী প্রথম পঞ্চশত বৎসর "শাক্যশৈবসংঘর্ষকাল," এবং খৃষ্টোত্তর ষষ্ঠ হইতে দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত পঞ্চশত বৎসর "তিরোভাবকাল" বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে। এই ত্রিধা বিভক্ত শাক্যযুগের সকল কালেই বৈদিকমত অল্পাধিক মাত্রায় বর্ত্তমান ছিল। অভ্যুদয়কালে তাহা কিয়দ্দিবসের জন্য হীনবল হইলেও, সংঘর্ষকালে আবার প্রবল হইয়া উঠিয়া, তিরোভাবকালে বৌদ্ধনিরসন সুসম্পন্ন করিয়াছিল। বৈদিকমত পুরাতন কর্ম্মকাণ্ড সুদৃঢ় করিবার জন্য, শাক্ত বৈষ্ণব শৈব সৌর গাণপত্যাদি নানা উপাসনাপ্রণালীর উদ্ভাবন করিয়া, বৌদ্ধনিরসনে অগ্রসর হইয়াছিল। এই সকল মত শাক্যসিংহের আবির্ভাবের পুর্ব্ব হইতেই বর্ত্তমান ছিল; সংঘর্ষকালে ক্রমে দিগ্‌দিগন্তে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল। বৌদ্ধগ্রন্থেই ইহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়।

দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত পুরাতন বৈদিক মত বিধ্বস্ত করিয়া নবোত্থিত শাক্যমত যে সহজে জলে স্থলে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে, ইহা সেকালের লোকের ধারণা ছিল না। অভ্যুদয়কালে শাক্যমত তজ্জন্য কোন প্রবল বাধা প্রাপ্ত হয় নাই। তখন সাম্রাজ্য বলিতে মগধ, রাজধানী বলিতে পাটলিপুত্র এবং ধর্ম্ম বলিতে শাক্যমত সহজেই সুপরিচিত হইয়া উঠিয়াছিল। পুরাতন কীকট দেশ তাহার ক্ষুদ্র সীমা অতিক্রম করিয়া পরাক্রান্ত মগধ সাম্রাজ্যে পরিণত হইবার সম-সময়ে, নবোত্থিত শাক্যমতও দিগ্‌দিগন্তে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। তৎসূত্রে নিরক্ষর জনসমাজ এক অজ্ঞাতপূর্ব্ব মহাপরিত্রাণ লাভ করিয়াছিল। কর্ম্মকাণ্ডের শাসন, ব্রাহ্মণের বিধিনিষেধের শাসন, জাতিধর্ম্মের শাসন,—পুরাতন সকল শাসন শিথিল করিয়া শাক্যমত যখন নরনারীকে ডাকিয়া কহিল,—

"অজ্জা! কলেধ ধম্মসঞ্চঅং।
শণ্ণম্মধ নিঅপোটং নিচ্চং জগেগধ ঝাণপড়হেণ।
বিশমা ইন্দিঅ-চোলা হলন্তি চিল-সঞ্চিদং ধম্মং॥"

তখন জনসাধারণ সেই চিরপরিচিত কথোপকথনের ভাষায় জাগরিত হইয়া উঠিল;—বুঝিল, "বিষম ইন্দ্রিয়চৌর চিরসঞ্চিত ধর্ম্মকে হরণ করিতেছে!" কথোপকথনের ভাষা নূতন সম্মান লাভ করিয়া সাহিত্যে আসন প্রাপ্ত হইল;—বেদাধ্যয়ন-বঞ্চিত নিরক্ষর তুচ্ছ লোকেরা সহসা নূতন মর্য্যাদা অধিকার করিল; লোকসমাজে শাক্যমত সহজেই জয়যুক্ত হইয়া গেল। তখন বৈদিকমতানুরক্ত ধনাঢ্য লোকেও চৈত্যবিহারাদি সংস্থাপনকে পুণ্যকার্য্য বলিয়া গণনা করিতে শিক্ষালাভ করিলেন। জনসমাজ এইরূপে শাক্যমতে আকৃষ্ট হইতেছে বলিয়া, তীর্থিকগণ শাক্যমতের গতিরোধকামনায় প্রতিবাদ করিতে দণ্ডায়মান হইয়াও, শাক্যমতের গতিরোধসাধনে সক্ষম হইলেন না। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল প্লাবন চিরপরিচিত লোকাচার ভাসাইয়া লইয়া নিরন্তর শক্তিশালী হইয়া উঠিতে লাগিল।

কাশ্মীর, কান্যকুব্জ, উজ্জয়িনী ও গৌড়াদিজনপদ মগধ সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিবার সময়, বৌদ্ধধর্ম্মের এই প্রবল প্লাবন বাধা প্রাপ্ত হইল;—শাক্যশৈবসংঘর্ষ সেই বাধা উপস্থিত করিয়া, কখন দার্শনিক তর্কে, কখন ক্রিয়াকাণ্ডের আড়ম্বরে, জনসাধারণকে ধীরে ধীরে আকর্ষণ করিতে আরম্ভ করিল। অভ্যুদয়কালে যাহা সাধিত হয় নাই, সংঘর্ষকালে তাহার সূত্রপাত হইয়া, তিরোভাবকালে বৌদ্ধনিরসন সুসম্পন্ন করিয়া দিল। খৃষ্টোত্তর পঞ্চম শতাব্দী হইতে ইহা সর্ব্বত্র দৃষ্টিপথে পতিত হইতে লাগিল। বৌদ্ধবিহার ক্রমে পরিত্যক্ত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হইতে লাগিল; তাহার পার্শ্বে শৈবমন্দির সমুন্নত চূড়ায় আকাশে মস্তকোত্তোলন করিতে লাগিল। মহাচীন সাম্রাজ্যের শ্রমণগণ ভারতভ্রমণে উপনীত হইয়া সকল প্রদেশেই ইহা সুস্পষ্ট লক্ষ্য করিতে লাগিলেন। কাশ্মীরে ইহা বহু পূর্ব্বেই সুব্যক্ত হইয়াছিল। কণিষ্করাজবংশের কৃপায়, অল্পদিবসের জন্য শাক্যমত পুনরায় উৎসাহ প্রাপ্ত হইলেও, তাহা পূর্ব্ববৎ শক্তিলাভে সক্ষম হইল না। অভ্যুদয়কালে মগধ ও পাটলিপুত্রের যে গৌরব সংস্থাপিত হইয়াছিল, সংঘর্ষকালে তাহা ক্রমশঃ তিরোহিত হইয়া—কাশ্মীর, উজ্জয়িনী, কান্যকুব্জ ও গৌড়াদি জনপদের গৌরববর্দ্ধনে অগ্রসর হইতে লাগিল।

মৃচ্ছকটিক ইহার কোন্ সময়ের গ্রন্থ? সে বিচারে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে কবিজীবনী সংকলন করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। কবিজীবনী গ্রন্থরচনার কালনির্দ্দেশের প্রধান সহায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মৃচ্ছকটিকের কবির জীবন-কাহিনী সংকলন করিবার সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায় না। সূত্রধার যে সংক্ষিপ্ত কবিপরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন, তাহা এইরূপ—

"এতৎ কবিঃ কিল—

"দ্বিরদেন্দ্রগতিশ্চকোরনেত্রঃ পরিপূর্ণেন্দুমুখঃ সুবিগ্রহশ্চ।
দ্বিজমুখ্যতমঃ কবির্বভূব প্রথিত শূদ্রক ইত্যগাধসত্ত্বঃ॥

অপিচ—

"ঋগ্বেদং সামবেদং গণিতমথ কলাং বৈশিকীং হস্তিশিক্ষাং
জ্ঞাত্বা শর্ব্বপ্রসাদাৎ ব্যপগততিমিরে চক্ষুষী চোপলভ্য।
রাজানং বীক্ষ্য পুত্রং পরমসমুদয়েনাশ্বমেধেন চেষ্ট্বা
লব্ধা চায়ুঃ শতাব্দং দশদিনসহিতং শূদ্রকোঽগ্নিং প্রবিষ্টঃ॥

অপিচ—

"সমরব্যসনী প্রমাদশূন্যঃ ককুদং বেদাবিদাং তপোধনশ্চ।
পরবারণবাহুযুদ্ধলুব্ধঃ ক্ষিতিপালঃ কিল শূদ্রকো বভূব॥"

সূত্রধারোক্ত সংক্ষিপ্ত কবিপরিচয়বিজ্ঞাপক কবিতাত্রয় পাঠ করিয়া এই পর্য্যন্ত জানিতে পারা যায়,—(১) কবির নাম শূদ্রক, (২) তিনি জাতিতে ক্ষত্রিয়, (৩) পদগৌরবে রাজা, (৪) ধর্ম্মবিশ্বাসে শৈব, (৫) বাহুবিক্রমে সমরকুশল, (৬) বেদবেদাঙ্গে সুশিক্ষিত, (৭) চরিত্রবলে সমুন্নত, (৮) যাগযজ্ঞে সুদীক্ষিত, (৯) অঙ্গসৌষ্ঠবে সুবিখ্যাত, এবং (১০) দীর্ঘায়ু ভোগ করিয়া যথাকালে স্বর্গারূঢ়। এ সমস্তই কিন্তু সূত্রধারের শোনা কথা;—রচা কথা হইলেও হইতে পারে। "ক্ষিতিপালঃ কিল শূদ্রকো বভূব"—এই বর্ণনাপ্রণালী শোনা কথারই পক্ষ সমর্থন করে। ইহাতে কালনির্ণয়ের আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায় না। ইহা কবিরচিত মনে করিয়া কেহ কেহ নিতান্ত অসঙ্গতির অবতারণা করিয়া থাকেন। কবি নিজের স্বর্গারোহণব্যাপার লিপিবদ্ধ করা অসম্ভব বলিয়া এই শ্রেণীর সমালোচকগণ মনে করেন,—মৃচ্ছকটিকের কবি নাম-গোপন করিয়া শূদ্রকনামক কল্পিত পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। এরূপ অনুমান ভিত্তিহীন বলিয়াই বোধ হয়। কারণ, এই কবিপরিচয় আদৌ কবিলেখনীপ্রসূত বলিয়া মনে হয় না। ইহা সূত্রধারের রচা কথা বলিয়াই

গ্রহণ করিতে ইচ্ছা হয়। কবিপরিচয়ের পরেই গ্রন্থপরিচয়। তাহা এইরূপ—

"অবন্তিপুর্য্যাং দ্বিজ সার্থবাহো
যুবা দরিদ্রঃ কিল চারুদত্তঃ।
গুণানুরক্তা গণিকা চ যস্য
বসন্তশোভেব বসন্তসেনা ॥
"তয়োরিদং সৎসুরতোৎসবাশ্রয়ং
নয়প্রচারং ব্যবহারদুষ্টতাং।
খলস্বভাবং ভবিতব্যতাং তথা
চকার সর্ব্বং কিল শূদ্রকো নৃপঃ ॥"

ইহার সহিত মৃচ্ছকটিকের অন্যান্য কবিতার রচনা-সামঞ্জস্য থাকিলেও, কবিপরিচয়বিজ্ঞাপক কবিতাত্রয়ের রচনা-সামঞ্জস্য লক্ষিত হয় না। কবি আত্মপরিচয় গোপন করিবার জন্য স্বয়ং এরূপ কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকিলে, ইহা অপেক্ষা অনেক সরল কৌশল অবলম্বন করিতে পারিতেন। শূদ্রকের নামোল্লেখ করিয়া সেই নামে পরিচিত হইতে ইচ্ছা করিলে, স্বর্গারোহণের কথা লিপিবদ্ধ করিয়া অসঙ্গতির অবতারণা করিতেন না। যাহা হউক, কবিপরিচয় যখন গ্রন্থরচনার কালনির্দ্দেশের সহায়তাসাধনে অক্ষম, তখন ইহার সমালোচনায় কালক্ষয় করা অনাবশ্যক।

মৃচ্ছকটিক প্রকরণ বলিয়া, ইহার আদ্যন্ত সমস্ত কথাই কবিকল্পিত ; সুতরাং পালকের নামও কবিকল্পিত। এরূপ অবস্থায় গ্রন্থরচনার কালনির্ণয়ে অন্যান্য বিষয়ের আলোচনা করাই কর্ত্তব্য। তাহাতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, আলোচনাপদ্ধতি স্থির করা আবশ্যক। কোন্ দেশে এই গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করিতে না পারিলে, ইতিহাসের সহায়তায় রচনাকাল নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে না। প্রথমে রচনাস্থান নির্ণয় করিয়া, পরে কোন্ সময়ে তদ্দেশে গ্রন্থবর্ণিত ব্যবহারাদি বর্ত্তমান ছিল, তাহার আলোচনা করিয়া রচনাকাল নির্ণয় করা সম্ভব। ইহাই তথ্যানুসন্ধানের প্রকৃষ্ট পদ্ধতি বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে। ইহাতে সমালোচনা সংযত হইয়া প্রকৃত বিচার্য্য বিষয়ের অনুধাবন করিতে বাধ্য হইবে।

সংস্কৃত নাট্যসাহিত্য রচনারীতির নিয়ম-শৃঙ্খলে নিয়ন্ত্রিত সুসংযত। তজ্জন্য তদ্দ্বারা রচনাস্থান অনুমান করা সম্ভব বলিয়া বোধ হয়। সকল দেশে সকল প্রকার রচনারীতি প্রচলিত না থাকায়, রীতিপার্থক্য ধরিয়া তথ্যনির্ণয়ের পন্থা প্রাপ্ত হওয়া যায়। নাট্যরসের পার্থক্যবশতঃ "বৃত্তি" এবং রচনারীতির পার্থক্যবশতঃ "প্রবৃত্তি" প্রচলিত ছিল। তাহার যথোপযুক্ত আলোচনার অভাবে সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের সমালোচনা পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীর একদেশদর্শী সিদ্ধান্তকেই ধ্রুব সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতেছে। তাঁহারা যাহা বলিয়াছেন, সেই কথার পুনরালোচনা, তাঁহারা যাহা বলেন নাই সেই কথার অনাদর, এখন পাণ্ডিত্যবিজ্ঞাপক প্রবল তর্ক বলিয়া জনসমাজে সগৌরবে বিঘোষিত হইতেছে! ইহাতে অনেক তথ্যনির্ণয়ের পথ সম্মুখে অজ্ঞাত থাকিলেও, সমালোচনা পুরাতন সুবিজ্ঞাত পথেই পুনঃ পুনঃ ধাবিত হইতেছে। মৃচ্ছকটিকের বৃত্তি "কৌশিকী", প্রবৃত্তি "অবন্তী"। এই বিশেষত্ব কি কোন তথ্যলাভের সহায়তাসাধন করে না? নাট্যশাস্ত্রের নির্দ্দেশ সত্য হইলে, ইহাতে আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যদেশকে মৃচ্ছকটিকের রচনাস্থান বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। রচনারীতি এই অনুমানের পক্ষ সমর্থন করে ; গ্রন্থবর্ণিত নানা কথাও ইহার অনুকূল প্রমাণ স্বরূপ উদ্ধৃত হইতে পারে। যথা—

(১) "ভিক্খুঃ। পক্খালিদে এশে মএ চীবলখণ্ডে। কিংণু হু শাহাএ শুক্খাবইশ্শং? ইধ বাণলা বিলুপ্পান্তি।"

বৃক্ষশাখায় আর্দ্র চীবরখণ্ড শুষ্ক করিবার চেষ্টা করিলে বানরে নষ্ট করিবে বলিয়া ভিক্ষুর মনে যে আশঙ্কা উত্থিত হইয়াছিল, তাহা কবির বাসস্থানের স্বাভাবিক আশঙ্কা বলিয়াই বোধ হয়। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের কবির মনে এরূপ আশঙ্কা উত্থিত হয় না।

(২) "হিঙ্গু জলা দিন্ন মরীচচুণ্ণে।"

এই শকারোক্তি রন্ধনে হিঙ্গু ব্যবহারের পরিচয় প্রদান করে। তাহাও প্রাদেশিক বিশেষত্ব বিজ্ঞাপক। সকল প্রদেশে হিঙ্গু ব্যবহৃত হয় না।

(৩) "দিন্ন-ণবণস্সা বিঅ গিট্ঠী।"

এই বিদূষকোক্তির "গিট্ঠী" শব্দের অর্থ—সকৃৎপ্রসূতা গাভী। তাহার নাসাছিদ্র করিবার প্রথা সকলদেশে প্রচলিত ছিল না। হট্টমালার দেশে নাকি এই প্রথা প্রচলিত ছিল।

"হট্টমালার দেশে —তারা গাই বলদে চষে",এই কথা অদ্যাপি বালকবালিকার ছড়ায় শুনিতে পাওয়া যায়।

(৪) "কক্কালুকা গোচ্ছড়লিত্তবেণ্টা
শাকে অ শুক্খে তলিদে হু মংশে।
ভত্তে অ হেমন্তি অলত্তিশিণ্ডে
লীণে অ বেলে ন হু হোদি পূদী॥"

এই শকারোক্তিতে কতকগুলি প্রাদেশিক ব্যবহার ও অভিজ্ঞতার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। শুষ্ক শাকভোজন তন্মধ্যে বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। তাহা ভারতবর্ষের সকল প্রদেশে প্রচলিত ছিল না।

(৫) পক্কেষ্টকাণাং আকর্ষণং, আমেষ্টকানাং ছেদনং,
পিণ্ডময়ানাং সেচনং, কাষ্ঠময়ানাং পাটনং।"

এই শর্ব্বিলকের বাক্যে প্রস্তরনির্ম্মিত বা তৃণাদিগঠিত ভিত্তির উল্লেখ নাই; ইষ্টক, মৃত্তিকা ও কাষ্ঠময় ভিত্তিরই উল্লেখ আছে। কাষ্ঠময়ভিত্তি বিশেষত্ববিজ্ঞাপক। সকল প্রদেশে প্রচলিত ছিল না। মেগাস্থিনীস্ মধ্যদেশে তাহা দর্শন করিয়াছিলেন। পাটলিপুত্রের কাষ্ঠপ্রাচীরের ধ্বংসাবশেষ আধুনিক সময়ে আবিষ্কৃত হইয়াছে।

এরূপ অনেক দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করা যাইতে পারে। প্রচলিত পশুপক্ষীর নাম, বৃক্ষলতার নাম, আহার্য্য দ্রব্যের নাম, গৃহসজ্জার নাম,—এরূপ অনেক নাম মৃচ্ছকটিকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহার মধ্যে প্রাদেশিক বিশেষত্ব লক্ষিত হইয়া থাকে। সে বিশেষত্ব কোন কোন স্থলে একাধিক প্রদেশে প্রচলিত থাকিলেও, সকলগুলি বিশেষত্ব একত্র একাধিক প্রদেশে বর্ত্তমান থাকার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাহা কেবল মধ্যদেশের পক্ষেই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দিনকরকিরণ, মধ্যাহ্নের তাপতপ্ত রাজপথ, একদিকে গ্রীষ্মাধিক্যের পরিচয় প্রদান করে; অন্যদিকে সেই গ্রীষ্মতাড়িত জনপদে বারিধারা বর্ষিত হইবামাত্র সর্ব্বগাত্রে শীতাবেগ উপস্থিত করিয়া থাকে। মৃচ্ছকটিকপাঠে এইরূপ ঋতুপরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাও মধ্যদেশের পক্ষে অসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। মধ্যদেশকে মৃচ্ছকটিকের রচনাস্থান কল্পনা করিলে, তদ্দেশের ইতিহাসের সহিত গ্রন্থোক্ত আচার ব্যবহারের সামঞ্জস্য লক্ষ্য করিতে বিলম্ব হয় না। দুই একটি বিশেষ ঐতিহাসিক তথ্য এই সিদ্ধান্ত আরও সুদৃঢ় করিয়া দেয়।

খৃষ্টাবির্ভাবের পূর্ব্বে মধ্যদেশে পাটলিপুত্রেরই প্রাধান্য ছিল। তাহার সমুজ্জ্বল সৌভাগ্যরশ্মি অন্যান্য প্রাদেশিক রাজধানীকে নিতান্ত নিষ্প্রভ করিয়া তুলিয়াছিল। তৎকালে যে ব্যাকরণবৃত্তি রচিত হইয়াছিল, তাহার উদাহরণের মধ্যেও পাটলিপুত্রের কথা;—সে নাম তখন ভারতবিখ্যাত, অপিচ জগদ্বিখ্যাত! মৃচ্ছকটিকেও পাটলিপুত্রের উল্লেখ আছে, কিন্তু সে সৌভাগ্যগর্ব্বের আভাস নাই। যেন উজ্জয়িনীর তুলনায় পাটলিপুত্র হীনপ্রভ! পাটলিপুত্রের অধিবাসী হইয়াও সংবাহক জীবিকার্জ্জনের আশায় উজ্জয়িনীতে সমাগত। সে পাটলিপুত্রে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল; তথায় "গৃহপতিদারক" বলিয়া পরিচিত ছিল; সৌভাগ্যের দিনে সংবাহনবিদ্যা অধিগত করিয়া দুর্ভাগ্যের দিনে তদ্দ্বারা জীবিকার্জ্জনের জন্য উজ্জয়িনীতে উপনীত হইয়াছিল। কবি এতদ্দ্বারা কেমন সুকৌশলে পাটলিপুত্রের অধঃপতন ও উজ্জয়িনীর অভ্যুদয় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন! ইতিহাসে এরূপ ভাগ্যবিপর্য্যয় দুইবার সংঘটিত হয় নাই। সুতরাং পাটলিপুত্রের অধঃপতন ও উজ্জয়িনীর অভ্যুদয়লাভের সমসময়ে মৃচ্ছকটিক রচিত হওয়ার আভাস প্রাপ্ত হওয়া গেল। তাহা কোন্ সময়ের ঘটনা? বৌদ্ধযুগের অভ্যুদয়কালের চরমদশায় ভারতবর্ষে এই ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হইবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। একদিকে পাটলিপুত্রের সৌভাগ্যচন্দ্রমা অস্তাচলচূড়াবলম্বী, অন্যদিকে উজ্জয়িনীর গৌরবরবি পরম সমুজ্জ্বল উদয়াচলশিখরারূঢ়;—সেই সন্ধিস্থলের নানা প্রসঙ্গ মৃচ্ছকটিকে বর্ত্তমান!

মৃচ্ছকটিক লোকব্যবহারের বিচিত্র চিত্রে সুসজ্জিত বলিয়া, ইহাতে ধনরত্নাদির কথা নানা ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। পুরাকালে ক্রয়বিক্রয়াদি সাংসারিক ব্যাপারে ধাতু ও রাজমুদ্রা ব্যবহৃত হইত। ৮০ রতি স্বর্ণ "সুবর্ণ" নামে পরিচিত ও সর্ব্বত্র ব্যবহৃত হইলেও, তাহাকে মুদ্রা বলিত না। মুদ্রার নাম কি ছিল? মৃচ্ছকটিক রচিত হইবার সময়ে মুদ্রার নাম ছিল—"ণানক"। তাহা জনসমাজে যথেষ্ট পরিচিত ছিল বলিয়াই কবি বেশ্যার দশনাম কীর্ত্তনকালে বলিয়াছেন— "এষা ণানকমোষীকামকষিকা"। এই রাজমুদ্রা কোন্ সময়ে প্রচলিত ছিল, তাহা নির্ণয় করিতে পারিলেই মৃচ্ছকটিকের রচনাকাল নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। "ণানক"-নামক রাজমুদ্রা

কাশ্মীরাদি বিবিধ প্রদেশে আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহা কণিষ্ক কর্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল বলিয়া প্রমাণও প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। কণিষ্ক রাজতরঙ্গিণীর মতে তুরুস্ক বংশীয় দিগ্বিজয়ী নরপতি; বাহুবলে কাশ্মীর হইতে বারাণসী পর্য্যন্ত শাসনক্ষমতা পরিচালিত করিয়াছিলেন। এই রাজবংশ কাণ্ব নামেও পুরাণে পরিচিত। কণিষ্ক, হুবিষ্ক ও বাসুদেব নামধেয় তিনজন মাত্র নরপতি এই রাজবংশে জন্মগ্রহণ করিয়া ভারতশাসনে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহাদের তিরোভাবের সঙ্গে তাঁহাদের রাজ্য, রাজমুদ্রা ও শাসনপ্রণালী তিরোহিত হইয়া গিয়াছিল। ইঁহারা আপনাদিগকে "দেবপুত্র"নামে অভিহিত করিতেন; ইঁহাদের রাজ্যকাল সংবৎ সংজ্ঞায় পরিগণিত হইত; ইঁহাদের নামাঙ্কিত নানা শিলালিপি মথুরাপ্রদেশে আবিষ্কৃত হইয়া মধ্যদেশের সহিত ঘনিষ্ঠ সংস্রব থাকা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। মৃচ্ছকটিকে এই রাজবংশের "ণানক" নামক মুদ্রা, ও "বাসুদেব" নামক নরপতির পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। বাসুদেব প্রবল পুরুষরূপে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। লোকে পুণ্যপ্রতিষ্ঠার্থ শিলালিপি খোদিত করাইবার সময়ে তাঁহার নামোল্লেখ করিয়া গিয়াছে। মৃচ্ছকটিকের শকার সগর্ব্বে আপনাকে "বাসুদেব" বলিয়া আস্ফালন করিয়াছেন। যথা—

"বিটঃ। কাণেলীমাতঃ! এষা বসন্তসেনা ভবন্তমভিসারয়িতুং আগতা।

শকারঃ। [সহর্ষং] ভাবে! ভাবে! মং পবলপুলিশং মণুশ্‌শং বাসুদেবকং?"

প্রবলপুরুষ নরপতি "বাসুদেব" দেবপুত্র,—দেবপুরুষ বলিয়াই বিখ্যাত ছিলেন। শকার আপনাকে মনুষ্যপুত্র—মানবপুরুষ "বাসুদেব" বলিয়া আস্ফালন করিয়াছেন। ইহার ঐতিহাসিক তথ্যালোচনায় অগ্রসর না হইয়া, টীকাকার "ণানককে" মুদ্রাবিশেষ বলিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন; "বাসুদেব" শব্দের অর্থ নিতান্ত সুগম বোধেই বোধ হয় তৎপ্রতি কৃপাকটাক্ষ করিতে বিরত হইয়াছেন। সুতরাং যে দুইটি রচনাকাল নির্ণয়ের পক্ষে প্রধান অবলম্বন, তাহা মৃচ্ছকটিকের প্রচলিত টীকায় আদৌ যথাযোগ্য যত্নের সহিত সমালোচিত না হওয়ায়, ইহার প্রাচীনত্বে অনেকের মনে সংশয় রহিয়া গিয়াছে। অধ্যাপক ওয়েবর সমগ্র সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের আধুনিকত্ব সংস্থাপনার্থ লালায়িত হইয়াও, মৃচ্ছকটিকে এই "ণানক" শব্দ লক্ষ্য করিয়া, ইহাকে প্রায় দ্বিসহস্র বৎসরের গ্রন্থ বলিতে বাধ্য হইয়াছেন;—শ্রীযুক্ত জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বঙ্গানুবাদে প্রবৃত্ত হইয়া, সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যালোচনায় দীর্ঘকাল অতিবাহিত করিয়া, মৃচ্ছকটিকের "ণানক" শব্দ হইতে ইহার প্রাচীনত্ব ঘোষণা করিয়া ভূমিকা রচনা করিয়াছেন। আমাদের পক্ষে "এই সিদ্ধান্ত অসঙ্গত হয় নাই" বলিয়া মত প্রকাশ করা অসঙ্গত নহে। দুই চারিটি প্রাকৃত পাঠের আধুনিকত্ব সংস্থাপন করিতে পারিলেও, এই তর্ক উড়াইয়া দিতে পারি না। প্রাকৃত পাঠ আধুনিক সময়ে বহুবার রূপান্তরিত হইয়া থাকিতে পারে। পরবর্ত্তী নাট্যাচার্য্যগণ এরূপ অনেক শব্দ পরিবর্ত্তন করিয়া পুরাতন গ্রন্থের নানা পাঠান্তর প্রচলিত করিয়া গিয়াছেন।

বাঙ্গালা পাঠশালার গুরুমহাশয়গণ স্বরসংযোগে চাণক্যশ্লোক অধ্যাপনাকালে তাঁহাকে রাজনীতিসমুচ্চয়ের সংকলনকর্ত্তা নীতিবিশারদ পরম পণ্ডিত বলিয়াই জানিয়া রাখিয়াছিলেন। আধুনিক ঐতিহাসিক আলোচনায় চাণক্য নন্দবংশবিধ্বস্তকারী, মৌর্য্যবংশপ্রতিষ্ঠাতা, চন্দ্রগুপ্তপরিচালক, ভয়ানক প্রতাপশালী ব্যক্তি বলিয়া সুপরিচিত হইয়াছেন। তাঁহার তর্জ্জনীহেলনে একদা পরাক্রান্ত মগধসাম্রাজ্যের সমগ্র সুখ দুঃখ নিয়মিত হইত, চন্দ্রগুপ্তের ন্যায় মহারাজচক্রবর্ত্তীও অবনত মস্তকে সে ইঙ্গিত প্রতিপালন করিয়া আপনাকে কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিতেন। মৃচ্ছকটিকের শকার এই চাণক্যের নামোল্লেখ করিয়া তাঁহাকে প্রবল পুরুষ বলিয়াই ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন। মৃচ্ছকটিক রচনাকালে চাণক্যের স্মৃতি কত উজ্জল ছিল, তাহা লক্ষ্য করিয়া আর আধুনিকত্ববাদ সমর্থন করা যায় না।

দরিদ্র চারুদত্ত বৈদিক ধর্ম্মানুরক্ত হইয়াও বিহারাদি নির্ম্মাণে উজ্জয়িনীকে অলংকৃত করিয়াছিলেন। বিদূষক মহাশয় প্রসঙ্গক্রমে তাহার উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। ইহা অভ্যুদয়কালের লোকব্যবহার বলিয়াই বোধ হয়। উত্তরকালে এই উদারতা ক্রমে সংকীর্ণ হইয়া শাক্যশৈবসংঘর্ষ ঘনীভূত করিয়া তুলিয়াছিল।

মৃচ্ছকটিকের নান্দী শৈবমত প্রতিপাদক বলিয়া কেহ কেহ বলেন,—মৃচ্ছকটিক আধুনিক গ্রন্থ; ভগবান শঙ্করাচার্য্য

শৈবমত প্রচার করিবার পর রচিত। শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাবকাল নির্ণয় করিবার জন্য বর্ত্তমান প্রবন্ধে কালক্ষয় করা অনাবশ্যক। শঙ্করাচার্য্যের পূর্ব্বেও শৈব মত প্রচলিত ছিল। তিনি লিঙ্গোপাসনার প্রচারক হইলেও, শৈব মতের প্রথম প্রবর্ত্তক বলিয়া স্বীকার করা যায় না। মৃচ্ছকটিকের নান্দী কোন্ শৈব মত প্রতিপাদন করে, তাহারও বিচার করা আবশ্যক।

"পর্য্যঙ্কগ্রন্থিবন্ধদ্বিগুণিতভুজগাশ্লেষসংবীতজানো-
রন্তঃ প্রাণাবরোধব্যুপরতসকলজ্ঞানরুদ্ধেন্দ্রিয়স্য।
আত্মন্যাত্মানমেব ব্যপগতকরণং পশ্যতস্তত্ত্বদৃষ্ট্যা
শম্ভোর্বঃ পাতু শূন্যেক্ষণঘটিতলয়ব্রহ্মলগ্নঃ সমাধিঃ॥"

এই নান্দীশ্লোক নিরতিশয় সুখপাঠ্য হইলেও, সুখবোধ্য বলিয়া বোধ হয় না। ইহার বাহ্যরূপ শৈবমতপ্রতিপাদক হইলেও ইহার প্রকৃতরূপ দার্শনিক তত্ত্বোপদেশপূর্ণ যোগাবস্থার চিত্রপট। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য যে সকল উপনিষদের ভাষ্য রচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেও এই দার্শনিক যোগতত্ত্ব দেদীপ্যমান। সুতরাং মৃচ্ছকটিকের প্রথম শ্লোকের দুরূহ তাৎপর্য্য সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম না করিয়া, কেহ কেহ তাহাকে আধুনিকত্বের প্রমাণ স্বরূপ স্থাপন করিবার চেষ্টা করিলেও, সেরূপ সমালোচনায় আস্থা স্থাপন করা যায় না।

ভারতবর্ষের লোকব্যবহার শ্রুতিস্মৃতির বিধিনিসেধ অবনতমস্তকে বহন করিয়া আসিয়াছে। কেবল শাক্যমতের অভ্যুদয়কালে তাহার শাসন কিয়দ্দিবসের জন্য শিথিল হইয়া উঠিয়াছিল, সংঘর্ষকালে তাহা পুনরায় দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হয়। মৃচ্ছকটিকের পাত্রপাত্রীগণের মধ্যে যাঁহারা বৈদিকমতানুরক্ত, তাঁহাদের আচারব্যবহারগুলি কোন্ স্মৃতির পরিচয় প্রদান করে? শর্ব্বিলকের ন্যায় ব্রাহ্মণকুমারের মদনিকার ন্যায় গণিকাদাসীকে বধূরূপে গ্রহণ করা, এবং চারুদত্তের পক্ষে বসন্তসেনাকে বধূপদে সংস্থাপন করা স্মৃতিবিরুদ্ধ;—কেবল বৌদ্ধযুগের অভ্যুদয়কালের শিথিল সমাজের পক্ষেই ইহা সম্ভব ছিল। ব্রাহ্মণ অবধ্য—এই মনুনির্দ্দিষ্ট পুরাতন শাসনবাক্য উদ্ধৃত করিয়া বিচারক চারুদত্তের পক্ষে নির্ব্বাসনদণ্ডের ব্যবস্থা করিবার উপদেশ দিলেও, রাজা তাঁহার প্রাণদণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন। ইহাও শিথিল সমাজের পরিচয় বিজ্ঞাপক। তখন বৌদ্ধমত প্রবল হইয়া পুরাতন সমাজশাসন এতদূর শিথিল করিয়া দিয়াছিল যে, বিদূষকের ন্যায় সুব্রাহ্মণ বসন্তসেনার গৃহে জলপানের জন্য অনুরুদ্ধ হন নাই বলিয়া আক্ষেপ প্রকাশ করিয়াছেন! বেশ্যাগৃহে ব্রাহ্মণতনয়ের জলযোগ,—কোন্ স্মৃতির অনুমোদিত? অথচ মৃচ্ছকটিক পাঠে বোধ হয়, গ্রন্থরচনাকালে এরূপ আচার ব্যবহার জনসমাজে প্রচলিত ছিল।

মৃচ্ছকটিকের রচনাকাল সর্ব্বপ্রকার শাসনশৈথিল্যের আধার। লোকাচারের শাসনশৈথিল্যের ন্যায় কাব্যরচনার শাসনশৈথিল্যও দেদীপ্যমান। কবি ইচ্ছা করিয়া বহুবার ব্যাকরণ ও রচনারীতিকে অতিক্রম করিয়াছেন। শব্দ সংকোচ করা, অবগাহকে বগাহে পরিণত করা, অল্প কথা। কিন্তু

"দারিদ্র্য! শোচামি ভবন্তমেব
মস্মচ্ছরীরে সুহৃদিত্যুষিত্বা।
বিপন্নদেহে ময়ি মন্দভাগ্যে
মমেতি চিন্তা ক্ব গমিষ্যসি ত্বম্॥"

এই শ্লোকের ক্লীবলিঙ্গ দারিদ্র্য শব্দের পুংবৎ ব্যবহার সাধারণ কথা নহে। টীকাকার ইহাকে "প্রামাদিক" প্রয়োগ বলিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন! এরূপ প্রয়োগ মৃচ্ছকটিকে আরও দেখিতে পাওয়া যায়। ইহা শাসনশৈথিল্যের পরিচয় প্রদান করে। বাহুল্য ভয়ে অধিক দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইল না।

শব্দার্থ পরিবর্ত্তিত ও পুরাতন অর্থ বিলুপ্ত হইবার জন্য মৃচ্ছকটিকের কোন কোন স্থল প্রচলিত অভিধানের সহায়তায় সহসা বোধগম্য হয় না। প্রবন্ধ দীর্ঘ হইল বলিয়া, দৃষ্টান্তস্বরূপ একটি মাত্র শ্লোক উদ্ধৃত করিব। চারুদত্ত স্বগৃহে চৌরাভিযানের সংবাদে প্রবুদ্ধ হইয়া যখন সন্ধিস্থান দর্শন করিলেন, তখন বলিলেন—

"বর্দ্ধমানক!
এতাভিরিষ্টিকাভিঃ সন্ধিঃ ক্রিয়তাং সুসংহতঃ শীঘ্রং।
পরিবাদবহুলদোষান্ন যস্য রক্ষাং পরিহরামি॥"

এখানে "রক্ষা" শব্দের অর্থ কি? টীকাকার বলিয়াছেন—"রক্ষাং ন পরিহরামি, ন ত্যজামি; সততমেব সন্ধিং রক্ষামীত্যর্থঃ।" রক্ষা শব্দের বর্ত্তমান অর্থানুসারে এইরূপ আক্ষরিক টীকাই লিপিবদ্ধ করিতে হয়। কিন্তু ইহাতে অসঙ্গতিদোষ পরিত্যক্ত হয় নাই। শ্লোকের প্রথমার্দ্ধে

চারুদত্ত বলিলেন, "বর্দ্ধমানক! এই ইষ্টকগুলি লইয়া শীঘ্রই সন্ধি সুসংহত কর,—সন্ধিমুখ বন্ধ করিয়া ফেল।" আবার সেই চারুদত্তই শ্লোকের পরার্দ্ধে বলিলেন, তিনি লোকনিন্দা ভয়ে সতত সন্ধি রক্ষা করিবেন! এই অসঙ্গতির অবতারণা করা হইল কেন? সংস্কৃতজ্ঞ পাঠক অবশ্যই ইহার ভাবোদ্ধার করিয়া ব্যাখ্যা লিখিতে পারিবেন। যতক্ষণ প্রচলিত অভিধানাদির সহায়তায় এই শ্লোকের ব্যাখ্যা দেখিতে পাইব না, ততক্ষণ বলিব,—ইহা মৃচ্ছকটিকের সমধিক প্রাচীনত্ববিজ্ঞাপক। বঙ্গীয় পূর্ব্বাচার্য্যগণ মৃচ্ছকটিককে পুরাতন গ্রন্থ বলিয়াই নিরস্ত হইয়াছেন; কেন পুরাতন বলিয়া মানিব,—তাহার সমালোচনা লিপিবদ্ধ করেন নাই। তজ্জন্য আধুনিক পণ্ডিতগণ তাঁহাদের মতে আস্থাশূন্য হইয়া উঠিতেছেন। তাঁহারা সকল গ্রন্থই যথারীতি অধ্যয়ন করিতেন; আমরা অধ্যয়ন করি না,—কেবল পাঠ করিয়া চলিয়া যাই। সুতরাং তাঁহাদের "মত" উপেক্ষা করিবার পূর্ব্বে, আমাদের পক্ষে তুলারূপ অধ্যয়নশ্রম স্বীকার করা কর্ত্তব্য। ভূদেব-প্রমুখ যে সকল আধুনিক পাঠক সেরূপ অধ্যয়নশ্রম স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহারা মৃচ্ছকটিককে একবাক্যে প্রাচীন বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। ইহা পুরুষপরম্পরাগত "বঙ্গীয় মত";—অকাট্য প্রমাণ ভিন্ন কেবল অনুমানবলে এই মতে অনাস্থা প্রদর্শন করিতে সাহস হয় না।

সুলভ সমালোচনা অপেক্ষা দুর্ল্লভ অধ্যয়ন কল্যাণকর। বোধ হয় এই কারণে সে কালের তাঁহারা সমালোচনা লিপিবদ্ধ করিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। কিন্তু আমাদের পক্ষে ইহাই সংশয়ের কারণ হইয়া উঠিয়াছে। যে দেশের ইতিহাস নাই, সে দেশের পুরাতন গ্রন্থের রচনাকাল নির্দ্দেশ করা একরূপ অসম্ভব ব্যাপার। পূর্ব্বাচার্য্যগণ কি বলিয়া গিয়াছেন, তাহা সযত্নে আলোচনা করাই আবশ্যক। কারণ, অন্য প্রমাণ না থাকিলেও, বংশপরম্পরায় পণ্ডিতসমাজে যে "মত" প্রবাহিত হইয়া আসিয়াছে, তাহা একদা অভিজ্ঞ আচার্য্যগণের পাদপদ্ম হইতে প্রথমে প্রস্রবণের ন্যায় নিঃসৃত হইয়াছিল! পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলী আমাদিগকে নানা ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান প্রদান করিলেও, তাঁহারা যে সময়ে সময়ে নিতান্ত যৎসামান্য কথার উপর নির্ভর করিয়া ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত প্রচারিত করিয়া থাকেন, তাহার অনেক প্রমাণ বিদ্যমান আছে। আমাদের পক্ষে স্বাধীন অনুসন্ধিৎসার সময় আসিয়াছে। আমরা সে পথে যত অগ্রসর হইব, ততই আমাদের সাহিত্য বল ও পুষ্টি লাভ করিবে। আর কিছু না হউক, পুরাতত্ত্বের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানপদ্ধতি আবিষ্কৃত হইয়া, উত্তরকালে আমাদের সাহিত্যসেবকগণকে তথ্যসংকলনে অধিকতর সক্ষম করিতে পারিবে। *

শ্রীঅক্ষয়কুমার মৈত্রেয়।

* মৃচ্ছকটিকে যে সকল লোকব্যবহারের সন্ধান প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা পৃথক্ প্রবন্ধে আলোচিত হইবে। তৎপূর্ব্বে নাট্যসাহিত্যের যুগ নির্ণয় করা আবশ্যক। সকলগুলি নাট্যগ্রন্থের সমালোচনা সমাপ্ত হইলে তাহা সাঙ্গ হইবে।

গিলগিট ও গিলগিটী।

আদিমনিবাসী ও তাহাদের উৎপত্তি।

পৃথিবীর অন্যান্য অসভ্য দেশের অধিবাসীদিগের যেমন লিখিত কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না, গিলগিটীদেরও সেইরূপ কোন জাতীয় ইতিহাস নাই। এইরূপ স্থানের ইতিহাস লেখা বড়ই দুরূহ। কিম্বদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া, তাহার যতদূর বিশ্বাসযোগ্য, ততদূর লইয়া নিম্নলিখিত বিবরণ প্রকটিত হইল।

অনুসন্ধানে ইহাই জানা যায় যে, নিম্নলিখিত কয়েক শ্রেণীর লোক এখানে বাস করিত এবং আজ কালকার অধিবাসীরা তাহাদেরই বংশোদ্ভূত। (১) রোনো, (২) সিন্, (৩) ইয়েশকুন, (৪) ক্রামিন, (৫) ডোম, (৬) কাশ্মীরী, (৭) গুজর। ইহাদের মধ্যে প্রথম তিন শ্রেণীই প্রধান। এই তিন শ্রেণী আবার বহু শ্রেণীতে বিভক্ত। সামাজিক প্রথানুসারে "রোনো"ই সর্ব্বপ্রধান বংশ। তাহার নীচে "সিন্" এবং তৎপরে "ইয়েশকুন"। "ক্রামিন" ও "ডোম" অতি নীচ জাতীয় বলিয়া বিবেচিত হয়। গিলগিটের আদিমনিবাসী কাহারা, তৎসম্বন্ধে কোন প্রকার সঠিক প্রমাণ পাওয়া যায় না। "ইয়েশকুন", "সিন্" ও "রোনোরা" যে যথাক্রমে অন্যস্থান হইতে এখানে আসিয়া বসবাস করিয়াছে, তাহার কতকটা প্রমাণ পাওয়া যায়, কিন্তু "ক্রামিনের" পক্ষে সেরূপ কোন প্রমাণ নাই। সুতরাং ইহাই বোধ হয়

যে হিন্দুস্থানের ভীল, গোণ্ড প্রভৃতি আদিম অসভ্য জাতির ন্যায় গিলগিটে "ক্রামিনেরা" বাস করিত। "ইয়েশকুনেরা" প্রথমে গিলগিটে আসে। ইহারা সম্ভবতঃ আর্য্যবংশোদ্ভূত। মধ্য এশিয়া হইতে হিন্দুকুশ পর্ব্বত অতিক্রম করিয়া আসিয়া ইহারা এ প্রদেশের অনেক স্থান জয় করিয়া বাস করে এবং সেই সকল স্থানে এই শ্রেণীর লোক এখনও পর্য্যন্ত বাস করে। "ইয়েশকুনেরা" গিলগিটের আদিমনিবাসীদিগকে পরাজিত করিয়া দাসশ্রেণীতে পরিণত করে ও তাহাদিগকে "ক্রামিন" শব্দে অভিহিত করে। এরূপ কিম্বদন্তী আছে যে, "ইয়েশ-কুন" শ্রেণীর অন্তর্গত "বাবুসাই" শ্রেণী গিলগিটে প্রথম আসে। তাহারা এখনও "মাথালপো" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। "মাথালপো" শব্দের অর্থ এক টুকরা জমি বা Natives of the land. "সিন্"রা বলে যে তাহাদের ধমনীতে আরবরক্ত প্রবাহিত হইতেছে এবং তাহারা খাইবার হইতে মাওয়ারা-উন-নহর অতিক্রম করিয়া সোয়াত, কোহি-স্থান, চিলাস ও গিলগিটে আসিয়া বাস করে।

"সিন্"রা যে প্রকারেই গিলগিটে আসুক না কেন, তাহারা যে "ইয়েশকুন" দিগের আসিবার অনেক পরে আসিয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইয়েশকুনেরা আসিয়া যেমন গিলগিটের আদিমনিবাসী ক্রামিনদিকে আপনাদিগের অপেক্ষা নীচশ্রেণীতে পরিণত করিয়াছিল, সেইরূপ "সিন্"-দেরও যখন প্রতাপ বৃদ্ধি হইল, তখন "ইয়েশকুন"দিগকে তাহাদের অপেক্ষা নিম্নশ্রেণীতে পরিগণিত করিল।

"সিন্"রা বলে যে মহম্মদের খুল্লতাত আবুজিহল হইতে তাহাদের উৎপত্তি। আবার এরূপও কথিত আছে, যে যখন স্কর্দুর রাজারা গিলগিট বিজয় করে ও গিলগিটীদিগকে মহম্মদায় ধর্ম্মে দীক্ষিত করে, তখন "সিন্"রা এই নূতন ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে অতিশয় অনিচ্ছুক ও পশ্চাৎপদ ছিল। এই কারণে মুসলমানেরা ইহাদিগকে আবুজিহলের * বংশধর বলিয়া ঘৃণা করিত।

"সিন্‌রা" স্বায়ত্ত-শাসন ও সাধারণতন্ত্রের বড় পক্ষপাতী ছিল। এ প্রদেশে যে যে স্থানে আসিয়া তাহারা বসবাস করিয়াছিল, সেই স্থানেই তাহারা এই প্রকার রাজ্যশাসনপ্রথা অবলম্বন করিয়াছিল। তাহাদের কোন রাজা ছিল না বা তাহারা কোন রাজার আশ্রয় গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ছিল না।

অন্য শ্রেণীর লোক অপেক্ষা "সিন্‌রা" গিলগিটে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। উচ্চ শ্রেণীর নাম করিতে হইলেই "সিন্" বলিতে হইত, কারণ সে সময়ে সিনেরাই সর্ব্বোচ্চ শ্রেণী ছিল। "সিন্" শব্দের অর্থ "স্বাধীন জাতি"। আবার ইহাদের নাম হইতেই দেশের এবং ভাষার নাম হইয়াছিল। যেমন হিন্দু হইতে দেশের নাম হিন্দুস্থান এবং ভাষার নাম হিন্দী, সেই প্রকার "সিন্" হইতে তাহাদের দেশের ও ভাষার নাম যথাক্রমে "সিনাকি" ও "সিনা" হইয়াছিল।

এই "সিন্" শ্রেণীভুক্ত যে সকল মুসলমান এখানে বাস করে, তাহারা গো-মাংসকে অতি ঘৃণার চক্ষে দেখে। কুক্কুট মাংসকেও তদ্রূপ মনে করে, এমন কি মুরগি ঘরে পালন করা পর্য্যন্ত ধর্ম্মবিরুদ্ধ মনে করে। ইহা মুসলমান ধর্ম্মে এক অতীব বিচিত্র ব্যাপার। ইহা হইতে মনে হয় যে ইহারা অবশ্যই আর্য্যবংশোদ্ভব। কিন্তু ইহাদের আর একটী অধিক-তর বিচিত্র অভ্যাস আছে, যাহার সহিত পৃথিবীর কোন ধর্ম্মের সম্বন্ধ আছে বলিয়া বোধ হয় না। ইহারা গাভী-দুগ্ধ বা গব্যঘৃত ব্যবহার করে না। গাভী গর্ভিণী হইলেই তাহাকে প্রতিবেশী কোন ডোমের হস্তে অর্পণ করে। ডোম মহাশয় গাভীকে লালন পালন করেন ও দুগ্ধবতী হইলে তাঁহারই অদৃষ্টে "দুধিভাতি" হয়। গাভীর দুগ্ধ যখন শুকাইয়া যায়, তখন গাভী-স্বামী "সিন্" নামক নন্দঘোষকে প্রত্যর্পণ করে। ইহাদের গাভী পালনের মুখ্য উদ্দেশ্য পশুর সংখ্যা বৃদ্ধি ও জমির জন্য সারসঞ্চয়। বৎস বড় হইলে, তাহাকে ইহারা প্রায় বিক্রয় করিয়া ফেলে। আবার এই সকল গাভী হইতে যে সার উৎপন্ন হয়, তাহা আপনাপন কৃষিজমির উৎপাদিকা-শক্তি বাড়াইবার জন্য ব্যবহার করে। ছাগদুগ্ধ ও ঘৃতই সিনের ব্যবহার্য্য। আহারাদির বিষয়ে সিনকে পুরা ভট্‌চায্ বলা যাইতে পারে। তাহারা মৎস্য পর্য্যন্ত আহার করে না। পশম (Wool) পরিষ্কার করা বা তাঁত বোনাও তাহারা আপনাদের পদমর্য্যাদার হানিকর বলিয়া বিবেচনা করিত।

* মহম্মদের খুল্লতাত আবুজিহল কখনও ভ্রাতুষ্পুত্রের ধর্ম্ম গ্রহণ করেন নাই।



রাজা রবিবর্ম্মা]　　মোহিনী।　　[কর্ত্তৃক অঙ্কিত

ইহাদের আচার ব্যবহার দেখিলে অনেকটা হিন্দু বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু শুনা যায় যে পুরাকালের আরব-দেশীয়েরাও এই প্রকার গো ও কুক্কুট মাংসকে ঘৃণা করিত। গাভী-দুগ্ধ পান করা বা দুগ্ধবতী গাভী পালন করা পুরা-কালে আর্য্যধর্ম্ম-বিগর্হিত ছিল কি না, তত সংবাদ আমি রাখিনা। তবে সাদাসিধা ভাবে দেখিলে সিন্‌দিগকে আর্য্য-বংশোদ্ভূত বলিয়াই বোধ হয়।

যাহা হউক "সিন্"দিগের আদি উৎপত্তির বিষয় ঠিক মীমাংসা করা যায় না। যদি তাহাদের কথা বিশ্বাস করিতে হয়, তবে তাহারা আরববংশীয়; কিন্তু আবার তাহা-দেরই কথাতে ইহাও সন্দেহ হয় যে, তাহারা য়িহুদি হই-লেও হইতে পারে। অবশেষে তাহাদের আচার ব্যবহার দেখিলে হিন্দু বলিয়া ভ্রম হয়। যদি "সিন্" শব্দটাই লওয়া যায়, তবে সহসা ইহাই মনে হয় যে ইহা হিন্দু উপাধি "সিং বা সিংহ" শব্দের অপভ্রংশ মাত্র।

ইয়েশকুনেরা আসিয়া যেমন ক্রামিনদিগকে নীচজাতীয় করিয়াছিল এবং সিন্‌রা আসিয়া যেমন ইয়েশকুনদিগকে নীচ জাতীয় করিয়াছিল, রোনোদের আসিবার পর তাহা রাই আপন শ্রেণীকে সর্ব্বোচ্চ করিয়া যথাক্রমে সিন্, ইয়েশ-কুন ও ক্রামিনদিগকে নিম্নশ্রেণীতে পরিণত করিয়াছিল। "সিন" শব্দের ন্যায় "রোনো" শব্দটাকে কি হিন্দু উপাধি "রাণা" শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া বোধ হয় না? রোনোরা দেখিতে সুপুরুষ।

ক্রামিনেরা নীচ জাতীয়। তাহারা আটা পেষা প্রভৃতি কার্য্য করিয়া থাকে। অনেকে বলেন পারস্য শব্দ "কমিন" (অর্থাৎ নীচ) হইতে ইহাদের নাম ক্রামিন হইয়াছে। কিন্তু যে প্রকারে পারস্য "কমিন" শব্দটাকে টেনেটুনে ক্রামিনের গা ঘেঁসান যায়, তাহা অপেক্ষা সংস্কৃত "কর্ম্ম"—অথবা হিন্দুস্থানিরা যেমন বলে "করম্"—শব্দটাকে বোধ হয় কম টানিতে হয়।

ডুম বা ডোমেরা অতি নীচজাতীয়। তাহারা বাজন-দারের কাজ করিয়া থাকে। আমাদের দেশে যেমন ডোমেরা নীচজাতীয়, এখানেও তদ্রূপ।

"গুজর" দিগের গাভী, মেষ, ছাগ প্রভৃতিই সম্পত্তি। ইহারা পাহাড়ের উপর ও নালার মধ্যে বাস করিয়া থাকে, এবং পাহাড়ে পাহাড়ে নালায় নালায় গো মেষাদি চরাইয়া বেড়ায়। দুগ্ধ মাখন ও আপনাদের জন্য বিক্রয় করিয়া আপনাদিগের ও পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করে। আজ কাল অনেক গুজরকে সংসারীর ন্যায় বসবাস করিয়া চাষ-বাসাদি-কার্য্যেও লিপ্ত দেখিতে পাওয়া যায়। গুজর শব্দ সংস্কৃত "গোচারক" বা তদ্রূপ কোন শব্দের অপভ্রংশ। ইহাদের সমাজ স্বতন্ত্র।

কাশ্মীরের কাশ্মীরী ও গিলগিটের কাশ্মীরীতে বিশেষ কোন প্রভেদ নাই। তবে বহুদিন হইতে এখানে থাকায় এবং গিলগিটীদের সহিত বৈবাহিক আদান প্রদান প্রচলিত থাকায়, তাহাদের আচার ব্যবহার ও বেশ ভূষা অনেকটা গিলগিটীদের মত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং তাহাদিগকে সহজে কাশ্মীরী বলিয়া চেনা যায় না। যে সময়ে কাশ্মীরে অত্যন্ত অশান্তি ছিল, সেই সময়ে ইহারা পলায়ন করিয়া গিলগিটে আসিয়া বাস করে। আবার কেহ কেহ ব্যবসায় উপলক্ষে এখানে আসিয়া হৃদয় হারাইয়া বসিয়াছিল; আর দেশে যাইতে ইচ্ছা হইল না, সুতরাং এখানেই ঘরকন্না করিতে লাগিল।

গিলগিটীদের সাংসারিক বিষয় সকল উত্তমরূপে পর্য্যা-লোচনা করিয়া দেখিলে ইহাই প্রতীয়মান হইবে যে, ইহারা আর্য্যবংশোদ্ভূত এবং কয়েক শতাব্দী পূর্ব্বে সনাতন ধর্ম্মের অনুচর ছিল। ইহাদের আচার ব্যবহার, রীতি নীতি, ভাষা প্রভৃতি সকলের ভিতরই হিন্দুয়ানির আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। প্রত্যেক বিষয় লইয়া বিচার করিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায়—তত সময়ও নাই। তবে গিল-গিটীদের ভাষা হইতে একটী জাজ্বল্যমান প্রমাণ দেওয়া যাইতে পারে যে, তাহারা হিন্দু ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বী ছিল না। তাহারা দিনের বা বারের যে নামকরণ করে, সে নাম হিন্দুদিগের ভিন্ন অন্য কাহারও নহে। নিম্নলিখিত নামগুলি দেখিলে আমার বক্তব্য বিষয় উত্তমরূপে বুঝিতে পারা যাইবে।

হিন্দু নাম	গিলগিটী নাম
রবি	আদিৎ (আদিত্য)
সোম	চান্দর (চন্দ্র)
মঙ্গল	আঙ্গারো (?)

বুধ	বুধো (বুধ)
বৃহস্পতি	বেরস্পৎ (বৃহস্পতি)
শুক্র	শুক্র (শুক্র)
শনি	সাম্‌সের (?)

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে গিলগিটীরা এখন পাকা মুসলমান। তাহারা অনেকেই ইহা আদৌ মানিতে চাহে না যে, তাহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা হিন্দুবংশোদ্ভূত ছিল। যদি জিজ্ঞাসা করা যায় যে, তবে তাহাদের ভাষার ভিতর হিন্দুদিগের ভাষা কি প্রকারে প্রবেশ করিল, তাহার উত্তরে তাহারা বলিবে যে, কাশ্মীরের মহারাজা গিলগিট দখল করিলে পর এখানে অনেক হিন্দু সিপাহি বাস করিত, সেই সকল হিন্দুদিগের সংস্রবে আসিয়া তাহাদের ভাষার পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে।

মুসলমানদিগের ভিতর জাতিবিচার দেখা যায় না। ধর্ম্মপন্থা সম্বন্ধে একের মতের সহিত অন্যের মতের মিল না হইতে পারে;—যথা, ধর্ম্ম বিষয়ে সিয়ার যে মত, সুন্নির সে মত নহে; সেইরূপ মৌলাই (বা মোগলাই) প্রভৃতি অন্যান্য শ্রেণীর ভিতর পরস্পরের মতের অনৈক্য দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু জাতিবিচার তাহাদের মধ্যে নাই। জাতিবিচারটী হিন্দুদিগের একচেটে বস্তু। সুতরাং যখন গিলগিটীদের মধ্যে গোঁড়ামিপূর্ণ জাতিবিচার দেখিতে পাওয়া যায়, তখন ইহা মনে হয়, ইহাদের ভিতর হিন্দু হিন্দু একটু গন্ধ আছে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, রোনোরা সমাজে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করে। রাজারা ইহাদের ও সিন্-শ্রেণী হইতে উজির বা মন্ত্রী প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারী নির্ব্বাচিত করিতেন। ইয়েশকুনেরা সামরিক কার্য্যের জন্য নিযুক্ত হইত এবং ক্রামিনেরা দাসত্ব-কর্ম্মের জন্যই জন্মগ্রহণ করিত। ডোমদের বাজন্দারের কার্য্য ছিল। হিন্দুদিগের কর্ম্মভেদের সহিত এই কর্ম্মভেদের অনেক সামঞ্জস্য দেখিতে পাওয়া যায়। রোনো ও সিনরা তাহাদের নিম্নতর শ্রেণীর লোকদিগের নিকট অত্যন্ত মাননীয়। যদি কোন রোনো বা সিন্ কোন একটী মজলিসে আসিয়া উপস্থিত হয়, সেখানে যে সমস্ত ইয়েশকুন, ক্রামিন ও ডোম থাকিবে, সকলেই দাঁড়াইয়া আগন্তুককে সাদরে অভ্যর্থনা করিবে ও বসিবার জন্য তাহাকে ভাল স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিবে। আবার যদি উপরোক্ত উচ্চ শ্রেণীর কোন লোক কোন গ্রামে গমন করেন, তবে গ্রামবাসীরা তাঁহাকে যথেষ্ট অভ্যর্থনা করে। ইয়েশকুন প্রভৃতি সিনেতর জাতিরা তদ্রূপ মান্য পায় না। রোনো ও সিন্‌রা তাহাদের পূর্ব্ব পদমর্য্যাদার গৌরবে এখনও ইয়েশকুন প্রভৃতি নিম্নতম জাতির চাকুরি স্বীকার করিতে ইচ্ছা করে না।

বিবাহপদ্ধতিতে গিলগিটীদের জাতিভেদ বেশ বুঝিতে পারা যায়। রোনোরা আপনাদের কন্যার বিবাহ "সিন" কিম্বা "ইয়েশকুন"বংশীয় পুত্রের সহিত দেয় না, কিন্তু তাহারা উহাদের কন্যা গ্রহণ করিতে পারে। এইরূপে "সিন্"রা "ইয়েশকুন"কে কন্যাদান করে না, কিন্তু "ইয়েশকুনের" কন্যা লইতে পারে। উপরিস্থ তিন শ্রেণীর জাতিদিগের নিম্নতম "ক্রামিন" ও "ডোম" জাতিদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত করা সামাজিক প্রথানুসারে নিষিদ্ধ। ইহাদ্বারা তাহারা আপনাদিগের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখে। গিলগিটীদের বংশাবলী পর্য্যালোচনা করিলে একটী অতি বিচিত্র ব্যবস্থা দেখিতে পাওয়া যায়, যাহা বোধ হয় পৃথিবীর অন্য কোন অংশে দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহাদের সন্তানসন্ততি মাতৃশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হয়। অর্থাৎ যদি কোন "সিনের" "ইয়েশকুন" স্ত্রীর গর্ভে সন্তান জন্মে, সেই সন্তান "সিন্" না হইয়া "ইয়েশকুন" হইবে। এই প্রকার যদি কোন "সিনের" দুই স্ত্রী থাকে, একটী "সিন্" ও অপরটী "ইয়েশকুন" এবং উভয়ের গর্ভে সন্তান জন্মে, তবে "সিন্" স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান "সিন্" ও "ইয়েশকুন" স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান "ইয়েশকুন" হইবে।

রোনো ও ইয়েশকুনেরা সাধারণতঃ সুপুরুষ হইয়া থাকে। তাহাদের অঙ্গসৌষ্ঠব অন্যান্য শ্রেণী অপেক্ষা অধিক।

শ্রীসতীশচন্দ্র হালদার।

পঞ্জাবে বাঙ্গালী।

(১)

দেবভারেও গোলোকনাথের পরবর্ত্তী আর একজন বাঙ্গালী পঞ্চনদ প্রদেশকে স্বীয় কর্ম্মক্ষেত্র করিয়া জনসাধারণের প্রভূত উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার নাম বাবু

শ্যামাচরণ বসু। ইনি খুলনা জেলার অন্তর্গত টেংরা ভবানীপুর গ্রামে ১৮২৭ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন এবং জন্মস্থানে বাঙ্গালা শিক্ষা করিয়া কলিকাতায় ইংরাজী শিক্ষা করিতে আইসেন। এখানে ডফ সাহেবের স্কুলে ভর্ত্তি হন এবং অল্প সময়ের মধ্যে ইংরাজী ভাষায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করেন। শ্যামাচরণ বাবু ইংরাজী ও বাঙ্গালা ব্যতীত সংস্কৃত ফারসী এবং আরবী ভাষাতেও যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৪৯ অব্দে পঞ্চনদ প্রদেশ ইংরেজের করতলগত হইলে মার্কিন পাদরি ফোরমান সাহেব কর্ত্তৃক আমেরিকান মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। ডাক্তার ডফ সাহেব যে প্রণালীতে বঙ্গে শিক্ষা বিস্তার করিতেছিলেন, ফোরমান সাহেব সেই আদর্শে লাহোর মিশনের কার্য্য করিতে কৃতসঙ্কল্প হন। কিন্তু তিনি দেশভাষা জানিতেন না, সুতরাং একজন উপযুক্ত সাহায্যকারীর অভাব তখন বেশ বোধ করিতে লাগিলেন। অধিকন্তু ফোরমান সাহেবের প্রধান উদ্দেশ্য খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার। বিদ্যাদান তাহার আনুষঙ্গিক ব্যাপার মাত্র। সুতরাং পঞ্জাবীগণ স্বীয় সন্তানদিগের শিক্ষার ভার তাঁহার হস্তে অর্পণ করিতে পশ্চাৎপদ হইলেন। ইহাও তাঁহার বিদ্যালয়প্রতিষ্ঠার প্রধান অন্তরায় হইল। ফোরমান সাহেব অনন্যোপায় হইয়া ডফ সাহেবের নিকট পরামর্শ প্রার্থনা এবং একজন উপযুক্ত সাহায্যকারী পাঠাইতে অনুরোধ করিয়া পত্র লিখিলেন। ডফ সাহেব তাঁহার প্রিয় শিষ্য শ্যামাচরণ বাবু ব্যতীত ঐ কার্য্যের সম্পূর্ণ উপযুক্ত পাত্র আর দেখিতে পাইলেন না। শ্যামাচরণ বাবু যদিও খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন না, তথাপি গুরুর অনুরোধে ২২ বৎসর বয়সে ১৫০৲ টাকা বেতনে লাহোর যাত্রা করিলেন। ইংরাজী পারস্য ও আরবী ভাষাভিজ্ঞ শ্যামাচরণ বাবু মুসলমান-ভাষা-প্লাবিত পঞ্জাবে সাধারণ শিক্ষা বিস্তারকল্পে মিশনরি ফোরমান সাহেবের অদ্বিতীয় সহায় হইয়া উঠিলেন। ইহাঁর আগমনের পর পাদরী সাহেব সঙ্কল্পিত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিতে সাহসী হইলেন। কলিকাতায় যখন মেডিকেল কলেজ স্থাপিত হয়, তখন মহাত্মা ডেভিড হেয়ারকে কত কষ্ট, কত আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল, অনেকের অবিদিত নাই। বলা বাহুল্য এই মিশন স্কুল প্রতিষ্ঠা, তাহার ছাত্রসংগ্রহ, শিক্ষাদান প্রভৃতি কার্য্যে প্রবাসী বাঙ্গালী শ্যামাচরণ বাবুকে তদপেক্ষা অল্প ক্লেশ পাইতে হয় নাই। ইনি কিম্বা ইহাঁরই ন্যায় সচ্চরিত্র, সবলকায়, অধ্যবসায়ী এবং দৃঢ়ব্রত ব্যক্তি ভিন্ন এইরূপ গুরুকার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হইত কি না সন্দেহ। যাহা হউক, ইনি এই বিদ্যালয়ে অধিক দিন তিষ্ঠিতে পারেন নাই। খৃষ্টধর্ম্মে ইহাঁর আস্থা ছিল না। যে দুইবৎসর ইনি এখানে হেডমাষ্টারের কার্য্য করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে একটী ছাত্রও খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করে নাই! শ্যামাচরণ বাবু এখানে পদত্যাগ করিয়া গভর্ণমেণ্টের রাজস্ব বিভাগে কর্ম্ম গ্রহণ করেন।

১৮৫৫ অব্দে সর চার্লস উডের শিক্ষাসম্বন্ধীয় পত্র (Educational Despatch) অনুসারে যখন প্রাদেশিক শিক্ষাবিভাগ স্থাপিত হয়, তখন সাহিত্যজগতের জ্যোতিষ্ক স্বনামধন্য এডুইন আর্নল্ড ও ম্যাথিউ আর্নল্ডের সহোদর ডব্লিউ. ডি. আর্নল্ড, পঞ্জাবে শিক্ষাকর্ম্মাধ্যক্ষ নিয়োজিত হন। কিন্তু উপযুক্ত পরামর্শদাতা ও সাহায্যকারী ব্যতীত নবাগত সাহেব মহোদয় অন্ধকার দেখিলেন। আবার শ্যামাচরণ বাবুকে আবশ্যক হইল। রাজস্ব বিভাগে থাকিলে অল্প দিনের মধ্যে তিনি ডেপুটি কলেক্টর * হইতে পারিতেন। কিন্তু তিনি সাধু উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া উক্ত বিভাগ ত্যাগ করিয়া আর্নল্ড সাহেবের সহযোগিতা করিবার জন্য শিক্ষা বিভাগে প্রবেশ করিলেন। ডিরেক্টর সাহেব তাঁহাকে স্বীয়দপ্তরের বড়বাবু করিলেন এবং শীঘ্রই ইন্‌স্পেক্টর অব-স্কুল্‌স্ এর পদে তাঁহাকে উন্নীত করিয়া দিবেন বলিয়া আশ্বাসও দিলেন। আর্নল্‌ড্ সাহেবের অকালমৃত্যু না হইলে হয়ত তিনি উক্ত পদ হইতে বঞ্চিত হইতেন না। এসম্বন্ধে আর্নল্‌ড্ সাহেব শ্যামাচরণ বাবুকে ১৮৫৮ সালের ১১ই এপ্রেল তারিখে ধর্ম্মশালা হইতে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, তাহার একস্থানে আছে—

* ১৮৬২ সালের ২৭শে নভেম্বর তারিখে ডিরেক্টর কাপ্তেন ফুলার পঞ্জাব গভর্ণমেণ্টের সেক্রেটরীকে লিখিয়াছিলেন—— "**** and by quitting the ordinary Civil Department, *he lost the chance* *** of attaining to the grade of Extra Assistant Commissioner. *** He was highly praised by the late Mr Arnold, my predecessor, for industry and an able, conscientious discharge of arduous and difficult duties and for his conduct during the mutiny. This was concurred in by the Financial Commissioner and the Chief Commissioner. ***"

"* * * * But at present the European element in the Department is too small, and the new Inspector should be an Enlishman; were a native Inspector to be appointed, there is no one whom I consider better qualified for the office than yourself * * * *"

১৮৬৪ সালে লাহোর গভর্ণমেণ্ট কলেজ স্থাপিত হয়। ডাক্তার লাইটনার তাহার প্রিন্সিপ্যাল হন। কলিকাতায় যেমন এসিয়াটিক সোসাইটি, পঞ্জাবে সেইরূপ আঞ্জুমান-ই-পঞ্জাব নামে একটী সভা আছে। এই সভা ডাক্তার লাইটনার, বাবু শ্যামাচরণ বসু এবং বাবু নবীনচন্দ্র রায় প্রমুখ জনহিতৈষিগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্যামাচরণ বাবুর অধ্যবসায়ে লাহোরে "শিক্ষা-সভা" নামে স্ত্রীশিক্ষা ও সাধারণ শিক্ষাপ্রচারিণী আর একটী সভা স্থাপিত হয়। শ্যামাচরণ বাবু এই সভার সম্পাদক মনোনীত হন। পঞ্জাবের ছোটলাট ইহার সভাপতি ছিলেন। এলাহাবাদ ইনষ্টিটিউট সাহিত্যসভায় বাবু সারদাপ্রসাদ সান্ন্যাল যেরূপ উত্তর-পশ্চিম ও অযোধ্যা প্রদেশের উচ্চশিক্ষোপযোগী কলেজ সংস্থাপনের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, বাবু শ্যামাচরণ বসু তদ্রূপ 'শিক্ষা-সভার' এক অধিবেশনে পঞ্জাবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সাধু প্রস্তাব করিলেন। বলা বাহুল্য প্রস্তাবটি তৎক্ষণাৎ গৃহীত হইল, কিন্তু শ্যামাচরণ বাবুর মৃত্যুর পর লাইটনার মহোদয় কর্ত্তৃক কার্য্যে পরিণত হইল। এই প্রস্তাব সম্বন্ধে পঞ্জাবের বিখ্যাত ট্রিবিউন * পত্রে এই মর্ম্মে লিখিত হয়—

"The Panjab University was the creation of almost an accident. A meeting was one time day held in the Siksha Sabha Hall somewhere about the beginning of 1865 and there was some conversation about Oriental Education. Babu Shama Churn Bose * * in course of the conversation suggested the formation of an institution which should foster the cultivation of Western as well as Eastern learning. The keen foresight of Dr Leitner looked through the suggestion and he eagerly caught hold of it as capable of indefinite expansion. A scheme was shortly after drawn up, matured and the proposal of a University was set afloat.';

"Official Monitor" নামে শ্যামাচরণ বাবু একখানি পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন। পঞ্জাবীগণ ঐ পুস্তিকার সাহায্যে কেরাণীগিরি শিক্ষা করিত। শ্যামাচরণ বাবু যে সকল স্মারকলিপি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহাতে বোধ হয় তিনি ভারতবর্ষের অবস্থা ও অভাব সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ লিখিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। কিন্তু অল্পবয়সে মৃত্যু হওয়ায় তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই। ১৮৬৭ অব্দে ৪০ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়। অমায়িক ব্যবহার এবং সর্ব্বসাধারণের হিতকর কার্য্যের জন্য ইনি পঞ্জাববাসিগণের নিকট যথেষ্ট আদর ও সম্মান লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই অকাল-মৃত্যুতে সকলেই শোকসন্তপ্ত হইয়াছিলেন। এই উপলক্ষে ডাক্তার লাইট্নার ও সার লেপেল গ্রিফিন কর্ত্তৃক প্রকাশিত পঞ্জাবের তৎকালীন খ্যাতনামা পত্রিকা ইণ্ডিয়ান পব্লিক্ ওপীনিয়নে * শোকপ্রকাশক যে প্রবন্ধ বাহির হয়, তাহাতে লিখিত আছে—

We deeply regret to hear of the death of Babu Shama Churn Bose, one of the most enlightened and respectable members of the excellent Bengali colony which we have in our midst at Lahore. The deceased gentleman took considerable interest in all matters affecting the welfare of his adoptive country and together with other Bengalis threw himself actively into all movements which sometime ago reflected credit on this Province. He was a Vedantist by persuation, a most amiable man and an accomplished English scholar. As head clerk of the Educational Department much of the credit assigned to its chief deservedly belongs to the well-known native gentleman whose loss, we are sure, is sincerely felt in the community to which he belonged."

গোলোকনাথের খ্যাতিপ্রতিপত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত হইবার পর পঞ্জাবে ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ রোপিত হয়। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে বাবু সারদাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারক হইয়া দিল্লী, অম্বালা, অমৃতসর প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করেন এবং পরে ফিরোজপুরে আসিয়া গভর্ণমেণ্টের চাকরী গ্রহণ করিয়া ১৮৬২ সালে লাহোরে বদলী হন। এই বৎসরে তাঁহার বাটীতে লাহোর ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। সারদা বাবু তাহার আচার্য্য হন। পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার প্রতি পঞ্চনদবাসীর যে ঘোর বিদ্বেষ ও আন্তরিক ঘৃণা ছিল, সেভারেও গোলোকনাথ হইতে তাহার উচ্ছেদ আরম্ভ হইয়াছিল। এক্ষণে ব্রাহ্ম-

* The Tribune, Dated Lahore, 5th December, 1885.

* Indian Public Opinion, Dated 16th August, 1867.



স্বর্গীয় নবীনচন্দ্র রায়।

সমাজের সংস্থাপনার পর হইতে তাহা বহু পরিমাণে অন্তর্হিত হইল। রায় মূলসিংহ, দিবান রতনচাঁদ ধারিওয়াল এবং পণ্ডিত রাধাকিষণ প্রমুখ হিন্দুসমাজের নেতৃবর্গ রেভারেণ্ড গোলোকনাথকে মহাপুরুষ বলিয়া ভক্তি করিতেন, কিন্তু তাঁহার ন্যায় অদ্বিতীয় ক্ষমতাশালী ব্যক্তি কর্ত্তৃক খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারে ভীত হইয়াছিলেন। এক্ষণে বেদপ্রতিপাদ্য ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হওয়ায় তাঁহারা আশ্বস্ত হইলেন। স্থানীয় অনেক বাঙ্গালী ও পঞ্জাবী ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। সারদা বাবুর সম্পাদকতায় এবং পণ্ডিত ভানুদত্ত বসন্তরাম প্রমুখ বন্ধিষ্ণু পঞ্জাবীগণের সহায়তায় বাঙ্গালী বালকদিগের জন্য বাঙ্গালা ও ইংরাজী নাইট স্কুল এবং পঞ্জাবীদিগের জন্য সৎসভা প্রতিষ্ঠিত হইল।

সারদাবাবু গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মোপলক্ষে পঞ্জাবের নানা স্থান ভ্রমণ করিয়াছেন এবং অনেক হিতকর অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছেন। সকলের বিবরণ প্রদান করিবার স্থান নাই। তবে তিনি এতদঞ্চলে কি কি প্রধান প্রধান কার্য্য সম্পাদিত করিয়াছেন, নিম্নে তাহার আভাসমাত্র প্রদত্ত হইল। সারদা বাবু কাংড়ার ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট সৈয়দ ওয়াজীর আলী খান ও সর্দ্দার আমীনচাঁদ বাহাদুরের সহায়তায় কাংড়ার অঞ্জুমান সভা স্থাপন করিয়াছেন। জালন্ধরে রেভারেণ্ড গোলোকনাথের সহায়তায় একটা সাধারণ পাঠাগার ও বক্তৃতা-সভা স্থাপন করিয়াছেন। সীমলাশৈলে রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর ও কাশ্মীরের মহারাজার অর্থসাহায্যে সনাতনধর্ম্ম-রক্ষিণী সভা স্থাপন করিয়াছেন। পাটিয়ালার মহারাজা, নাটোরের রাজা প্রভৃতি প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ এই সভার সভ্য হন। সারদা বাবু হাজারা জেলার এবটাবাদ পার্ব্বত্য প্রদেশে "হাজারা আঞ্জুমান" সভা স্থাপন করেন। কমিশনর-বাহাদুর, ফ্রণ্টিয়ার কমাণ্ডার প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজপুরুষগণ ইহার পৃষ্ঠপোষক হন। গক্করাজ রাজা জাহাঁদাদ খাঁ বাহাদুর, পেশওয়ার মুসলমান সম্প্রদায়ের নেতা আরবাব সের বাহাদুর খাঁ এবং হাজারার প্রসিদ্ধ ধনী রায় হুকুমচাঁদ সহকারী সভাপতি ও ট্রাষ্টি হন। ভারতবর্ষের এই পশ্চিম সীমান্তে একজন বাঙ্গালীর কর্ম্মক্ষেত্রে যাঁহারা সহায়তা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বাবু চন্দ্রকুমার রায় চৌধুরী ও বাবু কালীদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম। এই "হাজারা আঞ্জুমান" হিন্দু মুসলমান এবং ইংরাজদিগের মধ্যে সখ্যস্থাপনের প্রধান যন্ত্রস্বরূপ হইয়াছিল। সারদা বাবু হিন্দুধর্ম্ম প্রচার করিতে আসিয়া "হাজারা আঞ্জুমান" স্থাপন কেন করিলেন, তাহা বলিতেছি। পঞ্জাবের এই সীমান্ত প্রদেশে মুসলমান সম্প্রদায় অতি প্রবল। এখানে অনেক কাবুলীর বাস। কাবুলের রাজ্যচ্যুত আমীর, বোখারার প্রিন্স, * অম্বের নবাব, গক্কর রাজ, হাজারার রইস কাজী মীরমালম, খানপুরের রাজা ফিরোজ খাঁ এবং সেখ আলী গৌহর প্রভৃতি মুসলমান নেতাগণ এখানে বাস করিতেছিলেন। তাঁহাদের সহিত হিন্দুখৃষ্টানের সদ্ভাব স্থাপিত না হইলে হিন্দুধর্ম্মের † প্রচার হইবে না এবং বাঙ্গালী অথবা অন্যান্য হিন্দুর বাস নিরাপদ ও সুখের হইবে না, এই ভাবিয়া সারদা বাবু তথায় "আঞ্জুমান" প্রতিষ্ঠিত করিয়া এই সকল প্রধান ব্যক্তিগণের সহানুভূতি আকর্ষণ করেন। এই সভা সীমান্ত প্রদেশের গোঁয়ার আফগান এবং অশিক্ষিত উদ্দাম জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা উন্নতি ও সদ্ভাবের বীজ রোপণ করিয়াছে। ইনি যখন ১৮৮৬ সালে এবটাবাদ হইতে লাহোর যাত্রা করেন, তখন স্থানীয় হিন্দুমুসলমান ও দেশীয় খৃষ্টান ভদ্রলোকগণ সভা করিয়া তাঁহাকে বিদায় দান করেন এবং সকলে একবাক্যে স্বীকার করেন —

"* * * this station advanced from many others in the Panjab and all this is the result of Babu Saheb's untiring energy * * * we may call him the founder of the Anjuman, our first instructor, kind adviser and, in short, life and soul of all this progress."

এই সভায় সারদা বাবুর একখানি চিত্র রক্ষিত হইতেছে। ইঁহার সম্বন্ধে একটি কথা এখনও বলা হয় নাই। ইনি সিদ্ধাবতীতে কোন সাধুর সংস্রবে আসিয়া ব্রাহ্ম সমাজ ত্যাগ করত "সনাতন ধর্ম্ম" বা প্রাচীন হিন্দু ধর্ম্মের প্রচারে দেহমন নিয়োগ করেন। "সিমলা সনাতন ধর্ম্মসভা" তাহারই ফল। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে পঞ্জাবে প্রথম আর্য্যসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। সারদা বাবু তাহার সহকারী সভাপতি

* ইহারা সহিত সারদা বাবুর যে ফোটো গৃহীত হইয়াছিল, তাহা ১৩০৮ সালের আশ্বিনের সাহিত্যে মুদ্রিত হইয়াছে।

† এখানে ব্রাহ্মসমাজ ইতিপূর্ব্বেই প্রতিষ্ঠিত হইলেও জ্ঞান সমাজ ও আর্য্যসমাজ ইহারই ফল।

হন। বলা বাহুল্য ব্রাহ্মসমাজের আদর্শেই আর্য্যসমাজের কার্য্য আরম্ভ হয়। মহাত্মা দয়ানন্দ সরস্বতীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎই এই পরিবর্ত্তনের মূল। * এক্ষণে ইনি "Indo-Aryan Independent Mission" খুলিয়া ভারতীয় পরিব্রাজকের দল গঠিত করিয়াছেন। তাহার ফলস্বরূপ "অমর নাথ," "হাজারা" প্রভৃতি ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশিত হইতেছে। ব্রাহ্ম আচার্য্য সারদা বাবু যেমন আর্য্যসমাজভুক্ত হইলেন, আর্য্যসমাজী প্রসিদ্ধ পণ্ডিত লছমন দাস তেমনি ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক হইলেন এবং কালীবাড়ীর কর্তৃপক্ষীয়গণের মধ্যে প্রধান বাবু নবীনচন্দ্র রায় ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। গোলোকনাথ যেমন খৃষ্টধর্ম্ম গ্রহণ করিবার পর হইতে পঞ্জাবের শ্রী ফিরাইয়া দিয়াছিলেন, নবীন বাবু ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া পঞ্জাবী সমাজের অধিকতর উন্নতি সাধিত করিলেন। প্রকৃতপক্ষে রেভারেণ্ড গোলোকনাথ এবং নবীন বাবুর মত পঞ্জাবের হিতকারী ব্যক্তি পঞ্জাবে পদার্পণ করিয়াছেন কিনা সন্দেহ। উভয়েই নিঃস্ব অবস্থায় আসিয়া সমাজের শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। উভয়েই তরুণ বয়সে গৃহত্যাগ করিয়াছিলেন। নবীন বাবু স্বীয় ডায়েরীতে লিখিয়াছিলেন—"চাকরীর জন্য আমাকে অনেক স্থানে অনাথের ন্যায় ভ্রমণ করিতে হইয়াছে, আমি জীবনের অধিকাংশ কাল অতি দীন হীনের ন্যায় কাটাইয়াছি, একটি পয়সার অভাবে সমস্ত দিন অনাহারে গিয়াছে, এমন দিনও দেখিয়াছি। ভ্রমণের সময় যেখানে যেখানে মহাত্মা কৃষ্ণানন্দ স্বামীর কালীবাড়ী পাইয়াছিলাম, সেই খানেই পেট ভরিয়া খাইতে পাইয়াছি ও মনের সুখে নিদ্রা গিয়াছি। * * * * আমার ন্যায় কত শত হতভাগা, কৃষ্ণানন্দের কালীবাড়ীর কৃপায় শ্রীমন্ত পুরুষ হইয়া উঠিয়াছে। ইচ্ছা হয় একবার সেই মহাত্মাকে জীবিত দেখিয়া তাঁহার চরণ ধরিয়া পূজা করি।" নবীন বাবু উপরোক্ত অবস্থা হইতে রাজকার্য্যে পঞ্জাবের অনরারি ম্যাজিষ্ট্রেট, জষ্টিস অব দি পীস্, ডেপুটী একাউণ্টাণ্ট জেনারেল, পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, পরীক্ষক এবং ডেপুটী রেজিষ্ট্রার, কালীবাড়ীর পৃষ্ঠপোষক, ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক, ১৮৮২ সালে প্রতিষ্ঠিত লাহোর 'হিন্দুসভার' সম্পাদক ও অন্যতম নেতা, পঞ্জাবের দেশীয় সমাজের সর্ব্বেসর্ব্বা এবং পাণ্ডিত্যে অদ্বিতীয় বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। গোলোকনাথ যথায় শিক্ষা ও সমাজসংস্কারের বীজ রোপিত করিয়াছিলেন, প্রতিমাপূজার বিরোধী ব্রাহ্ম ও আর্য্য সমাজ এবং তাহার পক্ষপাতী সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণীসভার মধ্যে সামঞ্জস্যরক্ষাপ্রয়াসী সারদাবাবু যথায় হিন্দু-মুসলমানখৃষ্টানের মধ্যে সদ্ভাব সংস্থাপনের পথ পরিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন,—নবীন বাবু তথায় যুগান্তর আনয়ন করিলেন। ১৮৯০ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে একজন সুশিক্ষিত পঞ্জাবী একটী সাধারণ সভায় বক্তৃতার কালে বলিয়াছিলেন—"* * * when the country was involved in utter darkness, Raja Ram Mohun Roy brought light to the country.—" এই আলোক পঞ্চনদ প্রদেশকে এতদূর উদ্ভাসিত করিল যে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পর হইতে পঞ্জাবে পুনরায় জীবন্ত ভাব লক্ষিত হইল। ইতিপূর্ব্বে যাহারা কেবল আসুরিক শক্তি দ্বারা জগদ্বিখ্যাত হইয়াছিল, ২য় শিখ যুদ্ধের পর হইতে তাহারা ক্রমে নিম্নগামী হইতেছিল, তাহাদের জাতীয় জীবনে মরিচা ধরিতেছিল। বাঙ্গালীর সংস্রবে তাহাদের সেই জড়তা বিদূরিত হইল। যে পঞ্জাবীগণ শতদ্রুপার হইলে খৃষ্টানগণকে দ্বিখণ্ডিত করিত, তথাকার অনেক যুবক বিলাতে গিয়া উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া আসিতেছে, রাজভাষা ও মাতৃভাষার উন্নতিকল্পে তথাকার শিক্ষিত ব্যক্তিগণ উত্থিত হইয়াছেন। তথায় স্ত্রীশিক্ষা বিস্তার লাভ করিয়াছে। তথায় ব্রাহ্মসমাজের আদর্শে আর্য্যসমাজ, আঞ্জুমান ইসলামিয়া, দেশীয় পাঠশালা, স্কুল ও কলেজ স্থাপিত হইতেছে, এবং চতুর্দ্দিকেই উন্নতির চিহ্নলক্ষিত হইতেছে। এই সমস্তই বাঙ্গালীর পঞ্জাব-প্রবাসের ফল।

ডাক্তার আর সি বসুর কন্যা মিস্ বসু বালিকা বিদ্যালয়ের প্রথম প্রধান শিক্ষয়িত্রী হইয়া স্ত্রীশিক্ষার প্রসার বৃদ্ধি করেন। স্বর্গীয় নবীন বাবুর কন্যা বর্ত্তমান "অন্তঃপুর"-সম্পাদিকা পঞ্জাবে "সুগৃহিণী" নাম্নী হিন্দী মাসিকপত্রিকা সম্পাদন করিতে লাগিলেন। অতঃপর ভূতপূর্ব্ব সবইঞ্জিনিয়র লালা বেণীপ্রসাদের কন্যা ডাক্তার প্রেমদেবী মেডিকেল কলেজের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্ত্রীচিকিৎসা আরম্ভ করিলেন।

* দয়ানন্দ-চরিত—পৃ ৪৭, ৪৮—২য় ভাগ, ১৮৯৮। শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

রায় বাহাদুর কানহাইয়া লাল,এম ডি,সি,ই,মহোদয়ের পুত্র-বধূ এবং এক কন্যা শ্রীমতী হরদেবী বিলাত গমন করিলেন। হরদেবী "ভিক্টোরিয়া জুবিলি","বিলাত যাত্রী" প্রভৃতি পুস্তক রচনা করিলেন এবং "ভারতভগ্নীর" সম্পাদিকা হইলেন। এই সময়ে পঞ্জাবে বিধবা বিবাহ-প্রথাও প্রচলিত হইল। এই ব্রাহ্ম প্রভাব বিস্তারের পর হইতে দিল্লীকলেজ লাহোরে উঠিয়া গেল ; পঞ্জাববিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি * হইল এবং শিক্ষা-সভা সংস্থাপিত হইল। ডাক্তার লাইটনার ও গভর্ণমেণ্ট কলেজের সহকারিতায় ১৮৬৫ সালে "আঞ্জুমান-ই-পঞ্জাব" সাহিত্যসভা স্থাপিত হইল। নবীন বাবু তাহার সম্পাদক হইলেন। নবীন বাবু এই সকল লোকহিতকর অনুষ্ঠানে বিশেষ উদ্যোগী ছিলেন। নবীনবাবু হিন্দীসাহিত্য পুষ্ট করিবারজন্য বিলক্ষণ চেষ্টা করিয়াছেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে, তাঁহার কন্যা "সুগৃহিণী" নাম্নী হিন্দী পত্রিকা সম্পাদন করিয়াছিলেন। নবীন বাবু নিজেও কয়েকখানি হিন্দী পুস্তক প্রণয়ন করেন। তিনি "নবীন চন্দ্রোদয়" নামে একখানি হিন্দী ব্যাকরণ এবং "স্থিতিতত্ত্ব আউর গতিতত্ত্ব" (Elements of statics and dynamics) এবং "জলস্থিতি জলগতি আউর বায়ুকা তত্ত্ব" (Elements of hydrostatics, hydraulics and pneumatics)" নামে দুইখানি বিজ্ঞান-গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। লাহোর ওরিএণ্টাল কলেজের প্রিন্সিপাল হইয়া তিনি বিজ্ঞান, জীবনী ও চিকিৎসাবিষয়ক গ্রন্থ দ্বারা কলেজ লাইব্রেরীর কলেবর পুষ্ট করিয়াছিলেন। নবীন বাবুর কয়েকবৎসর হইল মৃত্যু হইয়াছে, কিন্তু পঞ্জাবে তাঁহার নাম অমর হইয়া আছে। নবীন বাবু ও সারদাবাবু উদ্যোগী হইয়া স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতীকে পঞ্চনদ প্রদেশে আনয়ন করেন। ইঁহারা এবং লাহোর ব্রাহ্মসমাজ স্বামীর প্রধান সহায় হন। বোধ হয় ব্রাহ্মসমাজের সহিত স্বামীজীর কোন কোন বিষয়ে মতভেদ না হইলে এই যে আর্য্যসমাজের শাখা প্রশাখা ভারত ব্যাপিয়াছে, তাহার স্বতন্ত্র অস্তিত্ব থাকিত কিনা সন্দেহ। † সুতরাং বলিতে হইবে, পঞ্চনদ প্রদেশে আর্য্যসমাজের সুত্রপাতও বাঙ্গালীর চেষ্টা প্রসূত।

* পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব যে স্বর্গীয় শ্যামাচরণ বসুই প্রথমে উত্থাপিত করেন, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

† দয়ানন্দ চরিত, ২য় ভাগ, ১৮৯৮।

পঞ্জাবে যে সকল বাঙ্গালী শিক্ষাবিস্তারকল্পে সহায়তা করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে রায় চন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর অন্যতম।



স্বর্গীয় রায় চন্দ্রনাথ মিত্র বাহাদুর।

মিউটিনির প্রায় দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে "পাবলিক ওয়ার্ক্স" বিভাগে কর্ম্ম লইয়া চন্দ্র বাবু লাহোর আসিয়াছিলেন। হুগলী বলাগড়ের নিকটবর্ত্তী চাঁদড়া গ্রাম ইঁহার আদি বাসস্থান। চাঁদড়ার বাটীতে ইঁহার বংশীয়গণ এখনও বাস করিতেছেন। চন্দ্রনাথ বাবু শীঘ্রই শিক্ষাবিভাগে প্রবেশ করিলেন এবং প্রথমে সেণ্ট্রাল মডেল স্কুলের হেড মাষ্টার ও পরে গভর্ণমেণ্ট বুক ডিপোর কিউরেটর হইলেন। কিউরেটর পদে থাকিতে থাকিতেই ইনি পেন্সন প্রাপ্ত হন। কিন্তু নিশ্চিন্ত হইয়া পেন্সন ভোগ করিতে পাইলেন না। ইহার অব্যবহিত পরেই ১৮৮৬ সালে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের আসিষ্টাণ্ট রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত করিলেন। ১৮৯৮ সালে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে রায়বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৮৯৯ খৃঃঅব্দে ৬৮ বৎসর ৬ মাস বয়ক্রমকালে চন্দ্রনাথ বাবু পরলোক গমন করেন। শিকারপুরের নিকট এবং গুজরণ-ওয়ালা প্রভৃতি স্থানে তাঁহার বিস্তৃত জমিদারী আছে। গুরু নানকের মাতুলালয় ও জন্মস্থান "নানকানাসাহেব" এবং আরও তিন চারিখানি গ্রাম তাঁহার জমিদারীভুক্ত।

চন্দ্রনাথবাবুর গুণের পুরস্কার স্বরূপ ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে একখানি গ্রাম দান করিয়াছেন। গত সেন্সস অনুসারে উক্ত গ্রামে ৬০০ লোকের বাস নির্দ্ধারিত হইয়াছে। চন্দ্রনাথ বাবুর স্মৃতি চিরস্থায়ী করিবার জন্য তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ উক্ত গ্রামের "চন্দ্রনগর" নাম দিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত পঞ্জাবে ইঁহার আরও ভূসম্পত্তি আছে।

চন্দ্রনাথ বাবু স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। মুসলমানপ্রধান পঞ্জাবে পরদার কিরূপ আঁটাআঁটি তাহা অনেকেই জানেন। চন্দ্রনাথ বাবু প্রভূত অর্থব্যয় করিয়া পরদাপ্রথা বজায় রাখিয়া স্ত্রীশিক্ষার বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছেন। ভিক্টোরিয়া বালিকাবিদ্যালয় প্রধানতঃ ইঁহারই যত্নপ্রসূত। প্রধান শিক্ষয়িত্রী কুমারী মনোরমা বসু ও আরও দুই তিনটী বাঙ্গালী ভদ্রমহিলা এই বিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করিয়া থাকেন। হিন্দু ও মুসলমান রমণীগণ এই বিদ্যালয়ের বাৎসরিক উৎসবে যোগদান করেন। লাটপত্নী বা লাটকন্যা তথায় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। পুরুষদিগের কোন সংস্রব থাকে না। এখানে উর্দ্দু হিন্দী ও বাঙ্গালা শিক্ষা দেওয়া হয়। অনেক মুসলমান বালিকা বিবাহের পরও অধ্যয়ন করেন। চন্দ্রনাথ বাবু জীবনের শেষ দশ বৎসর কাল ওরিএণ্টাল কলেজ কমিটির সম্পাদক এবং লাহোর কালীবাড়ীর তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন। ইনি ট্রিবিউন পত্রে পুনঃপুনঃ আলোচনা করিয়া ইউনিভার্সিটি কালেজের অনেক সংস্কার সাধন করিয়াছিলেন। ইঁহার পুত্রগণ এক্ষণে লাহোরে স্থায়ী প্রবাসী হইয়াছেন।

চন্দ্রনাথ বাবুর জামাতা শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র মজুমদার এতদঞ্চলে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। অবিনাশ বাবু প্রথমে এলাহাবাদ প্রবাসী ছিলেন। এলাহাবাদ বঙ্গসাহিত্যোৎসাহিনী সভার ইনিই প্রবর্ত্তক। যে সময় সারদা বাবু পঞ্জাবের ইতস্ততঃ ধর্ম্মপ্রচার করিতেছিলেন, অবিনাশ বাবু তখন রাওলপিণ্ডিতে বিশেষ খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। এখান হইতে পরে ইনি লাহোরে বদলি হন। অবিনাশ বাবু স্থানীয় ব্রাহ্ম সমাজের এক প্রকার অস্থি মজ্জা স্বরূপ হইয়া আছেন। চরিত্রবল থাকিলে লোকে মধ্যবিত্ত অবস্থায় থাকিয়াও দেশের কতদূর উপকার করিতে পারেন এবং জনসাধারণের প্রিয় হইতে পারেন, অবিনাশ বাবু তাহা স্বীয় জীবনে দেখাইতেছেন। এতদঞ্চলে সামাজিক, নৈতিক এবং শিক্ষাসম্বন্ধীয় উন্নতি বিধানে অবিনাশ বাবু এখনও অক্লান্ত পরিশ্রম করিতেছেন। ইনি কুবেরের ভাণ্ডার দিয়া অথবা উচ্চপদের ক্ষমতাবলে পঞ্জাববাসিগণকে বশীভূত করেন



শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মজুমদার।

নাই, কিন্তু স্থানীয় হিন্দু মুসলমান ছোট বড় সকলেই তাঁহার অনুগত। শিষ্টাচার, সাধুচরিত্র, এবং নিঃস্বার্থপরোপকারিতা ইঁহাকে জনসাধারণের প্রিয় করিয়াছে। ইনি দুইশতাধিক টাকা বেতনের চাকরী করেন, কিন্তু স্বয়ং সাধারণ অবস্থায় থাকিয়া অধিকাংশ অর্থ দরিদ্রসেবা ও অন্য সদনুষ্ঠানে ব্যয় করেন। প্রাতে ও সন্ধ্যায় দীন দরিদ্রদিগকে ঔষধ বিতরণ, অনাথ বিধবাগণকে অর্থদান, পিতৃমাতৃহীন বালকবালিকাগণের ভরণপোষণের ব্যবস্থা এবং ভিক্ষুক ও অন্নক্লিষ্ট ব্যক্তিগণকে অকাতরে অন্ন বিতরণ প্রভৃতি সৎকার্য্যেই তাঁহার আন্তরিক অনুরাগ ও আনন্দ। মধ্যপ্রদেশ হইতে মাঝে মাঝে অনেক অনাথ নরনারী পঞ্জাবে প্রবেশ করে। ইনি উদ্যোগী হইয়া আপনার অর্থ এবং সাধারণের সাহায্যে অন্নবস্ত্র দিয়া তাহাদের জীবনরক্ষা করেন। শিক্ষিত পঞ্জাবীগণের সমাজে যেরূপ কুৎসিত আচার সকল প্রচলিত ছিল, অবিনাশ

বাবুর অবিরাম চেষ্টায় তাহার অনেক সংশোধন হইয়াছে। পূর্ব্বে লাহোরে কি পঞ্জাবী, কি হিন্দুস্থানী, কি বাঙ্গালী, বিবাহের সময় কালীবাড়ীতে এবং লাহোরের অন্যান্য স্থানে বারাঙ্গনার নৃত্যের আয়োজন করিতেন। বেশ্যার নৃত্যই উৎসবের প্রধান অঙ্গস্বরূপ ছিল। অবিনাশ বাবুর সুযুক্তি-পূর্ণ প্রবন্ধে ও তীব্র প্রতিবাদের প্রভাবে ঐ কুপ্রথা উঠিয়া যাইতেছে। ইনি "পিউরিটি সার্ভ্যাণ্ট" পত্রের সম্পাদক। এই পত্রখানি পঞ্জাবে সুনীতি প্রবর্ত্তনের যন্ত্রস্বরূপ। অবিনাশ বাবু হিমালয় গেজেটের প্রোপ্রাইটর। সমস্ত দিবস সরকারী কর্ম্ম করিয়া বিবিধ লোকহিতকর অনুষ্ঠানে যোগদান করিয়া সংবাদপত্র পরিচালন ও অধ্যয়ন যে কিরূপ মানসিক শক্তি ও প্রতিভার কার্য্য, তাহা সহজেই অনুভব করা যাইতে পারে। ইঁহারাই প্রকৃত কর্ম্মযোগী। [ক্রমশঃ।

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।

কমলা।

[২]

পানবরষ নামক মহারণ্যে মহর্ষি আরুণ্যোদয় বাস করিতেন। নারায়ণ তাঁহারই শিষ্য ছিলেন। কমলার বিবাহ হইয়া গেলে তিনি ধ্যানযোগেই সময় অতিবাহিত করিতেন। নির্ব্বাণমুক্তি লাভ করাই তাঁহার জীবনের এক মাত্র লক্ষ্য ছিল। সেই উদ্দেশ্য সাধনের পক্ষে নির্জ্জনবাসই তিনি উপযোগী মনে করিতেন। কখনও কখনও তিনি নির্জ্জনবাস পরিত্যাগ করিয়া কর্ত্তব্যবুদ্ধির প্রেরণায় উত্তেজিত হইয়া লোকের নিকট শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ ব্যাখ্যা করিতে প্রবৃত্ত হইতেন, লোকে তাঁহার গভীর জ্ঞানের পরিচয় পাইয়া অবাক্ হইয়া যাইত। "তোমাদিগের প্রাচীন যোগিঋষিগণ যে ধর্ম্ম আচরণ করিয়া গিয়াছেন, সেই সনাতন ধর্ম্ম কখনও পরিত্যাগ করিও না। যে নামেই ঈশ্বরকে ডাক না কেন, তাহাতেই ফল পাইবে। তোমরা তাঁহার ভিন্ন ভিন্ন গুণের প্রকাশক ভিন্ন ভিন্ন মূর্ত্তির কল্পনা করিয়া মন্দিরাদিতে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার পূজা কর, তাহা কিছু মন্দ নহে। কিন্তু তিনি পাহাড়েও নাই, বৃক্ষেও নাই, অথচ তিনি সর্ব্বত্রই আছেন। তোমরা তাঁহার বাণী শুনিতে পাও, কিন্তু তাঁহাকে দেখিতে পাও না; অথচ তোমরা যাহা কিছু দেখিতে পাও, সে সকলেরই অভ্যন্তরে তিনি আছেন। তিনি পাপাত্মাদিগের প্রচণ্ড দণ্ডস্বরূপ, শুধু পুণ্যাত্মারাই সাযুজ্য মুক্তি লাভের অধিকারী। বিষয়-সুখ মাত্রই অনন্ত; তাহার জন্য লালায়িত হইও না। দয়াধর্ম্ম ও পুণ্যকর্ম্মই মুক্তির সাধন।" ইহাই নারায়ণের শাস্ত্রব্যাখ্যার স্থূল মর্ম্ম ছিল।

আরুণ্যোদয়ের আশ্রমেই তিনি পীড়িত হইলেন। গুরুদেব ধ্যানযোগে একটি নিভৃত নির্ঝরিণী আবিষ্কার করিয়া তাহারই জল সেবন করাইয়া নারায়ণকে আসন্ন মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বৎস, তোমার কি কোনও অভিলাষ আছে?" নারায়ণ বলিলেন, "আমার কন্যা কমলাকে একবার দেখিলেই আমি সুখে মরিতে পারি।"

পাঠক কমলার ব্যারামের সময় যাহার চিকিৎসাগুণের পরিচয় পাইয়াছেন, সেও এই মহর্ষিরই একজন চেলা, নাম রামচন্দ্র। সে দেখিল যে কমলাকে এই দুর্গম স্থানে আনয়ন করা সুসাধ্য নহে। তাই সে নারায়ণকে অগ্নিনীগড়ে আনয়ন করিয়া কমলাকে তাঁহার ব্যারামের সংবাদ জানাইয়াছিল। শাশুড়ীকে সঙ্গে করিয়া কমলা পিতৃভবনে চলিল। রাস্তায় যাইতে যাইতে কত ভাবে কমলার হৃদয় আলোড়িত হইতে লাগিল। শৈশবের পরিচিত দৃশ্যাবলি দেখিয়া পুরাতন সুখের স্মৃতি তাহার বর্ত্তমান দুঃখভারাক্রান্ত মনেও জাগিয়া উঠিল। আহা! তেমন সুখ কমলার ভাগ্যে আর কি ঘটিবে? রাস্তায় কমলা সবই দেখিতেছিল, কিন্তু তাহার চিন্তাস্রোত অনবরত সেই পাহাড়োপরিস্থ পিতৃগৃহের অভিমুখেই প্রবাহিত হইতেছিল। যে পিতাকে শৈশবে দুইদণ্ড না দেখিলে কমলা অস্থির হইত, তাঁহাকে সে কত কাল দেখে নাই! তাঁহাকে যাইয়া একটুকু সুস্থকায়ই দেখিতে পাইবে তো? এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে কমলা পাহাড়ের নিকট পৌঁছিলে, তাহার শাশুড়ী তাহার ব্যস্ততা দেখিয়া তাহাকে অগ্রসর হইতে বলিলেন। যাইতে যাইতে কমলা যেসীকে দেখিতে পাইল। আর দেখিল যেসীর কোলে তাহার নবজাত শিশুটী। কমলার হৃদয় স্নেহের তরঙ্গে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। সেই তরঙ্গের অভিঘাতে জাতিভেদ-বিচাররূপ বালির বাঁধ চুরমার হইয়া গেল। মুহূর্ত্তমধ্যে ছুটিয়া

গিয়া কমলা যেসীর দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ হইল। যেসীর মুখে কমলা শুনিল, তাহার পিতা কতকটা সুস্থই আছেন। পিতার ঘরে যাইয়া কমলা একেবারে তাঁহার শয্যার উপর অবসন্ন হইয়া পড়িল এবং পিতার বুকের উপর মাথা রাখিয়া অনেকক্ষণ এই ভাবেই পড়িয়া রহিল।

নারায়ণ ক্রমে সুস্থ ও সবলকায় হইয়া উঠিলেন। একদিন কমলা তাঁহার নিকট মায়ের জীবনঘটিত সব বিষয় জানিবার জন্য একান্ত আগ্রহ প্রকাশ করিল। তিনি ভাবিলেন, তাঁহার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইয়াছে, কখন মরেন ঠিক নাই, এমতাবস্থায় কমলার নিকট তাহার মায়ের জীবনকাহিনী আর গোপন রাখা উচিত নয়। তাই বলিতে লাগিলেন—"কোনও গিরিদুর্গে এক সমৃদ্ধ জায়গীরদার বাস করিতেন। তাঁহার লক্ষ্মীবাঈ নাম্নী একটা পরম সৌষ্ঠবশালিনী যুবতী কন্যা ছিল। তিনি তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার উপর সমস্ত বিষয়সম্পত্তির ভার ও ভ্রাতৃজায়ার উপর কন্যার লালন পালনের ভার অর্পণ করিয়া সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন। দুর্গেরই অভ্যন্তরে একটা মন্দির প্রতিষ্ঠিত করিয়া অর্থগৃধ্নু পূজারিগণে পরিবেষ্টিত হইয়া তিনি সেখানেই থাকিতেন। একদা জ্যোৎস্নাপুলকিতা রজনীযোগে হর্ম্ম্যোপরি ভ্রাম্যমাণা এই যুবতীমূর্ত্তি আমার নয়নপথে পতিত হইল। আমি পর্ব্বতের পাদদেশস্থ গ্রামে যাইয়া অনুসন্ধান করাতে যাহা জানিতে পারিলাম তাহাতে বুঝিলাম যে, যুবতীর প্রতিপালিকা খুড়ী সম্পর্কে আমারও মাসী হন। আমি মাসীর সহিত দেখা করিতে গেলাম এবং তাঁহার যত্নে ও আদরে অনেক দিন তাঁহাদের বাড়ী অবস্থান করিলাম। কতকদিন যাইতেই যুবতীর সহিত আমার প্রণয় জন্মিল। বলা বাহুল্য, যুবতীর পিতা কন্যার বিবাহ বিষয়ে অত্যন্ত উদাসীন ছিলেন। মাসী ঠাকুরাণী তাঁহার অজ্ঞাতসারেই আমার করে লক্ষ্মীকে অর্পণ করিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন পরে লক্ষ্মীর পিতার নিকট একথা জ্ঞাপন করিলেই চলিবে। কিন্তু আমাদের বিবাহের পরদিবসই লক্ষ্মীর পিতা আসিয়া ভাদ্রবধূকে বলিলেন যে, কোনও ক্ষমতাপন্ন জায়গীরদার লক্ষ্মীর পাণিগ্রহণ করিতে ইচ্ছুক। কাজেই লক্ষ্মীর ও আমার পলায়ন ভিন্ন আর গতি রহিল না। পলাইয়া গৃহে আসিলাম বটে, কিন্তু লক্ষ্মীকে কেহই সাদরে গ্রহণ করিল না। আমার পিতা পূর্ব্বে একজন যোত্রাপন্ন লোক ছিলেন, বাড়ী আসিয়াই দেখিলাম তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন। লক্ষ্মীর গৃহে আগমনই এই সকল অমঙ্গলের কারণ বলিয়া সকলে নির্দ্দেশ করিল। শেষে লক্ষ্মীর গহনাগুলির উপরও সকলের চোখ পড়িল। এই সকল গহনা কখনও হস্তান্তর করিব না বলিয়া আমি মাসীর নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলাম। প্রতিজ্ঞাভঙ্গের ভয়ে আমি অগত্যা লক্ষ্মীকে সঙ্গে করিয়া তীর্থদর্শনে বাহির হইলাম; আমার ভাগিনেয় রামচন্দ্রও আমাদের সঙ্গে চলিল। কাশী প্রভৃতি স্থানে দুই বৎসর কাটাইলাম। রামচন্দ্র আমার নিকট শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করিত; তোমার মা রন্ধন করিতেন, একটা ভৃত্য অপরাপর গৃহকর্ম্ম করিত। এই দুই বৎসর যেরূপ সুখে যাপন করিয়াছিলাম, তেমন সুখ মানুষের ভাগ্যে প্রায় ঘটেনা। তোমার মাই তোমার নাম কমলা রাখিয়াছিলেন। পরে কুরুক্ষেত্রে যাইবার পথে যখন দুধস্থলে উপস্থিত হই, তখন তুমি জলে পড়িয়া যাও, তোমার মাই তোমাকে উদ্ধার করেন। কিন্তু সেই দিনই সন্ধ্যা বেলা তাঁহার এরূপ কঠিন পীড়া হইল যে তাঁহার আর জীবনরক্ষা হইল না। এইরূপে আমি আমার প্রাণের প্রতিমা বিসর্জ্জন দিলাম। তোমার সহিত তাঁহার আকারগত এরূপ সাদৃশ্য ছিল যে, গত বৎসর যখন তোমাকে হঠাৎ দুধস্থলে দেখিতে পাই, তখন চিন্তাবেগে বড়ই অধীর হইয়া পড়ি। কাজেই তোমার সহিত তখন দেখা করিতে সাহসী হই নাই।"

একবার রামচন্দ্র তাহার মাতুলের নিকট বিদায় লইয়া গৃহে গমন করিল। তাহার মাতা নারায়ণের মত সেও পাছে গৃহত্যাগ করে, এই ভয়ে তাহার বিবাহের উদ্যোগ করিলেন। বাগ্দান হইয়া রহিল। রামচন্দ্র তাহার মাতুল ও গুরু আরুণ্যোদয়ের সঙ্গ ছাড়িয়া থাকিতে ভাল বাসিত না। তাই সে পুনরায় তাঁহাদের সহিত আসিয়া জুটিল। ইতিমধ্যে রামচন্দ্রের মিথ্যা মৃত্যুসংবাদ তাহার আত্মীয়স্বজনের নিকট পৌঁছিলে সেই বাগ্দত্তা কন্যা বৈধব্যযন্ত্রণার হাত এড়াইবার জন্য অকস্মাৎ নিরুদ্দেশ হইল। এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে একটা কলঙ্কের কথাও রাষ্ট্র হইল যে, বাড়ীর পূজারি ঠাকুরটীও ঠিক সেই সময়েই নিরুদ্দেশ হয়। রামচন্দ্র যখন পুনরায় গৃহে গমন করিল, তখন এই সকল কুৎসার

কথা শুনিয়া সংসারের প্রতি আরও বীতশ্রদ্ধ হইয়া মাতুলের নিকট ফিরিয়া আসিল। তখন কমলার সবে মাত্র জন্ম হইয়াছে; তাহার মাতুলানী কমলাকে তাহারই করে অর্পণ করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিলেন। কমলার বয়স যখন পাচ বৎসর তখন রামচন্দ্রের পিতার মৃত্যু হওয়াতে সে আবার বাড়ী গেল এবং পারিবারিক বিষয়কর্ম্মের বন্দোবস্ত করিতে সেখানে কতকদিন থাকিতে বাধ্য হইল। ইত্যবসরে পত্নী-বিয়োগ হওয়াতে শোকাকুলচিত্তে দেশ বিদেশ পর্য্যটন করিয়া নারায়ণ অবশেষে অগ্নিনীগড়ে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। অনেক দিন তাঁহার সহিত রামচন্দ্রের দেখাসাক্ষাৎ হয় নাই। কমলার বিবাহের পূর্ব্বক্ষণে হঠাৎ আসিয়া রামচন্দ্র উপস্থিত হইল, কিন্তু তখন আর কমলার সম্বন্ধ ফিরাইবার সময় ছিল না।

উল্লিখিত বাগ্‌দত্তা কন্যাই আমাদের পরিচিতা সঙ্গী। সঙ্গী-জাদোবিনী নামেই সে লোকের নিকট সমধিক পরিচিতা ছিল। সঙ্গী রামচন্দ্রকে যদিও জানিত বটে, কিন্তু সে যে তাহার স্বামী একথা তাহার জানা ছিলনা। সঙ্গী এখন তাহাও জানিতে পারিল। কমলা পিতার ব্যারামের সংবাদ পাইয়া যখন অগ্নিনীগড়ে আসিল, তখন রামচন্দ্র নারায়ণের চিকিৎসা ও শুশ্রূষায় নিযুক্ত ছিল; কিন্তু কোনও বিশেষ কার্য্যানুরোধে এই দিবসই তাহাকে বাসগ্রাম সিংহবাদে যাইতে হইল। অশ্বারোহণে গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে সে দেখিল শৈলশ্রেণীর অন্তরাল হইতে এক অশ্বারূঢ়া রমণী বহির্গত হইয়া তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল। রামচন্দ্র সঙ্গীকে দেখিয়াই চিনিল, কিন্তু সে যেন তাহাকে জানেনা এই ভাবেই তাহার সহিত আলাপ করিতে লাগিল। আলাপ করিতে করিতে রামচন্দ্র জানিতে পারিল যে, সঙ্গী তাহার বিষয়ে সকলই অবগত আছে, এমন কি কমলার বিবাহ যে তাহারই সহিত হওয়ার কথা ছিল, তাহাও সে বিলক্ষণরূপে জানে। অবশেষে রামচন্দ্রকে তাহাদের গ্রামটা একবার দেখিয়া যাইতে সঙ্গী অনুরোধ করিল। সঙ্গীর অনুরোধ বা আদেশ প্রায় তুল্য কথা, তাহার হাত ছাড়াইয়া যায় কাহার সাধ্য? রামচন্দ্র কিঞ্চিৎ ইতস্ততঃ করিয়া সম্মত হইল। ধর্ম্মশালায় রামচন্দ্রের থাকিবার বন্দোবস্ত করিবার জন্য সঙ্গী অগ্রবর্ত্তিনী হইল।

ছইটী উপত্যকার মধ্যবর্ত্তী পাহাড়ের উপর সঙ্গীর আবাস-গৃহ। ইহারই এক নিভৃত প্রকোষ্ঠে যাহার প্ররোচনায় সে কুলত্যাগিনী হইয়াছিল সেই ঠাকুরটী মন্ত্রণাদাতারূপে বাস করিত। ইহারই মন্ত্রণাকৌশলে সঙ্গী এতাদৃশ ভোগৈশ্বর্য্যের অধিকারিণী হইতে সমর্থ হইয়াছিল। কিন্তু উভয়ের মধ্যে এখন আর তত সদ্ভাব ছিলনা। সঙ্গী ঠাকুরকে তাহার কুল মান নাশের কারণ বলিয়া গালি দিত, ঠাকুরও সঙ্গীর পাপাচরণ দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে দেখিয়া তাহার ভিতরকার সব কথা তাহার স্বামী ও লোকের নিকট প্রকাশ করিয়া দিবে বলিয়া তাহাকে শাসাইত। আজও সঙ্গী মন্ত্রীর নিকট আসিয়া রামচন্দ্রের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে উভয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ বাগ্‌যুদ্ধ হইল। শেষে ঠাকুরেরই মুখে যখন শুনিতে পাইল যে, রামচন্দ্রই তাহার স্বামী, তখন তাহার মস্তক ঘুরিয়া গেল, অনুতাপানলে তাহার হৃদয় দগ্ধ হইতে লাগিল। জানালার গরাদে ধরিয়া সঙ্গী নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। "হায় হায়! কেন আমি এইরূপ রূপগুণসম্পন্ন স্বামিসুখে বঞ্চিতা হইয়া এই বাহ্যচাক্‌চক্যপূর্ণ অন্তঃসার-বিহীন ঘৃণিত জীবন যাপন করিতেছি?" এই কথাই পুনঃ পুনঃ তাহার মনে উদয় হইতে লাগিল। আর কি এই পাপের পথ হইতে ফিরিবার উপায় আছে? সঙ্গী জানিত, নাই; সে ফিরিতে পারিল না।

কমলা মাসাধিক পিত্রালয়ে থাকিল। এক দিন তাঁহার পিতা বলিলেন, "কমলা, আমি যদি মরি, তবে তুমি কি করিবে? তুমি কি মনে কর তুমি সুখী, কিছুরই তোমার অভাব নাই? তোমাতে ও তোমার স্বামীতে পরস্পরের প্রতি আন্তরিক প্রণয় থাকা আবশ্যক। তাহা হইলেই সব দিক্ বজায় থাকিবে। কিন্তু তুমি তোমার পিতার প্রতি কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় অনুরক্ত; আমার মনে হইতেছে, আমার কাছ ছাড়িয়া তুমি কোথাও যাইতে চাওনা। গণেশের সম্বন্ধেও আমি বিশেষ কিছু জানিনা। তাই তোমার জন্য আমি বড় উদ্বিগ্ন হইয়াছি।" কমলা বলিল, "বাবা, আমার জন্য আপনি কিছু মাত্র ভাবিবেন না। তিনি আমার প্রতি বড়ই সদয়। অন্যান্য বালিকাগণের কাহারও তেমন পতিলাভ হয় নাই। তজ্জন্য তাহারা সর্ব্বদাই আমার ভাগ্যের প্রশংসা করিয়া থাকে। এক সময়ে

আমি বড়ই অস্থিরচিত্ত ও উৎকণ্ঠান্বিত হইয়া পড়িয়াছিলাম, কিন্তু কি জানি কেন এখন আর আমার মনের সে ভাব নাই।”

বস্তুতঃ এই অল্প সময়ের মধ্যেই কমলার মানসিক অবস্থার আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। সে যেন অকস্মাৎ দুঃখ-জ্বালাময় সংসার হইতে উন্নীত হইয়া শান্তির রাজ্যে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। গণেশের সম্বন্ধে তাহার যে উৎকট উৎকণ্ঠা জন্মিয়াছিল, তাহা একবার অপগত হইলে সে তাহার প্রকৃত স্বভাবের বিচার করিতেও অবসর পাইল; কারণ, এখন আর তাহার মনে প্রেমান্ধতা বা মোহান্ধতা নাই। এখন সে বুঝিতে পারিল যে, একমাত্র গণেশের উপরই তাহার জীবনের সুখ দুঃখ নির্ভর করে না, তাহার নিকট হইতে অধিক আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

মনের এই অবস্থা লইয়া কমলা শ্বশুরালয়ে ফিরিয়া আসিল। শিবগঙ্গায় তখন বড়ই মারীভয়ের প্রাদুর্ভাব হইয়াছিল। কমলা যে দিন তথায় পৌছিল, সেই দিনই রাত্রিতে পতিপ্রাণা রুক্মা পতিহীনা হইল। কমলা সারা রাত্রি কাঁদিয়া কাটাইল। রাত্রি প্রভাত হইলেও সে একবার রুক্মার সহিত দেখা করিবার পর্য্যন্ত অনুমতি পাইল না।

এইরূপ দুঃখযন্ত্রণার মধ্যে কমলা একটী কন্যাসন্তান প্রসব করিল। গণেশ রামপুরে চলিয়া যাওয়ার পর কমলাকেই সকলে গলগ্রহ বলিয়া মনে করিত, তার উপর হইল আবার এই বোঝা। শাশুড়ী ও ননদেরা সর্ব্বদাই বলিত, “হতভাগীর গর্ভে কে এই সময়ে সন্তান কামনা করিয়াছিল? তাও হইল কিনা একটা মেয়ে!” এইরূপ দুর্ব্বাক্যে শিশুর পাছে কোনও অনিষ্ট হয় ভাবিয়া কমলা তাহাকে বক্ষে চাপিয়া রাখিত। অপরের কাছে যাহাই হউক, তাহার কাছে যে শিশুটী অমূল্য নিধি! মায়ের সন্তপ্ত প্রাণে শান্তি দিতে সন্তানের মত বস্তু আর সংসারে কি আছে?

দুই মাস পরে কমলাকে রামপুরে লইয়া যাইবার জন্য গণেশ বাড়ী আসিল। নবজাত শিশুটীকে দেখিয়া সেও আহ্লাদ প্রকাশ করিল না। সকল পিতাই তো সন্তান-বৎসল হয়না, এই বলিয়া কমলা নিজের মনকে প্রবোধ দিতে লাগিল এবং অবিলম্বেই রামপুরে যাইয়া স্বামিসহবাসে কাল কাটাইতে পারিবে, এই আশায় বুক বাঁধিল।

কমলা যেখানে যায়, তাহার অদৃষ্ট তাহার সঙ্গ ছাড়েনা। গণেশের ভগিনীদ্বয়ও রামপুরেই বাস করিতে লাগিল। তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া ঘরে ফিরিয়া আসিলে গণেশ যেন একেবারে বদলাইয়া আসিত। কখনও বা সে কমলার সহিত কথাই কহিতনা, কখনও বা তাহাকে তীক্ষ্ণ বাক্যবাণে বিদ্ধ করিত। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ত্রুটির জন্যও কমলাকে বড়ই লাঞ্ছিত হইতে হইত। এই তো গেল সঙ্গীর অনুপস্থিতিতে। এখন আসিল সঙ্গীর পালা। গণেশ আফিস হইতে বড়ই দেরি করিয়া বাড়ী আসিতে লাগিল। এক জন প্রতিবেশিনী এক দিন কমলার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া গণেশ কোথায় যায়, কি করে, সব কমলাকে বলিয়া গেল। কমলার বিশেষ অনুরোধে গণেশ একটুকু সকাল সকাল আফিস হইতে বাড়ী আসিবে স্বীকার করিল। কিন্তু এক দিনও সে ঘরে আসিয়া তিষ্ঠিতে পারিলনা। যতক্ষণ বাড়ী রহিল, ছট্‌ফট্ করিয়া কাটাইল, শেষে বাড়ীর বাহির হইয়াই সঙ্গীর বাড়ীর দিকে ছুটিল। কমলার জানিতে কিছুই বাকী রহিল না।

অতঃপর সঙ্গী গণেশের গৃহেই যাতায়াত আরম্ভ করিল। নারায়ণের অনুরোধে রামচন্দ্র এক দিন সন্ধ্যাবেলা কমলার সহিত দেখা করিতে আসিল। এই ঘটনা অবলম্বন করিয়া পাপীয়সী সঙ্গী কমলার সর্ব্বনাশ সাধন করিল।

যথারীতি সেই দিন সায়ংকালে গণেশ যাইয়া সঙ্গীর নিকট উপস্থিত হইলে নানা কথার পর সঙ্গী বলিল, “কমলা রামচন্দ্র নামে তাহার এক পিসতুত ভাইয়ের সহিত অবৈধ প্রণয়ে আবদ্ধ।” গণেশ জানিত, সংসারে কমলার কোনও আত্মীয় নাই, সে সংসারে কাহাকেও জানেনা, তাই সে সঙ্গীর কথা সর্ব্বৈব মিথ্যা বলিয়া উড়াইয়া দিতে চেষ্টা পাইল। সঙ্গী পুনরায় বলিল, “চাক্ষুষ প্রমাণ পাইলে তো বিশ্বাস করিবে? চল, তোমার বাড়ীর পাশে একটা বাড়ী খালি আছে, সেখানে গোপনে থাকিয়া তোমাকে দেখাইয়া দিব যে এই মুহূর্ত্তে কমলা রামচন্দ্রের সহিত প্রেমালাপ করিতেছে।” উভয়ে ত্বরান্বিত হইয়া গিয়া সেই খালি ঘরে চুপ করিয়া রহিল। রামচন্দ্র গণেশের বাড়ীর প্রাঙ্গণে বহির্দ্বারের সম্মুখে একটী নিম্বগাছের তলায় দাঁড়াইয়া কমলার সহিত কথাবার্ত্তা কহিতেছিল দেখিয়া গণেশের সর্ব্বাঙ্গ জ্বলিয়া

উঠিল। পাপীয়সী সঙ্গী এই বলিয়া জ্বলন্ত হুতাশনে ঘৃতাহুতি প্রদান করিতে লাগিল, "কমলা চিরকালই এই কাজে অভ্যস্ত। রামচন্দ্রের সহিত তাহার বিবাহের কথা হইয়াছিল, সেই অবধি উভয়ে প্রণয়সূত্রে আবদ্ধ। কমলার বিবাহ হইয়া গেলেও রামচন্দ্র তাহাকে ভুলিতে পারে নাই। আমি তাহার নিজমুখে শুনিয়াছি, দুধস্থলে সে কমলার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিল। কমলার পিতার ব্যারাম হইলে রামচন্দ্রই কমলাকে খবর দিয়া অগ্নিনীগড়ে আনয়ন করে। রামচন্দ্রেরই চিকিৎসার গুণে কমলার রোগ শান্তি হইয়াছিল!—রামচন্দ্রেরও আগমন, কমলার রোগেরও অদ্ভুত তিরোধান? মূর্খ তুমি, বুঝিলে এখন ব্যাপার খানা কি?"

রামচন্দ্র চলিয়া গেল। কমলা তাহাকে গণেশের গৃহে ফিরিয়া না আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া যাইতে অনুরোধ করিলেও বিলম্ব হওয়ার ভয়ে রামচন্দ্র সে অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিল না। গণেশ সঙ্গীকে সঙ্গে করিয়া বাড়ীর ভিতর ঢুকিল। সঙ্গী বাড়ীঘর ও গৃহসজ্জা দেখিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিল। তাহার অর্থ এই যে কমলা গৃহকর্ম্মে অত্যন্ত অপটু। কমলা কিন্তু তাহার দিকে চাহিয়াও দেখিতেছিল না। একথা ওকথার পর পাপিষ্ঠা কমলাকে হুকুম করিল, "ওলো পোড়ারমুখী, আমায় পিক্‌দানটা আনিয়া দে"। কমলা নিরুত্তর। সঙ্গী বলিল, "দেখ্‌রে গণেশ, কমলা আমার কথা শুনিতেছে না।" গণেশ বলিল, "উঠ্‌, সঙ্গী যা বলিতেছে তাহাই কর" এই বলিয়াই সে কমলার পৃষ্ঠে বজ্রমুষ্টি প্রহার করিল। সুপ্ত বাঘিনী যেন জাগিয়া উঠিল! কমলা বলিল, "ইহারই জন্য আমার গায়ে হাত তোলা? ধর্ম্মে সাহিবেনা।" হিন্দু পতি স্ত্রীর উপর প্রভুত্ব করিতেই অভ্যস্ত, তাহার মুখে এরূপ কথা শুনিতে অভ্যস্ত নহে। কাজেই গণেশ কমলার উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া হতভম্ব হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। স্বামীর উপর এইরূপে জয়লাভ করিয়া কমলা সঙ্গীকে আক্রমণ করিয়া বলিল, "পাপীয়সি, এই মুহূর্ত্তে এখান হইতে দূর হ!" এই বলিয়াই অর্দ্ধচন্দ্রদানে সঙ্গীকে বাটীর বাহির করিয়া দিল।

আকস্মিক উত্তেজনার পরে অবসাদ আসিল; কমলা ভূমিতে মস্তক লুটাইয়া রোদন করিতে লাগিল। এই দিনের ব্যাপার আরও গড়াইল। গণেশ কমলাকে বলিল, "দুরাচারিণি, তুই আমাকে আজ সঙ্গীর সমক্ষে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিয়াছিস্!" গণেশ এইরূপ আরও অনেক কটুকথা বলিল ও কমলার চরিত্রে দোষারোপ করিল। কমলা বলিল, "ধর্ম্মসাক্ষী, পরপুরুষ কাহাকে বলে, আমি জানিনা। কিন্তু তোমার মনে যখন এরূপ ভাবও স্থান পাইয়াছে, তখন তোমার সহিত আমার সম্পর্ক এই পর্য্যন্ত। আমি আত্মহত্যা করিলে তোমাকে বিপাকে পড়িতে হইবে, কাজেই তাহা করিবনা; কিন্তু এই মুহূর্ত্তেই আমি এখান হইতে চলিয়া যাইতেছি। কেহ কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলে বলিও, আমি আমার পিতার কাছে গিয়াছি। তবেই লোকে আর কুৎসা রটাইবার সুবিধা পাইবে না।" এই বলিয়া মেয়েটাকে কোলে করিয়া সেই রাত্রিতেই কমলা স্বামিগৃহ ত্যাগ করিল। প্রথমতঃ একাকিনীই বাহির হইয়াছিল, শেষে কি মনে করিয়া ফিরিয়া আসিয়া চাকরাণীটাকে সঙ্গে লইল। কমলা ভাবিল, "শৈশবের লীলাভূমি অগ্নিনীগড়ে যাইব কোন মুখে? শ্বশুরগৃহে যাইব। তাঁহারাই আমার স্বামীর মন নষ্ট করিয়াছেন; প্রথমতঃ তাঁহাদিগকে দেখাইব যে আমি নির্দ্দোষ, তার পর তাঁহাদেরই গৃহে এই দেহ পাত করিব।"

অগ্রসর হইতে হইতে কমলা ভাবিল, "ভবিষ্যৎ, ভবিষ্যৎ আমার ঘোর অন্ধকারময়! মৃত্যুব্যতীত এই অবস্থায় আমাকে আর কিছুতেই সান্ত্বনা দিতে পারেনা।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে নক্ষত্রখচিত আকাশমণ্ডলের পানে কমলার দৃষ্টি পড়িল। অমনি তার মনে হইল, "এই বিশাল বিশ্বেরমাঝে আমি কোন্ ছার পদার্থ! আমার জীবনমরণে কি আসিয়া যায়?" ঠিক এই সময়ে মেয়েটিও জাগিয়া আকাশের দিকে চাহিয়া হর্ষধ্বনি করিল। শিশুটী যেন ঈশ্বরের নিকট কৃপা ভিক্ষা করিতেছিল। কমলা ভাবিল, যিনি এই অপোগণ্ড শিশুর প্রাণ দিয়াছেন, আমি মরিলে কি তিনি ইহাকে রক্ষা করিবেননা? নিশ্চয়ই এমন একজন প্রেমময় ঈশ্বর আছেন যিনি সকলের তত্ত্বাবধান করিয়া থাকেন।" এইরূপ ভাবিতে ভাবিতেই কমলার প্রাণে শান্তি আসিল এবং তন্মুহূর্ত্তেই সে গতানুশোচনা করিতে বিরত হইল। চিত্তের এইরূপ শান্ত ও সমাহিত অবস্থায় কমলার হৃদয়ের অন্তস্তলে অস্ফুটস্বরে ঈশ্বরের আদেশ প্রচারিত হইল—"মৃত্যুর কল্পনা পরিত্যাগ করিয়া প্রকৃত নিষ্কলঙ্ক জীবনদ্বারা সংসারের কি মহদুপকার সাধিত হইতে পারে আত্মজীবনে তোমাকে তাহাই

দেখাইতে হইবে। নরনারী মাত্রেরই হৃদয়ে তোমার প্রেমের বিজয়পতাকা প্রোথিত করিতে হইবে। তোমাকে তৃণাপেক্ষাও নীচ হইতে হইবে, কারণ, এ জগতে হেয় বস্তু কিছুই নাই। সংসারই তোমার কর্ম্মক্ষেত্র; সোৎসাহে এই ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়া কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হও। এরূপ করিলে তোমার কার্য্যকলাপের কথা এক দিন গণেশের কাণেও অবশ্যই পৌঁছিবে।”

রামচন্দ্র যখন কমলার সহিত দেখা করিতে রামপুর গিয়াছিল, তখন সে শিবগঙ্গা হইয়া যায়, নারায়ণের বিষয় আশয়ের কথা কমলার শ্বশুরের নিকট জ্ঞাপন করে। যে পুত্রবধূ অচিরাৎ এত সম্পত্তির অধিকারিণী হইবে, তাহার প্রতি দুর্ব্যবহার করিয়া তাঁহারা ভাল কাজ করেন নাই, কমলার শ্বশুর শাশুড়ী এখন তাহা বুঝিতে পারিলেন। তাঁহারা মনে মনে স্থির করিলেন যে, কমলাকে একবার রামপুর হইতে গৃহে আনাইয়া পূর্ব্বের কসুরটা সারিয়া লইবেন। কাজেই প্রত্যূষে কমলা যখন শিবগঙ্গায় আসিয়া পৌঁছিল, তখন তাহার শ্বশুরগৃহে প্রবেশ লাভ করিতে কোনও কষ্ট হইলনা। কমলা ভিতরকার এই সকল কথা অবগত ছিলনা, কাজেই তাহার প্রতি শ্বশুর শাশুড়ীর যত্নের মাত্রাটা এবার কিছু বেশী দেখিয়া সে মনে করিল, “এই সংসার অবিমিশ্র দুঃখেরই স্থান নহে, এখানেও সুখের মুখ কখনও কখনও দেখা যায়; এখানেও শোকে সান্ত্বনা ও বিপদে সহানুভূতি আছে।”

কিছুকাল পরে পিতার মৃত্যুসংবাদ শুনিয়া কমলা নিদারুণ শোকে অভিভূতা হইয়া পড়িল। কত দিন কত রাত্রি কমলা কাঁদিয়া কাটাইল। কালক্রমে তাহার শোক প্রশমিত হইয়া আসিল। কিন্তু তাহার বিষাদময় জীবনের এক মাত্র শান্তির স্থল প্রাণের পুত্তলী শিশুটীকেও বুঝি যম কাড়িয়া লইবার উপক্রম করিল। মেয়েটীর এমন কঠিন পীড়া হইল যে তাহার আর বাঁচিবার লক্ষণ রহিলনা। তাহার চক্ষুর্দ্বয় প্রভাহীন হইয়া উঠিল। পূর্ব্বে তাহার যে চাহনি দেখিয়া কমলা মনে করিত যেন সে তাহারই সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিতেছে, সেই দৃষ্টি এখন শূন্য বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। শিশুটী স্বভাবতঃই অল্পমাত্র অসুখেই কাতর হইয়া পড়িত। অল্প অল্প জ্বরে তাহার দেহ দিন দিন ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইতে লাগিল। প্রেতলোকে বিশ্বাস হিন্দুদিগের অস্থিমজ্জাগত। পাপাত্মারা মরিয়া অপদেবতা হয়, আর এই সকল অপদেবতার প্রভাব শিশুদের পক্ষে বড়ই মারাত্মক; গৃহদেবতাদিগকে প্রসন্ন করিতে পারিলেই তাহাদের হাত হইতে শিশুদিগকে রক্ষা করা যাইতে পারে, এইরূপ তাহাদিগের বিশ্বাস। কমলার মনেও এই বিশ্বাস প্রবল ছিল। মেয়েটীর রোগ শান্তির জন্য সে অনেক দেবদেবীর আরাধনা ও অর্চনা করিল, কিছুতেই কিন্তু কোনও ফল দেখা গেল না। অবশেষে কমলা শুনিতে পাইল যে ভবানী দেবীর মন্দিরের সম্মুখস্থ ময়দানে এক বড় দেবতার আবির্ভাব হইবে। তাঁহার কাছে বর ভিক্ষা করিবার জন্য শিশুটীকে কোলে করিয়া কমলা মন্দিরসমীপে যাইয়া উপস্থিত হইল। তাহার মনে মনে ভয় পাছে দেবী রুষ্টা হইয়া তাহার অভিলাষ পূর্ণ করিবার পূর্ব্বেই শিশুটীকে মারিয়া ফেলেন, কিম্বা তাহাকে বলি স্বরূপ চাহিয়া বসেন। দেবীর ভক্তগণ গীত বাদ্য সহকারে নৃত্য করিতে করিতে সেখানে আসিয়া উপস্থিত হইল। কোলাহল শুনিয়া চকিত হইয়া শিশুটী কমলার মুখের পানে তাকাইল। কমলা দেখিল তাহার বড়ই মাথা ধরিয়াছে ও জ্বর বাড়িয়াছে। অমনি জানুপাতিয়া সন্তানের মঙ্গল কামনায় কমলা দেবীর নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল। সকলে দেখিয়া কমলাকে পাগল বলিয়া মনে করিতে লাগিল। পরে কমলা দ্রুতপদে গৃহে ফিরিয়া আসিল।

নৈশান্ধকার বিশ্বসংসার গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছে, ক্ষীণ নক্ষত্রালোকমাত্র ঘরে প্রবেশ করিতেছিল। শোঁ শোঁ শব্দে প্রবলবেগে বায়ু প্রবাহিত হইতেছিল; সেই শব্দ যেন কোনও বিলপমানা রমণীর দূরাগত আর্ত্তনাদের মত শ্রুত হইতেছিল। কমলার ক্রোড়ে শিশুটী মৃত্যুযন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিতেছিল; কমলা এই ঘুম পাড়ানিয়া গান গাহিয়া তাহাকে শান্ত করিতে চেষ্টা করিতেছিল—

সোণার দোলনা তোর,
পিতা তোর প্রবল প্রতাপ,
কার সাধ্য ভাঙ্গে তোর সুখনিদ্রা ঘোর?
অরিষ্ট আড়ষ্ট ভয়ে, কেন ভয় পাও?
বাছা, সুখে নিদ্রা যাও!

যত গন্ধর্ব্ব কিন্নর,
নহে তারা মরতের জীব,
স্বরগের দূত, নহে নয়নগোচর,
পক্ষ বিস্তারিয়া তোর করিছে রক্ষণ ;
যাদু, ঘুম ঘুম ঘুম।

তোর সুচারু আনন
পক্ষ-বৃন্ত করি সঞ্চালন
ধীরে ধীরে ধীরে তারা করিছে বীজন ,
নিদ্রা-বিঘ্ন তবে তোর কি আছে বাছনি ?
ঘুম, ঘুম যাদুমণি।

তোর নয়ন-পল্লবে
স্বরগীয় চুম্বনের ধারা
অমৃতের ধারা হেন বরষিছে সবে,
অধরে অধরে স্নিগ্ধ ভাবের পরশ !
যাদু, ঘুমরে অবশ।

থলো থলো লালে লাল
বুনো জাম দোলে ডালে ডালে,
নীল নীরে শোভে যেন উজ্জল প্রবাল।
রূপের তুলায় তোর তাহা কোন্ ছার !
যাদু, ঘুমরে আমার।

হায় ! হতভাগিনী জানিত না যে ইহাতেই তাহার শিশুটী চিরনিদ্রার অভিভূত হইয়া পড়িবে।

কমলা দেয়ালে ঠেসান দিয়া বসিয়াছিল। রাত্রি প্রভাত হইলে সকলে মনে করিল বুঝি সন্তানের সঙ্গে মায়েরও জীবন-লীলার অবসান হইয়াছে। প্রবল জ্বরে কমলার চৈতন্য-লোপ হইল। সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া সে শুনিল ১২ ঘণ্টা কলেরা রোগে ভুগিয়া গণেশও ইহধাম ত্যাগ করিয়াছে। কমলা ভাবিল, "আমার রাগ করিয়া স্বামীগৃহ ত্যাগ করিয়া আসার কি এই উপযুক্ত সাজা হইল ! কেন আমি রামপুরেই থাকিয়া স্বামীর মন পাইতে চেষ্টা করিলাম না ? যে ভাগীরথীর আমারই মত দশা ছিল, তাহার স্বামী তো এখন আবার তাহারই হইয়াছে। ভাগীরথী এখন কত সুখী !" কমলার জীবনের একরূপ সব ফুরাইল, সম্বল রহিল মাত্র সহচরীগণের অকপট ভালবাসা।

কমলার শ্বশুর শাশুড়ী পুত্রের ব্যারামের সংবাদ শুনিয়া রামপুর চলিয়া গিয়াছিলেন। সখীগণের সেবাশুশ্রূষাতেই কমলা আরোগ্য লাভ করিল। তাহারা সর্ব্বদাই কমলাকে সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করিতে লাগিল। কাশী তাহার নিজের শিশুটীকে আনিয়া কমলার কোলে দিয়া বলিল, "মনে কর এটী তোমারই সন্তান, তুমিই ইহাকে লালন পালন কর।"

সময় তো কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না ! মৃত স্বামী ও সন্তানের অনুধ্যানে কমলার দুই বৎসর কাটিল। পরে একদিন রামচন্দ্র উপস্থিত হইয়া বলিল, "কমলা, আমি মাতুল মহাশয়ের প্রদর্শিত পথে ধর্ম্মার্জ্জন করিবার জন্য কঠোর সাধন করিয়াছি, কিন্তু কই, ঈশ্বরের প্রকৃত তথ্য লাভে তো সমর্থ হইলাম না। এখন সংসারী হইতে আমার বড় ইচ্ছা হইয়াছে। তোমাকে পত্নীরূপে পাইলেই আমার এই সাধ পূর্ণ হইতে পারে। তোমার বিবাহের পূর্ব্বেও তুমি আমারই ছিলে, এখন তবে আমার হইতে আপত্তি করিবে না, আশা করি। লোকসমাজের অধীনতা-নিগড় পায়ে পরিয়া যে সুখ হয়, তাহার তো আস্বাদ পাইয়াছ, এখন তোমাকে আমি সম্পূর্ণ স্বাধীনতার রাজ্যে আহ্বান করিতেছি। চল আমার সহিত ; আমার যে বিষয়-সম্পদ আছে আশা করি তাহাতে আমরা সম্পূর্ণ সুখে কাল যাপন করিতে পারিব।" কমলা বলিল, "ওরূপ কথা মুখে আনিও না। পুরাকালে হিন্দু রমণীরা সহমৃতা হইতেন; মনে করিও আমারও জীবন আমার স্বামীর সহিতই গিয়াছে, এ হৃদয়ে অপর কাহারও স্থান হইতে পারে না। আর আমার এই অপকৃষ্ট জীবন লইয়াই বা তুমি কি করিবে ? তুমি অপর কোনও সুন্দরীর পাণিগ্রহণ করিয়া সুখী হও।"

রামচন্দ্রকে কাজেই বিষণ্ণমনে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইল। অতঃপর সে পীড়িতের চিকিৎসায় ও দরিদ্রের দুঃখমোচনে জীবন উৎসর্গ করিল। সকলেই তাহাকে অরুণোদয়ের পথানুবর্ত্তী বলিয়া মনে করিতে লাগিল। কমলা রামচন্দ্রকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছিল বটে, কিন্তু রামচন্দ্র তাহাকে নিঃস্বার্থ ভাবে ভালবাসে এই কথা ভাবিতেও কমলা বিমল আনন্দ অনুভব করিত। প্রকৃত ভালবাসার এমনই প্রভাব বটে।

কমলা অনাথ ও আতুরদিগের সেবায় জীবনের অবশিষ্ট-কাল অতিবাহিত করিয়া মৃত্যুকালে সমস্ত বিষয় অনাথ ও

বিধবাদিগের হিতকল্পে দান করিয়া গেল। কমলার নামে একটী সমাধিমন্দির ও সত্রশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহাই অদ্যাপি তাহার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ বর্ত্তমান রহিয়াছে।

[সমাপ্ত] শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র সোম।

বৈজ্ঞানিকপ্রসঙ্গ।

কালিদাস, বরাহ ও নবরত্ন।

গত বৈশাখের 'প্রবাসী'তে কবিবর 'বিজয়বাবু মহাকবি' কালিদাসের আবির্ভাবকাল বলিয়াও বলেন নাই। তিনি নজীরের নাম করিয়া সরাসরি বিচারে কালিদাসের আবির্ভাবকাল ৫৫০ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়াছেন। দুঃখের বিষয় এই পুস্তকাগারবিহীন দেশে কনিংহাম কিম্বা ফ্লীট সাহেবের কোন নজীরই পাওয়া গেল না। অতএব বিজয়বাবুকে ছাড়িতে পারিতেছি না। তিনি লিখিয়াছেন, "বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভা যে কল্পিত নহে, তাহা সবিশেষ প্রমাণিত হইয়াছে। যে সকল পণ্ডিত লইয়া এই নবরত্নসভা গঠিত ছিল, তাঁহাদের মধ্যে বরাহমিহিরের তিরোভাবকাল ৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দ বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। কাজেই হর্ষবিক্রমাদিত্যকেই নবরত্ন সভার প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে।"

বিজয়বাবুর মত আমিও প্রথমে মনে করিয়াছিলাম, কোন বিক্রমাদিত্যের—সম্ভবতঃ হর্ষবিক্রমাদিত্যের—নবরত্নের মধ্যে কবি কালিদাস ও বরাহমিহির ছিলেন। কিন্তু এই কথার একটি প্রমাণ ব্যতীত অন্য প্রমাণ পাই নাই। সে প্রমাণটি জ্যোতির্ব্বিদাভরণ নামক মুহূর্ত্তগ্রন্থরচয়িতা গণক কালিদাসের। এই গণক কালিদাস ত্রয়োদশ খ্রীষ্টাব্দে উক্ত গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন। উক্ত প্রমাণটি সকলেরই জ্ঞাত হইলেও আর একবার উদ্ধৃত হইল।

ধন্বন্তরি ক্ষপণকামরসিংহ শঙ্কু বেতালভট্ট ঘটকর্পর কালিদাসাঃ।
খ্যাতো বরাহমিহিরো নৃপতেঃ সভায়াং রত্নানি বৈ বররুচির্নব বিক্রমস্য।

এই গণক কালিদাস কবিত্বের যে নমুনা দেখাইয়াছেন, তাহা কবি কালিদাসের শিষ্যানুশিষ্যেরও উপযুক্ত নহে। একে আবির্ভাবকালে অনৈক্য, তার উপর কবিত্বের বিষম অনৈক্য। এই ও অন্যান্য কারণে উভয়কে কদাপি এক বলিয়া মনে করিতে পারা যায় না।

যদি এই নজীরের বলে নবরত্ন সভার অস্তিত্ব প্রমাণিত বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, তাহা হইলে অস্তিত্ব প্রমাণিত হয় নাই। অন্য নজীর থাকিলে, আশা করি, বিজয়বাবু তাহা দেখাইবেন।

অন্যপক্ষে বরাহ অনেক জ্ঞাতনামা ও অজ্ঞাতনামা ব্যক্তির নাম করিয়াছেন, কিন্তু কালিদাস নামের কোন ব্যক্তির কিম্বা কথিত নবরত্নের নামও করেন নাই। ইহাও স্মরণযোগ্য। বরাহ কোন নৃপতির জ্যোতিষী ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। পূর্ব্বকালে খ্যাতনামা কোন্ বিদ্বান্ পুরুষ কোন না কোন নৃপতির আশ্রয় না পাইতেন?

নবরত্ন সম্বন্ধে আর একটি কথা মনে হইতেছে। কোন্ সময় হইতে এদেশে নবরত্ন গণনা আরম্ভ হইয়াছে? নবরত্ন এই,

মুক্তামাণিক্যবৈদূর্য্যগোমেদান্ বজ্রবিদ্রুমৌ।
পদ্মরাগং মরকতং নীলং চেতি যথাক্রমম্॥

প্রাচীন রত্নশাস্ত্র আলোচনা করিলে দেখা যায় যে, সকল সময়ে নবরত্ন প্রসিদ্ধ ছিল না। অন্ততঃ বরাহ নবরত্ন গণনা করিতেন না। তিন চারিটি বা পাঁচটি রত্ন (মহারত্ন) গণনা করিতেন। অগস্ত্যও পাঁচটি করিতেন।* শুক্রাচার্য্য নয়টি করিতেন। উপরের উদ্ধৃত শ্লোকটি তন্ত্রসারের। সম্ভবতঃ তান্ত্রিক ধর্ম্মের প্রভাবের সময় নবরত্ন গণনা আরম্ভ হইয়াছিল। ফলতঃ স্পষ্ট বুঝা যায় যে নবগ্রহের খাতিরে নবরত্ন গণনা। কোন্ সময়ে নবগ্রহ শান্তির ব্যবস্থা হইয়াছিল, অর্থাৎ কোন্ সময় হইতে এদেশে রাহু কেতুর ফলদাতৃত্বে বিশ্বাস জন্মিয়াছে? যে সময়েই হউক, বরাহ রাহু-কেতুর দশা গণনা করিতেন না। তিনি রব্যাদি সপ্তগ্রহের সাতটি দশাভোগ গণনা করিয়া যবনেশ্বরের মতানুসারে লগ্নদশার উল্লেখ করিয়াছেন। বস্তুতঃ যিনি রাহু-কেতু লইয়া পৌরাণিকগণকে উপহাস করিতে পারিতেন, তিনি আর কোন্ মুখে তাহাদের বলাবল গণনা করিতে বসিবেন? যাহা

* ইনি পাঁচটি মহারত্ন গণনা করিতেন বটে, কিন্তু নবগ্রহের নিমিত্ত নয়টি বস্তু বরাদ্দ করিয়াছেন।

হউক, এই দিক্ দিয়া নবরত্ন সভার অস্তিত্ব বিচার করিতে পারা যায়। বিজয়বাবু সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনা করিতেছেন। তাঁহার উপর এই বিচারের ভার অর্পিত হইল।

বরাহমিহিরের তিরোভাবকাল আদৌ নির্ণীত হয় নাই। যে আমরাজ নামক জনৈক অজ্ঞাতনামা টীকাকারের প্রমাণে ভাউদাজী বলিয়াছিলেন যে, ৫০৯ শকে বরাহাচার্য্য স্বর্গ প্রাপ্ত হন, সেই আমরাজের উক্তিতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারা যায় না। বরাহের তিরোভাবকাল অন্য কেহ বলেন নাই। তিরোভাবকাল জানা না থাকিলেও বরাহের প্রাদুর্ভাব কাল জানা গিয়াছে। তিনি ৪২৭ শকের (৫০৫ খৃষ্টাব্দের) পরে ছিলেন। কত পরে, তাহা বলিতে পারা যায় না। তবে ৪৫০ শকে তিনি ছিলেন বলিতে পারা যায়।

কাব্যের সহিত আমার সম্পর্ক অল্প বা নাই। মহাকবি কালিদাস কোন্ কোন্ কাব্য লিখিয়াছিলেন, তিনি বিক্রমোর্বশী ও মালবিকাগ্নিমিত্র লিখিয়াছিলেন কিনা, তাহা বিজয় বাবুর মত কাব্যরসপায়ী সুধীগণ বিচার করিবেন। তবে এটুকু বলিতে দোষ নাই যে মালবিকাগ্নিমিত্রের ও শকুন্তলার কবির বিস্তর প্রভেদ শুনিয়া আসিতেছি। অন্যপক্ষে বিক্রমোর্বশীরচয়িতাসম্বন্ধে শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ পণ্ডিতের রঘুবংশের ভূমিকা পাঠ করিতে বিজয় বাবুকে অনুরোধ করি। বিক্রমোর্বশী ও শকুন্তলা, একই কবির রচিত বলিয়া পণ্ডিতজী প্রমাণ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ বিক্রমাদিত্যের ন্যায় কবি কালিদাস একাধিক ছিলেন। (See MaxMuller's *India, what can it teach us ?*)

বর্ণ ও বর্ণান্ধতা।

বরাহের নাম ইংরাজি প্রসিদ্ধ নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি কাগজেও উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে।* বর্ণান্ধতা বিষয়ে বলিতে বলিতে ডাক্তার লেখক বলিয়াছেন যে, বরাহও ইন্দ্রধনুতে ত্রিবিধ বর্ণ—রক্ত হরিৎ নীল—দেখিয়াছিলেন। কি জানি কেন, ইহাতে আমাদের বিস্ময় ত হয়ই না, উহা স্মরণযোগ্য বলিয়াও মনে হয় না। তবে কি না, বিলাতে বর্ণান্ধ যত (শতকরা ৪।৫ জন) বোধ হয়, এদেশে তত নাই। কলেজে দূরদৃষ্টিহীন যুবকের সংখ্যা ত দ্রুতবেগে বাড়িতেছে; কিন্তু বর্ণান্ধ তত দেখিতে পাই না। শতকরা একজন আছে কি না, সন্দেহ। ক্রমশঃ দূরদৃষ্টিহীনতার সহিত বর্ণান্ধতা আসিয়া জুটিলে সোণায় সোহাগা হইবে।

* The XIXth Century and After for April 1902

উক্ত ডাক্তার লেখক লিখিয়াছেন,

I have a series of paintings by colour-blind persons, and the mistakes made are similar to those which I find in museums in the work of the ancients. The blunders of those who are most colour-blind are to be found in the oldest paintings.....I also find that the faces of people are painted green,* and a confusion between blue and green in later paintings is very common.

অর্থাৎ ইনি বর্ণান্ধব্যক্তিকৃত অনেক চিত্রের সহিত কৌতুকাগারে রক্ষিত প্রাচীন চিত্র মিলাইয়া উভয় চিত্রে বর্ণনির্ব্বাচনবিষয়ে একই প্রকার দোষ দেখিয়াছেন। প্রাচীন চিত্রে মানুষের মুখ হরিদ্বর্ণে রঞ্জিত দেখা গিয়াছে, এবং পরবর্ত্তী কালের চিত্রে হরিৎ ও নীলের প্রভেদ দেখা যায় নাই।

এই কয়েকটি কথা পড়িয়া নবদূর্ব্বাদলশ্যামবর্ণ শ্রীরামচন্দ্রকে মনে হইতেছে। কোন কোন পণ্ডিত শ্যাম অর্থে মনোহর বলেন। কিন্তু ইহা কষ্টসাধ্য অর্থ। শ্যাম অর্থে কি বুঝায়, তাহা পরে বলা যাইতেছে। কিন্তু কে শ্রীরামচন্দ্রের নবদূর্ব্বাদলবর্ণ প্রথমে কল্পনা করিয়াছিলেন? বাল্মীকির

* অজন্টাগুহাচিত্রাবলীতেও এইরূপ সবুজ মানুষ দেখা যায়। গ্রিফিথ্‌স্ বলেন—

"As a curiosity it may be noted that some of the figures and animals are painted green. Not merely shaded with green tints, but solidly painted throughout in *terre verte*, the *sung sabz* of the Indian colourist. * * * All early literature is vague in colour nomenclature. Lot, according to an Arab authority, was of a green complexion ; and Krishna was blue and is always painted so. Indian poets, too, have from the earliest period recognised the existence of a greenish tinge on the faces of women and have sung its praises in many lyrics. As a matter of fact this tinge is common enough among the higher castes both Muhammedan and Rajput. The Ajanta artist in his downright fashion has taken the expressions of preacher or poet *au pied de la lettre*"

প্রবাসী-সম্পাদক।

বালকাণ্ডে ত একথা নাই। অন্য কোথাও আছে কি না, তাহা প্রবাসীর কোন পাঠক বা লেখক জানাইলে উপকৃত হইব। সংস্কৃত রামায়ণে না থাকিলে কৃত্তিবাস কি স্বয়ং কল্পনা করিয়াছিলেন? কালিদাস কি বলেন?

নবদূর্বাদলের বর্ণ কি শ্যাম? শ্যামবর্ণ বলিতে কৃষ্ণ বা নীলবর্ণ বুঝিয়া থাকি। হরিদ্বর্ণান্ধ ব্যক্তি দূর্বাদল শ্যামবর্ণ দেখে। সবুজকে নীল বলা অনেকের অভ্যাস। কিন্তু সেস্থলে সকলেই হরিদ্বর্ণান্ধ নহে। কেবল উপযুক্ত বর্ণজ্ঞানের ও বর্ণজ্ঞাপক শব্দের অভাবে কোন কোন লোক সবুজকে নীল বলে। কিন্তু হরিদ্বর্ণান্ধ ব্যক্তি সবুজরঙ্গ জানিতেই পারে না। তেমনই লোহিতবর্ণান্ধ, পীতবর্ণান্ধ, নীলবর্ণান্ধ ব্যক্তির নিকট লোহিত পীত নীলবর্ণ নাই। লোহিতহরিদ্বর্ণান্ধ ব্যক্তির সংখ্যা অধিক। পীতনীলবর্ণান্ধ অতি অল্প। লোহিতহরিদ্বর্ণান্ধের নিকট লাল ও সবুজ রঙ্গ একই প্রকার বোধ হয়। কাজেই সে সবুজ পাতার মধ্যে লাল ফুল হঠাৎ দেখিতে পায় না। অধিকন্তু তাহার চোখে উভয় বর্ণই এক প্রকার কৃষ্ণ বলিয়া বোধ হয়। এজন্য মনে হইয়াছে কোন লোহিতহরিদ্বর্ণান্ধব্যক্তি শ্রীরামকে নবদূর্বাদলশ্যাম বলিয়া থাকিবেন। শ্যামবর্ণ ধরিলে শ্রীরামচন্দ্র কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন এবং ইহাই সঙ্গত বোধ হয়। কারণ হরিদ্বর্ণ মনুষ্য এপর্য্যন্ত দৃষ্টিগোচর হয় নাই, এবং মনুষ্যের এরূপ বর্ণ হইতে পারেনা বলা যাইতে পারে। * শুনিয়াছি পঞ্চবটীবনে শ্রীরামের যে মূর্ত্তি আছে তাহা কৃষ্ণবর্ণ। সম্ভবত শ্রীরাম কৃষ্ণবর্ণ ছিলেন এবং কোন বর্ণান্ধ চিত্রকর তাঁহাকে হরিদ্বর্ণ ভাবিয়া থাকিবে। বঙ্গদেশের চিত্রকরেরা দশভুজার মহিষাসুরকেও হরিদ্বর্ণ করিয়া থাকে।

যাহা হউক, উক্ত ডাক্তারলেখক বরাহমিহির ভুল বুঝিয়াছেন। বরাহ রক্তহরিৎনীল বর্ণ বলেন নাই; তৎপরিবর্ত্তে পাটল (শ্বেতরক্ত) পীত নীল বলিয়াছেন। শুধু বরাহ কেন, নারদও ইন্দ্রচাপে ঐ তিনবর্ণ দেখিয়াছিলেন। কিংবা ইহাঁরাই বা কেন, আমাদের প্রাচীনেরা শ্বেত রক্ত পীত কৃষ্ণ (বা নীল)— এই চারিটি মূলবর্ণ গণনা করিতেন, এবং ঐ চারিটিবর্ণের বিভিন্ন যোগে বহুবিধ সঙ্করবর্ণের উৎপত্তি মনে করিতেন। ঐ চারি মূলবর্ণ ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণ নামেও অভিহিত হইত।

নীল ও কৃষ্ণে প্রভেদ করা হইত না। তাই শ্রীকৃষ্ণের ও কালীর বর্ণ কেহ বা নীল কেহ বা কাল করিয়া থাকেন। অমরকোষের "কৃষ্ণেনীলাসিতশ্যামকালশ্যামলমেচকা" সকলেরই মনে আছে।

আমরা আজকাল 'এত লেখা পড়া শিখিয়াও' বর্ণজ্ঞাপন সময়ে শব্দের অভাবে চিন্তিত হই। কিন্তু প্রাচীনেরা এক প্রকৃষ্ট উপায়ে অসংখ্য সঙ্করবর্ণ অক্লেশে জানাইতে পারিতেন। উদ্ভিজ্জাদি প্রাকৃত পদার্থের অসংখ্য প্রকার বর্ণ দেখা যায়। সুতরাং পদার্থবিশেষের নামদ্বারা নির্দ্দিষ্ট বস্তুর বর্ণজ্ঞাপন সহজ। রক্তবর্ণ কত প্রকার আছে, তাহা পুরাতন শাস্ত্র হইতে বলিতেছি। বন্ধূক (বা বাধূলী), জবা, কিংশুক, অশোক, কুসুম্ভ (বা কুসুম), কোকনদ, কুঙ্কুম (বা জাফরান), নাগরঙ্গ, দাড়িমবীজ, গুঞ্জা (বা লাল কুঁচ), বিদ্রুম (বা প্রবাল), ইন্দ্রগোপ (বা মকমলী পোকা), লাক্ষারস (বা আলতা), চকোর পুংস্কোকিল সারস পক্ষিনেত্র, শোণিত, সিন্দূর, হিঙ্গুল, তাম্র, রক্তাম্বর (সিঁদুরে মেঘ), অরুণ, ইত্যাদি। এইরূপে যে কোন সঙ্করবর্ণ প্রকাশ করিতে কোন অসুবিধা নাই।

এইরূপ প্রাকৃত পদার্থের সাহায্য ব্যতীত কয়েকটি বর্ণ জ্ঞাপনের নিমিত্ত আবশ্যক শব্দই আছে। অমরকোষে এই কয়েকটি আছে। যথা, শ্বেত, পাণ্ডু (yellowish), ধূসর (grey), কৃষ্ণ (blue or black), পীত, হরিত, রক্ত, অরুণ (reddish), পাটল (pink), কপিশ (dark green), ধূম্র বা ধূমল (violet), কপিল বা পিঙ্গল (orange)। এতদ্ভিন্ন আরক্ত, অতিরক্ত, রক্তপীত, রক্তনীল ইত্যাদি ত আছেই। অগ্নিপুরাণে দ্বাদশ আদিত্যের যে বর্ণ বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে কৃষ্ণ, রক্ত, ঈষদ্রক্ত, পীত, পাণ্ডর, সিত, কপিল, শুকাভ, ধূম্র, নীল দেখিতে পাই। অতএব সূর্য্যকিরণের সপ্তবর্ণের নাম করিতে হইলে রক্ত, কপিল, পীত, হরিৎ, নীল, মহানীল, ধূম্র বলা চলে।

কিন্তু আমরা দ্বন্দ্বর বর্ণের বস্তুই অধিক দেখিতে পাই। সৌরকরের মূল বর্ণের বস্তু কদাচিৎ দেখিতে পাই। এই

* পাঠকগণ দেখিবেন, ইহার আগের উদ্ধৃত পাদটীকায় গ্রিফিথ্স্ বলিতেছেন যে উচ্চশ্রেণীর রাজপুত ও মুসলমানগণের মুখে হরিতের আভা আছে। প্রবাসী-সম্পাদক।

সকল অসংখ্য সঙ্করবর্ণ উপরের কয়েকটি শব্দদ্বারা কদাপি প্রকাশ করিতে পারা যায় না। এবিষয়ে আধুনিক বিজ্ঞান-ও অগ্রসর হইতে পারে নাই। মনে করুন, রক্ত ও ও নীল যোগে অসংখ্য প্রকার রক্তনীলের সৃষ্টি হইতে পারে, কিন্তু সে সকল বর্ণ প্রকাশের নিমিত্ত ভাষায় শব্দ কই? বাঙ্গালা ও সংস্কৃত ভাষার কথা নহে, ইংরাজি ভাষাতেই শব্দ কই? মনে হইতেছে, একবার হার্বাট স্পেনসার এক প্রকার বর্ণসংজ্ঞা প্রস্তাব করিয়াছিলেন। নাবিকেরা যেমন পূ-পূ-দ ইত্যাদি দ্বারা চারি দিক্ যোগে অনেক বিদিক্ প্রকাশ করিয়া থাকে, স্পেন্সারের বর্ণসংজ্ঞাও কতকটা সেইরূপ। যথা, রক্ত, রক্ত-নীল, রক্তরক্ত-নীল, রক্তনীল-রক্ত, রক্তনীল-নীল, নীল, ইত্যাদি। এইরূপ, অন্যান্য বর্ণ লইয়া বহুবিধ সঙ্করবর্ণ প্রকাশের শব্দ পাওয়া যাইতে পারে।

কিন্তু শব্দ থাকিলেই হয় না। বিভিন্ন বর্ণ বুঝিতে পারে কত জন? যেমন সারিগামা সাতটা স্বরের প্রভেদ বুঝা সকলের কর্ম্ম নহে, তেমনই রক্তাদি বর্ণের প্রভেদও সকলে বুঝিতে পারে না। সঙ্গীতব্যবসায়ী স্বরের পার্থক্য বুঝেন, চিত্রব্যবসায়ী বর্ণের পার্থক্য বুঝেন। অন্যদিগের পক্ষে এই সকল প্রভেদজ্ঞান সহজ হইতে পারে না।

মূল ও সঙ্করবর্ণের প্রভেদের পর পূরকবর্ণের (complementary colours) জ্ঞান। এই জ্ঞান প্রাচীনদিগের ছিল কি না? চিত্রাঙ্কণকলায় কি প্রমাণ আছে, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণের পীতবসনে দেহের নীলবর্ণের পূরণ হইয়াছে। লক্ষ্মীর শ্বেতবর্ণে নীলাম্বর শোভা পায়। মহিষাসুরের কৃষ্ণহরিৎ বর্ণে রক্তবসন, চিত্রকরের পূরকবর্ণজ্ঞানের প্রমাণ। চম্পকগৌরীর নীলাম্বরপ্রীতি বুঝিতে পারি। অতএব পূরকবর্ণবিজ্ঞান পাঠ না করিলেও কোন্ রঙ্গের সহিত কোন রঙ্গ মানায়, তাহা গ্রাম্য নিরক্ষরা ঘরনীরাও বুঝেন। সুতরাং এ জ্ঞানটা এদেশে অল্পাধিক আছে বলা যাইতে পারে।

বৌদ্ধদিগের আমেরিকাবিষ্কার।

বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারক, পরিব্রাজক, ভিক্ষু সন্ন্যাসীদিগের অধ্যবসায় ইতিহাসপ্রসিদ্ধ। ভারত হইতে বুদ্ধশিষ্যগণ বুদ্ধের জ্ঞানদীপ্ত ধর্ম্মমত প্রচার করেন নাই, এশিয়া ভূখণ্ডে এরূপ জনপদ বিরল। আফগানিস্থান, তিব্বত, মধ্য এশিয়া, ব্রহ্মদেশ, চীন, লঙ্কা, সুমাত্রা ও যবদ্বীপ, এবং এমন কি সুদূর জাপানরাজ্য পর্য্যন্ত তাঁহাদের গতি অব্যাহত ছিল। খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে পাঁচ জন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী মধ্য এশিয়ায় এই ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন। সেই শতাব্দীরই শেষাংশে কাবুলের বৌদ্ধ শাসনকর্ত্তা চীন সম্রাটকে লিখিতেছেন যে তিনি আমেরিকায় যাইয়া বৌদ্ধধর্ম্মকে দৃঢ় স্থাপন করিয়া আসিয়াছেন।

প্রায় একবৎসর হইল অধ্যাপক ফ্রায়ার হার্পারের মাসিক পত্রে পুরাকালে আমেরিকার মেক্সিকো রাজ্যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের বৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়া জগৎকে বিস্মিত করিয়াছেন। জাপান হইতেই বৌদ্ধ প্রচারকগণ বোধ হয় আমেরিকায় যাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কারণ চীন বা জাপান হইতে আমেরিকা খুব নিকট, এবং এখনও অনেক চীন ও জাপানি আমেরিকায় উপনিবেশ স্থাপন করিতেছেন। মেক্সিকো রাজ্যের সর্ব্বত্র বৌদ্ধযুগের ভাস্কর্য্য ও স্থাপত্যের নিদর্শন সকল প্রচুর পরিমাণে বিদ্যমান আছে। অধ্যাপক ফ্রায়ার তদ্দেশের জনপদ সকলের নাম হইতেও তাঁহার মত সমর্থনের উপকরণ সংগ্রহ করিয়াছেন।* গোয়াটিমালা (Guatimala) = গৌতমালয় Oaxaca, Zacatecas, Sacatepec, Zacatland, Sacapulas, প্রভৃতি নামে তিনি শাক্য নামের ভগ্ন নিদর্শন দেখিয়াছেন। হওয়াও সম্ভব। কতকগুলি ত স্পষ্টই সাক্ষ্য দিতেছে; এবং অনেকসময় 'স' ভাষান্তরিত হইয়া 'জ' বা 'হ' বা 'থ' হয়। অতএব Zaca = Saca হওয়া বিচিত্র নহে। পালেঙ্ক নামক স্থানে একটি বুদ্ধমূর্ত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে। তাহাতে "Chacomol" বা শাক্যমুনি লিখিত আছে। তিব্বতের মত মেক্সিকো দেশেরও পুরোহিত লামা (Tlama) নামে পরিচিত। ইহা ভিন্ন বহু পুরাতন মঠ, মন্দির, খোদিত শিলাপট্ট এবং বুদ্ধ ধর্ম্ম, সঙ্ঘ প্রভৃতির প্রতিমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। স্পানিয়ার্ডগণ যখন আমেরিকা আবিষ্কার করেন, তখন তাঁহারা বর্ব্বর দেশসমূহের মধ্যে মেক্সিকোর সভ্যতা দেখিয়া

* John Fryer, L.L.D., Professor of Oriental Languages and Literature, University of Califorina

আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। তাঁহারা তখন বুঝেন নাই যে ইহা ভারতের বা এশিয়ারই অযাচিত দান। অধ্যাপক ফ্রায়ারের আবিষ্কার যদি সর্ব্বগ্রাহ্য সত্য হয়, তাহা হইলে কলম্বস প্রভৃতি প্রসিদ্ধ আবিষ্কারকের যশের অনেকটা অংশ এশিয়ার বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদিগকে ছাড়িয়া দিতে হইবে।

চৈন ঐতিহাসিক মা-তুয়ান্-লিন্ বলেন যে, 'হুই শেন [হয় সেন ?] নামক কফিন্ (কাবুল)-নিবাসী একজন বৌদ্ধ পরিব্রাজক ৪৯৯ খৃষ্টাব্দে ফুসাং রাজ্য হইতে সম্রাট যুঙ্গ যুআনের দরবারে আসিয়া নানাবিধ উপঢৌকন দিয়াছিলেন। সম্রাট্ যুকি নামক একজন উজিরকে হুই শেনের ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখিয়া লইতে আদেশ করেন'। সেই লিখিত বর্ণনা আজ পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে। তাহাতে হুই শেন বলিয়াছেন যে সম্রাট তামিঙের রাজত্ব সময়ে (৪৫৮ খৃষ্টাব্দে) কাবুল বৌদ্ধ ধর্ম্মের একটি প্রধান আড্ডা ছিল। তাহার পূর্ব্বে সেখানকার পাঁচটি বৌদ্ধ ভিক্ষু ফুসাং রাজ্যে যাইয়া বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই রাজ্য চীন হইতে ২০০০০ লি অর্থাৎ ৬৫০০ মাইল দূরবর্ত্তী। উহা ১০০০০ লি বা ৩২৫০ মাইল চৌড়া এবং সমুদ্রবেষ্টিত।

হুই শেন এক জাতীয় বৃক্ষ হইতে ঐ দেশের ফুসাং বা ফুসু নাম রাখিয়াছিলেন *। ফ্রায়ার সাহেব মেক্সিকোর আগেবি (agave) গাছের সহিত হুই শেন বর্ণিত ফুসাং গাছের সাদৃশ্য দেখিয়াছেন। ঐ গাছের ছালে রেশমের মত অথচ খুব শক্ত একপ্রকার তন্তু হয়; হুই শেন অন্যান্য নানা উপকরণের সহিত তাহাও চীন সম্রাট্‌কে উপহার দিয়াছিলেন। ফুসাং প্রদেশের তাম্র, লৌহ, স্বর্ণ ও রৌপ্যের প্রাচুর্য্যসম্বন্ধে হুই শেন সাক্ষ্য দিয়াছেন। কলম্বসও আমেরিকা হইতে প্রচুর স্বর্ণ রৌপ্য স্পেনদেশীয় রাজাকে উপহার দিবার জন্য লইয়া আসিয়াছিলেন। সেখানে প্রাচুর্য্যহেতু সোণা রূপার কোনই মূল্য ছিল না। কলম্বস কাচের চাকচিক্যে অধিবাসীদিগকে ভুলাইয়া প্রচুর স্বর্ণ সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছিলেন।

এই ফুসাং রাজ্য যে মেক্সিকো, তৎপক্ষে আরও প্রমাণ বিদ্যমান আছে। মেক্সিকো দেশে একটি প্রবাদ আছে যে



মেক্সিকো নগরস্থ জাদুঘরে রক্ষিত বৌদ্ধপ্রতিমূর্ত্তি সমূহ।

একজন শ্বেতকায় দীর্ঘপরিচ্ছদধারী মহাপুরুষ সে দেশে গিয়া নীতি ও সংযম শিক্ষা দিয়াছিলেন—তাঁহার নাম উই শি পেকোকো। এই নাম হুই শেন ভিক্ষুর দেশীয় পরিবর্ত্তন হইতে পারে। মেক্সিকোর আর একজন মহাপুরুষের (Quetzalcoatl) সম্বন্ধেও কিংবদন্তি আছে। ইঁহাদের শিক্ষা ও প্রচারের যেরূপ বর্ণনা পাওয়া যায়, তাহা হইতে ইঁহাদিগকে বৌদ্ধ বলিয়াই অনুমান হয়।

চীন বা কাবুলের পরিব্রাজকগণ দেশদেশান্তরে ধর্ম্মপ্রচার করিতেন, উপকূলবর্ত্তী দ্বীপসকলে যাইয়া তৎ-দ্বীপবাসীদিগের নিকট অন্যান্য দ্বীপের সংবাদ পাইতেন। এই-

* প্রাচীন চীন কাব্যে 'ফুসাং রাজ্য' 'পূর্ব্ব-রাজ্যের সমার্থকরূপে ব্যবহৃত হইত। বুদ্ধের চৈন নাম ফো বা ফোটো হইতেও ঐ নাম হওয়া অসম্ভব মনে হয় না।

রূপে দ্বীপ হইতে দ্বীপান্তরে যাইয়া তাঁহারা বহুদূর সমুদ্রস্থিত দ্বীপসকলেও ধর্ম্মপ্রচার করিয়াছিলেন। এইরূপ সন্ধান পাইয়া তাঁহাদের আমেরিকায় উপস্থিত হওয়া অসম্ভব নয়। আমেরিকার আলাস্কা প্রদেশ এশিয়া বা চীনের নিকটবর্ত্তী। আলাস্কা হইতে মেক্সিকো পর্য্যন্ত প্রশান্ত মহাসাগরোপকূলস্থ বহু প্রদেশে বৌদ্ধসভ্যতার অনেক ভগ্ন নিদর্শন স্পানিয়ার্ড-গণ দেখিয়াছিলেন এবং আজিও তাহার কিছু কিছু অবশিষ্ট আছে।

স্থানীয় নামসকলও অনেক পরিচয় প্রদান করিতেছে; যথা Guatemala, Huatama, ইত্যাদি। মেক্সিকোর প্রধান পুরোহিতের নাম 'টেশাক্কা' বা শাক্যপুরুষ—ইহা শাক্য-পুরুষের রূপান্তর মনে করা কষ্টকল্পনা নহে। আর একটি পুরোহিতের নাম ছিল কোয়াতু শাকা। ইহাকেও গৌতম ও শাক্য নামের মিশ্রণরূপে গ্রহণ করা যাইতে পারে। এত-গুলি প্রমাণের সাক্ষ্য অগ্রাহ্য করিয়া এই মিল গুলিকে আকস্মিক বলিয়া অগ্রাহ্য করা বোধ হয় দুঃসাহসের কার্য্য হইবে।

এতদ্ব্যতীত বৌদ্ধযুগের শিলালিপি, স্থাপত্যশিল্প, মূর্ত্তি প্রভৃতিও মেক্সিকো হইতে আবিষ্কৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে কতকগুলির নাম লিখিত হইল। (১) বৌদ্ধ মন্দির (২) দীর্ঘপরিচ্ছদধারী বৌদ্ধ পুরোহিত (৩) জোড়াসনে উপবিষ্ট বুদ্ধমূর্ত্তি, (৪) গণেশমূর্ত্তি, (৫) রাহুমূর্ত্তি প্রভৃতি।

হুই শেন যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহাতে যে তিনি বা তৎপূর্ব্বগামী পঞ্চভিক্ষুই সর্ব্বপ্রথম সেই দেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন তাহা মনে হয় না। তাঁহাদেরও পূর্ব্বগামী কেহ ছিলেন বোধ হয়। কিন্তু খৃষ্টপূর্ব্ব ২১৩ সনে সম্রাট শি-হোয়াঙ্ টির রাজত্বসময়ে চীনের সমস্ত দলিলপত্র ও লিখিত যাবতীয় কাগজ বিনষ্ট করা হইয়াছিল। তাহাতে সে সকল বর্ণনা নষ্ট হইয়া গিয়া থাকিবে। কিন্তু উভয় তারিখের মধ্যে ব্যবধান অনেক। এজন্য উভয় তারিখের মধ্য কালেরও নিদর্শন থাকা উচিত ছিল। তাহা না থাকায় কিঞ্চিৎ সন্দেহের কারণ উপস্থিত হইয়াছে।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, বি, এ।

বাসবদত্তা।

কানন-অঞ্চলবৃতা অচলশায়িনী
নির্ঝরিণী-সম, বক্ষে সদা লুক্কায়িত
প্রেমের নির্ঝর মম স্বতঃপ্রবাহিণী,
চরণযুগল তাঁর করিল সিঞ্চিত।

সুখের মন্দির তাঁর করিনু গঠন
নবীন যৌবন দিয়া; শুভ্র সুকোমল
অনুরাগ বিথারিয়া রচিনু শয়ন
সোহাগ-পর্য্যঙ্কোপরি। সকলি বিফল?

কি কুক্ষণে সাগরিকা প্রবেশিলি পুরে,
হরিলি জীবনরত্ন! কি হবে জীবনে?
আমার প্রেমের হার বিলুণ্ঠিত দূরে;
নব হার গলে তাঁর, সহিব কেমনে?

ছিল এই বক্ষভরা শুধু প্রেমরাশি,
—প্রেম রমণীর প্রাণ—সে প্রেমে যতনে
গড়িনু মূরতি তাঁর। তাই ভালবাসি
জীবনমরণ ভুলি জীবনমরণে।

না ভাঙিলে প্রাণ মম, না বধিলে মোরে,
পারে কি সেবিতে কেহ সে চারু চরণ?
সাগরিকা! সাগরিকা! ভালবাসি তোরে;
তুই কি হরিলি মোর জীবনরতন?

নব ফুল্ল রক্তাধর, অঙ্গে তরুণতা,
শুধু সেই প্রলোভনে সত্য কি ভুলিবে
অপার্থিব প্রেম তুমি, প্রাণের দেবতা?
সমুজ্জল ধূলিকণা স্বর্ণে পরাজিবে?

অফুরন্ত বহে যথা সুখিনী তটিনী
ঢালি সিন্ধুবক্ষে নিত্যসঞ্চিত জীবন,
বহিল তেমতি মম প্রীতিপ্রবাহিণী।
অতুল রমণীজন্ম, ভাবিনু তখন।

ওইরে বারিধি হোথা, তটিনী হেথায়!
কে আনিল মাঝে তার মরুর প্রান্তর?
হে সিন্ধু! তরঙ্গে দলি সে মরু হেলায়,
লহগো তটিনীধারা সুনীল সুন্দর।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

অনুভূতি।

আজি হৃদয়মন্দির ভরি মৌন আরতি
তব বন্দনে উঠিছে জাগি গো;

আজি অগীত রাগিণী যত গুঞ্জরি উঠিছে
তব লুকান পরশ লাগি গো।
মম মর্ম্মের তটে অরুণ আলোকে আজি
নূপুর উঠিছে বাজি গো,
ওগো শত স্বর্ণহাসে কত স্বরগের শোভা
উঠিছে অন্তরে রাজি গো।
আজি শ্যাম বসন্ত জেগেছে কুঞ্জে,
ঝরিছে সেফালি পুঞ্জে পুঞ্জে,
হৃদয়দ্বারে রাগিণী গুঞ্জে,—
সুন্দর সোহাগ ছন্দে।
আজি বাঁশরী বাজে সপ্তম সুরে
চির-বিরহে—মিলন তরে,
মন্দ মলয়া সুরভি-ভারে
লুটিয়া চরণ বন্দে।
আজি গুপ্ত-মর্ম্ম মাঝে কত সুপ্ত বাসনা,
কি মন্ত্র পরশে জেগেছে গো,
আজি ব্যর্থ সাধনা যত করিতে অর্চ্চনা
তোমারি চরণ ঘিরেছে গো।
আজি এ নির্জ্জন মন্দিরে ওগো নূতন-সুন্দর,
বরণ ডালা দিব চরণে ;
আমি লুকান রতন দিয়ে যতনে পূজিব
প্রেমরঞ্জিত শুভ নয়নে।

শ্রীমণীন্দ্রনাথ বসু।

হিন্দুরসায়নের ইতিহাস। *

বর্ত্তমানকালেও যে ভারতবাসিগণ স্বাধীনভাবে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিতে সমর্থ, তাহা যে দুই এক জন প্রতিভাশালী ব্যক্তির গবেষণাদ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে, বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাহার মধ্যে এক জন। সুশিক্ষিত ভারতবাসী মাত্রেই জানেন যে তিনি অনেকগুলি নূতন যৌগিক পদার্থ আবিষ্কার করিয়াছেন। প্রাচীন হিন্দুগণ রসায়ন-বিজ্ঞানে কতদূর উন্নতি করিয়াছিলেন, এবং তাহার কতটুকুই বা স্বাধীন ভাবে করিয়াছিলেন, তাহা নির্ণয় করিবার জন্য রায় মহাশয় অনেক বৎসর ধরিয়া নানা দুষ্প্রাপ্য চিকিৎসা ও রসায়নবিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থ সংগ্রহ ও অধ্যয়ন করিতেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকে এই সকল গ্রন্থ-বর্ণিত অনেক রাসায়নিক পরীক্ষা (experiment) নির্ব্বাহ ও বহুবিধ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধাদি বিশ্লেষণ করিতে হইয়াছে। তদ্ভিন্ন তিনি অনেক ইংরাজী, ফরাশিশ, জর্ম্মান ও লাটিন ভাষায় লিখিত গ্রন্থও অধ্যয়ন করিয়াছেন। এই কার্য্যের জন্য তাঁহাকে গুরুতর পরিশ্রম এবং প্রচুর অর্থব্যয় করিতে হইয়াছে। তিনি বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্টের নিকট এজন্য অর্থ-সাহায্য পাইয়াছিলেন, কিন্তু এই কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় তাঁহাকে অর্থোপার্জ্জনের অনেক বৈধ উপায় ত্যাগ করিতে হইয়াছে, এমন কি বলিতে গেলে হাতের কড়ি পায়ে ঠেলিতে হইয়াছে। এই স্বার্থত্যাগ ও বহুবৎসরব্যাপী পরিশ্রমের ফলে তিনি হিন্দুরসায়নের ইতিহাসের প্রথম খণ্ড সম্প্রতি বাহির করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

পুস্তকখানি ইংরাজী ভাষায় লিখিত ; রয়েল আটপেজী আকারে মুদ্রিত। ইহাতে একটি ৭৯ পৃষ্ঠাব্যাপী নানাবিধ অভিনব গবেষণাপূর্ণ উপক্রমণিকা আছে। যাঁহারা রাসায়নিক বা চিকিৎসক নহেন, তাঁহারাও এই উপক্রমণিকাটি সহজে পড়িতে ও বুঝিতে পারিবেন, এবং ইহা হইতে নানাবিধ জ্ঞান লাভ করিবেন ও তজ্জনিত আনন্দের অধিকারী হইবেন। মূল পুস্তক খানি ১৪৭ পৃষ্ঠাব্যাপী। ইহারও অধিকাংশ সাধারণ পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন। এতদ্ভিন্ন ইহাতে ৪১ পৃষ্ঠা মূল সংস্কৃত শ্লোক এবং বহুসংখ্যক প্রাচীন রাসায়নিক যন্ত্রের চিত্র আছে। চিত্রগুলির খোদাই পরিষ্কার এবং মুদ্রাঙ্কণ অতি সুন্দর হইয়াছে। পুস্তক খানি উৎকৃষ্ট মোটা কাগজে মুদ্রিত। ছাপা চেরীপ্রেসের সুখ্যাতির উপযুক্তই হইয়াছে। প্রফুল্লবাবুর মত বিজ্ঞানী কর্ত্তৃক লিখিত পুস্তকের সারবত্তার প্রশংসা করা বাহুল্য মাত্র। শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেরই এই পুস্তক পাঠ করা উচিত।

গ্রন্থকার ঋগ্বেদের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া হিন্দুদের রসায়নের ক্রমোন্নতি দেখাইয়াছেন। বহু প্রাচীন কালেও যে হিন্দুগণ অনেক ধাতুর ব্যবহার জানিতেন, তিনি তাহা দেখাইয়াছেন। তিনি অনেক অভিনব তত্ত্ব উদ্ঘাটন করিয়াছেন। প্রসঙ্গতঃ এমন অনেক কথা আসিয়া পড়িয়াছে, যাহা অতিশয় কৌতূহলোদ্দীপক। বৈদিক যুগের হিন্দুদিগের রাসায়নিক জ্ঞানের বিষয় লিখিতে

* A History of Hindu Chemistry from the Earliest Times to the Middle of the Sixteenth Century, A. D., with Sanskrit Texts, Variants, Translation and Illustrations. By Praphulla Chandra Ray, D. Sc,. Profesor of Chemistry, Presidency College Calcutta. Vol. I., Calcutta : Prithwis Chandra Ray, 8 College Square. 1902. Price Rs 5.

লিখিতে তিনি বিশ্‌পালা নাম্নী এক কন্যার উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার একটি পা কাটিয়া যাওয়ায় দেবচিকিৎসক অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে একটি লোহার পা দিয়াছিলেন। ইহা হইতে ঋগ্বেদের সময়ে আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা ধাতুবিদ্যাদিতে কতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহার আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ বিষয়ে ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণয়ের পক্ষে যথেষ্ট উপকরণ বিদ্যমান নাই।

অনেক ইউরোপীয় পণ্ডিত এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেন যে প্রাচীন হিন্দুগণের যাহা কিছু জ্ঞানৈশ্বর্য্য ছিল, তাঁহারা তাহা হয় গ্রীক, নয় আরব, নয় ব্যাবিলনীয়দিগের নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন। অবশ্য মোক্ষমূলর, ম্যাকডনেল, থিব, প্রভৃতি সুধীবর্গ এইরূপ পক্ষপাতদোষদুষ্ট নহেন। রায় মহাশয় দেখাইয়াছেন যে হিন্দুগণ যে যুগে রসায়নশাস্ত্রে যতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন, আরবেরা বা কোন ইউরোপীয় জাতি সেইযুগে ততদূর উন্নতি করিতে পারেন নাই।* বরং তিনি বিশদরূপে প্রমাণ করিয়াছেন যে আরবগণ সাক্ষাৎসম্বন্ধে রসায়নের জ্ঞান হিন্দুদিগের নিকট হইতে লাভ করিয়াছিলেন। তিনি ইহাও দেখাইয়াছেন যে সম্ভবতঃ গ্রীকগণও এ বিষয়ে পরোক্ষভাবে হিন্দুদিগের নিকট ঋণী। অবশ্য বর্ত্তমান পাশ্চাত্য রসায়ন প্রাচীন হিন্দু রসায়ন অপেক্ষা শতসহস্রগুণ উন্নত, বলা বাহুল্য।

গ্রন্থের এই প্রথমখণ্ডে তিনি রসরত্নাকর, রসার্ণব এবং রসরত্নসমুচ্চয় এই তিন খানি পুস্তক হইতে রসায়ন ও তৎসম্পৃক্ত বিদ্যাবিষয়ক শ্লোক সংগ্রহ ও অনুবাদ করিয়াছেন। তিনি রসরত্নসমুচ্চয়েরই অধিক ব্যবহার করিয়াছেন। এইরূপ করিবার কয়েকটি কারণের মধ্যে একটির উল্লেখ করিতেছি—

"[It is a systematic and comprehensive treatise on materia medica, pharmacy and medicine. Its methodical and scientific arrangement of the subject matter would do credit to any modern work, * * *.]"

ইহার ভাবার্থ এই যে এই পুস্তক খানির সুশৃঙ্খল ও বৈজ্ঞানিক নিয়মসঙ্গত বিষয়বিন্যাস আধুনিক যে কোন গ্রন্থের পক্ষে গৌরবের বিষয় হইত। এই গ্রন্থখানি খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যে রচিত হয়।

হিন্দুরসায়ন এবং অন্যান্য অনেক বিষয়ে প্রফুল্ল বাবুর পুস্তক হইতে অনেক বিষয় শিখিতে পারা যায়। স্থানাভাবে তৎসমুদয়ের উল্লেখ করিতে পারিলাম না। কনাদ ঋষির ধ্বনিবিস্তার (propagation of sound) বিষয়ক মত বাস্তবিকই বিস্ময়কর। আলোক ও উত্তাপ যে একই বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন অবস্থা বা রূপ, তাহাও তিনি জানিতেন। সুশ্রুতের ক্ষারকর্ম্মাধ্যায়ে যে সকল প্রক্রিয়া বর্ণিত আছে, তৎসম্বন্ধে প্রফুল্ল বাবু বলেন—

"The process of lixiviating the ashes and rendering the lye caustic by the addition of lime leaves very little to improve upon, and appears almost scientific compared to the crude method to which M. Berthelot pays a high tribute."

ডামাস্কাসের তরবারি পুরাকালে জগদ্বিখ্যাত ছিল; কিন্তু পারস্যদেশের লোকেরা ভারতবর্ষ হইতে এবং আরবেরা পারসীকদিগের নিকট হইতে এইরূপ উৎকৃষ্ট তরবারি নির্ম্মাণ বিদ্যা শিক্ষা করেন। হিন্দুদের ধাতুবিদ্যাবিষয়ক জ্ঞান ও ধাতব শিল্পনৈপুণ্য সম্বন্ধে গ্রন্থকার স্বয়ং যাহা বলিয়াছেন এবং ফর্গুসন সাহেবের যে মত উদ্ধৃত করিয়াছেন, আমরা স্থানাভাবে এখানে তাহা সন্নিবেশিত করিতে পারিলাম না। পাঠকগণকে গ্রন্থের ৮৪—৮৫ পৃষ্ঠা পড়িতে অনুরোধ করি।

প্রাচীন ভারতে দ্বিজেরাও নানা কলার চর্চ্চা করিতেন ও তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। বাৎসায়নরচিত কামসূত্রে নিম্নলিখিত কলাগুলির নাম আছে—সুবর্ণরত্নপরীক্ষা, ধাতুবাদ, মণিরাগাকরজ্ঞান। শুক্রনীতিসারেও "পাষাণধাত্বাদিদৃতিস্তদ্‌ভস্মীকরণ" "ধাত্বৌষধীনাং সংযোগক্রিয়াজ্ঞানং," ধাতুসাঙ্কর্য্যপার্থক্যকরণ, ক্ষারনিষ্কাশনজ্ঞান, প্রভৃতি কলার উল্লেখ আছে। সুশ্রুতমতে শবব্যবচ্ছেদ ব্যতিরেকে কেহ অস্ত্রচিকিৎসায় পারদর্শিতা লাভ করিতে পারে না। তিনি প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞানের গৌরব ঘোষণা করিয়াছেন। অথচ মনু বলেন, শব স্পর্শ করিলেই ব্রাহ্মণের শরীর কলুষিত হয়। প্রবাসীর আগামী সংখ্যায় মুদ্রিতব্য বৈশ্যবর্ণ নামক প্রবন্ধে এইরূপ আরও ব্যবস্থার উল্লেখ দৃষ্ট

*দৃষ্টান্তস্বরূপ নিম্নলিখিত বাক্যটি উদ্ধৃত করিতেছি—

"The knowledge in practical chemistry prevalent in India in the 12th and 13th centuries A. D., and perhaps earlier, such as we are enabled to glean from *Rasarnava* and similar works, is distinctly in advance of that of the same period in Europe." P. lvi.

হইবে। এই সকল কারণে ভারতবর্ষে বিজ্ঞান ও শিল্পের অবনতি হইয়াছে। গ্রন্থকার সত্যই লিখিয়াছেন—

"The arts being thus relegated to the low castes and the professions made hereditary, a certain degree of fineness, delicacy and deftness in manipulation was no doubt secured, but this was done at a terrible cost. The intellectual portion of the community being thus withdrawn from active participation in the arts, the *how* and *why* of phenomena—the co-ordination of cause and effect—were lost sight of—the spirit of enquiry gradually died out among a nation naturally prone to speculation and metaphysical subleties and India for once bade adieu to experimental and inductive sciences. Her soil was rendered morally unfit for the birth of a Boyle, a Descartes or a Newton and her very name was all but expunged from the map of the scientific world."

বঙ্গদেশে স্বর্ণালঙ্কার নির্ম্মাণ কার্য্যে কিপ্রকারে স্বর্ণের অপচয় হয় শ্রীযুক্ত জ্ঞানশরণ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের লিখিত তদ্বিষয়ক একটি প্রবন্ধের অধিকাংশ বর্ত্তমান পুস্তকে উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহাতে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের অধ্যবসায় ও অনুসন্ধিৎসার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি হিসাব করিয়া দেখিয়াছেন যে শুধু কলিকাতাতেই বৎসরে ১৫।১৬ লক্ষ টাকার সোণা নষ্ট হয়। যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে রসায়ন শিক্ষা করেন, তাঁহারা "জমক" ক্রয় করিয়া বৈজ্ঞানিক উপায়ে উহা হইতে সোণা বাহির করিলে অল্পই অপচয় হয়, অথচ তাঁহাদিগকেও চাকরীর জন্য লালায়িত হইতে হয় না।

এই গ্রন্থে যে সকল যন্ত্রের চিত্র আছে, তন্মধ্যে প্রফুল্লবাবু অনুগ্রহ করিয়া আমাদিগকে কোষ্ঠী যন্ত্র ও বিদ্যাধর যন্ত্রের চিত্র প্রবাসীতে প্রকাশ করিতে অনুমতি দিয়াছেন। বিদ্যাধর যন্ত্রদ্বারা হিঙ্গুল হইতে পারদ নিষ্কাশন করা যায়। চুল্লীর উপর একটি পাত্রে হিঙ্গুল রাখিয়া জ্বাল দিতে হয়। এই পাত্রটির উপর একটি জলপূর্ণ পাত্র ঢাকা দিতে হয়। হিঙ্গুল হইতে পারদ বাষ্পাকারে উড়িয়া উপরের হাঁড়িটির তলায় গিয়া লাগে। কিন্তু উহা জলপূর্ণ বলিয়া তলা ঠাণ্ডা থাকায় পারদবাষ্প ঘনীভূত হইয়া বিন্দু বিন্দু আকারে ঐ তলায় লাগিয়া থাকে। চিত্রে ইহা পরিষ্কার ভাবে দেখান হইয়াছে। কোষ্ঠীযন্ত্র ধাতুসত্ত্বনিপাতনার্থ ব্যবহৃত হইত। রসক [দুর্দ্দুর ও কারবেল্লক নামক দুই শ্রেণীতে বিভক্ত] হইতে দস্তা বাহির করিবার জন্য এই যন্ত্র ব্যবহৃত হইত। একটি জলপূর্ণ পাত্রের মুখ একটি ছিদ্রবিশিষ্ট বাটী দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া, তাহার উপর, কয়েকটি নির্দ্দিষ্ট বস্তুর সহিত মিশ্রিত রসকপূর্ণ মুচি উল্টাইয়া রাখিতে হইবে। মুচির মুখেও ছিদ্র আছে। মুচির চারি পাশে ঘুলকাষ্ঠের আগুন দিয়া জ্বাল দিলে জলপাত্রে যে বিন্দু বিন্দু বস্তু পড়িবে, তাহাই দস্তা।

আমাদের বিশ্বাস এই গ্রন্থদ্বারা দেশের মুখ উজ্জ্বল হইবে। কিন্তু সে দেশ বর্ত্তমান ভারতবর্ষ নয়, প্রাচীন ভারত। আমরা যখন প্রাচীন ভারতের গৌরবে উৎফুল্ল হই, অহঙ্কৃত হই, তখন আমরা ভুলিয়া যাই, যে আমরা সেই প্রাচীন হিন্দুজাতি নহি। আমরা সেই জাতি হইতে উদ্ভূত কিন্তু অধঃপতিত। যদি আমরা প্রাচীন আর্য্যগণের সুনাম রক্ষা করিতে না পারি, তাহা হইলে অহঙ্কারে আমাদের অধিকতর অধোগতিই হইবে। বাস্তবিক এখন আমাদের অহঙ্কারের কোন কারণ নাই, কিন্তু লজ্জায় অধোবদন হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। যাঁহারা বিজ্ঞানাচার্য্য রায়মহোদয়ের মত বিষয়সুখনিস্পৃহ হইয়া একাগ্রচিত্তে জ্ঞানান্বেষণরূপ পবিত্র তপশ্চর্য্যা করিতে পারেন, তাঁহারাই ধন্য। তাঁহাদের আর্য্যবংশোদ্ভূত বলিয়া পরিচয় দিবার অধিকার আছে।

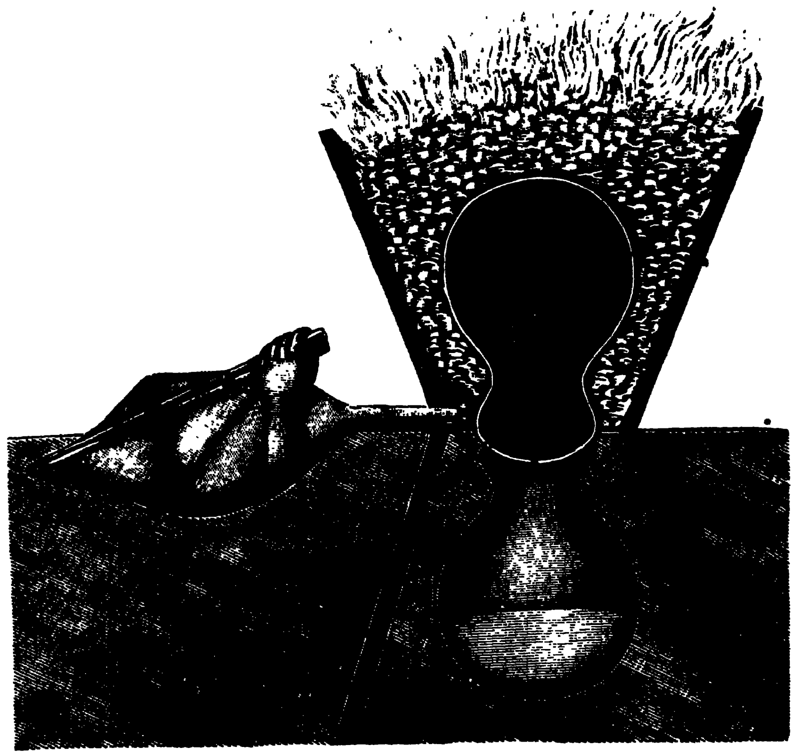
পাণ্ডুয়া-ভ্রমণ।

আমরা শ্রাবণ মাসের প্রচণ্ড রৌদ্রের মধ্যে মোকদ্দমপুরনিবাসী সুপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার ঠাকুরদাস দাসের সহিত পাণ্ডুয়া-ভ্রমণে যাত্রা করিলাম। আমাদের সঙ্গে দুইখানা গোশকট ছিল। গোশকট ফুলবাড়ীর নিকট মহানন্দা পার হইল। মহানন্দা প্রাচীন নদী। মহাভারতে কৌশিকী নদীর পর নন্দা ও অপরনন্দা নামক নদীদ্বয়ের উল্লেখ আছে; মহানন্দা তাহাদের অন্যতর। মালদহ জেলায় ফুলবাড়ী নামক কতিপয় স্থান আছে। এই ফুলবাড়ী মহানন্দা নদীর তীরবর্ত্তী বাণিজ্যপ্রধান স্থান। মহানন্দা পার হইয়া আমরা সাহমুণ্ডী নামক প্রাচীন গ্রামের অভ্যন্তর দিয়া বাচামারী নামক ভদ্রলোকপ্রধান গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিলাম। এই সকল স্থানের অট্টালিকাগুলি গৌড়ের ইষ্টক দ্বারা নির্ম্মিত। বাচামারীর পর পুরাতন মালদহে প্রবেশ করিতে হইল। মালদহ কতদিনের স্থান, তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। রামায়ণে মলদ ও করুষ নামক দুটী স্থানের নাম আছে। তাড়কা রাক্ষসীর উৎপাতে ঐ দুই স্থান নির্ম্মনুষ্য হইয়া যায়,



Vidyādhara yantram.

See p. 69



Koshthí apparatus.

for the extraction of zinc from calamine.

(See p. 49)

অঙ্গদেশ হইতে যতদূর পুণ্ড্রবর্দ্ধনের অবস্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, পাণ্ডুয়া ততদূরে অবস্থিত নহে। উহা পাণ্ডুয়া হইতে অনেকদূর পূর্ব্বে পড়ে। গঙ্গা ও করতোয়ার মধ্যবর্ত্তী প্রদেশ প্রাচীন পুণ্ড্রদেশ। এই পুণ্ড্রদেশের মধ্যে পুণ্ডরী বা পুণ্ডরিয়া নামে একাধিক নামের স্থান পাওয়া যায়। করতোয়া নদীতীরবর্ত্তী মহাস্থানগড়নামক স্থানকে অনেকে পুণ্ড্রবর্দ্ধন বলিয়া মনে করেন। স্কন্দপুরাণে পুণ্ড্রখণ্ড নামক একটী অংশ আছে। করতোয়ামাহাত্ম্য পুণ্ড্রখণ্ডের অন্তর্গত বলিয়া কথিত হয়। কিন্তু করতোয়ামাহাত্ম্যের ভাষা দেখিলে উহাকে কোনক্রমে প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া বিশ্বাস হয় না। উহাতে লিখিত আছে, পরশুরাম করতোয়াতীরে পঞ্চক্রোশ দীর্ঘ পুণ্ড্রবর্দ্ধনক্ষেত্র স্থাপন করেন। এই ক্ষেত্রের প্রধান দেবতা স্কন্দ ও গোবিন্দ। কেশব এ স্থান ত্যাগ করেন না।

কাশ্মীররাজ জয়াপীড় পুণ্ড্রবর্দ্ধনে কার্ত্তিকেয়দেবের প্রকাণ্ড মন্দির দর্শন করেন। অদ্যাপি মহাস্থানে স্কন্দগোবিন্দের স্থান প্রদর্শিত হইয়া থাকে। পৌণ্ড্রবর্দ্ধনের উনিশটী অদ্ভুত লক্ষণের মধ্যে ফণী ফণা ধরেনা একটী। পাণ্ডুয়া সম্বন্ধেও এটী কথিত হইয়া থাকে। কিন্তু উহা পীরের প্রভাবে ঘটে, লোকের এইরূপ বিশ্বাস। "যজ্ঞীয় অগ্নি সদানীরা অতিক্রম করেনাই"। করতোয়ার নামান্তর সদানীরা ও বাহুদা।

আমরা দেখিতেছি করতোয়া নামের সহিত পৌরাণিক ইতিহাস বহুল পরিমাণে সংসৃষ্ট আছে। এমন নদীতীরে একটি আর্য্য রাজধানী স্থাপিত হওয়া অসম্ভব নহে। পাণ্ডুয়া নামটী যদি পুণ্ড্রশব্দ মূলক হইত, তবে তাহাতে একটী রকার থাকিত। লোকের বিশ্বাস, উহা পাণ্ডু রাজার রাজধানী। চারিশত বৎসরের একখানি বাঙ্গালা মহাভারতের শেষে পাণ্ডুয়াকে পাণ্ডুগ্রাম বলা হইয়াছে। এই সকল কারণে পাণ্ডুয়া পুণ্ড্রবর্দ্ধন কিনা সন্দেহ হইতে পারে। মহাস্থানগড়ও পুণ্ড্রবর্দ্ধন নয়। বৌদ্ধ রাজত্বকালে এই নগর কিয়ৎকাল পৌণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তির রাজধানী ছিল। পুণ্ড্রদেশ ও পুণ্ড্রবর্দ্ধন, যাহাদের রাজ্য ও রাজধানী ছিল, সেই পুণ্ড্রজাতি, পাণ্ডুয়াকেই পুণ্ড্রবর্দ্ধন বলিয়া জানে, তাহারা পাণ্ডুয়ার নিকটেই বাস করে। পাণ্ডুয়া অতি প্রাচীন নগর। উহার পুণ্ড্রবর্দ্ধন ব্যতীত অন্য কোন নাম থাকিলে কোন গ্রন্থ বা তাম্রশাসনে অবশ্য সে নামের উল্লেখ থাকিত। পাণ্ডুয়া যে প্রাচীন পুণ্ড্রবর্দ্ধন, তদ্বিষয়ে কোন সংশয় নাই। অঙ্গদেশ হইতে পুণ্ড্রদেশে আদিম কালে আর্য্যবসতি বিস্তৃত হয়। বলিবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ অঙ্গদেশ হইতে এদেশে আগমন করেন। বলিবংশীয় ক্ষত্রিয়গণ আচারভ্রষ্ট হইয়া বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এদেশের পুণ্ড্রজাতি, বলিবংশীয় ক্ষত্রিয় জাতি। তাহাদের আচার ব্যবহার এখন উৎকৃষ্ট নয়, কিন্তু ক্ষত্রিয়োচিত কোন কোন গুণ, এখনও তাহাদিগের মধ্যে বিদ্যমান আছে। অনেকে ভ্রমবশতঃ পোদ ও পুণ্ড্রজাতিকে এক জাতি মনে করেন। কিন্তু পোদ জাতি পুলিন্দ জাতি হইতে উৎপন্ন বলিয়া বোধ হয়

পুণ্ড্রবর্দ্ধনে এক সময়ে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। পর্য্যাটক হুয়েনসাং এখানে কতিপয় বিহার ও কতকগুলি শ্রমণ দর্শন করেন। মুসলমানদের সময়ে বৌদ্ধ, জৈন ও হিন্দু দেবমন্দির গুলির ধ্বংসসাধন করা হয়। পালবংশীয় রাজগণ বৌদ্ধ ধর্ম্মের উৎসাহদাতা ছিলেন, কিন্তু মুসলমানেরা বৌদ্ধদিগের কোন চিহ্ন পুণ্ড্রবর্দ্ধনে থাকিতে দেয় নাই। সেইজন্য এখানে পালরাজগণের সময়ে নির্ম্মিত কোন বৌদ্ধমন্দিরের চিহ্ন পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় না। পাণ্ডুয়ার মধ্য দিয়া যে রাস্তা গিয়াছে, তাহার পূর্ব্বদিকে মোকদমসহর ও পশ্চিম দিকে কুতুবসহর। মোকদম সহরে বড় দরগা ও কুতুবসহরে ছোট দরগা অবস্থিত। বড় দরগা মোকদম সাহের ও ছোট দরগা কুতুব সাহের সম্মানার্থ নির্ম্মিত। এই দুই তপস্বী পাণ্ডুয়ার প্রাণ। বড় দরগা অপেক্ষা ছোট দরগার ধূমধাম অধিক। বড় দরগা অপেক্ষাকৃত পুরাতন। ছোট দরগার সুবিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে বিস্তর সমাধিস্থান রহিয়াছে। একটী লোক দিল্লীর বাদশাহ ও তাঁহার উজীরের কবর দেখাইল। বলা বাহুল্য যে লোকটি এবিষয়ের কিছুই জানেনা। একটি পুরাতন কূপ দেখাইয়া বলিল, এখানে মুসলমান ভূতেরা কয়েদ আছে। তাহাদের উদ্ধারার্থ পীরদিগের দরগায় সিন্নি না দিলে আকেয়ামৎ তাহারা এই কূপেই আবদ্ধ থাকিবে। কোন কোন মুসলমান, তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষদের উদ্দেশে এইজন্য পীরের সিন্নি দিয়া থাকেন। একটী মস্‌জিদ্ দেখাইয়া বলিল, এইটী হিন্দু মন্দির ছিল, পরে মস্‌জিদে পরিণত হইয়াছে। অসত্য বোধ হইলনা। এই সকল স্থান দেখিলে মনে স্বভাবতঃ একটা শ্রদ্ধামিশ্র গম্ভীর ভাবের উদয় হয়। মোকদম সাহ জালাল ও নুর কুতুব আলম উভয়েই মহাপুরুষ ছিলেন। এদেশের সর্ব্বত্র এই দুই তপস্বী, মহাপুরুষ বলিয়া সম্মানিত হইয়া থাকেন। ইঁহাদের দরগায় অতিথিসেবা ও সাধু ধার্ম্মিক দিগকে দানের ব্যয় নির্ব্বাহার্থ যথাক্রমে বাইশ হাজার ও ছয় হাজার বিঘা ভূমির রাজস্ব প্রদত্ত হইয়াছিল। গৌড় পাণ্ডুয়ার বিস্তর নৃপতি এখানে সমাহিত আছেন। উভয় দরগাকে ধ্বংসমুখ হইতে উদ্ধারের জন্য গবর্ণমেণ্ট্ সংপ্রতি মনোযোগী হইয়াছেন। জীর্ণসংস্কার হইতেছে। কিন্তু সে সকলের মেরামত দশ পাঁচ হাজার টাকায় হইবে না, বিস্তর অর্থের প্রয়োজন। গবর্ণমেণ্টও এ বিষয়ে কৃপণ হইবেন না, জানা গিয়াছে। গত

[১৯০১] জুলাই মাসে ছোট লাট সাহেব গৌড় পাণ্ডুয়া দর্শন করিয়া গিয়াছেন। লেফটেনেণ্ট্ গবর্ণর বাহাদুরের জনৈক পারিষদ রোটাসে নিমন্ত্রিত ভদ্রলোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে কেন এদেশীয় লোকে তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের কৃত এমন সুন্দর সুন্দর বস্তগুলি রক্ষণার্থ যত্ন করেন না।

কুতুব সহরের একক্রোশ উত্তরে বিখ্যাত আদিনা মসজিদ। এই মসজিদ সেকেন্দর সাহের রাজত্বকালে নির্ম্মিত হয়। সেকেন্দর একটা প্রকাণ্ড বৌদ্ধস্তূপ ধ্বংস করিয়া আদিনা মসজিদ নির্ম্মাণ করেন। সেকেন্দর ১৩৫৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৩৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। সেকেন্দর ও তৎপুত্র গিয়াসুদ্দিন গোঁড়া মুসলমান ছিলেন। একলাখী মসজিদে রাজা গণেশের পুত্র যত্ন সমাহিত আছেন। ইনি মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া জেলালুদ্দিন নাম ধারণ করিয়াছিলেন। রাজাগণেশ বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ছিলেন।

আমি সাতাইশ বৎসর পূর্ব্বে একবার পাণ্ডুয়া দেখিতে গিয়াছিলাম। তখন পাণ্ডুয়া গভীর জঙ্গলে আচ্ছন্ন ছিল। তখন বসন্তকাল, মহাকবি কালিদাস রচিত ঋতুসংহারের বসন্তবর্ণনা বেশ মিলিয়া গিয়াছিল, দেখিয়া আমরা প্রচুর আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম। তখন আদিনার ভিতর বিস্তর হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি দিয়া খচিত নামাজের স্থানে উঠিবার সোপান দেখিয়াছিলাম। যেমন মসজিদের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্খলিত হইতেছিল, অমনি মুসলমানভয়ে লুক্কায়িত গণেশ কার্ত্তিকেয় কৃষ্ণ বিষ্ণু বাহির হইয়া পড়িতেছিলেন। সে সকল মূর্ত্তির নাক প্রায় ভাঙ্গা ছিল। লোকেরা কালাপাহাড়ের উপর তাহার কারণ অর্পিত হইত। এখন সে সকল মূর্ত্তি দেখা গেলনা। কোথায় গেল ? শুনিয়াছিলাম একবার বার্লিন মহামেলার জন্য এখান হইতে প্রস্তরের সুন্দর সুন্দর মূর্ত্তি পাঠান হইয়াছিল। আদিনার মেরামত হইতেছে। সেকেন্দরের আদিনা আর ফিরিয়া আসিবেনা, তবে যাহা আছে, তাহা নষ্ট হইতে না দেওয়াই মেরামতের উদ্দেশ্য। শুনা যায় পাণ্ডুয়ার হোমদীঘী ও ধূমদীঘীর নিকট আদীশূরের পুত্রেষ্টি যজ্ঞ হইয়াছিল। সাতাশঘরা নামক অট্টালিকা আদিনার কিছু দূরে অবস্থিত। এই অট্টালিকার অর্দ্ধাংশ মৃত্তিকার নিম্নে প্রোথিত। ইহাতে একটী পুষ্করিণী সংলগ্ন আছে। পাণ্ডুয়ার এই অংশে রাজধানী ছিল। অন্ততঃ হিন্দুরাজগণ এই স্থানে বাস করিতেন। রাজবাটীর স্নানাগার পড়িয়া গিয়াছে। ২৭ বৎসর মধ্যে জঙ্গল পরিষ্কৃত হইয়াছে বটে, কিন্তু বিস্তর প্রাচীন বাটীর যে যে অংশ খাড়া ছিল, তাহা পড়িয়া গিয়াছে। নগর মধ্যে যে বিস্তর মৃৎপ্রাচীরবিশিষ্ট গৃহ ছিল, তাহা জানিতে পারা গিয়াছে। তিনশত বৎসর পূর্ব্বেও এখানে হিন্দুর বাস ছিল।

দারুণ উত্তাপে ক্লান্ত হইয়া আমরা ভ্রমণব্যাপার সংক্ষিপ্ত করিয়া বেলা চারিটার সময় ইংলিশবাজার অভিমুখে ফিরিতে লাগিলাম। গো, মহিষগণ পর্য্যাপ্ত ভোজনে পরিতৃপ্ত হইয়া গৃহাভিমুখে গমন করিতেছে। এমন সময়ে তাহাদের যে সৌন্দর্য্য হয়, তাহা বর্ণনাতীত। উজ্জ্বলচক্ষু সাঁওতাল বালকবালিকাদিগের বংশীধ্বনি শুনিতে শুনিতে আমাদের অধ্বশ্রম অপনীত হইতে লাগিল। আমরা এবার নিমাসরাইয়ের ঘাটে মহানন্দা পার হইলাম। কালিন্দীর স্বচ্ছজলে নিপতিত নিমাসরাই-মনুমেণ্টের ছায়া অন্ধকারেও স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। নিমাসরাই ফজলীও জালিবাঙ্গা আমের উৎপত্তি স্থান। ফজরী ও ফলিয়া নাম্নী রমণীদ্বয়ের নামানুসারে ফজলী ও ফলিয়া নামক আম্রের নাম হইয়াছে। ফজরীর বাটীর মূল গাছটী পড়িয়া গিয়াছে।

৬ই আশ্বিন, ১৩০৮। শ্রীরজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী।

বিবিধ প্রসঙ্গ।

অনেকের এখনও এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা আছে যে প্রবাসী বাঙ্গালীরা প্রায় কেবল অর্থোপার্জ্জন ও তদ্দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করেন, কোন সৎকার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন না। প্রসিদ্ধ পাদরী শেরিং সাহেব বঙ্গদেশে বাস করেন নাই ; তিনি আপনার জীবনের অধিকাংশভাগ কাশীধামে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তিনি প্রবাসী বাঙ্গালীদেরই সংশ্রবে আসিয়াছিলেন ; এবং তাঁহাদের চরিত্রের সদ্গুণ উপলব্ধি করিয়া বাঙ্গালীদের বিষয়ে নিজের মত এইরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন।—

"The Bengali has a glorious future before him, a future in which, if we mistake not, he will conspicuously shine as the leader of public opinion, and of intellectual and social progress among all the varied nationalities of the Indian Empire."

প্রবাসী বাঙ্গালীরা ভারতবর্ষের নানাস্থানে যে সকল সৎকার্য্য করিয়া গিয়াছেন, তাহা বঙ্গদেশের লোকদিগের প্রায় অবিদিত। রেল এবং টেলিগ্রাফ হইবার পূর্ব্বে যে সকল বাঙ্গালী বিদেশে প্রবাস ও দেশের উন্নতির জন্য যে উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাহা অতি অল্প লোকেই জ্ঞাত আছেন। আমরা এইজন্য "প্রবাসী"তে কীর্ত্তিমান্ প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রকাশ করিতেছি। আমরা আত্মশ্লাঘা করিবার জন্য এরূপ করিতেছিনা। কি

অর্থাৎ ক্রূরকর্ম্মা অনার্য্যদের উৎপাতে ঐ ছুই আর্য্যোপনিবেশ বিধ্বস্ত হয়। মহাভারতে করুষ দেশের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু মলদ রাজ্যের নাম পাওয়া যায় না। ঐ ছুটি রাজ্য মগধের পশ্চিম দিকে সম্ভবতঃ বর্ত্তমান শাহাবাদ জেলার মধ্যে ছিল। করুষ রাজ্য পশ্চিম দিকে অনেকদূর পর্য্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে। করুষ রাজ্যের পশ্চিম দিকে শিশুপালের চেদিরাজ্য। পৌরাণিক ভূগোলে পূর্ব্বদিকে প্রাগ্‌-জ্যোতিসপুরের সহিত মলদ বা মালদ রাজ্যের নাম আছে। পৌরাণিকযুগে রামায়ণবর্ণিত মলদ রাজ্য ছিল না। মালদহ কি সেই পুরাণবর্ণিত মালদ রাজ্য? সম্রাট ফিরোজ সাহ হাজি ইলিয়াস ও সেকেন্দর সাহের বিরুদ্ধে ছুইবার বঙ্গদেশে আগমন করেন। তিনি এই মালদহে শিবির সন্নিবেশ করেন। মালদহের যে অংশের নাম পিরোজপুর তাহা সম্রাট ফিরোজ সাহের স্থাপিত। মালদহের প্রকাণ্ড মসজিদটী আকবরের সময় কোন ধনশালী বণিক্‌ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। এখন এই প্রাচীন নগর ধ্বংসমুখে দ্রুতবেগে অগ্রসর হইতেছে। আমরা নগর মধ্যে প্রবেশ না করিয়া উহার পশ্চিম পার্শ্ব দিয়া বালিয়া-নবাবগঞ্জ নামক স্থানে উপনীত হইলাম। বালিয়া-নবাবগঞ্জ ও মালদহ পাণ্ডুয়ার বহির্বাণিজ্যস্থান ছিল। বালিয়া-নবাবগঞ্জের চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী স্থানের অবস্থা পর্য্যবলোকন করিলে স্পষ্টই অনুমিত হয় যে কোন প্রকাণ্ড নদীসৈকতে এই গঞ্জ স্থাপিত হইয়াছিল। এই স্থানে বুধ ও রবিবারে হাট হয়। এই হাটে বরেন্দ্র অঞ্চল হইতে আনীত প্রচুর তরকারী বিক্রীত হয়। এই স্থান মালদহ জেলার আম্রবৃক্ষশ্রেণীর উৎপত্তির শেষ সীমা। বালিয়া-নবাবগঞ্জের উত্তর দিকে যে নদীটী ছিল, তাহা বিলুপ্তপ্রায়। এই নদীর উত্তর তীর হইতে পাণ্ডুয়া নগরের আরম্ভ হইয়াছে। এই স্থানের মৃত্তিকা রক্তবর্ণ। প্রকাণ্ড তৃণপূর্ণ মাঠ চতুর্দ্দিকে প্রসারিত রহিয়াছে। এই মাঠের মধ্যে বিস্তর ক্ষুদ্র বৃহৎ পুষ্করিণী দৃষ্ট হয়। সে সকল পুষ্করিণীর অধিকাংশই হিন্দুকর্ত্তৃক খনিত। মুসলমানদের হইলে পূর্ব্বপশ্চিমে লম্বা হইত। এখন সেগুলিতে বিস্তর মৎস্য ও কুম্ভীর বাস করে। এই প্রান্তরটী ইষ্টক ও মৃত্তিকানির্ম্মিত বাসস্থানের ভগ্নাবশেষে পরিপূর্ণ। পূর্ব্বে প্রান্তরটী জঙ্গলে ভরিয়া গিয়াছিল, কিন্তু পরিশ্রমী সাঁওতাল ও সেরসা বেদিয়া মুসলমানদের যত্নে পরিস্কৃত হইয়া ক্রমশঃ হলতলে আনীত হইতেছে। যাইতে যাইতে আমরা পাণ্ডুয়ার আভীরপল্লী বা গোয়ালাপাড়ায় উপস্থিত হইলাম। এই আভীরপল্লীতে একজন আভীর কর্ত্তৃক সম্রাট অশোকের ভ্রাতা বীতশোক নিহত হন। কোন সময়ে পুণ্ড্রবর্দ্ধনের জৈনগণ আপনাদের দেবতাদের পদতলে বুদ্ধদেবের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের অপমান করে। অশোকের আদেশে পুণ্ড্রবর্দ্ধনের আঠার হাজার জৈন নিহত হয়। এমন কি এমন রাজাজ্ঞা প্রচারিত হয় যে, যে ব্যক্তি একজন জৈনের মাথা কাটিয়া আনিয়া দিতে পারিবে, সে এক দীনার পুরস্কার পাইবে। সে সময়ে বীতশোক বৌদ্ধভিক্ষুবেশে গোপপল্লীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। ছুরাত্মা আভীর, পুরস্কারলোভে জৈনভ্রমে বীতশোকের ছিন্নমুণ্ড অশোকসমীপে লইয়া যায়। এই ঘটনার পর এই নিষ্ঠুর রাজাজ্ঞা রহিত করা হয়। এই গোয়ালাপাড়ায় গিয়াসুদ্দিন তাঁহার পিতা সেকেন্দরের বিপক্ষে সসৈন্যে উপস্থিত হন। পিতাপুত্রে যুদ্ধারম্ভ হইল। যুদ্ধের পূর্ব্বে গিয়াসুদ্দিন সেনাগণকে বলিয়াছিলেন যে, তাঁহার পিতার অঙ্গে যেন কেহ আঘাত না করে। তিনি পিতার হৃদয় জানিতেন। বিমাতা যে সকল অনর্থের মূল, তাহাও বুঝিতে পারিয়াছিলেন; আত্মরক্ষার্থ যুদ্ধার্থী হইয়াছিলেন, কিন্তু পিতৃভক্তি বিসর্জ্জন দেন নাই। তাঁহার আদেশ পালিত হয় নাই। বৃদ্ধ সেকেন্দর যুদ্ধস্থলে আহত হইলেন, গিয়াসুদ্দিন জয় লাভ করিলেন। যুদ্ধান্তে পিতৃপদতলে নিপতিত হইয়া গিয়াসুদ্দিন ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। ক্ষমা প্রদত্ত হইল; সেকেন্দর পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া যুদ্ধস্থলে প্রাণত্যাগ করিলেন। গিয়াসুদ্দিন বিমাতার যোড়শ পুত্রকে অন্ধীকৃত করিয়া বিমাতার সমীপে পাঠাইয়া দিলেন। পাণ্ডুয়ার এই অংশ রক্ষার জন্য কোন প্রাচীর নির্ম্মিত হয় নাই। সম্রাট ফিরোজ তোগলক ছুইবার পাণ্ডুয়া অধিকার করেন। হাজি ইলিয়াস্‌ ও তৎপুত্র সেকেন্দর এখান হইতে এগার ক্রোশ দূরবর্ত্তী একডালার ছুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। একডালা অতি ছুরাক্রম্য ছিল। সম্রাট তাহা অধিকার করিতে পারেন নাই। হাজি ইলিয়াস, অসমসাহসী বীরপুরুষ ছিলেন। তিনি বীণাবাদকের বেশে এই গোপপল্লীস্থ পাঠানশিবিরে প্রবেশ করিয়া তাহাদের অবস্থা জানিয়া যান। সম্রাট পরে জানিতে পারিয়া শত্রুর সাহস দর্শনে চমৎকৃত হন। ফিরোজ সাহের ছুইবার আক্রমণে পাণ্ডুয়ারাজের লক্ষাধিক লোক নিহত হয়। এই গোপপল্লীর মধ্যে "কালুপীরের আস্তানা"। লোকে বলিয়া থাকে, মোকদম সাহ জালাল এই গোপপল্লীতে আসিয়া গোচর্ম্ম বিস্তার পূর্ব্বক তদুপরি উপবেশন করিয়া তপস্যা আরম্ভ করেন। লোকে যাইয়া রাজাকে বলিল, "মহারাজ! একজন বিদেশীয় তপস্বী আপনার রাজ্য লইবার জন্য গোপপল্লীতে তপস্যা আরম্ভ করিয়াছে।" রাজা তপস্বীকে স্থান ত্যাগ করিতে আদেশ করিলেন। আদেশ পালিত হইল না দেখিয়া তিনি তপস্বীর প্রাণনাশের সংকল্প করিলেন। তদর্থে তিনি একটী বিষলড্ডুক কালু ধোপার (মতান্তরে গোয়ালার) হস্তে দিয়া তপস্বীর আহারার্থ প্রেরণ করিলেন। তপস্বী রাজার অভিসন্ধি বুঝিতে

পারিয়া, কালুকে বলিলেন, "কালু তুই খা, তোর কোন অনিষ্ট হইবে না"। কালু লডডুক ভোজন করিল। তপস্বীর তপঃপ্রভাবে কালুর কোন অনিষ্ট হইল না। কালু তপস্বীর শরণাপন্ন হইল। তপস্বী তাহাকে মুসলমান ধর্ম্মে দীক্ষিত করিলেন। কালু পীরসংজ্ঞা প্রাপ্ত হইল। কালু-বাঙ্গলার প্রথম মুসলমান। রাজা যখন শুনিতে পাইলেন, কালু তপস্বীর নিকট নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে, তখন তাঁহার ভয়ের পরিসীমা রহিল না। তিনি তপস্বীর নিকট উপস্থিত হইয়া কিছু প্রার্থনা করিতে বলিলেন। তপস্বী প্রথমতঃ আপনার নিস্পৃহতা জানাইলেন, পরে রাজার নির্ব্বন্ধাতিশয় দর্শনে তপস্যার স্থানের জন্য গোচর্ম্মপরিমিত ভূমি প্রার্থনা করিলেন। রাজা অবজ্ঞার হাস্য হাসিয়া তাহাতেই সম্মত হইলেন। গোচর্ম্ম বর্দ্ধিত হইয়া সমস্ত পাণ্ডুয়া গ্রাস করিল। রাজারও নাকি ইহাতে মৃত্যু হইল। আমরা এ সকল গল্পে কোনরূপ মন্তব্য প্রকাশ না করিয়া যথাশ্রুত বর্ণনা করিলাম। যদি কেহ অল্প স্থান পাইয়া, অধিক স্থানের দাবী করিয়া বসে, তবে এ দেশের লোকে বলিয়া থাকে যে, "এ যে দেখিতেছি মোকদমসাহের ছড় (চর্ম্ম), ক্রমশঃ বাড়িয়া চলিতে লাগিল।"

আমরা আইহোরাণী বা রাইহোরাণী বাম দিকে রাখিয়া পাণ্ডুয়ার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে লাগিলাম। স্বামী পীড়িত হইলে এদেশীয় হিন্দুনারীগণের অনেকে স্বামীর আরোগ্যকামনায় এই দেবীর উপাসনা করিয়া থাকেন। বৈশাখ মাসে ইঁহার পূজার ধূমধাম হয়। প্রবাদ আছে, এক ব্রাহ্মণ সস্ত্রীক এই পথ দিয়া গমন করিতেছিলেন। এখানে দম্পতীর পিপাসা উপস্থিত হয়। ব্রাহ্মণ স্ত্রীকে বৃক্ষতলে বসিতে বলিয়া জলান্বেষণে গমন করিলেন। ব্রাহ্মণের আসিতে বিলম্ব হইল। ইত্যবসরে এই নগরের রাজপুত্র বয়স্যগণসঙ্গে এখানে উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মণীর রূপলাবণ্যে মোহিত হইলেন। তিনি ব্রাহ্মণীকে প্রলোভনে প্রলোভিত করিতে না পারিয়া বলপ্রকাশের উপক্রম করিলেন। ব্রাহ্মণী ভগবতী হৈমবতীর শরণ প্রার্থনা করিলে, এই বৃক্ষ হইতে দেবী আবির্ভূত হইয়া রাজপুত্রের নিধন করেন। এই ঘটনা হইতে এইটী তীর্থস্থানস্বরূপ গণ্য হইয়াছে। এখন এখানে রাইহোরাণীর কোন মূর্ত্তি নাই, কেবল বৃক্ষমূলে তাঁহার বেদী আছে। সাঁওতালেরাও ইঁহাকে মানিয়া থাকে। ইনি হয়ত প্রাচীন পুণ্ড্রবর্দ্ধনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ছিলেন।

পাণ্ডুয়ায় প্রবেশ করিয়া আমরা সেখ ফরিদ নামক এক ফকিরের উপন্যাস শুনিতে পাইলাম। ফকিরের মাতাও তপস্বিনী ছিলেন। ফরিদ, অনাহারে থাকিয়া দীর্ঘকাল তপস্যার পর ঈশ্বরদর্শন পান। তপস্যার সময় ক্ষুত্‌তৃষায় কাতর হইলে মাতৃপ্রদত্ত একটী ইষ্টক চুষিতেন। তাহাতেই তাঁহার ক্ষুধাতৃষ্ণার উপশম হইত। যদি কেহ কষ্ট সহ্য না করিয়া ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচয় দিতে চায়, তবে এদেশীয় লোকে বলে, "বগলমে রুটি, মুখমে ফরিদ"। ফরিদ ঈশ্বরের নিকট এই প্রার্থনা করেন যে, "তুমি যাহা করিবে, তাহা হইবে, কিন্তু আমি যাহা বলিব, তাহা হইবে"। ঈশ্বর তথাস্তু বলিয়া অন্তর্হিত হন।

বালিয়া-নবাবগঞ্জের উত্তরস্থ বিলুপ্তপ্রায় নদীর উত্তর তীরের ভূমির বর্ণ লাল। লোকের বিশ্বাস বেহুলার মান্দাস এই নদী দিয়া গিয়াছিল। তাঁহার সীমন্তের সিন্দূরে এ স্থানের ভূমি লাল হইয়াছে। পাণ্ডুয়া বরেন্দ্রভূমির অন্তর্গত। পুণ্ড্রদেশের নামই বরেন্দ্রভূমি। কথিত আছে, বরেন্দ্র শূর নামক শূরবংশীয় রাজার নামে বরেন্দ্রভূমি নাম হয়। পাণ্ডুয়ার প্রান্তর হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদায় বরেন্দ্রভূমিতে বিস্তর পুষ্করিণী দৃষ্ট হয়। মুসলমানদের অত্যাচারে ও জলবায়ুর প্রতিকূলতায় ভদ্র অধিবাসিগণ স্থান ত্যাগ করিলে কোচ্‌পলিয়া নামক অনার্য্য মোগলজাতি, প্রথমতঃ এই স্থানে বসতি আরম্ভ করে। এখন সাঁওতালেরা তাহাদের প্রতিবেশী হইয়াছে। তাহারা জঙ্গল পরিষ্কার করিয়া কৃষিকর্ম্ম করিতেছে। এখন আর পাণ্ডুয়ায় তেমন বাঘের ভয় নাই। রাজতরঙ্গিণীতে আছে, কাশ্মীররাজ জয়াপীড় নগরে উপদ্রবকারী এক সিংহকে বিনষ্ট করেন। বড় বাঘকেই হয়ত সিংহ বলা হইয়াছে। সাঁওতালেরা মধ্যে মধ্যে মৃত্তিকার ভিতর স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা পাইয়া থাকে। তৎসমুদায়ের অধিকাংশ হিন্দু সময়ের। সাঁওতালেরা প্রথমে যখন এ জেলায় আইসে, তখন তাহারা নিতান্ত নির্ব্বোধ ছিল। বাঙ্গালীরা তাহাদিগকে সর্ব্বদাই ঠকাইত। অর্থলোভী অসৎ লোকেরা চারি পাঁচ টাকা দিয়া তাহাদের নিকট হইতে মোহর কিনিত; আবার বলিত, "তোরা একটা পিতলের টাকা দিয়া চারি পাঁচটা রূপার টাকা নিলি ?" কেহ কেহ একটা টাকা দিয়া চারি পাঁচটা মোহরও কিনিয়াছে, এমন শুনা যায়। এই সকল মুদ্রা হস্তগত করিতে পারিলে কোন কোন নূতন ঐতিহাসিক জ্ঞান লাভ হইত, সন্দেহ নাই। আমি একবার একটী তাম্রমুদ্রা পাইয়াছিলাম, তাহার এক পৃষ্ঠে দেবনাগরী অক্ষরে "জো" লিখিত ছিল। পাণ্ডুয়া যে একটি প্রাচীন হিন্দু নগর, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। গৌড়নগরেও এত হিন্দুমুদ্রা পাওয়া যায় নাই। কেহ কেহ বলেন, পাণ্ডুয়া মুসলমানের স্থাপিত নগর। একথা প্রকৃত হইলে, পাণ্ডুয়া ও তন্নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে হিন্দু রাজগণের এত মুদ্রা পাওয়া যাইত না। মুসলমানেরা একবাক্যে পাণ্ডুয়াকে প্রাচীন নগর বলিয়া স্বীকার করেন। প্রাচীন নগর না হইলে এখানে প্রকাণ্ড বৌদ্ধস্তূপ কিরূপে আসিল ? এই নগর কি প্রাচীন পুণ্ড্রবর্দ্ধন ? চীন পর্য্যটক হুয়েন্থসাং

বঙ্গদেশে, কি অন্যপ্রদেশে, সর্ব্বত্র বাঙ্গালীদের সম্মুখে উচ্চ আদর্শ স্থাপনই আমাদের উদ্দেশ্য। আমরা আদর্শ হইতে নীচে গিয়া পড়িলে তাহা আমাদের পক্ষে সাতিশয় লজ্জার বিষয় হইবে।

***

কোচিনের প্রায় চারিদিকেই লবণাক্ত জল। সুতরাং কোচিনে ভাল জল পাওয়া যায় না। কূপ এবং পুকুরের জল এলওয়ে হইতে প্রতিদিন নৌকা করিয়া পানীয় জল কোচিনে আনীত হইয়া বিক্রীত হয়। বড় গোছের এক খান নৌকার ভিতর কতক গুলি পিপে থাকে। এক রকম টিনের দমকল দ্বারা এই পিপেগুলি পূর্ণ করা হয় এবং এই পম্প দ্বারা পিপে হইতে জল তুলিয়া কলসীতে দেয়। বড় এক কলসী জলের দাম কলসীর আকৃতি অনুসারে এক আনা হইতে দুই আনা। এলওয়ে ইতিহাসে প্রসিদ্ধ।



কোচিনে জল বিক্রয়।

কিছু কিছু লবণাক্ত, দীর্ঘকাল পান করিলে পা ফুলিয়া গোদ হয় এবং অন্যান্য নানা রকম পীড়াও হয়। কোচিন হইতে ১৪ মাইল দূরে এলওয়ে নামক স্থানে পেরিয়ার নদী আসিয়া ব্যাক ওয়াটারে পড়িয়াছে। পেরিয়ারের জল অতি স্বাস্থ্যকর। ইহাতে ধাতব পদার্থ আছে। বহুদূর হইতে লোকে এই জলে স্নান করিবার জন্য এলওয়েতে আসে। ভারতবিখ্যাত শঙ্করাচার্য্য এই এলওয়ের নিকট জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। শঙ্করাচার্য্য মালাবারের প্রসিদ্ধ নাম্বুরি ব্রাহ্মণ ছিলেন। টীপু সুলতান ত্রিবাঙ্কোড় আক্রমণ করিয়া এলওয়ে পর্য্যন্ত আসিয়াছিলেন। পেরিয়ার নদীর বন্যাতে সুলতানকে বড়ই ব্যতিব্যস্ত করিয়াছিল। বন্যার হাত এড়াইবার পূর্ব্বেই খবর আসিল যে লর্ড কর্ণওয়ালিস মহীশুর আক্রমণ

করিতে আসিতেছেন। এই খবর পাইয়াই টীপু মহীশুরে চলিয়া গেলেন। বহুসংখ্যক সাহেব ও মেম সাহেব আজ কাল এলওয়েতে স্নান করিতে আসিয়া থাকেন। নদীর জলের ভিতর ইঁহাদের স্নান করিবার অস্থায়ী কুটীরগুলি দেখিতে বেশ সুন্দর।

* *
*

মালাবারের বর্ত্তমান "চারুমা" জাতীয় লোক পূর্ব্বে ক্রীত দাস ছিল। ইহারা সর্ব্বদা ক্রীত এবং বিক্রীত হইত। ইহাদের রং অত্যন্ত কাল, শরীর দুর্ব্বল এবং কৃশ। সমাজে ইহারা অত্যন্ত ঘৃণিত। পূর্ব্বে ইহাদের রাজপথ দিয়া যাতায়াতের অধিকার ছিল না। এখনও ইহারা ব্রাহ্মণ



পুলেয়া স্ত্রী ও পুরুষ।

প্রভৃতি উচ্চজাতীয় লোক দেখিলে রাজপথ ছাড়িয়া বহু দূরে চলিয়া যায়। এই "চারুমা" জাতি বহু শাখা প্রশাখায় বিভক্ত। পুলেয়া এবং খণ্ডাপুলেয়া চারুমা জাতির দুইটী বিভিন্ন শাখা। পুলেয়া জাতি ত্রিবাঙ্কোড়েই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। এখন ইহারা ধান্যক্ষেত্রে জলসিঞ্চন এবং নারিকেল বাগানের কেয়ারি, প্রভৃতিতে কাজ করে। ক্ষেত্রের মালিক ইহাদিগকে ভরণ পোষণ করে, এবং এখনও কোন নারিকেল বাগান বা ধান্যক্ষেত্র বিক্রয় করিলে পুলেয়াগণ ক্ষেত্রের সঙ্গে সঙ্গে স্ব-ইচ্ছায় নূতন স্বত্বাধিকারীর অধীন হয়। ইহারা এত ঘৃণিত যে নারিকেলের মত পবিত্র গাছে ইহারা অস্ত্র প্রয়োগ করিতে পারেনা! তাহা করিলে প্রভুকর্ত্তৃক লাঞ্ছিত হয়। ইহাদের বিবাহ অতি সাদাসিদে। স্ত্রীপুরুষ পরস্পরের সহিত বিবাহিত হইতে ইচ্ছা করিলে দুই জনে মিলিয়া পুরুষের মনিবের নিকট সন্ধ্যাবেলায় একত্রে খাদ্য প্রার্থনা করে। মনিব দুই জনের উপযুক্ত চাউল দিলে বিবাহ শুদ্ধ হইল, নচেৎ নহে। খণ্ডাপুলেয়াদের ভিতর স্ত্রীলোকে বস্ত্র ব্যবহার করেনা। কোমরে একরকম ঘাস জড়াইয়া লজ্জা নিবারণ করে।"



খণ্ডা পুলেয়া।

ভ্রমসংশোধন। ৭৩ পৃঃ, ১ম স্তম্ভ, ৩৩ ছত্রে 'মাথায়' 'মায়ায়' হইবে।





'স্বরবৎ'-বাদিনী তামিল মহিলা।

[রবিবর্ম্মার একখানি অপ্রকাশিত তৈলচিত্র হইতে।

প্রবাসী

দ্বিতীয় ভাগ। | শ্রাবণ, ১৩০৯। | ৪র্থ সংখ্যা

সূর্য্যসম্ভব।

সৃষ্টির আদিতে জড়জগৎ অনন্ত আকাশ ব্যাপিয়া পরমাণুরূপে বিরাজিত ছিল। বিধাতা বিশ্বসৃষ্টির প্রথম সূচনা করিয়া পরমাণুতে জড়শক্তি সঞ্চারিত করিলেন; তাহার বলে পরমাণুজগতে গতি উৎপন্ন হইল। বিজ্ঞান এখনও এই শক্তির স্বরূপ ব্যাখ্যা করিতে সক্ষম হয় নাই। ইহাদ্বারা গতি উৎপন্ন হয়; এই জন্য ইহাকে গতির "কারণ" কহা যায়। পরমাণুতে শক্তি সঞ্চারিত হইয়া গতি উৎপাদিত হইলে, ঐ গতিবশে তাহারা কুণ্ডলীর আকারে ঘুরিতে আরম্ভ করিল। যেমন পরমাণু জড়স্বরূপের অতি শৈশব প্রতিকৃতি, তদ্রূপ কুণ্ডলিকাকার গতি জড়গতির শৈশবাবস্থা। জড়জগতে গতির প্রথম উদ্যম,—ঘুরিতে চেষ্টা। পরমাণুর পৃষ্ঠে পরমাণু চাপিয়া এই বিশাল বাস্তব জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। কত শত কোটি বৎসর এই সৃষ্টিকার্য্যে ব্যয়িত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা করা যায় না; কিন্তু এখনও সৃষ্টির আদিম স্বরূপ পরমাণু তাহার কুণ্ডলিকাকার গতি পরিহার করে নাই! সৃষ্টিব্যাপারে জগৎপ্রকটনপ্রসঙ্গে ঐ কুণ্ডলিকাকার গতিই বিশ্বস্রষ্টার প্রথম কার্য্য, এবং নিরুদ্যম জড়ে ইহাই প্রথম শক্তিপ্রকটন।*

কুণ্ডলিকাকার গতিতে স্থানান্তর গমন বুঝায় না। একটা সর্পের পুচ্ছ তাহার মুখবিবরে প্রবিষ্ট করাইয়া, তাহাকে চলিতে দিলে তাহার স্থানান্তর গমনের ক্ষমতা থাকিবে না, সে কেবল এক জায়গায় থাকিয়া ঘুরিতে থাকিবে; ইহাই কুণ্ডলিকাকার গতি। কিন্তু ইহাদ্বারা জগৎ সৃষ্টি হইতে পারে না; অথচ পরমাণু স্বয়ং নিরুদ্যম, তাহাদ্বারা কোন কার্য্যই স্বতঃপ্রণোদিত হইতে পারে না। সৃষ্টির এ অবস্থায় বিধাতা পরমাণুতে একটি গুণ প্রয়োগ করিলেন। তাহার নাম "আসক্তি"। (ইহা chemical affinityর পূর্ব্বরাগ!)

জড়কুণ্ডলী সকল ঘুরিতে ঘুরিতে পরস্পরের প্রতি "আসক্ত" হইতে আরম্ভ করিল। জড়বাদী বৈজ্ঞানিকের মতে এই আসক্তি কুণ্ডলিকাকার গতির ফলমাত্র। (তাঁহারা হয়ত একদিন ইহা প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইবেন যে মানুষের প্রতি মানুষের আসক্তি বা প্রেম, মানুষের মাথা ঘোরার ফল মাত্র!) সে যাহা হউক, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে কুণ্ডলিকাকার গতির কার্য্যকারিতা আসক্তিতে নিবদ্ধ। এই আসক্তিবশে জড়কুণ্ডলী সকল ঘুরিতে ঘুরিতে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট, এবং সান্নিধ্যানুক্রমে পরস্পরের সহিত মিলিত হইয়া, বহুপরমাণুর সমাবেশে এক একটা অণু সৃষ্টি করিতে লাগিল। পরমাণু সকল একজাতীয় হইলেও অণুতে জাতিভেদ আছে; তাহার কারণ জড়কুণ্ডলীর বিভিন্ন স্থিতিবৈচিত্রে সমাবেশ। অণুতে পরমাণুর ভিন্ন ভিন্ন স্থিতিবৈচিত্রবশতঃ অণুসকল ভিন্নভিন্নজাতীয় হইয়া থাকে।

ভিন্ন ভিন্ন পরমাণুর আসক্তির সমষ্টি দ্বারা অণুর আসক্তি পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। এই সমষ্টি কেবলমাত্র পারমাণবিক আসক্তির যোগফল নহে, পরমাণু সকলের অবস্থিতিভেদে আণবিক আসক্তির পরিমাণবৈষম্য ঘটিয়া থাকে। এ কারণ সমসংখ্যক পরমাণুদ্বারা গঠিত সকল অণুর আসক্তি

* "On the motion of Vortex Ring" by J. J. Thomson, (Adam's Prize Essay, 1882 দ্রষ্টব্য।

সমান নহে। যে অণুর আসক্তি যত অধিক, তাহা সেই পরিমাণে তৎসন্নিহিত অপর অল্পাসক্তিবিশিষ্ট অণুকে আপনার দিকে টানিয়া লয়। এইরূপে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বহুসংখ্যক অণুর একত্র সমাবেশ ঘটিয়া ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ উৎপন্ন করিয়াছে। যেমন নির্ম্মল আকাশে দেখিতে দেখিতে বাষ্পকণাসকল ঘনীভূত হইয়া মেঘ উৎপন্ন করে, জড়জগতের আদি উৎপত্তির প্রথাও সেইরূপ।

পদার্থের উৎপত্তিসাধন করিতে গিয়া জড় পরমাণু যে আপনার স্বাতন্ত্র্য বিলোপ করিয়া দেয়, তাহা নহে; তাহার কুণ্ডলিকাকার গতি চিরকাল অক্ষুণ্ণ থাকে। এই হেতু পদার্থসকল জন্ম হইতেই এক দুর্দ্দম্য গতিলিপ্সা প্রাপ্ত হয়।

অণুতে অণু মিশিয়া স্থানে স্থানে তাহাদের আকার ক্রমে বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইতে আরম্ভ করিল। এইরূপে জড়জগৎ, পরস্পর হইতে ব্যবচ্ছিন্ন খণ্ড খণ্ড নীহারিকাতে পরিণত হইল। এই সকল নীহারিকাতে গতির বিরাম নাই; বরং উত্তরোত্তর অধিক সংখ্যক অণুর সমাবেশে তাহাদের গতিলিপ্সা ও তদানুসঙ্গিক আসক্তি বহুপরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ইহার ফলে এক একটী নীহারিকা বিপুল শক্তির আধার হইতে আরম্ভ করিল। জড় না থাকিলে শক্তি প্রকটিত হইতে পারে না, এইকারণ জড়কে শক্তির 'বাহন' কহে। আবার যেখানে জড় পদার্থ যত বেশী, সেখানে শক্তি প্রকটনের সুযোগ তত বেশী। আকাশে যেমন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘের সমষ্টি হইতে ক্রমে বৃহৎ মেঘের উৎপত্তি হইতে দেখা যায়, নীহারিকাজগতেও তাহা ঘটিতে লাগিল। নীহারিকা যত আকারে বাড়িতে লাগিল, তত তাহার অণু সকলে গতি ও আসক্তি প্রবল হইতে লাগিল। ইহার বলে নীহারিকা ক্রমে ঘনীভূত হইয়া, পরিশেষে এক বিশাল পদার্থখণ্ডরূপে ঘুরিতে লাগিল।

ক্রমে পরমাণুসকলের কুণ্ডলিকাকার গতি ভিন্ন, সমগ্র নীহারিকার একটী বিস্তীর্ণ আবর্ত্তন প্রকটিত হইতে লাগিল। অণুসকলে যত আসক্তি বাড়িতে লাগিল, তত তাহারা পরস্পর অধিকতর সান্নিধ্যে আসিতে লাগিল; এবং ইহার অবশ্যম্ভাবী ফলে নীহারিকার আয়তন সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। এই সঙ্কোচনের অবশ্যম্ভাবী ফল নীহারিকার ঘনীভবন, এবং নীহারাবস্থা হইতে ঘনবাষ্প, তাহা হইতে তরল, তাহা হইতে কর্দ্দমবৎ এবং অবশেষে কঠিন অবস্থায় পরিণতি। ইহাই জড় জগতের উৎপত্তির ক্রম।

একটী তরল অথবা নমনশীল গোলককে ঘুরাইতে আরম্ভ করিয়া, যদি ক্রমে ক্রমে তাহার বেগ বৃদ্ধি করা যায়, তবে তাহার মধ্যভাগ ক্রমে স্ফীত হইয়া অবশেষে তাহা গোলক ছাড়িয়া দূরে পলায়ন করিতে চেষ্টা করে। নীহারিকা সকল যতই ঘনীভূত হইতে লাগিল, ততই তাহারা স্ব স্ব আবর্ত্তনগতিবশে ক্রমশঃ গোলাকার ধারণ করিতে লাগিল। (এখনও জড়জগতে এমত নীহারিকা দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা ঘনীভবনের এরূপ মাত্রায় পৌঁছায় নাই, যে অবস্থায় তাহারা এক অখণ্ডিত পদার্থরূপে ঘুরিতে আরম্ভ করিতে পারে।) যখন নীহারিকা এক অখণ্ডিত পদার্থরূপে ঘুরিতে আরম্ভ করে, তখন তাহার একটী কেন্দ্র জন্মাইতে থাকে এবং ঘনীভবনের ক্রম ঐ কেন্দ্রের দিকে প্রবল হয়। ইহারই ফলে কৈন্দ্রিক আকর্ষণের উৎপত্তি হয়, যাহা এক্ষণে মাধ্যাকর্ষণ নামে পরিচিত হইয়াছে। বস্তুতঃ মাধ্যাকর্ষণ ভিন্ন ভিন্ন আণবিক আকর্ষণের সমষ্টি ভিন্ন আর কিছুই নহে। ইহাই পারমাণবিক আসক্তির পরিণতি। ইহার ফলে অণুসকল কেন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট থাকিয়া তাহাকে বেষ্টন করিয়া আবর্ত্তন করে। ঐ আবর্ত্তনের ফলে নীহারিকা যত ঘন হইতে থাকে, ততই তাহা নমনশীল গোলকের ন্যায় মধ্যভাগে স্ফীত হইয়া পড়ে। অবশেষে যখন স্ফীতাংশে গতির বেগ এত প্রবল হয় যে তত্রস্থ জড়াংশ স্বীয় জড়ধর্ম্মবশে গতির মুখে চলিতে প্রয়াস পায়, এবং তাহার বেগ কৈন্দ্রিকাকর্ষণের মাত্রা ছাড়াইয়া উঠে, তখন ঐ স্ফীতাংশ দূরে ছড়াইয়া পড়ে। এরূপ অবস্থায় তাহা মূল নীহারিকার কেন্দ্র হইতে দূরে অপসারিত হইয়া আপনা আপনি আবার জড়ীভূত ও ঘনীভূত হইতে চেষ্টা করে। এই ঘনীভবনাবস্থায় তাহার আবার গোলাকার স্বরূপ প্রকটিত হইয়া তাহাতে স্বতন্ত্র কেন্দ্রের উৎপত্তি হয়; এবং তাহা একখণ্ড স্বতন্ত্র পদার্থরূপে প্রকাশ পায়।

মূল নীহার-গোলক হইতে উপরোক্ত প্রকারে খণ্ডবিশেষ বিচ্যুত হইয়া স্বতন্ত্র গোলকের উৎপত্তি জড়ধর্ম্মের প্রক্রিয়া মাত্র। কিন্তু তদ্দ্বারা মূল ও খণ্ড গোলকের পরস্পর সম্বন্ধবিচ্যুতি ঘটে না;—তাহাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি

পরস্পরের আসক্তি, পরস্পরের কেন্দ্রের দূরত্বানুসারে হ্রাস পাইলেও, একেবারে বিলোপ পায় না। এ কারণ খণ্ড গোলক মূল গোলককে বেষ্টন করিয়া ঘুরিতে থাকে। এরূপ স্থলে মূল গোলককে "সূর্য্য" ও খণ্ড গোলককে "গ্রহ" কহে। গ্রহ সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া চলিতে চলিতে যত ঘনীভূত হইতে থাকে, ততই তাহার কেন্দ্রবেষ্টনী গতি প্রবল হইয়া উঠে; এবং ক্রমে ঐ গতির বৃদ্ধিহেতু তাহা নমনশীল গোলকের ন্যায় মধ্যভাগে স্ফীত হইতে থাকে। এইরূপে গ্রহ হইতে কালক্রমে ক্ষুদ্র বা "উপ"-গ্রহের উৎপত্তি হয়।

উপরোক্ত প্রকারে যথাক্রমে বহুসংখ্যক গ্রহ ও উপগ্রহের উৎপত্তি হইয়া, কালে এক একটী সূর্য্যের চারিদিকে এক একটী বৃহৎ পরিবারের সৃষ্টি হয়। ইহার নাম "সৌরজগৎ"। এতাবৎকাল সূর্য্য গ্রহ এবং উপগ্রহগণ ক্রমশঃ ঘনীভূত হইতে থাকে; এবং তদবস্থায় যথাক্রমে গাঢ়বাষ্প হইতে তরল, কর্দ্দমবৎ ইত্যাদি অবস্থা অতিক্রম করিয়া কঠিনাবস্থায় পরিণত হয়। যে গোলক যত কাঠিন্যে অগ্রসর হইতে থাকে, তাহার আভ্যন্তরিক অণুসকলের পরস্পর ঘর্ষণে তাহাদের আণবিক গতির তত হ্রাস হয়। বিজ্ঞান আমাদিগকে জানাইয়া দিতেছে যে ঐ আণবিক গতির ফল— উত্তাপ এবং আলোক। (উত্তাপ এবং আলোক কি সূত্রে উৎপন্ন হয়, এস্থলে তাহার আলোচনা অসম্ভব।) একারণ পদার্থখণ্ড যত ঘনীভূত হইতে থাকে, ততই তাহাদের আণবিক গতি ঘর্ষণবলে অধিকতর উত্তাপ বিকীর্ণ করিয়া থাকে; এবং যখন ক্রমে তাহা কঠিন পদার্থে পরিণত হয়, তখন তাহার উত্তাপ বিকিরণের ক্ষমতা চলিয়া যায়।

আমরা যে সূর্য্যকে বেষ্টন করিয়া চলিতেছি, তাহার ন্যায় আরও কত সূর্য্য জগতে রহিয়াছে, তাহা কে বলিতে পারে? এবং ইহা যে অপর কোন মহাসূর্য্য হইতে স্খলিত হইয়া আসে নাই, তাহাই বা কে নির্ণয় করিতে পারে? পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে ইহা প্রমাণিত হয় যে যে সূর্য্য কোন মূল নীহারিকার সঙ্কোচনসম্ভূত, তাহার স্থানান্তর গমনের প্রয়াস সম্ভবপর নহে। কিন্তু গণনাদ্বারা ইহা স্থিরসিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে আমাদের সূর্য্য শূন্যপথে কোন নির্দ্দিষ্ট দিকে চলিতেছে (গত মাঘের ভারতী, "সৌরজগতের গতি" বিষয়ক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)। অতএব ইহা সহজে প্রতিপন্ন হয় যে আমাদের সূর্য্য কোন মূল নীহারিকার সঙ্কোচন দ্বারা উৎপন্ন হয় নাই, পরন্তু কোন এক মহাসূর্য্যের সঙ্কোচনের এবং আবর্ত্তনের ফলে স্খলিত হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে। সৌরজগতের গ্রহসকল যেমন ক্রমশঃ জমিতে জমিতে কঠিনাবস্থায় পরিণত হইতেছে, আমাদের সূর্য্যও যে এককালে সেইরূপ কঠিন পদার্থখণ্ডে পরিণত হইবে, তাহা সহজে অনুমান করা যায়। তখন যে সূর্য্যের সূর্য্যত্ব ঘুচিয়া যাইবে, অর্থাৎ তাহা নির্ব্বাপিত হইয়া একটী "অন্ধসূর্য্যে" পর্য্যবসিত হইবে, তাহাও স্বীকার করা অসম্ভব নহে।

সৌরজগতে কয়েকটি গ্রহ একেবারে নির্ব্বাপিত হইয়া গিয়াছে, যথা বুধ এবং শুক্র; কয়েকটী গ্রহের আবরণভাগ নির্ব্বাপিত হইলেও অভ্যন্তরভাগ এখনও উত্তপ্ত রহিয়াছে, যথা পৃথিবী ও মঙ্গল। অপর কোন কোন গ্রহ এখনও কিঞ্চিৎ উত্তাপ বিকিরণের ক্ষমতা রাখে,—যথা, বৃহস্পতি। ইহাদের স্বরূপ আলোচনা করিলে সৌরজগতের ক্রমোৎপত্তিবিধান অনেক পরিমাণে জ্ঞাত হওয়া যায়।

এস্থলে সূর্য্যের জন্মবৃত্তান্ত যাহা বর্ণিত হইল, তাহা হইতে ইহা প্রমাণ হইতেছে যে সূর্য্য অমর নহে; তাহার বিনাশ না থাকিলেও নির্ব্বাণ আছে। এক্ষণে এই প্রশ্নের আলোচনা হওয়া আবশ্যক যে সূর্য্য একবার নির্ব্বাপিত হইয়া গেলে তাহার পুনর্দীপ্তিলাভের সম্ভাবনা আছে কিনা।

প্রায় দশ বৎসর গত হইল আকাশের এক প্রান্তে হঠাৎ একটী অত্যুজ্জ্বল নব তারকার আবির্ভাব হইয়াছিল। কয়েক বৎসর পর্য্যবেক্ষণের পর দেখা গেল যে তাহার প্রখর দীপ্তি হ্রাস হইয়া ক্রমশঃ তাহা একটী সাধারণ তারার আকার ধারণ করিতেছে। প্রথমে যেরূপ দেখা গিয়াছিল তাহাতে অনুমান করা যাইত, যেন আকাশের কতকগুলি তারা একত্র হইয়া একটী বৃহৎ তারা গঠন করিয়াছে। কিন্তু যত দিন যাইতে লাগিল তত দেখা গেল যে তাহার দীপ্তি ক্রমশঃ কমিয়া গিয়া এক্ষণে তাহা একটী স্থির নক্ষত্রের আকার ধারণ করিয়াছে। কিছুকাল যাবৎ তাহার আর কোন বৈলক্ষণ্য দেখা যাইতেছে না। অগ্নিকুণ্ডে কাষ্ঠ কিম্বা কয়লা নিক্ষেপ করিয়া তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিলে তাহা প্রথমে দপ্ দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে; কিয়ৎক্ষণ পরে তাহার

উদ্দাম দীপ্তি কমিয়া গিয়া তাহা স্থিরভাবে জ্বলিতে থাকে। উপরোক্ত নবতারকাতে এইরূপ প্রক্রিয়ার আভাস পাওয়া যাইতেছে।

কোন কোন জ্যোতির্ব্বিদ মনে করিতেছেন যে আকাশের যে স্থানে উপরোক্ত নব তারকার প্রকাশ হইয়াছে, তথায় একদল উল্কা বিচরণ করিয়া একটী "উল্কাশয়" সৃষ্টি করিয়াছিল। কোন একটি অপরিচিত নির্ব্বাপিত সূর্য্য আপন গন্তব্য পথে চলিতে চলিতে ঐ উল্কাশয়ে আসিয়া পড়িয়াছে; এবং এক ঝাঁক উল্কার সংঘর্ষে আসিয়া তাহার গতি প্রতিহত হওয়াতে তাহা জ্বলিয়া উঠিয়াছে। বায়ুর সংঘর্ষে উল্কা প্রজ্বলিত হইতে সচরাচর দেখা যায়। এক ঝাঁক উল্কার সংঘর্ষে আসিয়া যে একটী অন্ধসূর্য্য জ্বলিয়া উঠিবে, তাহা বিচিত্র নহে। আবার ঐ সূর্য্যের আঘাতে উল্কাশয়ের উল্কারাশি যে জ্বলিয়া উঠিবে তাহাতেও আশ্চর্য্যের বিষয় কিছু নাই। পরন্তু ইহা অনুমান করা স্বাভাবিক যে, পৃথিবীর সান্নিধ্যে উল্কা আসিলে তাহা যেমন পৃথিবীর দিকে আকৃষ্ট হইয়া ধরাতলে উল্কাপাত ঘটায়, উক্ত অন্ধসূর্য্য উল্কাশয়ে নিপতিত হইয়া তাহার উল্কারাশিকে সেইরূপে আকৃষ্ট করিয়া আপনার সংঘর্ষে আনিয়াছে, এবং ঘর্ষণজনিত উত্তাপে তাহাদিগকে দগ্ধ করিয়াছে। ইহাই নব তারকার প্রথম উদ্দাম দীপ্তির কারণ। এক্ষণে ঐ নির্ব্বাপিত সূর্য্য সম্পূর্ণরূপে প্রজ্বলিত হইয়া একটা নব অথবা পুনর্জ্জীবিত সূর্য্যরূপে প্রকাশিত হইয়াছে, এবং তাহাকে আমরা একটী নবতারকারূপে দেখিতে পাইতেছি। এই অনুমান যদি সত্য হয় তাহা হইলে তদ্দারা ইহা প্রমাণ হইতেছে যে সূর্য্য একবার নির্ব্বাপিত হইয়া অসাড় জড়পিণ্ডে পরিণত হইলেই তাহাতে সৃষ্টির অবসান হইল না। নির্ব্বাপিত সূর্য্য পুনর্জ্জীবিত হইয়া তদ্দারা নূতন সৌরজগৎ সৃষ্টি হইবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। সূর্য্য জ্বলিয়া উঠিলেই তাহা একেবারে নীহারিকাতে না হউক অন্ততঃ বাষ্প কিম্বা তরলাবস্থায় পরিণত হইবে। তাহা হইলে ঐ সূর্য্য হইতে যথাক্রমে গ্রহ উপগ্রহাদির উৎপত্তি ঘটিতে পারে। এইরূপে জীর্ণ বিশ্বের পুনঃসংস্কার বিধাতার মঙ্গল বিধানেরই পরিচায়ক।

শ্রীঅপূর্ব্বচন্দ্র দত্ত।

পচ্‌মঢ়ি শৈল।

আমরা গতবৎসর পূজার বন্ধে পচ্‌মঢ়ি শৈলে সপরিবার বেড়াইতে গিয়াছিলাম। আজকাল চতুর্দ্দিকে রেল হইয়া অনেক প্রসিদ্ধ শৈলশিখরে বিহার অনায়াসসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে বটে, কিন্তু প্রয়াগ হইতে যাইতে হইলে বোধ হয় পচ্‌মঢ়ি যাওয়াই সুবিধা। পচ্‌মঢ়ি একটি অনুচ্চ অধিত্যকা, মধ্যভারতবর্ষে অবস্থিত, এলাহাবাদ হইতে ৩৭১ মাইল। শেষ ৩২ মাইল টাঙ্গা করিয়া যাইতে হয়, বাকী রেলের পথ। এলাহাবাদ হইতে মেলে যাইলে ১০।১১ ঘণ্টার মধ্যে পৌঁছান যায়। টাঙ্গায় ৫।৬ ঘণ্টার উদ্ধ লাগে না। স্থানটি তত বেশী উচ্চ না হওয়ায় অন্য পার্ব্বত্যপ্রদেশ অপেক্ষা গরম, আশ্বিন কার্ত্তিক মাসে শীতে হি হি করিতে হয় না। আমাদের আজ কাল দিন দিন ইংরাজী মেজাজ হইয়া পড়িতেছে, পাহাড়ে বেড়াইতে গেলেই বরফ বরফ, (snow) করিয়া পাগল হইয়া পড়ি; কিন্তু আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ত বোধ হয় যে গ্রীষ্মপ্রধানদেশবাসীদের পক্ষে শীতাধিক্যটা তত সুবিধাজনক জিনিস নয়। পচ্‌মঢ়ি স্থানটি বড় নিরিবিলি। লোকসংখ্যা হাজার দুই তিনের বেশী হইবে না। সাহেব সুবোর ভিড় বর্ষার পর বড় বেশী থাকে না,—গরমের সময় অবশ্য চীফ্ কমিশনর আসেন, তখন ভিড়ও হয়,—কাজেই বাঙ্গালী মেয়ে ছেলে লইয়া যাইবার জন্য, বিশেষ করিয়া সেকেলে লোকেদের পক্ষে, বড় সুবিধা।

তাই একদিন বুধবার সেপ্টেম্বর মাসে আমরা বেলা ১১-৪২ মিনিটের সময় "বম্বে মেলে" বাহির হইয়া পড়িলাম। বাঙ্গালী মেয়েদের গড়িমসী করা বোধ হয় স্বাভাবিক অভ্যাস;—আমরা বহুকষ্টে ট্রেণ ছাড়িবার ২ মিনিট পূর্ব্বে ষ্টেশনে পহুছিলাম। কিন্তু গাড়ী "রিজর্ভ" করা হইয়াছিল, পূর্ব্ব হইতে লোক পাঠাইয়া মাল চড়াইয়া দেওয়া হইয়াছিল, তাই রক্ষা—আমরা ছুটাছুটী করিয়া গাড়ীতে উঠিলাম আর ট্রেণ ছাড়িয়া দিল। আমরা সন্ধ্যা ৬॥ টার সময় জব্বলপুর পহুছিলাম। সেইখানেই ঈষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে শেষ। তাহার পর গ্রেট্ ইণ্ডিয়ান পেনিনসুলার লাইন। কিন্তু আমাদের গাড়ীখানি সোজা (through) বোম্বাই যাইবে, আমাদের আর গাড়ী বদলাইতে হইল না। এলাহাবাদ

হইতে জব্বলপুর যাইতে পথে মাঠ, চষা ক্ষেত এবং পাহাড় —সকল দৃশ্যই দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানে স্থানে পাহাড় কাটিয়া বা ফাটাইয়া রাস্তা করিয়াছে। জমী সর্ব্বত্র সমতল না হওয়ায় কোথাও বা একটু হেলিয়া অথবা একপেশে হইয়া রেলগাড়ী যায়। বিস্তৃত ক্ষেত বা ঘাসপূর্ণ মাঠ অনেক স্থানেই দৃষ্ট হয়, তাহার মধ্যে দুই একটি খেজুর গাছ দেখিতে বড় সুন্দর।

আমরা রাত্রি ১০॥টার সময় পিপরিয়া ষ্টেশনে পঁহুছিলাম। পাচ্‌মঢ়ি যাইতে হইলে এইখানে নামিতে হয়। আমরা নামিয়া বেশী দরকারী ও হাল্‌কা দ্রব্য কিছু সঙ্গে রাখিয়া বাকী মাল সব বুলাকিনন্দকিশোরদের লোকের হাতে সমর্পণ করিলাম। বলিলাম যে গরুর গাড়ী করিয়া যেন পাচ্‌মঢ়ি পাঠাইয়া দেওয়া হয়। সেঠ বুলাকি নন্দকিশোরেরা পচ্‌মঢ়ির প্রধান কণ্ট্রাক্টর, ইহাদের টাঙ্গার কারবার। আমরা ইহাদের পূর্ব্ব হইতে লিখিয়া দুখানা টাঙ্গা বৃহস্পতিবার সকালের জন্য ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম।

আমরা সে রাত্রে নিকটস্থ ডাকবাঙ্গলায় যাইয়া শুইলাম। ডাকবাঙ্গলাটি বেশ, পরিষ্কার ও পরিপাটী; আমরা লোহার খাটে নরমগদীর উপর আরামে নিশাযাপন করিলাম। পিপরিয়া তত উঁচু জায়গা নহে, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১১০০ ফুট উচ্চ। এসময় সেখানে রাত্রে বেশী ঠাণ্ডা হয় না। পাহাড়ের পথে ডাকবাঙ্গলাগুলি বড় আরামের জিনিস। একটু বেশীরকমের হিন্দু হইলে খাওয়া দাওয়া ও অন্যরূপ কষ্ট হয়ত হইতে পারে, কিন্তু রাত্রে শোয়ামাত্র প্রয়োজন হইলে কোন কষ্ট নাই। এইজন্য আমার সকল পাঠকপাঠিকাকেই আমি পিপরিয়া ডাকবাঙ্গলায় রজনীযাপন করিতে অনুরোধ করি। একলা মানুষ হইলে ডাকটাঙ্গায় যাইতে পারেন। সেখানি রাত দুটা নাগাদ পিপরিয়া ছাড়ে ও ভোরবেলা পচ্‌মঢ়ি পঁহুছায়। ভাড়া লোক পিছু ৮৲। কিন্তু অত তাড়াতাড়ি যদি না থাকে, তাহা হইলে রাত্রে ডাকবাঙ্গলায় ঘুমাইয়া, সকালে পিপরিয়া ছাড়াই সুবিধা।

আমরা পুরুষেরা প্রাতে কিঞ্চিৎ চাপান করিয়া প্রায় ৬-৪৫ মিনিট নাগাদ টাঙ্গা করিয়া রওয়ানা হইলাম। আমার পাঠকপাঠিকারা হয়ত সকলে টাঙ্গাগাড়ী দেখেন নাই। তাই তাহার একটু বিবরণ দি। টাঙ্গা একটি দ্বিচক্র যান, টমটমের মত তাহাতে সাম্নে পিছনে বসিবার স্থান আছে, উপরে একটা মস্ত ছাতের মত, বৃষ্টি পড়িলে বড় হাতে মুখে লাগে না, একটু পা ভিজিতে পারে। টাঙ্গায় ঘোড়াও জোতা হয়, বলদও জোতা হয়। পিপরিয়া পচ্‌মঢ়ি অঞ্চলে একটি টাঙ্গায় এক জোড়া ঘোড়া বা বলদ লাগে। জব্বলপুরে এক ঘোড়ার টাঙ্গাই বেশী। দুই চাকার গাড়ী বলিয়া উচুনীচুতে পড়িলে টাঙ্গার অনিষ্ট হয় না। তবে রাস্তা খারাব হইলে বড় ঝাঁকরানি লাগে, এবং বুলাকি নন্দকিশোরদের ঘোড়ার টাঙ্গায় ঘোড়ার ঘাড়ের উপর দিয়া একটা লম্বা লোহা থাকে, সেটার বড় শব্দ হয়। পিপরিয়া হইতে পচ্‌মঢ়ি পর্য্যন্ত একখানা ঘোড়ার টাঙ্গার ভাড়া ১৬৲, একখানা বলদের টাঙ্গার ভাড়া ১২৲। ঘোড়ার টাঙ্গাকে সিমলা টাঙ্গা বলা হয়। তিনজন লোক একখানা টাঙ্গায় বেশ বসিয়া যাইতে পারে, কিছু আসবাবও তাহাদের সহিত যাইতে পারে। গরুর টাঙ্গাগুলি ঘোড়ার টাঙ্গা অপেক্ষা কিছু ছোট হয় এবং প্রায় ঘণ্টা দুই পরে পঁহুছায়।

পিপরিয়া হইতে পচ্‌মঢ়ি ৩২ মাইল পথ, রাস্তা বেশ ভাল, বাইসিকেল্ করিয়া সাহেবেরা যান, বোধহয় ল্যাণ্ডো জুড়ি হাকাইয়াও যাওয়া যাইতে পারে। প্রথম ১৮ মাইল পথে বড় চড়াই নাই, ভূমি অনেকটা সমতল। এই স্থানটায় দেনবা নদী পার হইতে হয়। নদীটি বিশেষ বড় নয় এবং তাহার উপর একটি পাথরের পোল আছে। কিন্তু অন্যান্য গৈরিক নিস্রাবের ন্যায় ইহার জল মধ্যে মধ্যে হঠাৎ বাড়িয়া উঠে, পোল ডুবিয়া যায়; আবার ঘণ্টা কয়েকের মধ্যে জল নামিয়া যায়, পোলের উপর দিয়া লোক গাড়ী প্রভৃতি বেশ যাইতে পারে। এই নদীটি নর্ম্মদার একটি শাখা। ইহাতে যথেষ্ট মাছ পাওয়া যায়। ইহার পরই উপত্যকার শেষ, পর্ব্বতে চড়াই আরম্ভ হয়। সমস্ত পথেই অতি সুন্দর প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। পিপরিয়া হইতে প্রত্যূষে ছাড়িলে দূরে নীল আকাশের নীচে স্নিগ্ধ নীল মেঘরাশির ন্যায় মহাদেব পর্ব্বতশ্রেণী দেখিতে পাওয়া যায়, এবং ধূপগড় শৃঙ্গ স্বচ্ছ গগনপটে চিত্রার্পিতপ্রায় লক্ষিত হয়। আমাদের ঐ পর্ব্বতশ্রেণী চড়িতে হইবে। ধূপগড় পচ্‌মঢ়ি হইতে ৬ মাইল পথ। খানিকটা অগ্রসর হইলে জঙ্গলের মধ্যে আসিয়া পড়া যায়। সে দৃশ্য বড় সুন্দর। মধ্যে লাল

রাস্তা, দুই দিকে নিবিড় বন, সুদূর পর্য্যন্ত সোজা সোজা লম্বা লম্বা গাছ উঠিয়া গিয়াছে, নীচে ঘাস ও আগাছা আচ্ছন্ন জমীটা সবুজ, উপরে ডাল ও পাতার জন্য আকাশও যেন সবুজ। পিপরিয়া হইতে ৯ মাইল অগ্রসর হইলে একটা খুব জঙ্গলি রকমের পাহাড়ের নিকট আসিয়া পড়া যায়। এখানে শুনিলাম বিকালে কখন কখন টাঙ্গার সহিত বাঘের সাক্ষাৎ হয়। দেনবা পার হইলে, পাহাড় চড়িতে আরম্ভ করিলে, বন যেন আরও বাড়িয়া যায়, আর বর্ষার পর আসিতে পারিলে মধ্যে মধ্যে এমন সুন্দর ঝরণা দেখিতে পাওয়া যায় যে তাহার চিত্র শীঘ্র ভুলা যায় না। দূরে অবিরাম একটা সজোরে শব্দ হইতেছে শুনিতে পাইবেন, কাছে আসিলে দেখিবেন যেন কোন অদৃশ্য স্বর্ণকার একরাশ গলান ফুটন্ত রূপা পাহাড়ের গা দিয়া গড়াইয়া দিতেছে। গভীর নাদে পতিত হইয়া সেই রজতধারা পথপ্রান্তে প্রবাহিত হইয়া যাইতেছে। পথে নানারূপ সুন্দর গাছও দেখিতে পাওয়া যায়। সেগুনের বড় আদর; সেগুন ত আছেই, তাহা ছাড়া আম আছে, কাল জাম আছে, হরিতকী, আমলকী, আরও কতকি যা আমি চিনি না। একটি বৃক্ষ পচ্‌মঢ়ির কাছাকাছি অনেক, তাহার কাণ্ড ও শাখা বেশ মসৃণ, এবং তাহাতে কেমন সাদা-রা সবুজের মধ্যে রক্তিম আভা। তাহার পাতা খুব বড় বড়। অনেক স্থানে এই গাছ যেন পাথরের উপর হইতেই উঠিয়াছে বোধ হয়। পচ্‌মঢ়ি হইতে ১।০ মাইল দূরে একটি বৃক্ষের নিম্নে একটি সিন্দুরমাখান দেবীমূর্ত্তি আছে। বোধ হয় অষ্টভুজামূর্ত্তি, তবে অম্বা কি মহাকালী মূর্ত্তি তাহা বলিতে পারিনা। শুনিলাম মহাকালীদেবীও নাকি অষ্টভুজারূপে এদেশে চিত্রিত হইয়া থাকেন। মূর্ত্তি প্রস্তরের, পাশেই একটি লাল পতাকা। এখানে পর্ব্বতবাসীরা প্রায়ই পূজা দিতে আসে, এবং একটি কিম্বা একাধিক ব্যাঘ্র দেবীর সেবায় নিযুক্ত আছে, শুনিতে পাওয়া যায়।

আমরা একখানা ঘোড়ার এবং একখানা গরুর টাঙ্গা ভাড়া করিয়াছিলাম। ঘোড়ার টাঙ্গাখানি বেলা ১২টা নাগাদ আমাদিগকে পচ্‌মঢ়ি পঁহুছাইয়া দিল। দুর্ভাগ্যবশতঃ কিন্তু সেখানে পঁহুছাইয়া আমরা দেখিলাম যে আমাদের যে বাড়ীতে নামিবার কথা ছিল, তাহার দ্বারে চাবি বন্ধ। কাযেই আমাদিগকে আর একটি বাড়ীতে আশ্রয় লইতে হইল। আমরা পূর্ব্বে হইতে একটি বামন (পাচক) ও একটি চাকর রওনা করিয়াছিলাম। তাহারা পঁহুছিয়াছিল ঠিক্ বটে, কিন্তু গরুর গাড়ীতে আসিতে তাহাদের ২৪ ঘণ্টার বেশী লাগিয়া গিয়াছিল। আমরা আসিয়া দেখি তাহারা আমাদের খাবার দাবারের কোন উদ্যোগ করে নাই, দিব্য ঘুমাইতেছে। তাহাদের উঠাইয়া আহারের আয়োজন করিতে খানিক সময় কাটিয়া গেল। আমরা যখন খাইয়া উঠিলাম, তখন বেলা ২টা। সেই সময় গরুর টাঙ্গাখানি আসিয়া পঁহুছিল। তাহাতে যাঁহারা আসিলেন, তাঁহারা অবশ্য আসিয়াই তপ্ত ভাত পাইলেন। কিন্তু তাঁহারা পথিমধ্যে বড় ক্ষুধাক্লিষ্ট হইয়াছিলেন, এবং কয়স্থানে বৃক্ষ হইতে আমলকী ও তেঁতুল ভাঙ্গিয়া খাইয়াছিলেন। "কি খাইব?" কেবল এই কথা মনে ভাবিলে ক্ষুধা বেশী আসে। তাঁহাদের সঙ্গে খাবার সামগ্রী কিছু ছিল না, সমস্ত ভুলক্রমে ঘোড়ার টাঙ্গায় তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহারা জানিতেন যে তাঁহাদের পচ্‌মঢ়ি পহুছাইতে দেরী হইবে, তাঁহারা ভাবিয়াই আকুল যে ক্ষুধা পাইলে কি খাইব। কিন্তু ইংরেজেরা বলে, সয়তানের কথা ভাবিতে নাই, সে অমনি আসিয়া উপস্থিত হয়; সেইরূপ তাঁহাদের ভাবনার সহিত ক্ষুধার উদ্রেক হইল; কি করেন, শেষটা কোনরূপে আমলকী ও তেঁতুল খাইয়া জঠরানলকে শান্ত করেন। যাহারা ঘোড়ার টাঙ্গায় আসিয়াছিল, তাহাদের আশা ছিল পচ্‌মঢ়ি পঁহুছাইতে তত দেরী হইবে না ও সেখানে বামন বোধ হয় সব রাঁধিয়া বাড়িয়া রাখিবে, কাযেই তাহারা খাবারের কথা ভাবেও নাই এবং ক্ষুধার্ত্তও হয় নাই।

সে যাহা হউক, পচ্‌মঢ়িত পঁহুছান গেল, কিন্তু বাড়ির সুবিধা হইল না। পরন্তু একটও ২।৩ দিনের জন্যই ছিল। হোসঙ্গাবাদের খ্যাতনামা উকীল শ্রীকালিদাস চৌধুরী রায় বাহাদুর তাঁহার বাটিতে থাকিতে আমাদিগকে অনুমতি দিলেন। আমরা সেইখানে গিয়া উঠিলাম। সে বাড়ীটি আমাদের বড় পছন্দ হইয়াছিল। বাড়ীটি ছোট কিন্তু আমাদের অকুলান হইত না। বাড়ীটির অনেক গুণ, বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, বহির্বাটী ভিতরবাটী আলাদা, খানিকটা জমীও ছিল যাহাতে ২।১ টা গোলাপ গাছ (আমরা পশ্চিমে লোক, আমাদের কেমন বাড়ীতে একটু compound

বা খালি জমী না থাকিলে হাঁপ লাগে)। বাড়ীটি বাজারের ভিতরও নহে অথচ বাজার হইতে সম্পূর্ণ পৃথকও নহে, এবং বাড়ীর পিছনেই একটি ক্ষুদ্র নদী যেন শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ের সমুদায় তন্ত্রীতেই ঝঙ্কার দিয়া কল কল রবে ছুটিয়াছে। চন্দ্রালোকে নৈশসমীরণে এই কলনাদিনী স্রোতস্বিনীর তীরে বসিয়া ইহার অবিরাম আনন্দধ্বনি শুনিলে মনের মধ্যে কেমন একটি স্নিগ্ধ শান্তিভাব উদয় হইত! ঐ স্বচ্ছ জল তর তর করিয়া চলিয়াছে, একবারও দাঁড়াইতেছে না, এক বারও কাহারও দিকে ফিরিয়া চাহিতেছে না, কিন্তু উহার আনন্দকল্লোল ত একবারও থামিতেছে না, আপনার মনে আপনি গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে। পৃথিবীতে শ্রমেই সুখ, ইহাতে কোনভুল নাই।

আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি পচ্‌মঢ়ি একটি ক্ষুদ্র স্থান। এইস্থান অনেকটা সমতল এবং বড় লোকসমাকীর্ণ নহে। যদিচ মধ্যদেশের চীফ্‌কমিশনরের গ্রীষ্মাবাস, কিন্তু যথার্থপক্ষে ইহা একটি রুগ্ন গোরাদের শরীর সারিবার স্থান। এখানে বৎসরের বেশীভাগ সময়েই প্রায় ৩০০।৪০০ গোরা শরীর সারিবার জন্য থাকে, এবং তাহাদের ব্যবহারোপযোগী কতকগুলি বারিক নির্ম্মিত আছে। বাঙ্গলাবাড়ী পচমঢ়িতে তত বেশী নাই, কিন্তু বৃষ্টির পর অনেক সময় বেশ সুবিধামত ভাড়াতে পাওয়া যায়। রাস্তাগুলি ভাল, বেশ বেড়াইবার সুবিধা। সাহেবেরা দুইটি রাস্তায় বেশী বেড়ান, কেহ অশ্বে কেহ বাইসিকেলে, কেহ টাঙ্গায়, কেহ গাড়িতে, কেহ বা পদযানে। একটি রাস্তার নাম Long chakker—দীর্ঘ বা বড় চক্র; ইহা পচমঢ়ির পরিধিস্বরূপ, ঘুরিলে ৭।৮ মাইল বেড়ান হয়। অন্যটির নাম Short Chakker—ছোট চক্র; ইহা ঘুরিলে মাইল চারেক বেড়ান হয়। পচমঢ়িতে সাহেবদের একটি "ক্লব" আছে, এবং একটি সাধারণ উদ্যানও আছে। পচমঢ়ি বাজারটি ছোট, তিনটি সারি সারি রাস্তা, তাহার দুই পার্শ্বে দোকান এবং দেশীয় লোকেদের বাড়ী। পিপরিয়া হইতে পচমঢ়ি আসিতে হইলে এই বাজারের নিকট প্রথম আসিয়া পড়া যায়। বাজার ছাড়াইয়া একটা শ্লেট-পোল, তাহার নীচে খানিকটা জল আঁকিয়া বাঁকিয়া গিয়াছে। ইহাকে আমরা পুকুর বলিতে পারি, সাহেবেরা ইহাকে Lake বলেন। ইহা দৈর্ঘ্যে বোধ হয় মাইল খানেক হইবে। "লেকে"র পরেই দুটি একটি করিয়া বাঙ্গলা বাড়ী আরম্ভ হয়।' একটি খৃষ্টান সন্ন্যাসিনীদিগের মঠও ইহার নিকটে আছে।

হাকিম পচ্‌মঢ়িতে দুইজন আছেন, একজন ক্যাণ্টনমেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব—সাক্ষাৎ গোরা,—এবং একজন তহসীলদার বা মুন্সেফ, তিনি নেটিভ। আমি প্রথমবার যখন পচ্‌মঢ়ি বেড়াইতে গিয়াছিলাম তখন একজন বাঙ্গালী তহসীলদার ছিলেন। এইবার দেখিলাম তাঁহার স্থানে একজন খৃষ্টান মুসলমান আসিয়াছেন। তহসীলদারের কাছারি সাধারণ উদ্যানের সন্নিকট, বেশ যায়গায়, কিন্তু কাছারিতে কাজ বড় নাই। তহসীলদার মহাশয়কে মর্ম্মে সাহেবদের লইয়াই বেশী ব্যস্ত থাকিতে হয়, তাহাদের যখন যাহা দরকার হয় তাহার জোগাড় তাঁহাকে করিতে হয়। ক্যাণ্টনমেণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছারিতে ছুটকা ছাটকা ফৌজদারী মোকদ্দমা লাগিয়াই থাকে। বাজারদরের একটা তালিকা আছে। যদি কোন দোকানদার একটা দুই পয়সার জিনিস আপনাকে চার পয়সায় বেচিয়া থাকে, আপনি ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কাছারিতে নালিশ করুন, দোকানদারের কিছু জরিমানা হইয়া যাইবে।

তহসীল কাছারির নিকটেই ডাকঘর ও তার অফিস্‌। সেইখানে একখণ্ড বৃহৎ প্রস্তরের উপর একটি অতি ক্ষুদ্র কামান সংরক্ষিত আছে। প্রত্যহ বেলা দ্বিপ্রহরের সময় সেইটি ইংরাজরাজের জয় চতুর্দ্দিকে ঘোষিত করে। এই স্থান হইতে চীফ্‌ কমিশনরের আবাস অনতিদূরে অবস্থিত। বাড়ীটির বিশেষত্ব বড় কিছু নাই, তবে রাস্তার ধারে কাঠের রেলিংএর পাশে রাঙ্গা ও হলদে কলাফুলের (canna) বড় বাহার আমরা এবার দেখিয়াছিলাম।

পচ্‌মঢ়ি একটি অধিত্যকা বটে, কিন্তু তাহার একটা বিশেষত্ব আছে। উহা একটি প্রাচীরবেষ্টিত অধিত্যকা। উচ্চতর পর্ব্বতের প্রাচীর তিনদিকেত বেশ দেখা যায়। এই পর্ব্বতশ্রেণীর তিনটি শৃঙ্গ বেশী উল্লেখযোগ্য,—ধূপগড়, মহাদেবচূড়া এবং চৌরাদেব। এখানে বলা উচিত যে সমস্ত পর্ব্বতশ্রেণীটারই নাম পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকেরা মহাদেব রাখিয়াছেন। ইহা শতপুরা পর্ব্বতের এক ভাগ, লাল

পাথরের পাহাড়। কিন্তু মহাদেব পর্ব্বত যে লাল প্রস্তরে গঠিত, সেরূপ লাল প্রস্তর অন্যত্র বড় দেখা যায় না। ইহাতে লৌহের অংশ অধিক, সেই জন্য রং কিছু কাল্‌চে, এবং একখণ্ড প্রস্তরে আর এক খণ্ড আঘাত করিলে কেমন একটা ধাতব (metallic) শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। এই প্রস্তরের আর এক বিশেষত্ব--vertical escarpment. সচরাচর যে লাল পাথর দেখা যায় সে যেন এক স্তরের উপর আর এক স্তর সাজান রহিয়াছে বোধ হয়, কিন্তু মহাদেব পর্ব্বতের লাল পাথর সে রকম নহে, সে যেন পাশাপাশি তুলানা পাথর রাখিয়া কেহ জোড়া লাগাইয়া দিয়াছে, দেখিলে এইরূপ মনে হয়। জোড়ের স্থানটা একটু উচ্চ, উপর হইতে নীচে অবধি লক্ষিত হইতেছে। যাহারা ভূতত্ত্ব আলোচনা করিতে ভালবাসেন, তাঁহারা পচ্‌মঢ়িতে অনেক দেখিবার ও ভাবিবার জিনিস পাইবেন।

যাহারা ভূতত্ত্ব কিম্বা অন্য কোন জটিল বিদ্যার চর্চ্চা করিতে আসেন নাই, শুদ্ধ বেড়াইতে আসিয়াছেন, তাঁহারাও পচ্‌মঢ়িতে অনেকরূপ দেখিবার ও ভাবিবার জিনিস পাইবেন। পচ্‌মঢ়িতে প্রথম দেখিবার জিনিস জঙ্গল,— গ্রীষ্মপ্রধান দেশের আরণ্য দৃশ্য (tropical forest scenery)। ইহার বর্ণনা করিতে আমি চেষ্টা করিব না ; কারণ আমরা অনেকেই কবিতা সম্ভোগ করিতে পারি সত্য, কিন্তু কবি না হইলে কবিতা রচনা করিতে পারিনা। তবে এই টুকু বলিতে পারি যে বনের একটা সৌন্দর্য্য, একটা আকর্ষণী শক্তি, আছে, সেটা তাহার নিজস্ব। লোকের মনে বনের কথা শুনিলে হয়ত ভয় হয়, কিন্তু আমার বনের মধ্যে বেড়াইতে অনেক সময় কেমন romantic বোধ হইত। আমার এখন মনে হয় যে ছেলেবেলায় যতটা কল্পনা করা যাইত, ততটা কষ্ট হয়ত রাম সীতা ও লক্ষ্মণ বনবাসে পান নাই। তবে অবশ্য দুইমাসের জন্য বেড়াইতে যাওয়া এবং ১২ বৎসর ধরিয়া বসতি করার মধ্যে অনেক প্রভেদ আছে।

পচ্‌মঢ়ি পাহাড়ে দেখিবার মত প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলি চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে,--যথা গুহা, জলপ্রপাত, খড্ এবং শৃঙ্গ। গুহার মধ্যে প্রধান পঞ্চপাণ্ডব, ঋচখো, এবং মহাদেব। "পঞ্চপাণ্ডবে"র একটি চিত্র এখানে মুদ্রিত করা হইল। পাঠক এক অনুচ্চ পর্ব্বতের গায় দুইসার গুহ দেখিতে পাইবেন। গুহাগুলি পাথরের মধ্যে খোদিত, পাথর কাটিয়া ঘর করা হইয়াছে, বড় বড় থাম করা হইয়াছে। ঘর কয়টি বড় পরিপাটী। হয়ত ইতিহাসের প্রাতঃসন্ধ্যায় প্রাচীন মানব এই উর্দ্ধ প্রস্তরনির্ম্মিত বারাণ্ডায় বসিয়া অরণ্যানীর শোভা দেখিত এবং শিকারের জন্য বন্য জন্তুকে লক্ষ্য করিত। হয়ত আবার কোন সময়ে আধুনিক কালের ঠগ ও দস্যুরা এই কমনীয় স্থানে নিজেদের আবাস নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিল। এখন হিন্দুরা এই গুহাবলিকে একটি তীর্থস্থান করিয়া তুলিয়াছে এবং পঞ্চপাণ্ডবের অরণ্যবাসের স্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকে। কিন্তু যতদূর বুঝিতে পারা যায়, এ গুহা পাঁচটি হিন্দুদের কীর্ত্তি নহে, ইহা বৌদ্ধদের নির্ম্মিত। এটাত নিশ্চিত যে এই পাঁচটি গুহা এখানে থাকার দরুণ এই স্থানের নাম "পচ্‌মঢ়ি" (অর্থাৎ পাঁচটি ঘর বা কুটীর) হইয়াছে। কাপ্তেন ফরসাইথ্ যখন ৪০ বৎসর পূর্ব্বে স্যর রিচার্ড টেম্পলের আমলে এই স্থান সাহেবদিগের জন্য প্রথম আবিষ্কার করেন, তখন তিনি এই পঞ্চগুহার তলে নিজের তাম্বু ফেলিয়াছিলেন। পরে তিনি ইহার সন্নিকটে পচ্‌মঢ়ি শৈলে প্রথম বাঙ্গলাবাড়ী নির্ম্মিত করেন। তাহার নাম Bison Lodge ; উহা এখনও বিদ্যমান।

"ঋচখো" বা "ঋচঘর" আর একটি সুন্দর স্থান, পচ্‌মঢ়ির খুব নিকটে। ছোট চক্কর নামক রাস্তা হইতে ভাঙ্গিয়া খানিক্‌টা পথ যাইলেই একটা শৃঙ্গের কাছে উপস্থিত হওয়া যায় ; তাহাতে একটি প্রকাণ্ড গহ্বর। এই গহ্বরটি উচ্চে দ্বিকিম্বা ত্রিতল বাটীর সমান হইবে ; ইহাকে সিংহদ্বার বলা যাইতে পারে। এই সিংহদ্বার অতিক্রম করিলে একটি প্রাঙ্গণের মত স্থান, সেখানে আজকাল সাহেবেরা বনভোজন করিতে যান। এই প্রাঙ্গণ অতিক্রম করিলে একটি মস্ত গুহায় প্রবেশ করা যায়। পাহাড়ের মধ্যে সেই গুহাটির কয়েকটি শাখা প্রশাখা আছে, তবে সেগুলির ভিতর অন্ধকার, আমরা যাই নাই। এই স্থানে কোন সময়ে অনেক ভল্লুক বাস করিত, তাই গুহাগুলির নাম ঋচখো (বা ঋক্ষের কন্দর)। এই পর্ব্বততলে দাঁড়াইয়া এরূপ কল্পনা অবৈধ নয় যে একদিন এইস্থান কোন ভল্লুকরাজের প্রাসাদ ছিল। সেই শ্বাপদের অন্দরমহল ঐ ভিতরের গুহা ছিল, তাহার দরবার হইত ঐ নৈসর্গিক প্রাঙ্গণে, এবং সিংহদ্বারে কত ভল্লুক প্রহরী হয়ত



পচ্‌মঢ়ি পিপরিয়া রাস্তা।

"জটাশঙ্কর" পচ্‌মড়ি বাজার হইতে বিস্তর দূর নহে। এইখানে বাজারের লোকেরা প্রায় বনভোজন করিতে যায়। অনেকটা পথ খড়ের ভিতর নামিয়া যাইতে হয়, এবং বেশী-ভাগ সোজাই নামিতে হয়। গ্রীষ্মের সময় যখন সাহেবেরা আসেন, একটা পাথর বিছাইয়া কোনরূপ রাস্তা করিয়া দেওয়া হয়, কিন্তু বৃষ্টি পড়িলেই এ রাস্তা ভাঙ্গিয়া যায় এবং তখন জটাশঙ্কর নামা দুরূহ ব্যাপার হইয়া উঠে। নীচে নামিতে পারিলে, স্থান বেশ রমণীয়। দুইপাশে লাল পাহাড় উঠিয়া গিয়াছে, চতুর্দ্দিকে বড় বড় প্রস্তরখণ্ড ছড়ান, সম্মুখে পাহাড়ের গা বাহিয়া একটি ঝরণা পড়িতেছে, এবং এই নিত্য জলসংস্পর্শেই বোধ হয় সেই পাহাড়টি স্থানে স্থানে কেমন ক্ষরিয়া গিয়াছে, হঠাৎ দেখিলে যেন বিপুল গেরুয়া-বর্ণের জটারাশি ঝুলিতেছে বলিয়া মনে ভ্রম হয়। পার্শ্বে এক পর্ব্বতের তলে একটি গুহা, মাথা নোয়াইয়া ঢুকিতে হয়, কিন্তু ভিতরে যাইলে গুহাটি প্রকাণ্ড বোধ হয়। এই গুহার মেঝেতে বালিমধ্যে অনেকগুলি শিবলিঙ্গাকার ছোট বড় উপলখণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়; এই স্থানে লোকে আসিয়া পূজা দিয়া থাকে। শুনা যায় এই গুহার ভিতর খানিক পথ চলিয়া যাইলে জল পাওয়া যায়।

"ছোট মহাদেব" দেখিতে আরও সুন্দর। ইহার পথ আরও দুর্গম এবং অনেকটা হাঁটিতে হয়। কিন্তু এ স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য যথার্থই দেখিবার উপযোগী। উপত্যকা ক্রমশঃ সঙ্কীর্ণ হইতে সঙ্কীর্ণতর হইয়া আসে। মহান্‌ আম্রতরুর শাখাজালে সূর্য্যের আলোকও ক্ষীণ হইয়া যায়। একটা পাহাড়ের গা দিয়া নামিয়া যাইতে হয়, নীচে ২।১ বার একটি ক্ষুদ্র নদী দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার জলে যে লৌহ আছে তাহা রং দেখিয়াই বুঝিতে পারা যায়। শেষ যে স্থানে আসিয়া পড়া যায়, সেখানে লাল পাহাড় এবং বড় বড় চ্যাটাং ব্যতীত প্রায় আর কিছু নাই; নগ্ন শৈলশিখরে হয়ত ২।১টা মনসা গাছ, তাহার পাতা নাই, দেখিতে কি রকম। তাহার পর আর পথ নাই, বড় বড় দুই চারিটা শিলাখণ্ড লাফাইয়া একটা গুহা সমীপে আসা যায়। সেখানে আশ্চর্য্য দৃশ্য, সারি সারি শ্বেত পাথরের নৈসর্গিক শিবমূর্ত্তি। আমাদের মেয়েরা যে রকম মাটি দিয়া মহাদেব গড়িয়া থাকে, সেইরূপ মূর্ত্তি, প্রত্যেকটি ফুট খানেক উচ্চ। কিন্তু জটার ভারি বাহার, কেমন ঢেউ খেলাইয়া ঘাড়ের উপর পড়িয়াছে। সেই বিবিক্ত পর্ব্বতকন্দরে বসিয়া কতই চিন্তা মনে উদয় হয়! সুদূরে নীল আকাশ অল্প অল্প দেখা যাইতেছে, দুইধারে লাল পাহাড় যেন দেয়ালের মত দাঁড়াইয়া আছে, পাশেই পর্ব্বতের ভিতর রুদ্ধ জলের গম্ভীর শব্দ, সম্মুখে এই শ্বেতপাথরের মূর্ত্তি। না দেখিলে এরূপ নৈসর্গিক মন্দির কবিকল্পনার বাহিরে আর কোথাও আছে মনে হয় না। স্থানটি কিরূপ একান্ত, পাঠক ইহা হইতেই সহজে উপলব্ধি করিতে পারিবেন যে এই উপত্যকার মধ্যে নাগপুরের পলাতক রাজা আপ্পা সাহেব ভোঁস্‌লা অনেকদিন লুকায়িত ছিলেন, ইংরেজ বাহাদুরেরা কোনরূপ সন্ধান পান নাই। এস্থানে বলা আবশ্যক যে ছোট মহাদেবের পথ ভয়শূন্য নহে। নিকটেই নানারূপ বন্যজন্তু থাকে, এবং অনেকে এই পথে চিতাবাঘ দেখিয়াছে! পচ্‌মড়ির সন্নিকটে অনেক স্থানেই বেড়াইতে গেলে কেমন গা ছম্‌ ছম্‌ করে; সময় অসময়ে কোথাও কোথাও বাঘ, চিতাবাঘ, ভল্লুক, বরাহ প্রভৃতি বাহির হয়। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে দিনের বেলা এ সকল জন্তু প্রায়ই দেখা দেয় না, এবং পচ্‌মড়িতে যখন লোকের ভিড় থাকে, তখন তাহারা দূরে বনের ভিতর পলাইয়া যায়।*

পচমড়ির সন্নিকটে উল্লেখযোগ্য তিনটি জলপ্রপাত আছে, তাহাদের নাম Little Fall, Big Fall এবং Bee Fall. নদীগুলি খুব ছোট, কাযেই নির্ঝরগুলিও ছোট, তবে চতুর্দ্দিকের দৃশ্যের মনোহারিত্বের দরুণ এবং জলপ্রবাহ অনেকটা উপর হইতে পড়িবার দরুণ তিনটি ঝরনাই আমার মতে দেখিবার উপযুক্ত। "লিট্‌ল্‌ ফল্‌"টী সর্ব্বাপেক্ষা অনায়াসে পঁহুছান যায়। আমরা এইস্থানে একদিন চড়িভাতি করিয়াছিলাম। এই প্রপাতটি দুইভাগে বিভক্ত, প্রথমভাগ দেড় তলা প্রমাণ হইবে, দ্বিতীয় ভাগ নিশ্চয় তাহার দ্বিগুণ।

* পাঠক হয়ত জিজ্ঞাসা করিবেন, লালপাথরের মাঝে শ্বেতপাথরের মূর্ত্তি কি করিয়া আসিল? উত্তর সহজ। আমরা দেখিলাম যে ঐ গুহার ছাতে মূর্ত্তিগুলির উপরে লালপাথরের মাঝে ফাটল রহিয়াছে এবং তাহার ভিতর একস্তর শ্বেতপ্রস্তর বা চূর্ণোপল লক্ষ্য হইতেছে। এই চূণ কালে উপর হইতে পড়িয়া গুহাতলে জমিয়াছে। আমরা সেখানে শুভ্রবর্ণের Stalagmites ও Stalactites দুইই দেখিলাম।

এই নিম্নের অংশটি বেশী জল থাকিলে ছুটি ধারা হইয়া পড়ে। চতুর্দ্দিকে বনে আচ্ছন্ন পর্ব্বতরাজি, মধ্যে এক লাল পাহাড়ের উপর হইতে এই শুভ্র জলরাশি সজোরে নিম্নে পতিত হইতেছে, সুদূর পর্য্যন্ত সেই গম্ভীর নির্ঘোষের প্রতিধ্বনি শুনা যাইতেছে। আমরা যে বাড়ীতে থাকিতাম, তাহার পিছন দিয়া যে ক্ষুদ্র নদীটি বহিত, সেইটিই পরে এক পাহাড় অতিক্রম করিতে যাইয়া "লিট্‌ল্ ফল্" রূপে এক গভীর উপত্যকার মধ্যে গিয়া পড়িয়াছে। আমাদের ছেলেরা এইস্থানে যাইতে বড় ভালবাসিত এবং পথহইতে নানাবর্ণের নোড়ানুড়ি কুড়াইয়া আনিত। "বী ফল্"টি উচ্চে "লিট্‌ল্ ফল্" অপেক্ষা বড় নহে, জলও অনেকটা সেইরূপ। তবে ইহার পথের কিছু বিশেষত্ব আছে, এত গাছপালা লতাপাতা বোধহয় কোথাও নাই। এই স্থানটি যেন প্রকৃতিদেবীর Fernery, নানারকমের বড় ছোট Fern * চতুর্দ্দিকে বিদ্যমান। জঙ্গলী লতাই বা কি প্রকাণ্ড! এই লতার ডাল বড় বড় গাছের ডালের মত মোটা। "বিগ্ ফল্" কয়টি জলপ্রপাতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী উচ্চ। ইহাকে পচ্‌মঢ়ির লোকে "ধুঁয়াধার" বলে। নীচের দিকে প্রায় অর্দ্ধেক পথ জলের ধারা পরিষ্কার দেখিতে পাওয়া যায়না, যেন সমস্ত কুয়াসা আচ্ছন্ন। ঝরণাটির তলে গিয়া বসিলে সর্ব্বশরীর জলকণায় আর্দ্র হইয়া উঠে, যেন বৃষ্টিতে ভিজা গেল মনে হয়। তিনটি জলপ্রপাতের তলেই যাওয়া যায়; যদিচ পথ কিছু দুর্গম, এবং "বিগ্‌ফলের" নীচে যাইতে হইলে কোশ খানেকের উপর হাঁটিতে হয়। আমরা "বিগ্ ফলের" তলে জলের ধারে বড় বড় থাবা ও নখের দাগ দেখিয়াছিলাম।

খড সকল পাহাড়েই থাকে, পচ্‌মঢ়িতেও আছে। উল্লেখযোগ্য পাঁচটি—Handikho, Fraser Gully, Fuller's Khud, Daisy Khud এবং Woodburn Khud. বিশেষ বিবরণ প্রথম দুইটির দিলেই হইবে। হাণ্ডিখো (? অন্ধখো) বড় চক্করের ধারে একটি খুব গভীর খড্। দুই পাহাড়ের মাঝখানে মস্ত ফাঁক, সে যেন কতদূর অবধি নামিয়া গিয়াছে, তল ঠিক দৃষ্টিগোচর হয় না। নিম্নে শুনা যায় অনেক বৃহৎ বৃহৎ আমগাছ আছে, কিন্তু উপর হইতে সেগুলি নিতান্ত ক্ষুদ্র চারাগাছবৎ দৃষ্ট হয়। একধারে সাহেবেরা রেলিং বাঁধিয়া দিয়াছেন, তাহার পাশ দিয়া বর্ষাকালে জল বেগে মহাশব্দে যেন কোথায় অতলে নামিয়া যায়। জনপ্রবাদ এই যে পূর্ব্বে পচ্‌মঢ়িতে একটা হ্রদ ছিল, তাহার মধ্যে একটী ভয়ঙ্কর সর্প বাস করিত। এই সর্প মহাদেবের উপাসকদিগকে বিরক্ত করিত বলিয়া দেব তাহার উপর অসন্তুষ্ট হন। তাঁহার ত্রিশূলাঘাতে ধরা বিদীর্ণ হইয়া যায় এবং সেই সর্পকে ঐ রন্ধ্রের মধ্যে দেব মহেশ্বর রুদ্ধ করেন। আধুনিক হাণ্ডিখোই সেই রন্ধ্র। হ্রদ দেবপ্রভাবে সেই সময়েই বিশুষ্ক হইয়া যায়। ফরসাইথ সাহেব মনে করেন যে এই গল্পটি সেকালে হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে যে ঘোর বিবাদ হইয়াছিল তাহার রূপকমাত্র, সর্পার্থে বৌদ্ধ। পুরাকালে যে পচমঢ়িতে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী সম্প্রদায় বাস করিত, তাহা পঞ্চপাণ্ডব নামধেয় গুহাবলি দৃষ্টেও বোধ হয়।

"পাতালখো" আর একটি খুব গভীর খড। তবে হাণ্ডিখোর মত অমন সোজা নামিয়া যায় নাই। পাতালখোতে কিন্তু একটি বিশেষ দেখিবার জিনিস আছে। এই খডটির নীচে একটি ক্ষুদ্র নদী বহিতেছে, সেই নদীটি পর্ব্বতের ভিতরদিয়া পাথর কাটিয়া নিজের পথ বাহির করিয়া একটা পাতকুয়া হইতে আর একটা পাতকুয়া লাফাইয়া শেষে অন্ধকারে যেন পাতালের ভিতর নামিয়া গিয়াছে। বিজ্ঞানপুস্তকে জলের ক্ষমতার বিষয়ে অনেক উদাহরণ সংগৃহীত থাকে, কিন্তু এরূপ চিত্তাকর্ষক দৃষ্টান্ত সচরাচর দৃষ্টিগোচর হয় না। কোন সময়ে ঐ নদীর সম্মুখে এই পর্ব্বত প্রাচীরবৎ দণ্ডায়মান ছিল, কালে জলের আঘাতে পাষাণ গলিয়া গেল, মস্ত গোলাকার গর্ত্ত হইল, জল তাহার মধ্যে প্রবেশ করিল বটে কিন্তু সম্মুখে আবার অবরোধ। আবার এই অবরোধ ভাঙ্গিল, আবার কূপ খনন হইল, আবার জল অগ্রসর হইল। পৃথিবীতে অধ্যবসায়গুণই ধন্য! এই পাতালখোর নাম সাহেবেরা রাখিয়াছেন Fraser Gully। ইহা ধূপগড় হইতে তিন মাইল, ধূপগড় যাইবার পুরাতন পথে অবস্থিত। অনেকে এইস্থানে যাইতে ভয় পায়—বাঘের ভয়। আমরা কিন্তু কয়বার গিয়াছিলাম, দৃশ্যটি বড় মনোহারী। "ফুলর্স্ খড" সাহেবদিগের বড় প্রিয়স্থান, সেইজন্য তাহার বিষয় ২।১টি কথা না বলিলে হয়ত অন্যায় হইবে। এই খডে যাইবার পথ অতি দুর্গম। একটা পাহাড়ের গা দিয়া নামিয়া যাইতে

* ইহাকে পচ্‌মঢ়ির লোকেরা 'হংসরাজ' বলে।

হয়, আর একটা পাহাড়ের গা ধরিয়া উঠিতে ও নামিতে হয়। দুই পাহাড়ের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র নদী আছে, তাহা পাঁচবার পার হইতে হয়। শেষ একস্থানে উপস্থিত হওয়া যায় যেখানে আর একটি ক্ষুদ্র নদী ঐ দ্বিতীয় পাহাড়ের অন্যদিক দিয়া আসিয়া এই নদীটির সহিত মিলিত হইয়াছে। এই স্থানটিও বেশ মনোরম। সাহেব মেমেরা এখানে বন-ভোজন করিতে আসেন এবং শুনিতে পাওয়া যায় যে বেশী জল থাকিলে বোটিং ও করেন। এই খড়ে অনেক বড় বড় Fern বৃক্ষ আছে।

Fleetwood Junction নামক স্থানেও একটি প্রকাণ্ড খড় আছে, কিন্তু সেখানে লোকে খড় দেখিতে যায় না; তিনটি পাহাড় তিনদিক হইতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে, লোকে এই দৃশ্য দেখিতে সেখানে যায়।

এইবার দুই একটা শৃঙ্গের কথা বলি। যেখানে পাহাড় আছে, সেখানে খড়্ও আছে, চূড়াও আছে। পাহাড়ের মাথায় উঠিলে চূড়া দেখা হয়, পাহাড়ের তলে নামিয়া গেলে খড়্ বা (বেশী চৌড়া হইলে) উপত্যকায় পহুছান যায়। পচ্‌মঢ়ি একটি অধিত্যকা। কিন্তু ইহার উপর অনেক উচ্চ স্থান আছে, ছোট ছোট পাহাড় আছে, এবং সাহেবেরা সেগুলির সকলেরই প্রায় নামকরণ করিয়াছেন। ধূপগড়ের বিষয় কিছু বলা আবশ্যক। ধূপগড় পচ্‌মঢ়ি হইতে তিন ক্রোশ পথ হইবে। ইহা মহাদেব পর্ব্বতের সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ, সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৪৫০০ ফুট উচ্চ। ইহার উপরে খানিকটা সমতল জমি আছে এবং সেখানে একটি সুন্দর ডাকবাঙ্গলা আছে। পথে পাহাড়ভরা দোপাটি * ফুল, স্থানে স্থানে কলার ঝাড়ও আছে। ধূপগড় শৈলে উঠিলে চতুর্দ্দিকে অনেকদূর পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া যায়, নর্ম্মদা পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয়। পশ্চাতে সুবৃহৎ বোরি জঙ্গল। ধূপগড়ে জল পাওয়া যায় না বলিয়া একটি ক্ষুদ্র জলাশয় করা হইয়াছে, সেই-জন্য সেখানে থাকিতে কোন কষ্ট নাই। সেখানকার বায়ু বড় স্বাস্থ্যকর। তহসীলদারকে বলিলে ডাকবাঙ্গলা ভাড়া পাওয়া যায়, ৩্ রোজ; একটি ঘর লইলে ১৲। ধূপগড় যাইবার দুইটি পথ আছে। একটি এখন প্রায় ব্যবহৃত হয় না। যেটি ব্যবহৃত হয় সেটি নূতন; উহা দিয়া যাইলে মাইল খানেক চড়াই উঠিতে হয়—অনেকস্থলে খাড়া চড়াই। যাঁহারা পচ্‌মঢ়ি বেড়াইতে যান, তাঁহাদের কিছুদিন ধূপ-গড়ে গিয়া থাকা উচিত।

এইত গেল পচমঢ়ির প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলির কথা। মনে করিয়াছিলাম যে এ স্থানের আদিম অধিবাসীদিগের—গোঁড় ও কোর্কু জাতিদের বিষয়, তাহাদের আচার ব্যবহার ও সংস্কার সংক্রান্ত কিছু কথা এই প্রবন্ধে বলিব। কিন্তু প্রবন্ধ বাড়িয়া যাইতেছে, সেইজন্য অন্য সময় সুবিধা হইলে এবিষয় আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। পচ্‌মঢ়ি ও তৎসন্নিকটস্থ প্রদেশে যেমন ভূতত্ত্ব, প্রাণিতত্ত্ব, উদ্ভিদ্‌তত্ত্ব প্রভৃতির অনুশীলনের অনেক উপাদান পাওয়া যায়, সেইরূপ মানবতত্ত্ববিদেরও দেখিবার ও ভাবিবার জিনিস নিতান্ত অল্প নাই।

আমরা পচ্‌মঢ়িতে প্রায় দেড়মাস কাল ছিলাম। এক-দিন অক্টোবরের গোড়াগুড়ি টাঙ্গাকণ্ট্রাক্টরের অফিসে যাইয়া শুনিলাম ৩১শে তারিখ পর্য্যন্ত সাহেবেরা টাঙ্গা ভাড়া করিয়া ফেলিয়াছেন, মধ্যে কেবল দুই তিন দিন খালি আছে। আমাদের আরও কিছুদিন পচ্‌মঢ়িতে থাকিতে ইচ্ছা ছিল, কিন্তু নভেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহে কাছারি খুলিবে, অগত্যা আমরা শেষ খালি দিন যাহা পাইলাম, অর্থাৎ ২০শে অক্টো-বর ফিরিবার বন্দোবস্ত করিলাম। আমাদের পচ্‌মঢ়ি স্থানটি বড় ভাল লাগিয়াছিল। বেশ নিরিবিলি যায়গা ও যথেষ্ট বেড়াইবার সুবিধা — আর শুধু লক্ষ্যহীন বেড়ান নহে, দেখি-বার জানিবার জিনিস অনেক। অসুবিধার মধ্যে ডুলি বা ডাণ্ডি পাওয়া যায় না, মেয়েদের দূরে বেড়াইতে লইয়া যাওয়া সহজে ঘটিয়া উঠে না। মোট দুইটি সরকারী ডাণ্ডি আছে এবং তহসীলে একটি ভাঙ্গা পাল্কী আছে। আমরা একদিন ধূপগড়ে চড়িভাতি করিতে গিয়াছিলাম। সেদিন সব-ওভর-সিয়র বাবুর অনুগ্রহে ডাণ্ডির যোগাড় হইয়াছিল; কিন্তু যেদিন মহাদেবে চড়িভাতি করিতে যাই, সেদিন ডাণ্ডি পাওয়া যায় নাই, তহসীলের পাল্কী লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। সে পাল্কীটি বেশী ভারি নয়, তবে সে দেশের লোকেরা কান্ধে মোট বহে না, কাজেই ১২ জন কুলিতে পড়িয়া সে পাল্কী তুলিয়াছিল। সে একটি অপরূপ দৃশ্য হইয়াছিল, ফটোগ্রাফ তুলিয়া রাখিবার উপযুক্ত। আমরা একটি মাসের

* ইহাকে 'একপাটি' বলিলেও হয়, কারণ ফুল ঐ রূপ।



পঞ্চপাণ্ডব গুহা।



স্বাভাবিক সেতু।



সিন্ধুদেশের আমিরগণের সমাধি মন্দির



আমির আলি মুরাদ—শিকারী অনুচর সহ

হিসাবে টাঙ্গা ভাড়া করিয়াছিলাম। সেপ্টেম্বর মাসে সাধারণতঃ পচ্‌মঢ়িতে ভারি বৃষ্টি হইয়া থাকে, কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে গতবৎসর বেশী হয় নাই। ৮ই তারিখ নাগাদ ধরিয়া যায়, এবং তাহার পর কেবল একবার ২।৩ দিন ধরিয়া বৃষ্টি হইয়াছিল। চারিদিক কুয়াসায় ঢাকিয়া গিয়াছিল; আমরা একদিন সেই বৃষ্টি ও কুয়াসায় waterproof (জলাভেদ্য কাপড়) পরিয়া বেড়াইতে গিয়াছিলাম—অবশ্য পদব্রজে এবং মেঘের ভিতর দিয়া বেড়াইয়া আসিয়াছিলাম। রাস্তায় মেঘ গড়াইয়া যাইতেছিল। আমি জানি অনেক অতি মাননীয় লোক আছেন, যাঁহারা পচ্‌মঢ়ির নামে নাসিকাগ্র কুঞ্চিত করেন। তাঁহারা "আসল" পাহাড়ের জন্য লালায়িত,—যেখানে বরফ পড়ে, যেখানে সাহেবসুবোরা যায়। পথে ঘাটে বাহির হইলেই ২।৪টা বড় সাহেবের সঙ্গে দেখা হয়, টুপি তুলিলে তাহারাও টুপি তুলে, হয়ত একটু হাসিয়া "হাডুডু"? বলে, আর তাহা হইলেই—স্বর্গলাভ! যদি "ফ্যাসন" করিলাম, আর যাহাদের দেখাইবার জন্য করিলাম, তাহারাই না দেখিল, তবে সবই ত পণ্ডশ্রম! এ কথার ভিতর যে ন্যায্যযুক্তিটুকু আছে তাহা আমি স্বীকার করি, তবে উত্তরে কেবল এই মাত্র বলিব যে ভিন্নরুচির্হি লোকঃ। অবশ্য যে লোক "ফ্যাসনে"র খাতিরে পাহাড়ে যায় না, তাহার বেলা এ যুক্তি ত মোটেই খাটে না। মধ্য ভারতবর্ষের গেজেটিয়রে একজন সিবিলিয়ান সাহেব লিখিয়াছেন যে পচ্‌মঢ়ি "one of the greenest, softest and most lovely sanitaria that exist in India." পণ্ডিতপ্রবর এমার্সন বলিয়াছেন যে superlative degree সব কাটিয়া দিতে হয়। তাঁহার কথা অনুযায়ী ঐ বিবরণটা সংশোধন করিয়া লইলে বাকী যাহা থাকে তাহাতে বোধ হয় কাহারও আপত্তি হইতে পারে না। সাহেবেরা পচ্‌মঢ়িকে প্রায়ই একটি বৃহৎ park বা উপবন বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন। এ বিবরণটিও নিতান্ত ভুল নহে। শুনিলাম যে এখন সাহেবদের চেষ্টা বেশী জঙ্গল কাটিয়া ফেলিয়া এ স্থানটিকে একটি প্রমোদকানন করিয়া রাখেন। অনেক গাছ কাটা হইতেছে এবং বোধ হয় এই জন্যই স্থানটী পূর্ব্বে যত ঠাণ্ডা ছিল এখন আর তত নাই।

আমরা ২০ শে অক্টোবর প্রাতে বেলা ৯টা নাগাদ পচ্‌মঢ়ি হইতে দুইখানি সিমলা টাঙ্গা করিয়া রওয়ানা হইলাম। ৪ ঘণ্টায় পিপরিয়া ষ্টেশনে পঁহুছান গেল। ২ টার পর মেল ট্রেণ আসিল, চার দিন পূর্ব্বে আমরা "রিজর্ভড্" গাড়ীর জন্য লিখিয়াছিলাম, কিন্তু সেদিন ভারি বিলাত ফেরতা সাহেব মেমের ভিড়, ষ্টেশনমাষ্টার আমাদের "রিজর্ভড্" গাড়ী দিতে পারিলেন না। আমরা কিন্তু সেদিন সন্ধ্যা ৮টার সময় জব্বলপুরে নামিলাম, তাই পথে বিশেষ কষ্ট পাইতে হইল না। জব্বলপুরে আমার বন্ধু উকীল শ্রীজীবনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমাদের থাকিবার জন্য শেঠ রাজা গোকুলদাসের বাগান বাটীতে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। অতি আরামে নিশি যাপন করা গেল। পরদিন প্রাতে মদনমহল দেখা গেল। তাহার পর "কটনমিল্" দেখিয়া বিকালে আমরা নর্ম্মদাতীরে যাইলাম। জব্বলপুরেও টাঙ্গার ব্যবহার প্রশস্ত; তবে এস্থানে টাঙ্গা প্রায় এক ঘোড়ায় টানে। আমরা রাত্রে চন্দ্রালোকে নর্ম্মদাতটস্থ শ্বেতপ্রস্তরের পর্ব্বত দেখিতে যাইলাম। সে রাত্রি নর্ম্মদার উপকূলে রাজা গোকুলদাসের ধর্ম্মশালায় আমরা অতিবাহিত করিলাম। পরদিন প্রাতে আমরা ধুঁয়াধারে স্নান করিয়া গৌরীশঙ্করের মন্দির দর্শন করিলাম এবং আবার দিবালোকে শ্বেতপ্রস্তরের পর্ব্বত দেখা গেল। ঐ সকল জিনিসের বিস্তৃত বিবরণ লিখিবার আমার অভিপ্রায় নাই। কারণ অনেক ভাল লেখক জব্বলপুরের এই সকল বিখ্যাত এবং অপরূপ দৃশ্যের সুন্দর বর্ণনা পূর্ব্বে লিখিয়াছেন। কিন্তু যাঁহারা সে সকল বর্ণনা পড়েন নাই, তাঁহাদের জন্য এস্থলে ইহা বলা যথেষ্ট হইবে যে জব্বলপুর হইতে ৭ ক্রোশ দূরে এক পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে নর্ম্মদা নদী আসিয়া পড়িয়াছেন। এই পর্ব্বত বেশীভাগ শ্বেতপ্রস্তরের। দুই পার্শ্বে এই শুভ্র পবিত্র অভ্রংলিহ প্রাচীরের মধ্য দিয়া কোথাও অবসর পাইয়া ধীরে, কোথাও সঙ্কীর্ণতার মধ্যে গর্জ্জিয়া, কলুষনাশিনী হরিততোয়া নর্ম্মদা চলিয়াছেন। এরূপ দৃশ্য বোধ হয় জগতে আর নাই। স্থানে স্থানে দুই দিকের পর্ব্বত এত কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছে যে, শুনিতে পাওয়া যায়, বাঁদর একদিক হইতে অন্যদিকে লাফাইয়া যাইতে পারে। রাত্রে চন্দ্রালোকে দৃশ্য কিছু স্নিগ্ধতর ও মুগ্ধতর বোধ হয়, কোথাও পর্ব্বতাংশ যেন

তুলার রাশি প্রতীয়মান হয়, কোথাও বা যেন একপাল মেঘ বসিয়া আছে এরূপ লক্ষিত হয়। * কিন্তু এই অদ্বিতীয় দৃশ্যের নিখিল সৌন্দর্য্য সূর্য্যালোক ব্যতীত সম্যক উপলব্ধি হয় না। এই শ্বেতপ্রস্তরের সঙ্কটপথে (gorge) প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে নর্ম্মদার একটি জলপ্রপাত আছে, তাহার নাম 'ধুঁয়াধার'। জল বেশী উচ্চ হইতে পড়িতেছে না বটে, কিন্তু জল অনেকটা। সুতরাং এরূপ জলপ্রপাত ভারতে বিরল। এই স্থানে বারিকণা চতুর্দ্দিকে এরূপ ছিটাইতেছে যে নিম্নে শুভ্র শীকর ও ফেণ ব্যতিরেকে বিশেষ কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। নর্ম্মদাদেবী যেন বজ্রনাদে ঝাঁপাইয়া পড়িতেছেন এবং এই স্ত্রীজনানুচিত ব্যবহারে লজ্জিত হইয়া তৎক্ষণাৎ কুজ্ঝটিকাবরণে আপনাকে ঢাকিয়া ফেলিতেছেন। উপরে এই তরঙ্গিণীর তটে দাঁড়াইয়া জলরাশির ক্ষোভ দেখিবার চেষ্টা করিলে বেশ ধারাস্নান হইয়া যায়। গৌরীশঙ্করের মন্দিরে ৬৪টি দেবীমূর্ত্তি আছে, লালপ্রস্তরে নির্ম্মিত, বেশীভাগই ভগ্নাবস্থায়। এগুলি কিন্তু বৌদ্ধমূর্ত্তি বোধ হইল না, হিন্দু-হস্তনির্ম্মিত হিন্দুদেবীমূর্ত্তি।

আমরা জব্বলপুর হইতে সেই রাত্রে রওয়ানা হইলাম এবং পরদিন বেলা ১০টা নাগাদ এলাহাবাদ পঁহুছিলাম।

শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

* এই কারণেই বোধ হয় এই ঘাটের নাম 'ভেড়িঘাট'।

সিন্ধুদেশ।

সিন্ধুদেশকে প্রায়ই মিসর (Egypt) দেশের সহিত তুলনা করা হয়। এই তুলনা অনেকটা যথার্থ বটে। সিন্ধু দেশের সিন্ধুনদী মিসরদেশের নীলনদীর তুল্য। মিসর দেশের যেমন নীলনদীর উভয়পার্শ্বস্থিত ভূমি উর্ব্বরা, তদ্ভিন্ন আর সমস্ত দেশ প্রায় মরুময়, সেইরূপ সিন্ধুদেশে সিন্ধুনদীর দুইধারে লোকের বসতি ও চাষ বাস, তদ্ভিন্ন সমস্ত দেশ প্রায় বালুকাময়। আবার মিসর দেশে যে সকল গাছ লতা পাতা দেখিতে পাওয়া যায়, সিন্ধুদেশেও প্রায় সেই সকল দৃষ্ট হয়। এই দুই দেশের তুলনা কেবল এখানেই সমাপ্ত হয় না। তাহাদিগের ঐতিহাসিক ঘটনাতেও অনেকটা সাদৃশ্য আছে। মিসর দেশের ইতিহাসে ইহা দেখিতে পাওয়া যায় যে উহা সর্ব্বদা পৃথিবীর কোন না কোন বলশালী জাতির করায়ত্ত হইয়াছে। সিন্ধুদেশেরও ইতিহাস তদ্রূপ। সিন্ধুদেশ হইতে পূর্ব্বকালে অনেক যোদ্ধা ভারত আক্রমণ ও তথায় অধিকার বিস্তার করিতে আসিয়াছিলেন। পঞ্জাব ও সিন্ধুদেশই ভারতে আর্য্যদিগের প্রথম উপনিবেশস্থল ছিল। আবার যখন পারসীক জাতি বলশালী হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারা যেমন মিসরদেশ জয় করিয়াছিল, তদ্রূপ সিন্ধুদেশেও আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। এই ঘটনা অবলম্বন করিয়াই বোধ হয় কালিদাস সিন্ধুদেশকে পারস্য দেশের অংশ বলিয়া গণ্য করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার প্রণীত রঘুবংশে রঘুরাজার দিগ্বিজয় প্রসঙ্গে লিখিত আছে—পারসীকাংস্ততোজেতুং প্রতস্থেস্থলবর্ত্মনা। পারসীকান শব্দের অর্থ রঘুবংশের একজন সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার করিয়াছেন, "সিন্ধুতটবাসিনো ম্লেচ্ছরাজান।" ইহাতে স্পষ্ট জানা যাইতেছে যে সিন্ধুদেশ একদিন পারসীক জাতির শাসনাধীন ছিল।

পারসীক জাতির দর্পচূর্ণকারী সেকন্দর (Alexander) ও গ্রীকগণও সিন্ধুদেশে দৌরাত্ম্য করিতে ক্রটি করেন নাই। সেকন্দর ভারতবর্ষ হইতে প্রত্যাগমনকালে সিন্ধুদেশ হইয়া করাচীর নিকট এক বন্দর হইতে জাহাজে উঠিয়া বাবিলন অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন। সেকন্দর যে যে দেশ দিয়া যাতায়াত করিয়াছিলেন, সেই সেই দেশে নিজের নামে এক একটি নগর প্রতিষ্ঠিত করিয়া গিয়াছিলেন। গ্রীক দেশের ইতিহাসবেত্তারা বলেন যে তিনি নিজের নামে নানা দেশে ৭০টী নগর স্থাপিত করিয়াছিলেন। এই ৭০টী নগরের মধ্যে এক্ষণে কেবল মিসর দেশের আলেকজান্দ্রিয়া সহর তাঁহার একমাত্র কীর্ত্তিস্তম্ভরূপে দণ্ডায়মান হইয়া আছে। সিন্ধুদেশে কোন্ স্থলে তিনি নিজের নাম দিয়া নগর স্থাপন করিয়া যান, তাহার এখন পর্য্যন্ত সম্যকরূপে মীমাংসা হয় নাই। এই বিষয় যে কখনও যথার্থ রূপে নির্ণীত হইবে তাহার আশা অতি অল্প। সিন্ধুদেশের সহর সকল প্রায় দুই তিন শত বৎসর অন্তর ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। তাহার কারণ এই যে সিন্ধুনদী সতত নিজ গতিস্থল পরিবর্ত্তন করিয়া থাকে। যেস্থল হইতে সিন্ধুনদী দূরে চলিয়া যায় সেই স্থল বালুকাময় হইয়া পড়ে, এইকারণে তথায় বসতি থাকিতে পারে না। এইরূপ অবস্থায় সিন্ধুদেশে গ্রীক বীর সেকন্দরের স্থাপিত নগর যে কোথায় ছিল, তাহা এক্ষণে ঠিক করা নিতান্ত দুষ্কর।

রোমীয় জাতিরা মিসরে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা সিন্ধুদেশ কিম্বা ভারতের অভিমুখে আসিতে পারেন নাই। এই জন্য বোধ হয় আজ কাল অনেক ইংরাজ ঐতিহাসিক ও রাজনীতিজ্ঞদিগের মধ্যে এই প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে যে রোম ভারত বিজয় করিতে পারিলে ভারতকে কিরূপ করিয়া শাসন করিত (How Rome would have ruled India)। রোম সাম্রাজ্যের অবনতি সময়ে আরবেরা উন্নত হইয়াছিলেন। যেমন ইহাঁরা মিসরদেশে রাজ্য সংস্থাপন করেন, তদ্রূপ ইহাঁদিগের কর্ত্তৃকই ভারতের মধ্যে সর্ব্ব প্রথমে সিন্ধুদেশে মুসলমান রাজ্যের ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছিল এবং যেমন মিসর দেশ, তদ্রূপ, ইহা বলা বাহুল্য যে, সিন্ধুদেশও এখন ইংরাজদিগের অধীনে। লোকাচারেও মিসর ও সিন্ধুদেশবাসিগণের অনেকটা সাদৃশ্য আছে। পুরাতন কালে মিসর দেশের অধিবাসীরা যেমন কুম্ভীরকে দেবতা বলিয়া পূজা করিত, সেইরূপ আধুনিক সিন্ধুবাসীরা এই জলজন্তুকে পূজা করিয়া থাকে। করাচীর সন্নিকটে একটী সরোবরে অনেক কুম্ভীর আছে। এই সরোবরটী সিন্ধীদিগের মগর পীর নামক একটী প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। মিসর ও সিন্ধুদেশে যেমন অনেক বিষয়ে সাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, তেমনই একটী গুরুতর বিষয়ে মহৎ ভিন্নতা আছে। এই গুরুতর বিষয়টী ধর্ম্ম। পুরাতন মিসরদেশে যাঁহারা পিরামিড্ প্রভৃতি নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশ এক্ষণে লোপ পাইয়াছে, ও তৎ সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদিগের ধর্ম্মও লুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু সিন্ধুদেশে পুরাকালে হিন্দু জাতির যে ধর্ম্ম ছিল, এখনও তাহাই আছে; এবং যদিও অনেক বলশালী জাতি সিন্ধুদেশে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, তথাপি সেই বেদ ও দর্শনশাস্ত্রপ্রণেতাদিগের বংশোদ্ভব লোকেরা এখনও বিদ্যমান আছেন। সত্য বটে সিন্ধুদেশে পিরামিডের মত কোন পূর্ব্বকালের কীর্ত্তিস্তম্ভ নাই। কিন্তু আত্মার অমরত্ব বিষয়ে বিশ্বাস ছিল না বলিয়া পুরাতন মিসরবাসীরা ঐ সকল পিরামিড প্রস্তুত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এরূপ বিশ্বাস ছিল যে যতদিন মানবদেহের একেবারে বিনাশ হয়না, ততদিন আত্মাও জীবিত থাকে। এইজন্য তাঁহারা অনেক যত্নসহকারে মৃত শরীরকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন। এই কারণেই নানা মশলাসংযোগে মৃতদেহ রক্ষার প্রথা (mummies) এবং পিরামিডের সৃজন হয়। কিন্তু ভারতবাসীরা চিরকালই দেহের নশ্বরত্ব ও আত্মার অমরত্ব বিষয়ে বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহাদিগকে পিরামিড প্রভৃতির ন্যায় কোন কীর্ত্তিস্তম্ভ প্রস্তুত করিতে হয় নাই।

সিন্ধুদেশ ইংরাজদিগের অধীনে আসিবার পূর্ব্বে একটী স্বাধীন রাজ্য ছিল। এক শতাব্দী পূর্ব্বে যখন লর্ড ওয়েলেসলী সাহেব ভারতের গবর্ণর জেনারেল ছিলেন, তখন সিন্ধুদেশ কাবুল রাজ্যের একটী করদ প্রদেশ ছিল। পাছে তখনকার কাবুল রাজ্যের শাসনকর্ত্তা ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, সেই ভয়ে ওয়েলেসলী সাহেব তাঁহার বিরুদ্ধে নানাবিধ ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। কাবুল রাজ্যে যাহাতে অরাজকতা, গৃহবিবাদ ও বিশৃঙ্খলা জন্মাইতে পারে, এই তাঁহার ষড়যন্ত্রের প্রধান উদ্দেশ্যছিল। এই অভিপ্রায়ে তিনি পারস্যদেশে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন ও তথাকার রাজাকে অর্থ ও অস্ত্র শস্ত্র সাহায্য দানে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন। তিনি কেবল পারস্যরাজ্যে দূত প্রেরণ করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন না, যাহাতে সিন্ধুদেশ কাবুল রাজ্য হইতে পৃথক হইয়া যাইতে পারে, তাহার জন্যও তিনি চেষ্টা করিতে ত্রুটি করেন নাই। ভারতবর্ষীয় ইতিহাসলেখকগণ এবিষয়ে কোন কথার উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু ওয়েলেসলী সাহেবের চিঠিপত্র হইতে ইহা স্পষ্ট জানা যায় যে তিনি সিন্ধুদেশ কাবুলরাজ্য হইতে পৃথক করিবার জন্য অনেক ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। আমাদের কথার প্রমাণস্বরূপ, তিনি ১৭৯৮ খ্রীষ্টাব্দের ৮ই অক্টোবর বোম্বাই প্রদেশের গবর্ণর জোনাথান ডান্‌কনকে যে পত্রখানি লেখেন, তাহার কিয়দংশ নিম্নে প্রদত্ত হইল।

"It has been suggested to me, and I understand it was the opinion of Sir Charles Malet, that a further diversion of the Shah's force might be created by our affording certain encouragement to the nations occupying the delta and lower parts of the Indus who have been stated to be much disaffected to the Government of the Shah; I wish you to give this point the fullest and most serious consideration; to state to me your ideas upon it; and in the meanwhile to take any immediate steps which shall appear proper and practicable to you."

এইসময়ে সিন্ধুদেশে তালপুরবংশীয় বলোচ আমিরগণ রাজত্ব করিতেন; কিন্তু তাঁহারা স্বাধীন ছিলেন না; তাঁহারা কাবুল

রাজ্যের অধীনস্থ ছিলেন ও তজ্জন্য তাঁহাদিগকে কাবুলের রাজাকে কর দিতে হইত। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে যে সিন্ধুদেশের আমিরগণ কাবুলের রাজাকে কর না দিয়া স্বাধীন হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাতে ইহা স্পষ্ট রূপে জানা যাইতেছে যে তাঁহারা ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট দ্বারা উত্তেজিত হইয়া ও তাঁহাদের সাহায্য পাইয়া ঐরূপ সাহস করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহারা তখন ইংরাজদিগের গূঢ় অভিসন্ধি বুঝিতে পারেন নাই। তাঁহারা ইংরাজদিগের নিকট যে কৃতজ্ঞতাঋণপাশে বদ্ধ ছিলেন, তজ্জন্যই সম্ভবতঃ তাঁহারা তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা সাহায্য করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। প্রাচ্যদেশবাসীরা, বিশেষতঃ ভারতবাসীরা, কখন কাহারও উপকার বিস্মৃত হয় না। কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ ছিলেন বলিয়াই বোধ হয় সিন্ধুদেশের আমিরেরা ইংরাজ সৈন্যদিগকে নিজদেশ দিয়া আফগানিস্থান যাইতে ও দোস্তমহম্মদকে আক্রমণ করিতে পথ দিয়াছিলেন। কিন্তু এই পথ দেওয়া ও সাহায্য করাই তাঁহাদিগের অস্তিত্ব লোপ পাইবার প্রধান কারণ হইয়াছিল।

কিরূপ উপায়ে সিন্ধুদেশ ইংরাজকর্ত্তৃক বিজিত হইয়াছিল, তাহার উল্লেখ করিবার বিশেষ কোন প্রয়োজন নাই।*

* সিন্ধুদেশ জয় করিতে যে আমিরগণের প্রতি মহা অত্যাচার করা হইয়াছিল, তাহা সকল উদারপ্রকৃতি ইংরাজ লেখক স্বীকার করিয়া থাকেন। সিন্ধুদেশবিজয়ী সর্ চার্লস্ নেপিয়র্ স্বয়ং এবিষয় স্বীকার করিয়াছেন। তিনি মিয়ানীর যুদ্ধের পর সিন্ধুদেশ অধিকার করিয়া এইরূপ দ্ব্যর্থ ঘটিত বাক্য লিখিয়াছিলেন যে "I have sinned (Sind,)" অর্থাৎ আমি পাপ (সিন্ধুদেশ লাভ) করিয়াছি। তিনি সিন্ধুদেশ অধিকারকে "a humane piece of rascality"ও বলিয়াছেন।

"কলিকাতা রিভিউ"এর সম্পাদক সুবিখ্যাত সর্ জনকে সিন্ধুদেশ অধিকার বিষয়ে এইরূপ লিখিয়াছেন—

"The Sindh Ameers, it is said, violated treaties. It would seem as though the British Government claimed to itself the exclusive right of breaking through engagements. If the violation of existing covenants ever involved *ipso facto*, a loss of territory, the British Government in the east would not now possess a rood of land between Burhampooter and the Indus. * * * But the real cause of this chastisement of the Ameers consisted in the chastisement which the British had received from the Afghans. It was deemed expedient at this stage of the great political journey to show that the British could beat some one; and so it was determined to beat the Ameers of Sindh."

এই স্থলে ইহা বলা কর্ত্তব্য যে সিন্ধুদেশ এত সহজে ইংরাজ রাজ্যভুক্ত হইত না যদি তথাকার আমিরগণের মধ্যে একটী 'ঘরসন্ধানে' বিভীষণ ইংরাজদিগকে সাহায্য না করিত। এই 'ঘরসন্ধানে' বিভীষণের নাম আলী মোরাদ। ইনি নিজের ভ্রাতৃগণের সর্ব্বনাশ করান এবং তাহারই পুরস্কার স্বরূপ খৈরপুরের আমিরী পদে ইংরাজ কর্ত্তৃক অভিষিক্ত হন। ৭।৮ বৎসর হইল ইঁহার কাল হইয়াছে। ইনি সর্ব্বদাই শিকারে ব্যাপৃত থাকিতেন; তজ্জন্য সিন্ধীরা ইঁহাকে 'আলী মোরাদ জঙ্গী' বলিয়া থাকেন।

সিন্ধুদেশে আমিরগণের রাজত্বকালে হিন্দু ও মুসলমানদিগের ভিতর কোন অসদ্ভাব ছিল না। আমিরদিগের প্রধান



সিন্ধী টুপি।

প্রধান মন্ত্রী ও কর্ম্মচারিগণ প্রায় হিন্দু হইতেন। সিন্ধুদেশের রাজধানী হায়দ্রাবাদে অনেক পুরাতন হিন্দুরাজকর্ম্মচারিদিগের বসতি আছে। ইহারা "আমিল" বলিয়া জন সাধারণের নিকট বিদিত। বাঙ্গালীদিগের মধ্যে যেমন ভদ্রলোক 'বাবু' ও হিন্দুস্থানীদিগের মধ্যে "লালা", সেইরূপ এই "আমিল" জাতির লোকেরা সকলেই "দেওয়ান" বলিয়া সম্মানিত হইয়া থাকেন। এক কালে এই "আমিল"গণ

ধনসমৃদ্ধিশালী ছিলেন, কিন্তু এখন তাঁহারা প্রায় গরীব হইয়া পড়িয়াছেন। পূর্ব্বে ইঁহারাই সিন্ধুদেশের বড় লোক ছিলেন। তৎকারণে ইঁহাদের সংসারিক ব্যয় ও অভাবও অনেক। ইঁহাদিগের মেয়েদের বিবাহে এত বেশী খরচ যে এখন তাহা অনেকের পক্ষে কষ্টকর হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এই আমিলদিগের এখন পর্য্যন্ত জাতিনির্ণয় হয় নাই। ইঁহারা ব্রাহ্মণ কিম্বা ক্ষত্রিয় নহেন। তবে ইঁহাদিগের আচার ব্যবহার হিন্দুস্থানের কায়স্থদিগের মত ও তাহাদিগের মত ইঁহাদেরও রাজসেবা ব্যবসা হওয়াতে ইঁহারাও বোধ হয় কায়স্থদিগের মত মিশ্র জাতি। কায়স্থদিগের মত, ইঁহাদেরও মাছ মাংস ভক্ষণ কিম্বা সুরাপান নিষিদ্ধ নহে। এখন ইঁহারা প্রায় সকলেই শিখদিগের প্রথম গুরু নানকের মতাবলম্বী হইয়াছেন।

সিন্ধীদিগের ভিতরে এই "আমিল" সম্প্রদায়ের লোকেরা সুশিক্ষিত। বর্ত্তমানকালে সিন্ধুদেশে যে সকল বিষয়ে উন্নতি হইয়াছে, তাহা অধিকাংশ প্রায় এই আমিলগণ কর্ত্তৃক হইয়াছে।



দেওয়ান নবল রায়।

দেওয়ান নবলরায় (যাঁহার নাম সিন্ধুদেশে অদ্যাবধি প্রাতঃস্মরণী), এই আমিল জাতির একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি কেশব বাবুর বক্তৃতা পাঠ করিয়া ব্রাহ্ম সমাজের প্রতি আকৃষ্ট হন। কেশব বাবুর সহিত পত্র লেখালেখি করিয়া তিনি হায়দ্রাবাদ ও করাচীতে ব্রাহ্মসমাজ



দেওয়ান হীরানন্দ।

স্থাপন করিতে কৃতকার্য্য হন। সিন্ধীদিগের মধ্যে যাহাতে সামাজিক উন্নতি হইতে পারে, তাহার জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করিতেন। তাঁহার দরিদ্রের প্রতি দয়া ও গুপ্তদান প্রসিদ্ধ ছিল। তিনি বাঙ্গালীদিগকে ভারতের এক অদ্বিতীয় জাতি বলিয়া মনে করিতেন এবং যাহাতে সিন্ধুদেশ বঙ্গদেশের মত উন্নতি লাভ করিতে পারে, তাহাই তাঁহার বড় ইচ্ছা ছিল। এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার দুই কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে কলিকাতায় বাঙ্গালীদিগের সহিত শিক্ষা লাভ করিতে পাঠান। তিনি সিন্ধুদেশের একজন খ্যাতনামা ডেপুটি কলেক্টর ছিলেন। তিনি নিজের আয় প্রায় সমস্ত সৎকার্য্যে ব্যয় করিতেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে উষ্ট্র হইতে পতিত হইয়া তাঁহার আকস্মিক মৃত্যু হয়। এই দুর্ঘটনায় সমস্ত সিন্ধুদেশবাসীরা সন্তপ্ত ও দুঃখিত হইয়াছিলেন।

তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হীরানন্দ কলিকাতায় বিদ্যালাভ করেন। তাঁহার উন্নত চরিত্রের গুণে তিনি সিন্ধীদিগের

মধ্যে "সাধু হীরানন্দ" বলিয়া বিদিত। তাঁহার যদি অল্প বয়সে হঠাৎ মৃত্যু না হইত, তাহা হইলে তাঁহা কর্ত্তৃক সিন্ধুদেশের অনেক উপকার সাধিত হইত। কিন্তু কালের এমনই গতি যে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নবলরায়ের মৃত্যুর কয়েক মাস পরেই তাঁহারও মৃত্যু হয়।

এই দুই ভ্রাতার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ হায়দ্রাবাদে একটী পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে। এই পাঠশালার নাম নবলরায়-হীরানন্দ একাডেমী" (Nawalroy Hiranand Academy) হীরানন্দের জীবিত অবস্থায় এই পাঠশালার সূত্রপাত হয়। তিনি কলিকাতায় স্বাধীন পাঠশালা সকল দেখিয়া তাহার অনুকরণে সিন্ধুদেশেও পাঠশালা স্থাপন করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি কলিকাতা হইতে কয়েকজন বাঙ্গালীকে সিন্ধুদেশে আনাইয়াছিলেন। মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের ভ্রাতুষ্পুত্র বাবু নন্দলাল সেন কর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথম ঐ একাডেমী পরিচালিত হয়। এখন এই একাডেমীর জন্য একটী উৎকৃষ্ট বাটি নির্ম্মিত হইয়াছে ও ইহাতে প্রায় ৭০০ ছাত্র পাঠ করে।

করাচীতে উচ্চশিক্ষার নিমিত্ত যে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তাহাও আমিলদিগের যত্নে ও অর্থসাহায্যে হইয়াছে। দয়ারাম জেঠমল নামক এক জন সুপ্রসিদ্ধ আমিল এই কলেজ স্থাপনে বদ্ধপরিকর হন। তিনি নিজে অনেক অর্থসাহায্য করিয়াছিলেন। এইজন্য এই কলেজ এখন "দয়ারাম জেঠমল কলেজ" বলিয়া বিদিত।

দয়ারাম গিধুমলের নাম বোধ হয় ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন স্থলেই অবিদিত নাই। তিনিও আমিলজাতিভুক্ত ও এখন বোম্বাই প্রদেশে এক জন জজ। যেমনি তাঁহার বিপুল ঐশ্বর্য্য, তেমনি তাঁহার দানেরও ইয়ত্তা নাই। তিনি যেরূপ দান ও অনাথ দুঃখীদিগকে ভরণ পোষণ করেন, তাহা আমাদিগের সকল ধনীদিগের অনুকরণস্থল হওয়া উচিত। সিন্ধুদেশে এমন কোন সৎকার্য্য হয় নাই, যাহাতে দয়ারাম গিধুমল অর্থসাহায্য করেন নাই। হায়দ্রাবাদে স্বীয় পিতার স্মৃতি চিহ্নস্বরূপ তিনি একটী সংস্কৃত পাঠশালা স্থাপন করিয়াছেন।

সিন্ধুদেশে বণিক্ জাতি অতি প্রসিদ্ধ। হিন্দুস্থানের বেনেদের মত ইহাদিগের ভিতরে জাতিভেদের কড়াকড় নিয়ম নাই। ইহারা ম্লেচ্ছ ও যবনদেশে বাস ও সমুদ্রযাত্রা করিয়া থাকে। ইহারা প্রায় মধ্য এসিয়ার দেশগুলিতে বাণিজ্যব্যবসার জন্য গমন করে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক সহরে দোকান স্থাপন করিয়াছে।

সিন্ধুদেশে যত মুসলমান সম্প্রদায় দেখিতে পাওয়া যায়, তত আর পৃথিবীর কুত্রাপি নাই। সম্প্রতি সিন্ধুদেশের কমিশনরের সাহায্যে সিন্ধুদেশের ভিন্ন ভিন্ন মুসলমান সম্প্রদায়ের ইতিবৃত্ত প্রকাশিত হইয়াছে। ইহা হইতে জানা যায় যে মুসলমানদিগের একাদশটী প্রধান সম্প্রদায় সিন্ধুদেশে আছে। যদিও এই মুসলমানদিগের পূর্ব্ব পুরুষেরা সিন্ধুদেশে প্রায় এক সহস্র বৎসর রাজত্ব করিয়াছিল, তথাপি এখন তাহাদের অবস্থা নিতান্ত শোচনীয়। ইহাদের অনেকেই ঋণগ্রস্ত ও শিক্ষার অভাবে প্রায় চরিত্রহীন। যাহাতে ইহাদের অবস্থার উন্নতি হইতে পারে, তজ্জন্য এখন অনেকেই চেষ্টা করিতেছেন।

সাধারণতঃ সিন্ধীদিগের অন্তঃকরণ অতি সরল ও তাহারা আতিথেয়তার জন্য বিখ্যাত। তাহাদের মধ্যে একটী প্রবাদ প্রসিদ্ধ আছে যে কাকের মত খাবে, কুকুরের মত নহে; অর্থাৎ কাকেরা কিছু খাবার পাইলে 'কা' 'কা' করিয়া অন্য সকল কাককেও ডাকিয়া লয়; কিন্তু কুকুরেরা কিছু খাইতে পাইলে অন্য কাহাকেও দেয় না।

সিন্ধুদেশে দেশী রাজত্ব থাকায় অনেক শিল্পের উন্নতি হইয়াছিল। এখনও সেখানে অনেক ভাল ভাল শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। তথায় কাষ্ঠের ও মাটীর যেরূপ দ্রব্য তৈয়ার হয়, বোধ করি ভারতের অন্য কোন স্থানে সেরূপ সুন্দর জিনিস হয় না। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই সকল শিল্প উৎসাহ পায় না বলিয়া পূর্ব্বের মত সুন্দর কায এখন আর দেখা যায় না।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে সিন্ধুদেশে মিসরদেশের মত কোন পুরাতন বস্তু দেখিবার নাই। যাহা কিছু দেখিবার আছে, তাহা মুসলমান কিম্বা ইংরাজ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে। মুসলমানদের সময় সিন্ধুদেশের রাজধানী ছিল হায়দ্রাবাদ, কিন্তু ইংরাজদিগের সময় হইয়াছে করাচী। হায়দ্রাবাদে আমিরদিগের দুর্গ ও তাহাদিগের সমাধিমন্দির দেখিবার

যোগ্য। তাহাদিগের সমাধিমন্দিরে যে শিল্পকার্য্য আছে, তাহা সাতিশয় প্রশংসনীয়।

করাচীর উন্নতি ইংরাজকর্তৃক সাধিত হইয়াছে। এখানকার বন্দর ইংরাজ আমলেই বিখ্যাতি লাভ করিয়াছে। স্যর্ বাটল্ ফ্রেয়ার যখন সিন্ধুদেশের কমিশনরের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখন তিনি করাচী বন্দরের ও করাচীতে অন্যান্য বিষয়েরও অনেক উন্নতি করিয়া যান। এখন করাচীতে যে জীবনিবাস আছে তাহা তাঁহা কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল। কলিকাতার সন্নিকটস্থ আলীপুর ভিন্ন এরূপ জীবনিবাস ভারতের আর কোথাও নাই। করাচীবাসীরা ফ্রেয়ার সাহেব কর্তৃক উপকৃত হইয়াছিল বলিয়া তাঁহার স্মৃতিচিহ্নস্বরূপ ফ্রেয়ার হল নামক একটী বৃহৎ অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন। ইহাও দেখিবার যোগ্য। ইহার ভিতরে এখন একটী বৃহৎ পুস্তকালয় আছে। পূর্ব্বে ইহার ভিতর একটী যাদুঘর ছিল, কিন্তু এখন সেই যাদুঘরটীকে দয়ারাম জেঠমল কলেজে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে।

সিন্ধুদেশের ভিতর এখন সিন্ধুনদীর উপর দুই স্থলে সেতু বন্ধন করা হইয়াছে। এই দুই সেতু কোটরী ও সক্কর নামক স্থানে আছে। দুইটিই লৌহদ্বারা নির্ম্মিত ও দেখিবার যোগ্য। সক্করের সেতুর মত সেতু ভারতের আর কোথাও নাই।

যদিও সিন্ধুদেশ মরুময় ও তথায় বিশেষ কিছু দেখিবার যোগ্য বস্তু নাই, তথাপি ঐ দেশ ভারতবাসীদিগের পক্ষে তীর্থস্থান হওয়া কর্তব্য। গত সহস্র বৎসরের মধ্যে যাঁহাকে রামরাজার সহিত প্রায়ই তুলনা করা হয় এবং যাঁহার রাজত্বে ভারতবাসীরা সর্ব্ব প্রকারে সুখী ছিলেন, সেই প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মা আকবরের জন্ম এই মরুময় সিন্ধুদেশে হইয়াছিল। তিনি হায়দ্রাবাদের নিকট অমরকোট নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। সিন্ধুদেশে তাঁহার জন্ম হইয়াছিল বলিয়াই ঐ দেশ ভারত ইতিহাসে চিরকাল প্রসিদ্ধ থাকিবার যোগ্য।

শ্রীবামনদাস বসু।

ধর্ম্মের রূপ ও স্বরূপ।

ধর্ম্মের রূপের বৈচিত্র্য দেখিবার জন্য আমাদিগকে দূরে যাইতে হইবে না। এই ভারতক্ষেত্রই ধর্ম্মের নানা রূপের সাধন-ক্ষেত্র। এখানে বর্ব্বরদিগের প্রেতপূজা হইতে সুসভ্যদিগের একেশ্বরবাদ পর্য্যন্ত ধর্ম্মের সকল রূপ ও সকল সাধন বিদ্যমান রহিয়াছে। বাস্তবিক মানব-হৃদয়ে ধর্ম্মভাবের অভ্যুদয় ও বিকাশের এবং মানবীয় সামাজিক রীতিনীতির বিবর্তনের নিদর্শন ও পরীক্ষার দ্বিতীয় স্থান এরূপ আর নাই। অদ্যাপি এখানে পার্ব্বত্য জাতিসকলের মধ্যে প্রেতপূজা আছে; আবার সমতলস্থ জ্ঞানিগণের মধ্যে অত্যুন্নত একেশ্বরবাদও আছে। সুতরাং ধর্ম্মভাবের উৎপত্তি ও উন্নতির ক্রম যিনি জানিতে চান, তাঁহার পক্ষে ভারতীয় জাতিসকলের সামাজিক ইতিবৃত্তের আলোচনা অতীব প্রয়োজনীয়।

বৈদিক যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান ও উপনিষদের ব্রহ্মজ্ঞান, এই দুই সমান্তরাল ধারা চলিয়া আসিতে, আসিতে এদেশে কিরূপে পৌত্তলিকতার আবির্ভাব হইল, তাহা এক জটিল প্রশ্ন। কেহ কেহ বলেন যে বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পর বৌদ্ধধর্ম্মের দৃষ্টান্ত ও উপদেশের প্রভাবে ভারতীয় চিন্তাতে পৌত্তলিকতার আবির্ভাব ও শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। বৌদ্ধধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পর যে দেবদেবীর অর্চ্চনা প্রবল হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ে"র গ্রন্থকার খ্যাতনামা অক্ষয়কুমার দত্ত মহাশয় অনুমান করেন যে খ্রীষ্টীয় শকের ষষ্ঠ শতাব্দী পূর্ব্বেও এদেশে শিবপূজা প্রচলিত ছিল। তাহা হইলে মহাত্মা বুদ্ধের জন্মের পূর্ব্বেও কোন কোনও প্রকার দেবদেবীর পূজা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল বলিতে হইবে। ভারতীয় পৌত্তলিকতার উৎপত্তি ও ক্রম নির্দ্দেশ করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু সেই পৌত্তলিকতা এদেশে কিরূপ রূপ ধারণ করিয়াছিল, তাহাই সংক্ষেপে বর্ণন করা উদ্দেশ্য। ভারতীয় পৌত্তলিকতা এই আর্য্যাবর্ত্ত প্রদেশে প্রধানতঃ তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে—শৈব, বৈষ্ণব ও শাক্ত। দাক্ষিণাত্যে আর এক সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছে, তাহার নাম গাণপত্য। তাঁহারা গণপতির উপাসক। আর্য্যাবর্ত্তেও পূর্ব্বোক্ত তিন প্রধান সম্প্রদায়ের মধ্যে শৈব সম্প্রদায় সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন. তৎপরে বৈষ্ণব ও সর্ব্বশেষে শাক্ত। শৈবগণের অধিকাংশ শঙ্করের পথাবলম্বী। ইঁহাদের ভিন্ন ভিন্ন শাখা ও প্রশাখাতে ভিন্ন ভিন্ন সাধন-প্রণালী আছে। মহাত্মা চৈতন্যের অভ্যুদয়ের পর বঙ্গীয় বৈষ্ণবগণ তাঁহারই শিষ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়া

তাঁহারই শাখা প্রশাখাতে পরিণত হইয়াছেন। ইঁহাদের সাধন-প্রণালীর মধ্যেও বিভিন্নতা আছে। বঙ্গদেশে শাক্ত-মতাবলম্বীরাও সংখ্যাতে কম নহেন। তাঁহাদের সাধনপ্রণালী প্রধানতঃ তন্ত্রশাস্ত্রের অনুশাসনানুসারে গঠিত। তাহার সবিশেষ উল্লেখ করা এখানে নিষ্প্রয়োজন। সংক্ষেপে এইমাত্র বক্তব্য যেকোন কোনও তান্ত্রিক সাধন-প্রণালী এমনি জঘন্য, এমনি বীভৎস কাণ্ড, যে প্রকাশ্য পত্রিকায় তাহার উল্লেখ সম্ভব নহে। যখন সে সকলের বিবরণ পাঠ করা যায়, তখন মন এই চিন্তাতেই মগ্ন হয় যে ধর্ম্মের মধ্যে কিরূপে এরূপ অধর্ম্মের ব্যাপার প্রবিষ্ট হইল? জাতীয় দুর্গতি কিরূপে এতদূর গভীর হইল, যাহাতে এরূপ ব্যাপারও ধর্ম্ম-সাধনের অঙ্গীভূত হইতে পারে?

সে যাহা হউক শৈব, বৈষ্ণব ও শাক্ত এই ত্রিবিধ ধর্ম্ম যে যে প্রণালীতে সাধিত হইতেছে, স্থূলতঃ তাহাদিগকে তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে—(১ম) বৈরাগ্য ও যোগপ্রধান সাধন, (২য়) ভাবপ্রধান সাধন, (৩য়) ক্রিয়া-প্রধান সাধন। এই ত্রিবিধ সাধন-প্রণালীর বিকাশ ও উন্নতি ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায় সকলের মধ্যে দৃষ্ট হইয়াছে।

নানকপন্থী ও কবীরপন্থী প্রভৃতি সম্প্রদায়গণ অপেক্ষাকৃত পৌত্তলিকতাবিহীন ও একেশ্বরবাদী হইলেও তাঁহাদের মধ্যেও ঐ ত্রিবিধ সাধনপ্রণালীর বিকাশ দেখা গিয়াছে।

ঐ ত্রিবিধ সাধনের বিকাশ যে কেবল ভারতবর্ষীয় হিন্দুগণের মধ্যেই দেখা গিয়াছে তাহা নহে, খ্রীষ্টীয় সাধকদিগের মধ্যেও দৃষ্ট হইয়াছে। তাঁহাদের মধ্যেও অরণ্যবাসী সন্ন্যাসী, ভাবুক ও কর্ম্মী, এই তিনশ্রেণীর সাধক দেখা দিয়াছেন। বলিতে কি, সাধন-প্রণালী ও সাধক-শ্রেণীর এত বৈচিত্র্য আর অতি অল্প ধর্ম্মের মধ্যেই দৃষ্ট হইয়াছে। এখনও যদি খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের ইতিহাস বিষয়ে অনভিজ্ঞ কোনও ব্যক্তি হঠাৎ ইউরোপখণ্ডে গিয়া সাকারোপাসক রোমান কাথলিক ও ব্রহ্মোপাসক ইউনিটেরিয়ান এই উভয়ের সাধন-প্রণালীর প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তাহা হইলে কখনই তাঁহাদের উভয়কে একধর্ম্মাক্রান্ত লোক বলিয়া মনে করিতে পারিবেন না। অথচ তাঁহারা উভয়ে একধর্ম্মাক্রান্ত।

বৌদ্ধ ও মহম্মদীয় সাধকদিগের মধ্যে সাধনপ্রণালীর প্রভেদ ঘটিয়াছে, এবং তাহাদের মধ্যে নানা রূপ ধারণ করিয়াছে।

এইত গেল জগতের অপেক্ষাকৃত সভ্য জাতিসকলের মধ্যে ধর্ম্মের বিভিন্নরূপ। অসভ্য বর্ব্বরদিগের ত কথাই নাই। তাহাদের মধ্যে ধর্ম্মভাব যে ভাবে বিকশিত হইয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। তাহাদের মধ্যে এক এক জাতির ধর্ম্মভাব এক এক আকারে বিকশিত হইয়াছে। তাহার সবিস্তর উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। সংক্ষেপে এই মাত্র বলা যায়, পিতৃগণপূজা ও প্রেতপূজাই এই সকল জাতির প্রধান সাধন। প্রেতগণের প্রীত্যর্থ তাহারা নানা প্রকার ক্রিয়া করিয়া থাকে। তাহাদের পূজা ও ধর্ম্মানুষ্ঠানের মুখ্যভাব প্রেতের সন্তোষসাধনপূর্ব্বক অনিষ্টাশঙ্কা নিবারণ।

এইরূপে আমরা দেখিতে পাই যে ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মের বহিরঙ্গস্বরূপ ক্রিয়াসকল মানবীয় সভ্যতার সকল স্তরেই বিদ্যমান রহিয়াছে। কেন ধর্ম্ম মানবীয় সভ্যতার সকল স্তরে বিদ্যমান রহিয়াছে? কেন মানব ইহাকে অতিক্রম করিতে পারিতেছে না? ইহা অতীব বিস্ময়কর প্রশ্ন! আবার ধর্ম্মভাবের প্ররোচনাতে মানবগণ যে সকল আচরণ করিতেছে, তাহা আরও আশ্চর্য্য! আমরা অনেকবার শিশুদের খেলাঘরের নিকটে দাঁড়াইয়া তাহাদের খেলা দেখিয়াছি। দেখি কয়েকখানি হাঁড়িভাঙ্গা খোলা হইয়াছে মাছ, খ্যাংরাকাঠির কুচি হইয়াছে ডাঁটা, কতকগুলি কুরুই হইয়াছে আলু পটোল, কতকগুলি ইঁদুরমাটী হইয়াছে ভাত, এইরূপে অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত; আহারে বসিয়াছে একটী পুতুল, সে কর্ত্তা, আর একটী পুতুল হলেন গৃহিণী, তিনি অন্ন ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিয়া কর্ত্তার সমক্ষে দিয়াছেন, কর্ত্তা আহার করিতেছেন। এই সমুদয় অভিনয় গভীর অভিনিবেশের সহিত চলিতেছে; শিশু তাহাতেই মগ্ন রহিয়াছে! তুমি আমি দাঁড়াইয়া যেরূপ মনের সহিত দেখিতেছি, শিশুর সেরূপ মন হইলে সে আর খেলিতে পারিত না, "কি করিতেছি?" বলিয়া হাসিয়া উঠিয়া পলাইত। সেইরূপ যদি কোনও উন্নতজাতীয় জীব আজ মানবসমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তবে কি ধর্ম্ম সম্বন্ধে এই শিশুর খেলা দেখিতে পান না? তিনি কি

দেখিয়া বিস্মিত হন না যে বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ গভীর অভিনিবেশের সহিত কল্পনাময় জগতে বাস করিয়া অভিনয় করিতেছে? তিনি দেখেন, হিন্দুসমাজমধ্যে যজমান কয়েকগাছি কুশের উপরে এক মুষ্টি অন্নপিণ্ড, এক গণ্ডুষ জল এবং এক গাছি কাপড়ের দশী দিয়া ভাবিতেছেন, সেই অন্ন, জল ও বস্ত্র পরকালে গিয়া প্রেত পিতৃপুরুষের ক্ষুধা, তৃষ্ণা ও লজ্জা নিবারণ করিবে! খৃষ্টীয়ানদিগের মধ্যে উপাসকগণ একটু সুরা ঢালিয়া ও এক খণ্ড রুটী ভাঙ্গিয়া মনে করিতেছেন তাহা প্রভু যীশুর রক্তমাংস হইয়া গেল, এবং সেই বোধে তাহা পানাহার করিতেছেন! ইহা কি উন্নত জ্ঞানী আত্মাদের নিকটে শিশুদের ক্রীড়ার মত দেখায় না?

ধর্ম্মভাব এমনি জিনিস যাহাতে জ্ঞানপ্রাপ্ত বৃদ্ধকেও শিশুর ন্যায় করিতেছে। কেহ যদি দেখেন এক জন জ্ঞানসম্পন্ন বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তি আপনার চক্ষুদ্বয়ের প্রতি অবিশ্বাস করিয়া লৌহশলাকার দ্বারা তাহাদের আলোক নির্ব্বাণ করিতেছে ও আপনাকে অঙ্গহীন করিয়া অপরের হস্তে অর্পণ করিতেছে, তাহা হইলে কি রূপ দুঃখ হয়? হায়, ধর্ম্ম মানবহৃদয়ের এমনি প্রিয় যে যখনি ধর্ম্মবিশ্বাস ও বিচারশক্তিতে বিরোধ বাধিয়াছে, তখনি মানব বিচারশক্তিকে অন্ধ করিয়া গুরুর হস্তে আপনাকে অর্পণ করিয়াছে। অদৃশ্যে তন্ময়তা ইহার একটা প্রধান কারণ। ধর্ম্মের এই মহিমা যে ইহা অদৃশ্যকে দৃশ্য হইতে নিকটতর করে ও তাহার আবেশে চিত্তকে মুগ্ধ করে। বলিতে কি, এই তন্ময়তাজনিত ইন্দ্রজাল ও ভাবাবেশ, যেমন কবিত্বের প্রাণ, তেমনি ধর্ম্মেরও প্রাণ। এই জন্য উচ্চ অঙ্গে কবিত্ব ও ধর্ম্মভাব মিশিয়া একীভূত হয়। এই কারণেই জগতের প্রাচীন ধর্ম্মভাব কবিত্বে প্রকাশিত হইয়াছিল। এই কারণেই কবি ও ঋষি সমার্থবাচক শব্দ। পূর্ণিমারজনীতে পূর্ণচন্দ্রের চারিদিকে এক একদিন আলোক মণ্ডলদেখা যায়, তাহাতে পূর্ণচন্দ্রের শোভাকে দ্বিগুণিত করে; শীতের প্রারম্ভে এক এক দিন দৃষ্টিরেখাস্থিত তরুলতা এক প্রকার নীলাভ বাষ্পরাশিদ্বারা মণ্ডিত হয়, তাহাতে তাহারা অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়া প্রাণ মন হরণ করিতে থাকে। পূর্ণচন্দ্র হইতে সেই আলোকমণ্ডলকে সরাইয়া লও, অথবা প্রকৃতির মুখ হইতে সেই নীলাভ বাষ্পরাশিকে সরাইয়া লও, সে শোভা আর থাকিবে না। তেমনি আমাদের সুখদুঃখময়, বাসনা ও বিষাদময় জীবন হইতে এই তন্ময়তা ও ভাবের আবেশ সরাইয়া লও, জীবনক্ষেত্রে কেবল দৈনিক প্রবৃত্তি, বাসনা, সুখ, দুঃখ ও সংগ্রামের স্মৃতি পড়িয়া থাকিবে; সে জীবন আর ফিরিয়া দেখিতেও ইচ্ছা হইবে না। বিশ্বশিল্পী এই মানবজীবনকে সুন্দর দেখাইবার জন্য ইহাকে তন্ময়তা ও ভাবের তুলি দিয়া ছুঁইয়াছেন, মানবের প্রাণে তন্ময়তা ও ভাবের ঘোর দিয়াছেন। তাই জীবনে যাহা দেখিতেছি তদপেক্ষা যাহা দেখিতেছি না তাহারই আকর্ষণ আমাদের চিত্তের উপরে অধিক হইতেছে। ইহাই ধর্ম্মভাব অথবা ইহাই কবিত্ব। ধর্ম্মভাবের অধীন হইয়া মানুষ যাহা করিতেছে, তাহাকে তুমি শিশুর ক্রীড়া বলিতে পার, কিন্তু এই যে অদৃশ্যে রতি, ইহাই মানবজীবনের বিশেষত্ব, মহত্ত্ব ও সকল শক্তির উৎস।

ধর্ম্মের বাহিরের রূপসকল অনেক স্থলে শিশুর ক্রীড়া হইলেও এক মহোপকার সাধন করে। ইহা দৃশ্যজীবনের চারিদিকে অদৃশ্যের ছায়ামণ্ডলকে অঙ্কিত করে। অজ্ঞাতসারে সসীমের পশ্চাতে অসীমের ধারণাকে উজ্জ্বল করে, এবং মানবমনকে নিজ শক্তির ক্ষুদ্রতা জ্ঞানে অভ্যস্ত করিয়া বিনয় আনিয়া দেয়। সুতরাং ধর্ম্মের রূপসকল মানবের আধ্যাত্মিক শিক্ষার সহায়; তাহা উপেক্ষণীয় নহে। ধর্ম্মভাবকে হৃদয়ে ধরিয়া রাখিতে চাহিলেই তাহার সাধনের প্রণালী অবলম্বন করিতে হইবে। অতএব ধর্ম্মের রূপ অনিবার্য্যরূপেই আসিয়া পড়িবে।

এক্ষণে প্রশ্ন এই, ধর্ম্মের এই সকল বিভিন্ন ও পরস্পরবিসম্বাদী রূপের মধ্যে ধর্ম্মের স্বরূপ কি? এমন কি কোনও সূত্র আছে, যদ্দ্বারা বর্ব্বরদিগের প্রেতপূজা, বৌদ্ধদিগের অজ্ঞেয়তাবাদ, ও অত্যুন্নত ব্রহ্মোপাসকদিগের উপাসনা—সমুদয়কে ব্যাখ্যা করা যায়? ইহা অতীব দুরূহ প্রশ্ন। মোক্ষমূলর বলিয়াছেন, ধর্ম্মভাবের স্বরূপ ব্রহ্মজ্ঞান, অর্থাৎ সসীমের পশ্চাতে অসীম রহিয়াছে, এই বোধ। তিনি বলেন ইহা সকল ধর্ম্মেরই অন্তরালে আছে, সুতরাং এইটাই ধর্ম্মের স্বরূপ। থিওডোর পার্কার বলিয়াছেন, ধর্ম্মের স্বরূপ নির্ভরের ভাব। আমি আর কোনও শক্তির উপরে নির্ভর করিতেছি, এই বোধ। ইহা সকল ধর্ম্মের মধ্যেই আছে। ধর্ম্মের স্বরূপের এই সকল ব্যাখ্যা আংশিক ভাবে সত্য,

ধর্ম্মস্বরূপের এক দিক মাত্র। জগতের ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাজনগণের উপদেশ সকল আলোচনা করিলেই দৃষ্ট হইবে যে তাঁহারা ধর্ম্মকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিলেন, এক ভাগ আত্মার দিকে, অপর ভাগ জগতের দিকে। এক ভাগের নাম দেওয়া যাক আধ্যাত্মিকতা, অপর ভাগের নাম দেওয়া যাক নীতি। তাঁহারা মানবকে কেবল মাত্র এই উপদেশ দিয়া সন্তুষ্ট হন নাই যে তোমরা জগতের অতীত পরম সত্তার ভাব হৃদয়ে ধারণ কর, তৎসঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলিয়াছিলেন, সেই সত্তার ভাব হৃদয়ে লইয়া আপনাদের প্রবৃত্তিকুলকে শাসন কর। অতীন্দ্রিয় সত্তাকে হৃদয়ে ধারণ ও প্রবৃত্তিকুলের শাসন—এই উভয় ধর্ম্মের অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গ, ধর্ম্মের দুই পা বলিলেও হয়। বলিতে কি প্রবৃত্তিকুলের শাসনসংক্রান্ত প্রশ্নই মুখ্যরূপে মহাজনদিগকে ধর্ম্মের প্রতি উন্মুখ করিয়াছিল। তাঁহাদের প্রেমিক হৃদয় মানবকুলের পাপপ্রবৃত্তি ও তজ্জনিত দুঃখদুর্গতির আঘাতে আহত হইয়াই মানবের প্রবৃত্তিকুলের শাসনের পন্থা অন্বেষণ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; এবং সেই অন্বেষণের ফলস্বরূপ অতীন্দ্রিয় সত্তা ও শক্তিকেই সেই শাসনের সর্ব্বপ্রধান সহায়রূপে অবলম্বন করিয়াছিল। তাঁহাদের এই টুকু বিশেষত্ব, বাহিরের বিপ্লব নিবারণার্থ স্থূলদর্শী লোকের দৃষ্টি সচরাচর বাহিরের উপায় অন্বেষণ করে, কিন্তু তাহাদের দৃষ্টি জীবনের মূলে ও মানব প্রকৃতির মূলে সেই উপায় অবলম্বন করিয়াছিল। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন প্রবৃত্তিকুলকে সংযত করিবার উপায় দেখাইয়া না দিলে মানবকে পাপ হইতে রক্ষা করিবার আর উপায় নাই। সুতরাং সেই কার্য্যেই আপনাদিগকে প্রধান রূপে নিয়োগ করিয়াছিলেন।

লোকে মহম্মদকে যথেচ্ছাচারী বলে। সচরাচর শুনিতে পাই তিনি একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া লোকে তাঁহাকে প্রবৃত্তিপরতন্ত্র পুরুষ বলিয়া নিন্দা করে। কিন্তু আমি যখন ভাবি, যে আরবজাতি ইন্দ্রিয়পরতন্ত্রতা ও সর্ব্ববিধ উচ্ছৃঙ্খলতার আলয়স্বরূপ ছিল, মহম্মদ কিরূপে তাহাদিগকে পাঁচ নমাজ, ব্রত, উপবাস, রোজা, সুরাপানবিমুখতা, মিতাচার, ঋণাদি সম্বন্ধে কঠোর সততা প্রভৃতির ভিতরে বাঁধিলেন, তখন বিস্ময়সাগরে মগ্ন হই। ইহাতে কিছু সংশয় নাই যে মহম্মদ তাঁহার ধর্ম্মকে আরবীয় কুনীতির ঔষধরূপে প্রয়োগ করিয়াছিলেন।

যীশু তাঁহার ধর্ম্মকে প্রধানতঃ নীতিপ্রধান করিয়াছিলেন, তাহা সর্ব্বসাধারণেই জানেন, সুতরাং সে বিষয়ে বিশেষ উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। মহাত্মা বুদ্ধের ত কথাই নাই, প্রবৃত্তিকুলের শাসন তাঁহার ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান অঙ্গ ছিল। বরং একথা বলা যায়, যে ধর্ম্মের আধ্যাত্মিকতার অঙ্গকে তিনি দ্বিতীয় স্থানে রাখিয়াছিলেন; অজ্ঞেয়তাবাদের আবরণে তাহাকে আবৃত করিয়াছিলেন।

এই সকল বিষয় চিন্তা করিলে একথা এক প্রকার স্থির রূপে বলা যায়, যে ধর্ম্মের ভিতরকার কথা আত্ম-সংযম।

তবে ধর্ম্মের স্বরূপের ভিতর দুইটী কথা আছে—আধ্যাত্মিক দিকে এক ইন্দ্রিয়াতীত সত্তা বা শক্তিতে বিশ্বাস, নৈতিক দিকে আত্ম-শাসন।

বুদ্ধ এই আধ্যাত্মিক সত্তা বা শক্তিকে বলিলেন—কর্ম্ম। কর্ম্মই মানবজীবনকে শাসন করিতেছে। মহম্মদ এই অতীন্দ্রিয় সত্তা বা শক্তিকে বলিলেন—মহান আল্লা,—এক প্রবল শক্তি ও মহতী ইচ্ছা মানবজীবনকে শাসন করিতেছে; যীশু বলিলেন—এই অতীন্দ্রিয় সত্তা বা শক্তি পিতা অর্থাৎ এক উদার প্রেমের ক্রোড়ে মানবজীবন রহিয়াছে এবং তদ্দ্বারাই শাসিত হইতেছে।

ভিতরকার কথাটা বড়ই গম্ভীর। এই ইন্দ্রিয়াতীত শক্তিকে মহানিয়মই বল, মহতী ইচ্ছাই বল, আর উদার প্রেমই বল, ইহা নিশ্চিত যে মানব-জীবন অনিবার্য্যরূপে, অনুল্লঙ্ঘনীয়রূপে, ও সর্ব্বাঙ্গীনরূপে অপর কোনও শক্তির শাসনাধীন। এই সত্যটী বিরলে বসিয়া চিন্তা করিলে শরীর ও মন কম্পিত হয়। কিন্তু মহাজনেরা এই মহাসত্য হৃদয়ে ধারণ করিয়া নিবৃত্ত হইলেন না; বলিলেন, এই শক্তির অধীন হইয়া আত্ম বিলোপ কর। এই আত্মবিলোপসম্বন্ধে সকলেরই এক বাক্য দেখিতে পাওয়া যায়। বুদ্ধ বলিয়াছেন, নিজের কিছু একটা চাওয়াই পাপ—সম্পূর্ণরূপে বাসনা-বিলয় করাই নির্ব্বাণ। মহম্মদ বলিয়াছেন, আল্লা যাহা আদেশ করেন, তদ্বিরুদ্ধ কিছু চাওয়াই পাপ—সে কাফেরের কাজ। আল্লার ইচ্ছাতে আপনার ইচ্ছা জলাঞ্জলি দেও, পূর্ণ বাধ্যতা অভ্যাস কর। যীশু বলিয়াছেন, প্রেমে

তোমাদের পরমপিতার হস্তে আত্ম সমর্পণ কর। হায়! ইহাত একই উপদেশ! কিন্তু আমাদের ন্যায় কামক্রোধের বশীভূত, ক্ষণিক সুখেচ্ছার ক্রীড়ার পুতুল মানবের পক্ষে ইহা কতদূর কঠিন কথা! সম্পূর্ণ আত্মবিলোপ দূরের কথা, প্রবৃত্তিকুলের মুখে একটু লাগাম দিয়া, খানাখন্দ বাঁচাইয়াও যে আমরা চলিতে পারিতেছি না! অর্জ্জুনের ন্যায় আমাদিগকে বলিতে হইতেছে

"চঞ্চলং হি মনঃ কৃষ্ণ প্রমাথি বলবদ্দৃঢ়ং।
তস্যাহং নিগ্রহং মন্যে বায়োরিব সুদুষ্করং" ॥

অর্থাৎ "হে কৃষ্ণ! মন চঞ্চল এবং অতিশয় অনবহিত, তাহাকে সংযত করা বায়ুকে সংযত করার ন্যায় দুষ্কর বলিয়া মনে করি।"

উপনিষদকার ঋষিগণ বলিয়াছেন—

বিজ্ঞান সারথি র্যস্তু মনঃ প্রগ্রহবান্নরঃ।
সোধ্বনঃ পারমাপ্নোতি তদ্বিষ্ণোঃ পরংপদং ॥

অর্থ—সদ্বিচার যাঁহার চিত্তের সারথি, মনরূপ লাগাম যাঁহার হস্তে, সেই ব্যক্তিই সংসারপথ পার হইয়া সেই সর্ব্বব্যাপী পুরুষের পরম পদ প্রাপ্ত হন।

এই বিষয়েই পৃথিবীর মানুষ যুগে যুগে হারিয়া গিয়াছে। তাহাদের প্রবৃত্তিকুল "দুষ্টাশ্বা ইব সারথেঃ"—সারথির দুষ্ট অশ্বের ন্যায় বারণ না মানিয়া তাহাদিগকে পাপপঙ্কে নিমগ্ন করিয়াছে। সাধুরা কৃপাপরবশ হইয়া চিন্তা করিয়াছেন, কিরূপে ইহাদিগকে বাঁচান যায়। এই চিন্তাপ্রসূত ধ্যান ধারণাতে আপনাদিগকে নিযুক্ত করিয়া পরমতত্ত্বের সন্ধান পাইয়াছেন। অমনি বজ্রগম্ভীর স্বরে বলিয়াছেন—"হে মানব! পাপতাপে ক্লেশ পাইও না। যে শক্তি তোমাকে গ্রাস করিয়া রহিয়াছে, যাহা প্রতি মুহূর্ত্তে তোমার জীবনে প্রবেশ করিতেছে, যে শক্তিসাগরে তুমি বুদ্‌বুদের ন্যায় ভাসিতেছ, যে শক্তি তোমাকে অনিবার্য্য, অনুল্লঙ্ঘনীয়, অপরিহার্য্যরূপে শাসন করিতেছে, তুমি আপনাকে সম্পূর্ণরূপে তাহার হস্তে অর্পণ কর, তাহা ধর্ম্মাবহ, ধর্ম্মের বিজয়বিধাতা ও পাপের শাস্তা"। কেহ কেহ বলিয়াছেন, "ভয় পাইও না, এই শক্তিই প্রেম, ইহা তোমাকে কল্যাণের দিকেই লইয়া যাইবে।

একটা কথাত সত্য! ইন্দ্রিয়াতীত শক্তি যিনিই থাকুন, তিনি যদি আমাদের হৃদয়ক্ষেত্রে প্রবেশ না করেন, প্রবৃত্তিকুলের হস্ত হইতে যদি আমাদিগকে রক্ষা না করেন, যখন বলের প্রয়োজন তখন যদি বল না পাই, তবে সে অতীন্দ্রিয় শক্তির চিন্তাতে আমাদের প্রয়োজন কি? মহাজনেরা বলিয়াছেন, তোমরা চিন্তা কর, অবশ্য বল পাইবে। বুদ্ধ মরিতে মরিতে শিষ্যদিগকে বলিলেন—তোমরা আত্ম-সংযম করিয়া উন্নতি সাধন কর, ধর্ম্ম তোমাদিগকে রক্ষা করিবেন। যীশু বলিলেন, দ্বারে আঘাত কর, তোমাদের জন্য দ্বার উন্মুক্ত হইবে। এ সকলই আশার কথা।

এখন একটা তত্ত্ব অনিবার্য্যরূপে আসিয়া পড়িতেছে, যদি সেই ইন্দ্রিয়াতীত শক্তিকে হৃদয়ক্ষেত্রে ধারণ করিয়া পরে জীবনক্ষেত্রে আনিতে হয়, তবে প্রেমই সে পথের প্রধান সহায়। প্রেমের এক আশ্চর্য্য ধর্ম্ম এই যে উহা ব্যক্তিত্বকে বিলোপ না করিয়া আত্মবিলোপ করে। যে বাধ্যতাতে প্রেম নাই তাহাতে আত্মার দাসত্ব ও মৃত্যু, যে দাসত্বের মূলে প্রেম তাহাতে আত্মার স্বাধীনতা ও জীবন। সাধুরা যে আত্মবিলোপ চান, তাহা কেবল প্রেমই করিতে পারে। এই কারণে প্রেম যখন সেই ইন্দ্রিয়াতীত সত্তা বা শক্তিকে পরমপুরুষরূপে প্রাপ্ত হয়, তখনই ধর্ম্মের প্রকৃত সাধন আরম্ভ হয়।

প্রেম হইতেই ভক্তির জন্ম, ভক্তি প্রেমের পরিপক্বাবস্থা। এ বিশ্বে আমি কিছুই নই, প্রভু আমাকে সত্তা দিয়াছেন বলিয়া সত্তা পাইয়াছি, তিনি যা দেন আমি তাই পাই, তিনি আমাকে যা করেন তাই হই, অকপট চিত্তে এই বিনয়কে ধারণ করা ভক্তির প্রথম স্ফুরণ; তাঁহাকে জানা আমার জ্ঞানের সার্থকতা, তাঁহাকে পাওয়া আমার প্রেমের সার্থকতা, তাঁহার আদেশের অধীন হওয়া আমার শক্তির সার্থকতা—এই অনুভব ভক্তির দ্বিতীয় স্ফুরণ; জ্ঞানে প্রেমে আনন্দে তাঁহার সহিত একীভূত হইয়া তাঁহার প্রেমে আত্ম-সমর্পণ করা ও তাঁহার আদেশের বশবর্ত্তী হওয়া ভক্তির তৃতীয় স্ফুরণ।

ভক্তিই সেই উৎস যাহা হইতে সকল সাধুতা উৎসারিত হয়। ভক্তি শক্তিরূপে হৃদয়ে বাস করিয়া পুণ্য কর্ম্ম প্রসব করে; আলোকরূপে চক্ষে পশিয়া অধ্যাত্ম দর্শনে সমর্থ করে,

মানবপ্রেমকে উদ্দীপ্ত করিয়া নর-সেবাতে নিযুক্ত করে। ভক্তি জীবনের অন্তরালবর্ত্তী সেই পরম পুরুষকে কাছে আনিয়া দেয়, তাঁহার সহিত একীভূত করে।

ভক্তি পবিত্র হৃদয়েই বাস করে। কল্পনা যে পথে চলে, মনভুলান বা লোকভুলান ধর্ম্মাচরণ যে পথে চলে, ভক্তি সে পথেই থাকে না। ইহা প্রবঞ্চনাকে বিষের ন্যায় বর্জ্জন করে। ইহা পাপের সহিত সন্ধি করিতে জানেনা। ইহা মানিনী স্ত্রীর ন্যায় সাধককে বলে, হয় আমাকে লও, নতুবা বিষয়সুখ লও, দুই এক সঙ্গে চলিবে না। তাই বলি, ধার্ম্মিক মিলে লাখ, লাখ, ভক্ত মিলে এক। মন, বাক্য ও কার্য্যে খাটি মানুষ না হইলে ভক্তিরাজ্যের দ্বারে আঘাত করিবার অধিকার জন্মে না; ভিতরে প্রবেশ পরের কথা।

বৈশ্যবর্ণ।

[২]

চতুর্ব্বর্ণের উৎপত্তি।

আমরা প্রথম প্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, বৈদিক যুগে, প্রাচীন আর্য্যগণের মধ্যে, বর্ত্তমান কালের ন্যায় কোনও বর্ণবিভাগ ছিল না। সকলেই একজাতির অন্তর্গত ছিলেন এবং প্রবৃত্তি ও শক্তি অনুসারে যে কোনও ব্যক্তি যে কোনও কার্য্য করিতে অধিকারী হইতেন। কৃষি এবং গোপালনই তখন জীবিকার নিমিত্ত প্রধান কর্ম্ম ছিল এবং কেহই এই দুই কর্ম্ম সম্পাদনে কুণ্ঠিত হইতেন না। যাঁহারা ইন্দ্রাদি দেবতাগণের উদ্দেশে ঋক্ রচনা করিয়া "ঋষি" আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারাও কৃষি ও গোপালন কার্য্যে নিযুক্ত হইতেন। এই দুই কর্ম্ম তখন হীন কর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইত না। অধিকন্তু এই দুই কর্ম্ম হইতেই তাঁহারা আপনাদের বিশেষত্বজ্ঞাপক ও গৌরবাত্মক "আর্য্য", "কৃষ্টয়ঃ" ও "বিশ্" নামের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। বিশ্ শব্দ * বৈদিকযুগে কেবলমাত্র মনুষ্যপদবাচ্য ছিল। যাঁহারা কৃষিকর্ম্ম ও গোপালন করিতেন, তাঁহারাই মনুষ্য। অপর সকলে "অনার্য্য" "দস্যু", "রাক্ষস", প্রভৃতি ঘৃণাব্যঞ্জক নামে অভিহিত হইত, কদাপি মনুষ্য নামে অভিহিত হইত না। সুতরাং বৈদিকযুগে কৃষিকর্ম্মচারী গোপালক আর্য্যগণ আপনাদিগকে বিশনামেও অভিহিত করিতে যে গৌরব অনুভব করিতেন, তাহা সহজেই অনুমিত হইতে পারে। এই শব্দ যে ধাতু হইতে ব্যুৎপন্ন হইয়াছে, তাহার আলোচনা করিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন যে আর্য্যগণ গোচারণ ও কৃষির জন্য উর্ব্বর ভূমির অনুসন্ধানার্থ এবং বাণিজ্যার্থ নূতন নূতন দেশে প্রবেশ পূর্ব্বক তত্তদ্দেশে উপনিবেশ স্থাপন করিতেন। এই কারণেই, তাঁহাদের নাম বিশ্ (Pioneers and Settlers) হইয়া থাকিবে। *

যাহা হউক, এই বৈদিকযুগে যে ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের কোনও অস্তিত্ব দৃষ্ট হয় না, তাহা বৈদিক পণ্ডিতগণ একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন। সত্য বটে, ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৩০শ সূক্তের ১২শ ঋকে "ইহার মুখ ব্রাহ্মণ হইল, দুই বাহু রাজন্য হইল, যাহা উরু ছিল, তাহা বৈশ্য হইল এবং দুই চরণ হইতে শূদ্র হইল", এইরূপ উক্তি আছে। কিন্তু ব্যাকরণবিৎ পণ্ডিতেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে এই ঋকের ভাষা বৈদিক ভাষা নহে; তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক সংস্কৃত ভাষা। সুতরাং উপরোক্ত ঋক্‌টি প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই তাঁহাদের অনুমান হয়। আর সকল বিষয় আলোচনা করিয়াও, এই অনুমানকে নিতান্ত ভ্রান্ত বলিয়া মনে হয় না। †

আর্য্যজাতি ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণে যে বিভক্ত হন, তাহা ঋগ্বেদরচনার বহুকাল পরে। যখন তাঁহারা পশুপাল লইয়া এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিতেন, যখন কৃষিই সকলের একমাত্র জীবিকা ছিল এবং দস্যুভয়ে সকলেই

---

*বিশ্ + ঘে + কিপ্

* Weber বিশ্ শব্দের অনুবাদ Settlers করিয়াছেন; এই সঙ্গে Pioneers বলিলে বোধ হয়ঠিক হইত।

† শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত বলেন, "ঋগ্বেদরচনাকালের অনেক পরেএই অংশ রচিত হইয়া ঋগ্বেদের ভিতর প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই। ঋগ্বেদের অন্য কোনও অংশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চারি জাতির উল্লেখ নাই। এই শব্দগুলি কোনও স্থানে শ্রেণীবিশেষ বুঝাইবার জন্য ব্যবহৃত হয় নাই। ব্যাকরণবিৎ পণ্ডিতেরা প্রমাণ করিয়াছেন যে, এই ঋকের ভাষাও বৈদিক ভাষা নহে। ঐ ভাষা অপেক্ষাকৃত আধুনিক সংস্কৃত। জাতিবিভাগ প্রথা ঋগ্বেদের সময় প্রচলিত ছিল না। ঋগ্বেদে এই কুপ্রথার একটী প্রমাণ সৃষ্টি করিবার জন্য এই অংশ প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।"

সর্ব্বদা সশঙ্ক থাকিতেন, তখন আর্য্যমাত্রেই একাধারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র ছিলেন। কালক্রমে লোকসংখ্যার বৃদ্ধিসহকারে, বৃত্তির জন্য বংশপরম্পরায় কর্ম্মবিশেষের অনুসরণ দ্বারা, আর্য্যসমাজে ব্রাহ্মণাদি চারিটি বর্ণের উদ্ভব হয়। অর্থাৎ যাঁহারা দেবতাগণের আরাধনায় ও যজ্ঞাদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ হইলেন। যাঁহারা অনার্য্য দস্যুগণের দমনার্থ নিরন্তর যুদ্ধে লিপ্ত থাকিতেন, তাঁহারা ক্ষত্রিয় হইলেন। যাঁহারা গোপালন, কৃষি ও বাণিজ্যে নিযুক্ত থাকিতেন, তাঁহারা বৈশ্য হইলেন এবং যাঁহারা পরসেবা ও শিল্পাদি কার্য্যে উদরান্নের সংস্থান করিতেন, তাঁহারা শূদ্র হইলেন। যে সকল অনার্য্য মনুষ্য আর্য্যগণের বশ্যতা স্বীকার করিয়া আর্য্যভাবাপন্ন হইতে লাগিল, তাহারাও সম্ভবতঃ এই শূদ্রজাতিমধ্যে গণ্য হইল।

এই চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে কেবল বৈশ্যজাতিই আর্য্যগণের আদি বৃত্তি,—কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্যের অনুসরণ করিয়া প্রাচীন "বিশ্" নাম রক্ষা করিলেন। কিন্তু এক্ষণে "বিশ্" শব্দ সাধারণ আর্য্য মনুষ্যবাচক না হইয়া কেবলমাত্র একটী সঙ্কীর্ণ বর্ণবাচক হইল। স্মৃতির যুগে এই "বিশ্" শব্দ কেবলমাত্র বৈশ্যজাতির অর্থেই প্রযুক্ত হইয়াছে।

স্মৃতির যুগে বর্ণবিভাগ ও চতুর্ব্বর্ণের বৃত্তি।

স্মৃতির মধ্যে মানব ধর্ম্মশাস্ত্রই প্রাচীন ও প্রামাণিক গ্রন্থ। মনুসংহিতা যে সময়ে প্রণীত হয়, সেই সময়ে পূর্ব্বোক্ত চতুর্ব্বর্ণ ব্যতীত ইঁহাদের অনুলোম ও প্রাতিলোম যৌন সংমিশ্রণে, আরও অনেকগুলি জাতির উৎপত্তি হয়। বৈদিক যুগ হইলে, ইহারা সকলেই আর্য্য ও সদ্বংশজাত বলিয়া গণ্য হইত। কিন্তু মনুসংহিতার রচনা সময়ে, আর্য্যসমাজ চতুর্ব্বর্ণে বিভক্ত হইয়া পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। স্ববর্ণ ব্যতীত, এক বর্ণের সহিত অপর বর্ণের যৌন সম্বন্ধ ন্যূনাধিক পরিমাণে নিন্দনীয় ছিল। বিশেষতঃ নিম্নবর্ণের পুরুষের সহিত উচ্চবর্ণের রমণীর যৌন সম্বন্ধ যার পর নাই ঘৃণ্য বিবেচিত হইত এবং রমণীর সমধিক উচ্চবর্ণত্বানুসারে, ইহাদের অপত্যেরা সমাজে নিম্ন হইতে নিম্নতম স্থান অধিকার করিত। এই অনুলোম ও প্রতিলোম যৌন সংমিশ্রণে যে সমস্ত জাতির উৎপত্তি হয়, তাহারা সকলেই "সঙ্কর" জাতি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। অনুলোম ও প্রতিলোম উৎপত্তি ভেদে, ইহাদের মধ্যে কোনও কোনও জাতি স্পৃশ্য এবং কোনও কোনও জাতি অস্পৃশ্য বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

মহর্ষি মনু ব্রাহ্মণাদি চতুর্ব্বর্ণের ও সঙ্কর জাতিগণের কর্ত্তব্যকর্ম্ম ও জীবিকার সবিশেষ উল্লেখ করিয়াছেন। বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন, দান ও যজ্ঞ ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের কর্ত্তব্য কর্ম্ম বা ধর্ম্ম। যাজন, অধ্যাপনা ও প্রতিগ্রহ ব্রাহ্মণের জীবিকা; তন্মধ্যে অধ্যাপনাই শ্রেষ্ঠ। ক্ষত্রিয়ের জীবিকা প্রজারক্ষার্থ অস্ত্রধারণ অর্থাৎ যুদ্ধ। বৈশ্যের জীবিকা বাণিজ্য, পশুপালন ও কৃষিকর্ম্ম এবং শূদ্রের জীবিকা উচ্চ বর্ণত্রয়ের অসূয়াশূন্য শুশ্রূষা। এসম্বন্ধে নিম্নে কতিপয় মনুবচন উদ্ধৃত হইতেছে। যথা—

> শস্ত্রাস্ত্রভৃত্ত্বং ক্ষত্রস্য বণিক্ পশুকৃষির্বিশঃ।
> আজীবনার্থং ধর্ম্মস্তু দানমধ্যয়নং যজিঃ॥ ১০।৭৯

প্রজারক্ষার্থ অস্ত্রধারণ অর্থাৎ যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের জীবিকা। বাণিজ্য, পশুপালন ও কৃষিকর্ম্ম বৈশ্যের জীবিকা। আর দান, বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও যজ্ঞ, এতৎসমুদয় এই উভয়বর্ণের ধর্ম্ম।

> বেদাভ্যাসো ব্রাহ্মণস্য ক্ষত্রিয়স্য চ রক্ষণম্।
> বার্ত্তাকর্ম্মৈব বৈশ্যস্য বিশিষ্টানি স্বকর্ম্মসু॥ ১০৮০

স্বকর্ম্মের মধ্যে ব্রাহ্মণের বেদাধ্যাপনা, ক্ষত্রিয়ের প্রজারক্ষা এবং বৈশ্যের বাণিজ্য ও পশুপালন জীবিকার নিমিত্ত শ্রেষ্ঠ।

> একমেব তু শূদ্রস্য প্রভুঃ কর্ম্ম সমাদিশৎ।
> এতেষামেব বর্ণানাং শুশ্রূষামনসূয়য়া॥ ১০।৯১

ব্রহ্মা শূদ্রের জন্য কেবলমাত্র এক কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন, তাহা এই বর্ণত্রয়ের অসূয়াশূন্য শুশ্রূষামাত্র।

কিন্তু এতদ্দ্বারা যদি তাহার পরিবারবর্গের ভরণপোষণ নির্ব্বাহ না হয়, তাহা হইলে সে অন্য কর্ম্মও করিতে পারে। যথা—

> অশক্নুবংস্তু শুশ্রূষাং শূদ্রঃ কর্ত্তুং দ্বিজন্মনাম্।
> পুত্রদারাত্যয়ং প্রাপ্তো জীবেৎ কারুককর্ম্মভিঃ॥ ১০।৯৯

শূদ্র যদি স্ববৃত্তিতে অর্থাৎ দ্বিজাতির শুশ্রূষা দ্বারা পুত্রদারাদির ভরণ পোষণ করিতে অশক্ত হয়, তবে সে কারুকর্ম্মাদি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে।

কিন্তু এই কারুকর্ম্মাদি এইরূপ হওয়া আবশ্যক, যদ্দ্বারা দ্বিজাতিগণেরই পরিচর্য্যা হয়। যথা—

যৈঃ কর্ম্মভি প্রচরিতৈঃ শুশ্রূষ্যন্তে দ্বিজাতয়ঃ।
তানি কারুককর্ম্মাণি শিল্পানি বিবিধানিচ॥ ১০।১৯০

অর্থাৎ যে কর্ম্ম করিলে, দ্বিজাতিগণেরই পরিচর্য্যা হয়, এমত কারুকর্ম্ম অর্থাৎ কাষ্ঠতক্ষণ, শিল্প, চিত্র লেখা প্রভৃতি কর্ম্ম করিবে।

বর্ণবিভাগের ফল।

মহর্ষি মনুর সময়ে আর্য্যসমাজ চতুর্ব্বর্ণে বিভক্ত হইয়া কিরূপ আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহা উদ্ধৃত শ্লোক-পরম্পরা হইতে উপলব্ধ হইবে। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে বৈদিক আর্য্যসমাজে দেবারাধনা, যজ্ঞ, যুদ্ধ, গোপালন বাণিজ্য, কৃষি ও শিল্পাদি সকল কর্ম্মই অনিন্দ্য ছিল। সকলেরই সকল কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে কোনও বাধা বা সঙ্কোচ ছিল না। তৎকালে সূত্রধরপুত্রও ঋকরচনা করিয়া ঋষি উপাধি লাভ করিতে সমর্থ হইতেন। কিন্তু স্মৃতির যুগ হইতে এই অবারিত দ্বার রুদ্ধ হইল। ব্রাহ্মণের পুত্র কেবল ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়ের পুত্র কেবল ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের পুত্র কেবল বৈশ্য এবং শূদ্রের পুত্র কেবল শূদ্রই হইবে, এইরূপ ব্যবস্থা হইল। এক বর্ণ কর্ত্তৃক অপর বর্ণের কর্ম্ম গ্রহণ অনধিকারচর্চ্চা বলিয়া গণ্য হইল এবং তজ্জন্য সামাজিক দণ্ডেরও ব্যবস্থা হইল। পরবর্ত্তী যুগে দুই এক জন ক্ষত্রিয় ও ও বৈশ্য ব্রাহ্মণত্ব লাভের চেষ্টা করিয়া বহুকষ্টে সকলকাম হইলেও, কালক্রমে এক এক বর্ণ নিজ নিজ গণ্ডীর মধ্যে এরূপ বদ্ধ হইল যে, অন্য কোনও বর্ণের পক্ষে সে গণ্ডী অতিক্রম করা দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল। এইরূপে আবার প্রত্যেক বর্ণের মধ্যেও নানা শাখার উৎপত্তি হইয়া এক একটী শাখা এক একটী বিভিন্ন জাতিতে পরিণত হইল। আর্য্যসমাজ এইরূপে অসংখ্য জাতিতে বিভক্ত হইয়া পড়িল। এতদ্দ্বারা আর্য্যসমাজের মঙ্গল বা অমঙ্গল ঘটিয়াছে, তাহা এস্থলে বিচার্য্য না হইলেও, কেবল এই মাত্র বলা যাইতে পারে যে কর্ম্মানুসারে বর্ণবিভাগ আর্য্যসমাজের পক্ষে আদৌ মঙ্গলকর হইলেও, পরে যে ইহা হইতে বিষময় ফল উৎপন্ন হইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। আর্য্যজাতির পতনের যে ইহাও অন্যতম কারণ নহে, তাহাই বা কে বলিতে পারে?

বৈশ্যবর্ণের বৃত্তি সমালোচনা ও বৈশ্যবিপ্লব।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, বৈদিক যুগে আর্য্যগণের যে সাধারণ বৃত্তি ছিল, স্মৃতির যুগে বৈশ্যবর্ণের তাহাই বিশিষ্ট বৃত্তি নির্দ্ধারিত হইল। প্রকৃত প্রস্তাবে, স্মরণাতীত কাল হইতে, আর্য্যসাধারণের সহিত, তাঁহারা এই বৃত্তিরই অনুসরণ করিয়া আসিতেছিলেন। এক্ষণে তাহা সঙ্কুচিত হইয়া কেবল তাঁহাদেরই মধ্যে আবদ্ধ হইল মাত্র। বৈদিক যুগে তাঁহাদের যে সমুদায় অধিকার ছিল, স্মৃতির যুগেও তৎসমুদায় অব্যাহত রহিল। অর্থাৎ তাঁহারা বেদাধ্যয়ন, দান ও যজ্ঞের অধিকারী রহিলেন। তবে সমাজে ব্রাহ্মণবর্ণের প্রাধান্য স্থাপিত হওয়ায়, তাঁহারা অধ্যাপনা, যাজন ও প্রতিগ্রহের অধিকারী হইলেন না। অধ্যাপনা ও যাজন ব্রাহ্মণের বৃত্তি নির্দ্ধারিত হওয়ায়, তাহাতে অন্য বর্ণের হস্তক্ষেপ করা অবিধেয় বিবেচিত হইল। পশুপালন, কৃষি ও বাণিজ্য দ্বারা বৈশ্যগণের প্রভূত ধনাগম হইত বলিয়া, তাঁহাদের যে প্রতিগ্রহের কোনই আবশ্যকতা ছিল না, তাহা সহজেই বুঝা যাইতেছে।

বৈশ্যগণের ধর্ম্ম ও বৃত্তির সুস্পষ্ট উল্লেখ করিয়া মহর্ষি মনু যে শ্লোক রচনা করিয়াছেন, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল। যথা—

পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেবচ।
বণিক্ পথং * কুসীদঞ্চ বৈশ্যস্য কৃষিমেবচ॥ ১।৯০

অর্থাৎ (স্বয়ম্ভু) বৈশ্যদিগের পশুপালন, দান, যজ্ঞ, অধ্যয়ন, জলপথে ও স্থলপথে বাণিজ্য, কৃষিকর্ম্ম এবং বৃদ্ধির জন্য ধনপ্রয়োগ কল্পনা করিলেন।

উদ্ধৃত শ্লোকে বৈশ্যবর্ণের যে বৃত্তির উল্লেখ আছে, তাহাই ইহাদের অনন্যসাধারণ বৃত্তি ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে মনুর সময়েই জাতিভেদের বিষময় ফলসমূহ উৎপন্ন হইবার উপক্রম হইয়াছিল। বৈদিক আর্য্যগণ প্রথমে যে বৃত্তি অবলম্বনকে গৌরবাত্মক মনে করিতেন, স্মৃতির যুগে সমাজমধ্যে জাতিভেদ প্রথা বদ্ধমূল হওয়ায় এবং ব্রাহ্মণবর্গ আধ্যাত্মিক উৎকর্ষসাধনে অধিকতর মনোযোগী হওয়ায়, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পক্ষে সেই বৃত্তি অবলম্বন করা অযশস্কর ও পাতিত্যজনক গণ্য হইল। মহর্ষি মনু স্পষ্টই বলিয়াছেন—

* বণিক্পথং স্থলজলাদিনা বাণিজ্যমিতকুল্লূকভট্টঃ।

বৈশ্যবৃত্ত্যাপি জীবংস্তু ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়োঽপি বা।
হিংসাপ্রায়াং পরাধীনাং কৃষিং যত্নেন বর্জ্জয়েৎ ॥ ১০।৮৩

অর্থাৎ বৈশ্যবৃত্তিদ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইলে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় হলকুদ্দালাদি দ্বারা ভূমিষ্ঠ জন্তুর হিংসোপেত এবং বলীবর্দ্দাদির অধীন কৃষিকার্য্য যত্নসহকারে ত্যাগ করিবেন।

কৃষিং সাধ্বিতি মন্যন্তে সা বৃত্তিঃ সদ্বিগর্হিতা।
ভূমিং ভূমিশয়াংশ্চৈব হন্তি কাষ্ঠময়োমুখম্ ॥ ১০।৮৪

অর্থাৎ কোন পণ্ডিত কৃষিকে যে ভাল বলেন, তাহা নহে। উহা সাধুকর্ত্তৃক নিন্দিত; কারণ হলকুদ্দাল প্রভৃতি লৌহ-প্রান্ত কাষ্ঠ ভূমি নিহত জন্তুসকলকে নাশ করে।

হিংসোপেত এবং বলীবর্দ্দাদির অধীন কৃষিকর্ম্ম ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় কর্ত্তৃক এইরূপে গর্হিত কর্ম্ম বলিয়া গণ্য হইলে, বৈশ্যবর্ণের মধ্যেও একটি বিপ্লব উপস্থিত হইল। কৃষি, গোপালন ও বাণিজ্যাদি বৈশ্যবর্ণের সাধারণ বৃত্তি হইলেও সুবিধা ও প্রবৃত্তি অনুসারে কেহ কেহ কেবল কৃষিকার্য্যে, কেহ কেহ কেবল গোপালনে এবং কেহ কেহ বা কেবল বাণিজ্যে লিপ্ত থাকিতেন। কালক্রমে এই কর্ম্ম বংশবিশেষে বংশগতও হইয়া দাঁড়াইল। যখন কৃষিসম্বন্ধে ব্রাহ্মণাদির অভিমত সমাজমধ্যে প্রকটিত হইয়া পড়িল, তখন বৈশ্যবর্ণের মধ্যেও একটী বিভাগ হইবার উপক্রম হইল। সমাজমধ্যে সম্ভ্রান্ত ও সদাচারী বলিয়া পরিচিত হইবার আকাঙ্ক্ষা সকলেরই হৃদয়ে বদ্ধমূল আছে। বৈশ্যবর্ণের মধ্যে বণিকসম্প্রদায়কে কৃষি ও গোপালন এই দুইটি কর্ম্মের মধ্যে কোনটিই করিতে হয় না। সুতরাং বণিকবৈশ্যেরা ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের পদানুসরণ পূর্ব্বক কৃষিকর্ম্ম ও গোপালনকে ঘৃণা করিতে লাগিলেন এবং কৃষক-বৈশ্য ও গোপ-বৈশ্য হইতে আপনাদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্যও প্রয়াসী হইলেন। বৈশ্যবর্ণের মধ্যে এইরূপ বিপ্লব উপস্থিত হইলে, মহর্ষি মনু তন্নিবারণার্থ যত্নবান হইলেন। তিনি মানবসমাজের আদি বৃত্তান্ত কীর্ত্তন করিয়া কহিলেন—

প্রজাপতির্হি বৈশ্যায় সৃষ্ট্বা পরিদদে পশূন্।
ব্রাহ্মণায় চ রাজ্ঞে চ সর্ব্বাঃ পরিদদে প্রজাঃ ॥ ৯।৩২৭

অর্থাৎ সৃষ্টিকর্ত্তা প্রথমতঃ পশুসৃষ্টি করিয়া উহার প্রতিপালনের নিমিত্ত বৈশ্যকে অর্পণ করেন এবং প্রজা সৃষ্টি করিয়া উহার রক্ষণার্থ ব্রাহ্মণ ও রাজাকে সমর্পণ করেন। *

নচ বৈশ্যস্য কামঃ স্যান্ন রক্ষেয়ং পশূনিতি।
বৈশ্যে চেচ্ছতি নান্যেন রক্ষিতব্যাঃ কথঞ্চন ॥ ৯।৩২৮

অর্থাৎ বৈশ্যবর্ণ কদাচ এমত ইচ্ছা করিবে না যে আমরা নীচকর্ম্ম পশুপালন করিব না। বৈশ্য পশুপালন করিতে ইচ্ছুক (অনুবাদে 'সমর্থ' আছে) থাকিতে, অন্য কেহ পশুপালনে অধিকারী হইবে না। †

মহর্ষি মনু এইরূপ অনুশাসন প্রচার করিলেন বটে, কিন্তু বৈশ্যবর্ণের মধ্যে স্বতন্ত্র শ্রেণীবিভাগ অনিবার্য্য হইয়া উঠিল। প্রধানতঃ কৃষিকর্ম্মের জন্যই পশুপালন প্রয়োজনীয়। যাঁহারা কৃষি করিতেন, তাঁহাদিগকে বাধ্য হইয়া পশুপালনেও নিযুক্ত থাকিতে হইল। কেহ কেহ বা কৃষিকর্ম্ম না করিয়াও কেবল পশুপালন কার্য্যেই লিপ্ত থাকিলেন। কিন্তু কৃষি ও পশুপালনের সহিত বণিকবৈশ্যের কোনও সম্বন্ধ না থাকায়, তাঁহারা "সাধুজননিন্দিত" কৃষিকর্ম্ম তথা পশুপালনও পরিহার করিতে সমর্থ হইলেন। এইরূপে বণিক্-বৈশ্যেরা বৈশ্যবর্ণের মধ্যে একটী স্বতন্ত্র শ্রেণী হইয়া উঠিলেন। "নিন্দিত" কৃষিকর্ম্ম পরিহার জন্য তাঁহারা ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় সমাজেও সমধিক সমাদৃত হইতে লাগিলেন। কালক্রমে তাঁহারাই বৈশ্যপ্রধান বলিয়া গণ্য হইলেন। পরিশেষে "বণিক" শব্দই যে বৈশ্যের নামান্তর হইয়া দাঁড়াইল, তাহাও আমরা পরে দেখিতে পাইব।

যাহা হউক, পশুপালনসম্বন্ধে মহর্ষি মনু বৈশ্যবর্ণের উপর পূর্ব্বোক্ত অনুশাসন প্রচার করিয়া তাঁহাদের অন্যান্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

মণিমুক্তা প্রবালানাং লোহানাং তান্তবস্য চ।
গন্ধানাঞ্চ রসানাঞ্চ বিদ্যাদর্ঘবলাবলম্ ॥ ৯।৩২৯

* উদ্ধৃত শ্লোকে আর্য্যজাতির ক্রমোন্নতির ইতিহাস পরিব্যক্ত হইতেছে। আর্য্যজাতি সর্ব্বপ্রথমে পশুপালক ছিলেন। বৈশ্য অর্থে এখানে "আর্য্য" ধরিলেই পাঠকবর্গ সকলকথা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইবেন। প্রথমে বিশ্ (বা বৈশ্য) ও পশু, তৎপরে পশুর সাহায্যে কৃষি; তৎপরে উপনিবেশ স্থাপন। তৎপরে রাজ্যতন্ত্র। "প্রজা" বলিলেই "রাজা"ও বুঝায়। যখন প্রজার সৃষ্টি হইল, তখন ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণও হইয়াছেন। প্রজারক্ষার ভার ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের উপরেই অর্পিত হইল, তবে প্রত্যক্ষ ভাবে ক্ষত্রিয়ের উপর এবং পরোক্ষভাবে ব্রাহ্মণের উপর। ব্রাহ্মণের পরামর্শানুসারেই রাজা প্রজাপালন করিতেন।

† পাঠকবর্গ দেখিবেন যে, পশুপালন কার্য্যটি মনুর সময়েই বৈশ্যদিগের "ইচ্ছা"র উপর নির্ভর করিয়াছিল।

অর্থাৎ বৈশ্য মণিমুক্তাপ্রবালাদি (রত্ন), সুবর্ণাদি (ধাতু), বস্ত্র, কর্পূরাদি গন্ধদ্রব্য, লবণাদিরস, এইসকল দ্রব্যের উত্তমাধমমধ্যম ভেদে মূল্যের উৎকর্ষ অপকর্ষ স্থির করিবেন।

বীজানামুপ্তিবিচ্চ স্যাৎ ক্ষেত্রদোষগুণস্যচ।
মানযোগঞ্চ জানীয়াত্তুলাযোগাংশ্চ সর্ব্বশঃ। ৩,৩৩০

বৈশ্য কোন্ বীজ কিরূপে বপন করিলে উত্তম শস্য হয়, ইহাতে বিজ্ঞ হইবে এবং ইহা উষর ভূমি, ইহা শস্যপ্রদ, এইরূপ ক্ষেত্রের গুণদোষজ্ঞ হইবে এবং প্রস্থ দ্রোণাদি পরিমাণ ও তুলামান জ্ঞাত হইবে।

সারাসারঞ্চ ভাণ্ডানাং দেশানাঞ্চ গুণাগুণম্।
লাভালাভঞ্চ পণ্যানাং পশূনাং পরিবর্দ্ধনম্॥ ৮।৩৩১

অর্থাৎ এক জাতীয় দ্রব্যের মধ্যে ইহা উৎকৃষ্ট, ইহা অপকৃষ্ট, এইরূপ বিশেষ অবগত হইবে এবং পূর্ব্বপশ্চিমাদি দেশের মধ্যে কোন্ দেশে কোন্ দ্রব্য অল্পমূল্য, কোন্ দ্রব্য বহুমূল্য, এইরূপে দেশের গুণদোষ বুঝিবে এবং বিক্রেয় দ্রব্যের মধ্যে এই দ্রব্য এত দিন রাখিলে এত অপচয় হইবে ও এত উপচয় হইবে, ইহা জানিবে এবং এই দেশে এই কালে তৃণোদক যবাদি দ্বারা পশু সকল বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, এইরূপে ক্ষীণ হয়, ইহা জানিবে।

ভৃত্যানাঞ্চ ভৃতিং বিদ্যাদ্ভাষাশ্চ বিবিধানৃণাম।
দ্রব্যানাং স্থানাযোগাংশ্চ ক্রয়বিক্রয়মেবচ॥ ৯,৩৩২

অর্থাৎ গোপালকমহিষাদিপালকরূপ ভৃত্যের * দেশ কাল ও কর্ম্মের উচিত বেতনজ্ঞ হইবে এবং গৌড়দাক্ষিণাত্যাদি মনুষ্যসকলের বাণিজ্যার্থ ভাষা অবগত হইবে, আর এইদ্রব্য এইরূপে স্থাপিত করিতে হয় এবং ইহা এই দ্রব্যে মিশ্রিত করিলে নষ্ট হয় না এবং এই দ্রব্য এই দেশে, এই কালে, এত মূল্যে বিক্রয় করিলে ভাল হয়, ইহা জানিবে।

ধর্ম্মেন চ দ্রব্যবৃদ্ধাবাতিষ্ঠেদ্ যত্নমুত্তমম্।
দদ্যাচ্চ সর্ব্বভূতানামন্নমেব প্রযত্নতঃ॥ ৯।৩৩৩

অর্থাৎ শতকরা দুই, তিন, চারি, পাঁচ বৃদ্ধিতে ধনপ্রয়োগে যত্ন করিবে এবং হিরণ্যাদি দান অপেক্ষা সর্ব্বপ্রাণীকে বিশেষ রূপে অন্নদান করিবে। *

মহর্ষি মনু উল্লিখিত শ্লোকসমূহে বৈশ্যবর্ণের বৃত্তি নির্দ্ধারিত করিলেন। কিন্তু এতৎসমুদায়ের আলোচনা করিয়া বুদ্ধিমান্ পাঠকবর্গ দেখিতে পাইবেন যে, কৃষি এবং গোপালন বৈশ্যবর্ণের অন্য দুই বৃত্তি হইলেও, মনু তৎসম্বন্ধে অধিক কথা না বলিয়া কেবল বাণিজ্য, ক্রয় বিক্রয়, দ্রব্যরক্ষা, ধনবৃদ্ধি এবং বাণিজ্যনীতি সম্বন্ধেই বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিলেন। কৃষিসম্বন্ধে তাঁহার মত পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে। গোপ-বৈশ্য এবং কৃষক-বৈশ্য অপেক্ষা বণিক-বৈশ্যের প্রতিই যে তাঁহার অধিকতর অনুরাগ ছিল, তাহা এতদ্দ্বারা বুঝা যাইতেছে।

মহর্ষি মনুর পর যে যে সংহিতাকার প্রাদুর্ভূত হন, বৈশ্যবৃত্তিসম্বন্ধে তাঁহারাও মনুর মতানুসরণ করিয়াছেন। নিম্নে কতিপয় সংহিতার মত উদ্ধৃত হইল।

বিষ্ণুস্মৃতি।

কৃষি-গোরক্ষ্য-বাণিজ্য-কুসীদ-যোণিপোষণানি † বৈশস্য।

লঘুহারীত সংহিতা।

গোরক্ষাং কৃষিবাণিজ্যং কুর্য্যাদ্বৈশ্যো যথাবিধি।

বৃদ্ধহারীত সংহিতা।

কুসীদং চৈব বাণিজ্যং বিশামেব প্রকীর্ত্তিতম্। ‡

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।

কুসীদং কৃষিবাণিজ্যং পশুপাল্যং বিশঃ স্মৃতম্।

পরাশর সংহিতা।

লোহকর্ম্ম তথা রত্নং গবাঞ্চ পরিপালনম্।
বাণিজ্যং কৃষিকর্ম্মাণি বৈশ্যবৃত্তি রুদাহৃতা॥

শঙ্খসংহিতা।

কৃষি গোরক্ষ্য বাণিজ্যং বৈশ্যস্য পরিকল্পিতম্।

বাশিষ্ঠ সংহিতা।

এতান্যপি ত্রীণি বৈশ্যস্য কৃষিবাণিজ্যপশুপাল্যকুসীদঞ্চেতি।

অর্থাৎ যজন, অধ্যয়ন ও দান এই তিন বৈশ্যের ধর্ম্ম এবং কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন ও কুসীদ এই সমস্ত বৈশ্যের বৃত্তি।

* সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব স্মৃতিশাস্ত্রাধ্যাপক মহাত্মা ৺ ভরতচন্দ্র শিরোমণি ও পণ্ডিত যদুনাথ ন্যায়পঞ্চানন মহাশয় মনুসংহিতার যে বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন, উদ্ধৃত অনুবাদের অধিকাংশ তাহা হইতে গৃহীত হইল। মহর্ষি মনুর সময়েও বৈশ্যেরা স্বহস্তে গোপালন করিতেন না। ভৃত্যদ্বারা এই সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইত। উদ্ধৃত শ্লোকেই তাহা বুঝা যাইতেছে।

† যোণিপোষণ অর্থাৎ বীজরক্ষা।

‡ বৃদ্ধ হারীতের মতে কুসীদ এবং বাণিজ্যই বৈশ্যের বৃত্তি। ইনি বৈশ্যবৃত্তি হইতে কৃষি ও গোপালন বাদ দিয়াছেন,



রায়বাহাদুর প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

উদ্ধৃত শ্লোকপরম্পরা হইতে অবগত হওয়া যায় যে, পশুপালন, কৃষি ও বাণিজ্যই বৈশ্যের প্রধান বৃত্তি নির্দ্ধারিত ছিল। কিন্তু পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, মহর্ষি মনুর সময় হইতে পশুপালন ও কৃষি নিন্দিত কর্ম্ম বলিয়া গণ্য হওয়াতে, বণিক্-বৈশ্যেরা গোপ-বৈশ্য ও কৃষক-বৈশ্যবর্গ হইতে আপনাদের স্বাতন্ত্র্যরক্ষার প্রয়াসী হইয়াছিলেন। কালক্রমে এই স্বাতন্ত্র্যরেখা, ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের বিকাশসহকারে, বৈশ্যসমাজে স্পষ্টীভূত হইয়া পড়ে। পরাশরসংহিতা কলিযুগের পক্ষে প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া গণ্য হয়। সেই পরাশরসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের নবম শ্লোকে কৃষিকর্ম্মের যে নিন্দাবাদ আছে, তাহার উল্লেখ করিয়া অদ্য এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব। পরাশর বলিয়াছেন—

সংবৎসরেণ যৎ পাপং মৎস্যঘাতী সমাপ্নুয়াৎ।
অয়োমুখেন কাষ্ঠেন তদেকাহেন লাঙ্গলী॥

অর্থাৎ মৎস্যঘাতী সংবৎসরে যে পাপ সঞ্চয় করে, লাঙ্গলী বা কৃষক লৌহপ্রান্ত হলদ্বারা একদিনেই সেই পাপ সঞ্চয় করিয়া থাকে।

প্রাচীনকালে মহর্ষি মনু এবং পরবর্ত্তী যুগে মহর্ষি পরাশর যখন কৃষিকর্ম্মের এইরূপ নিন্দাবাদ করিয়াছেন, তখন বৈশ্যবর্গের মধ্যে একমাত্র বণিক্-বৈশ্যেরাই যে সমাজে সমধিক সমাদৃত হইবেন এবং বণিক্ শব্দই যে কালক্রমে বৈশ্যের নামান্তর হইয়া দাঁড়াইবে, তাহার আর বিচিত্রতা কি? ফলে, বৈশ্যবর্ণের সামাজিক ইতিহাসে তাহাই ঘটিয়াছিল। প্রবন্ধান্তরে এসম্বন্ধে আলোচনা করিব।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

পঞ্জাবে বাঙ্গালী।

পঞ্জাবের বর্ত্তমান প্রসিদ্ধ প্রবাসীদিগের মধ্যে বাঙ্গালীর গৌরব পঞ্জাব চীফ কোর্টের মাননীয় বিচারপতি রায় বাহাদুর প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম.এ., বি.এল., মহোদয়ের নাম উল্লেখযোগ্য। স্বদেশে শিক্ষালাভ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্র প্রবাসে যাঁহারা স্বজাতির মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন, প্রতুল বাবু তাঁহাদের একজন। ইনি বর্ত্তমান সময়ে পঞ্জাব চীফ কোর্টের বিজ্ঞতম বিচারক, সকল শুভানুষ্ঠানের উৎসাহদাতা, সর্ব্বপ্রকার শিক্ষা ও সাহিত্যসভার অনুকূল, বিদ্যানুরাগী, সহৃদয় এবং সর্ব্বজনপ্রিয়। ইনি শিক্ষাবস্থাতেই স্বীয় অনন্যসাধারণ প্রতিভার পরিচয় এবং সমুজ্জ্বল ভবিষ্যতের আভাস দান করিয়াছিলেন। তখনই ইঁহার অধ্যয়নস্পৃহা এরূপ বলবতী ছিল যে নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক ব্যতীত রাশি রাশি সদ্গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন। ১৮৬৯ অব্দে জেনেরাল এসেম্ব্লিজ্ ইনষ্টিটিউশ্যন হইতে এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ১৮৭০ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজ হইতে বি.এল. পরীক্ষা দান করেন। আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া সেই বৎসরই পঞ্জাবের চীফকোর্টে ওকালতী আরম্ভ করেন। সে সময় ভূতপূর্ব্ব কাশ্মীরসচিব স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় এম.এ. এবং এলাহাবাদ হাইকোর্টের বর্ত্তমান প্রবীণ ও বিজ্ঞ ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ অনেক লব্ধপ্রতিষ্ঠ বাঙ্গালী লাহোর চীফ কোর্টের উকীলসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। এখানে প্রতুল বাবু অল্প দিনেই সকলের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। প্রথম হইতেই তাঁহারা তাঁহার প্রখর বুদ্ধির পরিচয় পাইয়া এবং অনন্যসাধারণ অধ্যবসায় দর্শন করিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। আইনসংক্রান্ত জটিল এবং দুর্ব্বোধ্য বিষয় সকল তিনি যুক্তিকৌশলে এবং অসাধারণ তর্কশক্তি প্রভাবে নিতান্ত সহজসাধ্য সরল ও স্পষ্ট করিয়া দেন। পঞ্জাবের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণ আইনসংক্রান্ত বিষয়ে ইঁহার পরামর্শ গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইনি এপ্রদেশের অনেকগুলি দেশীয় রাজ্যের বিচারবিভাগে শৃঙ্খলা-সংস্থাপনে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। প্রতুল বাবু বহুকাল হইতে কাশ্মীররাজ্যের সহিত আইন-উপদেষ্টারূপে সংশ্লিষ্ট আছেন। ১৮৮৬ অব্দে ইনি পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো হন এবং ১৮৯৪ অব্দে উক্ত প্রদেশের চীফ্ কোর্টের বিচারপতির পদে অধিষ্ঠিত হন। পরলোকগত মাননীয় শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ ব্যতীত ভারতের সীমান্ত প্রদেশে আর কোন ভারতবাসী এরূপ উচ্চপদ প্রাপ্ত হয়েন নাই। পঞ্জাবের প্রধান প্রধান করদরাজ্যগুলিকে প্রায়ই প্রতুল বাবুর সাহায্য গ্রহণ করিতে হয়। বিচারকার্য্যে ইনি এরূপ দক্ষতা লাভ করিয়াছেন যে চীফ্ কোর্টে কোন নূতন বিচারপতি আসিলেই তাঁহাকে প্রতুল বাবুর সহিত কিছুদিন শিক্ষানবিশী করিবার জন্য বসিতে দেওয়া হয়।

ইনি যে কেবল এ প্রদেশের সর্দারগণ এবং প্রধান প্রধান ব্যক্তিবর্গের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন তাহা নয়, কিন্তু বহুকাল হইতেই এই সামরিক জাতির ছোট বড় নির্ব্বিশেষে সকল অবস্থার এবং সকল সমাজের লোকের নিকট সমভাবে আদৃত ও সম্মানিত হইয়া আসিতেছেন। দেশের যাহা মঙ্গলকর এরূপ অনুষ্ঠানে যোগ দান করিতে ইনি ভীত বা সংকুচিত নহেন। কি পণ্ডিতগণের সাহিত্য-সভা, কি যুবকগণের তর্কসমিতি, বৃহৎ অথবা সামান্য এরূপ যে কোন সভা সমিতির অধিবেশনে ইনি সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়া থাকেন। জাতীয় মহাসভার সূত্রপাতকালেই তাহাতে ইনি যোগদান করেন। বিদ্যানুরাগ ইঁহার এখনও এরূপ প্রবল যে বিচারপতির গুরুতর কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন করিয়াও প্রগাঢ় অনুরাগের সহিত অধ্যয়ন করিয়া থাকেন। প্রতুল বাবু প্রাচীন ভারতের ধর্ম্মতত্ব এবং ভৈষজ্যতত্ব বিষয়ে বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করিয়াছেন। দশ বার বৎসর হইল, ইনি বুদ্ধ এবং বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে দুইটি গভীর গবেষণা ও চিন্তাপূর্ণ বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

লাহোরের ভূতপূর্ব্ব প্রধান ব্যারিষ্টার এবং এক্ষণে বিলাতের ব্যারিষ্টার সার উইলিয়ম র‍্যাটিগান, কে. সি., মহোদয় প্রতুল বাবুর পরম বন্ধু এবং বিশেষ হিতৈষী। ইঁহারই চেষ্টায় ইনি তের চৌদ্দ বৎসর পূর্ব্বে একবার চীফ কোর্টের অস্থায়ী জজের পদ প্রাপ্ত হন। কিন্তু প্রবাসের এই উচ্চ পদ তাঁহার জন্মস্থান এবং আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধবগণের সহিত ঘনিষ্ঠতা সংরক্ষার অন্তরায় হইতে পারে নাই। সামান্য অবকাশকালও ইনি প্রবাসে না কাটাইয়া জন্মস্থানে অতিবাহিত করেন।

রায় শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় বাহাদুর গভর্মেণ্ট কলেজের প্রধান গণিতাধ্যাপক ছিলেন। শুনা যায় পঞ্জাবে তাঁহার সমকক্ষ অঙ্কশাস্ত্রবিদ্ কেহ ছিলনা। ইনি সম্প্রতি ১৯০১ সালের জুলাই মাসে বহুমূত্র রোগে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ রায় বাহাদুর এবং উকীল সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রসিদ্ধ বাগ্মী বাবু কালী প্রসন্ন রায়, এম এ., বি.এল, প্রমুখ প্রবাসী ধনী বঙ্গসন্তানগণ এপ্রদেশে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছেন এবং পঞ্জাবে বাটী ঘর বাগান জমীদারী প্রভৃতি করিয়া স্থায়ী হইয়াছেন।

এপ্রদেশে ১৮৮১ সালে ১০৬৪ জন বাঙ্গালী ছিলেন। ১৮৯১ অব্দের সেন্সসে জানা যায় সমস্ত পঞ্জাবে ২২৬৩ জন বাঙ্গালী ছিলেন। গত দশ বৎসরে ঐ সংখ্যা সম্ভবতঃ তিন সহস্রের উপর হইয়া থাকিবে। বর্ত্তমান কালে লাহোরে প্রায় একশত ঘর বাঙ্গালীর বাস। সমস্ত পঞ্জাবের মধ্যে রাওলপিণ্ডিতে এক্ষণে বাঙ্গালীর সংখ্যা অধিক। রাজধানী লাহোরে পাঁচ বৎসর পূর্ব্বে একটী বাঙ্গালা বিদ্যালয় ছিল। পণ্ডিত মহাশয় দেশে চলিয়া যাওয়ায় এবং শিক্ষক ও অর্থ সাহায্য অভাবে বিদ্যালয়টি উঠিয়া যায়। লাহোরের কালীবাড়ী বেশ প্রশস্ত। কমিসেরিয়েট প্রভৃতি বড় বড় দপ্তর থাকায় মিয়ানমীরেও অনেক বাঙ্গালী আছেন। সেখানেও একটী বাঙ্গালীর কালীবাড়ী আছে। উভয় স্থানেই দুর্গাপূজা হয়। উভয় স্থানেই বাঙ্গালীদের থিয়েটার আছে। এখানে স্থানীয় ব্যক্তিগণের সহিত বাঙ্গালীর ঘনিষ্ঠতা উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ অপেক্ষা অধিক। উভয়েই উভয়ের ধর্ম্ম ও সামাজিক উৎসবে যোগদান করিতে কুণ্ঠিত হন না। এমন কি পঞ্জাবীগণ দুর্গাপূজার সময় শতাধিক টাকা পর্য্যন্ত চাঁদা দিয়া থাকেন। পঞ্জাবে লাহোরের দয়ানন্দ এংলো বৈদিক কলেজ সর্ব্বাপেক্ষা বড়। এই কলেজেই স্থানীয় অধিকাংশ ছাত্র শিক্ষালাভ করিয়া থাকে। এই কলেজের চারিজন প্রধান অধ্যাপক বাঙ্গালী। স্থানীয় বিখ্যাত পত্রিকা ট্রিবিউনের সম্পাদকীয় ভার প্রথমাবধি বাঙ্গালীর হস্তেই ন্যস্ত রহিয়াছে। কাগজখানির স্বত্বাধিকারী ৺ সর্দার দয়ালসিংহ। বাঙ্গালীর গৌরব স্বর্গীয় শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের পর সাহিত্যসেবী বাবু নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ইহার সম্পাদক ছিলেন। এক্ষণে বাবু অমৃতলাল রায় ট্রিবিউনের সম্পাদক। ১৮৭৬ সালে সর্দার দয়ালসিংহ কলিকাতা যাইয়া বাঙ্গালীর অনুরাগী হন এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম অবলম্বন করেন। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে ইনি ট্রিবিউন পত্রিকা প্রবর্ত্তিত করেন। এই পত্র প্রথমে সাপ্তাহিক ছিল, পরে সপ্তাহে তিন বার প্রকাশিত হয়। ইহা পঞ্জাবে নবযুগ আনয়ন করিয়াছে।

পঞ্জাবপ্রবাসী বাঙ্গালীদিগের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত এই স্থানেই শেষ করিয়া আমরা সাহিত্যিক সামাজিক প্রভৃতি বিষয়ের অবতারণা করিবার সংকল্প করিয়াছিলাম। কিন্তু দিল্লীপ্রবাসী

স্বর্গীয় রাজা পীতাম্বর মিত্রের পরিচয় না দিয়া ইহা সমাপ্ত করিতে পারিলাম না। রাজা পীতাম্বর মিত্র ভারতের বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ববিদ্ স্বর্গীয় রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রপিতামহ ছিলেন। ইনি ১৭৪৯ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের নবাব আলীবর্দ্দীখাঁর রাজত্বকালে ২৪ পরগণার অন্তর্গত বরিসা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। এই ক্ষণজন্মা পুরুষের বিস্তৃত জীবনচরিত সংগ্রহ করিবার জন্য আমরা বিশেষ চেষ্টা করিতেছি। কৃতকার্য্য হইলে ইঁহার স্বতন্ত্র জীবনী ক্রমশঃ প্রবাসীতে প্রকাশিত হইবে। ইনি দিল্লীর সম্রাট শাহআলমের একজন সেনাপতি ছিলেন।* সম্রাট ইঁহাকে রাজা উপাধি প্রদান করেন এবং দশ সহস্র মুসলমান অশ্বারোহী সৈন্যের অধিনায়ক করিয়া দেন। কোন্ সূত্রে ইনি বাঙ্গালী হইয়াও দিল্লীর সম্রাটের নিকট এরূপ উচ্চ এবং দায়িত্বপূর্ণ পদলাভে সমর্থ হইয়াছিলেন, আমরা তাহার সন্ধান এখনও প্রাপ্ত হই নাই ; তবে রাজা পীতাম্বরের পিতা এবং পিতামহ উভয়েই মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারে দেওয়ানের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, এবং ইঁহার পিতা ৺ অযোধ্যারাম মিত্র নবাব বাহাদুরের যথেষ্ট অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হইয়াছিলেন। নবাব তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে "রায় বাহাদুর" উপাধি দান করেন। এই কারণে বোধ হয় উদারচরিত নবাব বাহাদুর স্বীয় দেওয়ানের পুত্রের উক্ত পদ প্রাপ্তির কারণস্বরূপ হইয়াছিলেন। সম্রাট শাহ আলম ১৭৭১ অব্দ পর্য্যন্ত এলাহাবাদে অবস্থান করেন। তৎপরে মহারাষ্ট্রীয়দিগের সহিত যোগদান করেন। মহারাষ্ট্রীয়েরা পরে বিদ্রোহীদিগের হস্ত হইতে সম্রাটকে উদ্ধার করেন।

এই মহারাষ্ট্রযুদ্ধে রাজা পীতাম্বর মিত্র সম্রাটের নিকট হইতে পুরস্কারস্বরূপ বর্ত্তমান এলাহাবাদ জেলার অন্তর্গত কড়ানগর জায়গীর প্রাপ্ত হন। কড়া এলাহাবাদ সহর হইতে ৪৫।৬ মাইল উত্তর-পশ্চিমে গঙ্গার উপকূলে অবস্থিত। কড়ার দুর্গ অতি প্রাচীন এবং প্রসিদ্ধ। এখনও ইহার ভগ্নাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার ঐশ্বর্য্য সমৃদ্ধির উপর অযোধ্যার নবাবের লোলুপ দৃষ্টি পতিত হওয়ায় কড়া শ্রীহীন হইয়া যায়। ইহার বার্ষিক আয় ছিল ২ লক্ষ ২০ হাজার টাকা। কোন নবাবের সময় কড়া লুণ্ঠিত হয়, তাহা জানা যায় নাই। অযোধ্যার প্রাতঃস্মরণীয় নবাব আসফউদ্দৌলার সহিত রাজা পীতাম্বরের বন্ধুতা ছিল। এমন কি কথিত আছে, রাজা তাঁহার নিকট ৯ লক্ষ টাকা গচ্ছিত রাখিয়াছিলেন।

১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে গোলাম কাদির বিদ্রোহী হইয়া শাহ আলমকে অন্ধ করিয়া দেয়। এই সময় দিল্লীর ভগ্ন সাম্রাজ্য নিতান্তই বিশৃঙ্খল হইয়া পড়ে। ইহার দুই একবৎসর পরে রাজা পীতাম্বর সামরিক কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করেন। প্রথমে কলিকাতা মেছুয়াবাজারস্থ "বিখ্যাত মিত্র পারিবারিক বাড়ী"তে আসিয়া উপস্থিত হন। কিন্তু তিনি বৈষ্ণব ধর্ম্ম গ্রহণ করায় বাটী পরিত্যাগ করিয়া শুঁড়ার বাগানে অবস্থিতি করেন। ক্রমে এখানে প্রকাণ্ড প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়া পরিবারবর্গ লইয়া বাস স্থাপন করত "শুঁড়ার রাজা" বলিয়া পরিচিত হন। ইঁহার পুত্র স্বর্গীয় রাজা বৃন্দাবন মিত্র অশেষগুণসম্পন্ন, বিদ্যানুরাগী এবং সহৃদয় পুরুষ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রধান দোষ অমিতব্যয়িতার ফলে পিতার অর্জ্জিত জায়গীরটি নষ্ট করিয়া ফেলেন। [সমাপ্ত।]

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।

নবমীতে বিসর্জ্জন।

এক সময়ে চৌধুরী ও রায় পরিবার বিজয়ীগ্রামের দক্ষিণ ও বাম বাহুস্বরূপ ছিল। গ্রামটার নামেই এই দুই পরিবারের পূর্ব্বপুরুষগণের বাহুবলের বা লাঠির বলের গৌরব ঘোষণা করিতেছে। বস্তুত গ্রামটির সর্ব্বাংশই তাঁহাদিগের বিজয়শ্রীলাঞ্ছিত বলিয়া বোধ হয়। সেই জলকষ্টপীড়িত অঞ্চলে বিজয়ানাম্নী দীর্ঘিকা তাঁহাদিগের কীর্ত্তিচিহ্নস্বরূপ বিরাজিত। দীঘিটীর চারি পাড়ে চারিটী বাঁধা ঘাট ; উহার তীরভূমি বেষ্টন করিয়া এক সারি গুবাকবৃক্ষ ; তৎপর প্রশস্ত রাস্তা ; রাস্তার পর নানাবিধ ফুল ও ফলের বাগিচা।

এই দুই পরিবারে পূর্ব্বের সেই মধুর সম্প্রীতি এখন আর নাই ; বিদ্বেষ অনেক দিন হইতেই তাহার স্থান অধিকার করিয়াছে। বিদ্বেষবুদ্ধিপ্রেরিত হইয়া কালীকিঙ্কর চৌধুরী

* বীরভূমি, ১৩০৭, পৃঃ ১১২।

বিজয়কেশরী রায়ের নামে অযথা মামলা মোকদ্দমা করিতে সর্ব্বদাই ব্যস্ত। বিজয়কেশরী বাবু নিতান্ত আত্মরক্ষার্থ উহাতে জড়িত হইয়া পড়েন। তবে তিনি গায়ে পড়িয়া কিছুই করেন না; ইহাই যথেষ্ট। ফল কিন্তু প্রায় তুল্য,—অর্থহানি উভয়পক্ষেরই হইতেছে; গ্রামটী দুইটী মণ্ডলে বিভক্ত হইয়াছে, একটী চৌধুরী মহাশয়ের পক্ষে, অপরটী রায় মহাশয়ের আশ্রিত। উল্লিখিত দীঘিটীর ঘাটগুলির ভগ্নাবস্থা ও চৈত্রমাসে পঙ্কোদ্ধার অভাবে স্ফীত-গর্ভা দীর্ঘিকাটীর শুষ্কপ্রায় অবস্থা দেখিলে 'ভাগের মা গঙ্গা পায়না' এই প্রবচনের সত্যতা সপ্রমাণ হয়। রায় মহাশয় নিজ ব্যয়ে দীঘিটীর সংস্কারে কৃতসঙ্কল্প হইয়াও চৌধুরী মহাশয়ের অনুমতির অভাবে এতাবৎকাল কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই।

রায় পরিবারের আচার ব্যবহার আধুনিক ছাঁচে ঢালা; চৌধুরী পরিবারে সেকালের চাল চলনের প্রভাব খুবই বেশী।

রায় মহাশয়ের একমাত্র পুত্র রমেশচন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দুই পরীক্ষাতেই বেশ উচ্চস্থান লাভ করিয়া এবার চতুর্থ বার্ষিক শ্রেণীতে পড়িতেছে। চৌধুরী মহাশয়েরও একমাত্র গুণধর পুত্র গদাধরচন্দ্র ওরফে গদাইরাম একটী ইংরাজী স্কুলে চতুর্থ শ্রেণী পর্য্যন্তই পড়িয়া বিদ্যাপারদর্শনাপেক্ষা বিলাসিতাসাগর পার হওয়া সহজসাধ্য মনে করিয়া পিতার ধনরূপ ভেলকের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। বিংশতিবর্ষীয় গদাধরচন্দ্রের যশশ্চন্দ্র ইহারই মধ্যে বিমল কিরণ বিকীর্ণ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

পূজার উৎসব উভয় পরিবারেই জাঁক জমকের সহিত নির্ব্বাহ হইতেছে। আজ নবমী পূজা। রায় পরিবারে দুর্গা পূজা যোড়শোপচারে হইতেছে একথা ঠিক্ বলা যায় না। কারণ যোড়া মহিষ বলিদান তো দূরের কথা, ছাগ বলিদানেরও আয়োজন সেখানে নাই। শুনিতে পাই একবার নাকি পাঁঠা "বাঁধিয়াছিল," সেই কারণে ও এক মাত্র পুত্রের ঐকান্তিক ইচ্ছার বশে রায় মহাশয় পণ্ডিতমণ্ডলীর সম্মতিক্রমে চারি বৎসর যাবৎ শুধু কুষ্মাণ্ড বলিদানের নিয়ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। রায়পরিবারে পূজা সমাপ্ত হইয়াছে। পিতাপুত্র কিবা ভদ্র কিবা ইতর সকল শ্রেণীর লোকদের ভোজনব্যাপার পরিদর্শন করিয়া বেড়াইতেছেন। চলুন, আমরা এই অবসরে একবার চৌধুরী মহাশয়ের বাড়ীর খবর লইতে চেষ্টা করি।

ঐ যে সুচিত্রিত কার্পেটের বিনামা পায়ে, কারুকার্য্য-খচিত তাঞ্জেব কাপড়ের তৈয়ারি পাঞ্জাবী আস্তিনের জামা গায়ে, তাম্বূলরঞ্জিত-অধরোষ্ঠ, তৈলনিষিক্ততরঙ্গায়িতকেশ, নধর, গৌরকান্তি যুবাপুরুষটীকে দেখিতে পাইতেছেন, ইনিই আমাদের পরিচিত গদাধর বাবু। "নির্গলিতাম্বু গর্ভশরদ্‌ঘনা"বিষ্ট আকাশমণ্ডলের ন্যায় উঁহার মুখমণ্ডল কিঞ্চিৎ গম্ভীর বলিয়া বোধ হইতেছে না? ঘন ঘন ইনি শয়নকক্ষে কেন প্রবেশ করিতেছেন? আপনারা বোধ হয় বুঝিয়াছেন, আয়নাসেবাই ইহার উদ্দেশ্য। পবনবাহন ধূলিপটলের গতিবিধির জন্য চিরুণী সাহায্যে গদাধর বাবু স্বীয় মস্তকোপরি যে দিব্য সড়কটী প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহার উপর কোনও অসংযত কেশগুচ্ছের অনধিকার বিচরণ তিনি আজ প্রাণান্তেও হইতে দিতে পারেন না। কিন্তু উনি এরূপ চঞ্চল ভাবে ছুটিয়া বেড়াইতেছেন কেন? একবার খিড়কীর দ্বারে আসিয়া আবার বহির্ব্বাটীর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছুটিয়া যাইতেছেন। উঁহার সতৃষ্ণ নয়নসঞ্চালন দেখিয়া বোধ হয় উনি কাহারও আগমন প্রতীক্ষা করিতেছেন। অভ্যাগত ব্যক্তিরা মনে করিতেছে, গদাধর বাবু বড়ই কাজের লোক, কাজের জন্য ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছেন; কাজেই তাঁহাকে ডাকিয়া দুইটা শিষ্টালাপ করিতেও কেহ সাহস পাইতেছে না।

এইবার বাড়ীর ভিতর ঢুকিয়া কাহাকেও যেন দেখিতে পাইয়া গদাধর বাবু কিছু খুসী হইলেন,—তাঁহার কালিমাময় মুখমণ্ডলে কিছু আলো প্রতিভাত হইল। ঐ যে ঘরের কোণে বামী দাসীর সহিত ফুস্ ফুস্ করিয়া তাঁর কি কথা হইল? একি এ, গদাধর বাবুর মুখ যে একেবারে বিবর্ণ হইয়া গেল! আর যে বাক্যস্ফূর্ত্তি নাই! বামী চলিয়া যাইতেছিল, গদাধর বাবু যাইয়া তাহাকে আবার ধরিলেন এবং কি জিজ্ঞাসা করিলেন; বামীর উত্তর শুনিয়া তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করিলেন এবং ঈষৎ মস্তকান্দোলন করিতে করিতে সেখান হইতে সবেগে প্রস্থান করিলেন।

বহির্ব্বাটীতে নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ কেহ হাই তুলিতেছেন, কেহ তামাকু খাইতেছেন; কোনও শিশু দ্যূতক্রীড়ারত পিতার উরুদেশে মাথা রাখিয়া ক্ষুধায় কাতর হইয়া নিদ্রা যাইতেছে।

এদিকে ঢাক ঢোল সানাই কাঁসী বাজিয়া উঠিল। সকলেই জানিল, বলির সময় উপস্থিত। মুহূর্ত্তমধ্যে বহির্ব্বাটীর প্রাঙ্গণভূমি লোকে লোকারণ্য হইল। কিন্তু কৈ, চৌধুরী মহাশয় কৈ? ঐ যে ঐ, দুইটী পরকালের বান্ধবের স্কন্ধে বাহুদ্বয় ভর করিয়া অবিরাম নিষ্ঠীবন পরিত্যাগ করিতে করিতে তিনি বলিস্থানাভিমুখেই আসিতেছেন। এতক্ষণ তিনি ইয়ারগণ সমভিব্যাহারে একটী নিভৃত কক্ষে বসিয়া সন্ধিপূজার 'প্রসাদের' চাট্ প্রস্তুত করাইয়া কিঞ্চিৎ 'কারণকরণে' মনোনিবেশ করিয়াছিলেন।

ঠিক এই ধুমধামের সময়ে সেই "ফলবৎপূগমালিনী" দীর্ঘিকাসমীপে একটী অনুপম রূপলাবণ্যবতী চতুর্দ্দশবর্ষীয়া বালিকা স্নানার্থ উপস্থিত হইয়া প্রকৃতির নির্জ্জনতা ও নিস্তব্ধতা অনুভব করিয়া যেন শিহরিয়া উঠিল। বালিকা মনে মনে বলিল, "মার কথা অগ্রাহ্য করিয়া কেন আসিলাম? আসিয়াছি যদি শীঘ্র শীঘ্র একটা ডুব দিয়া যাই"। এই বলিয়া সে হস্তস্থিত অঙ্গারখণ্ড মুখে পুরিয়া দ্রুতপদে সোপানাবলী অবতরণ করিল, সর্ব্বনিম্ন সোপানোপরি উপবেশন পূর্ব্বক হাঁটু পর্য্যন্ত জলে ডুবাইয়া দ্রুত অঙ্গুলিসঞ্চালন করিয়া দন্তধাবন করিতে লাগিল। অকস্মাৎ তাহার পদদ্বয় ধরিয়া কে যেন সজোরে আকর্ষণ করিল; মাথা সোপানে পড়িয়া যাওয়াতে অভাগিনী বড়ই আঘাত পাইল; "মাগো! গেলাম গো! মলাম গো! তোমার গতি কি হবে গো?" চীৎকার করিয়া এই কথা কয়টী বলিতে বলিতে বালিকা মজ্জনোন্মুখী হইল। তন্মুহূর্ত্তেই "ভয় নাই" রবে রমেশচন্দ্র দীর্ঘিতে ঝাঁপ দিয়া পড়িল। সন্তরণপটু বালিকা নিষ্কৃতি পাইয়া তীরাভিমুখে ছুটিল। কিন্তু, "মানসি, আমি বুঝি মরিলাম," এই বলিয়াই রমেশ নিমজ্জিত হইল। বালিকা ও রমেশের উচ্চ চীৎকার শুনিয়া দুই চারি জন লোক আসিয়া যুটিল, কিন্তু কেহই রমেশের রক্ষার্থ যত্নবান্ হইল না; বলিল, "কে বাবা প্রাণ দিবে? যে ভুতুড়ে পুকুর। একটাকে ছাড়িয়া আর একটা ধরিল!" কেহ বলিল, "বর্ষার জলের সঙ্গে নিশ্চয়ই একটা কুমীর টুমীর আসিয়া থাকিবে, তারই এই কাণ্ড।" প্রত্যুৎপন্নমতি বালিকা কিন্তু প্রাণপণে দৌড়িয়া গিয়া রমেশদের বাড়ী এ খবর পৌঁছাইল। বিজয়কেশরী বাবু ভৃত্যগণ সঙ্গে করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইলে উক্ত বীর পুরুষগণ অমনি বলিয়া উঠিল, "আজ্ঞে আমরাও জলে নামিব কি?" রায় মহাশয় তাহাদের প্রতি ধিক্কারসূচক তীব্রকটাক্ষ মাত্র পাত করিয়া জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। এক ডুবেই তিনি রমেশের দেহ লইয়া উঠিলেন এবং ভৃত্যগণের সাহায্যে ধরাধরি করিয়া তীরে আনিলেন। রমেশকে অধোমুখ করিয়া তাহার পদদ্বয় ঊর্দ্ধদিকে রাখিয়া কয়েকবার ঝাঁকরাইতেই কতকটা জল বমন হইয়া গেলে তাহার চৈতন্যের সঞ্চার হইল। আরও কিছুকাল শুশ্রূষার পরেই রমেশ বলিল, "আর এক জন জলে ডুবিয়াছে, তাহাকে তোলা হইয়াছে কি? আমার বোধ হয় সে গদাধর।" এই কথা শুনিয়া সকলেই ভীত ও বিস্মিত হইল। রায় মহাশয় অবিলম্বে ভৃত্যদের জলে নামিয়া তল্লাস করিতে আদেশ দিয়া কালীকিঙ্কর বাবুকে খবর পাঠাইলেন। চৌধুরী মহাশয় আসিয়া পৌঁছিতে পৌঁছিতেই গদাধরের দেহ উত্তোলিত হইয়া তীরে আনীত হইল। দেখিতে দেখিতে কত শত লোক আসিয়া সেখানে জড় হইল। গ্রামের প্রধান কবিরাজ মহাশয় আসিয়া নাড়ী টিপিয়া মুখ বিকৃত করিলেন। সে গ্রামে ডাক্তার ছিল না; ডাক্তার আনিতে গ্রামান্তরে লোক ছুটিল; ডাক্তারও আসিল, চেষ্টারও ত্রুটি হইল না; কিন্তু কেহই গদাধরের চৈতন্য সম্পাদন করিতে পারিল না। কান্নাকাটিটা প্রথমে একটুকু চাপা ছিল, এখন চতুর্দ্দিকে হাহাকার পড়িয়া গেল।

ঘটনাস্থলে মানসী ও রমেশের প্রমুখাৎ এই সকল কথা জানা গেল।

মানসী। আজ কয়দিন মা জ্বরে শয্যাগত। আমি আজ মাকে কিছু পথ্য দিয়া, নিজের জন্য চারিটা 'ভাতেভাত' রাঁধিয়া স্নান করিতে আসিতে চাওয়ায় মা বলিলেন, "বাড়ীতেই হাত পা টা ধুইয়া ফেল, এখন বোধ হয় ঘাটে কেহ নাই। একাকী ঘাটে যাওয়া উচিত নয়"। আমি ভাবিলাম, বৎসরের একটা দিন, রসুই করিয়া অস্নাত থাকা কিছুতেই হইতে পারেনা। তাই একটু জেদ্ করিয়া

আসিয়া দেখিলাম ঘাটে কেহ নাই। আমার একটু ভয় ভয় করিতে লাগিল। তাড়াতাড়ি স্নান করিব মনে করিয়া ঘাটের নীচে বসিয়া জলে পা ডুবাইয়া আঙ্গার দিয়া দাঁত মাজিতেছিলাম এমন সময় হঠাৎ আমাকে যেন কে পায়ে ধরিয়া জলে ডুবাইতে লাগিল। আমি চেঁচাইয়া উঠাতেই অমনি রমেশ বাবু জলে ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন। তখনই আমার পা ছাড়িয়া দেওয়াতে আমি উপরে উঠিলাম। কিন্তু রমেশ বাবু "আমি বুঝি মরিলাম" এই বলিয়াই ডুবিয়া গেলেন। আমি দৌড়িয়া গিয়া তাঁহাদের বাড়ী খবর দিলাম। আমাকে যখন ধরিয়াছিল তখন ধরনটা মানুষের মতই বোধ হইয়াছিল। কিন্তু সেই সময়ে যাহারা আসিয়া ঘাটে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তাঁহারা বলিলেন এ ভূতের কাজ! আমিও মনে করিলাম তাই। তাই আর একজন যে জলেই ছিল, একথা আমার মনে হয় নাই।

রমেশ। আমি হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা করি, আপনারা বোধ হয় অনেকেই একথা জানেন। এবার কলিকাতা হইতে আসিয়াই শুনিলাম মানসীর মায়ের জ্বর হইয়াছে। গিয়া দেখিলাম, অবিরাম জ্বর; কিছু শক্ত বলিয়াই বোধ হইল; একটু ঘন ঘন দেখারও প্রয়োজন বোধ করিলাম। কিন্তু মানসীর বয়স হইয়াছে, আর তার মা শয্যাগত, এই অবস্থায় তাঁহাদের বাড়ী বেশী যাওয়াটা সঙ্গত মনে না করিয়া রোজ একবার মাত্র যাইতাম। আজ নিমন্ত্রিত লোক জন খাওয়ান হইয়া গেলে তাহাদের বাড়ী কিছু দেরিতেই গিয়াছিলাম। গিয়া দেখিলাম, মানসীর মা মেয়ে অসময়ে একাকী ঘাটে গিয়াছে বলিয়া বড়ই উদ্বিগ্না। আমিও তার খোঁজ লওয়াটা সঙ্গত মনে করিয়া ছুটিয়া আসিলাম। তার পর যাহা যাহা ঘটিয়াছে আপনারা মানসীর মুখেই শুনিয়াছেন; অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন। তবে গদাধরের চরিত্রসম্বন্ধে একটা কথা বলিলে এই শোচনীয় ঘটনার মূল কারণ আপনারা বোধ হয় আমারই মত বুঝিতে পারিবেন। তাহা এই—গদাধর অনেক দিন হইতেই বামী দাসীর সাহায্যে মানসীকে বিবাহে সম্মত করাইতে চেষ্টা পাইতেছিল; এমন কি মানসীর প্রতি কোনও কোনও অশিষ্ট ব্যবহার করিতেও গদাধর প্রয়াস পাইয়াছিল। আমি মানসীর মায়ের মুখে এই সব কথা শুনিয়া এই সে দিন গদাধরকে একটুকু ভর্ৎসনা করাতে সে আমার উপর বড়ই চটিয়া গিয়াছিল। মানসীকে সে যে একদিন বড়ই বিপাকে ফেলিবে সেই দিন হইতেই আমার এই ধারণা হইয়াছিল। এই পূজার তিন দিনই নাকি বামী মানসীদের বাড়ী যাতায়াত করিয়াছে। পূর্ব্বকৃত অপরাধ স্বীকার করিয়া, ভবিষ্যতে আর ওরূপ করিবেনা এই অভয় দিয়া, বলি ও আরতি দেখিবার জন্য সে মানসীকে মিনতিপূর্ব্বক অনুরোধ করিয়াছে। কিন্তু মানসী শুধু মায়ের অসুখের ওজর করিয়াই কিছুতেই যাইতে রাজি হয় নাই। আজ মানসী স্নান করিতে আসার পূর্ব্বক্ষণেই নাকি বামী নিরাশ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছিল। মানসীকে ভয়প্রদর্শন মাত্র করাই বোধ হয় গদাধরের উদ্দেশ্য ছিল; কিন্তু আমি মানসীর প্রণয়াকাঙ্ক্ষী, অতএব তাহার শত্রু, এই মনে করিয়া গদাধর আমাকে যে আজ প্রাণে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। গদাধরের শক্তি আমার চেয়ে অনেক বেশী ছিল। যখন তাহার গাত্রস্পর্শ মাত্রই আমি তাহাকে চিনিতে পারিয়াছিলাম, তখনই আমি জীবনের আশা ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। ডাঙ্গায় হইলে বা এমতাবস্থায় পরিত্রাণের উপায় থাকে, কিন্তু অথই জলে তার সম্ভাবনা কোথায়? সে যখন আমাকে ছাড়িয়া দিল তখন আমার উঠিবার শক্তি ছিল না; কিন্তু যেন বুঝিতে পারিলাম গদাধরও উঠিলনা!

এই বলিয়া রমেশ সাতিশয় নির্ব্বেদ প্রকাশ করিতে লাগিল।

মানসী ও রমেশের কথা শুনিয়া উপস্থিত সকলেই বুঝিতে পারিল যে, মানসী ঘাটে আসিবার পূর্ব্বেই গদাধর ঘাটের সিঁড়ির আড়ালে লুক্কায়িত ছিল।

চৌধুরী মহাশয়ের মনের অবস্থা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। যখন সব ফুরাইল, তখন তিনি উন্মত্তের মত বাড়ী গিয়াই একেবারে চণ্ডীমণ্ডপে ঢুকিলেন, পুরোহিত ঠাকুর ও অন্যান্য হিতাকাঙ্ক্ষিগণের বাধা কিছুতেই মানিলেন না। প্রতিমার কাঠাম ধরিয়া ভৃত্যগণকে হুকুম দিলেন, "চল্, গদাধরের সঙ্গে ইহাকেও বিজয়ার জলে বিসর্জ্জন দিয়া আসি।" ভৃত্যদিগকে এই হুকুম তামিল করিতেই হইল।

মোসায়েবগণ দেখিল তাহাদের অন্ন আজ নিতান্তই মারা যাইতে বসিয়াছে। কাজেই কালীকিঙ্কর বাবুকে

মতিস্থির করিতে তাহারা পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিল। তাহারা বুঝাইয়া বলিল যে পঞ্চাশ বৎসর বয়সেও চৌধুরী মহাশয়ের পুনরায় পুত্রলাভ অসম্ভব নহে। আর যে চিরশত্রু বিজয়কেশরী রায়, তাহাকে কি নিঃসন্তান না করিয়া ছাড়া উচিত? যে প্রকারে হউক গদাধরের হত্যাপরাধে রমেশকে অপরাধী সাব্যস্ত করিতেই হইবে। মোকদ্দমাটা এইরূপে সাজাইতে হইবে — মানসী ও রমেশকে পরস্পরের গাত্রে জল নিক্ষেপ করিতে দেখিয়া গদাধর বাধা দেয়; এই বাধার ফলে ঝগড়া বাঁধে; শেষে মানসী ও রমেশ উভয়ে মিলিয়া গদাধরকে জলমগ্ন করে; কারণ, গদাধরকে না মারিয়া ফেলিলে তাহাদের ব্যবহার জনসমাজে রাষ্ট্র হইয়া পড়ে, ইত্যাদি। তাহারা একবার বামীর জবানবন্দীটা লইতে চেষ্টা করিলে সে কাঁদিয়াই আকুল হইল; বলিল, "আমি কি দোষ করিয়াছি গো? আমাকে কেন ইহার ভিতর জড়াও গো! দাদা বাবু গো, তুমি থাকিলে আমাকে আজ কে এমন কথা বলিতে পারিত গো!"

মোসায়েবগণ বলিল, "মর মাগী, তোকে কে কি বলিল? আমরাও তো ইহাই চাই; মানসীর প্রতি গদাধরের কোনও রূপ মনের টান ছিল, এরূপ কথা কাহারও নিকট তুই প্রকাশ করিস্ না।"

কালীকিঙ্কর বাবু নীরবে সব শুনিলেন; নীরবে তপ্ত অশ্রুধারায় বক্ষ ভাসাইলেন; শেষে বলিলেন, "আমার পাপের বোঝা বড়ই ভারী হইয়াছে, আমি আর বহিতে পারিব না। কাশীবাসী হইয়া এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব।" মোসায়েবগণ সমস্বরে বলিয়া উঠিল, "সেকি সেকি, চৌধুরীকুলধুরন্ধরের শেষ এই গতি!" তাহারা মনে মনে ভাবিল, "বেশতো, লুট পাট করিয়া তবে কিছু খাইতে পাইবই"। কিন্তু চৌধুরী মহাশয় যখন বলিলেন যে তিনি তাঁহার ভাগিনেয় হরিবিলাস বাবুকে বিষয় লেখাপড়া করিয়াদিয়া যাইবেন, তখন তাহাদের মাথায় বজ্রাঘাত হইল। হরিবিলাস বাবু আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত, আর (তাহাদের ভাষায় বলিতে গেলে) তিনি যেরূপ বদ্ধমুষ্টি তাহাতে তাঁহার কাছে আর তাহাদের আমল পাইতে হইবেনা।

চৌধুরী মহাশয় কিছুতেই নিজ সঙ্কল্প হইতে বিচলিত হইলেননা। বিজয়কেশরী বাবু চিরকালের মনোমালিন্য ভুলিয়া কালীকিঙ্কর বাবুর বাড়ী যাইয়া তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন এবং তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষগণের কার্য্যকলাপের কথা উল্লেখ করিয়া পুনরায় উভয়পরিবারে সৌহার্দ্দস্থাপনের অনেক চেষ্টা করিলেন। রমেশ শুধু চৌধুরী মহাশয়কে প্রবোধ দিয়াই ক্ষান্ত হইলনা। তাঁহার স্ত্রীর অশ্রুধারার সহিত নিজের কত অশ্রু মিলাইল। কিছুতেই কিন্তু কিছু হইল না। সুযোগ্য ভাগিনেয়কে বিষয়ের অধিকারী করিয়া চৌধুরী মহাশয় সপরিবার কাশীধাম যাত্রা করিবার দিন স্থির করিলেন।

নিজের জলমজ্জন বৃত্তান্ত বলিবার সময় মানসীর সর্ব্বাঙ্গ কাঁপিতেছিল। বলা শেষ হইলেই সে বাড়ী আসিল। কাঁপিতে কাঁপিতেই মাকে এক দাগ ঔষধ খাওয়াইল; পরে মায়ের পাশে শুইয়া পড়িল। মানসীর বাড়ী ফিরিতে বিলম্ব দেখিয়া তার মা একবার হাতে ভর করিয়া ঘরের দরজা পর্য্যন্ত আসিয়া ক্লান্ত হইয়া আবার গিয়া শুইয়া পড়িয়াছিলেন। মানসীকে আসিতে দেখিয়া তিনি নিরুদ্বেগ হইলেন, কিন্তু তার আসিতে কেন বিলম্ব হইল সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে যেন শক্তি হইল না। মেয়েরও যে জ্বর হইয়াছে তাহা কিন্তু তিনি বুঝিতে পারিলেন।

রমেশের প্রতি তাহার পিতার কঠোর আদেশ হইল, সে আর মানসীদের বাড়ী যাইতে পাইবে না। রায় মহাশয় কিন্তু মানসীর মায়ের জন্য কবিরাজী চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়া দিতে রাজি হইলেন। রমেশ বলিল, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় যেরূপ সুফল দেখা যাইতেছে, তাহাতে হঠাৎ চিকিৎসা প্রণালীর পরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয় নহে। বিনোদ নামে তার একটী সহাধ্যায়ী বন্ধু নিকটস্থ কোনও গ্রামে আছেন, তাঁহাকে আনাইলে এরূপ পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা হইবেনা। তিনি হোমিওপ্যাথী চিকিৎসায় বেশ পটু। যতক্ষণ তিনি আসিয়া না পৌঁছেন, সেই সময়ের মধ্যে রমেশ আর একটী বার মানসীদের বাড়ী যাইতে ইচ্ছুক। পিতা পুত্রের কথায় সম্মত হইয়া একটী ভৃত্যকে পত্রসহ রমেশের বন্ধু বিনোদ বাবুর জন্য তম্মুহূর্ত্তেই পাঠাইলেন।

রমেশ মানসীদের বাড়ী গিয়া দেখিল, মা ও মেয়ে উভয়েরই জ্বর! উভয়ের এই অবস্থায় এক বিছানায় থাকা অনুচিত মনে করিয়া রমেশ স্বতন্ত্র বিছানা করার প্রস্তাব করাতেই

মা অনিচ্ছাসূচক শব্দমাত্র উচ্চারণ করিয়া মেয়েকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন। আহা, মানসী যে কখনও তাঁহার বুকছাড়া হয় নাই! রমেশ উপায়ান্তর না দেখিয়া মানসীকে বলিলেন, "একটু কষ্ট করিয়া উঠিয়া আমাকে থারমোমিটারটা আনিয়া দাও তো"। মানসী উঠিবামাত্রই রমেশ সুযোগ বুঝিয়া তার সঙ্গে চলিল; মানসীকে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করিল, "আজিকার ঘটনা সব মাকে জানাইয়াছ কি?"

মানসী। না, মাও কিছু জিজ্ঞাসা করিতে পারেন নাই, আমিও বলা ভাল মনে করি নাই। সেই এক দিনের ঘটনাতেই তো কাঁপিতে কাঁপিতে তাঁহার জ্বর হইয়াছে। আজিকার ঘটনা জানিলে মা আর কি ভাল হইবেন? তাঁহার কাছে কোনও দিন কোনও কথা আমি গোপন করি নাই। এ কথাও তিনি ভাল হইলে বলিব স্থির করিয়াছি!

রমেশ। বেশ। মানসি, তোমাকে একটা কথা বলিতে আমার প্রাণ ফাটিয়া যাইতেছে। বাবার আদেশ হইয়াছে, কাল হইতে আর আমি তোমাদের বাড়ী আসিতে পাইবনা। বিনোদ নামে আমার একটা বন্ধু তোমাদের চিকিৎসা করিবেন। বাবাও ইহাতে স্বীকৃত হইয়া তাঁর জন্য লোক পাঠাইয়াছেন। তোমাদের বাড়ী আমার না আসার কারণটাও এখন মার কাছে প্রকাশ করিওনা।

রমেশের কথা শুনিয়া মানসী ঘরের একটা খুঁটা ধরিল, তাহার অধর স্ফুরিত হইল; চোখ দিয়া দর দর ধারা বহিতে লাগিল।

রমেশ দেখিল ইহা শুধু অসহায়ের কাতর ক্রন্দন নহে, ইহা অস্ফুট প্রেমের ভাষা। বলিল, "মানসি, আমি তোমাকে বুদ্ধিহীনা বালিকা মনে করি না। তাই বলিতেছি বিপদে ধৈর্য্য ধরাই মহত্তের লক্ষণ। তুমি এখন অধীর হইলে তোমার মার আরোগ্যলাভ অসম্ভব হইয়া পড়িবে। তোমাদের প্রতি আমার মনের অবস্থা পূর্ব্বেও যেমন ছিল, এখনও তেমনই থাকিবে। আর তোমারও জ্বর হইয়াছে শুনিলে বাবা আমার প্রতি তাঁহার যে আদেশ হইয়াছে, তাহা প্রত্যাহার ও করিতে পারেন"।

এই বলিয়া রমেশ থারমোমিটার লইয়া জ্বর পরীক্ষা করিয়া ঔষধের ব্যবস্থা করিল; পরে মানসীকে একটুকু পৃথক পৃথকই থাকিতে পরামর্শ দিয়া, তাহাদের পরিচর্য্যারও বন্দোবস্ত করিবে, এই আশ্বাস দিয়া বাড়ী চলিয়া আসিল।

রমেশ পিতার নিকট সব অবস্থা নিবেদন করাতে বিজয় বাবু নিজ পরিবারের এক বয়স্কা বিধবাকে মানসীদের শুশ্রূষার জন্য পাঠাইলেন।

যে বৃদ্ধাটী মানসীদের পরিচর্য্যার জন্য আসিলেন তিনি কিছু দূর সম্পর্কে রমেশের পিসীমা। রাত্রি জাগরণ করিয়া মানসীর মাকে তিনি ঔষধ না খাওয়াইলে আর কে খাওয়াইবে? তিনি মানসীদের শয়নঘরেই স্বতন্ত্র বিছানায় একটুকু গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন, দুইবার যথাসময়ে ঔষধ খাওয়ান হইল; তিনি আর নিদ্রার আবেগ সহ্য করিতে পারিলেন না; একটুকু তন্দ্রা আসিল। বেশীক্ষণ এই অবস্থায় না থাকিতেই তিনি দ্বারোদ্ঘাটনের শব্দ শুনিতে পাইলেন। পাশ ফিরিয়া দেখিলেন, ঘরের দরজাটা একটুকু ফাঁক হইয়া আছে। ব্যস্ত সমস্ত হইয়া উঠিয়াই ঘরের চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছিল, দেখিলেন যেখানকার জিনিষগুলি সেখানেই আছে। কিন্তু মানসীদের বিছানার উপর দৃষ্টি পড়িবামাত্র তিনি একেবারে চমকিয়া উঠিলেন,—মায়ের পাশে মানসী নাই। চুপি চুপি ঘরের দরজা খুলিয়া বৃদ্ধা এদিক্ ওদিক্ খুঁজিলেন, কিন্তু কোথাও মানসীর সন্ধান পাইলেন না। বাহির হইতে ঘরের দরজা খুব দৃঢ়রূপে বন্ধ করিয়া তিনি বরাবর ক্ষিপ্রগতিতে রমেশদের বাড়ী গেলেন এবং রমেশের শয়নকক্ষের দরজায় আঘাত করিলেন।

রমেশ যে আজ অনিদ্র ছিল একথা বলাই বাহুল্য। দরজা খুলিয়া সে চকিতের ন্যায় বলিল, "পিসীমা, এত রাত্রিতে আমার জন্য কেন? মানসীর মার কি কোনও বিশেষ খারাপ উপসর্গ উপস্থিত হইয়াছে?"

বৃদ্ধা। আরও মন্দ খবর,—মানসী ঘরের দোর খুলিয়া কোথায় গিয়াছে তাহার সন্ধান পাইতেছিনা। তার মা কিছু সুস্থ আছেন বলিয়াই বোধ হইল; তিনি ঘুমাইতেছেন।

পিসীমার কথা শুনিতে শুনিতেই রমেশের কর্ত্তব্য স্থির হইয়া গেল। সে নিজের একটা বিশ্বস্ত ভৃত্যকে জাগাইয়া তাহাকে ও পিসীমাকে মানসীদের বাড়ীতে ও তাহার

চারিদিকে অনুসন্ধান করিতে বলিয়া নিজে বিজয়ার দিকে ছুটিল।

দীর্ঘিকার সমীপবর্ত্তী আম্রকানন মধ্য দিয়া যাইতে যাইতে রমেশ স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইল; দিবা চন্দ্রালোকে দেখিল, বিজয়ার গর্ভ হইতে শুক্লবসনা গৌরাঙ্গী মূর্ত্তি উত্থিত হইয়া জলের উপর দাড়াইলেন। রমেশ কিছুমাত্র ভীত না হইয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "গদাধরকে তো খাইয়াছ, মানসীকেও এতক্ষণে শেষ করিয়াই থাকিবে। বিশ্বোদরে! দুইকুল নির্ম্মূল করিয়া তোমার উদরপূর্ত্তি হয় নাই! যাই, আমিও তোমার ঐ বিশাল গহ্বরে প্রবেশ করিব। রোষসংহার যদি না করিলে তবে করালরূপিনী হইয়া আবির্ভূত হইলে না কেন? আমি এমন কি পুণ্য করিয়াছি যে আমাকে বরাভয়প্রদায়িনী মূর্ত্তি দেখাইলে?" বলিতে বলিতে রমেশ দীঘির ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল; অমনি "ডাকিনী, প্রেতিনী, প্রেতিনী, নিশ্চয় মানসীর প্রেতাত্মা" বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল।

সেই জলচারিণী মূর্ত্তি সোপানাবলী আরোহণ করিল এবং বস্ত্রাঞ্চলে জল আনিয়া সজোরে রমেশের চক্ষে ও মস্তকে প্রক্ষেপ করিতে লাগিল। রমেশ সংজ্ঞাপ্রাপ্ত হইয়া বলিল, "আমি জাগিয়া আছি কি স্বপ্ন দেখিতেছি? কে তুমি?"

মানসী। আপনি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন বটে, এখন আপনার সহজ অবস্থা বলিয়াই বোধ হইতেছে। আমি অভাগিনী মানসী।

রমেশ। আমি কি তবে তোমাকেই জলের উপর দণ্ডায়মান দেখিয়াছিলাম?

মানসী। হাঁ।

রমেশ। সে কি মানসি, তুমি কোন্ যাদুবলে জলের উপর দাঁড়াইতে শিখিয়াছ?

মানসী। আমার যাদুমন্ত্র কিছুই নাই।

রমেশ। তবে?

মানসী। মা আমাকে জলের উপর দাঁড় করাইয়াছিলেন।

রমেশ। মানসি, আমার বিকৃত মস্তিষ্ককে আর বিকৃত করিওনা। বল বল, শীঘ্র সব খুলিয়া বল।

অতঃপর মানসী নিজের গৃহত্যাগ, আত্মবিসর্জ্জন সঙ্কল্পে জলে ঝম্পপ্রদান, জলে ভাসমান সোপানসংলগ্ন প্রতিমার কাঠামোর উপর পতন, অবশেষে তদপুরি তাহার দণ্ডায়মান হওয়া, এই সকল ঘটনা প্রকাশ করিয়া বলিলে রমেশ নিজের ভুল বুঝিতে পারিল; বলিল, "মানসি, মৃতকল্পা মায়ের শয্যাত্যাগ করিয়া আত্মপ্রাণ বিসর্জ্জন দিতে আসিয়াছিলে, এই কি তোমার মাতৃভক্তি? আত্মহত্যা মহাপাপ, ঘোর স্বার্থপরতা, তুমি কি জাননা?"

আবার মানসী কাঁদিল। কাঁদিতে কাঁদিতে এইবার মুখ ফুটিল। "এই কলঙ্কিত জীবন রাখিয়া কি হইবে? ইহাতে মার চিরকাল দুঃখ। এক দিনেই সে দুঃখের যাহাতে শেষ হয় তাহাই করিতে আসিয়াছিলাম। আর আপনিও যাহাকে অকারণে ত্যাগ করিলেন, তাহার বাঁচিয়া কি ফল?"

রমেশ। আমি তোমার কে? এক জন সামান্য হিতাকাঙ্ক্ষী মাত্র বৈ তো নহি? আর আমি তো তোমাকে পরিত্যাগ করি নাই, আশ্বাসবাক্যই বলিয়াছিলাম?

আজ মানসীর হৃদয়ের কপাট খুলিয়া গেল; আজ সর্ব্বপ্রথম রমেশকে নাম ধরিয়া সম্বোধন করিয়া বলিল, "রমেশ তুমি আমার জীবনসর্ব্বস্ব।"

রমেশ। ঐ চন্দ্র, এই বিজয়া, আর এই প্রতিমা সাক্ষী করিয়া বলিতেছি, তোমার সহিত আমার লৌকিক বিবাহ না হইলেও তুমিই চিরকাল আমার হৃদয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইয়া থাকিবে।

মানসীর হৃদয়ে পুলকের আবেগময় তরঙ্গ উঠিল, সে আর একটী কথাও বলিতে পারিল না।

রমেশ দেখিল, মানসীর কাপড় ভিজা, সে থর থর কাঁপিতেছে; তাড়াতাড়ি উভয়ে মানসীদের বাড়ী পৌঁছিল। রমেশ ভৃত্য ও পিসীমাকে বিশেষ করিয়া বলিয়া দিল, এ ঘটনার কথা যেন কাহারও কাণে না উঠে।

পর দিন বিনোদ বাবু আসিয়া পৌঁছিলেন। রমেশের প্রারদ্ধ প্রণালীতেই চিকিৎসা চলিতে লাগিল। আট দশ দিনের মধ্যেই মা ও মেয়ে উভয়ে আরোগ্য লাভ করিল।

পূজাবকাশের পর রমেশ কলিকাতা ফিরিয়া আসিয়াছে। বিনোদ বাবুর সহিত তাহার নানারূপ আলাপ হইতেছে॥ মানসীর সহিত তাহার বিবাহের সম্বন্ধনির্ণয়সম্বন্ধে কথা উঠিলে রমেশ বলিলেন, "গরীবের ঘর বলিয়া সম্বন্ধ

করিতে বাবা যদিও এখন পূর্ব্বের মত নারাজ নহেন, তথাপি মানসীকে বিবাহ করিলে লোকে গদাধরের হত্যাপরাধটা আমার ঘাড়েই চাপাইবে, এই আশঙ্কায় এ সম্বন্ধে বাবার আদৌ মত নাই। আমিও বাবার অমতে কিছুই করিতে পারিব না। শুধু কলঙ্কের ভয়ে দুই তিনটা সম্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যাওয়াতে বাবা নিজেই এখন চতুর্দ্দিকে মানসীর সম্বন্ধের চেষ্টা করিতেছেন।"

বিনোদ। আমি বলি, ছয় মাসের মধ্যে তোমার পিতার সম্মতিক্রমে মানসী তোমার সহধর্ম্মিণী হইবে।

রমেশ। তুমি জ্যোতিষী নাকি?

বিনোদ। জ্যোতিষী হই আর না হই, এই মাত্র আমি মানসীর মাকে এই মর্ম্মে চিঠি লিখিতেছি যে, ছয় মাস পরে তোমার সহিত তাহার কন্যার বিবাহ হইবে। তিনি ইহার মধ্যে একথা কাহারও নিকট প্রকাশ না করেন।

রমেশ। তার পর?

বিনোদ। ছয় মাস পরে কালীকিঙ্কর বাবু স্বয়ং কন্যা সম্প্রদান করিবেন।

রমেশ। ভাই তোমার পায়ে পড়ি, এই ঠাট্টার সময় পাইলে?

বিনোদ। ঠাট্টা কি না টের পাইবে ছয় মাস পরে। এখন চল নিশ্চিন্ত হইয়া উভয়ে গিয়া পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হই।

চৈত্র মাসের প্রথম ভাগেই পরীক্ষা হইয়া গেল। রমেশ ও তাহার বন্ধু উভয়েই ভাল পরীক্ষা দিল। পরীক্ষান্তে রমেশ বিস্ময়ের সহিত দেখিতে পাইল যে সেই দিন বিনোদ বাবু ভ্রমণচ্ছলে হাবড়া ষ্টেশনে গিয়া হঠাৎ কাশী চলিলেন। বিনোদ বাবু যাহা মনে করিয়াছিলেন তাহাই দেখিতে পাইলেন—কালীকিঙ্কর বাবু একেবারে বদলাইয়া গিয়াছেন; সে গর্ব্ব সে ঔদ্ধত্যের কিছু মাত্র চিহ্ন এখন তাঁহাতে নাই। আত্মপরিচয় দিয়া বিনোদ বাবু প্রসঙ্গক্রমে আসল কথা পাড়িলেন। সেই সকল কথার খানিকটা পাঠকবর্গকে শুনাইতেছি।

কালী বাবু। মানসীর বিবাহসঙ্কটের কথা শুনিয়া যতদূর দুঃখিত হইলাম, আপনার এই নবীনবয়সে প্রবীণের মত বুদ্ধিবিবেচনা দেখিয়া আবার তেমনই প্রীত হইয়াছি। কিন্তু তথাপি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিনা আপনি এই সামান্য বিষয়ের জন্য আমার নিকট এত দূর কেন আসিয়াছেন। হরিবিলাস তো আপনাদেরই মত এক জন উৎকৃষ্ট লোক। তাহাকে রমেশ কিম্বা আপনি ভিতরকার কথাগুলি একটু বুঝাইয়া বলিলেই রমেশের সম্বন্ধে লোকের সংশয় দূর হইতে পারিত এবং হরিবিলাসই উদ্যোগী হইয়া মানসীর সহিত রমেশের বিবাহ দিত।

বিনোদ বাবু। মানিলাম হরিবিলাস বাবু এক জন উৎকৃষ্ট লোক। কিন্তু আপনার পুত্রের মৃত্যুই কি তাঁর সম্পদের কারণ নয়? তিনি আপনি বর্ত্তমান থাকিতে আপনার চিরশত্রু বিজয়কেশরী বাবুর সহিত সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইতে পারেন কি? যদিই বা তিনি এরূপ অমানুষিক আচরণ করিতে পারেন, তথাপি আপনার দেশত্যাগে যাহারা মর্ম্মের অন্তস্তলে ব্যথা পাইয়াছে তাহাদের সে ব্যথা দূর হইবে কি? আপনি স্বয়ং একাজে ব্রতী না হইলে এ মহদুদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারেনা। মানসীর বিবাহ বা কলঙ্ক-মোচন সে উদ্দেশ্যসাধনের উপায়মাত্র। আমি দিব্যচক্ষে দেখিতে পাইতেছি, রমেশ ও হরিবিলাস বাবুর মিলনে আপনাদের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্দীপ্ত হইবে।

কালী বাবু। বিনোদ বাবু, আপনি ধন্য। আমি আপনার কথায় রাজি হইলাম।

কালীকিঙ্কর বাবু, বিজয়কেশরী বাবু ও হরিবিলাস বাবুকে বিনোদ বাবুর সাক্ষাতে ও তাঁহার মুসাবিদা অনুসারে পত্র লিখিলেন। যথা সময়ে বাঞ্ছিত উত্তর আসিল। বৈশাখ মাসে চৌধুরী মহাশয় দেশে প্রত্যাগমন করিয়া বহুসমারোহে রমেশ বাবুর শুভ পরিণয় ক্রিয়া সমাপন করিয়া কাশী ফিরিয়া আসিলেন।

শ্রীনগেন্দ্রচন্দ্র সোম।

বীণা।

কলঙ্কের দাগ লাগি অবশ, অলস
তারগুলি!—লাজ রাখ, মান রাখ!—বিনা
তোমার করুণা, হে কৌশলি, অতি দীনা
এ হৃদয়-বীণা! ঢাল বিদ্যুৎ-পরশ
তার ও অঙ্গুলি-মাঝে! উদ্দাম হরষ
জাগুক্ গো তারে তারে! যেমন প্রবীণা

হয় গো নবীনা, পেয়ে পতির দরশ
যুগান্তে! যুগান্তে আজি বাজুক্ এ বীণা!
হে কর্ম্মি! শিখাও কর্ম্ম। নয়ন মুছিয়া,
নবীন উৎসাহে পুনঃ, নবীন বীণায়,
ধরিব নবীন তান, সুছন্দ গাঁথিয়া
কর্ম্ম-রঙ্গভূমি-মাঝে, অপূর্ব্ব লীলায়!
হে শিবসুন্দর দেব! স্মরিয়া তোমারে,
বিশ্বপ্রেম-গীতি গাব, ঝঙ্কারিয়া তারে!

বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ।

মানুষের গায়ের রঙ্গ।

সবুজ রঙ্গের মানুষ আছে কি? গত আষাঢ়ের 'প্রবাসী'তে সম্পাদক মহাশয় গ্রিফিথ্‌স্ সাহেবের মত উদ্ধৃত করিয়াছেন। সাহেব বলেন, "এ দেশীয় কবিগণ এ দেশীয় রমণীগণের ঈষৎ হরিদ্বর্ণ মুখের প্রশংসা করিয়াছেন, এবং বাস্তবিক উচ্চজাতীয়া মুসলমান ও রাজপুত রমণীগণের মুখে ঐ বর্ণ সর্ব্বদা দেখিতে পাওয়া যায়।" কিন্তু বাস্তবিক তাই কি? কোন্ কবি কবে কোন্ হরিদাননা ললনার উল্লেখ করিয়াছেন? কে কবে রাজপুত বা মুসলমান রমণীর মুখে হরিতের আভা দেখিয়াছেন? রাজপুতানাপ্রবাসী কোন পাঠক ইহার উত্তর দিলে কথাটা সহজেই মীমাংসিত হইতে পারিবে।

আমার বোধ হয়, সাহেব ভুল বুঝিয়াছেন এবং ভুল দেখিয়াছেন। হরিদ্রাবর্ণকে তিনি হরিৎ বলেন নাই ত? তপ্তকাঞ্চনাভা দশভুজার বর্ণই দেখুন, কি অন্যান্য গৌরকান্তি দেবদেবী নায়কনায়িকার বর্ণই স্মরণ করুন, ঘাসের ন্যায় বা তদনুরূপ বর্ণ কাহারও ছিল বলিয়া মনে হইতেছে না। ককেশীয়, মঙ্গোলীয়, ইথিয়োপীয়, আমেরিক, ও মালয়—এই পঞ্চবর্ণ মানবের মধ্যে হরিতের আভা দেখিতে পাই না। মনে হইতেছে, স্বর্গীয় উমেশচন্দ্র বটব্যাল হরি শব্দের মূল অর্থ ও পরে সেই অর্থের পরিবর্ত্তনের বিষয় লিখিয়াছিলেন। অমরকোষে হরি শব্দের অর্থে যম বায়ু ইন্দ্র চন্দ্র সূর্য্য বিষ্ণু সিংহ কিরণ ঘোটক শুকপক্ষী সর্প বানর ভেক দেখিতে পাই। যমাদি দেবতা ছাড়িয়া দিলে অন্য যে কয়েকটি অর্থ থাকে, তাহাদের নাম কেন হরি হইয়াছে, তাহা যেন কতকটা বুঝিতে পারা যায়। হরি অর্থে কপিল (রক্তপীত) বর্ণ আছে। বোধ হয়, হরি শব্দের অর্থ প্রথমে পীতবর্ণ ছিল। হরি, হরিণ, হরিত, হরিতাল, হরিতাশ্ম, হরিদ্রা, হরিতকী প্রভৃতি শব্দে হরি শব্দের অর্থ প্রকাশ পাইতেছে। অমরকোষের টীকাকার রঘুনাথ বলেন হরিদ্রা—হরিং হরিতবর্ণং দ্রাতি গচ্ছতি। বস্তুত পীত হরিৎ নীল—এই তিন বর্ণই হরি শব্দে প্রকাশিত হইতে দেখা যায়। হরি শব্দে শুকপক্ষী, হরিতাশ্ম শব্দে মরকত মণিও বটে, তুঁতেও বটে। বস্তুত পীতের কিঞ্চিৎ প্রভেদে হরিৎ এবং হরিতের কিঞ্চিৎ প্রভেদে নীল পাওয়া যায়। কিংবা হরিৎ অল্প হইলে পীত, এবং নীল অল্প হইলে হরিৎ দেখাইতে পারে। এইরূপে, বোধ করি, সাহেব পীতবর্ণে হরিতের আভা মনে করিয়া থাকিবেন।

হরি শব্দে পীত ও হরিৎ বুঝিতে পারি। কিন্তু নীল বর্ণ কিরূপে আসে? হরিতাশ্ম অর্থে মরকত ও হিরাকশ হইতে পারে, কিন্তু তুঁতে হয় কিরূপে? হরিদ্বর্ণান্ধতা ব্যতীত ইহার উত্তর পাই না। পূর্ব্বকালে যে কেহ কেহ হরিদ্বর্ণান্ধ ছিলেন, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। মহর্ষি সিংহ তাঁহার রত্নসংগ্রহে লিখিয়াছেন, "নীলকণ্ঠরুচিজ্ঞেয়ঃ", "ম্লেচ্ছদেশে মহানীলঃ কীরপক্ষনীভোভবেৎ", ইত্যাদি। অর্থাৎ ইনি বলেন, নীলমণির বর্ণ ঘাসের ন্যায়, মহানীলের বর্ণ শুকপক্ষীর পক্ষের ন্যায়। এইরূপ, হরিন্মণি (মরকত) শব্দের অর্থে অমরকোষের টীকাকার রঘুনাথ লিখিয়াছেন, "হরিৎ নীলবর্ণো মণিঃ।" এ সকল স্থলে সকলেই যে বর্ণান্ধ ছিলেন, তাহা নহে। সাহেবের কথা সত্য যে, পূর্ব্বকালে সকল দেশেই বর্ণজ্ঞাপক উপযুক্ত শব্দের অভাব ছিল।

বজ্রদ্রুম।

অমরকোষ উল্টাইতে উল্টাইতে মনসা বা সিজ গাছের এক নাম বজ্রদ্রু বা বজ্রদ্রুম দেখিতে পাইতেছি। দেখিয়াই অনেক দুতলা তেতলা পাকা বাড়ীর ছাতের তেকাটা সিজগাছ মনে হইতেছে। এই গাছ ছাতে রাখিয়া গৃহস্বামী বজ্রপাতের আশঙ্কা হইতে মুক্তির আশা করিয়া থাকেন, অর্থাৎ বজ্রদ্রুম

দ্বারা বজ্রদণ্ডের (lightning conductor) কাজ সারিয়া লয়েন। বিষয়টা একটু ভাবিয়া দেখা যাউক।

যাঁহারা আধুনিক বিজ্ঞানের সম্পর্কে আসিয়াছেন, তাঁহারা তড়িদাশ্রয়ের কণ্টকিত গাত্রের সহিত কণ্টকী সিজুর তুলনা করিবেন। তড়িদ্‌বিজ্ঞানের একটা সামান্য পরীক্ষা এই যে, কোন তড়িত্বান্ বস্তুর নিকটে সূচী ধরিলে অল্পে অল্পে সেই বস্তু তড়িৎহীন হয়। যেন সূচীমুখে সেই বস্তুর তড়িৎ মাটিতে মিলাইয়া যায়। এই রূপে দেখা যায়, কণ্টকিত বস্তুকে তড়িত্বান্ করিতে পারা যায় না, কিংবা পারিলেও তাহা অল্পক্ষণে তড়িৎহীন হইয়া পড়ে। অতএব কেহ কেহ মনে করিতে পারেন, উচ্চ গৃহচূড়ায় তেকাটা মনসা রাখিলে তাহার কাঁটা পথে গৃহের উর্দ্ধস্থিত মেঘের তড়িৎ অল্পে অল্পে মিলাইয়া যায়। ফলে বজ্রপাত হইতে গৃহ রক্ষা পায়।

যাঁহারা প্রাচীনকালের সকল কথাতেই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা শুনিতে চান, তাঁহারা বজ্রদ্রুম নামে প্রফুল্ল হইবেন। তাঁহারা মনে করিতে পারেন যে, বজ্রপাত নিবারণ করে বলিয়া নাম বজ্রদ্রুম হইয়াছে। হয়ত বা এই বিশ্বাসে ছাতের উপরে বজ্রদ্রুমের অধিষ্ঠান হইয়া থাকিবে। কিন্তু বোধ করি, এত তত্ত্ব অন্বেষণ না করিয়া গাছে কাঁটা দেখিয়াই নাম বজ্রদ্রুম হইয়াছে।" কঠোরতা বুঝাইতে বজ্র শব্দের প্রয়োগ আছে। যথা, বজ্রহৃদয়, বজ্রশল্য (সজারু), বজ্র-দন্ত (ইন্দুর), ইত্যাদি।

বস্তুত মনসা গাছের বজ্রনিবারণের ক্ষমতা থাকিলে বৈশাখ জ্যৈষ্ঠের ঘোর দুর্দ্দিনে ভাবনা থাকিত না। বিদ্যুতের চকমকি ও বজ্রের গর্জ্জনে লোকে যখন ভীত হয়, তখন ছাতে বজ্রদ্রুম আছে মনে করিয়া গৃহে বসিয়া নির্ভয়ে সুখ-চিন্তা করিতে পারা যাইত। বস্তুত বজ্রদণ্ড ব্যবহারের মূলতত্ত্ব চিন্তা করিলে মনসাগাছ হইতে উপকারের আশা করিতে পারা যায় না। তেকাটা সিজ কতই বা উচ্চ হয়, এবং তড়িৎপরিচালক ক্ষমতাই বা তাহার কতটুকু?

বজ্রদণ্ড কোন্ ধাতুর, লৌহের না তাম্রের, গৃহসংলগ্ন না বিলগ্ন, হওয়া আবশ্যক, তাহাই এখনও সর্ব্বসম্মতিক্রমে নিরূপিত হয় নাই। অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন মত আছে। এই সকল মতকে দুইভাগে ভাগ করিতে পারা যায়। একমতে গৃহের উর্দ্ধস্থিত মেঘে তড়িৎ সঞ্চিত হইতে না দেওয়াই বজ্র-দণ্ডের উদ্দেশ্য। অন্যমতে সঞ্চিত তড়িতের নির্গমনপথ হওয়াই উদ্দেশ্য। প্রথম মতে, মেঘে এত তড়িৎ জন্মিতে অবসর পায় না যে, তাহা গৃহে আঘাত করিতে পারে। দ্বিতীয় মতে তড়িৎ সঞ্চয় নিবারণ করা অসাধ্য; যাহাতে গৃহ বিদীর্ণ না হয়, তাহারই কেবল উপায়বিধান কর্ত্তব্য। প্রথম মত সত্য হইলে বজ্রদণ্ড পৃথুল তাম্রনির্ম্মিত এবং গৃহের অঙ্গীভূত করা আবশ্যক। দ্বিতীয় মত সত্য হইলে তাহাকে লৌহের করা এবং গৃহ হইতে কিছু দূরে রাখা কর্ত্তব্য।

এই মতভেদের কারণ আর একটু খুলিয়া বলিলে উপ-করণের প্রভেদের কারণ বুঝা যাইবে। মেঘে যদি অল্পে অল্পে তড়িৎ জাত হয়, তাহা হইলে উচ্চ তাম্রচূড়া দিয়া কোন প্রকারে তাহা পৃথিবীর তাড়িতের সহিত মিশিয়া সাম্যভাব ধরিতে পারে। তড়িৎ পদার্থটা কি, তাহার আলোচনা থাক। এখানে কেবল কাজের কথাই হউক। মনে করুন, মেঘে ও তন্নিম্নস্থ ভূপৃষ্ঠে তড়িৎ সঞ্চিত হইয়া উভয় তড়িৎ মিলিত হইতে চেষ্টা করিতেছে। এই মিলন অল্পে অল্পে হইতে থাকিলে কোন ভয় থাকে না। যখনই হঠাৎ প্রবলবেগে উভয় তড়িৎ মিলিত হইতে যায়, তখন তাহাদের পথে কোন বাধা পড়িলে বাধাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া পোড়াইয়া গলাইয়া মিলিত হয়। মিলনের ফলে বিদ্যুৎ ও গর্জ্জনের উৎপত্তি। এই দুইই যুগপৎ উৎপন্ন হয়; আলো ও শব্দের বেগের তারতম্য হেতু আগে আলো পরে শব্দ প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। সে যাহা হউক, বাধাকে ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ফেলিয়াই তড়িৎ সাম্যভাব ধরে না। লড়াইয়ের মেড়া যেমন পুনঃ পুনঃ পরস্পর আঘাত করিতে থাকে, মেঘ ও পৃথিবীর মধ্যের তাড়িতেরও তেমনই লড়াই চলিতে থাকে। উপরিলিখিত প্রথম মতে তড়িৎতরঙ্গের ঘাত প্রতিঘাত ততটা গ্রাহ্য হয় না, দ্বিতীয় মতে উহাই বিপজ্জনক।

বোধ হয় অন্যান্য মত ভেদের ন্যায় এস্থলেও দুই মতেই সত্য আছে। যে রূপেই দণ্ড নির্ম্মিত হউক, অবশ্য কেহই অভয় দান করিতে পারে না। বাস্তবিক, অন্যান্য বিপদ নিবারণের ন্যায় বজ্রপাত নিবারণও আপেক্ষিক মাত্র। এই হিসাবে অধিকাংশ আধুনিক পণ্ডিতদিগের মতে মেঘে যাহাতে অধিক পরিমাণে তড়িৎ সঞ্চিত হইয়া থাকিতে না

পারে, তাহারই বিধান বাঞ্ছনীয়। কারণ মূল বিনাশ করিতে পারিলে ফলের আশঙ্কা থাকে না। এই জন্য তাঁহারা তাম্রের দণ্ড গৃহলগ্ন করিয়া বসাইতে উপদেশ করেন। সকলেই জানেন আমাদের সরকারি উপদেশও তাই।

লৌহ অপেক্ষা তাম্র তড়িৎপরিচালক। এইজন্য তাম্রের প্রয়োজন। ঐ তাম্র তার বা পাত এত পুরু হওয়া আবশ্যক যে বজ্রপাতে তাহা গলিয়া না যায়, কিংবা তড়িৎপথে বাধা না দেয়। বাজারের সকল তামা সমান পরিচালক নহে। তাম্রের সহিত অন্য কোন নিকৃষ্ট ধাতু মিশ্রিত থাকিলে তাম্রের পরিচালকতা হীন হয়। তড়িৎ-বিজ্ঞানের ভাষায় সমস্ত তাম্রদণ্ডের প্রতিরোধ (বাধা) ১ 'ওমের' অধিক না হয়।

পাকা বাড়ীর চিলে ছাতই বাড়ীর সর্ব্বোচ্চ অংশ। চিলে ছাতের বাহির দিকের কোণই আয়ুর্ব্বেদের ভাষায় গৃহের মর্ম্মস্থান। (বাড়ীর সকল কোণই মর্ম্মস্থান)। কথা হই-তেছে, দণ্ড ছাত হইতে কত উচ্চ করা আবশ্যক। এস্থলেও স্থূল নিয়মই সম্বল। ভূপৃষ্ঠ হইতে দণ্ড যত হাত উচ্চ, দণ্ডের চারিদিকে তত হাত ব্যাসার্দ্ধ পরিমিত স্থান রক্ষিত হয়। কেহ কেহ বলেন, ছাত ধাতুময় না হইলে দণ্ডের দ্বিগুণ ব্যাসার্দ্ধপর্য্যন্ত রক্ষিত হইতে পারে। ফরাসী মতে দ্বিগুণ না হইয়া পৌনে দুই গুণ ধরা হইয়া থাকে।

তাম্রদণ্ডের অগ্রভাগ সূচ্যাকার এবং নিম্নভাগে একখান তাম্রপট্ট থাকা আবশ্যক। দণ্ডটি গৃহের গায়েলাগিয়া থাকিবে। আলসে কার্ণিস ইত্যাদির গা দিয়া বাঁকাইয়া লাগাইবার নিমিত্ত তামার পাতই ভাল। মাটিতে আনিয়া কিছু দূরে গর্ত্ত বা কূয়া খুলিয়া নীচের সদা আর্দ্র স্তরে কিংবা সদা জলময় স্তরে কয়লারাশির মধ্যে তাম্রপট্ট প্রোথিত করা আবশ্যক। এত করিলে তবে বজ্রদণ্ড দ্বারা বজ্রপাত নিবারিত হইতে পারে।

এখানে বজ্রদণ্ডের ব্যবহারোচিত বিধি সঙ্কলন করা উদ্দেশ্য নহে। বজ্রদ্রুম দ্বারা উপকারের সম্ভাবনা আছে কি না, তাহাই দেখা উদ্দেশ্য। দেখা গেল তদ্দ্বারা কোন উপ-কারের সম্ভাবনা নাই। যদি কিছু উপকার থাকে, তাহা মনকে চোখ ঠারা। অবশ্য ইহাও কম উপকার নহে।

বিক্রমাদিত্য ও নবরত্ন।

অধিক প্রমাণ প্রয়োগ করিলে, পাঠকদিগের ধৈর্য্য-চ্যুতি হইবে ভাবিয়া, সুপণ্ডিত পাঠকগণের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা করিয়া, কবি কালিদাসের আবির্ভাবকাল এবং গ্রন্থা-বলীর কথা লিখিয়াছিলাম। কিন্তু যোগেশ বাবুর মত সুপণ্ডিত ব্যক্তি যখন বিশেষ প্রমাণ এবং নজীর পেশ করিতে আহ্বান করিয়াছেন, তখন সংক্ষেপে তাহার ৩। চারিটির উল্লেখ করিতেছি।

খৃঃ পূঃ ৫৭ যে কোন বিক্রমাদিত্যেরই রাজত্বকাল নহে; এবং মালবদেশে যে সংবৎ বহুকাল হইতে প্রচলিত ছিল, তাহাই যে মগধরাজ গুপ্তবংশীয় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য, মালবদেশ জয় করিয়া প্রচলিত করিয়া গিয়াছিলেন, তাহা হয়ত যোগেশ বাবু স্বীকার করেন। কারণ সে বিষয়ে তিনি কোন আপত্তি উত্থাপন করেন নাই।

যোগেশ বাবু যে কালিদাসকে শকুন্তলারচয়িতার শিষ্য প্রশিষ্যেরও উপযুক্ত নহে বলিয়াছেন সে কালিদাসের আবির্ভাবকাল যে একাদশ শতাব্দীতে, তাহা আমার প্রবন্ধে উল্লিখিত আছে। আনুমানিক ১০০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১০৫৯ পর্য্যন্ত ভোজদেব নামক একজন রাজপুত রাজা মালবে রাজত্ব করেন। ইহাঁর রাজধানী ছিল ধার নগরীতে, উজ্জয়িনীতে নহে। ইনি বিক্রমাদিত্যের গৌরব পুনরুদ্দীপ্ত করিবার কামনায় ধার নগরীতে একটি নবরত্নসভার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এ কালিদাস সেই নকল সভার কবি। নলোদয় পুষ্পবিলাস প্রভৃতি অপাঠ্য কাব্যগুলি তাহারই রচনা। এই সময়ের প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বের একটি খোদিত লিপি বুদ্ধগয়ায় দৃষ্ট হয়; তাহাতে উজ্জয়িনী-পতি বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। কাজেই ভোজদেবের পূর্ব্বেই যে নবরত্নসভা ছিল তাহা নিঃসন্দেহ। বাসবদত্তাপ্রণেতা সুবন্ধু ৬ষ্ঠ শতাব্দীর কবি। কনোজপতি হর্ষবর্দ্ধন ৬০৬ খৃঃ অব্দে রাজত্ব আরম্ভ করেন, ইহাঁর দ্বিতীয় নাম শীলাদিত্য; ইহাঁর পিতার নাম প্রভা-করবর্দ্ধন, এবং জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও পূর্ব্ববর্ত্তী কনোজরাজার নাম রাজ্যবর্দ্ধন। এই শীলাদিত্য এবং মালবের শীলাদিত্য যে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ব্যক্তি তাহা স্মরণ রাখা উচিত। মোক্ষমূলর

সাহেব মালবের শীলাদিত্যের সহিত কনোজের শিলাদিত্য-কে এক করিয়া অনেক গোলযোগ করিয়াছেন ; শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত পর্য্যন্ত ঐ ভুলটি আপনার ইতিহাসে সত্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কনোজের হর্ষবর্দ্ধনের রাজত্বের সময়ে যে সকল কবি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন তাঁহারা সুবন্ধুর নাম উল্লেখ করিয়াছেন। কাজেই সুবন্ধু ৬০৬এর পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। সুবন্ধুর রচনায় কবির একটি আক্ষেপ উক্তি পাওয়া যায়, যাহাতে উজ্জয়িনী-পতি এবং তাঁহার সভায় কালিদাসাদির অল্প সময় পূর্ব্বে তিরোধান হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ আছে। পুনশ্চ, ৬৩৭ খৃষ্টাব্দের খোদিত প্রস্তরলিপিতে কালিদাস এবং ভারবির উল্লেখ দেখা যায়। এই জন্য চিত্রখোদিতা এবং তাঁহার সভাসদ্গণ—বিশেষতঃ কালিদাস, যে ৬ষ্ঠ শতাব্দীর লোক এ অনুমান অসঙ্গত নহে। আরও কয়েকটি প্রমাণ দিতেছি।

গুপ্তবংশীয় কুমারগুপ্তের আবির্ভাবকাল ৪১৫ হইতে ৪৩৩এর মধ্যবর্ত্তী। যুক্তরাজ্য বা উঃ পঃ প্রদেশের আলি-গঞ্জ তহশীলের বিল্‌সড় (Bilsad) স্তম্ভলিপি হইতে ফ্লীট্ সাহেব প্রমাণ করিয়াছেন, যে কুমারগুপ্তের সময়ে বন্ধুবর্দ্ধন মালবদেশের শাসনকর্ত্তা ছিলেন। ইহাঁর পিতা দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য ৪০১ খৃষ্টাব্দে মালব জয় করেন ; কিন্তু পাটলিপুত্র পরিত্যাগ করিয়া উজ্জয়িনীতে রাজধানী স্থাপন করেন নাই। ইহাঁকে কেবল উজ্জয়িনীপতি বলিলে অপমান করা হয়।

যিনি উজ্জয়িনীতে বিক্রমাদিত্য নামে খ্যাতি পাইয়া-ছিলেন, তিনি যে কাশ্মীরের হিরণ্যরাজার সমসাময়িক একথায় প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌দিগের মধ্যে মতদ্বৈধ নাই। আমি পূর্ব্ব প্রবন্ধেই বলিয়াছি যে, বিক্রমাদিত্যপ্রেরিত মাতৃগুপ্ত ৫৫০ খৃঃঅব্দে কাশ্মীরে রাজত্ব করিয়াছিলেন। রাজ-তরঙ্গিনীতে একথার উল্লেখ আছে। ঐ রাজতরঙ্গিনীতেই বিক্রমাদিত্যকে হর্ষবিক্রমাদিত্য বলা হইয়াছে।

অশোক রাজা উজ্জয়িনী প্রভৃতি শাসন করিতে গিয়া-ছিলেন, ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় ; কিন্তু হর্ষবিক্রমাদিত্যের পূর্ব্বে উজ্জয়িনীর স্বাতন্ত্র্য বা অশেষ শ্রীবৃদ্ধির সংবাদ পাওয়া যায় না। কুমারগুপ্তের সময়ে, বন্ধুবর্দ্ধন যখন মালবের শাসনকর্ত্তা, তখন তিনিও রাজদ্রোহিতা করিয়া উজ্জয়িনীতে স্বাতন্ত্র্য স্থাপন করেন নাই। এ সময়েও পাটলিপুত্র গৌরব-পূর্ণ ; এবং মগধের রাজাই ভারতের মহারাজাধিরাজ। উজ্জয়িনীসম্পর্কের আর একটি কথা বলিয়া রাখি। কালি-দাসের সময়ে উজ্জয়িনী অতীব সমৃদ্ধিশালিনী নগরী হইলেও, মগধরাজার মহারাজত্ব অক্ষুণ্ণ ছিল। এই জন্যই ইন্দুমতীর স্বয়ংবরে, ইন্দুমতী সর্ব্বপ্রথমে মগধরাজের নিকটে নীত হইয়াছিলেন (রঘুবংশ ৬ষ্ঠ সর্গ, ২০ শ্লোক)। মৃচ্ছকটিকের কাল নিরূপণের জন্যও একথাটার উপযোগিতা আছে।

নবরত্নের মধ্যে অমরসিংহ যে ৬ষ্ঠ শতাব্দীর ব্যক্তি, তাহার দুইটি প্রমাণ পাওয়া যায়। ১ম ঐ শতাব্দীতে অমরসিংহ বুদ্ধগয়ার মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন ; ২য়, ৬ষ্ঠ শতা-ব্দীতেই চীনদেশীয় বৌদ্ধেরা অমরসিংহের অনেক রচনা অনুবাদ করিয়াছিল। একথা দেশীয় প্রবাদের অনুরূপ ; কারণ অমরসিংহ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বলিয়া বিখ্যাত। বরাহ-মিহিরের আবির্ভাবকাল ৫০৫ বলিয়া যোগেশ বাবু স্বীকার করিতেছেন ; এরূপ স্থলে তাঁহার সহিত আমার কথার অধিক পার্থক্য রহিল না। আমি বলিতে চাই যে, ৫০৫ বরাহমিহিরের জন্মবৎসর, এবং ৫৮৭ তাঁহার তিরোভাব-কাল। নজীর, রয়াল এসিয়াটিক সোসাইটির নবপ্রবর্ত্তিত (new series) জর্ণালের প্রথম ভাগের ৪০৭ পৃষ্ঠা। বর-রুচি প্রাকৃত ব্যাকরণ রচনা করিয়া গিয়াছেন। প্রাকৃত ভাষা গুপ্ত রাজাদিগের সময়ে বর্দ্ধিত হইতেছিল, তাহা স্বীকার করি ; কিন্তু ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে সর্ব্বাঙ্গ পূর্ণ হয় নাই। কাজেই বররুচিকেও ৬ষ্ঠ শতাব্দীর ব্যক্তি বলিলেই বেশী যুক্তিযুক্ত হয়। যাঁহারা নাট্যসাহিত্যের প্রাচীনতার আলোচনা করিবেন, তাঁহাদেরও স্মরণ রাখা উচিত যে, প্রাকৃত ভাষাপূর্ণ কোন নাটকই খৃষ্টোত্তর ৫ম শতাব্দীর পূর্ব্বে রচিত হইতে পারে নাই।

যে সময়ে উজ্জয়িনী পাইলাম, এবং উজ্জয়িনীর অধিপতি বিক্রমাদিত্য পাইলাম, ঠিক সেই সময়েই কালিদাস, বরাহ-মিহির, বররুচি এবং অমরসিংহকে পাইতেছি। এই জন্যই ৫৫০ খৃষ্টাব্দে নবরত্নসভা-সম্বলিত উজ্জয়িনীপতি হর্ষবিক্রমা-দিত্যের অভ্যুদয় বলিয়াছি।

সাবধানতার হিসাবে, গুপ্তবংশীয় বিক্রমাদিত্যদ্বয়ের সম্বন্ধে আর একটি কথা বলিয়া রাখি। ঐ বংশ নীচশূদ্রবংশ বলিয়া বিষ্ণুপুরাণকার লিখিয়াছেন। গুপ্ত উপাধিটাও বৈশ্য জাতির উপাধি। উঁহারা যে উচ্চবংশীয় নহেন, তাহার আর এক প্রমাণ এই, যে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্য, নেপালের লিচ্ছবিবংশীয় কুমারদেবাকে বিবাহ করিয়া এতটা গৌরবান্বিত বোধ করিয়াছিলেন যে তাঁহার এবং তাঁহার পৌত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের অনেক প্রস্তরলিপিতে এই গৌরবের কথা খোদিত হইয়াছে। ইঁহারা বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন না তাহা সত্য; কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে কেহই কখনও কোন দেবালয় বা প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করেন নাই। যাহা অন্যত্র কোথাও করেন নাই, তাহা যে কেবল উজ্জয়িনীতে করিয়াছিলেন, একথা বলা যায় না।

হৃতগৌরব বৌদ্ধদিগের নিকট হইতে হিন্দুরা যে প্রতিমাপূজা এবং দেবালয় ধার করিয়া লইয়াছিলেন, কালিদাসের সময়ে তাহা সুপ্রতিষ্ঠিত। পৌরাণিক ধর্ম্ম তখন জয় লাভ করিয়াছে। চতুর্থ শতাব্দীতেই হিন্দুরা দেবালয়ের সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিয়াছিল, তাহা মানি। কারণ ঐ সময়ের বিধিবদ্ধ মনুসংহিতায় (আমি প্রাচীন মনুসূত্রের কথা বলিতেছিনা) দেবালয়ের পূজক ব্রাহ্মণকে হেয় বলিয়া কটাক্ষ করা হইয়াছে। নূতন বৌদ্ধ অনুকরণ বলিয়াই এপ্রকার তীব্রতা। কিন্তু কালিদাসের সময়ে উজ্জয়িনী নগরীতে, ঢাক বাজাইয়া দেবমন্দিরে মহাকালের পূজা চলিয়াছিল। মন্দির এবং অন্যান্য খোদিত লিপি হইতে এ কথা প্রত্নতত্ত্ববিদেরা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, যে ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে, এদেশে বিস্তৃতভাবে হিন্দুদেবালয় এবং প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত হয় নাই।

যাঁহার রত্নপরীক্ষা গ্রন্থ, শীঘ্রই বঙ্গসাহিত্যের গৌরব বর্দ্ধন করিবে, তাঁহার কাছে খাঁটি রত্নের কথা কহিবার ধৃষ্টতা আমার নাই। তবে মনে হয় যে রত্ন কথাটা যখন পণ্ডিতগণের প্রতি রূপকে আরোপিত, তখন নয় জন বড় পণ্ডিত ছিলেন বলিয়াই, নবরত্ন নাম হইয়া থাকিবে। তখন যদি নয়টি রত্নের আবিষ্কার না হইয়াও থাকে, তাহা হইলেও বিক্রমাদিত্য বলিতে পারিতেন, "দেখ, পৃথিবীতে 'সত্যিকার' রত্ন ৪।৫টি ভিন্ন নাই, কিন্তু আমার সভা নবরত্নগঠিত!"

এ পর্য্যন্ত সকল ইউরোপীয় পণ্ডিতেরাই বলিয়া আসিয়াছেন যে মালবিকাগ্নিমিত্র কালিদাসের নহে; কিন্তু বিক্রমোর্ব্বশী কালিদাসের। দেশীয় পণ্ডিতেরাও প্রায়শঃ এই মতাবলম্বী। আমার এই বিষয়ে অন্যরূপ ধারণা হইয়াছে বলিয়াই একথাটা লিখিয়াছি। ঐতিহাসিক যৎকিঞ্চিৎ পড়িয়া আঁচে বোধ হইতেছে যে অক্ষয় বাবুর মত সুযোগ্য ব্যক্তিও বুঝি ঐরূপ কথা প্রমাণিত করিতে সচেষ্ট হইবেন। স্নেহাস্পদ শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী, তাঁহার দক্ষিণাপথভ্রমণে বিক্রমোর্ব্বশী কালিদাসের নহে বলিয়া সন্দেহ করিয়াছেন; কিন্তু কোন প্রমাণাদি দেন নাই। দিলে ভাল হইত। তিনি সুপণ্ডিত; কাজেই কথা লইয়া পণ্ডিতে পণ্ডিতে কথা হইত; আমাকে এতটা কষ্ট পাইতে হইত না।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

যাচনা।

দেবী! চির-অসম্পূর্ণ কাহিনীর মত
ব্যাকুল রাখিও পরাণি;
অকূল নদীর তীর-রেখা মত
থেকো, আবেগে বহিব যখনি।

দেখো, দীপ্ত যৌবনের রহস্যের মত,
মোর দুকূল ভরিয়া থাকি';
ফোটো, ধরণী যেমন জাগে গো বসন্তে
নিজ পূর্ণতায় চমকি'।

জেগো, চির-অনুদ্দেশ পথরেখা মত
মোর দূর দূরান্তর ভরিয়া:
এস, নিজ মহিমায়, চির-নীরব
আকাশের মত নামিয়া!

দাড়ায়ো, প্রথম জাগ্রত সৌন্দর্য্যের মত,
আপনা-প্রকাশে বিস্মিত:
বীণার প্রথম সুরটীর মত
মধুর সরমে জড়িত।

যথা ভাবের বাণীটি কবির গাথায়,
জেগো তেমনি আমার নয়নে;
প্রেমের প্রথম পুলক মতন
ওগো, চিরদিন এসো স্মরণে।



মাতৃদেবী মূর্ত্তি।

র‍্যাফেএলের সিষ্টিন ম্যাডোনা] [Raphael's Sistine Madonna

Photograph by the Photographische Gesellschaft, Berlin.

Duotype blocks by U. Ray.

প্রবাসী

দ্বিতীয় ভাগ। { ভাদ্র, ১৩০৯। } ৫ম সংখ্যা।

ভারতে প্রাচ্যপ্রতীচ্যের সংমিশ্রণ।

নিবিষ্টচিত্তে চিন্তা করিলে সকলেই অনুভব করিতে পারিবেন যে বর্ত্তমান যুগে, বঙ্গদেশে, আমরা যে সকল ব্যক্তিকে আমাদের জাতীয় জীবনের সারথ্যকার্য্যে বরণ করিয়াছি, তাঁহারা সকলেই স্বীয় স্বীয় চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষাতে পূর্ব্ব ও পশ্চিমকে সম্মিলিত করিয়াছেন। একে একে এই কথার প্রমাণ প্রদর্শন করিতেছি।

শিক্ষিত বাঙ্গালির আদর্শ পণ্ডিত কে? কোন্ পণ্ডিতকে শিক্ষিত বাঙ্গালি হৃদয়ের সর্ব্বোচ্চ স্থানে পূজা করিতেছেন? কাহার উক্তি মনোযোগসহকারে আলোচনা করিতেছেন? সকলে ভাবিয়া দেখুন; এখনও নবদ্বীপে খ্যাতনামা পণ্ডিত অনেক রহিয়াছেন; শেরপুরের সুপ্রসিদ্ধ চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় এখনও কলিকাতা রাজধানীতে বিরাজ করিতেছেন; তাঁহাদের কাহাকেও কেন নব্য শিক্ষিত বাঙ্গালিদের কেহ ভাবী ভারতের সারথ্যে নিযুক্ত করিতেছেন না? এমন কি হিন্দুধর্ম্মের পুনরুজ্জীবনপ্রয়াসী শিক্ষিত ব্যক্তিরাও কেন আপনাদের সারথি করিতেছেন না? এই জন্য কি নহে, যে এই সকল পূজ্যপাদ পণ্ডিতাগ্রগণ্য ব্যক্তি মহামহোপাধ্যায় হইলেও ভাবী ভারত সম্বন্ধে তাঁহাদের কোনও বাণী নাই; কোনও নূতন কথা নাই। তাঁহারা সম্পূর্ণ রূপে প্রাচীনে নিবদ্ধ; নবীনের জন্য তাঁহাদের কিছু বলিবার বা করিবার নাই। তবেই দেখিতেছি যাঁহারা প্রাচীন প্রাচীন করিতেছেন, তাঁহারাও সম্পূর্ণ প্রাচীন চাহিতেছেন না। শশধর তর্কচূড়ামণি পাণ্ডিত্যবিষয়ে ইঁহাদের পদতলে বসিবার যোগ্য লোক না হইলেও 'নব্যহিন্দু'দের সারথ্যকার্য্যে এই জন্য বৃত হইয়াছিলেন যে তিনি হিন্দুধর্ম্মের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, অর্থাৎ প্রাচ্যের বোতলে প্রতীচ্যের সুরা কিয়ৎপরিমাণে ঢালিবার প্রয়াস পাইয়াছিলেন। যাঁহাদের চিন্তাতে প্রতীচ্যের একটু গন্ধ নাই, তাঁহারা মহা পুনরুজ্জীবনপ্রয়াসীদেরও সারথি হইতে পারিতেছেন না।

নব্য শিক্ষিত বাঙ্গালি কি ভাবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়কে দেখেন, তাহা একবার চিন্তা করুন। পণ্ডিতকুলের মধ্যে বিদ্যাসাগর মহাশয় আমাদের হৃদয়ের সর্ব্বোচ্চস্থানে উপবিষ্ট আছেন, বলিলে কি অত্যুক্তি হয়? আমার বোধ হয় হয় না। জিজ্ঞাসা করি কেন তিনি শিক্ষিত বাঙ্গালির হৃদয়ের সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছেন? তাঁহার ন্যায় সংস্কৃত বিদ্যাতে পারদর্শী ও প্রাচীন শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন লোক ছিল না বলিয়া কি? কখনই নহে। আমরা সকলেই জানি, যে সংস্কৃত কলেজে তিনি পাঠ করিয়া কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন, সেই কলেজেই তাঁহার গুরুস্থানীয়, তারানাথ তর্কবাচস্পতি, জয়নারায়ণ তর্কপঞ্চানন, ভরতচন্দ্র শিরোমণি, প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশ প্রভৃতি পণ্ডিতগণ ছিলেন; বিদ্যাসাগর মহাশয় সংস্কৃত বিদ্যাতে বা প্রাচীন শাস্ত্রজ্ঞানে তাঁহাদের সমকক্ষ হওয়া দূরে থাকুক নিকটেও পৌঁছিতে পারেন নাই। তবে কেন পণ্ডিতকুলের মধ্যে বিদ্যাসাগর আমাদের সারথি? তাহা এই জন্য যে তিনি প্রাচ্য জ্ঞান ও প্রাচ্যানুরাগের ভিত্তির উপরে প্রতীচ্য জ্ঞান ও প্রতীচ্য আকাঙ্ক্ষাকে স্থাপন করিয়াছিলেন। এই এক পণ্ডিত, যিনি নিজের বিদ্যা ও অনুরাগে এদেশীয় হইয়াও নিজ কার্য্যে ও আকাঙ্ক্ষাতে

প্রতীচ্যভাব ধারণ করিয়াছিলেন; এই জন্য শিক্ষিতদলে তাঁহার আদর, ভাবী ভারতের আনয়ন বিষয়ে তাঁহার সারথ্য।

জাতীয় সাহিত্যের বিষয়ে চিন্তা কর। কাহাকে সারথ্য কার্য্যে বৃত দেখিতেছ? গদ্যসাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র, কাব্য-সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ। বঙ্কিম এরূপ শীর্ষস্থানে উঠিলেন কিরূপে? এই জন্য কি নহে যে তিনি প্রবল প্রাচ্যানুরাগের সহিত প্রতীচ্য চিন্তাকে মিশ্রিত করিয়াছেন? তাঁহার ধর্ম্ম-তত্ত্ব ব্যাখ্যা যাঁহারা মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই কি অনুভব করেন নাই যে তাঁহার ধর্ম্মতত্ত্ব আর কিছুই নহে, দেশীয় পরিচ্ছদে বিদেশীয় চিন্তা মাত্র, কৃষ্ণচরিত্রের পক্ষপুটের মধ্যে মিলের হিতবাদ। চিন্তা ও ও আকাঙ্ক্ষাতে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমাবেশ শিক্ষিতদলের নিকট তাঁহার সাহিত্যের প্রধান আকর্ষণ।

রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা কি লক্ষ্য করেন নাই যে তাঁহার কাব্যসকলে, বহুল পরি-মাণে প্রতীচ্য ভাব ও আদর্শ প্রাচ্য ছাঁচে ঢালা। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমাবেশ তাঁহারও প্রধান আকর্ষণ।

এক সময় স্বর্গীয় কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ধর্ম্মসম্বন্ধে শিক্ষিতদলের সারথ্যকার্য্যে বৃত হইয়াছিলেন। তাহার কারণ এই ছিল, তিনি বুলিয়াছিলেন যে প্রতীচ্য ধর্ম্মভাবকে প্রাচ্য জীবনে স্থাপিত করিব, এবং প্রাচ্য ধর্ম্মভাবকে প্রতীচ্য আদর্শের সহিত মিলিত করিব। ইহাও সেই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংমিশ্রণ। এখন বোধ হয় প্রাচ্য ধর্ম্মভাবের বিকাশের দিকে শিক্ষিত দলের কিঞ্চিৎ অতিরিক্ত ঝোঁক হওয়াতে তাঁহারা কেশবচন্দ্র সেন হইতে সরিয়া পড়িয়াছেন।

পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত সকলের দ্বারা আমি ইহাই প্রতিপন্ন করিতে চাহিতেছি, যে কেহ, তিনি বক্তাই হউন, লেখকই হউন, ধর্ম্মপ্রচারকই হউন, প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে স্বীয় চিন্তা ও আকাঙ্ক্ষাতে সন্নিবিষ্ট করিতে না পারিবেন, তিনি শিক্ষিতদলের সারথি হইতে পারিবেন না। ভাবী ভার-তের গঠনের বিষয়ে দুই দিকের দুই দলের কোনও কাজ দেখা যাইতেছে না। প্রথম, যাঁহারা বলেন এদেশে প্রাচীনে যাহা ছিল বা বর্ত্তমানে যাহা আছে, তাহাই ভাল, তদ-তিরিক্ত দেখিবার বা লইবার উপযুক্ত ভাল কিছু অন্য কুত্রাপি নাই। দ্বিতীয়, যাঁহারা বলেন পশ্চিমে যাহা আছে, তাহা সকলই ভাল; তাহার কিছু বর্জ্জন বা পরিহার করিবার মত নাই; এবং এদেশে যাহা ছিল বা আছে তাহাতে রাখিবার মত কিছু নাই। অর্থাৎ নব্য শিক্ষিত বাঙ্গালিগণ একদিকে টিকিধারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, অপরদিকে হেটকোটধারী বিলাত-ফেরত বাঙ্গালি সাহেব, উভয়কেই অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেছেন। তাঁহাদের নিকট হিন্দুধর্ম্মের প্রচারক হইতে গেলে তাঁহার বিবেকানন্দের মত হওয়া চাই, অর্থাৎ যিনি চান প্রতীচ্যভাব ও আদর্শ, দোহাই দেন প্রাচীন ভারতের ও বেদান্তের।

এই দোহাইটা একটা বড় কথা। যিনি সকল কথায় কেবল পশ্চিমের দোহাই দেন, তিনি কাজে প্রকাশ করেন যে তাঁহার বিবেচনায় দোহাই দিবার মত এদেশে কিছুই নাই। তা কেন? আমাদের কি দোহাই দিবার মত কিছুই নাই? আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যে শাখা-প্রশাখা-সমন্বিত প্রকাণ্ড একটা সভ্যতা সৃষ্টি করিয়া তুলিয়াছিলেন, তাঁহারা কি দোহাই দিবার মত কিছুই রাখিয়া যান নাই? এরূপ যিনি মনে করেন, তাঁহার চিন্তা বিকৃত শিক্ষার ফল। ধনীর ঘরের শিশুরা যেমন সূতিকাগৃহ হইতে বাহির হই-য়াই ধাইমার স্তন্যে মানুষ হয়, এবং শেষে স্তন্য বলিতে ধাইমার স্তন্যই বোঝে, ইহাও সেই প্রকার। শৈশব ঘুচিতে না ঘুচিতে প্রতীচ্য ভাব ও চিন্তার স্তন্যে বর্দ্ধিত হইয়া এই সকল ব্যক্তির মনে চিন্তা বলিলেই প্রতীচ্য চিন্তার কথাই মনে হয়। শিক্ষার এই বিকৃত ফল অতীব শোচনীয়। আমি বলিতেছি, এদেশে দোহাই দিবার উপযুক্ত অনেক বিষয় আছে। তাহা পরে নির্দ্দেশ করিতেছি।

আসল কথাটা যেন ভুলিয়া না যাই। ইহা সকলকেই পরিষ্কার করিয়া বুঝিতে হইবে যে যাঁহারা আপনাদের চিন্তা, ভাব ও কার্য্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সমাবেশ করিতে না পারিবেন, ভাবী ভারতসম্বন্ধে তাঁহাদের কার্য্য নাই, এবং শিক্ষিতদলের সারথ্যে তাঁহারা বৃত হইবেন না।

এখন প্রশ্ন এই, এই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সংমিশ্রণ কিরূপে হইবে? উপরে উপরে দেখিতে গেলে বাহিরের জীবনে উক্ত সংমিশ্রণ ত প্রতিদিন, প্রতি মুহূর্ত্তে, ঘটিতেছে। তুমি আমি না চাহিলেও ঘটিতেছে। জাতীয় জীবনের শত রন্ধ্র দিয়া পাশ্চাত্য ভাব ও পাশ্চাত্য আদর্শ আমাদের

দৈনিক জীবনে প্রবেশ করিতেছে। ইতিমধ্যেই আমরা টেবলটি না হইলে লিখিতে পারি না; প্রাতে চাদানি, পেয়ালা, পিরিজ, চামচেটী চাই; আহারে পশ্চিম ধরণের চপ, কাবাব, আমোদে পশ্চিম ধরণের থিয়েটার, পরিচ্ছদে পশ্চিম ধরণের কাট কুট, বৈঠকখানাতে পশ্চিম ধরণের সাজ সজ্জা, এ সমুদয় চাই। এমন কি বাড়ী ঘর নির্ম্মাণের প্রণালীও পশ্চিমের হাওয়াতে বদলিয়া যাইতেছে।

এত গেল বাহিরের কথা। জাতীয় জীবনের অন্তস্তম তলে-ও প্রতীচ্য চিন্তার ধাক্কা লাগিতেছে। আমাদের রাজনীতি পাশ্চাত্য, আইন আদালত পাশ্চাত্য, বিদ্যালয় শিক্ষাপ্রণালী প্রভৃতি পাশ্চাত্য, যাতায়াতের যানবাহনাদি পাশ্চাত্য, গ্রামে ডাকপেয়াদা ও পোষ্টাফিস পাশ্চাত্য;—দেখ পাশ্চাত্য আদর্শ ও পাশ্চাত্য ভাব, অজ্ঞ, মূর্খ, গ্রাম্যজনেরও মনের দ্বারে দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। ফলস্বরূপ হিন্দুর জীবনের প্রাচীন প্রাচীরসকল ভগ্ন হইয়া যাইতেছে। আহার বিহারে জাতি ভাঙ্গিতেছে; একান্নভুক্ত পরিবারপ্রথা তিরোহিত হইতেছে; মোকদ্দমাপ্রবৃত্তি, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, জাল প্রভৃতি বাড়িতেছে; কৌলীন্যপ্রথা তিরোহিত হইতেছে; সমাজের প্রাচীন নিয়ম ও শৃঙ্খলাসকল চূর্ণ হইয়া যাইতেছে। এই সকল পরিবর্ত্তন দেখিয়া যাঁহারা ভীত হইয়া যে কোনও প্রকারে হউক প্রাচীনকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইতেছেন, তাঁহাদের একটি বিষয় স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য। সেটী এই—প্রাচীন সমাজে সমাজরক্ষা ও সমাজশাসনের জন্য যে সকল শক্তি বিদ্যমান ছিল, সেই সকল শক্তিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে না পারিলে প্রাচীন শৃঙ্খলা ও প্রাচীন ভাবসকলকে পুনরানয়ন করিতে পারা যাইবে না। ইহা সকলেই জানেন প্রাচীন সমাজ জাতিভেদপ্রথা ও ব্রাহ্মণদিগের প্রভুত্ব এই উভয় প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত হইত। ব্রাহ্মণগণ জাতিভেদপ্রথাকে অস্ত্রস্বরূপ হস্তে লইয়া সমগ্র সমাজের রক্ষা ও শাসন করিতেন। তাহাতেই প্রাচীন সমাজ সুরক্ষিত ও সুশাসিত থাকিত। যাঁহারা হুবহু প্রাচীনকে পুনরানয়ন করিতে যাইতেছেন, তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা কি ব্রাহ্মণের প্রভুত্বকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারিবেন? যদি বলেন কেন পারিব না? তবে জিজ্ঞাসা করি কোন্ ভিত্তির উপরে স্থাপন করিবেন? প্রাচীনকালে রাজশক্তি ব্রাহ্মণশক্তির সহায় ও অনুকূল ছিল। রাজারা ব্রাহ্মণদিগের পৃষ্ঠপোষক হইয়া তাঁহাদের শক্তিকে প্রবল রাখিতেন। প্রাচীনের পুনরানয়নপ্রয়াসিগণ কি রাজশক্তিকে ব্রাহ্মণের অনুকূল করিতে পারিবেন? তাহাত সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। তৎপরে ব্রাহ্মণগণের শক্তির আর একটী প্রধান ভিত্তি ছিল বিদ্যা ও আধ্যাত্মিকতা। উক্ত উভয় বিষয় অর্থাৎ বিদ্যা ও ধর্ম্মচর্চ্চা তাঁহাদের একচেটিয়া ছিল, তাহাতে অপর জাতির অধিকার ছিল না। ইহাই তাঁহাদের শক্তির প্রধান কারণ ছিল। ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন। এখন জিজ্ঞাসা করি, প্রাচীনের পক্ষপাতিগণ কি বিদ্যা ও ধর্ম্মচর্চ্চাকে ব্রাহ্মণের একচেটিয়া করিয়া দিতে পারিবেন? তাহাও ত সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। সুতরাং প্রাচীনের অনুরাগী যতই হওনা কেন, প্রাচীন হাতের বাহির হইয়া পড়িয়াছে, সে আরম্ভতর ভিত্তি ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। তবে এখন কর্ত্তব্য কি? আমরা কি হাত পা ছাড়িয়া স্রোতে অঙ্গ ঢালিব অথবা প্রাচীনের সকলই ভাঙ্গিয়া যাক বলিয়া উপেক্ষা করিব? তাহা কেন? আমাদের কিছু করিবার আছে। আমাদিগকে আস্তিক হইতে হইবে। নাস্তিকের মত জীবনকে দেখিলে চলিবে না। এই যে তুমি আমি এ জগতে রহিয়াছি, এই যে প্রতিদিনের সুখ দুঃখ আশা নিরাশার মধ্যে আন্দোলিত হইতেছি, এই যে প্রবৃত্তিকুলের তাড়নাতে অস্থির হইতেছি, ঘটনার পর ঘটনা, অবস্থার পর অবস্থা দেখিতেছি, মনে কি কর এ রঙ্গক্ষেত্রে তুমি আমি এবং তোমার আমার প্রবৃত্তি ও বাসনা ভিন্ন আর কেহ নাই? আর এক জন তোমার আমার অন্তরে বাহিরে, সকল আন্দোলন ও ঘটনার মধ্যে রহিয়াছেন। ইংরাজ কবি শেক্‌স্‌পীয়র ঠিক বলিয়াছেন—

> There is a Divinity that shapes our ends
> Roughhew them as we will.

তোমার আমার সঙ্গে আর এক জন রহিয়াছেন। কেবল ব্যক্তিগত ভাবে তোমার আমার সঙ্গে নহে, জাতি সকলের উত্থানপতনের মধ্যেও সেই জন রহিয়াছেন। জাতি সকল অন্ধপ্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া যুদ্ধ বিগ্রহ, মিত্রতা সন্ধি, বাণিজ্যবিস্তার, সাম্রাজ্যস্থাপন, প্রভৃতি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে, কিন্তু সেই জন এই সকল কার্য্যকে মঙ্গলময় উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োগ করিতেছেন। ইংরাজগণ বাণিজ্যলোলুপ হইয়া

যখন এদেশে আসিয়াছিলেন, তখন জানিতেন না যে তাঁহাদের স্বার্থপ্রণোদিত কর্ম্ম হইতে বিধাতার বিচিত্র বিধানে এদেশের পক্ষে এক নবযুগের সূচনা হইবে। প্রাচ্যপ্রতীচ্যের অদ্ভুত সংমিশ্রণ এই যুগের প্রধান লক্ষণ। আমরা অতি প্রাচীন জাতি, আমাদের জ্ঞানসম্পদ অতি প্রাচীন, আমাদের বিশেষত্ব যেখানে তাহা আমাদের প্রাচীন সম্পত্তি, তাহাতে আমরা জগতে অদ্বিতীয়; কিন্তু তাহা বলিয়া ইহা কেহ বলিবেন না, যে সেই বিশেষ সম্পত্তি এই প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সুসভ্য সময়ে আমাদিগকে পুনরায় মহত্ব প্রদানে সমর্থ। আমাদের সেই বিশেষত্বের এমন একটা দিক ছিল, যে দিকে তাহা অঙ্গহীনতাদোষে দূষিত। তাহার সঙ্গে আরও কিছু যোগ হওয়া চাই, যাহা হইলেই আমরা বর্ত্তমান সময়ে মাথা তুলিয়া আবার দাঁড়াইতে পারি। সেটা যে কি তাহা নির্দ্দেশ করিতেছি।

মনোবিজ্ঞান বা ধর্ম্মতত্ত্বসম্বন্ধীয় গভীর প্রশ্নে অবতরণ করিবার ইচ্ছা নাই। যাহা বলিব তাহা স্থূলভাবে ও সংক্ষেপেই বলিব। ভারতীয় ধর্ম্মচিন্তার প্রধান লক্ষণ বিষয়ে বিরাগ। ব্রহ্ম নিত্য বিষয় অনিত্য, ব্রহ্ম সত্য বিষয় ছায়া, অতএব বিষয় হইতে বিনিবৃত্ত হইয়া ব্রহ্মে স্থিত হও, এই আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপদেশ। আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা আত্মাতে পরমাত্মাকে দেখা। বিষয়বিমুখতা এই আকাঙ্ক্ষার অনিবার্য্য ফল। কিন্তু বিষয়বিমুখতা হইতেই সমাজবিমুখতা উৎপন্ন হইয়াছে। আত্মাতে পরমাত্মাকে দেখিতে হইলেই ধ্যানপরায়ণ হইতে হয়, চিত্তবৃত্তি নিরোধদ্বারা আত্মাকে আত্মস্থ করিতে হয়, এই জন্য ভারতীয় ধর্ম্মজীবনে ধ্যানপরায়ণতাই ফুটিয়াছে। জন-সমাজ ও জনসমাজের কার্য্যকলাপ মায়াবাদের চক্ষে অনিত্য ও অসার, সুতরাং তাহাও বর্জ্জনীয়। এইরূপে সমাজ-বিমুখতা ভারতীয় ধর্ম্মভাবের একটা প্রধান লক্ষণ দাঁড়াইয়াছে।

সমাজবিমুখতা যেমন এতদ্দেশীয় উন্নত ধর্ম্মভাবের লক্ষণ, সমাজমুখীনতা তেমনি পাশ্চাত্য ধর্ম্মভাবের লক্ষণ। যীশুর ধর্ম্ম সামাজিক ধর্ম্ম, ইহার প্রধান লক্ষ্য জনসমাজে ঈশ্বরের রাজ্য স্থাপন। সুতরাং জনসমাজকে উন্নত ও পবিত্র করা পাশ্চাত্য ধর্ম্মের প্রধান আকাজ্ঞা। প্রাচীন হিন্দুর ধর্ম্মের সাধনক্ষেত্র নির্জ্জন গিরিকন্দরে; যীশুর ধর্ম্মের সাধনক্ষেত্র জনসমাজের পাপতাপের মধ্যে। দুই এ কেমন বিভিন্ন!

আমরা দুই রাজ্যে কেমন দুইটা কথা শুনিতেছি। এক জনেরা বলিতেছেন ব্রহ্মবস্তুই নিত্যবস্তু, আধ্যাত্মিকতাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবস্থা, অপর জনেরা বলিতেছেন, মানবের সেবাই ঈশ্বরের সেবা। এক দলের মধ্যে অনাসক্তি ফুটিয়াছে, আর দলের মধ্যে নরসেবা ফুটিয়াছে। বল দেখি এই উভয়ের সংমিশ্রণ আবশ্যক কিনা? অতিরিক্ত বিষয়সুখাসক্তি বর্ত্তমান ইউরোপের সর্ব্বপ্রধান ব্যাধি, নর-সেবাতে অরুচি আমাদের প্রাচীন ধর্ম্মভাবের প্রধান অভাব। উভয়ের সংমিশ্রণে উভয়ের অভাব দূরীভূত হইয়া সর্ব্বাঙ্গীন জীবন গঠিত হইতে পারে। ইউরোপকে বলা আবশ্যক, "কর কি, বিষয়সুখের নেশায় এত মাতিও না, বিষয় ত অনিত্য, এক আত্মবস্তুই নিত্য ও সত্য; জীবনের সুখের সামগ্রী অপেক্ষা জীবনের মূল্য অধিক; পেটভরা অপেক্ষা আধ্যাত্মিক উন্নতি অধিক বাঞ্ছনীয়; দেহের স্বাস্থ্য অপেক্ষা আত্মার উৎকর্ষ অধিক বাঞ্ছনীয়।" আবার প্রাচীন ভারতকে বলা উচিত,—"কর কি, বিষয়বিমুখ ও সমাজবিমুখ হইয়া আত্মসুখে মগ্ন থাকাই ধর্ম্মের চরম অবস্থা নয়, নর-সেবাই ঈশ্বরের সেবা। শত সহস্র লোক দুর্ভিক্ষে মরিতেছে; সহস্র সহস্র বালকবালিকা পিতৃমাতৃহীন হইতেছে; নরনারী পাপতাপে জর্জ্জরিত হইতেছে; তাহাদের দুঃখ নিবারণে ও উদ্ধারসাধনে বদ্ধপরিকর হও; সামাজিক উন্নতির সর্ব্ববিধ উপায় অবলম্বনকে ধর্ম্মের একটা প্রধান সাধন বলিয়া মনে কর।"

অতিরিক্ত বিষয়সুখাসক্তিকে যে বর্ত্তমান পাশ্চাত্য জগতের ব্যাধি বলিয়াছি, তাহা সকলেই লক্ষ্য করিতেছেন। এক সময় ছিল যখন পাশ্চাত্য সমাজে ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মসমাজের প্রাবল্য ছিল। ভারতীয় ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় ধর্ম্মাচার্য্যগণ রাজাদিগকেও শাসন করিতেন। কিন্তু লুথরের প্রতিবাদবাণীর পর হইতে ধর্ম্মাচার্য্য ও ধর্ম্মসমাজ সকলের শক্তি দিন দিন হ্রাস হইয়া ও বিষয়চিন্তার প্রবলতা হইয়া দিন দিন বিষয়সুখলালসা বাড়িয়া যাইতেছে। অতৃপ্ত ও অতর্পণীয় ভোগাকাঙ্ক্ষা প্রজ্জ্বলিত অনলের ন্যায় দিনরাত্রি জ্বলিতেছে; ভোগের সামগ্রী যতই সঞ্চিত হইতেছে, ততই সেই অগ্নি

অধিকতর জলিয়া উঠিতেছে। ভারতের প্রাচীন আচার্য্যগণ বলিয়াছেন—

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি
হবিষা কৃষ্ণবর্ম্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে ॥

অর্থ -"কামনার বিষয় পাইলে কামনা শান্ত হয় না, বরং ঘৃতাহুতি পাইলে অগ্নি যেরূপ বর্দ্ধিত হয় সেইরূপ বর্দ্ধিত হইয়া থাকে।"

এই উক্তির প্রমাণ যিনি দেখিতে চান, তিনি বর্ত্তমান পাশ্চাত্য জগতের প্রতি দৃষ্টিপাত করুন। কি প্রজ্জলিত ভোগলালসা !! কি অতর্পণীয় বিষয়সুখস্পৃহা ! জ্ঞান বল, বিজ্ঞান বল, সাক্ষাৎ বা পরম্পরা সম্বন্ধে যাহা মানবের দৈহিক দুঃখনিবৃত্তি বা দৈহিক সুখবৃদ্ধির সহায় হইবে না, সে জ্ঞান বিজ্ঞানের আদর নাই ! বিজ্ঞানের কোনও নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইলেই প্রথম প্রশ্ন এই উঠে তাহাতে পৃথিবীতে সুখে বাস করিবার পক্ষে কতটা সাহায্য করিবে ? পাপ অপেক্ষা রোগের ভয় এত অধিক যে স্বাস্থ্যের উপায় নির্দ্ধারণার্থ পাপানুষ্ঠান গর্হিত বলিয়া বোধ হইতেছে না।

ভোগবাসনার এই গতি দেখিয়াই ভারতীয় প্রাচীন আচার্য্যগণ পরিষ্কার করিয়া বুঝিয়াছিলেন, যে ভোগবাসনার চরিতার্থতা অন্বেষণ করা অপেক্ষা আত্মসংযমের অভ্যাস করাই ভাল। তুমি তোমার প্রবৃত্তিকুলের মুখে আবশ্যকমত লাগাম দিতে শিখ। সকলের সকল বাসনা ত চরিতার্থ হইতে পারে না ; এক স্থানেত সীমা নির্দ্দেশ করিয়া চিত্তকে ধারণ করিতে হয়, নতুবা আপনার আগুনে আপনি পুড়িয়া মরিতে হয়। তবে আত্ম-নিগ্রহের অভ্যাসটা করনা কেন ? তাঁহারা এই আত্ম-নিগ্রহের বিবিধ উপায় বলিয়া দিয়াছেন।

পাশ্চাত্যজগতের এই অতিরিক্ত বিষয়-সুখ-লালসা যদি নিয়মিত না হয় তাহা হইলে ঘোর প্রতিক্রিয়া আসিবে। অস্বাভাবিক প্রতিদ্বন্দ্বিতাতে কাহারও চিত্তের শান্তি বা স্বাস্থ্য থাকিবে না ; বিবিধ সামাজিক পাপে জনসমাজ দুর্ব্বল ও রুগ্ন হইয়া পড়িবে; অবশেষে যুদ্ধবিগ্রহ ও রক্তপাতে শক্তিক্ষয় হইয়া তাহারা শ্রেষ্ঠ পদবী হইতে অধঃকৃত হইবে।

পাশ্চাত্য জগৎকে এই বিষয়সুখাসক্তিরূপ ব্যাধি হইতে রক্ষা করিবার একমাত্র উপায় প্রাচীন ভারতের আধ্যাত্মিকতাকে তাহাদের মধ্যে স্থাপন করা। জর্ম্মনদেশীয় পণ্ডিতেরা বিগত শতাব্দীর প্রথম হইতে কিয়ৎ পরিমাণে তাহা করিতেছেন। বর্ত্তমান সময়েও এদেশীয় কতিপয় প্রচারকের চেষ্টাতে ঐ কার্য্য প্রবল হইয়াছে। অতএব আমরা দেখিতেছি যে প্রাচ্য প্রতীচ্যের সংমিশ্রণ প্রতীচ্যজগতের পক্ষেও প্রয়োজন হইয়াছে।

এদেশের পক্ষেও ঐ সংমিশ্রণ অতীব প্রয়োজনীয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার সহিত প্রতীচ্য নরসেবা সংমিশ্রিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু কিরূপে তাহা হইবে ? আবার বলি, আমাদিগকে আস্তিক হইতে হইবে। মনে করিও না যে দেশে ভাল যাহা কিছু আছে তাহা কেবল সে দেশেরই জন্য। আমাদের দেশে পাট হয় বলিয়া তাহার অর্থ কি এই যে আমরাই কেবল পাটের কাপড় পরিব ? চীনে চা হয়, তাহার অর্থ কি এই যে সে চা কেবল তাহারা বসিয়াই খাইবে, অন্যে ভোগ করিবে না ? বর্ত্তমান বাণিজ্য ইহার প্রতিবাদ করিতেছে। প্রত্যেকে একবার নিজ নিজ দেহ ও ঘরকন্নার দ্রব্য পরীক্ষা করিয়া দেখুন কোথাকার জিনিস কোথায় আসিয়াছে। ইহাতে কি কিছু অন্যায় হইয়াছে ? ভালইত হইয়াছে। জগদীশ্বরের প্রদত্ত জিনিস সকলে বাঁটিয়া খাইতেছে। জ্ঞানের তত্ত্ব সম্বন্ধেও ত এইরূপ ভাগ বিতরণ দেখিতেছি। আমেরিকায় বসিয়া আবিষ্কার করিলেন এডিসন, তুমি আমি ভারতে বসিয়া অবাধে তাহার ফল ভোগ করিতেছি। তাহাতে অনিষ্ট কি হইতেছে ? ভালইত। ঈশ্বরের প্রদত্ত জিনিস সকলে বাঁটিয়া ভোগ করিতেছি। ধর্ম্মতত্ত্বসম্বন্ধে এরূপ ভাবিতে পার না কেন ? সেই সময়ে আর্য্য অনার্য্য, হিন্দু ম্লেচ্ছ আসিয়া পড়ে কেন ? কেন মনু যাজ্ঞবল্ক্যের ন্যায়, যীশু মহম্মদকে আপনার লোক ভাবিতে পার না ? দেশ কাল ভুলিয়া সত্যকে কেন সত্য বলিয়া হৃদয়ে ধারণ করিতে পার না ? অপরদেশীয় সাধুদিগকে আদর করিলে কি আপনার দেশীয় সাধুদিগকে অনাদর করা হয় ? ইহা অতি সংকীর্ণ চিন্তাবিহীন বালকের উপযুক্ত ভাব। ইহা সেই মূর্খ স্ত্রীলোকের ভাব যে মনে করে যে তাহার পতি যদি অপর কোন স্ত্রীলোকের প্রশংসা করেন, তবে তাহার অর্থ এই যে তিনি নিজ পত্নীর প্রতি বিরক্ত। ••

জগতে এক মহা পরিবর্ত্তনের দিন আসিতেছে তাহা কি সকলে অনুভব করিতে পারিতেছেন না? আমরা বুঝিতে পারিতেছি, যিনি এদেশে সাধু-হৃদয়ে বাস করিয়া ধর্ম্মের তত্ত্ব সকল অভিব্যক্ত করিয়াছেন, তিনিই অপরাপর দেশে সাধুহৃদয়ে ধর্ম্মকে অভিব্যক্ত করিয়াছেন; একই নিয়মাধীন হইয়া সকল দেশে ধর্ম্মের উত্থান পতন হইয়াছে। সকল দেশের শাস্ত্র আমাদের শাস্ত্র, সকল দেশের সাধুজন আমাদের গুরু। ইহাতে কি স্বদেশবৎসলতা বা স্বজাতিবৎসলতা কম হয়? জার্ম্মানগণ যে অকপটে ভারতের প্রাচীন ঋষিগণের প্রশংসা করিতেছেন তাহাতে তাঁহাদের জার্ম্মানত্ব কি কিছু কম হইয়া যাইতেছে? নিজদেশে নিজজাতিমধ্যে যাহা ফুটিয়াছে তাহা প্রাণপণে রক্ষা কর; তাহার আদর কর; কিন্তু বিধাতার বিশ্বরাজ্য অতি বিস্তৃত রাজ্য এবং তাহা সকলেরই জন্য, ইহাও স্মরণ রাখ।

সেই দিনের দিকে আমরা অগ্রসর হইতেছি, যখন পৃথিবীর জ্ঞানসম্পন্ন জাতিসকল অনুভব করিবে, যে সমগ্র মানবজাতি এক পরিবার, যাহাদের পৈতৃক বাসভূমি এই মেদিনী, যাহাদের পিতা মাতা গুরু ও প্রভু একমাত্র সত্য-স্বরূপ ঈশ্বর, যাহাদের জ্যেষ্ঠভ্রাতা ও পথপ্রদর্শক সকল দেশের সাধু সজ্জন, যাহাদের উপদেষ্টা ও শিক্ষক সকল দেশের জ্ঞানিগণ, যাহাদের লক্ষ্য আত্মার উৎকর্ষসাধন, যাহাদের গম্যস্থান ব্রহ্মধাম, যাহাদের প্রধান সুখ পরস্পরের সেবা ও সাহায্য। এই মহাসংমিশ্রণে কোনও জাতি স্বীয় ব্যক্তিত্ব খোয়াইবে না, কিন্তু পূর্ণমাত্রায় আপনার প্রকৃতি ও শিক্ষা অনুসারে আপনাকে ফুটাইয়া সাধারণ উন্নতিতে যোগ দিবে। এ দিন এখনও দূরে, অনেক দূরে, তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু বর্ত্তমান ভারতে যে আমরা প্রাচ্য-প্রতীচ্যের সংমিশ্রণ দেখিতেছি, তাহার গতি সেই দিকে। বিধাতা ভারতকে এই নবধর্ম্মভাবের সাধনক্ষেত্র রূপে বরণ করিয়াছেন। ইহা আমরা দেখিতেছি।

লাঠির কথা।

আমার নাম বংশযষ্টি। সেনেদের সুঁড়োর বাগান-বাড়ির এঁদো পুকুরের পাড়ে আমার জন্ম। এক ঝাড়ে আমরা সাতটি ছিলাম, তন্মধ্যে আমি কনিষ্ঠ। নিশ্চিত পূর্ব্বজন্ম-কৃত পাপের ফলে কিম্বা কোন দেবতার অভিসম্পাতে আমার এই বংশত্বপ্রাপ্তি; নহিলে কেন, অপরাধী স্কুলের ছাত্রের ন্যায় খাড়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া দিবারাত্র কেবল একই চিত্র দেখিব! যতদূর দৃষ্টি যায়, দেখিতাম, বাগানে শ্যালকাঁটা সাঁইকাঁটা বিচুটির জঙ্গল,—মধ্যে মধ্যে দুই একটি সুগন্ধী পুষ্পতরু; পুকুরে আধ ইঞ্চি পুরু পানা, তদুপরি লাল সাদা হেলা শালুক ও পদ্ম ভাসিতেছে; ঘাটে ভাঙ্গা ধাপে প্রক্ষিপ্ত বাসন সামগ্রী—পার্শ্বে কর্দ্দমলিপ্ত শালপত্র হস্তে সুন্দরী যুবতী; নিশাকালে ঊর্দ্ধে রজতশুভ্র শশধর, নিম্নে পদতলে শৃগালের সম্মিলন ও কোলাহল। এইরূপ দেখিতে দেখিতে আমি ঊর্দ্ধে বাড়িতেছিলাম।

এমন সময় একদিন দা হস্তে নিধিয়া মালী আসিয়া দুই চারি কোপে আমাকে শাপবিমুক্ত করিল। শ্রীবিষ্ণুর হস্তে দশানন অথবা নৃসিংহের হস্তে হিরণ্যকশিপুর যেরূপ সদ্গতি লাভ হইয়াছিল, উড়ে মালীর শ্রীহস্তে আমারও সেইরূপ সদ্গতি লাভ হইল। আমি ঈষৎ বক্রভাবাপন্ন ছিলাম, সেই জন্য মালীপ্রবর অনেক দিন যাবৎ আমাকে জলে চুবাইয়া রাখিল, তৎপরে অগ্ন্যুত্তাপ দানে এবং তৈলমর্দ্দনে আমাকে সোজা এবং শক্ত করিয়া শৃগালতাড়নোপযোগী করতঃ তাহার গৃহকোণে আমার স্থান নির্দ্দেশ করিল।

একটি মাত্র ঘর, গোময়প্রলেপে বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। গৃহসজ্জার মধ্যে একটি ঢেঁকি, একটি উনান, একটি তক্তাপোষ, শিকেয় টাঙ্গান কতকগুলি হাঁড়ি এবং, বৃহৎব্যাপার—একটি স্ত্রীরত্ন। এইখানে চিরাগত প্রথা অনুসারে মালিনীর একটু রূপ বর্ণনা আবশ্যক। দীর্ঘায়ত বপু, মুখে ডায়মণ্ড কাটা বসন্তের দাগ, বামপদে গজেন্দ্রচরণ-দর্পহারী প্রকাণ্ড গোদ, নাকে সুদর্শন চক্র ঝুলিতেছে, রঙ—ভীমরুলের উপর বোলতার উপবেশন যদি কেহ কল্পনায় আনিতে পারেন, তবে তদ্রূপ হরিদ্রারসসিক্ত গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ, এবং রসনা প্রতিক্ষণ দংশনে উদ্যতা। অরণ্যসঙ্কটে মৃগশিশুর ন্যায় নিধিয়া যেন সর্ব্বদাই ভীত ত্রস্ত। প্রভুর নিকট গালাগালি খাইয়াও সে ভৈরবীর প্রসাদনার্থে বাগানের যত ভাল ভাল ফলমূল তরকারী শ্রীপদে নিবেদন করিত। মনে পড়ে, একদিন বাবু বাগানে বেড়াইতে আসিয়া দেখেন, কাঁঠাল গাছে কাঁঠাল প্রায় নিঃ-

শোভিত। মালীকে ডাকিয়া খুব বকাবকি আরম্ভ করিলেন। নিধিয়া অম্লানবদনে বলিল, "ধর্ম্মাবতার, শিয়ালি পনস খাইল্যা, মু কুন করিমি"।

এইরূপে দিন যায়, একদিন বাগানের তরিতরকারী নারিকেল প্রভৃতি গোরুর গাড়ি বোঝাই করিয়া নিধিয়া কলিকাতায় বাবুর বাড়ি আসিতেছিল। খুব ভোর থাকিতে উঠিয়াছিল, সেই জন্য অর্দ্ধপথ আসিতে না আসিতে তাহার তন্দ্রা আসিল। আমাকে একটা ঝুড়ির উপর রাখিয়া সে ঘুমাইয়া পড়িল। গাড়ি ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দে চলিতে লাগিল। যখন বেলেঘাটার পুলের নিকট আসিয়াছি, আমি একটু একটু সরিতে সরিতে একেবারে ভূমিশায়ী হইলাম। মালী কিম্বা গাড়োয়ান কেহই তাহা জানিতে পারিল না। গাড়ী আস্তে আস্তে পুল পার হইয়া চলিয়া গেল। তখন বেলা প্রায় দশটা।

এক অন্ধ বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ একটি ছোট ছেলের কাঁধের উপর হাত দিয়া সেই পথ দিয়া চলিতেছিল। ছেলেটি আমাকে দেখিতে পাইয়া তাড়াতাড়ি কুড়াইয়া লইল এবং আহ্লাদে গদগদ হইয়া কহিল, "দাদা, একটা লাঠি কুড়িয়ে পেয়েছি। অতখানি নুয়ে আমার কাঁধের উপর হাত দিয়ে চলতে তোমার কষ্ট বোধ হয়,—তুমি এই লাঠির একদিক্ ধর, আমি অন্যদিকে ধরি,তাহলে বেশ সুবিধে হবে।" এই বলিয়া আমার দুই প্রান্ত দুই জনে ধরিয়া চলিতে লাগিল। এক দিকে দুঃখদৈন্যময়সংসার-সাগরতরঙ্গবিধ্বস্ত অশীতিপর বৃদ্ধের লৌহশলাকাবৎ অস্থিসার শুষ্ক কঠিন অঙ্গুলির স্পর্শ, অন্যদিকে নব অভ্যাগত তাঁহারাই শিশু প্রতিকৃতি আত্মজতনয়ের নবনীতকোমল অঙ্গুলির দৃঢ়মুষ্টি;—কি এক অপূর্ব্ব রসসঞ্চারে আমার আগাগোড়া কণ্টকিত হইয়া উঠিল।

বৌবাজারের চৌমাথায়, যেখানে ট্রামগাড়ি বাঁধে সেইখানে, আসিয়া ফুটপাথের উপর দুইজনে দাঁড়াইল। বৃদ্ধ আমাকে ছাড়িয়া অতি সঙ্কোচে হাত পাতিল, অন্যান্য ভিখারীর ন্যায় চীৎকার কিম্বা মুখে একটি কথা নাই। বৃদ্ধের গৌরবর্ণ, গলায় উপবীত ঝুলিতেছে, মুখে একটি প্রশান্ত পবিত্র ভাব,—দেখিলেই বুঝা যায়, কোন সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোক নিতান্ত দায়ে পড়িয়া এই ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে। আশ্চর্য্য দেখিলাম, লোকে গাড়ি হইতে নামিয়া অতি ভক্তিসহকারে কেহ এক পয়সা, কেহ দুই পয়সা, কেহ বা চারি পয়সা বৃদ্ধকে দিতে লাগিল। এইরূপ একঘণ্টা কাল থাকিয়া পূর্ব্বের ন্যায় আমাকে ধরিয়া দুইজনে গৃহাভিমুখে ফিরিল।

বেলেঘাটার রাস্তার দক্ষিণ দিকে একটা গলির ভিতর খোলার ঘরে ইহাদের বাস। সদর দরজা ভেজান ছিল। দরজা খোলার শব্দ পাইয়া ভিতর হইতে একজন বলিয়া উঠিল, "কে ও, সতু?" ছেলেটি উত্তর দিল "হাঁ, দিদি, আমরা এসেছি।" ঘরের ভিতর ঢুকিয়া বাতব্যাধিপীড়িত শয্যাশায়ী একটি বৃদ্ধাকে সম্বোধন করিয়া সে বলিল, "দেখ দিদি,দাদার জন্য কেমন একটা লাঠি পেয়েছি।" বৃদ্ধা আমাকে হাতে লইয়া নাড়িয়া চাড়িয়া বলিল "বাঃ বেশ হয়েছে।" বৃদ্ধকে তক্তার উপর বসাইয়া ছেলেটি আমাকে দাওয়ার এককোণে রাখিয়া দিল। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর সে গামলা হইতে জল তুলিয়া ঠাকুরদাকে স্নান করাইল এবং নিজেও করিল। বৃদ্ধা তখন অতি কষ্টে রান্নাঘরে গিয়া ভাত বাড়িল এবং স্বহস্তে পতিপৌত্র উভয়কে খাওয়াইল। ছেলেটির মা রান্না করিতেছিল। বৃদ্ধা সে দিন আর কিছু খাইল না।

ছেলেটির নাম সতীশ। দাদা দিদিমা সকলে আদর করিয়া "সতু" বলিয়া ডাকিত। সতীশের তিন বৎসর বয়সের সময় তাহার পিতার মৃত্যু হয়। এখন তাহার বয়স দশ কি এগারো হইবে। সতীশের মা নিজের জন্য পুনরায় স্বতন্ত্র রন্ধনপূর্ব্বক আহারাদি শেষ করিয়া নিজের ঘরে আসিয়া শুইলেন। সতীশ আস্তে আস্তে আসিয়া মায়ের পাশে শুইয়া বই পড়িতে লাগিল। সতীশের মার মত এমন শান্ত ধীর নম্র ধর্ম্মভীরু স্ত্রীলোক দেখা যায় না। তিনি অল্প স্বল্প লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন, নিজেই ছেলেকে পড়াইতেন। তাঁহার একান্ত চেষ্টা কিসে ছেলেটি ভাল হয়,সৎ হয়। সাধ্বী স্ত্রী যেমন সহস্র অত্যাচার সহ্য করিয়াও বলে, হে স্বামিন্, জন্মজন্মান্তরে যেন আমি তোমাকেই পাই,—এই দুঃখিনী বিধবা তেমনি গললগ্নবাসে যোড়করে প্রতিদিন প্রার্থনা করিত,হে জগদম্বে,দুঃখ দাও,কষ্ট দাও,তোমার যা ইচ্ছা কর, কিন্তু মা, আমার এই ছেলেটিকে যেন কখনো পরিত্যাগ কোরোনা, এযেন তোমারি চরণ ধরে চিরকাল পড়ে থাকে।

অপরাহ্নে আবার দুইজনে ভিক্ষায় বাহির হইল। এই বেলা তাহারা বেশী দূর যাইলনা, পুলের কাছে দাঁড়াইয়া রহিল। যখন একটু একটু অন্ধকার হইয়া আসিল, আস্তে আস্তে গৃহে ফিরিল। সতীশ খানিকটা পড়া মুখস্থ করিয়া আহারান্তে শয়ন করিল। সে কখন দিদির কাছে কখনো বা মায়ের কাছে শুইত।

এইরূপে কীটদংষ্ট্রজীর্ণ জীবনগ্রন্থের পাতা উল্টাইতে লাগিল। একদিন মধ্যাহ্নে বুড়াবুড়ি নিদ্রিত। দুইটা কাক ঝাঁঝাঁ রৌদ্রে পুড়িয়া চালের উপর খোলা উল্টাইতে ব্যস্ত। সতীশ তাহার মায়ের অপেক্ষায় ঘরে চুপ করিয়া শুইয়া আছে। মা তখন রান্না করিতেছিলেন। আহারান্তে মা যখন আসিলেন, সতীশ তাঁহার গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, "মা আমাকে একটা কথা বল্‌বে বল"? মা বলিলেন, "কি বাবা, বল্‌বনা কেন?"

সতীশ বলিল, "মা, আজ রাস্তা দিয়ে যাচ্চি এমন সময়ে আমাকে দেখাইয়া একটি লোক আর একটি লোককে বলিল, আহা, দেখেচ, এদের কিরকম অবস্থা ছিল আর এখন কি হয়েচে;—মা, আমাদের কি আগে ভাল অবস্থা ছিল?"

মা তখন শুইয়া পুত্রকে বুকের কাছে টানিয়া বলিল, "হাঁ বাবা, তোমার ঠাকুরদাদা এক সময়ে খুব বড় লোক ছিলেন, অনেক টাকাকড়ি ছিল। তোমার বাবাই একমাত্র ছেলে ছিলেন। তাঁর হঠাৎ মৃত্যু হওয়ায় তোমার ঠাকুরদাদা পাগলের মত হন।"

সতীশ কহিল, "আচ্ছা মা, বাবাকে কি আমি দেখেচি? কার মত দেখ্‌তে ছিলেন?"

মা বলিলেন, "তখন তুমি খুব ছোট, তোমার মনে নাই—অনেকটা তোমার ঠাকুরদাদার মত দেখ্‌তে ছিলেন।"

"আচ্ছা মা তাঁর নাম কি ছিল?"

হিন্দুঘরের স্ত্রীর পক্ষে এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সম্ভবপর নহে। সতীশ দেখিল মায়ের চোখ দিয়া দুই ফোটা জল পড়িল। সে মুখখানি ভার করিয়া বলিল, "আচ্ছা মা ও সব কথা থাক্‌, তার পর কি হল বল।"

আঁচলের খোঁটা দিয়া চোখের কোণ মুছিয়া মা বলিতে লাগিলেন, "তার পর তোমার ঠাকুরদাদা সমস্ত বিষয়কর্ম্মের ভার ছোট ভাইয়ের উপর দিয়া রাত দিন কেবল ধর্ম্মচর্চ্চা করতে লাগলেন। একদিন ছোট ভাই তোমার ঠাকুরদাদার কাছে এসে বললেন, দাদা, টাকা গুলো কেন মিছে ব্যাঙ্কে জমা হয়ে আছে, ঐ টাকা নিয়ে আমি একটা কারবার করব ভাবচি, অনেক লাভ হবে। কারবার তোমার নামেই চলবে। ঠাকুরদাদা তাঁকে বল্লেন, তোমার ভাই যা ভাল বিবেচনা হয় কর, আমার দুবেলা দুমুঠো ভাত জুটলেই হল। তার পর ছোট ভাই কারবার আরম্ভ করিলেন। ছয়মাসের মধ্যে কারবার ফেল হইল এবং অনেক হাজার টাকা দেনা দাঁড়াইল। তোমার ঠাকুরদাদা পথের ভিখারী হইলেন এবং ক্রমে ক্রমে চক্ষু দুটি গেল। এখন শুনিতে পাই কারবার ফেল হওয়ার কথা সব মিথ্যা, ছোট ভাইই সমস্ত টাকা আত্মসাৎ করেন।"

সতীশ বলিল, "উঃ কি অন্যায়।"

এই সময় পাশের ঘর হইতে "উঃ গেলুম" একটা মর্ম্মভেদী আর্ত্তস্বর উত্থিত হইল। মাতাপুত্র ছুটিয়া গিয়া দেখিলেন, বৃদ্ধা বুকের যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, নিশ্বাস ফেলিতে কষ্ট হইতেছে। সতীশ একছুটে দৌড়িয়া গিয়া হাতে পায়ে ধরিয়া একজন ডাক্তারকে ডাকিয়া আনিল। ডাক্তার রোগীকে দেখিয়া বাহিরে আসিয়া বলিল, আর আশা নাই, বাত হৃৎপিণ্ড পর্য্যন্ত আক্রমণ করিয়াছে। সতীশ সমস্ত রাত ধরিয়া সাশ্রুনয়নে ঠাকুরমার পদতলে বসিয়া সেবা করিল। এমনি স্নেহ বটে! এত যন্ত্রণা, তবুও সতীশের গায়ে একবার পা ঠেকিয়াছিল বলিয়া অমঙ্গল আশঙ্কায় বৃদ্ধা ধড় ফড় করিয়া উঠিয়া পৌত্রের মুখচুম্বন করতঃ আবার শুইয়া পড়িল। কিন্তু সেই যে শুইল আর উঠিল না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

চারি পাঁচ বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। পরিবর্ত্তনের মধ্যে সতীশের উপনয়ন হইয়াছে এবং বৃদ্ধ ক্রমশঃ চলৎশক্তিহীন হওয়াতে বৌবাজার অবধি না গিয়া শিয়ালদার মোড়ে আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

একদিন টিপ্‌ টিপ্‌ বৃষ্টি পড়িতেছে। সহরের রাস্তায় মুষলধারে বৃষ্টি অপেক্ষা স্বল্প বৃষ্টিতে অধিক কাদা হয়। বৃদ্ধ ফুটপাথের উপর দাঁড়াইয়া আছে, এমন সময় চুণোগলির

এক ফিরিঙ্গী "ইউ ড্যাম্‌ নিগার" সম্ভাষণপূর্ব্বক বৃদ্ধকে সজোরে এক ঠেলা মারিয়া ট্রামের অপেক্ষায় সেই কাষ্ঠখণ্ডের উপর আসিয়া দাঁড়াইল। সতীশ যদি না ধরিত, বৃদ্ধ তখনই রাস্তায় পড়িয়া পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইত। ক্রোধে সতীশের মুখ লাল টক্‌টকে হইয়া উঠিল এবং সর্ব্বশরীর থর্‌ থর্‌ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। বৃদ্ধকে একটু দূরে রাখিয়া সে ব্যাঘ্রের ন্যায় লাফাইয়া প্রাণপণশক্তিতে আমাকে উঠাইয়া ফিরিঙ্গীর মাথায় এক ঘা মারিল। মাথা ফাটিয়া ঝর্‌ ঝর্‌ করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল। লোকে লোকারণ্য এবং পুলিশ আসিয়া উপস্থিত হইল। এই সময়ে সহরের মস্ত এক ধনীলোক প্রকাণ্ড একটা জুড়ি চড়িয়া আসিতেছিলেন। তিনি দূর হইতে আদ্যোপান্ত সমস্ত দেখিয়াছিলেন। ঘটনাস্থলের নিকট উপস্থিত হইয়া তিনি কোচম্যান্‌কে গাড়ী থামাইতে বলিলেন এবং পুলিশকে কাছে ডাকিয়া আনিয়া বলিলেন, "উয়ো বাচ্ছাকো কোন্‌ কসুর নেহি থা, ফিরিঙ্গীনে পহিলে বুঢ়াকে ঢেকিল্‌ দিয়া থা, উয়ো আউর তানিক হোতা তো গিরকে মর যাতা"। এই বলিয়া তাহার হাতে দশ টাকার একটা নোট্‌ গুঁজিয়া দিলেন। পুলিশ "উয়ো বাৎ ত ঠিক্‌ হ্যায়" বলিয়া সতীশকে ছাড়িয়া দুই হাতে সেলাম করিতে করিতে সেই ভিড়ের মধ্যে প্রবেশ করতঃ ফিরিঙ্গীকে হাত ধরিয়া উঠাইয়া ক্যাম্বেল হাঁসপাতালের দিকে চলিল। বড় লোকটি সতীশকে কাছে ডাকিয়া তাহার নাম ও ঠিকানা জিজ্ঞাসা করিলেন এবং তাহার হাত হইতে আমাকে গ্রহণপূর্ব্বক তৎপরিবর্ত্তে কোচ্‌বাক্সস্থিত দরওয়ানের লাঠি এবং পঞ্চমুদ্রা তাহাকে দিয়া বলিলেন, "তুমি কিছুদিন আর এ পথে আসিও না।" এই বলিয়া গাড়ী হাঁকাইতে বলিলেন। আমি গাড়ীর ভিতর হইতে দেখিলাম, কৌতূহলী দর্শকমণ্ডলীর প্রশ্নের উত্তর দিতে দিতে সতীশ বৃদ্ধকে লইয়া গৃহাভিমুখে চলিল।

গৃহে ফিরিয়াই বাবু সরকারকে ডাকিয়া বলিলেন, "এই লাঠিটা লইয়া এখনই স্যাকরার বাড়ী যাও। ইহার মাথাটা সোণা দিয়া বাঁধাইতে হইবে এবং উপরে লেখা থাকিবে 'বীরত্বের পুরস্কার।'"

দুই দিন পরে এক প্রকাণ্ড পগ্‌গড়ধারী হিন্দুস্থানী দরওয়ান স্বর্ণমণ্ডিত আমাকে হাতে লইয়া বৃদ্ধের বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল। সতীশ তখন বৃদ্ধকে লইয়া বাহির হইবার উপক্রম করিতেছে। সে দরওয়ানকে দেখিয়া পূর্ব্বেকার মারামারির কথা স্মরণ করিয়া কিঞ্চিৎ ভীত হইল, কিন্তু দরওয়ান যখন তাহার কাছে আসিয়া বলিল "রাজা বাবু ইয়ে লাঠি ভেজ্‌ দিয়া হ্যায়," তখন সে সমস্ত ব্যাপার বুঝিতে পারিল। দরওয়ানের হাত হইতে আমাকে লইয়া রাজাবাবু-প্রদত্ত সেদিনকার লাঠিটা তাহাকে ফিরাইয়া দিল। বৃদ্ধ আমাকে স্পর্শ করিবামাত্র শিহরিয়া হাত সরাইয়া লইল এবং সতীশকে বলিল, "এত ঠাণ্ডা কেন? লাঠিটা কি ভিজে"? সতীশ তখন সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিল। বৃদ্ধ শুনিয়া কহিল, "এখনি আমাকে সেই বাবুর বাড়ী লইয়া চল।" সতীশ বৃদ্ধকে সঙ্গে লইয়া দরওয়ানপ্রদর্শিত পথ দিয়া বাবুর বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইল।

বাবু তখন বারাণ্ডায় বসিয়া আলবোলা টানিতে টানিতে খবরের কাগজ পড়িতেছিলেন। দরওয়ান সতীশ ও বৃদ্ধের আগমনবার্ত্তা তাঁহাকে জানাইল। তিনি তাহাদিগকে উপরে লইয়া আসিতে বলিলেন। তাহারা আসিলে অতি আদর ও যত্নপূর্ব্বক তাহাদিগকে বসাইলেন। বৃদ্ধ আসনগ্রহণ করিয়া ভাবোচ্ছ্বাসরুদ্ধকণ্ঠে দুই হাত তুলিয়া বলিল, "চিরজীবী হউন! গরীবের প্রতি আপনার এত দয়া, ভগবান আপনার ভাল করবেন! আমি সতুর কাছে সব শুনেছি। বাবা, আমরা গরীব, পেটে খেতে পাই না, সোণা বাঁধান লাঠি নিয়ে কি করব? আপনি যদি দয়া করে আমার এই পৌত্রের একটা উপায় করিয়া দেন ত আমি নিশ্চিন্ত হইয়া মরিতে পারি।" বৃদ্ধের আর কথা বাহির হইল না। সতীশ তখন মায়ের নিকট শ্রুত ঠাকুরদাদার জীবনকাহিনী আনুপূর্ব্বিক সমস্ত বলিল। বাবুটি শুনিয়া বৃদ্ধকে বলিলেন, "আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আজ হইতে আপনার পৌত্রের ভার আমি লইলাম।" এই বলিয়া সরকারকে ডাকিয়া সতীশের হাতে পঞ্চাশ টাকার নোট দিয়া বলিলেন, "তোমাদের সংসারখরচের জন্য আমি মাসে মাসে পঞ্চাশ টাকা করিয়া দিব, তুমি এখানে আসিয়া লইয়া যাইও —আর কাল তুমি একবার আসিও, নারিকেলডাঙ্গায় আমার একখানি ছোট খাট বাড়ী আছে সেইটা তোমার নামে লিখিয়া দিব।" বাক্‌শক্তিরহিত উভয়ে তখন দুই চক্ষু

দিয়া দর দর ধারায় হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করিল। বাবুর গাড়ি তাহাদিগকে বাসায় রাখিয়া আসিল।

বাড়ি আসিয়া সতীশ মায়ের গলা জড়াইয়া ধরিয়া সমস্ত বলিল। স্নেহময়ী মা পুত্রের মুখচুম্বন করতঃবলিলেন, "বুঝি মা দুর্গতিনাশিনী এতদিনে আমাদের দুঃখ ঘুচাইলেন।"

যথাকালে সতীশের নামে বাড়ী লেখা পড়া হইল। গৃহ-প্রবেশের দিন সতীশ বেলেঘাটার আলাপী মুদি ময়রা প্রভৃতি সকলকে নিমন্ত্রণ করিয়া যথা সাধ্য আহার করাইল। আহা-রান্তে সতীশ আমাকে দেখাইয়া সকলকে কহিল, "এই আমার সোনার কাঠি; যাহা কিছু হই-য়াছে ইহারই জন্য।" সতীশের মুখে সমস্ত ঘটনা শুনিয়া সকলে আনন্দ প্রকাশ করিতে করিতে বিদায় লইল।

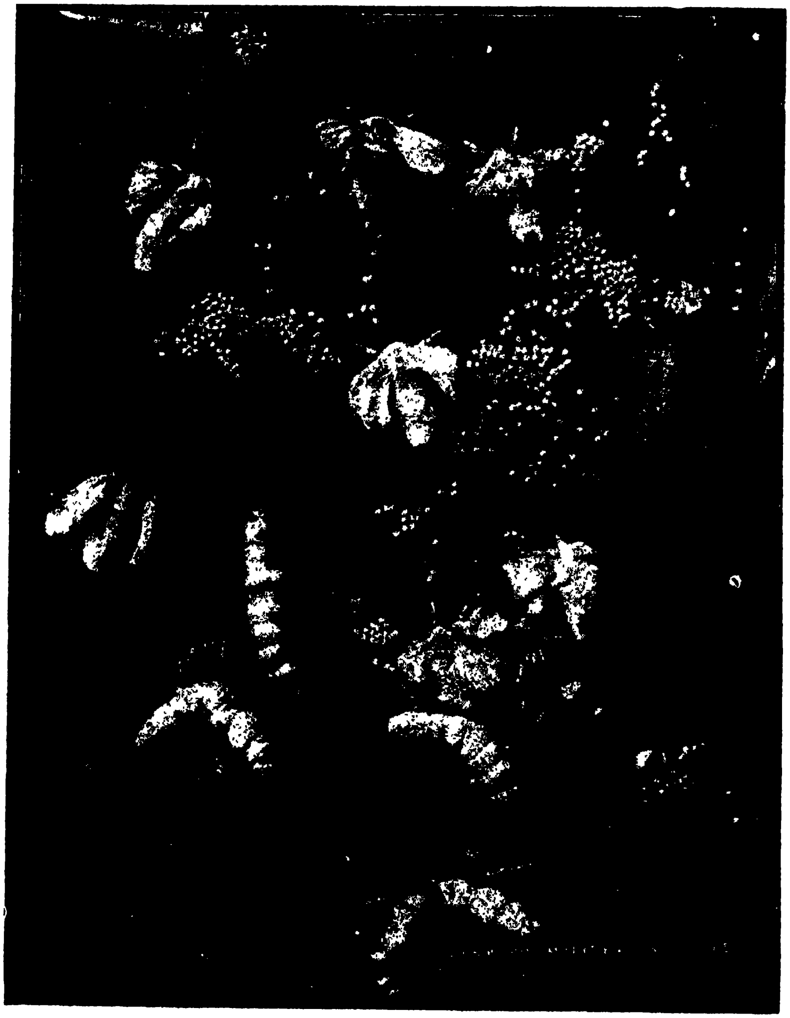
আমার আর আদর যত্নের অবধি ছিলনা। নিজের ছেলে-কেও কেহ এত ভালবাসেনা।

বৃদ্ধ আর বেশী দিন জীবিত রহিল না। সতীশ লেখাপড়া শিখিয়া কাজকর্ম্ম করিতে লাগিল। জননীর একান্ত অনু-রোধ উপেক্ষা করিতে না পারিয়া সতীশ শেষে বিবাহ করিল। একটি পুত্র হইল। সে মাঝে মাঝে আমাকে হাতে লইয়া চুম খাইয়া বলিত, "বাবার সোনার লাঠি।"

শ্রীসুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

কোষকীট।

পৃথিবীতে যত প্রকার কীট দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে যে সকল কীট রেশমের কোষ প্রস্তুত করে, তাহাদের নাম "কোষকীট"। বহুকাল হইতে আমাদিগের দেশে রেশম ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। অতি পুরাতন গ্রন্থেও তাহার উল্লেখ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সুবিখ্যাত বৈয়া-করণিক পাণিনি "কোষাৎ ঢঞ্" * এই সূত্রে কোষ হইতে "কৌষেয়" হইবার কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। এই



রেশমকীটের নানারূপ।

গ্রন্থ খৃষ্টের জন্মের বহু পূর্ব্বে সঙ্কলিত। তাহার পূর্ব্বের রচিত বৈদিক গ্রন্থেও ইহার উল্লেখ আছে। যথা—"কৌশং বাসঃ পরিধাপয়তি"। † রামায়ণে, মহাভারতে, মনুসংহিতায়, যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় এবং ভাগবতেও ইহার উল্লেখ আছে। যথা—

* ৪।৩।৪২।

† শতপথ ব্রাহ্মণ।

(১) রামায়ণে –

"উত্তরীয়মিহাসক্তং সুব্যক্তং সীতয়াতদা।
তথাহেতে প্রকাশন্তে সক্তাঃ কৌশেয়তন্তবঃ॥ *

(২) মহাভারতে—

"যাম্বাহং কৌষিকৈঃ স্ত্রৈঃ শুভ্রৈরাচ্ছাদিতংপুরা।
দৃষ্টবত্যস্মি রাজেন্দ্রসাত্বাং পশ্যামিচীরিণং। †

(৩) মনুসংহিতায়াং

"কৌশেয়া বিকয়োরূষৈঃকুতপানামরিষ্টকৈঃ।
শ্রীফলৈরংশুপট্টানাং ক্ষৌমানাং গৌরসর্ষপৈঃ॥ ‡

প্রাচীন সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যেও রেশমের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। অমরকোষেও ইহার উল্লেখ আছে। সুতরাং রেশমের ব্যবহার যে ভারতবর্ষে অতি প্রাচীনকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। কিন্তু কোন কোন নব্য লেখকের মত এই যে, রেশম চীন হইতেই ভারতবর্ষে আনীত হইয়াছিল। কোন কোন রেশম ঐ দেশ হইতে আসিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু চীন হইতে আসিবার পূর্ব্বেও, আমাদের দেশে ভারতীয় রেশম প্রচলিত ছিল। বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বে চীন ও অন্যান্য প্রাচ্যদেশের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্যসংস্রব বর্ত্তমান থাকার প্রমাণ পাওয়া যায় না। বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বের রচিত পাণিনি-ব্যাকরণ ও বৈদিক গ্রন্থে রেশমের উল্লেখ দেখিয়া বোধ হয়, চীনের সহিত ভারতবর্ষের পরিচয় হইবার পূর্ব্বেও ভারতবর্ষে রেশম প্রচলিত ছিল। কিন্তু "কৌষেয়" অর্থে কোন্ শ্রেণীর রেশম বুঝিতে হইবে, তাহাতে নানা তর্ক উপস্থিত হইতে পারে।

কোষকীট সাধারণতঃ বন্য ও গৃহপালিত এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া থাকে। কতকগুলি সহজে গৃহমধ্যে পালিত হইতে পারে। কতকগুলি কেবল অরণ্যে কোষ নির্ম্মাণ করে; গৃহমধ্যে পালন করিতে গেলে মরিয়া যায়। যাহাদিগকে গৃহপালিত কোষকীট বলা যায়, তাহার মধ্যে দুই এক শ্রেণীর কীট প্রকৃতপক্ষে গৃহে পালন করা যায় না। যাহারা সচরাচর বন্যনামে কথিত, তন্মধ্যেও দুই এক শ্রেণীর কীট গৃহমধ্যেই পালিত হইয়া থাকে। সুতরাং এই জাতিবিভাগ সম্পূর্ণ স্বাভাবিক বলিয়া বোধ হয় না। গৃহপালিত কোষকীটের নাম Bombycedæ ও বন্য কোষকীটের নাম Saturnidæ। তাহারা বহু শাখায় বিভক্ত। তন্মধ্যে পাঁচ প্রকার Bombycedæ ও দুই প্রকার Saturniidæ হইতে যে কোষ প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাই এতদ্দেশে শিল্পকার্য্যে ব্যবহৃত হয়। অন্যান্য কীটকোষ বিশেষ ব্যবহারে লাগে না; তাহার বর্ণনাও নিষ্প্রয়োজন। যত প্রকার কোষকীট আছে, তাহারা আবার দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। কতকগুলি বৎসরের মধ্যে একবার মাত্র কোষ নির্ম্মাণ করে। ইহাদিগকে (univoltine) বার্ষিক কীট বলা যাইতে পারে, কতকগুলি আবার এক বৎসরে অনেকবার কোষ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। ইহাদিগকে polyvoltine বলা হয়।

যে দুই শ্রেণীর বন্য কীটের কোষ ভারতবর্ষে শিল্পকার্য্যে ব্যবহৃত হয়, তাহা তসর ও এণ্ডি নামে পরিচিত। এই দুই শ্রেণীর কীট Polyvoltine। এণ্ডি কীট বন্য নামে কথিত হইলেও, গৃহমধ্যে পালিত হইয়া থাকে। কিন্তু তসর কিছুতেই গৃহমধ্যে পালিত হইতে পারে না। গৃহমধ্যে পালন করিবার জন্য এ পর্য্যন্ত বহুবিধ চেষ্টা হইয়াছে; কিন্তু কোন চেষ্টাই সফল হয় নাই। তসরজাতীয় কীট ভারতবর্ষের প্রায় সকল স্থানেই দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা শাল, সেগুন, আসন, ও কুলের পাতা খাইয়া জীবন ধারণ করে। জঙ্গল হইতে এই সকল কীটের গুটী সংগ্রহ করিয়া যে সুতা প্রস্তুত করা হয়, ঐ সকল সুতায় বীরভূম, ভাগলপুর ও মির্জাপুরের প্রসিদ্ধ তসরের বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে।

এণ্ডি আসাম প্রদেশে প্রচুর পরিমাণে প্রাপ্ত হওয়া যায়; তজ্জন্যই ইহা 'আসাম সিল্ক' নামে পরিচিত। এই কীট এরণ্ড গাছের পাতা খায়। তজ্জন্য সংস্কৃত এরণ্ড শব্দ হইতে এরণ্ডী এবং তাহার অপভ্রংশ এণ্ডি শব্দ উৎপন্ন হইয়াছে। এই কীট আসাম ব্যতীত অন্য স্থানেও পালিত হইতে পারে। যে স্থানে এরণ্ড বৃক্ষ জন্মিতে পারে, এণ্ডি কীটও সেই স্থানে পালিত হইতে পারে। বাঙ্গলার ও অযোধ্যার কোন কোন স্থানে এক্ষণে এণ্ডি কীট পালিত হইতেছে।

Bombycedæ জাতীয় গৃহপালিত কীট কেবল তুঁত পাতা ভোজন করে। তাহারা অন্য কোন প্রকার পাতা

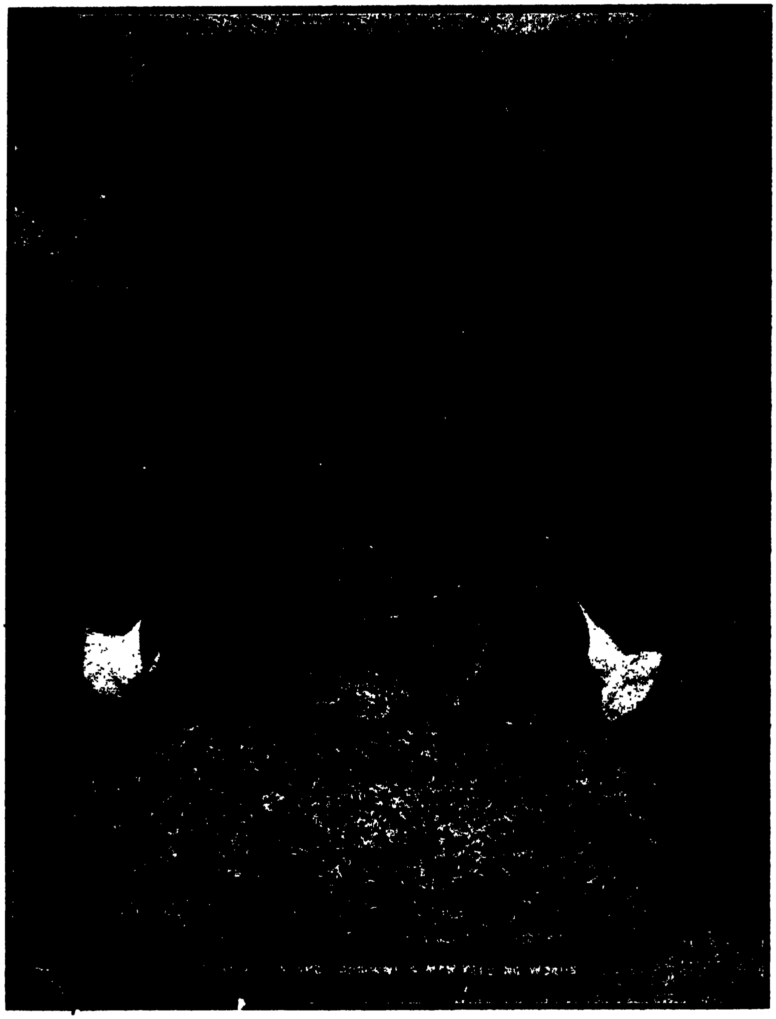
* অযোধ্যাকাণ্ড।
† বনপর্ব্ব।
‡ ৫।১২০।

খাইয়া কোষ প্রস্তুত করিতে পারে না। তাহাদিগের জন্য তুঁতের আবাদ করিতে হয়। বাঙ্গলাদেশে যে তুঁতের গাছ রেশমকীট-পালনে ব্যবহৃত হয়, তাহার নাম Morus Indica। এই গাছের পাতা polyvoltine রেশমকীটের পক্ষে বিশেষ উপযোগী; কিন্তু univoltine রেশমকীটের জন্য বড় তুঁত-গাছের পাতা ব্যবহার করিলেই ভাল হয়। তন্মধ্যে Morus Alba এবং Morus Multicalis উল্লেখযোগ্য।

প্রাণিগণের প্রাণধারণ করিবার প্রণালী প্রায় একইরূপ। আমাদিগের জীবনে যেরূপ বাল্যযৌবনাদি বিভাগ আছে, সেইরূপ রেশমকীটের জীবনেও চারিটী বিভাগ আছে। যথা—(১) ডিম্বাবস্থা, (২) কীটাণু-অবস্থা, (৩) কীটাবস্থা, ৪) পতঙ্গাবস্থা।

বার্ষিক কীটের ডিম্ব হইতে কীটাণু বাহির হইতে দশমাস প্রয়োজন। ভারতবর্ষের সমতল ভূমিতে এই কীটের জন্য Hybernation ও Incubation প্রয়োজন। গ্রীষ্মকালে কোন শীতপ্রধান পার্ব্বত্য স্থানে ডিম্ব রক্ষা করার নাম Hybernation। গ্রীষ্মান্তে ঐ ডিম্বগুলিকে ৭৫ ডিগ্রি ফারণহিটের উত্তাপে সমভাবে কিছুকাল রাখিলে ডিম্বগুলি শীঘ্র কীটাণুরূপে পরিণত হয়। এইকার্য্য করিবার নাম Incubation। ডিম্ব হইতে কীটাণু বহির্গত হইবার পর সকলজাতীয় গৃহপালিত কোষকীটের পালন-প্রণালী প্রায় একই রূপ; কোনও প্রভেদ নাই।

আমাদের দেশে রেশমকীটের সাধারণ নাম পলুপোকা; কোনও কোনও স্থানে গুটিপোকা নামও প্রচলিত আছে। কীটকোষের নাম কোয়া বা গুটি। কীটাণু অবস্থার পলুর নাম গুঁড়াপলু; পতঙ্গ অবস্থার পলুর অর্থাৎ প্রজাপতির নাম চক্রী। কীটাণু অবস্থার পলুপোকা নিতান্ত ক্ষুদ্র বলিয়া পালনকার্য্যে অনেক অসুবিধা ঘটিয়া থাকে। গুঁড়াপলু প্রায়ই একত্রে রাশীকৃত করিয়া রাখিয়া তুঁতগাছের কচি পাতা ছুরি বা কাঁচি দিয়া সরু সরু করিয়া কাটিয়া কীটাণুর উপর বিছাইয়া দেওয়া হয়। এই পাতা খাইয়া ক্রমে তাহাদের কলেবর বৃদ্ধি হইতে থাকে, এবং ক্রমে মোটা পাতা খাইবার ক্ষমতা জন্মিয়া থাকে। শরীর সম্পূর্ণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে, কোষ প্রস্তুত করিবার সময় উপস্থিত হয়। এই সময় কীটদেহ দেড় ইঞ্চি পর্য্যন্ত লম্বা হইয়া থাকে। এই



চক্রকী।

সময় ইহারা আর পাতা খায় না, ইহাদের শরীরের মধ্যে তরল রেশম সঞ্চিত হইতে থাকে। এই তরল পদার্থই মুখ-বিবর হইতে নিঃসৃত হইয়া বায়ু-সংস্পর্শে সুন্দর সূক্ষ্ম রেশমসূত্রে পরিণত হইয়া থাকে। কীটাণু অবস্থা হইতে কোষ প্রস্তুত করিবার সময় পর্য্যন্ত পলুপোকার চারিবার জ্বর হইতে দেখা যায়। প্রত্যেক বারের শেষে ইহারা সর্পের মত খোলস ছাড়িয়া নূতন কলেবর ধারণ করে। এইরূপ খোলস ছাড়িয়া নূতন কলেবর ধারণ করার সাধারণ নাম "কলপ"।

হইলে, কীটগুলিকে "চন্দ্রকীর" উপর বিন্যস্ত করিতে হয়। তথায় তাহারা কোষ নির্ম্মাণ করিয়া, আত্মসূত্রে আপনি আবদ্ধ হইয়া অদৃশ্য ভাবে কোষাভ্যন্তরে বাস করিতে আরম্ভ করে। এই সময় বিশেষ যত্ন করিবার প্রয়োজন হয় না। কেবল রৌদ্র বা অগ্নির উত্তাপে কোষনিবদ্ধ কীট যাহাতে মরিয়া না যায়, এরূপ ভাবে বীজকোষগুলিকে রক্ষা করিতে হয়। যে সকল কোষ হইতে সূত্র প্রস্তুত করিতে হইবে, তাহাতে উত্তাপ লাগাইয়া কীট নষ্ট করিতে হয়। বীজকোষনিবদ্ধ



পলু হত্যা।

নূতন কলেবর ধারণ করায় পলুপোকা পূর্ব্বাপেক্ষা সবল, উজ্জ্বল ও বৃহদায়তন হয়। প্রথম খোলস ত্যাগের নাম "মেটে কলপ"; দ্বিতীয় "দোকলপ"; তৃতীয় "তেকলপ" এবং চতুর্থ অর্থাৎ শেষ খোলস ত্যাগের নাম "সোধের কলপ"। এই পরিবর্ত্তনের সময় পলু পোকা কিছুই আহার করে না; পীড়িতের ন্যায় নিস্তেজ অবস্থায় পড়িয়া থাকে। সোধের কলপের পর কোষনির্ম্মাণের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইহারা অত্যন্ত আহার করে। কোষ নির্ম্মাণের সময় উপস্থিত

কদাকার কীটদেহ হইতে ভগবানের অপূর্ব্ব সৃষ্টিকৌশলে পদপক্ষ-সমন্বিত সুন্দর সুন্দর প্রজাপতির উৎপত্তি হয়। তাহারা তখন আর কোষের মধ্যে থাকে না। কোষ ভেদ করিয়া বাহির হইয়া, যথাযোগ্য সঙ্গিনীর অনুসন্ধান করে; এবং স্ত্রী পতঙ্গ যথাকালে ডিম্ব প্রসব করিয়া কালকবলে পতিত হইয়া থাকে। অন্যান্য প্রাণীর মত রেশমকীটেরও নানা প্রকার ব্যাধি ও বিপদ আছে। তাহার কথা পৃথক প্রবন্ধে আলোচনা করা যাইবে। এই প্রবন্ধের প্রথম চিত্রে

রেশমকীটের ডিম্বাবস্থা হইতে কোষাবদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। কোষনির্ম্মাণের পূর্ব্বে পাকা পলুকে ডালা হইতে বাছিয়া চন্দ্রকীতে বিছাইয়া দিবার প্রণালী দ্বিতীয় চিত্রে প্রদর্শিত হইতেছে। তৃতীয় চিত্র পলুহত্যার করুণ দৃশ্য উদ্‌ঘাটিত করিতেছে। যাহারা প্রাকৃতিক নিয়মে কিছু দিনের জন্য আত্মসূত্রে কোষবদ্ধ হইয়া আবার কোষ কাটিয়া বিচিত্র প্রজাপতিরূপে বিচরণ করিতে সক্ষম, মনুষ্যের বিলাস-লালসা তাহাদের কোষ হইতে সূত্র অপহরণ করিবার জন্য কিরূপ উত্তপ্ত তন্দুরের মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া তাহাদিগকে জীয়ন্তে নিদারুণ যমযন্ত্রণা প্রদান করিতেছে,—এই চিত্রে তাহা প্রদর্শিত হইল। মুক্তার জন্য শুক্তিকে অসময়ে মৃত্যু-মুখে পতিত হইতে হয়। মৃগনাভির জন্য কস্তুরীমৃগকে ব্যাধশরে নিপতিত হইতে হয়। সুন্দরীগণের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য কত বিচিত্রপক্ষ পক্ষীকে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া সুকোমল পালক বিতরণ করিতে হয়। সমগ্র জীব-জগৎ মনুষ্যসমাজের ন্যায় প্রবন্ধ রচনা করিয়া সচিত্র মাসিক পত্র প্রকাশ করিতে পারিলে, সে সকল পত্র ও সে সকল চিত্র মনুষ্যের কলঙ্ক ঘোষণা করিয়া শেষ করিতে পারিতনা।

শ্রীপ্রমদাগোবিন্দ চৌধুরী।

শান্তি, তৃপ্তি, সুখ।

১

সর্ব্ব উচ্চ সৌধে স্বর্ণ
আসন মাঝে,
মান, সম্পদ, বিলাস, আলসে
নৃপতি রাজে ;
হস্তে দণ্ড মাথায় মুকুট
ভুবনভার,
সূর্য্যের মত প্রতাপ, আছে কি
শান্তি তার ?

২

জীবনের কূলে, মহৎ কর্ম্ম
দেউল-চূড়ে
সুধীর শুভ্র বিমল কীর্ত্তি-
কেতন উড়ে ;
যশো-সৌরভে পূরিত ধরণী ;
তবু ও মনে
তৃপ্তি কি আছে অনন্ত সেই
মহা সাধনে ?

৩

মেলিয়া লেলিহা রসনা বাসনা-
অনল জ্বলে ;
নিবাইতে চায় বিষয়ী বৃথাই
ভোগের জলে ;
এক হতে আর ধরে সে আগুন
মোহন খেলা,
সুখ কোথা তার ? মরীচিকা লয়ে
কাটায় বেলা।

৪

ধরণীর ধারে অজানা বিজন
একটি ঘরে,
এ বিরল সাঁঝে অমল ধবল
শয়ন পরে ;
বসিয়া কে তুমি পুণ্যপুঞ্জ
দেবতা সম ?
কি সুধা এনেছ, মরতের মাঝে
মধুরতম !

৫

গৃহ দীপালোক উজ্জ্বল হয়ে
পড়েছে মুখে,
ঘুমন্ত শিশু হাসিছে পারশে
স্বপন সুখে !
দক্ষিণ হ'তে মল্লিকাবাস
আনিছে বায়,
মঙ্গলভরা আশীষপরশে
জুড়ায়ে কায়।

৬

কায, ভাবনার অবসাদ-ভার,
অভাব-দুখ,
ঘুচিল সকলি মন্ত্রে যেমন
হেরি ও মুখ।

মুদে এল আঁখি, মধুময় ভাবে
ভরিল বুক,
আসিল আমারি প্রাণে সে শান্তি,
তৃপ্তি, সুখ !

তিলোত্তমা।

[রবিবর্ম্মার চিত্রদর্শনে]

কঙ্কণ, কিঙ্কিণী, হার, হীরক কেয়ুর,
কনককুণ্ডল, কাঞ্চী !--অনন্ত, নূপুর,
সিঁথি, কণ্ঠমালা, তাড়, মুক্তার বেশর
সুন্দর নাসায়—স্বর্ণ কদম্ব কেশর
কর্ণপ্রান্তে—ব্যাঘ্রমুখ বৈদূর্য্যবলয়,
হৈমচূড়—(ইন্দ্রনীলকান্তি মণিময়,
শিশুফণি রক্তআঁখি নীল দেহ তার)—
কোষ্ঠ দেশে—যেথা যত আভরণ আর—
কাল কেশপাশে শোভে মাণিকের মালা—
অমারাত্রে জ্যোৎস্নাকান্তি জোনাকীর জ্বালা
যথা তরুশিরে—ত্রৈলোক্যের সৌন্দর্য্য
জড়িত কনকে রতনে ! কটাক্ষচাতুর্য্যে,
কন্দুকক্রীড়ায়, হাবে ভাবে, লোলাপাঙ্গে,
বিলাসে, বিভ্রমে, সৌন্দর্য্যের প্রতি অঙ্গে
তরঙ্গ উথলে—যে রূপের উদ্যত অশনি
নিমেষে বিদারি—আর অবহেলে খনি
অটল, দুর্ভেদ্য সেই সৌভ্রাত্রপ্রাচীর
অসুরের !—পঞ্চশর অলক্ষ্যে যে তীর
গোপনে সন্ধানে—মুগ্ধ, উন্মত্ত অধীর,
দানবের হিয়া। কি যে উন্মাদনা,
কি তীব্র আকাঙ্ক্ষাস্রোত, অপূর্ব্ব বেদনা
গ্রাসিছে উভয়ে আজি ! হিংসার গরল
জারিল সে আজন্মের সুস্নিগ্ধ, সরল,
ত্রিদিবঅমিয়াপূর্ণ, মধুর সৌভ্রাত্র
উভয়ের।—হারে রূপ-মোহ ! কি যে পাত্র
মৃত্যুর মদিরাপূর্ণ;—কি বিষম বিষ,
মরণের কি মোহন মোহ—স্বপ্ন অহর্নিশ
উদ্‌ভ্রান্ত জীবের তরে !—কি বিদ্যুৎবিভা,
(ম্লান করি শরতের স্বর্ণময় দিবা !)
ভাতিল দোঁহার চক্ষে—বীরভ্রাতৃদ্বয়,
সম্ভাষণে সুন্দরীর সহ পরিচয় !

গিলগিটের পুরাতন রাজ্য-শাসন-প্রথা।

(ক) রাজকর্ম্মচারী ও তাঁহাদের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

গিলগিটীরা তাহাদের শাসনকর্ত্তাকে "রা" বলিয়া সম্বোধন করিত। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে গিলগিটীদের ভাষা একটু ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, বিকৃত সংস্কৃত বলিয়া বোধ হইবে। "রা" শব্দ যে সংস্কৃত "রাজন্" শব্দের অপভ্রংশ, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। রাজন্ হইতে রাজ, রায়, রা, পরিবর্ত্তনের এইরূপ ক্রম অনুমান করা যাইতে পারে। যখন গিলগিটীরা রাজত্বের উল্লেখ করিত, তখন "রাজাকি" শব্দ ব্যবহার করিত। "রাজাকি"ও (অর্থ, রাজার প্রজা) বিকৃত সংস্কৃত শব্দ—এবং ইহা "সিনাকি"র অর্থাৎ স্বায়ত্ত শাসনের বিপরীত।

পৃথিবীর অন্যান্য দেশে যেমন প্রজারা রাজাকে অতিশয় মান্য করে ও তাঁহার আজ্ঞাবহ হইয়া থাকে, গিলগিটীরাও তদ্রূপ করিত। কিন্তু উভয়ের কারণে কিছু প্রভেদ আছে। অন্যান্য দেশের প্রজারা তাহাদের রাজাকে মান্য করে, কারণ তিনি তাহাদের 'রাজা'। গিলগিটীরা আপনাদের রাজাকে রাজা বলিয়াত মান্য করিতই,—কিন্তু তাহাদের অন্য কারণও ছিল। তাহাদের বিশ্বাস যে তাহাদের পুরাকালীন শাসনকর্ত্তারা জিনের (Giants) বাচ্চা ছিল। তৎপরে যে সকল মুসলমান শাসনকর্ত্তা হইয়াছে, তাহারা পরীর (Fairy) বাচ্চা ছিল। এই বিশ্বাসেই তাহারা আপনাদিগের শাসনকর্ত্তাকে ও তদ্বংশীয় লোকদিগকে অতি মহৎ জাতীয় বলিয়া মনে করিত। কারণ যখন তাঁহারা জিন এবং পরীর বংশধর, তখন অবশ্যই তাঁহারা ঈশ্বরজানিত লোক, সুতরাং তাহাদের মান্য করিয়া ও আজ্ঞাবহ হইয়া চলাই ধর্ম্মসঙ্গত।

প্রজাদিগের উপর "রা"র একাধিপত্য ক্ষমতা ছিল। Autocrat বা স্বেচ্ছাশাসক হইলেও অনেক রাজকীয় কার্য্যে তিনি উজীরের পরামর্শ লইতেন। কিন্তু নিম্নলিখিত কয়েকটী কার্য্যে উজীর টুজিরের তোয়াক্কা রাখিতেন না, তৎসমুদয় নিজের ইচ্ছামতই করিতেন। এ বিষয়ে যদি কাহারও কখন পরামর্শ লইতেন, তাহা হইলে তাঁহার উদার চিত্তের প্রমাণ পাওয়া যাইত। কার্য্য কয়টী এই —

(১) কোন অন্য রাজ্যের সহিত যুদ্ধঘোষণা করা। (২) কোন স্থানে কেল্লা তৈয়ার করা বা কোথাও নুতন পয়ঃনালী তৈয়ার করা। এই দুইটাই সর্ব্বপ্রধান পূর্ত্ত কার্য্য (public works) ছিল। (৩) নরহত্যা, "রা"র বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, প্রভৃতি অপরাধে রায় দেওয়া। (৪) যদি কেহ নরহত্যা করিবার ঘোষণা করিত বা কাহাকেও দাসত্বে বিক্রয় করিত, তাহার বিচারও "রা"র নিকট হইত। ("রা" নিজে যদি কাহাকেও দাসত্বে বিক্রয় করিতেন, তাহাতে দোষ হইত না)। (৫) কোন বিজিত স্থানে কর স্থাপন করা বা কোন প্রজাকে কর হইতে মুক্তি প্রদান করা। (৬) উজীর বা অন্য কোন রাজকর্ম্মচারীকে পদচ্যুত করা।

অন্যান্য দেশে যেমন রাজ্যশাসন কার্য্যে পদানুক্রমে কর্ম্মচারিগণ নিযুক্ত হইয়া থাকেন, গিলগিটেও সেইরূপ হইত। ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যের জন্য কেবল ৫ প্রকার কর্ম্মচারীই এখানে নিযুক্ত হইত। যথা (১) উজীর (২) ইয়ারফা (৩) ত্রাংফা (৪) বাড়ো (৫) কোট্‌ওয়াল বা জাইতু।

বৌদ্ধেরা যে এখানকার সর্ব্বপ্রথম শাসনকর্ত্তা ছিল, তাহাই বিশ্বাস হয়। তাহাদের সময়েও এখানে সম্ভবতঃ উজীর, ইয়ারফা, ত্রাংফা, কোট্‌ওয়াল প্রভৃতি পদগুলি ছিল। মুসলমানদিগের রাজত্ব সময়েও ঐ পদগুলির নামকরণ অক্ষুণ্ণ ছিল, কেবল তাহারা "বাড়ো" শব্দটীকে "মকদ্দম"এ পরিণত করিয়াছিল। উজীর শব্দটী যখন পারসীক, তখন ইহাই অনুমান হয় যে মুসলমান রাজারা ইহার প্রবর্ত্তন করেন। কিন্তু ইহাও প্রায় নিশ্চয় যে বৌদ্ধদিগের রাজত্বসময়েও এখানে "উজীরের" পদ ছিল। তাহারা বোধ হয় ইহার অন্য কোন নাম দিয়াছিল, যাহার এখন কোন অস্তিত্ব নাই।

খাস গিলগিটের উচ্চবংশীয় ঘর হইতে উজীর, ইয়ারফা ও ত্রাংফা নির্ব্বাচিত হইত। মকদ্দম এবং জাইতু সম্ভ্রান্ত ঘর হইতে নির্ব্বাচন করা হইত, কিন্তু ইহারা আপন আপন গ্রাম হইতে নির্ব্বাচিত হইত।

নিম্নে এই সকল কর্ম্মচারীদের কার্য্যের তালিকা দেওয়া হইল।

"উজীর" শব্দের অর্থ "ভারবদলকারী" (interchanger of loads)। রাজকীয় কার্য্যে রাজার ভারের অনেকাংশ ইনি আপন মস্তকে বহন করেন, তজ্জন্যই ইহার এই নাম। গিলগিটে দুই জন উজীর নিযুক্ত হইতেন। এক জন সর্ব্বদা "রা"র সঙ্গে থাকিতেন, অপর জন সর্ব্বদা রাজ্য পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। "রা"র পরামর্শদায়ক এবং দক্ষিণ হস্ত বলিয়া উজীরেরা প্রজার নিকট অতি মাননীয় ছিলেন।

"ইয়ারফা"- রাজকার্য্যে ইনি একজন প্রধানতম কর্ম্মচারী ছিলেন। ইহাকে ঠিক রাজকর্ম্মচারী বলা যাইতে পারেনা। ইহাঁর কার্য্য দেখিলে ইহাঁকে রাজার ভাণ্ডারাধ্যক্ষ ও কোষাধ্যক্ষ বলাই উচিত। রাজার সম্পত্তি, অর্থাৎ সমস্ত রাজস্ব-শস্য, স্বর্ণ, ভেড়া, ঘী, প্রভৃতি ইয়ারফার নিকট জমা থাকিত এবং আবশ্যকানুসারে সপ্তাহে বা মাসে এক বার রাজার "কুলচিন" (private store-keeper and kitchen superintendent) আসিয়া ইহাঁর নিকট হইতে দ্রব্যাদি লইয়া যাইত। "রা" আপনার কোন অতি বিশ্বাসী লোককেই "ইয়ারফা"র কার্য্য দিতেন, কারণ রাজভাণ্ডারের উপর ইহার সম্পূর্ণ প্রভুত্ব; আয় ব্যয়ের হিসাব না তাহাকে রাখিতে হইত, না "রা" কখনও চাহিতেন। এক জন "ইয়ারফা" "রা"র সহিত সর্ব্বদা গিলগিটে থাকিত। অন্যান্য স্থানে যেখানে "রা"র নিজস্ব কিছু খাস সম্পত্তি থাকিত, সেখানেও এক এক জন "ইয়ারফা" নিযুক্ত হইত।

ত্রাংফা—আপন আপন গ্রামে "রা"র অর্দ্ধেক ক্ষমতা ত্রাংফার উপর ন্যস্ত ছিল। কৃষি জমীর অনুপাতানুসারে প্রত্যেক গ্রামে এক বা দুই জন ত্রাংফা নিযুক্ত হইত। আপন গ্রামের প্রজাদিগের সচ্চরিত্রতার জন্য ত্রাংফা, রা ও উজীরের নিকট দায়ী ছিল। তাহার বিশেষ কাজ ছিল রাজস্ব-শস্য আদায় করিয়া ইয়ারফাকে প্রদান করা এবং যাহাতে গ্রামে সুখ শান্তি অক্ষুণ্ণ থাকে তদ্বিষয়ে যত্নবান হওয়া। আপন গ্রামের প্রজাদিগের ভিতর যদি কোন

ধরওয়া বিবাদ হইত, উজীরের পরামর্শ না লইয়াও ত্রাংফা তাহার মীমাংসা করিতে পারিত।

বাড়ো শব্দের অর্থ "বয়োজ্যেষ্ঠ" (an elder)। মুসলমানদিগের সময় "বাড়ো" শব্দটাকে "মকদ্দম"এ পরিণত করা হয়। "মকদ্দম" শব্দের অর্থ "দূরদর্শী"। প্রত্যেক গ্রামে কৃষি জমির অনুপাতানুসারে, এক হইতে ৪ জন পর্য্যন্ত "মকদ্দম" নিযুক্ত হইত। ইহাদিগকে গ্রাম্য সংবাদ সকল ত্রাংফার গোচরে আনিতে হইত এবং তাহার পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিতে হইত। মকদ্দমের বিশেষ কাজ ছিল গ্রামের রাজস্ব আদায় করিয়া ত্রাংফার উপস্থিতিতে ইয়ারফাকে প্রদান করা।

জাইতু বা কোটোয়াল। জাইতু শব্দের অর্থ "সমাবেশকারী" (collector)। বৌদ্ধ রাজারাই বোধ হয় কোটোয়ালের প্রথম প্রবর্ত্তন করেন। "কোটোয়াল" শব্দের অর্থ (কোট = কেল্লা, ওয়াল = প্রহরী) (a watchman of the fort)। প্রত্যেক গ্রামে এক জন কোটোয়াল এবং লোকসংখ্যার অনুপাতানুসারে এক হইতে ৫ জন পর্য্যন্ত জাইতু নিযুক্ত হইত। জাইতু প্রজাদিগের ফসলের এবং গ্রামের পয়ঃনালীর তদারক করিত। রাজা বা কোন সম্ভ্রান্ত লোক তাহাদের গ্রামে আসিলে তাঁহার আবশ্যক দ্রব্য সকল সরবরাহ করিত; গ্রামের মধ্যে কোন বিবাদ বিসম্বাদ হইলে তাহা মকদ্দমের কর্ণগোচর করিত; কোন কার্য্যোপলক্ষে গ্রামবাসীদের পরামর্শ আবশ্যক হইলে তাহাদিগকে এক স্থানে সমাবিষ্ট করিত এবং তাহারা যে আদায় করিয়াছে সে বিষয়ে কোন গোলমাল থাকিলে তাহারাই তাহার নিষ্পত্তি করিত।

(খ) রাজকর।

(১) রাজস্বকে গিলগিটীরা "বপ" বলিয়া থাকে। রাজস্ব অনেক প্রকার ছিল। প্রায় সকলগুলিই নীচে সন্নিবেশ করা গেল।

রাজস্ব-শস্যকে "থুটুকুল" বলে। ইহা ধার্য্য করিবার জন্য প্রত্যেক গ্রামের জমীগুলিকে ৩ ভাগে বিভক্ত করিয়া যথাক্রমে মাকুমি, চুনি ও চুকলি নাম দেওয়া হইত। যে জমীতে ৯ মন বীজ বপন করা যাইত তাহার নাম মাকুমি। ইহা হইতে যে ফসল উৎপন্ন হইত, তাহা হইতে ২ মন রাজভাণ্ডারে যাইত। যে জমীতে ৪॥০ মন বীজ বপন করা যাইত তাহা চুনি নামে অভিহিত হইত। ইহার উৎপন্ন ফসল হইতে ১ মন রাজার প্রাপ্য। যে জমীতে ১॥০ মন বীজবপন করা যাইত তাহার নাম চুকলি। ইহার উৎপন্ন ফসল হইতে অর্দ্ধমন রাজভাণ্ডারে যাইত।

কাহাকেও রাজকর হইতে মুক্তি দেওয়া হইলে তাহাকে "দারখাঁ" বলা হইত। দারখাঁকে কোন কর দিতে হইত না বটে, কিন্তু "রা" যখন তাহাদের গ্রামে যাইতেন, দারখাঁকেই তাঁহার আতিথ্যসৎকার করিতে হইত।

(২) "মারে" শব্দের অর্থ "মারা" (to kill)। পুরাকালে যখন 'রা" আপন রাজ্যের কোন গ্রাম পরিদর্শন করিতে যাইতেন, সেই গ্রামবাসী প্রজারা তাঁহার মান্যের জন্য ও তাঁহার সৎকার করিবার জন্য অনেক ছাগ "জবাই" করিত। অবশেষে কোন "রা" এই প্রথাটী উঠাইয়া দিয়া এই সমস্ত ছাগগুলি বাৎসরিক তাঁহার নজরস্বরূপ পাঠাইবার অনুমতি করেন। তদবধি ইহাও একটি করস্বরূপ হইয়া পড়ে। "মারে" কর স্বরূপ হইবার পর "রা" কোন গ্রামে যাইলে একমাত্র দারখাঁকেই সমস্ত রাজসেবা করিতে হইত। তখন হইতে প্রজাদের আর কোন প্রকার বাধ্যবাধকতা থাকিলনা। "মারে" কর প্রত্যেক গ্রামের কৃষি জমি ও চরাই জমীর (pasture) অনুপাতানুসারে ধার্য্য হইত। ১০ হইতে ২০ ছাগ পর্য্যন্ত বৎসরে প্রত্যেক গ্রাম হইতে "নজর" পাঠান হইত।

(৩) "দিল্কি"—যে সকল গ্রাম হইতে স্বর্ণ উৎপন্ন হইত, অর্থাৎ যে সকল গ্রামবাসীরা স্বর্ণ ধৌত করিত, সেই সকল গ্রামে প্রত্যেক স্বর্ণধৌতকারী দলকে * বৎসরে "রা"-কে ৫ মাসা সোনা দিত।

(৪) "কুরতাই বা ছুসি"—যে সকল গ্রামে রেশম উৎপন্ন হইত সেই সকল গ্রাম হইতে "রা"র কিছু রেশম প্রাপ্য ছিল।

(৫) "রার ভোলো"—প্রত্যেক লোকের বিবাহ সময়ে রাকে একটী বন্দুক, ছাগ মেষাদি বা কিছু সোনা নজর করিতে হইত।

---

* ৫।৭ জন লোক মিলিয়া স্বর্ণ-ধৌতকরণ কার্য্যে লিপ্ত হয়।

(৬) "তোলো" – রাজদরবারে কোন লোক বিচারপ্রার্থী হইলে, বাদী বা ফরিয়াদিকে প্রথমে ১ তুলু (৪ মাসা) সোনা নজর করিয়া আপনার দুঃখের কথা জ্ঞাপন করিতে হইত।

(৭) বাবরকি বা পানডার—রাজবাটীতে বিবাহোপলক্ষে প্রত্যেক কেল্লা * বা গ্রাম হইতে ৩ তুলু (১২ মাসা) সোনা বা তৎপরিবর্ত্তে মূল্যানুসারে ছাগমযোদি দান করিতে হইত।

(৮) কোন লোক প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হইলে তাহার সম্পত্তি রাজসরকারে দাখিল হইত।

(৯) "লাসপিকারে"– যে গ্রামে "রা"র নিজস্ব খাস জমী থাকিত সেই গ্রাম হইতে ১০ জন লোক পর্য্যায়ক্রমে লাসপিকারে নিযুক্ত হইত। ইহারা "ইয়ারফার" তত্ত্বাবধানে আসিয়া বিনা বেতনে "রা"র জমীর চায বাস করিত।

(১০) "ওয়াইকু"– গিলগিট হইতে দূরবর্ত্তী কয়েকটী গ্রাম হইতে রাজাকে বাৎসরিক কিছু সোনা দেওয়া হইত। নিকটবর্ত্তী গ্রাম হইতে আঙ্গুর প্রভৃতি মেওয়া ইহার পরিবর্ত্তে দেওয়া হইত।

উপরোক্ত করগুলি রাজস্ব। ইহা হইতে উজীর প্রভৃতি কর্ম্মচারীদেরও কিছু প্রাপ্য ছিল। কিন্তু এই সকল কর্ম্মচারীদিগের জন্য স্বতন্ত্র করেও নির্দ্দেশ করা ছিল।

উজীর প্রজাদিগের নিকট হইতে নিম্নলিখিত করগুলি আদায় করিতেন।

(১) "বাগালো"—ইহাকে কর না বলিয়া জরিমানা বলা উচিত। বাগালোর পরিমাণ অর্দ্ধতুলু (২ মাসা) সোনা। নিম্নলিখিত অবস্থায় প্রজাদিগের নিকট হইতে উজীর এই জরিমানা আদায় করিতেন।

(ক) উজীর যখন কোন গ্রামে কেল্লা তৈয়ার করিবার জন্য নিযুক্ত হইতেন, তখন সেই ও তন্নিকটস্থ গ্রাম সকলের প্রজাদিগকে অবৈতনিকরূপে সেই কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইত। কোন কারণবশতঃ যদি কেহ এই কার্য্যে সাহায্য করিতে অপারগ হইত তবে উজীরকে "বাগালো" দিয়া এই কারবেগারি হইতে * মুক্তিনামা লইতে হইত।

* পুরাকালে গ্রামবাসীরা বহিঃশত্রুর আক্রমণভয়ে সর্ব্বদা কেল্লার মধ্যে বাস করিত।

* প্রজাদিগকে অবৈতনিকরূপে কোন সরকারি কার্য্য করিতে বাধ্য করিলে তাহাকে কার বেগার বলে।

(খ) উজীরকে কার্য্যোপলক্ষে কোন গ্রামে যাইতে হইলে সেই ও তন্নিকটস্থ গ্রামসকল হইতে প্রত্যহ এক এক জন লোককে উজীরের নিকট তাঁহার সেবার জন্য পাঠাইতে হইত। কেহ আসিতে অপারগ হইলে উজীরকে বাগালো দিয়া মুক্তি পাইত। কিন্তু যখন তিনি কোন শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতেন, এমন সময়ে কেহ তাঁহার সেবার জন্য আসিতে অক্ষম হইলে তাহাকে দ্বিগুণ "বাগালো" দিতে হইত।

(২) দিলকি কর হইতে "রা" বৎসরে যে সোনা পাইতেন তাহা হইতে বৎসরে ৫ তুলু তিনি উজীরকে দিতেন।

(৩) "মারে" কর হইতে "রা" ৫ টী ছাগ উজীরকে বাৎসরিক দিতেন।

(৪) "জামলি" – ব্যবসায়ীরা নূতন কাপড় বিক্রয়ার্থে আমদানি করিলে, প্রত্যেক গাঁইট হইতে ৫ গজ কাপড় উজীরের প্রাপ্য ছিল।

(৫) প্রত্যেক গ্রামের প্রত্যেক ঘর হইতে বৎসরে ১ টী ছাগ ও ৪ সের ঘৃত উজিরের প্রাপ্য ছিল।

(৬) "লাসপিকারে"—ছয় জন প্রজা বিনা বেতনে উজীরের খাস জমীর চাষ বাস করিত।

(৭) উজীরকে রাজসরকারে কোন কর দিতে হইতেনা।

[ক্রমশ।

বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ।

বিন্দু।

পবনবিজয় নামক স্বরোদয় শাস্ত্রে আয়ুর্হীন ব্যক্তির কতকগুলি লক্ষণ প্রদত্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে একটি এই,

অরুন্ধতীং ধ্রুবঞ্চৈব বিষ্ণোস্ত্রীণি পদানি চ।
আয়ুর্হীনা ন পশ্যন্তি চতুর্থং মাতৃমণ্ডলম্॥

অর্থাৎ আয়ুর্হীন ব্যক্তিরা অরুন্ধতী ধ্রুব শ্রবণা ও মাতৃমণ্ডল (কৃত্তিকা) দেখিতে পায় না। এইরূপ লক্ষণ মহাভারতেও আছে। সুশ্রুতেও আছে।

ন পশ্যন্তি সনক্ষত্রাং যশ্চ দেবীমরুন্ধতীম্।
ধ্রুবমাকাশগঙ্গাং বা তং বদন্তি গতায়ুষম্॥

অর্থাৎ যে ব্যক্তি নক্ষত্রসহ অরুন্ধতী, ধ্রুব ও আকাশগঙ্গা দেখিতে না পায়, তাহার আয়ুঃ শেষ হইয়াছে।

এই প্রকারের লক্ষণের বশিষ্ঠতারার নিকটস্থ অরুন্ধতীর দৃশ্যাদৃশ্যতা সাধারণ লোকের মধ্যেও জানা আছে। বোধ হয়, এই লক্ষণে বয়োবৃদ্ধি বা বার্দ্ধক্যে দৃষ্টিশক্তি-হীনতার উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কথা মনে উঠে। যে সময়ে এইরূপ লক্ষণের সৃষ্টি হইয়াছিল, সে সময়ে কি দূরদৃষ্টিহীনতা ছিল না? স্কুল ও কলেজের ছাত্রদিগের মধ্যেই যে ঐ রোগ জন্মে, এমন নহে। পল্লীগ্রামের স্বচ্ছন্দবিচরণশীল যুবাকেও দূরদৃষ্টিহীন হইতে দেখা গিয়াছে। তবে, এরূপ যুবার সংখ্যা অত্যল্প; স্কুল ও কলেজেই ঐ রোগের প্রসার।

পবনবিজয়ের আর একটি লক্ষণ এই,

কোণমক্ষোঃঙ্গুলীভ্যাস্তু কিঞ্চিৎ পীড্য নিরীক্ষয়েৎ।
যদা ন দৃশ্যতে বিন্দুর্দশাহেন জনো মৃতঃ।

অর্থাৎ অঙ্গুলী দ্বারা চক্ষুর কোণ কিঞ্চিৎ পীড়ন করিলে যদি বিন্দু দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে দশ দিন মধ্যে মৃত্যু হয়। এই লক্ষণটি অন্য কোথাও পাই নাই। বলা বাহুল্য, ইহা জীবনবিদ্যার কথা। চক্ষুর কোণ বা পাশ টিপিলে, সেই কোণ বা পাশের বিপরীত দিকে ময়ূরপুচ্ছের তার-কার মত নানাবর্ণ চন্দ্রাকার আলো দেখা যায়। ইংরাজিতে উহাকে phosgene বলে। পবনবিজয়শাস্ত্রে তাহাকে বিন্দু বলা হইয়াছে। দৃষ্টিশক্তির সহিত ইহার দৃশ্যাদৃশ্যতার সম্বন্ধ আছে। বলা বাহুল্য, এ সম্বন্ধ অরুন্ধতী দেখার তুল্য নহে। *

এক হাত না দুই হাত?

আমরা দক্ষিণ হাত দ্বারাই অধিকাংশ কাজ করিয়া থাকি। অথচ আমাদের বাম হাতও আছে। ছুতর কামার প্রভৃতি কারুকরেরা দক্ষিণ হাত দ্বারা তাহাদের অধিকাংশ কর্ম্ম করিয়া থাকে। অথচ এমন কোন কথা নাই যে বাম হাত চালনা, অভ্যাস করিলে তাহা সেই সকল কর্ম্ম করিতে পারে না। পুরুষানুক্রমে ডান হাত চালনায় এই হাতের পেশী অধিক বলবান্ হইয়াছে। বাল্যকালাবধি বাম হাত ও ডান হাত চালনা করিবার অভ্যাস থাকিলে উক্ত প্রভেদ চলিয়া যায়। এক পুরুষে ঐ প্রভেদ না গেলেও দুই তিন পুরুষে নিশ্চয়ই যায়। লেখা, ছবি আঁকা প্রভৃতি অনেক ছোট ছোট কাজ, যাহাতে তেমন বল আবশ্যক হয় না, অন্ততঃ সে সকল কাজ সমান ভাবে দুই হাতে করিতে পারিলে অনেক লাভ। কোন কাজ করিতে করিতে এক হাত ব্যথা করিলে অন্য হাত লাগান যাইতে পারে। সুতরাং কর্ম্মও অধিক করিতে পারা যায়। জর্ম্মানির বিদ্যালয়ে বাম হাতে লিখিতে ছবি আঁকিতে শিক্ষা দেওয়া বিধিবদ্ধ হইয়াছে। বিশেষতঃ কারুকর্ম্ম শিখাইবার সময় ছেলেরা যাহাতে দুই হাতই সম্যক্ রূপ চালন করিতে পারে তদ্বিষয়ে দৃষ্টি পড়িয়াছে। জাপানেও ছেলেদিগকে দুই হাতে লিখিতে ছবি আঁকিতে শিখান হইয়া থাকে। কেহ কেহ মনে করেন যে, জাপানে এই রীতি প্রচলিত থাকাতে তথাকার কোন কোন শিল্প এত উন্নতি লাভ করিয়াছে। কেবল ডান হাতকেই পীড়ন না করিয়া বাম হাতকেও পীড়ন করিলে যে উপকার আছে, তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। চেষ্টা করিলে এক মাসের মধ্যে বাম হাতে লিখিতে পারা যায়। যাঁহাদের সময় দুর্ব্বহ, তাঁহারা বাম হাতে লিখিতে শিখিয়া অনেকটা সময় কাটাইতে পারেন।

মধুমক্ষিকা ও পিপীলিকা।

তাস পাশা বাহির করিয়া কেহ কেহ সময় কাটাইবার ভাবনা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন। তাস পাশায়, বৃথা গল্পে, পরের কুৎসায় মন না দিয়াও সময় কাটাইবার বহু উপায় আছে। যাঁহারা এই সকল উপায় অবলম্বন করেন, তাঁহারা তাহাতেই প্রভূত আনন্দ লাভ করেন। লর্ড এভ-বেরির (Sir John Lubbock) তুল্য পরিশ্রমী ও নানা কার্য্যে ব্যাপৃত ব্যক্তি অল্পই আছেন। কিন্তু মৌমাছির শ্রবণশক্তি আছে কি না, তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত তিনিও সময় পান। কেবল সময় পাওয়া নহে, সেই কাজে উন্মত্ত হইতে পারেন। মৌমাছিকে দুই তিন

* শুনিয়াছি, কলিকাতার কোন যোগবিদ্যাব্যবসায়ী কাহাকেও শিষ্য করিবার পূর্ব্বে তাহার চক্ষুপীড়ন করিয়া এইরূপ জ্যোতির্ম্ময় ব্রহ্ম দর্শন করাইয়া থাকেন। আমার শোনা কথা বটে, কিন্তু কোন শিষ্যের নিকটেই শোনা। শুনিয়া প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারি নাই যে, জীবনবিদ্যার এই সামান্য ব্যাপার লইয়া শিষ্যের ভক্তি আকর্ষণ করা যাইতে পারে।

মাস ধরিয়া হারমোনিয়াম শুনাইলে, কিংবা কুকুরকে এক দুই তিন গনাইতে চেষ্টা করিলে ঐহিক বা পারত্রিক লাভের আশা নাই বটে, কিন্তু লর্ড এভবেরী ইহাতেই আনন্দ অনুভব করেন। তিনি দেখিয়াছেন, কুকুরের এক দুই তিন ইত্যাদি গনিবার শক্তি নাই, হারমোনিয়ামের যে শব্দ আমরা শুনিতে পাই, মৌমাছি তাহা শুনিতে পায় না। এই দুই সিদ্ধান্ত করিতে তাঁহার কত সময় আনন্দে কাটিয়াছে। তিনি নিশ্চয়ই সময় দুর্বহ মনে করেন না।

আমেরিকার কুমারী ফীল্ডেরও (Miss A. M. Fielde, of New York city) সময় কখন দুর্বহ হয় না। পিপীলিকাকে অন্ধ বলিলেই হয়। কাজেই তাহার নিকট দিনরাত সমান। আলো আঁধার, সব সময়েই পিপীলিকা কাজ করিতে পারে, এবং করিয়া থাকে। অথচ কি রূপে তাহারা পথ চিনিয়া চলে, কিরূপে তাহারা আপনাপন আত্মীয় স্বজন চিনিয়া লয়, তাহা প্রাণিতত্ত্ববিদের নিকট দুরূহ প্রশ্ন ছিল। বহু বৎসর ধরিয়া কুমারী ফীল্ড পিপীলিকার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া উক্ত প্রশ্নের কতকটা সমাধান করিয়াছেন। তিনি বলেন, পিপীলিকা ঘ্রাণ দ্বারা পথ চিনিয়া চলিতে পারে। তাহার মাথার সম্মুখে যে দুইটি রেফ * আছে, তাহাদের প্রত্যেকটির অগ্রভাগে পাঁচটি পৃথক্ পৃথক্ নাসিকা আছে। প্রত্যেক রেফে কতকগুলি পর্ব্ব (সন্ধি) আছে। সেই সকল পর্ব্বের কোনটা দ্বারা পিপীলিকা তাহার নিজের বাসা, কোনটা দ্বারা নিজের পথ, চিনিতে পারে।

আমাদের মধ্যে অনেকেই এই প্রকার পর্য্যবেক্ষণকে ছেলেখেলা ভাবিয়া থাকি। কিন্তু বিলাতের লোকেরা সেরূপ ভাবে না। কবিবর দ্বিজেন্দ্রলাল রায় "বিলেত দেশটা কেমন," তাহার ব্যাখ্যান করিয়াছেন। কবির সহিত, বিশেষতঃ তাঁহার ন্যায় কবির সহিত, লড়াই করা চলে না। নচেৎ বলিতাম, "বিলেত দেশটা মাটির; কিন্তু মানুষ মাটির নয়।"

---

* শাব্দিক পাঠক ক্ষমা করিবেন, পতঙ্গের শুঁড়োকে (antennæ) রেফ বলা গেল।

র‍্যাফেল, চিত্রবিদ্যা ও ম্যাডোনা।

১

হে র‍্যাফেল, চিত্রকাব্যরাজ্যের ভূপতি !
বসিয়া সৌন্দর্য্যহর্ম্ম্যে কি মাহেন্দ্রক্ষণে
আরাধিলে আরাধ্যারে? আনত আননে
আসিয়া উরিলা দেবী, মৌনা সরস্বতী,
ধরাধন্যা চিত্রবিদ্যা! মোহন চরণে
লোভন অরুণকান্তি! কি শান্তি, কি জ্যোতিঃ,
স্বপ্নে-মাখা, কৃষ্ণতার, বিভোর নয়নে !
কি দ্যুতি চম্পকবর্ণে! শোভা মূর্ত্তিমতী !
সহচরীদল সব নীরব, নিচল!
কারো করে বর্ণপাত্র, কাহারো তুলিকা;
কারো হস্তে ফুলসাজি; পাটল কমল
কারো করতলে; কারো শ্রীকণ্ঠে মালিকা!
শত ইন্দ্রধনুবর্ণ দেবীর বসনে,
শত মহাকবিভাব দেবীর লোচনে !

২

কহিলেন কলালক্ষ্মী; "শোনরে বাছনি,
মোর এই নিত্যপূজা গুপ্ত নিকেতনে,
শত ভক্তিউপচারে, অর্চ্চনে, বন্দনে,
প্রীতা আমি। হইবে ওই সুন্দর লেখনী
অমর।" হাসিয়া দেবী, ম্যাডোনার বেশ
ধরিলেন আচম্বিতে; হাসিতে, হাসিতে,
শ্রীঅঙ্কে তুলিয়া নিলা কবিরে ত্বরিতে !
বৈকুণ্ঠে হাসিলা হরি, কৈলাসে দীনেশ।
ম্যাডোনার কণ্ঠলগ্ন ক্ষুদ্রশিশুরূপে,
হাসিছেন খোলাপ্রাণ, ভাবভোলা কবি !
আমি ভাবি, হেরি চিত্র, মুগ্ধনেত্রে, চুপে,
আমিও হইব কবে, ওই শিশু ছবি!
মাগো মা, ভুলিলি মোরে? "বাছা" বলি ডাকি,
সেরেও কোলে নিস্, দিস্নে মা, ফাকি।

কপিলবস্তু।

বৌদ্ধধর্ম্মের তিরোভাবের সঙ্গে ভারতবর্ষ হইতে কপিলবস্তুর নাম পর্য্যন্তও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এখন

আর কপিলবস্তু নামে কোন রাজ্য বা রাজধানী দেখিতে পাওয়া যায় না। অতি পুরাতন দেশ বলিয়া, ভারতবর্ষে যত গ্রাম নগর ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে, অন্য কোন দেশে তত ধ্বংসলীলার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যদুপতির মথুরাপুরী, রঘুপতির উত্তর কোশলা, কোথায় বুদ্বুদবৎ বিলীন হইয়া গিয়াছে;—সে কথা ক্রমে প্রবাদমাত্রে পরিণত হইয়াছে। যদুপতি বা রঘুপতি দৃষ্টান্ত মাত্র; কত নরপতির কত সমুন্নত সৌধশিখর ধূলিপরিণত হইয়াছে,—তাহার তথ্যনির্ণয় করা অসম্ভব।

অগণ্য পুরাকীর্ত্তির সন্ধান প্রাপ্ত হইয়া পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতমণ্ডলী কখন একদেশ মাত্র পর্য্যালোচনা করিয়া, কখন বা কল্পনা জল্পনার সহায়তা গ্রহণ করিয়া ঐতিহাসিক ভ্রমপ্রমাদে পতিত হইয়া থাকেন। কপিলবস্তুর স্থাননির্দ্দেশে এরূপ অনেক ভ্রমপ্রমাদ প্রচলিত হইয়াছিল। ভূগর্ভের নিভৃত নিকেতনে কতবার কপিলবস্তুর কীর্ত্তিচিহ্ন আবিষ্কৃত হইল; কতবার তাহার ভ্রমপ্রমাদ অক্ষরে অক্ষরে প্রতিপাদিত হইয়া গেল! তথাপি ঐতিহাসিক আবিষ্কারের অদম্য অধ্যবসায় পরিশ্রান্ত না হইয়া, আবার অনুসন্ধান কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছিল। তাহার ফলে আমরা আবার একখানি বিচিত্র গ্রন্থ প্রাপ্ত হইয়াছি। *

কপিলবস্তু কোথায় ছিল, তাহা নানা দেশের নানা জাতির লোকেই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকে। শাক্য নরপতি শুদ্ধোদন ও তদীয় পট্টমহিষী মায়াদেবীর পুত্র সিদ্ধার্থ শাক্যসিংহ কপিলবস্তুর সমুচ্চ প্রাসাদপ্রাচীর অতিক্রম করিয়া দীর্ঘতপস্যায় যে নির্ব্বাণপথের সন্ধান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহা অদ্যাপি ভূমণ্ডলের বহুসংখ্যক নরনারীর হৃদয় মন আকর্ষণ করিয়া রাখিয়াছে। তাহাদের নিকট কপিলবস্তু সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পুণ্যতীর্থ। যাঁহারা এসিয়া মহাদেশের জলে স্থলে ভারতীয় শিক্ষা ও সভ্যতার প্রভাব দর্শন করিয়া তাহার রহস্যোদ্ধারে বদ্ধপরিকর, তাঁহাদের নিকটেও কপিলবস্তু বহুবিস্ময়ের লীলাভূমি। সুতরাং কপিলবস্তু কোথায় ছিল, সেকথা অনেকেই জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। পৃথিবীর অধিকাংশ সভ্যজাতি এই প্রশ্নের মীমাংসা করিবার জন্য মৃত্তিকাখনন করিয়া পুরাকীর্ত্তির অনুসন্ধান করিয়া আসিতেছেন। এত কাল পরে এক জন বঙ্গবাসীর হস্তে সেই কীর্ত্তিচিহ্ন আবিষ্কৃত হইয়াছে।

স্বনামখ্যাত শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয় অল্প সময়ে, অল্প ব্যয়ে, হিমালয়ের পদতললগ্ন তরাই অঞ্চলে নেপালরাজ্যের শালবনসমাচ্ছন্ন নতোন্নত ভূমিভাগে ভূগর্ভপ্রোথিত যে সকল কীর্ত্তিচিহ্ন খনন করিয়া লোকলোচনের বিস্ময়োৎপাদন করিয়াছেন, তদ্দ্বারা কপিলবস্তুর রাজদুর্গের পরিখা, প্রাচীর, প্রাসাদ, তোরণ সমস্তই পুনরায় দৃষ্টিগোচর হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে। প্রথম চিত্রে এই ঐতিহাসিক পুণ্যভূমির আভাস প্রাপ্ত হওয়া যায়; ইহা পূর্ব্বদ্বারের চিত্রপট। সমস্তই ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া পড়িয়াছিল; তাহার উপর অরণ্যানী সমুদ্ভূত হইয়া তথ্যানুসন্ধানের সকল চেষ্টা বিফল করিয়া রাখিয়াছিল। বিদেশের বিদ্বন্মণ্ডলী এই নবাবিষ্কারের পথপ্রদর্শক হইলেও, তাহার সহিত এক জন বাঙ্গালীর নামও যে চিরসংযুক্ত হইয়া রহিল, তাহা অল্প আহ্লাদের কথা বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। আমাদের পুরাকীর্ত্তি জনশ্রুতিমাত্রে পর্য্যবসিত হইয়া সত্যের সঙ্গে কবিকল্পনা সংযুক্ত করিয়া তথ্যানুসন্ধানের পথ কিয়ৎপরিমাণে কঠিন করিয়া তুলিয়াছে। কোন কোন পাশ্চাত্য পণ্ডিত সেই জন্য অনুমান করেন,—আমরা সত্যানুসন্ধান কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার মত বিচারবুদ্ধি লাভ করিতে অক্ষম; সংস্কারবশতঃ স্বদেশের প্রচলিত জনশ্রুতিতে আস্থা স্থাপন করিয়া অসত্যকেও সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি। এই সকল সিদ্ধান্ত যে কিরূপ একদেশদর্শী, মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিনব আবিষ্ক্রিয়া তাহা প্রমাণ করিয়া দিয়াছে। তজ্জন্য তিনি আমাদের ললাটপট হইতে একটি কলঙ্করেখা অপনয়ন করিয়া বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিয়া দিয়াছেন।

শাক্যসিংহের ইতিহাসই কপিলবস্তুর ইতিহাসের একমাত্র জ্ঞাতব্য বিষয়। তাহা কল্পনাপ্রসূত অতিপ্রাকৃত কাহিনীপরম্পরায় পরিব্যাপ্ত হইলেও, সুধীর ইতিহাসপাঠক তন্মধ্যে নানা ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান লাভ করিতে পারেন। কপিলবস্তু নামের ব্যুৎপত্তিনির্দ্দেশের জন্য বৌদ্ধসাহিত্যে নানা আখ্যায়িকা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। একটি আখ্যায়িকা

* Report on a Tour of Exploration of the Antiquities in the Terrai, Nepal—By Babu Purna Chandra Mukerjea.

এইরূপ। "সেকালে ইক্ষ্বাকুবংশোদ্ভব কোশলাধিপতির চারি পুত্র ও পাঁচ কন্যা বিমাতার কুটিল কৌশলে নির্ব্বাসিত হইয়া, মহর্ষি কপিলদেবের আশ্রমাভোগে আশ্রয়গ্রহণ করিয়া, মহর্ষির কৃপায় অরণ্যানী মধ্যে এক বিচিত্র রাজধানী সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। তাহার "বস্তু" অর্থাৎ ভূমি কপিলপ্রদত্ত বলিয়া, সেই রাজ্য ও রাজধানী কপিল-বস্তু নামে পরিচিত হয়। সে কত দিনের কথা, ইতিহাস তাহার তথ্যনির্ণয়ে অক্ষম। তাহার নিকটে এবং সমসময়ে কোলী নামক আরও একটি ক্ষত্রিয় জনপদ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। এই উভয় ক্ষত্রিয় রাজ্যের অধিবাসিবর্গের মধ্যে বৈবাহিক সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইয়া, হিমালয়-পাদমূলে শাক্যশাখার ক্ষত্রিয়বংশের শৌর্য্য বীর্য্য সর্ব্বত্র জয়যুক্ত হইয়াছিল। কপিলবস্তুর জয়সেনের পুত্র সিংহহনুর সহিত কোলীরাজ ঔককের কন্যা কাঞ্চনার, এবং ঔককপুত্র অঞ্জনের সহিত জয়সেনদুহিতা যশোধরার উদ্বাহ কার্য্য সুসম্পন্ন হয়। অঞ্জন খৃষ্টাবির্ভাবের ৬৯১ বৎসর পূর্ব্বে যে অব্দগণনা প্রবর্ত্তিত করেন, তাহা "অঞ্জনাব্দ" নামে পরিচিত। দশম অঞ্জনাব্দে অঞ্জনের ভাগিনেয় কাঞ্চনার পুত্র শুদ্ধোদনের জন্ম হয়। দ্বাদশ অঞ্জনাব্দে অঞ্জনের কন্যা মায়াদেবী জন্মগ্রহণ করেন। শুদ্ধোদনের ঔরসে মায়াদেবীর গর্ভে, ৬৮ অঞ্জনাব্দের বৈশাখী পূর্ণিমায় মঙ্গলবাসরে ভগবান শাক্যসিংহ জন্মগ্রহণ করেন।

শাক্যসিংহের আবির্ভাবকাল অদ্যাপি বহুবিতর্কে আচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে। মুখোপাধ্যায় মহাশয় ৬৮ অঞ্জনাব্দ গ্রহণ করিয়া, খৃষ্টাবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী ৬২৩ অব্দে শাক্যসিংহের আবির্ভাব কীর্ত্তন করিয়াছেন। এবিষয়ে নানা মতভেদ থাকিলেও, তাহাতে কপিলবস্তুর স্থাননির্দ্দেশে গোলযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। শাক্যজীবনের নানা কাহিনী নানা-ভাষায় নানারূপে লিপিবদ্ধ হইলেও তাঁহার জীবনী সকল গ্রন্থেই কয়েকটি বিশেষ ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। তাঁহার জন্ম, শিক্ষা, গৃহত্যাগ, সাধন ও ধর্ম্মপ্রচারের প্রথম ও শেষ উদ্যমের কাহিনী সকল গ্রন্থেই প্রায় একরূপ। সকলেই বলেন, তিনি কপিলবস্তুর অদূরবর্ত্তী লুম্বিনীবনে ভূমিষ্ঠ হইয়া কুশী নগরের শালবনে নির্ব্বাণলাভ করেন। এই উভয় স্থলেই রাজাধিরাজ অশোক স্তম্ভস্থাপন করিয়া স্থাননির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। সে স্তম্ভ ও স্তম্ভলিপি বহু পরিব্রাজকের ভ্রমণ-কাহিনীতে উল্লিখিত। এ পর্য্যন্ত যত স্থান জন্মস্থান বলিয়া বিঘোষিত হইয়াছিল, তথায় অশোকস্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায় নাই। মুখোপাধ্যায় মহাশয় যাহাকে জন্মস্থান বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তথায় এই পুরাতন অশোকস্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

রাজপুত্র হইলেও শাক্যসিংহের জন্ম বা মৃত্যু রাজপ্রাসাদে সংঘটিত হয় নাই;—উভয় ঘটনাই বনান্তরালে সংঘটিত হইয়াছিল। আসন্নপ্রসবা মায়াদেবী পতিগৃহ হইতে পিতৃ-গৃহে গমন করিবার সময়ে পথিমধ্যে শালবনে (মতান্তরে অশোককাননে) শাক্যসিংহ ভূমিষ্ঠ হইবার কথা সকল গ্রন্থেই দেখিতে পাওয়া যায়। এবিষয়ে কোন মতভেদ নাই। এই স্থান বৌদ্ধগ্রন্থে "লুম্বিনীবন" নামে পরিচিত। অশোক-স্তম্ভের ন্যায় তথায় মায়াদেবীর মন্দির নামে একটি মন্দিরও নির্ম্মিত হইয়াছিল। তাহা বহুকাল বৌদ্ধতীর্থরূপে পরিগণিত হইয়া পুনঃ পুনঃ সুসংস্কৃত হইয়া বহুদিন তীর্থযাত্রি-গণের আনন্দবর্দ্ধন করিয়া অবশেষে ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া পড়িয়াছিল। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় তাহার যে ভিত্তিমূল আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার চিত্রপট প্রদত্ত হইল। ইহাতে খৃষ্টাবির্ভাবের ও গ্রীক অভিযানের পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের ভারতীয় ইষ্টকালয় নির্ম্মাণের অপূর্ব্ব কৌশল দেদীপ্যমান। যাঁহারা আমাদের স্থপতিবিদ্যা গ্রীকঅনুকরণে সমুদ্ভূত বলিয়া ইতিহাস রচনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা ইহাতে অনেক নূতন তথ্য লাভ করিতে পারিবেন। মানুষের গৃহনির্ম্মাণপ্রয়াস অতীব পুরাতন বলিয়াই স্বীকার করিতে হইবে। তাহা দীর্ঘকালে ধীরে ধীরে নানা কৌশলের উদ্ভাবন করিয়া শিল্প-সৌন্দর্য্যের অবতারণা করিয়াছিল। মায়াদেবীর মন্দিরের ভিত্তিমূলে এখনও যে রচনাকৌশল ও শিল্পসৌন্দর্য্যের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা অতি পুরাকালে প্রচলিত না হইলে, সহসা কপিলবস্তুর সান্নিধ্যে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিত না। কালপ্রভাবে এই সকল কীর্ত্তিচিহ্ন বিলুপ্ত হইয়াছে বলিয়া অনেকে নানা ঐতিহাসিক পাণ্ডিত্য প্রকাশের অবসরলাভ করিয়া আমাদের মৌলিকতায় সন্দেহ উৎপাদন করিতেছেন। এরূপ ঐতিহাসিক গবেষণা অপেক্ষা মায়া-দেবীর মন্দিরের একখানি পুরাতন ইষ্টক অধিক বিশ্বাস-যোগ্য। মুখোপাধ্যায় মহাশয় সেই বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণের

আবিষ্কার করিয়া গ্রীক-অনুকরণবাদী ইতিহাসলেখকগণের তর্কবিতর্কের অসারতা প্রদর্শন করিয়া দিয়াছেন।

শুদ্ধোদনের রাজপ্রাসাদ "ধার্ত্তরাষ্ট্র" নামে পরিচিত ছিল। তাহা নদীতীরে প্রাচীর ও পরিখাবেষ্টিত দুর্গমধ্যে অবস্থিত ছিল। সেকালের দুর্গনির্ম্মাণকৌশল কিরূপ ছিল, সংস্কৃত সাহিত্যে তাহার কিছু কিছু নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। আধুনিক সময় পর্য্যন্তও ভারতীয় দুর্গরচনায় সেই পুরাতন পদ্ধতি অবলম্বিত হইত; তাহা পৌরাণিক বর্ণনার সহিত দুর্গাদির চিত্র দর্শন করিলেই বুঝিতে পারা যায়। প্রাচীর এবং পরিখা দুর্গের সাধারণ বাহুদেশ। প্রাচীরে দ্বার থাকিত; দ্বারে যন্ত্রারূঢ় কপাট থাকিত; তাহা রক্ষা করিবার জন্য অস্ত্র শস্ত্র সুবিন্যস্ত হইত। যুধিষ্ঠির শরশয্যাশায়ী ভীষ্মদেবের নিকট তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইলে, তিনি যে সকল উপদেশ দান করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে দুর্গরচনারও উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাহা মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্বের অন্তর্গত। শুদ্ধোদনের রাজদুর্গের যে বর্ণনা ললিতবিস্তরে প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাও এই শ্রেণীর। এই দুর্গান্তর্গত রাজপ্রাসাদ শাক্যসিংহের শৈশবলীলার তীর্থরূপে বৌদ্ধগ্রন্থে সমাদর প্রাপ্ত হইয়াছিল।

শাক্যসিংহ ভূমিষ্ঠ হইবার এক সপ্তাহ মধ্যে মায়াদেবী স্বর্গারোহণ করায়, তদীয়া কনিষ্ঠা ভগিনী মহাপ্রজাবতী নাম্নী শুদ্ধোদনের দ্বিতীয়া মহিষী সন্তান পালনের ভার গ্রহণ করেন। শাক্যগণ দেবপূজক ছিলেন; শৈব ছিলেন বলিয়াই প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। শাক্যসিংহকে লুম্বিনীবন হইতে প্রাসাদে আনয়ন করিবার সময়ে কুলপ্রথা অনুসারে এক দেবমন্দিরে তাঁহার জাতকর্ম্ম সম্পন্ন হইয়াছিল। এই মন্দির বৌদ্ধসাহিত্যে নানা নামে অভিহিত; কাহারও মতে ইহার নাম যক্ষমন্দির; কাহারও মতে—ঈশ্বরমন্দির। এই মন্দিরে শিব, স্কন্দ, নারায়ণ, বৈশ্রবণ, শক্র, কুবের, চন্দ্র, সূর্য্য, ব্রহ্মাদির দেবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইহাও কালে বৌদ্ধ তীর্থযাত্রিবর্গের দর্শনীয় স্থান বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল।

জাতকর্ম্মের পর নামকরণ সময়ে নবকুমার সিদ্ধার্থ বা সর্ব্বসিদ্ধার্থ নামে অভিহিত হইয়া পৌরজনের আনন্দবর্দ্ধন করিবার সময়ে, তাঁহার কোষ্ঠীফল প্রচারিত হইয়া শুদ্ধোদনকে নিরতিশয় বিষণ্ণ করিয়া তুলিয়াছিল। সকলেই গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন, রাজকুমার সংসারে থাকিলে রাজচক্রবর্ত্তী হইবেন; সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে বুদ্ধত্ব লাভ করিবেন। শুদ্ধোদন পুত্রকে মহারাজচক্রবর্ত্তী করিবার জন্যই লালায়িত হইয়াছিলেন, এবং তদনুরূপ শৌর্য্যবীর্য্য-বিবর্দ্ধক ব্যায়ামাদির শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করিয়া পুত্রের জন্য রম্য, সুরম্য ও শুভ নামক তিনটি অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। রাজকুমার সিদ্ধার্থ ভগবান্ কৌশিকের নিকট শাস্ত্র, এবং শাকদেবের নিকট শস্ত্রশিক্ষা করিয়া, ২৯ বৎসর বয়সে রাজ্য, রাজসিংহাসন, শিশুপুত্র রাহুল ও ধর্ম্মপত্নী যশোধরাকে (মতান্তরে গোপা) পরিত্যাগ করিয়া, পূর্ণিমা রজনীর প্রশান্ত জ্যোৎস্নালোকে "মঙ্গলদ্বার" নামক নগর-তোরণ অতিক্রম করিয়া গোপনে কপিলবস্তু হইতে পলায়ন করিয়াছিলেন! ইহারই নাম—মহাভিনিক্রমণ।

প্রভাতে কপিলবস্তু হাহাকারে পরিপূর্ণ হইয়া গেল; সিদ্ধার্থের কোষ্ঠীফল তাঁহাকে মহারাজচক্রবর্ত্তী না সাজাইয়া সন্ন্যাসী সাজাইয়া সংসার হইতে বিদায় করিয়া দিল! ছয় বৎসরের মধ্যে সিদ্ধার্থ আর সে শোকসন্তপ্ত রাজপুরীতে পদার্পণ করেন নাই। তিনি তখন মগধান্তর্গত উরুবিল্বের বোধিদ্রুমমূলে দীর্ঘতপস্যায় ধ্যানমগ্ন। তাহার পর সিদ্ধার্থ সিদ্ধকাম হইয়া যখন শৈশবের লীলাভূমি কপিলবস্তুর নগরোপকণ্ঠে সশিষ্যে উপনীত হইলেন, তখন সে নবীন সন্ন্যাসীর অলৌকিক পুণ্যপ্রতাপে কপিলবস্তু অভিভূত হইয়া পড়িল; রাজা, রাজপুত্র, রাজামাত্য, কত লোকে নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া সম্ভোগের সিংহাসনে সংযমকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য মহামন্ত্র গ্রহণ করিতে লাগিল!

সে দিন কপিলবস্তুর শাক্য রাজধানী শাক্যসিংহের পুণ্যাশ্রমে পরিণত হইয়াছিল। সংসর্গগুণে লোকচিত্ত সংসারাসক্তি বিচ্ছিন্ন করিয়া সদ্‌গতিকামনায় ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। সিদ্ধার্থের সন্ন্যাসগ্রহণে রাজা শুদ্ধোদন দ্বিতীয় পুত্র নন্দকে সিংহাসনদানের সংকল্প করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ শুদ্ধোদন অভিষেকের আয়োজন করিয়া আনন্দোৎসবের সূচনা করিয়াছেন; নন্দ তাহা উপভোগ করিবার পূর্ব্বেই জ্যেষ্ঠের চরণতলে পতিত হইয়া সিংহাসন ও ছত্রদণ্ডের পরিবর্ত্তে সন্ন্যাসীর চীবরখণ্ড ও ভিক্ষাপাত্র গ্রহণ করি-

লেন। সিদ্ধার্থের শিশুপুত্র রাহুল, আনন্দ, অনিরুদ্ধ প্রভৃতি শাক্যরাজকুমারগণ দলে দলে সন্ন্যাসগ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন; অন্তঃপুরকামিনীগণও মন্ত্র গ্রহণের জন্য লালায়িত হইয়া উঠিলেন। পৃথিবীর ইতিহাসে এমন ঘটনা অল্পই সংঘটিত হইয়াছে!

ইহার পর রাজকুমার সিদ্ধার্থ আরও কয়েকবার কপিলবস্তু প্রদেশে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি বৈশালীতে অবস্থান করিবার সময়ে শাক্য ও কোলী রাজবংশের মধ্যে তুমুল কলহ উপস্থিত হয়। উভয় পক্ষের সৈন্যসামন্ত অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া রোহিণীতটে সমবেত হইয়াছে, এই সংবাদ পাইয়া সিদ্ধার্থ আসিয়া শান্তির প্রতিমূর্ত্তিরূপে বিবদমান সেনাতরঙ্গের মধ্যে অচল গিরিশৃঙ্গবৎ দণ্ডায়মান হইলেন। হিংসা নিরস্ত হইয়া গেল; সাম্য ও মৈত্রীর মহামন্ত্র ধ্বনিত হইয়া উঠিল; শোণিতলোলুপ সেনাদলের বহু ব্যক্তি বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া শস্ত্রের পরিবর্ত্তে শাস্ত্রশাসন স্বীকার করিয়া ধর্ম্ম, সংঘ ও বুদ্ধের জয়ধ্বনি বিঘোষিত করিল।

ইহার পর বৃদ্ধ শুদ্ধোদনের দিন ক্রমে ফুরাইয়া আসিতে লাগিল। তখন সিদ্ধার্থ আসিয়া রুগ্নশয্যাপার্শ্বে উপবেশন করায়, শুদ্ধোদন সহাস্যবদনে আনন্দলোকে মহাপ্রস্থান করিলেন। সিদ্ধার্থ পুনরায় বনগমনে সমুদ্যত হইলে, পঞ্চশত শাক্যরমণী তাঁহার অনুগমনে সমুদ্যত হইলেন। তখনও রমণীগণ সন্ন্যাসের অধিকারে বঞ্চিত ছিলেন। আনন্দের নিরতিশয় কাতরোক্তিতে দয়ার্দ্র হইয়া সিদ্ধার্থ এই সময়ে প্রথম ভিক্ষুণীদল গঠিত করিলেন। এইরূপে শাক্যবংশের অধিকাংশ নরনারী বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করায়, কপিলবস্তুর পুণ্যভূমি শাক্যসিংহের জীবিতকালেই তীর্থরূপে সমাদর লাভ করিল।

শাক্যসিংহের জন্মভূমি পুণ্যতীর্থ মধ্যে পরিগণিত হইয়া বৌদ্ধ তীর্থযাত্রিবর্গের নিরতিশয় যত্ন ও অর্থব্যয়ে নিয়ত সুসংস্কৃত অবস্থায় দীর্ঘকাল লোকসমাজে সুপরিচিত থাকিতে পারিত। কিন্তু শাক্যসিংহের পরিনির্ব্বাণ লাভের পূর্ব্বেই বিরুদ্ধক নামক কোশলাধিপতির ক্রোধবহ্নি কপিলবস্তু ভস্মীভূত করিয়া তাহাকে শ্মশানভূমিতে পরিণত করিয়াছিল। শাক্যসিংহ সে শ্মশানে পদার্পণ করিয়া হতাবশিষ্ট শাক্যগণকে আশ্রয়দান করায়, কপিলবস্তুর অনতিদূরে শাক্যগণ নূতন বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়া পুরাতন রাজধানী পরিত্যাগ করে। কপিলবস্তুর পুরাতন রাজপথপার্শ্বে যে সকল চৈত্য, বিহার, আরাম প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল, তাহা ক্রমে ধ্বংসমুখে পতিত হইয়া স্থাননির্দ্দেশের চেষ্টা বিফল করিবার উপক্রম করে। তখন দেবানাং প্রিয় প্রিয়দশী (অশোক) তদীয় রাজ্যাঙ্কের একবিংশতি বর্ষে বৌদ্ধসন্ন্যাসী উপগুপ্তের সঙ্গে এই পুণ্যতীর্থে উপনীত হইয়া স্তম্ভ স্থাপন করিয়া ও স্তম্ভলিপি খোদিত করাইয়া স্থান নির্দ্দেশের সহায়তা করিয়াছিলেন। কালক্রমে তাহাও বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে!

কপিলবস্তু ও তন্নিকটবর্ত্তী যে সকল স্থান তীর্থরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল, তন্মধ্যে রাজপ্রাসাদ, মঙ্গলদ্বার, লিপিশালা, জন্মস্থান, যক্ষমন্দির, মায়াদেবীর মন্দির প্রভৃতি বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। অশোকের পর খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে ফাহিয়ান এই সকল তীর্থ দর্শনে উপনীত হইয়া, পূর্ব্বচিহ্নাদি বিলুপ্ত হইবার কথা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তখন এখানে রাজা ছিল না, প্রজা ছিল না, ছিল কেবল অরণ্যের পর অরণ্য এবং অরণ্যবিহারী অল্পসংখ্যক সন্ন্যাসী। তাহার পর খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে হিয়াঙ্গ থ্সাঙ্গ আসিয়া দেখিয়াছিলেন—সীমাচিহ্নাদি সমস্তই বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে; তখনও যাহা সম্পূর্ণরূপে ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া পড়ে নাই, কালে তাহাও অদৃশ্য হইয়া পড়িয়াছিল।

কপিলবস্তু কোথায় ছিল, তাহার সাধারণ জ্ঞান লাভ করিলেও, ঠিক্ কোন্ স্থান কপিলবস্তু, তাহা নির্ণয় করা কঠিন হইয়া পড়িয়াছিল। সে অঞ্চলের নতোন্নত ভূমিভাগ সর্ব্বত্র একরূপ,—সর্ব্বত্রই ভগ্নস্তূপ, সর্ব্বত্রই অরণ্যের পর অরণ্য! মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই অরণ্যসমাচ্ছন্ন তরাই অঞ্চলে উপনীত হইয়া, তৌলিভা নামক নেপালী তহশিল কাছারি হইতে অনুসন্ধানকার্য্য আরম্ভ করেন। তথায় অদ্যাপি এক পুরাতন শৈব মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাতে অদ্যাপি সেবাপূজা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। এই স্থানে নানা পুরাকীর্ত্তির চিহ্ন দর্শন করিয়া, মুখোপাধ্যায় মহাশয় ইহাকেই বৌদ্ধসাহিত্যবর্ণিত যক্ষমন্দির কল্পনা





স্তম্ভলিপি।



মায়াদেবীর মন্দিরের ভিত্তিমূল



কপিলবস্তুর রাজদুর্গের ধ্বংসাবশেষ। বর্ত্তমান তিলৌরা কোট



নাইটের স্বপ্ন।

From a photogravure by the Berlin Photographische Gessellschaft.

করিয়া অনুসন্ধান কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। ইহার এক ক্রোশ উত্তরে তিলৌরা। তাহা এখনও পাহাড়ীদিগের নিকট তিলৌরাকোট নামে পরিচিত। কোট শব্দের অর্থ দুর্গ। মৃত্তিকাখনন করাইয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় সে দুর্গের ভিত্তিমূলাদি আবিষ্কৃত করিয়াছেন। নানা প্রমাণে তাহাই কপিলবস্তুর রাজদুর্গ বলিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে।

ভগবানপুর তহশিল-কাছারীর এক ক্রোশ উত্তরে "রুম্মিন্ দেয়ী" * নামে একটি পুরাতন স্থান দেখিতে পাওয়া যায়। তাহাই "লুম্বিনীবন" নামক বৌদ্ধতীর্থ; শাক্যসিংহের জন্মস্থান। লুম্বিনীবনের মায়াদেবীর মন্দির, মায়াদেবীর প্রস্তরমূর্ত্তি এবং অশোকস্তম্ভ আবিষ্কৃত হইয়া সকল সন্দেহ নিরস্ত করিয়া দিয়াছে! লুম্বিনীবন এইরূপে নিঃসন্দেহে নির্ণীত হইয়া, কপিলবস্তুর স্থাননির্দ্দেশে যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছে। এখন অতীতের স্বপ্ন-সমুদ্র সন্তরণ করিয়া সকলেই সেই ইতিহাসবিখ্যাত পুণ্যভূমি প্রত্যক্ষবৎ দর্শন করিয়া কৌতূহল চরিতার্থ করিতে পারিবেন। একজন বঙ্গবাসীর চেষ্টায় যে এই লুপ্তোদ্ধার সাধিত হইয়াছে, তাহা চিরদিন ইতিহাসপাঠকের স্মৃতিপথে আরূঢ় হইয়া বাঙ্গালীর মুখ উজ্জ্বল করিবে।

কি ছিল, কি হইয়াছে, তাহা চিন্তা করিলে, ভারতবর্ষের ইতিহাসের অভাব আরও বিশেষ ভাবে অনুভূত হয়! কিন্তু আধুনিক অনুসন্ধানপরায়ণ পণ্ডিতবর্গের অধ্যবসায়ে যে সকল কীর্ত্তিচিহ্ন ক্রমশঃ আবিষ্কৃত হইতেছে, তদ্দ্বারা পুরাকালের নানা ঐতিহাসিক তথ্য প্রকাশিত হইবার সম্ভাবনা হইতেছে। এ সময়ে যাঁহাদের সময় আছে, শক্তি আছে, স্বদেশের লুপ্তকীর্ত্তির উদ্ধার সাধনের পুণ্যপিপাসা আছে, তাঁহারা অধ্যবসায়ের সঙ্গে তথ্যসংকলনে অগ্রসর হইলে ভাল হয়। কোথায় কোন্ নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইতেছে, তাহার সংবাদ বহনের জন্য মাসিকপত্র অগ্রসর হইলে ঘরে বসিয়া পাঠকগণ নানা তথ্য সংকলন করিতে পারেন। প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয় তজ্জন্য বহুযত্নে চিত্রাদি সংগ্রহ করিয়া, কপিলবস্তু ও পাটলিপুত্রের নবাবিষ্কৃত কীর্ত্তিচিহ্নাদির বিবরণী আমার নিকট প্রেরণ করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। †

* "দেয়ী" "দেবীর" অপভ্রংশ। প্রবাসী-সম্পাদক।

† এই প্রবন্ধের সহিত মুদ্রিত চিত্রগুলি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহীত বহুমূল্য ফোটোগ্রাফ হইতে প্রস্তুত। তিনি আমাদিগকে এই ফোটোগ্রাফগুলি ব্যবহার করিতে অনুমতি দেওয়ায় আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ রহিলাম। কপিলবস্তু সম্বন্ধে আরও প্রবন্ধ ও চিত্র প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। প্রবাসী-সম্পাদক।

স্বপ্ন।

[The Vision of a Knight]

শ্রান্ত, ক্লান্ত কর্ম্মবীর পড়িলা ঘুমায়ে!
দেখিলা অদ্ভুত স্বপ্ন। একটি সুন্দরী,
সুন্দর কুসুমহস্তে; রূপে আলো করি
স্বপ্নরাজ্য; কটাক্ষেতে ভুবন ভুলায়ে;
মধুর মোহন হাস্যে বিশ্বেরে মাতায়ে!
"উঠ বীর, কর, কর মোরে আলিঙ্গন,
পাতিয়াছি ফুলশয্যা তোমার কারণ;"
কহিলা বীরের কর্ণে, বিনায়ে, বিনায়ে!
"শুনো না বচন ওর", কহিলা সুধীরে
ধীরে আসি কর্ম্মদেবী — অপূর্ব্বমোহিনী।
"চিনিলে না ওরে বৎস? কুহকী ডাইনী,
ওর নাম 'ভোগস্পৃহা'। এ কর্ম্ম-অসিরে
ধর; ধর জ্ঞান-গ্রন্থ। কি কাজ আরামে?
'জয় দুর্গা' রবে, বীর, পশরে সংগ্রামে।"

বিবিধ প্রসঙ্গ।

আমরা বর্ত্তমান সংখ্যায় র‍্যাফেএলের অঙ্কিত তিন খানি চিত্রের প্রতিলিপি দিলাম। অধিকাংশ সমালোচকের মতে র‍্যাফেএল পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিত্রকর। স্থপতি ও ভাস্করগণের মধ্যেও তাঁহার স্থান অতি উচ্চ। তিনি ১৪৮৩ খৃষ্টাব্দে ইতালীর অন্তঃপাতী উর্বিনোনগরে জন্মগ্রহণ করেন। ১৫২০ খৃষ্টাব্দে ৩৭ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার এত অল্প বয়সে মৃত্যু হইয়াছিল বটে, তথাপি তিনি ২৮৭ খানি তৈল চিত্র, ৫৭৬ খানি রেখাচিত্র ও নক্‌সা এবং নানা প্রাসাদের প্রাচীরগাত্রে বহুসংখ্যক অপর চিত্র আঁকিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার এক এক খানি চিত্রের মূল্যের কথা শুনিলে অবাক্ হইতে হয়। বিলাতের ন্যাশ্যাল গ্যালারী অর্থাৎ জাতীয় চিত্রশালায় তাঁহার এক খানি মাতৃদেবী-চিত্র (*the Ansidei Madonna*) আছে।

উহা দশ লক্ষ আশী হাজার টাকা মূল্যে ক্রীত হইয়াছিল। আর কোনও চিত্র কখনও এত অধিক মূল্যে ক্রীত হয় নাই। আমরা যে তিনখানি চিত্র মুদ্রিত করিলাম, তন্মধ্যে সিষ্টিন্ ম্যাডোনা (Sistine Madonna) শ্রেষ্ঠ। ড্যানভার্স (D'Anvers) বলেন, ইহা বোধ হয় পৃথিবীর প্রসিদ্ধতম চিত্র (perhaps the most famous painting in the world)। ইহা এক্ষণে জর্ম্মানীর অন্তর্গত ড্রেস্‌ডেন সহরের চিত্রশালা সুশোভিত করিতেছে। যুবা বৃদ্ধ ধনী নির্ধন সকলেই এই চিত্র দেখিতে গিয়া কেহ বা মন্ত্রমুগ্ধের মত ইহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া থাকে কেহ বা ভক্তিভরে নতজানু হয়। অনেক সময় প্রবীণা মহিলাগণকে ইহার সম্মুখে অশ্রুপাত করিতে দেখা গিয়াছে। চিত্রটি দেখিয়া তাঁহাদের হৃদয়ে নূতন আশার সঞ্চার হইয়াছে, তাঁহাদের মুখ নবালোকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে। চিত্রটিতে ঈশাজননী ঈশাকে ক্রোড়ে লইয়া মেঘরাশির উপরে প্রশান্ত দৃষ্টিতে দাঁড়াইয়া আছেন। অসংখ্য স্বর্গদূতগণের মুখমণ্ডল প্রভামণ্ডলের ন্যায় তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছে। সেণ্ট সিক্স্‌টস তাঁহার অনুচরদিগের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া তাঁহাদের জন্য আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিতেছেন, এবং সেণ্ট বার্ব্বারা প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে নিম্নস্থ বিশ্বাসী শিষ্যমণ্ডলীর দিকে চাহিয়া আছেন। অনুচর ও শিষ্যগণ চিত্রে অঙ্কিত হয় নাই। সর্ব্বনিম্নে দুটি সুকুমার দেবশিশু উর্দ্ধনেত্রে মাতৃদেবীর দিকে চাহিয়া আছেন। এই চিত্রটির সৌন্দর্য্য এপর্য্যন্ত কেহই অনুকরণ করিতে পারেন নাই। ধর্ম্মবিষয়কচিত্রাঙ্কণে সুদক্ষ ফ্রান্সিয়া, আধ্যাত্মিক সৌন্দর্য্য অঙ্কণে কেবল র‍্যাফেএলের নিকটই পরাজিত। এহেন ফ্রান্সিয়া এই স্বর্গীয় চিত্রটি দেখিয়া নৈরাশ্যে নিজ তুলি নামাইয়া রাখিয়াছিলেন। কথিত আছে, র‍্যাফেএল এই ঈশাজননী-চিত্রের মুখটি নিজ প্রণয়িণী মার্গারিটার মুখের মত করিয়া আঁকিয়াছিলেন। আমাদের দ্বিতীয় চিত্রটিকে ইংরাজীতে The Vision of a Knight বলে। এক জন যুবা নাইট যোদ্ধৃবেশে নিদ্রা যাইতেছেন। নিদ্রিতাবস্থায় তিনি স্বপ্ন দেখিতেছেন যেন তাঁহার দুই পার্শ্বে দুই নারী দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। এক জন তাঁহাকে পুষ্প উপহার দিতেছেন. দ্বিতীয়া তাঁহাকে তরবারি ও একখানি পুস্তক গ্রহণ করিতে বলিতেছেন। এই চিত্রখানি এখন বিলাতের ন্যাশন্যাল গ্যালারীর শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। "স্বপ্ন" শীর্ষক কবিতাটি পাঠ করিলেই ইহার মর্ম্ম বুঝিতে পারা যাইবে। আমরা র‍্যাফেএলের যে মূর্ত্তি মুদ্রিত করিলাম, তাহা তাঁহার স্বহস্তাঙ্কিত। ইহা এখন ফ্লোরেন্সের চিত্রশালায় আছে। প্রবাসীর আগামী সংখ্যায় র‍্যাফেএলের আরও কয়েকখানি চিত্র মুদ্রিত হইবে। আমরা বহু অর্থব্যয়ে ইউরোপ হইতে এই সকল ছবির ফোটোগ্রাফ আনাইয়াছি। আমাদের এবারকার ম্যাডোনার চিত্র দুই রঙ্গে মুদ্রিত।

***

এ বৎসর সিমলা চিত্রপ্রদর্শনীতে যে সকল দেশীয় চিত্রকর চিত্র প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় ব্যতিরেকে সকলেই মানবমূর্ত্তির চিত্র পাঠাইয়াছিলেন। যামিনী বাবু প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি পাঠাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে "পদ্মানদীতে কুহেলিকাচ্ছন্ন প্রভাতের" দৃশ্যের জন্য তিনি মাননীয় ফিন্‌লে সাহেবের পুরস্কার পাইয়াছেন। তাঁহার "আদ্র গঙ্গাসৈকতে" বিশেষরূপে প্রশংসিত হইয়াছে। "গঙ্গাবক্ষে চন্দ্রোদয়"ও খুব সুন্দর। যামিনী বাবুর দৃশ্য গুলি সম্বন্ধে পাইয়োনীয়ার বলেন— "Mr. J. P. Ganguli exhibits some very charming paintings of Bengal river scenery, either moonlight, misty morning or evening "effects.". They are very poetic in feeling and tender in colour and treatment." ঠাকুর পরিবারের শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ও চিত্রবিদ্যায় প্রতিষ্ঠালাভ করিতেছেন। তাঁহার কয়েক খানি চিত্র শীঘ্রই বিলাতের Studio পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

***

সিমলা প্রদর্শনীতে প্রদর্শিত মিঃ এম্, এফ্ পিঠাওয়ালার অঙ্কিত পার্সী মহিলার চিত্র অনেকের মতে এবারকার এক খানি শ্রেষ্ঠ ছবি। মিঃ ভি, এল্, ধুরন্ধর কর্ত্তৃক অঙ্কিত "দুষ্মন্ত ও শকুন্তলা" ও বেশ সুন্দর হইয়াছে।

ব্রহ্মদেশে বাঙ্গালী।

বঙ্গের সীমা।—বঙ্গ ও ব্রহ্মদেশের সম্বন্ধকাল নির্ণয়ার্থে বঙ্গের সীমা নিরূপণ আবশ্যক। শাসনসৌকর্য্যার্থে রাজ-

তিকবিভাগ বিভিন্ন হইলেও প্রাকৃতিক বিভাগ ও প্রচলিত বর্ণমালা দৃষ্টে নেপাল তরাই হইতে আসাম পর্য্যন্ত বঙ্গাধিকার গণনা করা যাইতে পারে। নেপাল তরাইএর অধিবাসিবর্গের বর্ণমালা অনেকেই দেবনাগরীর অপভ্রংশ বলিবেন সন্দেহ নাই; কিন্তু পূর্ব্বে হিমাদ্রিপদাশ্রিত উক্ত তরাই রাজ্য ত্রিহুত নামে অভিহিত হইত এবং তথাকার তাৎকালীন বর্ণমালা বঙ্গীয় বর্ণমালার সম্পূর্ণ অনুরূপ ছিল। নানা প্রদেশস্থ বৌদ্ধমন্দিরে ত্রিহুতবর্ণমালাঙ্কিত তাম্রফলক ও ঘণ্টাদি এতাবৎকাল তাহার সাক্ষ্য প্রদান করিয়া আসিতেছে। এতদ্ভিন্ন মুসলমান রাজত্বকাল হইতে ঐতিহাসিক উক্ত প্রদেশকে সুবে বাঙ্গলা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছেন। অধুনাও সে নামের অসম্মান করিতে ইংরাজরাজ সক্ষম হন নাই। অধিকন্তু ফাহিয়ান, হিউনৎসঙ্গ প্রভৃতি বিদেশীয় পর্য্যটকগণের ভ্রমণবৃত্তান্ত পাঠে ও বৈদিক এবং পৌরাণিক কালের বর্ণনানুমোদিত আধুনিক মানচিত্র দর্শনে এবিষয়ে বহুল পরিমাণে প্রমাণ পাওয়া যায়। যদি উল্লিখিত কারণসমূহ বঙ্গের সীমানির্ণয়বিষয়ে প্রামাণ্য বলিয়া গ্রাহ্য হয়, তবে ত্রিহুতরাজ্য বঙ্গের উত্তর-পশ্চিম অংশ মাত্র। পুরাকালে শাক্য নৃপতিগণ ত্রিহুতরাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন।

ব্রহ্মের ঐতিহাসিক তত্ত্ব।—প্রসিদ্ধ ইতিহাস মহারাজ-ওয়েঙ্গ পাঠে আমরা অবগত হই বর্ত্তমান খৃষ্টীয় অব্দ প্রবর্ত্তনের কিঞ্চিৎ ঊর্দ্ধ আট শত বৎসর পূর্ব্বে ও শাক্যসিংহের জন্মের সার্দ্ধ পাঁচশত বর্ষ পূর্ব্বে জনৈক শাক্য নৃপতি * রাজ্যের প্রদেশ হইতে পূর্ব্ববঙ্গের দুর্গম অরণ্য ভেদ করিয়া মধ্যব্রহ্মপৌত্রিক প্রদেশে কিয়ৎকাল বাসের পর সদলবলে ব্রহ্মে আসিয়া রাজ্যস্থাপন করেন।

হজসনের মত।—ব্রহ্মের পুরাতত্ত্বপাঠকের নিকট হজসন্ † সুপরিচিত। তিনি বলেন "হিমাদ্রির শতদ্বার (শতদ্রু) হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া ব্রহ্মপুত্রের মধ্যপ্রদেশ—বর্ত্তমান আসাম রাজ্যে—কিছুকাল বাস করিয়া আর্য্যগণ ব্রহ্মে আগমন করেন"। ত্রিহুত রাজ্য পূর্ব্বোক্ত প্রমাণানুসারে বঙ্গাধিকার গণনা করিলে শতদ্রু হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার অত্যল্পকাল মধ্যেই আর্য্যগণ বঙ্গদেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন এবং তথা হইতে ব্রহ্মে পৌছান পর্য্যন্ত তাঁহাদিগকে অনবরত বঙ্গভূমি মন্থন করিয়া আসিতে হইয়াছে। হিউনৎসঙ্গের ভ্রমণবৃত্তান্তে তৎকালীন বঙ্গীয় পঞ্চ বিভাগ মধ্যে আসামের উল্লেখ আছে। পূর্ব্বেই হজসনের মত উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে যে আর্য্যগণ ব্রহ্মে আসিবার পূর্ব্বে কিয়ৎকাল আসামে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তৎকালে আধুনিক উপনিবেশ সংস্থাপনকারিগণের ন্যায় জাহাজে আরোহণ করিয়া সুদূর ব্রহ্মদেশে আর্য্যগণ আসিতে পারেন নাই ইহা অনায়াসেই উপলব্ধি করিতে পারা যায়। বহুবর্ষব্যাপী ভ্রমণের পর বাসোপযোগী স্থান প্রাপ্ত হইয়া তাঁহারা উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, অনুমান করা অযথা বলিয়া মনে হয় না। ইহা ছাড়া মহারাজ-ওয়েঙ্গে গৃহবিচ্ছেদেই শাক্যবংশোদ্ভূত জনৈক নৃপতির রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মে আসার কারণ নিরূপিত হইয়াছে। এ অবস্থায় তিনি যে ব্রহ্মে আসিবার জন্য উপযুক্ত পরিমাণ পাথেয় লইয়া আসিতে পারিয়াছিলেন তাহা বোধ হয় না। ব্রহ্মদেশের অস্তিত্ব এবং দূরত্ব তাঁহারা পরিজ্ঞাত ছিলেন কি না তাহা বিচারসাপেক্ষ। এমত স্থলে নিশ্চয়ই তাঁহাদিগকে স্থানে স্থানে শস্যাহরণ জন্য কৃষিকার্য্য করিতে হইয়াছে সন্দেহ নাই। এই সকল কারণে বিবেচনা হয় তাঁহারা দুই এক পুরুষে বঙ্গের সীমা অতিক্রম করিতে সক্ষম হয়েন নাই। হজসন লিখিয়াছেন "আসামে কিছুকাল বাসের পর আর্য্যগণ ব্রহ্মে আসিয়াছেন"। এই "কিছুকাল" মধ্যে কত কাল নিহিত আছে তাহা কে বলিতে পারে? তবে নিষ্ক্রমণস্থান হইতে ব্রহ্মের ব্যবধান ও তৎকালীন পথের দুর্গমতা বিবেচনা করিলে অনেকটা অনুমান করা যায়।

লেসনের মত।—উপরোক্ত প্রকারে ক্ষত্রিয়রাজার বঙ্গে অভ্যুদয় ও রাজ্য স্থাপনের কথা আমরা অধ্যাপক লেসনের নিকটও অবগত হই। পুরাকালীন ভৌগোলিক বর্ণনা ও

* Probability of Kshatriya tribes having migrated from India (P. 3, Sir A. Phayre's History of Burma).

† Opinion of Hodgson (P. 7, Sir Phayre's History of Burma).

* Bengal (P. 67, R. C. Dutt's Ancient and Modern India).

† Indische. Alterthwnskunde. vol ii. Second book (M. S. translation into English).

ধর্ম্মপ্রসঙ্গ ভিন্ন অন্যান্য বিষয়ে ব্রহ্মভাষায় সংস্কৃত * বাক্যের ব্যবহার দ্বারা তিনি স্বীয় মত সমর্থন করিয়াছেন। তবে তিনি কাল নির্ণয় করিতে সক্ষম হন নাই। লেসন বলেন মণিপুরের মধ্য দিয়া আর্য্যগণ ব্রহ্মে আগমন করেন, এবং যে পথে তাঁহারা আসিয়াছিলেন তাহার নাম এখনও তাঁহাদের নেতার বংশমর্য্যাদায় "মূর্য্য" বলিয়া বিখ্যাত। জনৈক ক্ষত্রিয় রাজা ব্রহ্মে উপনিবেশ স্থাপন করেন সে বিষয় অধিক প্রমাণ বাহুল্য মাত্র। কেবল তাঁহার নাম ও বংশ, নিক্রমণ স্থান ও কালনির্ণয় আবশ্যক। আগমনকারী রাজা ছিলেন, তাঁহার বংশমর্য্যাদায় পথের "মূর্য্য" † নামকরণ হইয়াছে। ইহাতেই মগধ রাজ্যের রাজধানী পাটলিপুত্র হইতে তিনি নিক্রান্ত হন স্থিরীকৃত হইতে পারে। মূর্য্যবংশ খৃষ্টজন্মের ৩২০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে ১৮৩ বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত মগধে শাসনদণ্ড পরিচালনা করেন। অতএব উক্তকাল মধ্যে যে কোন সময়ে একজন ক্ষত্রিয় রাজা ব্রহ্মাভিমুখে যাত্রা করেন ইহা অতি স্থূল সিদ্ধান্ত। ত্রিহুত হইতে বঙ্গদেশের আরম্ভ স্বীকার করিলে বঙ্গদেশ হইতে তিনি ব্রহ্মে পদার্পণ করেন একথাও স্বীকার করা যাইতে পারে।

প্রথম ক্ষত্রিয় রাজা।—মহারাজ ওয়েঙ্গে ব্রহ্মরাজ্য-সংস্থাপনকারী ক্ষত্রিয় রাজার নাম অভিরাজা ‡ বলিয়া লিখিত আছে। শাক্য রাজধানী কপিলবস্তু হইতে ঐরাবতীর মধ্যপ্রদেশে আসিয়া তিনি রাজ্য স্থাপন করেন একথা আমরা মহারাজ-ওয়েঙ্গে দেখিতে পাই। কিন্তু অধ্যাপক লেসনের মতে মগধের রাজধানী পাটলিপুত্র তাঁহার আদিম বাসস্থান। অভিরাজা দুইটী পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। জ্যেষ্ঠের নাম কানরাজগী, কনিষ্ঠের নাম কানরাজঙ্গী। রাজ্যাধিকারসম্বন্ধে উভয় ভ্রাতার মতান্তর উপস্থিত হয়। পরে অপেক্ষাকৃত অল্পকাল মধ্যে যে একটী ধর্ম্মমন্দির গঠনে সক্ষম হইবে সেই রাজ্যের অধিকারী হইবে, এইরূপ স্থির হয়। কৌশলক্রমে কনিষ্ঠভ্রাতা একরাত্রে মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া রাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কানরাজগী অনুচরাদি সংগ্রহ করিয়া খিয়ানডোএঙ্গ তীরস্থ কুবো প্রান্তরে স্বীয় পুত্র মুঙ্গ্ সিডাকে অধিনায়ক করিয়া এক রাজ্য স্থাপন করতঃ তথা হইতে দক্ষিণ-পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিয়া আরাকানে উপস্থিত হন এবং তথায়ই তাঁহার রাজধানী নির্ম্মাণ করেন। আরাকানী পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা এই সূত্র অবলম্বন করিয়া ক্ষত্রিয়কুলে স্বীয় জন্ম বলিয়া লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদেরই গ্রন্থাদি পাঠে পাশ্চাত্য কালতত্ত্ববিদ্‌গণ খৃষ্টজন্মের আটশত * পচিশ বৎসর পূর্ব্বে এই সকল ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

দ্বিতীয় ক্ষত্রিয় রাজা।—পৈত্রিক রাজ্যের অধিকারী কনিষ্ঠ ভ্রাতা কানরাজঙ্গীর বংশধরগণ টগঙ্গে মহাপরাক্রমে রাজত্ব করিতেছেন, এমন সময়ে ইউনানী উপদ্রবে উক্ত বংশীয় শেষ রাজা ভিন্নককে রাজধানী হইতে পলায়ন করিতে হয়। তাঁহার মৃত্যুকালে রাণী নাগসিন জীবিতা ছিলেন। রাজ্যভ্রষ্ট রাজা ও রাণীর অদৃষ্টে আনুসঙ্গিক যে সকল উৎপাত সাধারণতঃ ঘটিয়া থাকে ইঁহাদের অদৃষ্টেও তাহার কোন বৈপরীত্য ঘটে নাই। এই প্রকার বিশৃঙ্খলার মধ্যে আর একজন ক্ষত্রিয় রাজা ব্রহ্মে পদার্পণ করেন, এবং মৃত রাজা ভিন্নক পত্নীকে বিবাহ করিয়া, তিনিই পুনরায় ক্ষত্রিয় রাজধানী টগঙ্গে জয়পতাকা উড্ডীয়মান করেন। এই ক্ষত্রিয় রাজার আগমনবৃত্তান্তের সহিত ব্রহ্মইতিহাসে মূর্য্য শব্দ সংশ্লিষ্ট আছে। তাঁহার আগমনকাল মগধের মূর্য্যবংশীয়গণের সমসাময়িক। তাই মনে হয় অধ্যাপক লেসন্ ইহাকেই প্রথম ক্ষত্রিয় আগমনকারী বিবেচনা করেন। কিন্তু ব্রহ্মইতিহাসে ইঁহার দ্বিতীয় ‡ আগমনকারী বলিয়া লিখিত আছে। রাণী নাগসিনের বংশ হইতে প্রোমে এক রাজ্য স্থাপিত হয়। সেই বংশীয় রক্তই বন্দী রাজা থিবর § ধমনীতে প্রবাহিত হইতেছে বলিয়া কথিত।

---

* Article by H. D. St. Barbe B. C. S., Journal, A. S. of Bengal vol. XLVIII., N. S., P. 253.

† P. 4, Sir A. Phayre's History of Burma.

‡ Tradition as to the first kings in Burmese national history (P. 7, Sir A. Phayre's History of Burma).

* First Arakanese king, P. 8, Sir A. Phayre's History of Burma.

† Second monarchy established and overthrown (P. 9, Sir A. Phayre's History of Burma).

‡ Do Do

§ Monarchy established at Prome, P. 10, Sir A. Phayre's History of Burma.

আরাকানের ইতিহাস।—আরাকানের ইতিহাসে মুর্ব্য রাজন্যবর্গের উল্লেখ আছে। কিন্তু ঐতিহাসিকগণ খৃষ্ট জন্মের ২৬৬৬ বৎসর পূর্ব্বে উক্ত বংশের অস্তিত্ব দেখাইতে গিয়া সত্যের অপলাপ করিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। আরাকানে ৭৮৮ খৃষ্টাব্দে ওয়াথানি নামে এক রাজ্য স্থাপিত হয়। আধুনিক পাটনা সহর হইতে ১০ ক্রোশ উত্তরে তৎকালে যে বৈশালী রাজ্য ছিল, উক্ত ওয়াথালি তাহারই অনুকরণ * বলিয়া সার আরথার ফেয়ার অনুমান করেন। আরাকানের মুদ্রাঙ্কিত চিত্র দৃষ্টে তথায় সে সময়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের প্রচলনের কথা অবগত হওয়া যায়। ওয়াথালির শাসনকর্ত্তাদের উদ্ভববৃত্তান্ত জ্ঞাত হওয়া সুকঠিন। রাজা রাজেন্দ্র লাল মিত্রের † মতানুসারে তাহারা বৈদেশিক রাজা এবং সম্ভবতঃ পূর্ব্ববঙ্গের সেন রাজন্যগণের বংশধর। আরাকাণের ইতিহাস অনুসারে সময় নির্দ্ধারণে তিনি সন্দিহান। উক্ত ইতিহাসোক্ত কাল তাঁহার মতে ভ্রমাত্মক। বুদ্ধগয়ার মন্দিরে এক খণ্ড প্রস্তরোপরি ব্রহ্মভাষায় লিটিযামেঙ্গনাস্ ‡ নামক ঐ বংশীয় জনৈক নৃপতিকর্ত্তৃক ঐ স্থানের মন্দির সংস্কারের বিবরণ লিখিত আছে।

মগ্ শব্দের উৎপত্তি।—ব্রহ্মের যে সমস্ত পৌরাণিক নাম আধুনিক ইতিহাসে পাওয়া যায় তন্মধ্যে অনঙ্গসিংহের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নামের পূর্ব্বে মঙ্গশব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ডাক্তার ফ্রান্সিস্ বুকানন্ ও সার ইউলিয়ম হাণ্টারের অনুসরণ করিয়া মণ্টোগমারি মারটিন পূর্ব্বভারত (Eastern India) নামক যে পুস্তক লিখিয়াছেন তাহাতে মগ শব্দের ব্যাখ্যাকালে বঙ্গের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধবিষয়ে কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছেন। ১৮৭০ সালের আদমসুমারি অনুসারে চট্টগ্রামে মগের সংখ্যা ১০,৮৫২। চট্টগ্রামবাসী মগেরা সকলেই রাজবংশী বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। সপ্তদশ শতাব্দীর জনৈক আরাকানী রাজা চট্টগ্রাম জয় করেন। মারটিন সাহেব পূর্ব্বে চট্টগ্রামের মগদিগকে উক্ত রাজার অনুচরবর্গের ঔরসে তাহাদের বঙ্গীয় স্ত্রীর গর্ভজাত বিবেচনা করিতেন। কিন্তু ডাক্তার বুকানান্ ও হাণ্টারের বর্ণনা পাঠে তাঁহার সে ধারণা অপনীত হইয়াছে। ডাক্তারদ্বয়ের মতে ইহারা মগধের আদিম অধিবাসী *। মগধ হইতে তাঁহাদের মগ নাম ও মগধের রাজধানী রাজগৃহ হইতে তাঁহাদের রাজবংশী কুলোৎপত্তি হইয়াছে। যদি একথা সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে যে মগধের উপনিবেশকারিগণ ব্রহ্মে আসার পূর্ব্বে কিছু কাল বঙ্গে বাস করিয়া আসিয়াছেন সে বিষয়ে আর সন্দেহ থাকে না। পশ্চিমে ত্রিহুত, পাটলিপুত্র ও বৈশালী এবং পূর্ব্বে আসাম পরিত্যাগ করিয়াও আমরা অতি প্রাচীনকাল হইতে ব্রহ্মের সহিত খাস বঙ্গের (Bengal Proper) সম্বন্ধ দেখাইতে সক্ষম হই। বুকানান ও হাণ্টারের মতে চট্টগ্রামের মগগণ মগধের আদিম নিবাসী; কিন্তু তাঁহাদের পরণপরিচ্ছদ, বিশেষতঃ ধর্ম্মযাজকগণের, আবহমানকাল ব্রহ্মদেশীয়ের ন্যায়। ইহাতে তাঁহাদের সহিত ব্রহ্মের আচার ব্যবহার থাকা প্রতীয়মান হয়। ব্রহ্ম ঐতিহাসিকের মতে ব্রহ্মবাসিগণ আর্য্যগণের নিকট বস্ত্রবয়ণ ইত্যাদি শিক্ষা করেন। ব্রহ্মে ও চট্টগ্রামে একই প্রকরণে ধর্ম্মযাজকগণের আশ্রমে বস্ত্রবয়ণ কার্য্য সমাধা হয়। উভয় দেশের সম্বন্ধনির্ণয়ে ইহাও একটী বিশিষ্ট প্রমাণ।

ব্যবসার দ্বারা সম্বন্ধ নির্ণয়।—বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের কৃষি-বিভাগের উচ্চ কর্ম্মকারী মিঃ এন্ এন্ বানারজী লিখিত বঙ্গীয় কার্পাসবিষয়ক প্রবন্ধে বহুকাল পূর্ব্ব হইতে ব্রহ্ম ও বঙ্গদেশে বস্ত্র ব্যবসায় প্রচলিত থাকা দৃষ্ট হয় †।

ব্রহ্মের নানা প্রাদেশিক ইতিহাস—পিগু, পাটন ও ত্রিক্ষেত্র প্রভৃতি কয়েকটী রাজ্যের প্রতিষ্ঠা কাহিনী পাঠেও পূর্ব্ববঙ্গের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ দৃষ্ট হয়। ত্রিক্ষেত্ররাজ্যের রাণী বৈশালী রাজকন্যার গর্ভে পিগুর রাজা কনিষ্ঠের জন্ম হয়। ব্রহ্ম ইতিহাসে দেখিতে পাওয়া যায়, উক্ত রাজার শাসনকালে ভারতবর্ষের কোন নৃপতি ব্রহ্মে আসিয়া তাঁহার কন্যার পাণিগ্রহণ প্রার্থনা করেন। মহারাজ ওয়েঙ্গে ঐ ভারতীয় নৃপতি

* Chandra dynasty, P. 45, Sir A. Phayre's History of Burma.

† Paper by Dr. Rajendra Lal Mittra in Journal A. S. of Bengal, vol. XLVII, P. 384.

‡ Do　　Do　　Do

* Francis Buchanan, vol. i. pp. 22 to 29; vol ii. pp. 114 &c. and Hunter's Statistical account of Bengal, vol. xi pp. 41 and 79.

† Monograph on the Cotton Fabrics of Bengal. by N. N. Banerji, P. 4, L. 9.

পালকর বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র উক্ত পালকর * শব্দ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী কোন বঙ্গীয় বংশ বা বৌদ্ধধর্ম্মপ্লাবিত কোন বঙ্গীয় প্রদেশ নির্দ্দেশার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করেন। তিনি ধ্রুবনিশ্চয়তার সহিত না হইলেও এই প্রসঙ্গে তৎকালীন পালরাজবংশেরও উল্লেখ করিয়াছেন। উক্ত পালকর শব্দ যে বঙ্গের কোন দেশ বা বংশবিশেষ নির্দ্দেশ করিতেছে সে বিষয়ে রাজেন্দ্রলাল স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন—। পালকররাজের পাণিগ্রহণ প্রার্থনা সফল না হওয়ায় তিনি আত্মহত্যা করেন। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই কনিষ্ট রাজার কন্যা একটী পুত্র প্রসব করেন। পালকর রাজের সহিত বিহিতবিধানে বিবাহ বন্ধন না হইলেও রাজা কনিষ্ট নবপ্রসূত দৌহিত্রের ভবিষ্যতে রাজ্যলাভে পাছে বিঘ্ন ঘটে এই আশঙ্কা করিয়া মহাসমারোহে তাহাকে উত্তরাধিকারী বলিয়া ঘোষণা করেন। কনিষ্টের পরলোকগমনের পর উক্ত দৌহিত্র অলঙ্গসিতু সিংহাসনে অধিরূঢ় হন এবং ১০৮৪ খৃষ্টাব্দে আরাকান ও বঙ্গদেশ পরিদর্শন করেন। ১১০৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বুদ্ধগয়ার প্রসিদ্ধ মন্দির সংস্কার করেন। তিনি স্বীয় পিতৃকুল-বঙ্গীয় পালকররাজবংশে বিবাহ করেন।

এণ্ডারসনলিখিত পশ্চিম। ইউনান বিষয়ক পুস্তক ও এসিয়াটিক সমাজের একখণ্ড বিবরণী পাঠে গুপ্ত রাজাদের সময়ে ব্রহ্মের সহিত বঙ্গের বিশেষ সংশ্রবের কথা অবগত হওয়া যায়।

মণিপুরে প্রাপ্ত একখণ্ড শান (Shan) ইতিহাস † হইতে জানা যায়, ৭৬৭ খৃষ্টাব্দে বঙ্গের কোন রাজা আসাম, মণিপুর, কাছাড় ও ত্রিপুরা পর্য্যন্ত অধিকার বিস্তার করেন। এসময়েও যে বঙ্গ এবং ব্রহ্মদেশে ঘনিষ্ট সম্বন্ধ ছিল তাহা সহজেই অনুমেয়।

বঙ্গ ও ব্রহ্মদেশে অতি প্রাচীনকাল হইতেই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ রহিয়াছে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে, যখন ব্রহ্মে ভারতীয় ইংরাজ বণিক সম্প্রদায় আসিতে আরম্ভ করেন, সেই সময় হইতে বঙ্গ ও ব্রহ্মের আধুনিক সম্বন্ধের সূত্রপাত হইয়াছে।

বর্ত্তমান সম্বন্ধ।—১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে বাণিজ্যাদি নানা কারণে ইংরাজের সহিত ব্রহ্মরাজের মতান্তর উপস্থিত হইয়া ক্রমে বাদানুবাদে পরিণত হয় এবং ১৮২৫ খৃষ্টাব্দে প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধ আরম্ভ হয়। এই সময়ে সৈনিক বিভাগের সহিত কিছু বাঙ্গালী ব্রহ্মে আগমন করেন।

১৮৫২ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বভুক্ ডালহউসি মহোদয় নিম্নব্রহ্মে ভারতরাজ্য বিস্তার করেন। তখন শাসনবিভাগীয় নানা সিরেস্তায় বাঙ্গালী কর্ম্মচারী নিয়োজিত হয়েন। প্রকৃত পক্ষে সেই সময়ই বাঙ্গালীর নিকট ব্রহ্মদ্বার উদ্ঘাটিত হয়। তদবধি দলে দলে বাঙ্গালী উদরান্নের অন্বেষণে ব্রহ্মে আগমন করিতেছেন। কলিকাতার প্রতি ডাকজাহাজেই দুই এক জন নূতন বাঙ্গালীর ব্রহ্মে শুভাগমন হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতিরিক্ত চট্টগ্রাম পথে কত বাঙ্গালী ব্রহ্মে আগমন করেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।

জনসংখ্যা।—১৮৯১ সালের আদমসুমারি অনুসারে সমগ্র ব্রহ্মে ৯০১২৩ জন পুরুষ ও ২১৯৬১ জন স্ত্রীলোকের জন্মস্থান বঙ্গে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তৎকালে ১১৫৮০৪ জন ব্রহ্মবাসী পুরুষ ও ৩৬৩৭৭ জন ব্রহ্মবাসিনী স্ত্রীলোকের মাতৃভাষা বাঙ্গালা স্থিরীকৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে ৬৮৬১০ জন পুরুষ ও ৪৫৫৩২ জন স্ত্রীলোক আকিয়াবের অধিবাসী। বঙ্গের সন্নিকট বলিয়া আকিয়াবে বহু বাঙ্গালী স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। সুমার সিরেস্তার হিসাব অনুসারে আকিয়াবের বঙ্গভাষী অধিবাসী মধ্যে শতকরা ১০ জন প্রকৃত বাঙ্গালী। ঐ হিসাব অনুসারে নিম্নলিখিত প্রকরণে ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙ্গালীর আনুমানিক জনসংখ্যা প্রাপ্ত হওয়া যায়। সমগ্র ব্রহ্মের বঙ্গভাষী জনসংখ্যা হইতে আকিয়াবের বঙ্গভাষী জনসংখ্যা বিয়োগ করিয়া বিয়োগাবশিষ্টের সহিত আকিয়াবের বঙ্গভাষী জনসংখ্যার শতকরা ১০ জন যোগ করিলে যে সংখ্যা পাওয়া যায় তাহাই ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙ্গালীর আনুমানিক জনসংখ্যা। উক্ত প্রকারে ৫৪০৪৬ জন পুরুষ ও ২২৩৯৮ জন স্ত্রীলোক ব্রহ্মে প্রবাসে অবস্থিতি করিতেছেন দেখিতে পাওয়া যায়। রেঙ্গুন সহরে বাঙ্গলায় জন্মস্থান এরূপ ১৪৯১৩ জন পুরুষ ও ২২১২ জন স্ত্রীলোক এবং বঙ্গভাষী ১৫৮৩৪ জন পুরুষও ২৯৯৪ জন স্ত্রীলোক বাস করেন। সমগ্র ব্রহ্মে ৬৮৬৫

* Journal A. S. Bengal, vol XLVII, N. S., P. 384.

* Anderson's Repart on the Expedition to Western Yunnan.

† Pemberton's Report on the Easterñ frontier of Bengal.

...৩৫৮ বৈদ্য আছেন। বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের সংখ্যাবধারণ অসম্ভব। সুমার নিকাশে নানা প্রদেশীয় ব্রাহ্মণ একস্থানে প্রদর্শন হইয়াছে। তন্মধ্য হইতে বঙ্গীয় ব্রাহ্মণসংখ্যা ঠিক করা কি প্রকারে সম্ভব হইতে পারে? ব্রহ্মে বহু বাঙ্গালী গোয়ালার ব্যবসায় করে। ব্রহ্মবাসিগণের দুগ্ধ দোহন না করাই বাঙ্গালী গোয়ালার দুগ্ধব্যবসায়ে লাভবান হওয়ার কারণ। বর্ত্তমান বাঙ্গালীর সংখ্যা ১৮৯১ সাল হইতে অনেক অধিক।

সাহিত্য চর্চ্চা।—দৈশিক দৈন্য ও পারিবারিক অভাবই বাঙ্গালীর ব্রহ্মাগমনের কারণ। উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের এখনও দেশে কিঞ্চিৎ আদর আছে। যাঁহারা অল্পশিক্ষিত, দেশান্তরে উঞ্ছবৃত্তি অবলম্বন বই তাঁহাদের উপায়ান্তর নাই। তাই সাধারণতঃ সামান্য শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণই ব্রহ্মে আসিয়া থাকেন। ব্রহ্মবাসী বাঙ্গালীর শিক্ষা কম, অভাব অত্যধিক। একারণ অর্থাগমচিন্তা ব্যতীত অন্য চিন্তা তাঁহাদের হৃদয়ে স্থান পায় না। কাজেই সাহিত্যচর্চ্চা কিম্বা অন্য কোন উচ্চাঙ্গের কার্য্য বাঙ্গালীকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয় না। বঙ্গীয় সামাজিক সমিতি নামে রেঙ্গুনে একটী সমিতি গঠিত হইয়াছে; কিন্তু ধূমপান ও অক্ষক্রীড়া ভিন্ন তথায় অন্য কোন কার্য্য হইতে দেখি নাই। সাময়িক পত্রিকাপাঠ ভিন্ন ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙ্গালীরা অন্য কোন প্রকারে সাহিত্যসেবার কথা অবগত আছেন বলিয়া মনে হয় না। তাহাই বা কয়জনে পাঠ করিয়া থাকেন? শতকরা হিসাব করিতে গেলে গোটা মানুষ দশমিকাংশে বিভক্ত করিতে হয়। অনেকে আজকাল নাট্যাভিনয় দ্বারা সাহিত্যচর্চ্চার পক্ষপাতী। কিন্তু বৎসরের মধ্যে কেবল মাত্র দুই একবার অভিনয় হইলে কি কোন উপকারের আশা করা যায়? শুনিতে পাই উক্ত উদ্দেশ্যে রেঙ্গুনে একটী নাট্যসমিতি গঠিত হইয়াছিল। সমিতির বর্ত্তমান অবস্থা আমরা বিশেষ রূপ অবগত নহি। এক রাত্রির অভিনয়ে এখানে যে অর্থ ব্যয়িত হয়, তদ্দ্বারা অন্য প্রকারে সম্বৎসর সাহিত্যচর্চ্চা হইতে পারে। রেঙ্গুনে ইংরাজীসাহিত্যানুরাগী ব্যক্তির যে সুযোগ আছে অন্য কোন সহরে তাহা আছে কি না সন্দেহ। বার্ণার্ড পুস্তকালয় হইতে বিনা ব্যয়ে যে কেহ পুস্তক আনিতে পারেন। এটি একটি উচ্চাঙ্গের পুস্তকালয়; প্রাদেশিক শিক্ষাবিভাগের গৌরবস্থল। বঙ্গীয় সামাজিক সমিতি, মসলেম পুস্তকালয়, বঙ্গীয় মুসলমান সমাজ ও আর্য্য সমাজ প্রভৃতি কয়েকটি সভাসমিতি কর্ত্তৃক অল্পাধিক পরিমাণে পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছে। বাবু গিরীন্দ্রনাথ সরকার প্রায় ২০০০৲ মূল্যের বাঙ্গলা পুস্তকসম্বলিত একটি পারিবারিক পুস্তকালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত জনৈক রাজকর্ম্মচারী স্বীয় গৃহে একটী পুস্তকালয় স্থাপিত করিয়াছেন। তথায় ভাল ভাল ইংরাজী বিজ্ঞান ও দর্শনবিষয়ক পুস্তক আছে। সাহিত্যচর্চ্চার উপায় আছে, কিন্তু উৎসাহ নাই।

সামাজিক অবস্থা।—সমাজ ও শিক্ষা পরস্পরসাপেক্ষ। শিক্ষার উন্নতি সামাজিক উন্নতির কারণ, সামাজিক উন্নতি শিক্ষোন্নতির পৃষ্ঠপোষক। যেখানে সাহিত্যচর্চ্চা নাই প্রকৃত শিক্ষা তথায় অসম্ভব, তথায় সামাজিক অবনতি অবশ্যম্ভাবী। ব্রহ্মের বাঙ্গালী সমাজবর্জ্জিত, সামাজিকতা ব্রহ্মে অপরিজ্ঞাত। প্রাচীনের প্রাচীনত্ব লইয়া ব্যঙ্গ করা, পরদুঃখে উপহাস করা, বিলাসিতায় জঠরানল নির্ব্বাণের চেষ্টা করা, ইত্যাদি ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙ্গালীর নিত্যকর্ম্মপদ্ধতি।

নৈতিক অবস্থা।—সমাজের বিশেষণেই নৈতিক অবস্থা ব্যাখ্যাত হইয়াছে। পূর্ব্বেকার বাঙ্গালীবর্গের নৈতিক অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল। আধুনিক অবস্থা তদনুরূপ না হইলেও সে অবস্থা একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। বর্ত্তমান বাঙ্গালীগণের মধ্যে অতি সামান্য সংখ্যক লোকের নৈতিক চরিত্র কলুষিত।

আর্থিক অবস্থা।—আর্থিক অবস্থার হীনতানিবন্ধন বাঙ্গালী বঙ্গোপসাগর পার হইয়া ব্রহ্মে আসিয়াছেন তাহা সকলেই জানেন। দেশেই আজকাল আমরা বিলাসপ্রিয় বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিতেছি, এমন সময় বিলাসভবন ব্রহ্মে আগমন করিয়া অর্থনাশের পথ অধিকতর প্রসারিত করিয়াছি। ব্রহ্মে আসিয়াছি সত্য, কিন্তু ব্যয়ের লাঘব হয় নাই, অথবা দেশ হইতে উপার্জ্জন অধিক করি না। নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য দ্রব্যাদিও অপেক্ষাকৃত দুর্ম্মূল্য। এই সকল কারণে অধিকাংশ ব্যক্তিরই আর্থিক অবস্থা ভাল নহে। কেরাণীবর্গের দুর্দ্দশা বরং দেশ অপেক্ষা এখানে বেশী।

শিক্ষা।—প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরে ভ্রমণ করিয়া দেখিলাম ভারতের প্রায় সকল প্রদেশেই অল্পাধিক বাঙ্গালী চাকুরী করিতে গিয়া বসবাস করিতেছেন। কিন্তু নানা প্রকার অভাবে ও কুদৃষ্টান্ত দর্শনে তাঁহাদের সন্তানগণের ভাল শিক্ষা-প্রাপ্তি ঘটে না। এই জন্য সন্তানগণ বঙ্গে থাকিয়াই শিক্ষা প্রাপ্ত হয় ইহা অতি বাঞ্ছনীয়। বিশেষ অন্য প্রদেশের শিক্ষাপ্রণালী তাহাদের পক্ষে সুবিধাজনক নহে। ব্রহ্মের শিক্ষাবিভাগীয় নিয়মানুসারে ব্রহ্মে থাকিয়া সংস্কৃত বা বাঙ্গলা পড়া যায় না এবং এ কোর্শে বি. এ. পরীক্ষা দেওয়া যায় না। তবুও বাঙ্গালীর অসাধারণ মেধা ও অধ্যবসায়-গুণে অনেক সময়ে আমরা অনেক বাঙ্গালী ছেলেকে উচ্চ-স্থান অধিকার করিতে দেখিয়া থাকি। রেঙ্গুনের প্রসিদ্ধ আইনব্যবসায়ী মিঃ পূর্ণচন্দ্র সেন মহাশয়ের শিক্ষাবিভাগে বিশেষ প্রতিপত্তি আছে। অত্রস্থ বঙ্গসন্তানগণের শিক্ষা বিষয়ে তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষিত হইলে সর্ব্বপ্রকার অভাব ও অভিযোগ বিদূরিত হইতে পারে। এখানকার অন্যতম আইনব্যবসায়ী বাবু শ্যামলাল রায় চৌধুরী বহুদিন হইল ব্রহ্মের চীনসীমান্তে একটী প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছিলেন। আমরা আশা করি শ্যাম বাবুর অবস্থোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মের বাঙ্গালী ছাত্রগণের জন্য রেঙ্গুনে একটী উচ্চশ্রেণীর বিদ্যালয় স্থাপিত হইবে।

নানাবিষয়ক উন্নতি সাধন।—ব্রহ্মবাসী বাঙ্গালীর নৈতিক আর্থিক ও শিক্ষা প্রভৃতি সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিই সর্ব্বতোভাবে সামাজিক উন্নতির উপর নির্ভর করিতেছে। ব্রহ্মের বঙ্গীয় সমাজে সদ্ভাব না থাকিলেও অসদ্ভাবের অভাব নাই। সেই কারণেই ইতিমধ্যে কতিপয় বাঙ্গালীকর্ত্তৃক রেঙ্গুনে একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়া বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে। চট্টগ্রামের ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙ্গালীগণের মধ্যে বিশেষ একতা আছে। তাঁহাদের একতায় রেঙ্গুনে দুর্গাবাড়ী স্থাপিত হইয়া সুন্দররূপে পরিচালিত হইতেছে। একতা সামাজিক উন্নতির মূল মন্ত্র। রেঙ্গুনের বঙ্গীয় সামাজিক সমিতির সভ্যগণের একতায় ব্রহ্মবাসী বাঙ্গালীগণের নানা উপকার সাধিত হইতে পারে। তাঁহারা পথ প্রদর্শন করিলে অন্যান্য সহরের বাঙ্গালীগণও সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিবেন সন্দেহ নাই।

ব্রহ্মবাসীর সহিত সদ্ভাব।—বর্ত্তমান অবস্থা দৃষ্টে ব্রহ্মবাসিগণের সহিত বাঙ্গালীর সদ্ভাব রক্ষা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয়। ব্রহ্মবাসিগণের ধারণা তাহারা ভূমণ্ডলে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞানী। এমন কি পাশ্চাত্য জগতের উন্নতাবস্থাও তাহারা অস্বীকার করে। এমত অবস্থায় বাঙ্গালীর সহিত তাহারা সমশ্রেণীভুক্ত হইতে চাহিবে তাহা কি করিয়া আশা করা যায়? নিজের মনে শ্রেষ্ঠতাজ্ঞান থাকসিত্ত্বেও পদে পদে অকৃতকার্য্য হইয়া ব্রহ্মবাসিগণ বিদেশীয়গণের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া গিয়াছে। বিশেষতঃ সরকারী সিরেস্তাসমূহে তাহাদের অনাদর ও কার্য্যকুশল বাঙ্গালীর আদর থাকা হেতু বাঙ্গালী তাহাদের পরম শত্রু মধ্যে গণ্য। যত দিন ব্রহ্মবাসিগণের অযথা আত্মগরিমা বিদূরিত না হইবে, যত দিন না ব্রহ্মবাসিগণ উচ্চশিক্ষা প্রাপ্ত হইবে, যত দিন না ব্রহ্মবাসিগণ বাঙ্গালীকে স্বদেশী মনে করিতে শিখিবে এবং সর্ব্বোপরি যত দিন ব্রহ্মবাসিগণ সাম্যবাদ, অহিংসা ইত্যাদি বৌদ্ধধর্ম্মের সার মর্ম্ম অবগত না হইবে, তত দিন এ বিদ্বেষ ভাব কিছুতেই দূর হইতে পারে না।

ব্রহ্মগ্রন্থ পাঠে উপকার।—অধুনা বৌদ্ধ ধর্ম্ম সম্পূর্ণ অঙ্গহীন অবস্থায় ব্রহ্মে প্রচলিত। শাক্য সিংহের মহাধর্ম্মের এ অধঃপতন হৃদয়বানের অসহনীয়। ব্রহ্মের ধর্ম্মগ্রন্থ সদ্ভাবপূর্ণ। ধর্ম্ম ও নানাবিষয়ক ব্রহ্মসাহিত্য পাঠ করিলে বাঙ্গালী হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্ম্মের সম্বন্ধ জ্ঞাত হইয়া ও ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের পৌরাণিক ইতিবৃত্ত সংগ্রহ করিয়া নিজের ও দেশের অনেক উপকার করিতে পারেন।

ব্রহ্মবাসীর স্বভাবে অনুকরণীয় গুণ।—কোপনস্বভাব ব্রহ্মবাসীর চরিত্রে বাঙ্গালীর অনুকরণীয় কিছুই নাই। ইংরাজ লেখকগণ ব্রহ্মবাসীকে দাম্ভিক, মিথ্যাবাদী, প্রবঞ্চক ইত্যাদি নানা বিশেষণে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। আমাদের সে বিষয় অধিক বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন। তবে ব্রহ্মের সামাজিক আচার ব্যবহার হইতে বাঙ্গালী স্ত্রীশিক্ষা অনুকরণ করিতে পারেন। ব্রহ্মের স্ত্রীস্বাধীনতা ভয়াবহ। অত্যধিক স্বাধীনতা হেতু ব্রহ্মরমণী স্বীয় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করতঃ ভিন্ন দেশীয়ের সহিত পরিণীতা হইয়া ব্রহ্ম জাতির অস্তিত্ব লোপ আশঙ্কার কারণ হইয়াছে। অনেক বঙ্গীয়মুসলমানের ব্রহ্মস্ত্রী আছে। এই সম্প্রদায়ের মুসলমান জেড়বাড়ী নামে ব্রহ্মে পরিচিত।

বাঙ্গালীর কার্য্যক্ষেত্র। -অপেক্ষাকৃত শিক্ষিত বাঙ্গালীগণের মধ্যে প্রায় সকলেই এখানে চাকুরী করেন। কয়েকজন মাত্র আইনব্যবসায়ী, ঠিকাদার ও দোকানদার আছেন। চাকুরীর অবস্থা সর্ব্বত্রই সমান। ব্যবসার পক্ষে ব্রহ্মদেশ উপযুক্ত ক্ষেত্র। এমন কি আইন ব্যবসাও এখনও পর্য্যন্ত বিশেষ লাভজনক মনে হয়। ব্রহ্মের উর্ব্বরতা ও কর্ষণোপযোগী অকর্ষিত ভূমি দৃষ্টে কৃষিকার্য্য লাভজনক বলিয়া সকলেরই বিশ্বাস। কিন্তু বাঙ্গালীর মধ্যে কেহই সে দিকে হস্ত প্রসারণ করেন নাই। বঙ্গীয় জমীদারগণ এ বিষয়ে চেষ্টা করিলে ব্রহ্ম ও বঙ্গের বিশেষ উপকার সাধন করতঃ নিজেরা লাভবান হইতে পারেন। ডুমরাওয়ানের দেওয়ান ৺ জয়প্রকাশ লাল এখানে জমীদারী করিয়া দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট অনেক ভারতবাসীর অন্নের সংস্থান করিয়া দিয়াছেন। ব্রহ্মের ১৩০ কোটি বিঘা জমী কর্ষণোপযোগী বলিয়া সরকার বাহাদুর স্থির করিয়াছেন। তন্মধ্যে কেবল মাত্র ১০ কোটি বিঘা জমী বর্ত্তমানে কর্ষিত হইতেছে। তদুৎপন্ন ধান্য হইতে সমগ্র ব্রহ্মের খাদ্য রক্ষিত হইয়া প্রতি বৎসর ২৭ কোটী মন ধান্য বিদেশে রপ্তানী হইয়া থাকে। ব্রহ্মে ৮ কোটী লোকের স্থানে ৩৩ কোটী লোক বাস করিলেও স্থানসঙ্কীর্ণতা বোধ করিতে হয় না। প্রতি বর্গ মাইলে বর্ত্তমানে কেবলমাত্র ৪৬ জন লোক বাস করে।

প্রসিদ্ধ প্রবাসী।—রেঙ্গুনের প্রসিদ্ধ আইনব্যবসায়ী মিঃ পূর্ণচন্দ্র সেন ব্রহ্মবাসী বাঙ্গালীর নেতা। তিনি স্বীয় উদারতায় সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র হইয়াছেন। রেঙ্গুনের অন্যতম আইনব্যবসায়ী বাবু কুঞ্জবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহদ্বার নবাগত বাঙ্গালীর নিকট নিয়তই উন্মুক্ত। পরদুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করিতে ব্রহ্মে আর এমন বাঙ্গালী নাই। "রাজদ্বারে শ্মশানেচ যস্তিষ্ঠতি স বান্ধবঃ" এই মহাবাক্যানুসারে কুঞ্জ বাবু ও বাবু অক্ষয়কুমার দে মহাশয়ই রেঙ্গুনবাসীর প্রকৃত বান্ধব। কারণ শবদাহ করিতেও সময় সময় লোকের অভাব হয়, কিন্তু ইঁহারা সর্ব্বত্রই সে কার্য্যে সহায় হন। চাকুরে সম্প্রদায়ে বর্ত্তমানে কাহাকেও বিশেষ উল্লেখযোগ্য মনে হয় না। তবে ভূতপূর্ব্ব ডিঃ একাউণ্টেণ্ট জেনেরেল শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ভট্টাচার্য্যের নাম অনেককেই কীর্ত্তন করিতে শুনিতে পাওয়া যায়। তাঁহার দ্বারা অনেক দুঃখী পরিবারের অন্নকষ্ট দূর হইয়াছে। উক্ত পদে উপেন্দ্রলাল মজুমদার মহাশয় আসিয়াও বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ঠিকাদারী ব্যবসায়ে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রনাথ দে, শিবনাথ রক্ষিত, জয়চন্দ্র দত্ত ও শশিকুমার ঘোষ মহাশয়েরা বহু অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছেন শুনিতে পাই। কিন্তু তাঁহারা বাঙ্গালীর উন্নতিকল্পে কিছু করিয়াছেন বলিয়া আমরা শুনি নাই। মৃত লক্ষ্মীচন্দ্র সেন ওরফে এল. সি. সেন ব্যারিষ্টারী করিয়া রেঙ্গুনে বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ইঞ্জিনিয়ার বাবু অহীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় শিক্ষিত ও উদারচেতা। শুনিতে পাই তিনিও অনেক স্বদেশীর উপকার করিয়া থাকেন। বঙ্গকুলতিলক ৺ রামগোপাল ঘোষ রেঙ্গুনে থাকিয়া বাণিজ্য করিতেন সে কথা আমরা পূর্ব্বে অবগত ছিলাম না। তাই সর্ব্বশেষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মপ্রবাসী বাঙ্গালীর নাম করিলাম।

প্রবাসীর নিয়মাবলী।

১। প্রবাসীর প্রত্যেক সংখ্যায় অন্যূন ৩২ পৃষ্ঠা লেখা থাকে। চিত্রের সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট নাই; বিষয় অনুসারে কম বেশী হয়।

২। প্রবাসী সাধারণতঃ মাসের শেষ দিনের মধ্যে বাহির হয়।

৩। কোন গ্রাহক কোন মাসের প্রবাসী না পাইলে তাহার পর মাসের ১৫ই তারিখের মধ্যে আমাদিগকে না জানাইলে আমরা ক্ষতি পূরণ করিতে বাধ্য হইবনা।

৪। কোন গ্রাহক আমাদিগকে পূর্ব্বেই পত্র লিখিয়া ঠিকানা পরিবর্ত্তন না করিলে, ঠিকানা পরিবর্ত্তনের গোলমালে অপ্রাপ্ত কোনসংখ্যা পাইবার দাবী করিতে পারিবেন না।

৫। পূর্ণ অগ্রিম মূল্য লইয়া বা ভি পি তে প্রবাসী পাঠানই নিয়ম। কেহ এই নিয়মের ব্যতিক্রম করিতে অনুরোধ না করিলে বাধিত হইব। নমুনা চাহিলে এক খণ্ডের মূল্য ।/০ দিতে হয়।

৬। প্রথম অর্থাৎ বৈশাখসংখ্যা ব্যতীত অন্য কোন সংখ্যা হইতে কাহাকেও গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত করা হয় না।

৭। প্রবাসীতে সকল পুস্তকের সমালোচনা করা হয় না।

৮। টিকিট এবং লেখকের ঠিকানা দেওয়া থাকিলে অমনোনীত রচনা ফেরত দেওয়া হয়। পত্রের উত্তর চাহিলে টিকিট কিম্বা পোষ্টকার্ড পাঠাইতে হয়। কোন রচনা কেন মনোনীত হইল না, তাহা নির্দ্দেশ করিতে আমরা অসমর্থ।

৯। টাকাকড়ি চিঠিপত্র সমুদয় আমার নামে প্রেরিতব্য।

১০। চিঠি লিখিলে বিজ্ঞাপনের নিয়ম পাঠান হয়।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, এলাহাবাদ।

প্রবাসীর এজেণ্টগণ।

১। শ্রীরাখালদাস পালধি, পর্য্যটক। ২। শ্রীমনোমোহন দাস, পর্য্যটক। ৩। শ্রীসুরেন্দ্রনাথ হালদার, সঞ্জীবনী অফিস, ৬ কলেজ স্কোয়ার কলিকাতা। ৪। কার্য্যাধ্যক্ষ, বিধানবুক ডিপজিটরী, ৮৬।২ হারিসনরোড্, কলিকাতা। ৫। শ্রীহরিচরণ দাস, বরিশাল। ৬। শ্রীবিভূতিভূষণ সরকার, পর্য্যটক। ৭। ডাক্তার সুরেন্দ্রনাথ দত্ত, শিলচর। ৮। শ্রীজয়কুমার নন্দী, শিলং। ৯। শ্রীভোলানাথ ঘোষ, নারায়ণগঞ্জ। ১০। শ্রীসুরেশচন্দ্র রায় চৌধুরী, পর্য্যটক। ১১। শ্রীবিশ্বনাথ পাল, এলাহাবাদ। ১২। শ্রীগোপালচন্দ্র মজুমদার, নাগপুর। ১৩। শ্রীরামেশ্বর ঘোষ, কলিকাতা।



পূতশীলা সিসীলিয়া।

Raphael's St. Cecilia.

Double Printing by the
Kuntaline Press, Calcutta.

Duotype blocks by U. Ray.

প্রবাসী

. দ্বিতীয় ভাগ। { আশ্বিন, ১৩০৯। } ৬ষ্ঠ সংখ্যা

অজ্ঞাত অতিথি।

নীরব নিশীথ; শুধু ঝিল্লী-রব,
ঘুমের আহ্বান সম,
ধ্বনিতেছে স্তব্ধ কুটীরের মাঝে;
মুদে আসে আঁখি মম।

নিশীথ-প্রাণের মর্ম্মব্যথা সম
কাঁদে বায়ু মৃদু স্বনে;
শিয়রে আঁধার বসিয়া নীরবে
চেয়ে আছে মুখপানে।

কেহ নাহি কাছে; শুধু সাথী মোর
অন্তরের ব্যথা খানি;
নিরজন প্রাণে শুধু ধ্বনে আসি
স্মিরিতির পদধ্বনি।

এহেন সময়ে দুয়ারে ধ্বনিল
কাহার আহ্বান ধ্বনি?
সকরুণ স্বরে কে বলিল ডাকি,
"অতিথি এসেছি আমি।"

যেন পরিচিত, তবু না চিনিনু
কার সে মধুর স্বর;
বলিনু ডাকিয়া, "বলগো আমারে
কে তুমি অতিথিবর?

নাহি মোর স্থান, গ্রহিতে তোমারে;
কে তুমি আইলে হেথা?—

যেন ওই তব করুণ আহ্বান
দুয়ারে কাঁদিবে বৃথা"।

নীরব অতিথি, উত্তরিলা শুধু
সুগভীর দীর্ঘশ্বাসে;
ব্যথিত হইয়া খুলিনু দুয়ার
আনিতে তাহারে পাশে।

দেখিনু বাহিরে, কেহ কোথা নাই;
শুধু আঁধারের ছায়,
ঘুমায়ে রজনী; কাঁদিয়া পেচক
আপনার ব্যথা গায়।

রয়েছে পড়িয়া শূন্যপ্রাণে হায়!
নিরজন পথ খানি,
অতিদূরে যেন ধ্বনিছে কাহার
চরণের প্রতিধ্বনি।

মনে হলো যেন ছায়া খানি কার
মিলায়ে যাইল দূরে,
শত তপস্যায় শত সাধনায়
আর না আসিবে ফিরে।

কে গেল চলিয়া ব্যথিত পরাণে?
মুহূর্ত্তের অনাদরে,
যত শূন্য পথে চায় আঁখি মম
তত ভরে অশ্রুজলে।

যত ভুলিবারে চাই হায় সেই
অবিজ্ঞাত অতিথিরে,

দুস্বপন মত দীর্ঘশ্বাস তার
কাঁদি তত কাছে ফিরে।

লজ্জাবতী বসু।

অনঙ্গপ্রভা।

প্রথম অধ্যায়।

শারিকা পঞ্জরস্থা।

[অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে বাকাটকবংশীয় প্রথিতনামা প্রবরসেন, একালের মধ্যপ্রদেশের চাঁদা নগরীর অনতিদূরে, প্রবরপুর নামে একটি নগর প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচীন রাজধানী সম্পূর্ণরূপে পরিত্যক্ত না হইলেও রাজা প্রবরসেন এখানেই সপরিবারে বাস করিতেন। পূর্ব্বকালে বাকাটক রাজগণ দক্ষিণাঞ্চলের অনার্য্যরাজাদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ করিতেন। এমন কি, প্রবরসেনের প্রপিতামহ রুদ্রসেন, অনার্য্য লিঙ্গউপাসক রাজা ভবনাগের কন্যাকে বিবাহ করিয়া স্বীয় বংশে অনার্য্যদেবপূজার প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রবরসেনের পিতা দ্বিতীয় রুদ্রসেন, মগধাধিপতি আদিত্যসেনের পৌত্রী প্রভাবতী গুপ্তাকে বিবাহ করিয়া অনার্য্যসংশ্রব পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, যে এই জন্যই স্বনামাঙ্কিত প্রবরপুরেই রাজা প্রবরসেন বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। আখ্যানকের সময়টি বুঝাইবার জন্য এই প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক কথা সূচনাস্বরূপে লিখিলাম।]

রাজপ্রাসাদসংলগ্ন উদ্যানে, রাজকুমারী অনঙ্গপ্রভা, প্রভাতে এবং সায়াহ্নে ক্রীড়া করিতেন। রাজসেনাপতি বাপ্পাদেবের পুত্র সুব্রত, তাঁহার বাল্যক্রীড়ার প্রধান সহচর ছিলেন। তাঁহারা আশৈশব একত্রে খেলা করিয়া আসিয়াছেন, এখনও করিতেন। এখনও করিতেন; কেননা রাজকুমারীর বয়স দ্বাদশ বর্ষও উত্তীর্ণ হয়নাই, এবং সুব্রতও চতুর্দ্দশবর্ষীয় বালক মাত্র।

ইহাকে প্রেম বলিতে চাও, ভালবাসা বলিতে চাও, অনুরাগ বলিতে চাও, যাহা বলিতে চাও বল; অনঙ্গপ্রভাকে দুবেলা দেখিতে না পাইলে সুব্রতের ভাত হজম হইত না। অনঙ্গপ্রভা বালিকা; কিন্তু সে বুঝিতে পারিত যে সুব্রত তাহার দুটি কথা শুনিবার জন্য, তাহাকে একটুখানি খুসী করিবার জন্য, সর্ব্বদাই উৎসুক। বুঝিতে পারিয়া সে নানা রকম দুষ্টামি করিত। যখন দেখিত যে সুব্রত তাহার সঙ্গে কথা কহিবার উদ্যোগ করিতেছে, তখন ছুটিয়া দূরে গিয়া অন্য কাহারও সঙ্গে গল্প জুড়িয়া দিত। তাহার পর আবার যখন দেখিত যে সুব্রত ম্লানমুখে একাকী কোথাও বসিয়া আছে, তখন চুপে চুপে পিছন হইতে গিয়া, হয় তাহার চোখ টিপিয়া ধরিত, না হয় একটা কিল মারিত। সুব্রতের আহ্লাদের সীমা পরিসীমা থাকিত না। এইরূপে সুব্রতের চিত্তগগন কখনো মেঘে ঢাকিয়া, কখনো রৌদ্রে প্রভাসিত করিয়া, অনঙ্গপ্রভা খেলা করিত।

একদিন প্রভাতকালে অনঙ্গপ্রভা একাকিনী উদ্যানের ছায়াতলে বসিয়া একটি শালিক পাখীকে একবার খাঁচায় পুরিতেছিল, একবার বাহির করিতেছিল, একবার তাহার গায়ে হাত বুলাইয়া দিতেছিল, একবার তাহাকে তিরস্কার করিতেছিল, এবং এইপ্রকারে আরও নানা রকমে পোষা পাখীটি লইয়া খেলা করিতেছিল। খেলার সঙ্গী সঙ্গিনীরা আজ কেহই কাছে ছিলনা; সহসা শালিকটি উড়িয়া গিয়া একটা গাছের শাখায় বসিল। বালিকা ব্যস্ত হইয়া আয় আয় বলিয়া ডাকিল; পাখীটি আরও একটু উঁচু ডালে বসিল। দুধমাখা ছাতুর বাটিটি হাতে উঁচু করিয়া ধরিয়া ডাকিল, দুষ্টপাখী খুব বড় একটা গাছের উপরে গিয়া বসিল। রাজকুমারীর চোখে জল আসিল; কাহাকে ডাকিবে ভাবিয়া পিছন ফিরিয়া দেখে, সুব্রত অলক্ষ্যে আসিয়া পশ্চাতে দাঁড়াইয়া আছে। অনঙ্গপ্রভা তখন পাখীটির দিকে চাহিয়া বলিল, "যে আমার পাখীটি ধরিয়া আনিয়া দিবে আমি তাহাকে বিবাহ করিব।" "যে" বলিতে ত সেখানে সুব্রত একা। সুব্রত তখন কাপড়খানি গুছাইয়া পরিয়া, কিরাতের মত ক্ষিপ্রভাবে এবং নিঃশব্দে গাছে উঠিয়া এ ডাল ও ডাল করিয়া পাখীটি ধরিয়া আনিল। অনঙ্গপ্রভা তখন আনন্দে কম্পিত-হস্তে খাঁচা বন্ধ করিয়া পাখীকে অনেক তিরস্কার করিল, কিন্তু সুব্রতকে ভাল মন্দ কিছুই বলিলনা। সে যাহাই করুক, সুব্রত একদৃষ্টে তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া রহিল। কিছুক্ষণ পরে অনঙ্গপ্রভা বাম হস্তের তর্জ্জনীটি নাকের উপর রাখিয়া এবং অবশিষ্ট অঙ্গুলিগুলি চিবুকের উপর স্থাপন করিয়া, অর্দ্ধঅবনত দৃষ্টিতে হাসিয়া হাসিয়া বলিল, "আমি তামাসা কচ্ছিলুম; আমি রাজার মেয়ে, আমি কি যাকে তাকে বে করিতে পারি"? সুব্রত কথা কহিল না; অধোমুখে দাঁড়াইয়া একটি বালপাদপের শাখা ভাঙ্গিয়া নিঃশেষ করিল। এমন সময় একজন পরিচারিকা আসিয়া রাজ-

কুমারীকে অন্তঃপুরে যাইবার জন্ত রাজমহিষীর আজ্ঞা জ্ঞাপন করিল। পিঞ্জরস্থা শারিকা পরিচারিকার হাতে দিয়া বালিকা ছুটিয়া পলাইল।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

শরবিদ্ধ।

যে সময়ের কথা হইতেছে, তখন অবরোধপ্রথা ছিল না, শৈশববিবাহও ছিল না। কিন্তু রাজমহিষী ভাবিলেন যে দ্বাদশবর্ষীয়া বালিকার পক্ষে বালকদের সহিত খেলা করা ভাল নয়; এই জন্ত অনঙ্গপ্রভাকে সুব্রত আর সদা সর্ব্বদা দেখিতে পাইতেন না। যখনও বা দেখিতে পাইতেন তখন রাজকুমারী অন্ত দশ জনের সঙ্গে থাকিতেন। দেখিতে দেখিতে দুই তিন বৎসর অতিবাহিত হইয়া গেল। বাপ্পাদেব পুত্রকে যুদ্ধবিদ্যায় সুশিক্ষিত করিতেছিলেন; পুত্রও তাঁহাতে অমনোযোগী ছিলেন না। বরং তিনি সুশিক্ষিত হইয়াছিলেন, সকলেই এই কথা বলিত। কিন্তু একথাও প্রকাশ হইল যে, একদিন বাপ্পাদেব তাঁহাকে একখানি তালপত্রে সুরক্ষিত দুর্গ অঙ্কিত করিয়া দিয়া, কি প্রকারে দুর্গ ভেদ করিতে হইবে, তাহা প্রদর্শন করিতে আদেশ দিয়াছিলেন। সুব্রত সেই তালপত্রে মদনদেবকে লক্ষ্য করিয়া শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন যে "হে পুষ্পধন্বা! তুমি যদি দুর্গভেদে সহায়তা কর, তবেই সিদ্ধি লাভ করিব"।

সহসা এই সময়ে দক্ষিণ কোশলের রাজার সহিত প্রবরসেনের একটি যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিল। মেখলা পর্ব্বতের পশ্চিমে বাকাটকরাজ্য, পূর্ব্বে দক্ষিণ-কোশল; তথাপি সীমা লইয়া বিবাদ উঠিল। কূললঙ্ঘন, রাজবাহিনী ও প্রবাহিণীর প্রাকৃত ধর্ম্ম।

যথোচিত আয়োজনের পর রাজা যুদ্ধযাত্রা করিলেন; সেনাপতি বাপ্পাদেব পুত্রকে লইয়া সৈন্য চালনা করিয়া চলিলেন। সমগ্র রাজ্যের মধ্যে উৎসাহের স্রোত বহিল। এখন যে রাজ্য কাঁকের নামে প্রসিদ্ধ, যুদ্ধ সেইখানে হইয়াছিল। উৎকলের কেশরীরাজা, এই যুদ্ধে দক্ষিণ-কোশলেশ্বরের সহায় হইয়াছিলেন বলিয়া,—বাকাটকীয়েরা, প্রভৃত বিপক্ষ সৈন্যবলের সম্মুখীন হইতে সঙ্কুচিত হইতেছিল। কাজেই তাহাদের উৎসাহবর্দ্ধনের জন্য রাজা নিজে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলেন; এবং বাপ্পাদেব স্বীয় পুত্রকে রাজার পার্শ্বচর করিয়া দিয়া অন্য দিক্ হইতে বিপক্ষীয়দিগকে আক্রমণ করিলেন। রাজাকে লক্ষ্য করিয়া যত শর বর্ষিত হইয়াছিল, সকলই সুব্রতের ক্ষিপ্র হস্তচালনায় অপসারিত হইয়াছিল। যুদ্ধে বাকাটকীয়েরা জয়লাভ করিল; এবং মেখলাপর্ব্বতের আরণ্যবিভাগ প্রবরসেনকে দান করিয়া দক্ষিণ-কোশলপতি সন্ধি করিলেন। রাজা সুব্রতের বীরত্ব এবং যুদ্ধবিদ্যা দেখিয়া বড়ই পরিতুষ্ট হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ তাঁহার প্রাণরক্ষার জন্যই সুব্রত তাঁহার পার্শ্বচর ছিল বলিয়া, কৃতজ্ঞচিত্তে এবং প্রসন্নমুখে সুব্রতকে বলিলেন, "তোমার যদি কোন প্রার্থনা থাকে, আমাকে বল; আমি তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব।" সুব্রত অবনতমস্তকে বলিলেন, "মহারাজ! দরিদ্রের প্রার্থনার ইয়ত্তা নাই; কিন্তু আমি আপনার অনুগ্রহ ভিন্ন আর কিছুই প্রার্থনা করি না"। রাজা যখন তাঁহাকে সস্নেহে আলিঙ্গন করিলেন, তখন পার্শ্বদেশে হস্তসংলগ্ন হওয়ায় সুব্রত কাতরতা সূচনা করিয়া মুখ কুঞ্চন করিলেন। রাজার সন্দেহ হইল; তিনি দেখিলেন যে সুব্রতের পার্শ্বদেশ অস্ত্রবিদ্ধ। অস্ত্র উত্তোলিত হইয়াছে, ক্ষতস্থান বস্ত্রে বাঁধা আছে; কিন্তু বুঝিতে পারিলেন যে ক্ষত বড় গভীর। উপযুক্ত চিকিৎসার জন্য তাহাকে নিজ শিবিরে লইয়া গেলেন; এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। চারি পাঁচ ঘণ্টার মধ্যেই সুব্রত শয্যাশায়ী হইয়া পড়িলেন এবং প্রবল বেগে জ্বর আসিল।

তিন চারি দিন চিকিৎসা হইল; কিন্তু জ্বরের প্রকোপ দিন দিন বাড়িতে লাগিল এবং পার্শ্বদেশের ক্ষত বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে সুব্রত সংজ্ঞাশূন্য হইয়া পড়িলেন, এবং চিকিৎসকেরা বলিল যে ব্যাধি দুঃসাধ্য। তখন একজন পরিব্রাজক আসিয়া রাজাকে বলিলেন যে তিনি একবার রোগীকে দেখিবেন। রাজা তাঁহাকে লইয়া গিয়া রোগীকে দেখাইলেন; এবং বাপ্পাদেব বিষণ্ণভাবে পরিব্রাজকের মুখের দিকে তাকাইয়া রহিলেন। পরিব্রাজক বাপ্পাদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার কয়টি পুত্র?" বাপ্পাদেব বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে বলিলেন, "দুইটি"। পরিব্রাজক তখন রাজা এবং বাপ্পাদেবকে বলিলেন, "যদি আপনার এই পুত্রটিকে আমার শিষ্যত্বে উৎসর্গ করেন, তাহা হইলে ইহার জীবন বিধান করি।" পরিব্রাজক হইলেও ত পুত্র

জীবিত থাকিবে, এই চিন্তা করিয়া বাপ্পাদেব পরিব্রাজকের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন ; এবং পরিব্রাজক সুব্রতের চিকিৎসা আরম্ভ করিলেন। সেকালে প্রেস্‌কিপ্‌শ্যন্‌ দিত না; কাজেই পরিব্রাজক কি ঔষধ দিয়াছিলেন, তাহা বলিতে পারিলাম না। কিন্তু তিন দিনের মধ্যে ক্ষতস্থান পূর্ণ হইয়া উঠিল; জ্বর একেবারে চলিয়া গেল ; সুব্রত প্রায় সুস্থ হইয়া উঠিয়া বসিলেন। বাপ্পাদেব পুত্রকে সকল কথা জানাইলেন ; সুব্রতও পিতার সত্যপালনের জন্য পরিব্রাজকের শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন।

সুব্রত পরিব্রাজককে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আমাকে লইয়া আপনি কি করিবেন ?" পরিব্রাজক বলিলেন, "আমি আজ আট বৎসর উপযুক্ত শিষ্যের অনুসন্ধান করিয়া বেড়াইতেছি! তুমি যখন যুদ্ধযাত্রা করিয়া আসিতেছিলে, তখন তোমাকে দেখিয়া সর্ব্বলক্ষণাক্রান্ত পাত্র দেখিলাম, মনে করিয়াছিলাম। ঈশ্বরকৃপায় আমার আশা পূর্ণ হইয়াছে।" সুব্রত কোন কথা কহিলেন না। তাহার পর যখন সম্পূর্ণ স্বাস্থ্যলাভ করিলেন, তখন রাজা এবং পিতার চরণ বন্দনা করিয়া পরিব্রাজকের সঙ্গে নিরুদ্দিষ্ট হইলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

পাখী উড়িয়া গেল।

শীর্ণতোয়া বারদা নদী ধীরে ধীরে বহিতেছে ; এবং নদীগর্ভের বালুকারাশির উপর প্রতপ্ত মধ্যাহ্নসূর্য্য, মহাদেবের অট্টহাস্যের মত প্রদীপ্ত রহিয়াছে। তীরে মহাদেবের মন্দির ; এবং অনতিদূরে রাজা প্রবরসেনের রাজপ্রাসাদ। প্রাসাদের উন্মুক্ত গবাক্ষের পার্শ্বে দাঁড়াইয়া রাজকুমারী অনঙ্গপ্রভা। রাজকুমারী এখন ষোড়শী। এখনও যেন সেই আয়ত লোচনযুগল তেমনি ক্রীড়াশীল ; কিন্তু সে ক্রীড়ায় চপলতা নাই, বরং মনে হয় যেন সেই উজ্জ্বল চক্ষু দুটি অকালগাম্ভীর্য্যস্পৃষ্ট। বালিকার আনন্দদায়িনী মূর্ত্তি এখন ভুবনমোহিনী প্রতিমা।

লবঙ্গিকা আসিয়া বলিল, "সই, পাশা খেলিবে চল"। রাজকুমারী সখীর দিকে না চাহিয়াই বলিলেন, "বড় ঘুম পাচ্চে, এখন যাব না।" লবঙ্গিকা চলিয়া গেল ; রাজকুমারী দ্বার রুদ্ধ করিয়া আবার গবাক্ষপার্শ্বে দাঁড়াইলেন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, আর খেলা করিবেন না। মহাদেবের মন্দিরের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, "দেবদেব ! এই জীবনের খেলা কবে শেষ হইবে ? আমি ক্রীড়াচ্ছলে ধূলি নিক্ষেপ করিয়াছিলাম; সে ধূলিমুষ্টি ভিত্তিচ্যুত অদ্রিশৃঙ্গের মত পতিত হইল! খেলা করিতে করিতে যাতনা দিতাম ; আবার খেলা করিয়া চিত্তবিনোদন করিতাম। কিন্তু সেই শেষ দিনে,—আমার জীবনক্রীড়ার সুখের শেষ দিনে—যাহা করিয়াছিলাম, আর তাহার প্রতীকার করিতে পারিলাম না। আর অবকাশ পাইলাম না। ক্রীড়া করিতে করিতে সুখ হারাইলাম ; কিন্তু জীবন রহিল। এই শীর্ণসলিলা নদীতে আবার বর্ষাধারা বহিবে ; জীবনের সুখ কি ফিরিবে না ?" বালুকাক্ষেত্রপ্রভাসিত মহাদেবের অট্টহাসি, যেন মানবের সুখদুঃখের প্রতি উপেক্ষা করিয়া, দ্বিগুণ প্রদীপ্ত হইল। রাজকুমারী গবাক্ষ রুদ্ধ করিয়া কাঁদিতে বসিলেন। অনেকক্ষণ কাঁদিলেন। সন্ধ্যার পূর্ব্বে পরিচারিকা দ্বারে আঘাত দিয়া বলিল, যে বেলা অবসান হইয়াছে। রাজকুমারী তখন ধীরে ধীরে গৃহ হইতে বাহির হইয়া উদ্যানের দিকে চলিলেন। যাইতে যাইতে দেখিলেন যে তাঁহার আদরের পাখীটি কত কিছু পড়িতেছে। আজি তাহার প্রতি মমতাশূন্য হইয়া রাজকুমারী তাহাকে উদ্যানের মধ্যে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া দিলেন ; এবং বলিলেন, "যদি আবার সেই হাতে তুই ধরা পড়িস্‌, তবে তোকে রাখিব, নচেৎ নহে।" এখনও অনঙ্গপ্রভা বালিকা নয় ত কি ? পাখী এখন পোষ মানিয়াছিল ; সে উড়িয়া যাইতে চাহিল না। রাজকুমারী সাত আট দিন পরিশ্রম করিয়া উড়িতে শিখাইয়া, পাখায় বল সঞ্চার করাইয়া ছাড়িয়া দিলেন। পাখী উড়িয়া গেল।

চতুর্থ অধ্যায়।

প্রতিজ্ঞাভঙ্গ।

রাজকুমারী একদিন মহাদেবের মন্দিরে গিয়া, দেবতার চরণ স্পর্শ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন যে সুব্রত ভিন্ন অন্য কাহাকেও বিবাহ করিবেন না।

কিন্তু রাজা প্রবরসেন, কন্যাকে সৎপাত্রস্থা করাইবার জন্য চারি দিকে চর পাঠাইলেন। তাঁহার প্রতিজ্ঞা, যে দক্ষিণ-

প্রদেশীয় অনার্য্যভাবদুষ্ট কোন রাজপরিবারে কন্যা সম্প্রদান করিবেন না; সেই জন্য উপযুক্ত পাত্রের সন্ধানে অন্যান্য দিকে লোক প্রেরিত হইয়াছিল। মাহেষ্মতীর সৌভাগ্য-সূর্য্য তখন অস্তমিত হইয়াছে; গণ্ড বা গোঁড় জাতীয়েরা সমগ্র রাজ্য অধিকার করিয়া অনার্য্য রাজ্য স্থাপন করিয়াছে। বলভীরাজ পঞ্চম শীলাদিত্য বিবাহ করিতে প্রস্তুত ছিলেন, কিন্তু ইতিপূর্ব্বেই তিনি তিনটি বিবাহ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহাকে রাজা কন্যা সম্প্রদান করিবেন না। অবন্তীর রাজা বৌদ্ধ-ধর্ম্ম অবলম্বন করিবার পর হইতেই সে রাজ্য হতশ্রী হইয়া পড়িয়াছিল। কানোজরাজ, কাশ্মীররাজ কর্ত্তৃক পরাভব প্রাপ্ত হইয়া, উচ্ছৃঙ্খল রাজ্যে বাস করিতেছিলেন। দ্বিতীয় জীবিতগুপ্তের মৃত্যুর পরেই মগধের নাম পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হইতে বসিয়াছিল। দূতেরা চারিদিক হইতে আসিয়া এই সকল সংবাদ দিল। রাজা তখন ভাবিলেন, যাহাকে হউক কন্যা সম্প্রদান করিবেন; আর্য্য অনার্য্যের বিচার করিবেন না। ভারতগৌরব দিন দিন লুপ্ত হইতে চলিল ভাবিয়া ব্যথিত হইলেন; এবং ব্যথিত অন্তঃকরণে চালুক্য-রাজপরিবারে কন্যাসম্প্রদানের কল্পনা করিয়া পাত্রসন্ধানে দূত প্রেরণ করিলেন। রাজার চিরপোষিত প্রতিজ্ঞা, আজি ভগ্ন হইতে চলিল।

পঞ্চম অধ্যায়।

"বসনে পরিধূসরে বসানা।"

রেবার গদগদনাদী বারিরাশি, সহস্র ধারায় মর্ম্মরশৈল ভেদ করিয়া, বিন্ধ্যের উপলবিষম পাদতলে প্রবাহিত হইতেছে; এবং একালে যেখানে গৌরীশঙ্করের মন্দির প্রতিষ্ঠিত, সেই স্থানে, রেবার সহস্র ধারার অনতিদূরে, প্রশস্ত গিরিগহ্বরে, আমাদের পূর্ব্বপরিচিত পরিব্রাজক এবং সুব্রত, বহুবিধ বিষয়ের বিচার করিতেছেন। পরিব্রাজক বলিলেন, "সুব্রত! তোমাকে চতুর্দ্দিক পরিভ্রমণ করাইয়া দেশের অবস্থা দেখাইলাম; আর্য্যজাতি, উপনিষদের পবিত্র ধর্ম্ম দূরীভূত করিয়া, কি প্রকারে ধীরে ধীরে অনার্য্য দেবতা এবং অনার্য্য জাতি কর্ত্তৃক পরাভূত হইতেছে, তাহা দেখিতে পাইলে। গোঁড় জাতির "লিঙ্গো" এখন আর্য্যের অভিধানের লিঙ্গ শব্দের সহিত মিলিয়া অপূর্ব্ব কৌশলে মহাদেবে পরিণত হইতেছেন। বহু দিন পূর্ব্ব হইতেই ইহার সূত্রপাত হইয়াছিল, কিন্তু এখন অনার্য্যের জয় অবশ্যম্ভাবী। অনার্য্যের পৈশাচিক ক্রিয়া এবং শবরজাতির মন্ত্রতন্ত্র, আর্য্যের যোগশাস্ত্রের সহিত মিলিয়া ঘৃণিত তন্ত্রশাস্ত্রের সৃষ্টি হইতেছে। আমার প্রথম শিষ্য কুমারিল ভট্ট আর্য্যধর্ম্ম প্রতিষ্ঠার জন্য শাস্ত্রব্যাখ্যায় নিযুক্ত হইয়াছেন। তুমি কুমারিল অপেক্ষাও প্রতিভাশালী; তুমি এখন কিরূপে দেশের মুক্তিসংকল্পে আপনাকে নিয়োজিত করিবে, তাহা স্থির কর। তুমি এখন স্বাধীন, যেখানে ইচ্ছা যাইতে পার; কিন্তু তুমি কি করিবে তাহার আভাস পাইলে সন্তুষ্ট হইতাম।" সুব্রত কহিলেন, "গুরুদেব! ক্ষমতা ঈশ্বরদত্ত; তিনি আমাকে যে কার্য্যে নিয়োজিত করিবেন, তাহাই করিব। কিন্তু একটি বিষয়ের তথ্য জানিবার জন্য উৎসুক হইয়াছি; যদি বাধা না থাকে, আমাকে জানাইবেন।" পরিব্রাজক সস্নেহে কহিলেন, "যাহা ইচ্ছা জিজ্ঞাসা করিতে পার"। সুব্রত বলিলেন, "যোগ এবং মন্ত্রতন্ত্রের বিরুদ্ধে কিছু বলিবার পূর্ব্বে জানিতে ইচ্ছা করি, যে সত্য সত্যই, উহাতে কোন সত্য আছে কি না? যোগবলে ক্ষমতা লাভ হয়, সে কথা কি সত্য?" পরিব্রাজক তখন বলিলেন, "বৎস, কতকগুলি শারীরিক প্রক্রিয়ার বলে, এক প্রকারের মানসিক জড়তা এবং ভ্রান্তি জন্মে তাহাতে লোকেরা প্রত্যক্ষবৎ অনেক স্বপ্ন দর্শন করে, এবং সেইগুলিকেই ক্ষমতালাভ মনে করিয়া অন্ধতমসাবৃত লোকে গমন করে। আমি সেই প্রক্রিয়া জানি; তোমাকেই তাহা প্রত্যক্ষ দেখাইতেছি।" এই বলিয়া পরিব্রাজক সুব্রতকে গুহামধ্যে শয়ন করাইয়া, অঙ্গে হস্ত সঞ্চালন করিতে লাগিলেন। অল্প সময়ের মধ্যেই সুব্রত সংজ্ঞাশূন্যের মত হইয়া পড়িলেন। পরিব্রাজক জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুব্রত, কি দেখিতেছ?" সুব্রত কহিলেন, "অন্ধকার"। অপর হস্ত সঞ্চালন করিলেন—"কি দেখিতেছ"? সুব্রত নিমীলিতচক্ষে কহিলেন, "আহা! অন্ধকার অপসারিত হইতেছে, এবং অপূর্ব্ব স্নিগ্ধ জ্যোতি প্রভাসিত হইতেছে"। পরিব্রাজক আবার তাঁহার শরীরে হস্ত সঞ্চালন করিলেন; এবার সুব্রত আপনা আপনি বলিতে লাগিলেন, "গুরুদেব! একি দৃশ্য! এই জ্যোতিরাশির মধ্যে সুন্দরী

পাষাণময়ী মূর্ত্তি !” পরিব্রাজক ভাবিলেন, “আমি যখন সুব্রতকে শিষ্য করিয়াছি, তখন সুব্রত বালক বলিলেই হয়; সে বয়সে কোন সুন্দরীর প্রতি অনুরাগ সঞ্চার হওয়া, অথবা মনে মনে তাহাকে পাষাণী বলিয়া মনে করা সম্ভবপর হইয়াছে কি ?” পরিব্রাজক এবার কৌতূহলী হইয়া আরও পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। সুব্রত মদবিহ্বলের মত কহিতে লাগিলেন,“পাষাণীর সর্ব্বাঙ্গ হইতে পাষাণ খসিয়া পড়িতেছে, এবং দেবীমূর্ত্তি লাবণ্যময়ী রমণীরূপে প্রকাশিত হইতেছেন। কি সুন্দর ! কে তুমি ? কে তুমি ? তুমি কি আমার জীবনের আরাধ্যা দেবী ? তুমি পাষাণী ছিলে, মনোমোহিনী হইলে কেন ? এ আবার কি ? অনঙ্গপ্রভা, অনঙ্গপ্রভা ! তোমার এ বেশ কেন ? “বসনে পরিধূসরে বসানা, নিয়মক্ষামমুখী ধৃতৈকবেণী——” কথা কহিতে কহিতে সুব্রতের সংজ্ঞা লুপ্ত হইল। পরিব্রাজক তাঁহার চৈতন্ত বিধান করিয়া সস্নেহে অনেক কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। যাহা শুনিলেন, তাহাতে তাঁহার দয়ার সঞ্চার হইল। কহিলেন, “সুব্রত, তুমি সংসারাশ্রম অবলম্বন কর; এবং পরে যখন ভগবানের প্রেরণা অনুভব করিবে, তখন দেশসেবায় প্রবৃত্ত হইও।” সুব্রত পরিব্রাজকের চরণ বন্দনা করিয়া বলিলেন, “আজি আমি একাকী আপনার শিক্ষার উপযোগী কার্য্যে বাহির হইব; আমার স্বপ্ন, স্বপ্নমাত্র”। পরিব্রাজক চিন্তিতমনে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় হইলেন; এবং সুব্রত নর্ম্মদাকূলে দাঁড়াইয়া ভাবিতে লাগিলেন, “বসনে পরিধূসরে বসানা”।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

বন্দী।

একালের জব্বলপুর হইতে, পার্ব্বত্য পথে, শিওনির মধ্য দিয়া, সুব্রত একাকী নাগপুর পর্য্যন্ত গেলেন। সেখানে এক প্রবীন্ বৃদ্ধ পরিব্রাজক তাঁহাকে আপনার আশ্রমে লইয়া গিয়া আতিথ্যসৎকার করিলেন। সুব্রত সেখানে তিন চারি দিন ছিলেন; এমন সময়ে এক দিন মণ্ডলার গৌড়সৈন্যেরা নাগপুর লুণ্ঠন করিতে লাগিল। দরিদ্রের আর্ত্তনাদে নাগপুর পরিপূর্ণ হইল। সুব্রত দেখিলেন যে নাগপুরের শাসনকর্ত্তা, বাকাটকীয় সৈন্তদলকে অনার্য্যদের দমনের জন্ত নিযুক্ত করিতে পারিতেছেননা। তখন তিনি শাসনকর্ত্তাকে আত্মপরিচয় দিয়া, সৈন্তদল লইয়া গৌড় সৈন্তদলটিকে রাজ্য হইতে দুরীভূত করিয়া দিলেন এবং কার্য্যোদ্ধার হইবার পরেই নাগপুর পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন। শাসনকর্ত্তা অনেক সন্ধান করিলেন, কিন্তু কোন সংবাদ পাইলেন না। সুব্রত দুই তিন দিন বনপথে বহুদূর চলিয়া গেলেন। সম্মুখে অমাবস্যার রাত্রি, সন্ধ্যাও হইয়া আসিল; সুব্রত দ্রুতপদে একটি গ্রামের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন; এমন সময়ে চারিজন বলিষ্ঠ ব্যক্তি আসিয়া তাঁহার পথ রোধ করিয়া বলিল, “তুমি আমাদের বন্দী”। সুব্রত নিরস্ত্র; তাহারা অস্ত্রসজ্জিত। সুব্রত বুঝিলেন যে গৌড়েরা অবৈধ উপায়ে তাঁহাকে বন্দী করিতেছে। কোন কথা না কহিয়া আত্মসমর্পণ করিলেন। তাহার পর তিনি নৈশ অন্ধকারে অবরুদ্ধ শকটে কোথায় নীত হইতে লাগিলেন, বুঝিতে পারিলেন না। শকট খানি অতি দ্রুত চলিতেছিল। সমস্ত রাত্রি সুব্রতের নিদ্রা হয় নাই; কোথায় আসিয়া প্রভাত হইল, তাহাও বুঝিতে পারিলেন না; কিন্তু অবরুদ্ধ শকটে বসিয়াও বুঝিলেন যে প্রভাত হইয়াছে। প্রভাত হইবার পরেও শকট খানি আবার দ্রুত চলিল; কিন্তু এবার অল্পদূরে গিয়াই থামিল। লোককোলাহলে বুঝিতে পারিলেন, কোন নগরে প্রবেশ করিলেন।

অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত একাকী শকটে বসিয়াছিলেন; তাহার পর কে একজন আসিয়া বলিল,“বন্দী, তুমি বাহিরে আসিতে পার”। শকটের আবরণ উন্মুক্ত হইল; বন্দী দেখিলেন, তিনি প্রবরপুরের রাজপ্রাসাদের সম্মুখে। স্বয়ং রাজা প্রবরসেন এবং বাপ্পাদেব প্রাসাদসোপানে দণ্ডায়মান; এবং তাঁহাদের পশ্চাতে মুক্তদ্বারপথে অনঙ্গপ্রভা; এবং তিনি সত্য সত্যই “বসনে পরিধূসরে বসানা”। সুব্রত শকট হইতে অবতরণ করিতে না করিতে দেখিলেন, তাঁহার গুরু পরিব্রাজক স্নান শেষ করিয়া রাজপ্রাসাদের দিকে অগ্রসর হইতেছেন। বিস্ময়ের কারণ দূর হইল; সুব্রত সকল কথাই বুঝিতে পারিলেন।

পরিশিষ্ট।

অনঙ্গপ্রভা এবং সুব্রত সন্ধ্যার প্রাক্কালে প্রাসাদসন্নিকটস্থ উদ্যানে পরিভ্রমণ করিতেছেন, এমন সময়ে একটি পাখী

আসিয়া সুব্রতের কাছে উড়িয়া পড়িল। সুব্রত কৌতুক-পরবশ হইয়া সেটিকে ধরিয়া অনঙ্গপ্রভাকে দিলেন। অনঙ্গ-প্রভার চক্ষু দিয়া জল পড়িল; তিনি বলিলেন, "এই পাখীটি আমার সেই পোষা পাখী; তুমি না ধরিয়া দিলে উহাকে আর রাখিব না বলিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলাম"।

বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ।

নবরত্ন সভা।

গত শ্রাবণের 'প্রবাসী'তে বিজয় বাবু বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন সভার অস্তিত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহার সমুদয় উক্তি মনোযোগের সহিত পাঠ করিয়াও নিঃসন্দেহ হইতে পারিলাম না। ইহার প্রধান কারণ, আমার অজ্ঞতা। কাজেই প্রত্যেক উক্তির দৃঢ় প্রমাণ আবশ্যক মনে করি। বিজয় বাবুর প্রতি একটু অভিযোগও আছে। তাঁহার ন্যায় সাবধান লেখক বিনা প্রমাণে কোন কথা লেখেন না। কিন্তু তৎসমুদয় প্রমাণ প্রকাশ করিলে আমার ন্যায় অনভিজ্ঞ পাঠকের উপকার হইত। প্রশ্ন এই ছিল যে, (১) কোন নবরত্ন সভা ছিল কি না, (২) সেই নবরত্নের মধ্যে কালিদাস ও বরাহ দুই রত্ন ছিলেন কি না। এই দুই প্রশ্ন মীমাংসার নিমিত্ত বরাহাদি কথিত নবরত্নের কি কাল জানা গিয়াছে, তাহা প্রথমে দেখা আবশ্যক।

১। বরাহের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে বড় একটা সন্দেহ নাই। তিনি খ্রীষ্টের ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমে ছিলেন। ৪২৭ শকে অর্থাৎ খ্রীঃ ৫০৫ অব্দে তাঁহার জ্যোতিষ করণের অব্দ। ঐ শকে তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন কিঁ না, তাহার কোন প্রমাণ নাই। যেরূপ দেখা যায়, তাহাতে জন্মশককে করণাব্দ করিবার কোন হেতু নাই। তবে, ইহা নিশ্চিত যে, উক্ত করণাব্দের পরে গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। অতএব বরাহ ৫০৫ খ্রীষ্টাব্দের পরে জীবিত ছিলেন। কত কাল ছিলেন, তাহার এক ক্ষুদ্র প্রমাণ—আমরাজের উক্তি—ব্যতীত অন্য প্রমাণ নাই। নাই থাক, ৫০৫ খ্রীষ্টাব্দের পরে যিনি করণ লেখেন, এবং করণের পরে যিনি হোরা যাত্রা বিবাহাদি বিষয় লিখিয়া শেষে বৃহৎসংহিতা লেখেন, তিনি সম্ভবতঃ আরো বিশ ত্রিশ বৎসর জীবিত ছিলেন। অতএব এই টুকু বলিতে পারা যায় যে, বরাহ খ্রীষ্টের ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ছিলেন। ইহার অতিরিক্ত কিছু বলিতে গেলে কল্পনা আশ্রয় করিতে হয়। এখন প্রশ্ন এই যে কালিদাস, অমরসিংহ, বররুচি, ধন্বন্তরি প্রভৃতি অন্য আট পণ্ডিত ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ছিলেন কিনা। এবিষয়ে বিজয় বাবু সমুদয় প্রমাণ বলিলেন না। তাই, আধুনিক প্রত্নতত্ত্ববিদেরা কি বলেন, তাহা জানিবার নিমিত্ত আমার বন্ধু শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী (M.R.A.S.) মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করি। ২। কালিদাস সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন, "কর্ণ (১)ও মোক্ষমূলর সাহেব-(২) দ্বয় কালিদাসকে ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে, মাক্‌ডোনেল (৩) ও শঙ্কর পাণ্ডুরঙ্গ পণ্ডিত (৪) ৫ম শতাব্দীর প্রারম্ভ সময়ে বসাইয়াছেন। আমার নিজের মতে কালিদাসের রঘুবংশ খ্রীঃ ৪৬৫—৪৮৫ অব্দের মধ্যে রচিত (৫)।"

বিজয় বাবু কালিদাসের সময়সম্বন্ধে চারিটি প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন। (১) ৬ষ্ঠ শতাব্দীর আরম্ভে সুবন্ধু কর্ত্তৃক উল্লেখ, (২) ৭ম শতাব্দীর প্রস্তরলিপিতে কালিদাস ও ভারবির নাম, (৩) রঘুবংশে ইন্দুমতীর স্বয়ংবরে মগধরাজার প্রাধান্য এবং ৬ষ্ঠ শতাব্দীর হর্ষবিক্রমাদিত্যের পূর্ব্বে উজ্জয়িনীর অশেষ শ্রীবৃদ্ধির প্রমাণাভাব, (৪) কালিদাসের সময়ে দেব-প্রতিমা পূজা এবং ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে এরূপ প্রতিমার অভাব। বিজয় বাবুর এই সকল যুক্তি অকাট্য মনে করিলেও কালি-দাসের ঠিক সময় জানা যায় না। (১) ও (২) হইতে জানা যায়, কালিদাস ৬।৭ শতাব্দীর পূর্ব্বে ছিলেন। (৩) প্রমাণ সম্বন্ধে পরে বক্তব্য। বস্তুতঃ (৩) ও (৪) প্রমাণ অকাট্য নহে। এই বিচারে নবরত্নসভাবিষয়ক কিম্বদন্তি ভুলিয়া গেলেই ভাল হয়।

৩। কোষকার অমরসিংহ কোন্ সময়ে ছি[লেন] চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলেন, "তাঁহার সময় এখনও ঠিক [নিরূপ]রিত হয় নাই। মহাবোধির খোদিত লিপির উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে পারা যায় না। কারণ সে লিপি এখন আর

১ Kern's Preface to *Brihat Samhita.* p. 20.

২ Max Muller's *India*, p. 302ff.

৩ Mac donnell's *Hist. Sansk Lit.* pp. 321,325.

৪ Sankara Panduraug Pundit's Preface to *Raghuvamsa*, p.27

৫ আগামী "নবপ্রভা" দেখুন।

পাওয়া যায় না। ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে সার চার্লস্ উইলকিন্স্ সাহেব ঐ লিপির অনুবাদ করেন। তৎকালে তিনি সংস্কৃত ভাল জানিতেন কি না সন্দেহ (৬)। ব্লিনাড সাহেবের মতে অমরকোষ ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে চীন ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছিল (৭)। ইহাও কত দূর ঠিক, তাহা বলিতে পারা যায় না। জাকারি সাহেবের মতে অমরকোষ ৫০০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত। (৮) ইনি সমুদয় কোষের সময় বিচার করিয়াছেন, সুতরাং অনেকটা ঠিক হইবার কথা।"

বিজয় বাবু বলেন, ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে অমরসিংহ বুদ্ধগয়ার মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রমাণের উল্লেখ করিলে ভাল হইত। এই অমরসিংহ, কোষকার অমরসিংহ এবং নবরত্নের অমরসিংহ এক ত ? অমরসিংহ নামটা অসাধারণ নহে। তাই সন্দেহ।

৪। বররুচি সম্বন্ধে চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলেন যে, "ইঁহার সময় একবারে অজ্ঞাত। কয়েকজন বররুচির নাম পাওয়া যায়। বৈদিক সাহিত্যে সামবেদীয় ফুল্ল সূত্রের বররুচি, কৃষ্ণযজুর্বেদীয় প্রতিশাখ্য সূত্র টীকাকার বররুচি, কথাসরিৎসাগরের পাণিনির সমসাময়িক বৈয়াকরণ বররুচি, প্রাকৃতপ্রকাশরচয়িতা বররুচি, ইত্যাদি। শেষোক্ত বররুচির সময়, কাওয়েল সাহেবের মতে খ্রীঃ পূঃ ১ম শতাব্দী, লেসনের মতে খ্রীঃ ১ম শতাব্দীর মধ্যভাগ, ভাণ্ডারকারের মতে ৬ষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগ।(৯) এই কয় মতের মধ্যে কাওয়েল ও ভাণ্ডারকার বিক্রমের নবরত্ন সভা ধরিয়া সময় নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সুতরাং সন্দেহাত্মক। প্রাকৃতপ্রকাশ প্রাকৃতসম্বন্ধে সর্ব্বপ্রাচীন গ্রন্থ ; ৬ষ্ঠ শতাব্দীর দণ্ডির কাব্যাদর্শ অপেক্ষা প্রাচীন। যত দূর দেখিয়াছি, তাহাতে প্রাকৃতপ্রকাশ ২য় বা ৩য় শতাব্দীর পরে বলিয়া বোধ হয় না। (১০)"

৫। ঘটকর্পরের সময় নির্দ্ধারণের কোন উপায় নাই। চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলেন, "ইঁহার দ্বাবিংশ শ্লোকযুক্ত কেবল, একখানি ক্ষুদ্র কাব্য আছে।" তাহা ৬ষ্ঠ শতাব্দীর হইতে পারে। বহুপরেরও হইতে পারে। এতদ্ব্যতীত, ২১ টি শ্লোকযুক্ত নীতিসার ঘটকর্পরের লিখিত বলিয়া কিম্বদন্তি আছে। (১২) এই নীতিসারের ৮ম শ্লোক পঞ্চতন্ত্র ও হিতোপদেশ হইতে গৃহীত। ২, ৪, ৬, ১৮ প্রভৃতি শ্লোকগুলি মোহমুদ্গরের ন্যায়। অতএব নীতিসার ৭ম শতাব্দীর পূর্ব্বের বলিতে পারা যায় না।

৬। ধন্বন্তরি। ইনি সুশ্রুতের গুরু বলিয়া প্রসিদ্ধ, এবং ইঁহার বিষয় পরে বক্তব্য।

৭। বেতালভট্ট। চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলেন, "ইঁহার সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানা নাই। ষোড়শশ্লোকাত্মক নীতিপ্রদীপ নামক এক খানি ক্ষুদ্র কাব্য বেতালভট্টের বলিয়া লিখিত হইতে দেখি।(১৩) সেগুলি উদ্ভট এবং হিতোপদেশের ন্যায়। সুতরাং ৭ম শতাব্দীর পরে হওয়া সম্ভবপর।"

৮।৯। ক্ষপণক ও শঙ্কু। ইহাঁদের বিষয় অজ্ঞাত।

কথিত নবরত্নের সময় সম্বন্ধে কতটুকু জানা, এবং কত খানি অজানা তাহা উপরে দেখা গেল। মূল না থাকিলে গাছ দাঁড়ায় না বটে, কিন্তু মূলটি লইয়াই যে সন্দেহ। ১৩শ শতাব্দীর [১১শ শতাব্দীর নহে] এক জন লোক (গণক কালিদাস] নিজকে লইয়া বিক্রমাদিত্যের সভার নয়টি রত্ন গণনা করিয়াছিলেন। বিজয় বাবু বলেন, ধারা নগরীর ভোজ রাজা (১১শ শতাব্দী) একটি নবরত্ন সভা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। গণক কালিদাস সেই নকল সভার কবি। কিন্তু বিজয় বাবু এই বিষয়ের কি প্রমাণ পাইয়াছেন ? বিজয় বাবু আরও বলেন যে "এই সময়ের প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বের একটি খোদিত লিপি বুদ্ধ গয়ায় দৃষ্ট হয় ; তাহাতে উজ্জয়িনীপতি বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভার স্পষ্ট উল্লেখ আছে।" কিন্তু ইহা কোন্ লিপি ? উপরে যে লিপির উল্লেখ করা গিয়াছে ? যে লিপিই হউক এতদ্দ্বারা এই টুকু জানা যায় যে, দশম শতাব্দীর লোকেরা বলিত যে, পূর্ব্বকালে একটা নবরত্নসভা

৬ Weber's *Hist. Ind. Lit.* pp. 228—9.

৭ Weber's *Hist. Ind. Lit.* p. 229.

৮ Macdonell's *Hist. Ind. Lit.* p 433.

৯ Cowell's *Prakrit Prakaca.* 1868.
Muir's *Sans. Texts*, vol 11, p 43, note 71.
BhandarKar's *Early History of the Dekhan*, 2nd Ed. p 12.

১০ বররুচি কবির নীতিরত্ন নামক এক ক্ষুদ্র সংগ্রহ আছে। তাঁহার সময় জানা নাই। তবে নীতিরত্নের শ্লোক দেখিলে মনে হয় যে তাহা পঞ্চতন্ত্রের পরে রচিত।

১১ জীবানন্দ বিদ্যাসাগর সংগৃহীত কাব্যসংগ্রহ (১ম সংখ্যা)।

১২ ঐ।

১৩ জীবানন্দ বিদ্যাসাগরের কাব্যসংগ্রহ, (১ম সং)।

ছিল। আমাদের প্রশ্ন, এই কিম্বদন্তির প্রকৃত মূল কোথায়? নবগ্রহ হইতে নবরত্ন (মণি) গণনার আরম্ভ—এই অনুমান পরিবর্ত্তনের কোন হেতু পাই নাই। পূর্ব্বকালে 'সত্যিকার' রত্ন নয়টি কেন, বরাহ ২২টির নাম করিয়াছেন। অগ্নি-পুরাণাদিতে ৩৩টি রত্নের নাম আছে। এই সকল রত্নেরই মধ্যে নয়টি নির্ব্বাচন আকস্মিক নহে। কিন্তু ১০ম শতাব্দীর পূর্ব্বের যে সকল গ্রন্থে রত্নের নাম আছে তৎসমুদয়ে নবরত্ন-গণনা পাই না; তৎপরিবর্ত্তে চারি পাঁচটি পাই। অমর-কোষ দেখুন, উহাতে বরাহের ঠিক পাঁচটি রত্নের নাম ও প্রতিশব্দ প্রদত্ত হইয়াছে। অন্য রত্নের নাম নাই। রত্ন শব্দের অর্থ, রত্নং স্বজাতিশ্রেষ্ঠেঽপি—অমরে দেখিতে পাই। শেষোক্ত অর্থে বিক্রমাদিত্য নয়টি রত্ন কেন, এক শত রত্নের সভা করিতে পারিতেন। তবে, নবরত্ন কথাটি বিচার করিলে মনে হয়, (১) ঠিক নয় জন পণ্ডিতরত্ন ছিলেন, তাই নবরত্ন নাম; কিংবা (২) নয়টি মণি নবরত্ন নামে কথিত হইত, এবং তাহা হইতে নয় জন পণ্ডিত লইয়া নবরত্ন সভার উৎপত্তি হইয়াছিল। এই দুই অনুমানের মধ্যে কোন্‌টা অধিকতর সম্ভবপর বোধ হয়?

এ স্থলে কেবল 'সম্ভব' 'অসম্ভবে'র কথা নহে। বাস্তবিকই একই সময়ে একই সভায় নয়টি রত্ন সভ্য ছিলেন কি? এ বিষয়ের লিখিত সাক্ষী ১৩শ [১১শ নহে] শতাব্দীর এক জন লোক, যিনি নানা কবির নাম করিতে করিতে নিজেকে নবরত্নের এক রত্ন বলিয়া দাবী করিয়াছেন। যদি এই সাক্ষীর কথায় বিশ্বাস করিতে হয়, তাহা হইলে তাহার খানিকটা বাদ দেই কেন? তিনি লিখিয়াছেন, নবরত্ন সভা খ্রীঃ পূঃ ১ম শতাব্দীতে ছিল। এই ১ম শতাব্দী ছাড়িয়া ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে যাই কেন? কোন্ পণ্ডিতরত্নের কি কাল অনুমিত হইয়াছে, তাহা উপরে দেখা গিয়াছে। দুই তিন জনের ত কিছুই জানা নাই, এবং বরাহ ছাড়া অপর কয়েক জনের এক একটা অনুমান হইয়াছে। জানি না, কিন্তু এমন কোন প্রমাণ আছে কি, যাহাতে কালিদাস প্রভৃতি ১ম শতাব্দীর হইতে পারেন না? বরাহ লইয়া গোলযোগ? তাহারও মীমাংসা আছে। আমাদের জ্ঞাত বরাহ দ্বিতীয় বলিয়া প্রবাদ আছে। তাঁহার পূর্ব্বে ১ম শতাব্দীতে প্রথম বরাহ ছিলেন। একথা হাণ্টার সাহেব প্রাচীন জ্যোতিষি-গণের মুখে শুনিয়াছিলেন। তিনি দশ জন জ্যোতিষীর নাম ও অভ্যুদয়কাল পাইয়াছিলেন। নয় জন সম্বন্ধে তিনি যে সংবাদ পাইয়াছিলেন, তাহা সত্য বলিয়া জানা গিয়াছে। কেবল প্রথম বরাহের বেলাতেই মিথ্যা হইবে কি? আমার বলিবার অভিপ্রায় এই যে, নবরত্নের নয় জনকে ১ম শতাব্দীর কবি অনুমান করিতে পারা যায় কি না, তাহার পুনর্বিচার আবশ্যক। যাহা হউক, এখন পণ্ডিতের নিকট পণ্ডিত উপস্থিত করিলাম। তাঁহারা সমস্যা পুরিয়া কথা কহিয়া ফলাফল জানাইলে আমরা দশ জন শিখিতে পারিব।

উজ্জয়িনী।

বিজয় বাবু বলেন, "হর্ষবিক্রমাদিত্যের পূর্ব্বে উজ্জয়িনীর স্বাতন্ত্র্য বা অশেষ শ্রীবৃদ্ধির সংবাদ পাওয়া যায় না।" কিন্তু স্বাতন্ত্র্যের সংবাদ পাই না পাই, শ্রীবৃদ্ধির সংবাদ পাইতেছি। এই সংবাদও চক্রবর্ত্তী মহাশয় আমায় দিয়াছেন। সংক্ষেপে দুই চারিটির উল্লেখ করা যাইতেছে।

(১) ক্লডিয়াস টলেমায়স (১৫০ খ্রীঃ) তাঁহার ভূগোলে উজ্জয়িনীর নাম, দেশান্তর ১১৭° ও অক্ষাংশ ২০° দিয়াছেন। তাঁহার ম্যাপে নামটি আছে। তিনি লিখিয়াছেন, চষ্টন মালবদেশের রাজা ছিলেন, তাঁহার উপাধি ক্ষত্রপ, রাজধানী উজ্জয়িনী। (১৪)

(২) পেরিপ্লস মেরিজ ইরিথ্রী নামক পুস্তকেও (৮০—৯০ খ্রীঃ) উজ্জয়িনীর বিশেষ উল্লেখ আছে। (১৫)

(৩) উজ্জয়িনী ও তন্নিকটস্থ গ্রামসমূহে প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। তাহাদের মধ্যে দুই একটি মুদ্রায় "উজেনীয়" লিখিত আছে। সে অক্ষর মৌর্য্যসময়ের ব্রাহ্মি-লিপিতে লেখা; সুতরাং খ্রীঃ পূঃ ২০০ বৎসরের অধিক প্রাচীন। এই সকল মুদ্রা হইতে প্রকাশ যে, উজ্জয়িনী রাজধানী ছিল, এবং সেখানে স্বতন্ত্র মুদ্রামুদ্রিত হইত। (১৬)

(৪) ভুবনেশ্বরের নিকটস্থ ধউলি পাহাড়ে ও গঞ্জামের নিকট জউগড় পাহাড়ে অশোকের খোদিত লিপি আছে। এই খোদিত লিপি দুই প্রকার; (১) সাধারণ, (২) বিশেষ। এই

১৪ Mc Crindle, *Ind. Antiquary*, vol XIII, p 359.

১৫ Mc Crindle, *Ind. Antiquary*. vol. VII, p 143.

১৬ Cunningham, *Coins of Ancient India*, p. 94; *Archaeological Survey of India*, vol XIV, p 148; Rapson's *Indian Coins*. Art. 58, p. 14.

বিশেষ লিপিতে অশোক অনুজ্ঞা করিয়াছেন, "ধর্ম্মার্থ আমি পঞ্চ পঞ্চ বৎসরে এক জন অকর্কশ অচণ্ড জীব-অহিংসক মহাত্মাকে পাঠাইব। * * * উজ্জয়িনীর কুমার ও প্রতি তিন বৎসর বর্গের নিমিত্ত এইরূপ করিবেন। তক্ষশিলাতে এই রকম।" (১৭) ইহা হইতে জানা যায়, উক্ত লিপি লেখকের সময় অশোকের রাজ্য তিন প্রদেশে বিভক্ত ছিল। (১) মধ্য প্রদেশ; রাজধানী পাটলীপুত্র; (২) দক্ষিণপশ্চিম প্রদেশ, রাজধানী উজ্জয়িনী; (৩) উত্তরপশ্চিম প্রদেশ, রাজধানী তক্ষশিলা। অতএব ২৬০ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দে উজ্জয়িনী এক বিস্তৃত ও সমৃদ্ধিশালী নগরী ছিল।

ধন্বন্তরি ও সুশ্রুত।

অধ্যাপক প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁহার হিন্দুরসায়নের ইতিহাসে ধন্বন্তরিশিষ্য সুশ্রুতের আবির্ভাবকাল আলোচনা করিয়াছেন। উক্ত ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, সম্ভবতঃ ৮ম কি ৯ম শতাব্দীতে সিদ্ধ নাগার্জ্জুন সুশ্রুতসংহিতার বর্ত্তমান সংস্কর্ত্তা হইয়াছিলেন। তিনি সুশ্রুতের উত্তর তন্ত্রটি যোগ করিয়াছিলেন বলিয়া খ্যাতি আছে। মহাভারতে এক সুশ্রুতের নাম পাওয়া যায়। কাত্যায়নের বার্ত্তিকেও (৪র্থ খ্রীঃ পূঃ শতাব্দী) সুশ্রুতের নাম আছে। কিন্তু অধ্যাপক রায় মহাশয় বলেন যে, ঐ দুই সুশ্রুত ধন্বন্তরিশিষ্য সুশ্রুত কি না, তাহা বলিতে পারা যায় না। তবে বাওয়ার সাহেবের পুঁথিতে (৫ম শতাব্দী) সুশ্রুতকে পাওয়া যায়। সুতরাং সুশ্রুত ৫মশতাব্দীর পূর্ব্বে ছিলেন।

অধ্যাপক রায়মহাশয় যত সাবধানে প্রত্যেক উক্তি বিচার করিয়া অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা সকলেরই অনুকরণীয়। এমন সমীক্ষ্যকারীর নিকট দুর্ব্বল অনুমান প্রত্যয়জনক হইবার সম্ভাবনা দেখি না। তবে, তিনি যখন সুশ্রুতকে ৫ম শতাব্দীর পূর্ব্বের বলিয়াছেন, তখন তাঁহার নির্দ্দেশিত পথে আর একটু অগ্রসর হইলে অন্যায় হইবেনা।

পৌরাণিক প্রমাণ আজকাল বড় একটা গ্রাহ্য হয় না। কারণ পুরাণের রচনাকালে ধরিবার ছুঁইবার কিছু পাওয়া যায় না। তার পর, একই বিষয়ে বিভিন্ন পুরাণে হয়ত বিভিন্ন কথা লিখিত থাকে। কিন্তু অন্য প্রমাণের সহিত পৌরাণিক প্রমাণ এক হইলে একটি অন্যকে দৃঢ় করে। এই হিসাবে সুশ্রুতগুরু ধন্বন্তরির আবির্ভাবকাল পুরাণ হইতে পাইতে পারি।

পুরাণে ধন্বন্তরির তিনপ্রকার জন্ম দেখিতে পাই। প্রায় সকল পুরাণমতে তিনি ক্ষীরোদসাগর মন্থনে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। ক্ষীরোদসাগরমন্থনকে আমি জ্যোতিষিক রূপক মনে করি। উহা যে যে জ্যোতিষিক বিষয়ের রূপক তাহা খ্রীষ্টের প্রায় চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল। (১৮) বায়ুপুরাণে আছে, ধন্বন্তরি দ্বাপরযুগে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। (১৯) অর্থাৎ এই মতে তিনি খ্রীষ্টের প্রায় তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ছিলেন। এই দুই পৌরাণিক উক্তি হইতে বোধ হয় যে, পুরাণরচনার সময়—অন্ততঃ বায়ুপুরাণরচনার সময়—ধন্বন্তরি বহু বহু প্রাচীন বলিয়া বিবেচিত হইতেন। দুইচারি শত বৎসরের মধ্যেই কোন ঘটনায় এত প্রাচীনত্ব আরোপিত হয় না।

বায়ুপুরাণে আরও দেখা যায়, তিনি কাশীরাজ দীর্ঘতপার পুত্ররূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। ধন্বন্তরির পুত্র কেতুমান্। কেতুমানের পুত্র দিবোদাস ইত্যাদি।

যদি বায়ুপুরাণ রচনার সময় নির্ণীত হয়, তাহা হইলে তৎসঙ্গে ধন্বন্তরিরও সময়ের কতকটা আভাস পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু কোন পুরাণের সময় নিঃসন্দেহে বলিবার উপায় নাই। বায়ুপুরাণও কতকটা এইরূপ। তবে যতদূর দেখিয়াছি, তাহাতে বায়ুপুরাণকে প্রাচীন বলিয়া বোধ হইয়াছে। এখানে সমুদয় প্রমাণ দিবার স্থান নাই। তবে একটা কথা এই। বায়ুপুরাণের জ্যোতিষ, প্রাচীন জ্যোতিষ, বরাহের পরের জ্যোতিষ নহে। এই জ্যোতিষ বেদাঙ্গজ্যোতিষের ন্যায়; মহাভারতেও এই জ্যোতিষের চিহ্ন আছে। যতদূর জানি, তাহাতে বোধহয় ২শকের পৈতামহসিদ্ধান্তে ঐ জ্যোতিষের শেষ। ইহার পর আমাদের প্রাচীন জ্যোতিষগণনা কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হয়। এইরূপ প্রমাণে বলিতে

১৭ Buhler, *Arch. Surv. of W. India.* vol 1, p. 127; Senart, *Ind. Antiquary,* vol. XIX (1900), p. 85. আসল কথা এই,—"উজে (নি) তে পি চু কুমালে…"। হেমেব তখ (শি) লাতে পি।"

১৮ ইহার প্রমাণ "আমাদের জ্যোতিষ" নামক গ্রন্থে প্রদত্ত হইয়াছে। বর্ত্তমান স্থানে তাহা না জানিলেও চলে।

১৯ ডাঃ রাজেন্দ্রলালমিত্রসংশোধিত বায়ুপুরাণ, ২য় খণ্ড, ৩০ অঃ।

পারা যায়, বায়ুপুরাণ বরাহের পরের নহে, পূর্ব্বের; কত পূর্ব্বের তাহা বলিতে পারা যায় না। কিন্তু খ্রীঃ পূঃ ৫ম শতাব্দীর পূর্ব্বের নহে। কারণ তৎপূর্ব্বে মেষবৃষাদি রাশি-নাম ছিল না। মোটের উপর বায়ুপুরাণকে খ্রীঃ ১ম কি ২য় শতাব্দীর বলিলে অধিক ভুল হইবে না। কিন্তু তৎকালে ধন্বন্তরি এত প্রাচীন হইয়াছিলেন যে তাঁহার আবির্ভাব দ্বাপরযুগে বলিয়া মনে হইত।

এইরূপ প্রাচীনত্ব বর্ত্তমান সুশ্রুত হইতেই সূচিত হয়। উহার সূত্রস্থানে (৬ষ্ঠ অঃ) দুই প্রকার ঋতু নির্দেশ আছে। তন্মধ্যে প্রথমে দেখা যায়, "ঋতু ছয়, শিশির বসন্ত গ্রীষ্ম বর্ষা শরৎ হেমন্ত। দ্বাদশ মাসের মধ্যে তপঃ তপস্য শিশির, মধুমাধব বসন্ত, শুচি শুক্র গ্রীষ্ম, ইত্যাদি। দুই অয়নে বৎসর এবং পাঁচ বৎসরে যুগ।"

এই ঋতুনির্দেশের পর আছে, "একালে (ইহ তু) ভাদ্র আশ্বিনে বর্ষা, কার্ত্তিক মার্গশীর্ষে শরৎ; পৌষমাঘে হেমন্ত, ফাল্গুন চৈত্রে বসন্ত, বৈশাখ জ্যৈষ্ঠে গ্রীষ্ম, আষাঢ় শ্রাবণে প্রাবৃট্‌।"

ঠিক পরে পরে দুই প্রকার ঋতু মাস নাম করিবার কারণ কি ছিল? কোন্‌ ঋতুতে আমাদের শরীর কিরূপ থাকে, এবং কি স্বাস্থ্যরক্ষার বিধি পালন করিতে হয়, তৎসমুদয় বলিবার নিমিত্ত ঋতু মাসের নাম করা হইয়াছে। এস্থলে যে যে মাসে যে যে ঋতু প্রত্যক্ষ হয়, তাহাদেরই উল্লেখ আবশ্যক। কোন্‌ অতীত কালে কোন মাসে কি ঋতু হইত, —ইহা জ্যোতিষগ্রন্থে আবশ্যক হইতে পারে, কিন্তু আয়ুর্ব্বেদে আবশ্যক হয় কি? দুইটির একটিকে প্রক্ষিপ্ত মনে করা যাইতে পারে কি? এরূপ প্রক্ষেপের কারণ কি ছিল? আয়ুর্ব্বেদগ্রন্থে প্রকৃত আয়ুর্ব্বেদবিষয় প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে, কিন্তু জ্যোতিষ প্রক্ষিপ্ত হইবে কেন?

জানিনা, অপরে ইহার কি উত্তর দিয়াছেন। কিন্তু আমার নিকট উহার উত্তর সহজ বোধ হইতেছে। আমার বোধহয় ১ম উক্তিটি পুরাতন সুশ্রুতের, ২য়টি তাঁহার সংস্কর্ত্তার। যদি বাওয়ার সাহেবের পুঁথিতে এই অংশটি থাকে, তাহা হইলে তাহাতে কেবল প্রথম উক্তিটি পাইবার কথা। তখন দ্বিতীয় উক্তিটির জন্ম হয় নাই, বলিতে পারা যায়। বাওয়ার সাহেবের পুঁথি মিলাইবার যাঁহাদের সুবিধা আছে, তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক জানাইলে উপকৃত হইব। আমার অনুমান হয়, সুশ্রুতের সময়ে যে যে মাসে যে যে ঋতু হইত, তাহাই প্রথমে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার সংস্কর্ত্তা দেখিলেন তাঁহার সময়ে সেরূপ হয় না। অথচ আয়ুর্ব্বেদে বর্ত্তমান মাস ঋতু নির্দেশ করা আবশ্যক। এই হেতু তিনি একালে এইরূপ হয় বলিয়াছেন।

যদি উপরের অনুমান সত্য হয়, তাহা হইলে আদি সুশ্রুতকে খ্রীষ্টের ৫ম কি ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বের বলিতে পারা যায়। তাহা হইলে মহাভারতে ও বার্ত্তিকে সুশ্রুতের নামোল্লেখ বুঝিতে পারা যায়। এইসঙ্গে আর একটি কথার উল্লেখ করা যাইতেছে। সুশ্রুতের সূত্রস্থানে (লবণবর্গে) দেখা যায়, "মুক্তা বিদ্রুম বজ্রেন্দ্রবৈদূর্য্য স্ফটিকাদয়ঃ। চক্ষুষ্যা মণয়ঃ শীতা লেখনা বিষসূদনাঃ॥"—এইরূপ আছে। এখানে নবরত্নগণনার চেষ্টা হয় নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, যে মরকত বিষসূদন বলিয়া খ্যাত, এমন কি যাহার নামেই বিষাপহত্ব প্রকাশিত, সে মরকতের নাম নাই। ইহাতে বোধহয় মরকত হয়ত তৎকালে বৈদূর্য্যের অন্তর্গত ছিল, কিংবা জানা ছিল না।

আজ অনেক প্রসঙ্গ করা গেল। বিজয়বাবুর অনুমান যে ৬ষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে এদেশে দেবপ্রতিমা ছিলনা। এখন তাহার অসারতা প্রতিপাদন করিতে বসিলে সুধু পাঠক নহে, সম্পাদক মহাশয়ও উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিবেন।

শিক্ষিত ভদ্রলোকের কৃষি-বৃত্তি অবলম্বন।

কৃসি-কার্য্যের উন্নতিকল্পে যে আজ কাল শিক্ষিত সমাজে একটি দেশব্যাপী আন্দোলন চলিতেছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এই আন্দোলন হইতে যে কোন ফল ফলিবে না আমার এরূপ বিশ্বাস নহে। হুজুগে পড়িয়া, উৎসাহে মাতিয়া, যে স্থানে স্থানে গরীব ইস্কুল মাষ্টার অথবা উকিল মোক্তার, কৃষিকার্য্যের ফল দেখিতে গিয়া, কতকগুলি অর্থের শ্রাদ্ধ করিতেছেন না, তাহা আমি বলি না, এবং এরূপ বিসদৃশ ফল ফলাতে স্থানে স্থানে যে লোকের মনে কৃষি-কার্য্যের উন্নতিসম্বন্ধে অবিশ্বাস জন্মিয়া যাইতেছে না

তাহাও আমি বলি না। কিন্তু মোটের উপর শিক্ষিত সমাজের মধ্যে এতৎসম্বন্ধে আন্দোলন হইবার কারণ উপকারই হইতেছে। উন্নতি সম্বন্ধে একটি দেশব্যাপী আকাঙ্ক্ষা জন্মিতেছে, উন্নতির প্রত্যাশাও প্রবল হইয়া আসিতেছে। যে ব্যক্তি দুই তিন বৎসর ধরিয়া কোন একটি বিশেষ কৃষি পরীক্ষার অনুসরণ দ্বারা কতকগুলি অর্থ নষ্ট করেন, তাঁহার ঐ দুই তিন বৎসরের পরে প্রতীতি জন্মে, যে আর কিছু অর্থ থাকিলে এই পরীক্ষাটী আমি লাভে দাঁড় করাইতে পারিতাম। বস্তুতঃ "আক্কেল-সেলামি" ভিন্ন কোন ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হওয়া যায় না, ইহা যে ব্যবসায়ের একটী মূল মন্ত্র, ইহা সাহেবেরা বেশ বুঝিয়া থাকেন। তাঁহারা কোন একটি ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হইয়াই যে লাভ করিতে পারিবেন, ইহা কখনই মনে করেন না এবং উপর্য্যুপরি দুই তিন বৎসর লোকসানদ্বারা তাঁহারা বিচলিতও হয়েন না। লোকে পাঁচ রকম ঠেকিয়া, অর্থ নষ্ট করিয়া, অথবা শিক্ষানবিশী করিয়া, ব্যবসায় শিক্ষা করে। কোন স্কুল মাষ্টার অথবা উকিল, একটী প্রবন্ধ অথবা এক খানি পুস্তক মাত্র পাঠ করিয়া কৃষিকার্য্যসম্বন্ধে উৎসাহিত হইয়া, কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, অর্থনাশ অবশ্যম্ভাবী ভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে? অপর কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে চাষ করিয়া চাষ শিক্ষা করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিলে অর্থদণ্ড দিতে হয় না; কিন্তু কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে গেলেই অভিজ্ঞতা আবশ্যক।

পুঁজি অল্প অথচ লাভের আশা অধিক, এরূপ অবস্থাপন্ন লোকই আমাদের দেশে সহজে কৃষিকার্য্যে লিপ্ত হইতে বাসনা প্রকাশ করেন। বাসনাটী মানসিক উন্নতির লক্ষণ, কিন্তু এরূপ ব্যক্তির ধারণা কৃষিকার্য্যের দ্বারা অপেক্ষাকৃত সহজে অধিক অর্থোপার্জ্জন করিতে পারা যায়। এ ধারণা কতকটা ভ্রমাত্মক। ইংলণ্ডের, কানেডার, অষ্ট্রেলিয়ার, দক্ষিণ আফ্রিকার ভদ্রলোক, শিক্ষিত লোক, কৃষিকার্য্যে লিপ্ত থাকিয়া সুখস্বচ্ছন্দে কাল যাপন করেন বলিয়া, যে এদেশের ভদ্রলোকে তাহাই পারিবেন, এরূপ কোন কথা নাই। এখানে সূর্য্যের প্রচণ্ড উত্তাপ আছেন, ম্যালেরিয়া জ্বর আছেন, বাঘ, ভাল্লুক, শৃগাল, বন্যবরাহ আছেন, চোরের উৎপাত আছেন, শ্রমজীবীর প্রবঞ্চনা আছেন। এই সকল কারণ দ্বারা, অনেক সময় উৎসাহভঙ্গ হইয়া কৃষিকার্য্যে ইস্তফা দিবার আবশ্যক হয়।

শিক্ষিত ব্যক্তিদের মধ্যে যাঁহাদের কৃষিপরীক্ষায় মতি জন্মিয়াছে, তাঁহাদের আর একটী ধারণা, কোন নূতন ফসলের চাষ করিতে পারিলে বুঝি রাতারাতি বড় মানুষ হইতে পারিব। তাহাদের যত ঝোঁক্ রিয়ার দিকে, আগাভে সিসালানার দিকে, বিটের দিকে, পাস্‌পেলাম্ ডাইলেটেটামের দিকে, যে সকল নূতন ফসলের বিষয় সম্বাদপত্রে পড়েন, তাহারই দিকে। ধান, পাট, ছোলা, সর্ষপে তাঁহাদের মন উঠে না। নূতন ফসল কে ক্রয় করিবে, কিরূপে এ সকল ব্যবহারে আনা যাইবে, কেহ বা ব্যবহার করিতে সম্মত হইবে, এ সকল দিকে লক্ষ্য রাখা আবশ্যক। ধান, পাট, ছোলা, সর্ষপ এই সকল ফসল কোন নূতন প্রক্রিয়া দ্বারা উন্নতি করিয়া লইতে পারিলে, এ সকল বিক্রয় করিবার জন্য ভাবিতে হয় না, অথচ যেখানে চাষারা বিঘা প্রতি ৫মন ফসল পায় এবং অনাবৃষ্টি হইলে তাহাও পায় না, সেখানে যদি নূতন প্রক্রিয়া অবলম্বন দ্বারা কোন ভদ্রলোক অনাবৃষ্টি সত্বেও বিঘা প্রতি ৮মন ফসল উঠাইতে পারেন তাহা হইলে তাঁহার বিলক্ষণ লাভ হইতে পারে।

যদি কোন ভদ্রলোক কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে বাসনা করেন, তিনি যেন আর পাঁচ জন চাষাতে যে ফসল লাগায়, সেই ফসলগুলিই প্রথমতঃ অবলম্বন করিয়া, সাধারণ কৃষিকার্য্যে লাভবান হইয়া পরে অন্য দিকে মন দেন। আমি বলি না, চাষারা যে প্রক্রিয়া অবলম্বন করিয়া কার্য্য করে, ভদ্রলোকে ঠিক্ সেই প্রক্রিয়ার অনুসরণ করিবেন, কোন উন্নতির দিকে প্রথমে দৃষ্টি রাখিবেন না। কোন উন্নতি না করিতে পারিলে চাষাদের কার্য্যে চাষাদের সহিত ভদ্রলোকে কখনই পারিয়া উঠিবেন না। এক বীজ হইতে শ্রেষ্ঠ ফসল হয়, অন্যবীজ হইতে নিকৃষ্ট ফসল হয়; এক বীজ হইতে অধিক ফল হয়, অন্য বীজ হইতে কম ফল হয়; কেবল বীজের দোষগুণে ফসলের এত তারতম্য হইয়া থাকে। অধিক ফলপ্রদ শ্রেষ্ঠজাতীয় বীজের সংগ্রহ শিক্ষিত ভদ্রলোকের দ্বারা অতি সহজেই হইতে পারে। কোন্ জাতীয় ধান, কোন্ জাতীয় পাট, কোন্ জাতীয় ছোলা,

কোন্ জাতীয় আক্ হইতে অল্প ব্যয়ে অধিক ফসল হয়, এ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের কৃষি-পরীক্ষা ক্ষেত্রগুলির বাৎসরিক বিবরণী পাঠ করিয়া স্থির করা যাইতে পারে।

ভদ্রলোকের পক্ষে চাষীদের প্রতিযোগিতায় চাষ করিয়া উঠা নিতান্ত দুরূহ। কোন নূতন বীজ, বা কোন নূতন প্রক্রিয়া একচেটিয়া করিয়া রাখা চিরকালের মত চলিতে পারে না। চাষীদের মধ্যে নূতন সামগ্রীর বা প্রক্রিয়ার অনুসন্ধান অনতিবিলম্বেই চলিতে থাকিবে, এবং শ্রমজীবীদের সাহায্যে উঁহারা নূতন বীজ বা নূতন প্রক্রিয়ার জ্ঞান লাভ করিয়া লইবে। ভদ্রলোকে শ্রমজীবীর সাহায্য ভিন্ন একাকী কোন কার্য্যই করিতে পারেন না। দুই এক জন ভদ্রলোকের মধ্যে বিশেষ জ্ঞান লুক্কায়িতভাবে থাকিলে, কখনই দেশের উন্নতি হইতে পারে না। দেশের উন্নতি সাধারণ চাষীদের উন্নতির পথ সম্পূর্ণ ভাবে দেখাইয়া দেওয়া হইতে সম্ভব। ভদ্রলোকেও কৃষিকার্য্যে লিপ্ত হইতে পারিবেন, অথচ চাষীদের মধ্যেও যুগপৎ সমস্ত উন্নতি চলিতে থাকিবে, ইহার সুন্দর উপায় ভাগে চাষ করা। ভদ্রলোকের জমী, বিশেষ বিশেষ বীজ, বিশেষ বিশেষ যন্ত্র, বিশেষ বিশেষ সার, আর চাষীর এবং উঁহার বলদের পরিশ্রম, শেষে অর্দ্ধা অর্দ্ধি ভাগ ;—এনিয়মে কার্য্য করা দেশে প্রচলিত থাকায় চাষীরা সহজেই ইহাতে রাজি হইতে পারে, এবং ইহা দ্বারা শিক্ষিত ব্যক্তি নানা উন্নতির অনুষ্ঠান করিয়া নিজেও কৃষিকার্য্য দ্বারা লাভবান হইতে পারেন। নিজজোত অপেক্ষা ভাগজোতে কার্য্য করাতে ভদ্রলোকের পক্ষে বিশেষ সুবিধা আছে, এবং দেশেরও কৃষিউন্নতির প্রধান পন্থা এই।

শিক্ষিত ভদ্রলোকে আপনার ক্ষমতা ও প্রবৃত্তি বুঝিয়া যেন কৃষিকার্য্যে লিপ্ত হয়েন। যাঁহার পল্লীগ্রামে চাষাভূষা লোকদের সহিত সহবাস করিবার প্রবৃত্তি নাই, যাঁহার প্রবৃত্তি গণিত, সাহিত্য বা দর্শনচর্চ্চার দিকে, যাঁহার জলে ও রৌদ্রে মাঠে মাঠে ঘুরিয়া বেড়াইলেই ব্যারাম হয়, তাঁহার পক্ষে কৃষিকার্য্যে লিপ্ত হওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। সন্তানদিগের প্রবৃত্তি বুঝিয়া এদেশের পিতা মাতা আপনাপন সন্তানদের ভবিষ্যৎ জীবন প্রায়ই পরিচালিত করেন না। অমুক, ছেলে এণ্ট্রেন্স্ পাস্ করিতে পারিল না, উহাকে দেশে রাখিয়া চাষাবাদের বন্দোবস্ত করিব, এইরূপ ভাবে পিতা পুত্রকে কৃষিজীবী করিবার প্রয়াস্ পান ; পুত্রও তাহাতে কোন মতামত প্রকাশ করেন না। যাহার নিজের প্রবৃত্তি অন্য দিকে, তাহার পিতার সহস্র যত্ন সত্ত্বেও, কৃষিকার্য্যে তাহার কখনই লাভ হইবে না। সকল বৃত্তিসম্বন্ধেই এই নিয়ম প্রযুজ্য,—নিজ প্রবৃত্তি অনুসারে কার্য্য না করিতে পারিলে সে বৃত্তি অবলম্বনদ্বারা কেহ লাভবান হইতে পারেন না। কৃষি-কার্য্য শিক্ষা করাইবার এবং কৃষি-কার্য্যে লিপ্ত করাইবার প্রয়াস পাইবার পূর্ব্বে অভিভাবকের কর্ত্তব্য শিক্ষার্থীর নিজের প্রবৃত্তি কোন্ দিকে এ বিষয়ে যথাযথ অনুসন্ধান লওয়া। এ সম্বন্ধে অভিভাবকদিগের নিতান্ত শিথিলতা সর্ব্বদাই দেখিতে পাওয়া যায়।

কৃষি-কার্য্যে লিপ্ত হইবার পূর্ব্বে ভদ্রলোকের কিরূপ শিক্ষার আবশ্যক ? কৃষি-কার্য্য শিক্ষা করিবার তিনটী উপায় —১ম বিদ্যালয়ে শিক্ষা করিয়া ; ২য়, চাষীর সহিত কার্য্য করিয়া ; ৩য়, নিজের অর্থ ব্যয় করিয়া "ঠেকে" শিক্ষা করিয়া। বিদ্যালয়ের কৃষি শিক্ষার বিশেষত্ব, এই শিক্ষার প্রসার। বিদ্যালয়ের গৃহে সহস্র সহস্র নূতন বিষয় দেখা ও শিক্ষা করা হয়, বিদ্যালয়ের পরীক্ষাক্ষেত্রে শত শত বিষয়ের অনুশীলন হয় ; বিদ্যালয়ে ল্যাবোরেটারিতে বিশ পঁচিশ রকম সামগ্রীর বিশ্লেষণ দ্বারা উহাদের রাসায়নিক অবস্থা অভিজ্ঞাত হওয়া যায়। কার্য্যক্ষেত্রে এত প্রকার জ্ঞানের আবশ্যক করে না, অথচ, কার্য্যক্ষেত্রে যাইয়া বিদ্যালয়ের শিক্ষা সম্পূর্ণ বলিয়া কখনই বোধ হয় না। এক জন শিক্ষিত চাষীর নিকট শিক্ষা-নবিশি করিয়া পাঁচ সাতটী ফসলের বিষয় যেরূপ সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ হয়, বিদ্যালয়ের শিক্ষা দ্বারা এই ফসল কয়টী সম্বন্ধে কখনই সেরূপ অভিজ্ঞতা লাভ হয় না। তবে এদেশে শিক্ষিত চাষীর নিকট শিক্ষা-নবিশি করিবার সময় এখনও আসে নাই। বিলাতে এই প্রথা অবলম্বন দ্বারা কৃষিকার্য্যের বিশেষ বিশেষ বিভাগ সম্বন্ধে যেরূপ সম্পূর্ণ ভাবে শিক্ষা করিবার সুবিধা হয়, কলেজে বা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষি শিক্ষা দ্বারা কখনই সেরূপ সুবিধা হয় না। এদেশে দ্বিতীয় পন্থা অবলম্বন করিবার একটী উপায় সরকারী কোন একটী পরীক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষা-নবিশি করা। এরূপ শিক্ষা-নবিশি দ্বারা দুই তিন বৎসরে কয়েকটী ফসল জন্মান সম্বন্ধে শিক্ষার্থির যেরূপ ব্যুৎপত্তি জন্মিবে, বিদ্যালয়ে নানা

বিষয় আলোচনা হেতু ঐ কয়েকটী ফসল সম্বন্ধে তাদৃশ ব্যুৎপত্তি কখনই জন্মিবে না। তবে রীতিমত শিক্ষিত ব্যক্তি বিভিন্ন অবস্থায় বিভিন্ন প্রথা অবলম্বন করিতে যেরূপ সক্ষম হয়েন, বিশেষ একটী পরীক্ষাক্ষেত্রে, বিশেষ কয়েকটী ফসল সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করিয়া শিক্ষানবিশ কখনই সেরূপ সক্ষম হয়েন না, তাঁহাকেও অবস্থাভেদে ঠেকিয়া শিখিতে হয়। তৃতীয় উপায় শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্র দ্বারা অবলম্বনীয়, অর্থাৎ পুস্তকাদির সাহায্যে কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া, নানা বিঘ্ন বিপত্তি উৎক্রমণ করিয়া, ক্রমশঃ ঠিক্ সোজা পথ অবলম্বন করিয়া লাভবান হওয়া, মন্দ উপায় নহে। এবং এই উপায় অনেকেরই আয়ত্তের মধ্যে। ইহা অবলম্বন করিতে গেলে প্রবৃত্তি আবশ্যক, অধ্যয়ন আবশ্যক, সমস্ত বিষয় নিজে দেখিয়া ও বুঝিয়া কার্য্য করা আবশ্যক, অর্থ ব্যয় আবশ্যক, সহিষ্ণুতা আবশ্যক। এদেশের কুঠিয়াল সাহেবেরা প্রায়ই ঠেকিয়া শেখেন, অর্থাৎ বিলাত হইতে যখন আসিয়া চায়ের, কি রেশমের, কি নীলের কুঠির ভার লয়েন, তখন তাঁহারা স্ব স্ব ব্যবসায়সম্বন্ধে এককালীন অনভিজ্ঞ। গোমস্তা প্রভৃতি অধস্তন কর্ম্মচারিগণ আপনাদিগের স্বার্থ বজায় রাখিবার জন্য সাহেবকে কার্য্য শিখাইয়া দিবার জন্য বিশেষ প্রয়াসী হয়েন না। সাহেব ক্রমশঃ কার্য্য শিখিয়া লয়েন। কোন কোন কুঠিয়াল সাহেব স্বাধীনভাবে কুঠির ভার লইবার পূর্ব্বে অন্য একটী কুঠিতে শিক্ষা-নবিশি করেন; কিন্তু বিদ্যালয়ে চা, বা রেশম, বা নীল সম্বন্ধে রীতিমত বৈজ্ঞানিক শিক্ষালাভ করিয়া কোন কুঠিয়াল সাহেবই এদেশে আসেন না। শিক্ষার তিনটী প্রথাই অবস্থাভেদে অবলম্বনীয়, অর্থাৎ যাঁহার যে প্রথাটী অবলম্বন করা সুবিধা, তাঁহার পক্ষে সেইটীই অবলম্বনীয়। যাঁহার পল্লীগ্রামে জমি জারাত আছে, তাঁহার পক্ষে ঘরে বসিয়াই পুস্তকাদির সাহায্যে ঠেকিয়া ঠেকিয়া কৃষিকার্য্য শিক্ষা করা, হয়ত বিদ্যালয়ে যাওয়া অথবা শিক্ষা-নবিশি করা অপেক্ষা সুবিধা। এই তিনটী সোপানের একটী মাত্রও যদি কেহ অবলম্বন করিতে সম্মত না হয়েন, তাঁহার পক্ষে কৃষি-কার্য্যে লাভের প্রত্যাশা করা দুরাশা মাত্র।

শ্রীনিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায়।

বিদ্যুতের উৎপত্তি।

শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে যেদিন ভল্টা তড়িৎ-প্রবাহের অস্তিত্ব আবিষ্কার করিয়া জগৎকে বিস্মিত করিয়াছিলেন, সেই শুভ মুহূর্ত্ত হইতে তড়িৎবিজ্ঞান ক্রমেই উন্নতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। বিদ্যুতের নানা অদ্ভুত শক্তিতে আজকাল যে কত অভাবনীয় ও কল্পনাতীত কার্য্য সুসাধ্য হইয়া পড়িয়াছে তাহা পাঠকপাঠিকাগণের অবিদিত নাই। কিন্তু বিদ্যুৎ জিনিসটা কি, এবং ইহার উৎপত্তিস্থান কোথায়, জিজ্ঞাসা করিলে, আজকালকার প্রধান বিজ্ঞানরথীর নিকটেও সদুত্তর পাওয়া যায় না। বিদ্যুৎ ঠিক্ আলোক নয়, তাপও নয় এবং পরিজ্ঞাত কোনও বায়ব বা তরল পদার্থের সহিত ইহার কোনও সম্বন্ধ নাই, একথা সকল বিজ্ঞানবিদ্ই বুঝেন ও বুঝাইতেও পারেন; কিন্তু এই সকল ছাড়া অপর সহস্র সহস্র জ্ঞাত অজ্ঞাত ব্যাপারের মধ্যে কোনটী বিদ্যুৎমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া জগৎকে ভেল্কি দেখাইতেছে, তাহা কোন বিজ্ঞানবিদ্ আজও নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারেন না।

বিদ্যুৎটা যে কি তাহা কোন পণ্ডিতই বলিতে পারেন না সত্য কিন্তু তথাপি অতি প্রাচীনকাল হইতে ইহার উৎপত্তিতত্ত্বসম্বন্ধে মতবাদ ও অনুমান প্রচারের বিরাম নাই। একটা মতবাদের অযৌক্তিকতা প্রতিপন্ন হইলে, অচিরাৎ আর একটা সিদ্ধান্ত তাহার স্থান অধিকার করিয়া ফেলিতেছে। তারপর কালে সেটাও পরবর্ত্তী বিজ্ঞানবিদ্‌গণের কঠোর পরীক্ষায় হৃতগৌরব হইয়া পড়িলে, এক তৃতীয় মতবাদের আবির্ভাব দেখা যাইতেছে। তড়িৎবিজ্ঞানের বৈচিত্র্যময় ইতিহাসে, নানা বৈদ্যুতিক মতবাদের এই প্রকার অভ্যুত্থান ও পতন অতি সুলভ ঘটনা।

অতি প্রাচীন পণ্ডিতগণ বিদ্যুৎসম্বন্ধে কিছুই জানিতেন না। তৈলস্ফটিক (amber) লঘু পদার্থকে আকর্ষণ করে, কেবল এই অতি ক্ষুদ্র বৈদ্যুতিক ব্যাপারের সহিত তাঁহাদের পরিচয় ছিল। কিন্তু তড়িৎবিজ্ঞানের এই অবস্থাতেও তৎসম্বন্ধীয় মতবাদের অভাব হয় নাই। থেলিজ্ (Thales) নামক জনৈক পণ্ডিত সেই সময় প্রচার করিয়াছিলেন, চুম্বকের যেমন একটা আকর্ষণী শক্তি আছে, তৈলস্ফটিকের-

ও তদ্রূপ কোন একটা শক্তি আছে। থেলিস্বের কথাটা খুব সহজ সন্দেহ নাই, কিন্তু তদ্দ্বারা তড়িৎবিজ্ঞানের সেই শৈশবকালে যে কোনও উন্নতি সাধিত হইয়াছিল, তাহা কিছুতেই বলা যায়না।

এই ত গেল অতি প্রাচীন কালের কথা। ষোড়শ শতাব্দীর পণ্ডিত গিল্‌বার্ট পদার্থবিশেষের পরস্পর সংঘর্ষণে তড়িতের উৎপত্তি দেখিয়া যে মতবাদ প্রচার করিয়াছিলেন, এখন তাহার আলোচনা করা যাউক। ইনি বলিয়াছিলেন, পদার্থকে ঘর্ষণ করিলে স্বভাবতই যে তাপ উৎপন্ন হয়, তাহাই ঘর্ষণজ তড়িৎ-উৎপত্তির মূল কারণ। তড়িতোৎপাদক বস্তু হইতে ঘর্ষণজ তাপদ্বারা একপ্রকার অতিসূক্ষ্ম পদার্থ স্বতই বহির্গত হয়, তার পর বাহিরের বাতাসের সংস্পর্শে আসিলেই, সেটা শীতল ও সঙ্কুচিত হইয়া, সেই উৎপাদক বস্তুটার সহিত পুনর্মিলিত হইবার চেষ্টা করে, এবং সঙ্গে সঙ্গে সন্নিহিত লঘু পদার্থগুলিকে টানিয়া লইয়া যায়। গিলবার্টের মতে, ঘর্ষণজ তাপদ্বারা বিচ্ছিন্ন পদার্থের এই টানই বৈদ্যুতিক আকর্ষণ। বৈদ্যুতিক বিকর্ষণের সহিত বোধ হয় তাৎকালিক পণ্ডিতগণ পরিচিত ছিলেন না, নচেৎ হয়ত তৎসম্বন্ধেও এইরূপ একটা অদ্ভুত মতবাদের কথা শুনা যাইত। গিলবার্টের পর বয়িল্ (Boyle) নামক জনৈক বিখ্যাত পণ্ডিত বিদ্যুৎসম্বন্ধীয় পূর্ব্বোক্ত মতবাদটার কিঞ্চিৎ সংস্কার করিয়া, ইহাকে একটা নূতন আকার দিয়াছিলেন। কিন্তু বলা বাহুল্য পরবর্ত্তী কালে নানা অভিনব বৈদ্যুতিক ধর্ম্ম আবিষ্কৃত হইলে, সংস্কৃত মতবাদটার দ্বারাও তাহাদের কোনও ব্যাখ্যা না পাওয়ায়, তাৎকালিক পণ্ডিতগণ উভয় মতবাদই অমূলক বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।

ইহার পরই হক্‌সবি ও আবি নোলের (Abbe Nollet) গবেষণাকাল। অধ্যাপক হক্‌সবি বহু পরীক্ষাদি দ্বারা স্থির করিয়াছিলেন, যেমন উজ্জ্বল পদার্থাদি হইতে আলোকরেখা বহির্গত হয়, বিদ্যুৎযুক্ত বস্তু হইতেও তদ্রূপ এক রশ্মিময় পদার্থ নির্গত হইয়া থাকে। এই জিনিষটা বায়ুর ভিতর দিয়া অগ্রসর হইবার সময় প্রবল ধাক্কা দিয়া পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের কতক বায়ুকে স্থানচ্যুত করিতে থাকে। কিন্তু বায়ু স্থানচ্যুত হইয়া থাকিবার জিনিস নয়; ধাক্কার মাত্রাটা কমিয়া আসিলেই, পার্শ্বস্থ বায়ু সেই বায়ুবিরল স্থান অধিকার করিবার জন্য ধাবিত হয়, এবং কাজেই সেই বৈদ্যুতিক রশ্মিকে ঘেরিয়া একটা বায়ুস্রোত উৎপন্ন হইয়া পড়ে এবং সেটা বিদ্যুৎযুক্ত পদার্থ টারই অভিমুখে ধাবিত হয়। হক্‌সবির মতে বৈদ্যুতিক আকর্ষণ এবং পূর্ব্বোক্ত বায়ুপ্রবাহদ্বারা লঘু পদার্থের সঞ্চরণ একই ব্যাপার। নোলের মতবাদটা কিছু নূতন ধরণের। তড়িতাত্মক বস্তুমাত্রেই, এক প্রকার পদার্থ আবদ্ধ থাকে। কঠিন বস্তুর আণবিক বন্ধন ছিন্ন করিয়া বহির্গত হইবার শক্তি সেই পদার্থের নাই; এজন্য বিদ্যুতাত্মক পদার্থের স্বাভাবিক অবস্থায় বিদ্যুতের বিকাশ দেখা যায় না; কিন্তু ঘর্ষণাদি দ্বারা সেই সকল পদার্থের উপরে চাপ দিলে, আবদ্ধ বৈদ্যুতিক পাদার্থটা চোঁয়াইয়া বাহির হইয়া আমাদের ইন্দ্রিয়গোচর হইয়া পড়ে। পূর্ব্বেকার সিদ্ধান্তগুলির ন্যায় এই মতবাদ দুটীও প্রচারের অল্পকাল পরেই, অমূলক বলিয়া প্রতিপন্ন হওয়ায় পরিত্যক্ত হইয়াছিল। কিন্তু ইহাদের স্থান অধিককাল শূন্য থাকিতে পারে নাই,—*বিখ্যাত পণ্ডিত আচার্য্য* ফ্রাংক্লিনের একপ্রবহবাদ এবং অধ্যাপক *সিমারের দ্বিপ্রবহ*-বাদ দ্বারা শূন্যস্থান যুগপৎ অধিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল

ফ্রাঙ্কলিন বলিতেন, স্বভাবতই এক প্রকার প্রবহ-পদার্থ * (fluid) বস্তুমাত্রেই সর্ব্বদা অবস্থান করিতেছে। এই পদার্থের বিশেষ ধর্ম্ম এই যে, সাধারণ জড়মাত্রেরই অণুসকলকে ইহা আকর্ষণ করে, কিন্তু সেই বৈদ্যুতিক পদার্থের পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণের কোন লক্ষণই দেখা যায় না, বরং তাহার বিপরীত লক্ষণ অর্থাৎ বিকর্ষণের চিহ্ন স্পষ্ট দেখা গিয়া থাকে। স্বাভাবিক অবস্থায় জড়বস্তুতে ঐ পদার্থটা সমভাবে অবস্থান করে, কাযেই তাহাতে বিদ্যুতের কোনও চিহ্ন দেখা যায় না; কিন্তু কোন উপায়ে, জড়বস্তুতে সেই পদার্থের পরিমাণ বাড়াইয়া বা কমাইয়া দিলে, তৎক্ষণাৎ তড়িৎলক্ষণ প্রকাশ পায়। কাচে ফ্লানেল বা রেশমী কাপড় ঘসিলে আমরা কাচস্থিত সমঘন পদার্থটাকে অল্প করিয়া দিই, কিন্তু ফ্লানেলে বৈদ্যুতিক সামগ্রী বাড়িয়া

* ইংরাজি fluid এর বাঙ্গালা পারিভাষিক শব্দ তরল পদার্থ নয়, দ্রব পদার্থও ঠিক নয়। বর্ত্তমান প্রবন্ধে fluidকে প্রবহপদার্থ বলা গেল। লেখক কোন নূতন শব্দ গঠনের স্পর্দ্ধা রাখেন না,——কেবল অর্থ প্রকাশের জন্য এই নূতন শব্দটা ব্যবহৃত হইল।

যায়। এই জন্ম কাচ ধনাত্মক (positive) ও ফ্লানেল ঋণাত্মক (Negative) তড়িতে পূর্ণ হইয়া পড়ে।

সিমারের মতবাদটী আবার আর এক রকমের। ইনিও ফ্রাঙ্কলিনের স্থায় তড়িৎজনক পদার্থের কল্পনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; কিন্তু ইঁহার মতে সেই প্রবহ পদার্থের সংখ্যা একটী নয়, স্পষ্টই দুইটী এবং এই দুইটী পদার্থ পরস্পর বিপরীতধর্ম্মী। ইহাদের বিশেষ ধর্ম্ম এই যে, কোনও দুইটী বস্তু উহাদের মধ্যে কেবল একটীরই দ্বারা তড়িন্ময় হইলে বস্তু দুইটীতে বিকর্ষণী শক্তি দেখা যায়; কিন্তু আবার সেই দুইটী পদার্থকেই যদি বিভিন্ন বৈদ্যুতিক পদার্থ দ্বারা তড়িৎযুক্ত করা যায়, তাহা হইলে পরস্পরের মধ্যে আকর্ষণী শক্তির উৎপত্তি দেখা গিয়া থাকে। জড় বস্তুর স্বাভাবিক অবস্থায় ঐ দুই প্রবহপদার্থ সমপরিমাণে মিশ্রিত থাকে, এজন্ম সে সময় কোনও বৈদ্যুতিক চিহ্ন প্রকাশ পায় না, কিন্তু ঘর্ষণাদি দ্বারা কোনও বস্তুর সেই সাম্যভাব বিচলিত করিলে, তাহাতে একটী বৈদ্যুতিক পদার্থের আধিক্য হইয়া পড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুতের লক্ষণও দেখা গিয়া থাকে।

ফ্রাঙ্কলিনের সিদ্ধান্ত ও সিমারের মতবাদ, এই উভয় দ্বারাই প্রায় সকল পরিজ্ঞাত বৈদ্যুতিক ধর্ম্মের কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। এইজন্ম মতবাদ দুইটীর মধ্যে কোন্‌টী সত্য, তাহা স্থির করিবার নিমিত্ত গতশতাব্দীর বৈজ্ঞানিকদিগের মধ্যে অনেক তর্কবিতর্ক হইয়াছিল, কিন্তু পণ্ডিতগণ ইহার একটা চরম মীমাংসা করিতে পারেন নাই। এই কলহদ্বন্দ্বের ফলস্বরূপ তাৎকালিক বৈজ্ঞানিক-সম্প্রদায় দ্বিধা বিভক্ত হইয়া কতক ফ্রাঙ্কলিনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং কতক সিমারের মতবাদ সত্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন মাত্র। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই দুইটী মতবাদ পণ্ডিতসমাজে এত প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল যে, কোনও নূতন মতবাদ দ্বারা ইহাদের ভিত্তি যে সহসা কম্পিত হইবে তাহা কিছুদিন পূর্ব্বেও কোন পণ্ডিত মনে স্থান দিতে পারেন নাই। কিন্তু ফারাডে ও হাম্‌ফ্রে ডেভির শিষ্য জুল (Joule) ও মেয়ার (Mayer) প্রমুখ আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্‌গণ শক্তির অবিনশ্বরতা সম্বন্ধীয় পুরাতন সত্যটাকে একটা নির্দ্দিষ্ট আকারে গড়িয়া তুলিলে, ফ্রাঙ্কলিন ও সিমারের সিদ্ধান্তের মূলে কুঠারাঘাত হইয়াছিল। এই মতবাদ দুইটীর কথা কয়েকজন বৃদ্ধ ফরাসী পণ্ডিতের সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িক গণ্ডীর বাহিরে আর বড় শুনা যায় না; এই সম্প্রদায়স্থ ঐ বৃদ্ধ পণ্ডিতগণের মৃত্যুর সহিত মতবাদ দুইটীরও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

নব্য বৈজ্ঞানিকগণ বলেন ফ্রাঙ্কলিন্ ও সিমারের মতবাদ সাহায্যে, বিদ্যুতের নানা জটিল ধর্ম্মগুলিকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা সহজ বটে, কিন্তু তদ্দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপত্তিতত্ত্বের রহস্যটার কিছুই জানা যায় না। শিক্ষার্থীর পক্ষে উভয় মতবাদই বিশেষ উপকারী, কারণ ইহাদের সাহায্যে জটিল বৈদ্যুতিক ধর্ম্মগুলিকে গুছাইয়া সুছাইয়া আয়ত্ত করা যাইতে পারে, কিন্তু মূল বৈদ্যুতিক তথ্যানুসন্ধীর নিকট থেলিজের মতবাদ এবং সিমার ও ফ্রাঙ্কলিনের সিদ্ধান্তের মূল্য একই।

আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ বিদ্যুতের উৎপত্তি সম্বন্ধে কি বলেন এখন দেখা যাউক। বলা বাহুল্য ইঁহারাও একটা মতবাদ গঠন করিয়াছেন, কিন্তু ইহার সহিত পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে কোনটীরও সাদৃশ্য নাই—আধুনিক শক্তিতত্ত্ব (Doctrine of Energy) এই নূতন বৈদ্যুতিক মতবাদের প্রধান অবলম্বন। আজকালকার পণ্ডিতগণ বলেন, জগতের প্রত্যেক স্বাভাবিক ঘটনাকে বিরাট প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া ক্ষুদ্র পরীক্ষাগারের প্রাচীরের মধ্যগত করিলে তাহাকে ঠিক্ ভাবে দেখা যায় না। দেখিতে হইলে তাহাদিগকে সেই বিরাট প্রকৃতির অংশস্বরূপই দেখিতে হইবে। প্রাচীন পণ্ডিতেরা প্রকৃতিকে খণ্ড খণ্ড করিয়া দেখিয়া একটা মহা ভুল করিয়াছিলেন, এবং ইহারই ফলে তাঁহারা প্রত্যেক প্রাকৃতিক ঘটনাকে এক একটা সম্পূর্ণ নূতন সৃষ্টি বলিয়া অনুমান করিয়া ফেলিতেন। কাজেই সেই সকল প্রাকৃতিক কার্য্যের প্রত্যেকটীর কারণ নির্দ্দেশ করিবার জন্ম এক একটা অদ্ভুত রকমের মতবাদের আবশ্যকতা দেখা যাইত। এই জন্যই প্রাচীন বিজ্ঞানশাস্ত্রে তাপ আলোক চুম্বক বিদ্যুৎ, প্রত্যেকেরই জন্ম এক একটা মতবাদ দেখা যায়। প্রাচীন পণ্ডিতগণ শক্তি ও বিদ্যুৎ এই উভয়ের মধ্যেকার সম্বন্ধটা বুঝিয়া গবেষণা করিলে বোধ হয় আজ পূর্ব্বোক্ত নানা আজগবি মতবাদের কথা শুনা যাইত না।

জগতে শক্তির ভাণ্ডার সর্ব্বদাই পূর্ণ বটে, কিন্তু ইহার পরিমাণ অসীম নয়। প্রতিদিন চক্ষের সম্মুখে আমরা যে

নানা শক্তির বিকাশ দেখিতেছি, তাহার প্রত্যেক ক্ষুদ্র অংশই প্রকৃতির বিরাট শক্তিসম্পদের এক এক ক্ষুদ্র কণামাত্র। তাপ, আলোক, বিদ্যুৎ, চৌম্বকাকর্ষণ, মাধ্যাকর্ষণ, রাসায়নিক যোগবিয়োগ শক্তি সকলই প্রকৃতির বিপুল শক্তির অঙ্গীভূত। প্রকৃতির শক্তিভাণ্ডারের ক্ষয় নাই, বৃদ্ধিও নাই, কিন্তু পরিবর্ত্তন আছে এবং এই পরিবর্ত্তন আছে বলিয়াই প্রকৃতি এত বৈচিত্র্যময়ী। যে শক্তি সৌরকিরণাকারে ভূপৃষ্ঠে পতিত হইয়া জলকে বাষ্পীভূত করিতেছে, বাষ্পে পরিণত করিবার জন্য তাহার ধ্বংস হয় না, ব্যয় হয় মাত্র। সৌর তাপ গূঢ়াবস্থায় সেই বাষ্পে অবস্থান করে, তার পর যথাকালে বাষ্প জমিয়া জল হইতে আরম্ভ করিলে, সেই তাপের পুনর্বিকাশ হয়। মানুষ সৌরতাপপুষ্ট শক্তিময় খাদ্য আহার করিয়া যে বলের সঞ্চয় করে, চলা ফেরা উঠা বসা প্রভৃতি কার্য্যে তাহারই বিকাশ দেখা যায়। আমাদের প্রত্যেক পাদক্ষেপে ব্যয়িত শক্তি হয় তাপ বা অপর কোনও আকার গ্রহণ করিয়া কার্য্যান্তরে নিযুক্ত হইতেছে। আধুনিক পণ্ডিতগণের মতে বৈদ্যুতিক ব্যাপারটাও প্রাকৃতিক শক্তির একটা বিকাশমাত্র। একটা বৃক্ষশাখা নত করিতে বা বন্দুক হইতে গুলি ছুড়িতে যেমন কিছু শক্তি ব্যয় আবশ্যক হয়, তদ্রূপ টেলিগ্রাফের তারের সাহায্যে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালাইতে হইলে, বা কোনও ধাতুফলককে বিদ্যুৎযুক্ত করিবার চেষ্টা করিলেও শক্তি ব্যয়ের আবশ্যকতা দেখা যায়। গাড়ীর কলে প্রযুক্ত শক্তির প্রকারান্তর বিকাশ, যেমন তাহার গতি এবং চাকা ও রেলে সংঘর্ষণজ তাপাদিতে বিকাশ পায়, সেই ধাতুফলকে বা টেলিগ্রাফের তারে প্রযুক্ত শক্তি ও তদ্রূপ বিদ্যুৎস্ফুলিঙ্গ ও বিদ্যুৎপ্রবাহদ্বারা রূপান্তর পরিগ্রহ করে।

প্রযুক্ত শক্তি কিপ্রকারে বিদ্যুতে পরিণত হয় এখন দেখা যাউক। আধুনিক বিজ্ঞানবিদ্‌গণের মতে জড়জগতে কেবলমাত্র দুইটী নিত্য পদার্থের অস্তিত্ব দেখা গিয়া থাকে, একটী উল্লিখিত বিশাল স্তূপ এবং অপরটী সামগ্রী (Matter)। উভয়ই অক্ষয় এবং স্থির। কিন্তু কেবল এই দুইটী অবলম্বন করিয়া প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যমাত্রেরই কারণ নির্দ্দেশ করা অসম্ভব দেখিয়া, বিজ্ঞানবিদ্‌গণ পরীক্ষাদি দ্বারা তাপালোক প্রবহ ঈথর বা আকাশ নামক একটা তৃতীয় পদার্থের অস্তিত্ব বুঝিতে পারিয়াছেন। তাপ আলোক ইত্যাদি অনেক ব্যাপারই সেই ঈথরের প্রযুক্ত শক্তির বিকাশ বলিয়া ধরা পড়িয়াছে। আধুনিক পণ্ডিতগণের মতে এই ঈথর বা আকাশই বিদ্যুৎ এবং এই আকাশই অবস্থাভেদে, স্থিরতড়িৎ, তড়িৎপ্রবাহ, এবং চৌম্বক শক্তিরূপে আমাদের চোখে পড়ে। তড়িতের কার্য্যটা তড়িৎপ্রবাহক তার বা তড়িতের আধার ধাতুফলকের মধ্যে হয় না, ইহাদের বাহিরে যে ঈথর অবস্থিত তাহাতেই তড়িতের উৎপত্তি। টেলিগ্রাফের তার বিদ্যুৎকে কেবল পথ দেখাইয়া লইয়া যায় মাত্র এবং সন্নিহিত ঈথরের অবস্থাবিশেষকে একটা নির্দ্দিষ্টস্থানে আবদ্ধ রাখাই ধাতুফলকের এক মাত্র কাজ।

এখন দেখা যাউক আকাশের কোন্ কোন্ অবস্থায় কোন্ কোন্ শক্তির বিকাশ হয়। বিজ্ঞানবিদ্‌গণ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, আকাশ বা ঈথরের একপ্রকার কম্পনই তড়িৎশক্তি বিকাশের একমাত্র কারণ। পদার্থমাত্রই স্থূলতঃ দুই প্রকারে কম্পিত হইতে পারে, তন্মধ্যে একটীকে উর্দ্ধাধঃ কম্পন এবং অপরটীকে পাশাপাশি আন্দোলন বলা যাইতে পারে। কোন পদার্থ যখন জলে ভাসিতে ভাসিতে নাচিতে থাকে, আমরা তাহার সেই কম্পনকে উর্দ্ধাধঃ কম্পন বলিতেছি এবং সেই পদার্থেরই প্রান্তদ্বয় যখন তরঙ্গাভিঘাতে ডুবিতে উঠিতে থাকে, সেই সঞ্চালনকে আমরা পাশাপাশি কম্পন আখ্যা দিতেছি। এই শেষোক্ত কম্পনটা কতকটা নিক্তির দণ্ডের আন্দোলনের অনুরূপ। ঈথর অবস্থাবিশেষে পড়িয়া ভাসমান পদার্থের ন্যায় কম্পিত হইতে পারে। বৈজ্ঞানিকগণ ইহার অতি সূক্ষ্ম অংশ গুলির সেই উর্দ্ধাধঃ কম্পন ও পাশাপাশি আন্দোলনকে electro-static oscillation এবং magneto-electric oscillation সংজ্ঞা দিয়া থকেন। জলের উপরে ভাসমান পদার্থে যেমন ঐ উভয় কম্পনই যুগপৎ সম্ভবপর, ঈথরকণাতেও ঠিক সেই উর্দ্ধাধঃ ও পাশাপাশি কম্পন একসঙ্গে দেখা যায়। আধুনিক পণ্ডিতগণ বলেন, এই দুই কম্পন বলের (Stress) সমবেত কার্য্যদ্বারা ঈথরের অংশ বিশেষের যে আকারগত পরিবর্ত্তন (Strain) ঘটে, তাহাই তাড়িতোৎপাদক ঈথরতরঙ্গ। আলোক উৎপাদক তরঙ্গও এই শ্রেণীভুক্ত। অধ্যাপক ম্যাক্সওয়েল ঈথরের এই বিশেষ অবস্থাকে electro-magnetic oscillation নামে আখ্যাত করিয়াছেন।

প্রচলিত বৈদ্যুতিক সিদ্ধান্তমতে, আলোকোৎপাদক ঈথর-তরঙ্গ এবং বিদ্যুজ্জননোপযোগী হিল্লোল, ইহাদের প্রকৃতি-গত কোনও পার্থক্য নাই। পার্থক্যটা কেবল একটা অবান্তর ব্যাপার, অর্থাৎ কম্পনমাত্রায় সীমাবদ্ধ। পাঠক-পাঠিকাগণ বোধ হয় জানেন আমাদের ইন্দ্রিয় মাত্রেই সহস্র দুর্ব্বলতা ও নানা অসম্পূর্ণতায় পূর্ণ। আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয় আছে কিন্তু সকল শব্দ শুনিতে পাই না। শব্দোৎপাদক বায়ুতরঙ্গের কম্পন দ্রুততর হইয়া একটা নির্দ্দিষ্ট সীমা উত্তীর্ণ করিলে, সে শব্দটা আমাদের নিকট এত চড়া হইয়া পড়ে যে শ্রবণেন্দ্রিয়কে আর উত্তেজিত করিতে পারে না। অত্যুচ্চ শব্দ ও নিস্তব্ধতা আমাদের কানে সমান ফল উৎ-পাদন করে। অতি ধীর কম্পনজাত শব্দ শ্রবণেও আমাদের কর্ণ বধির। শব্দোৎপাদক কম্পনসংখ্যা হ্রাস হইতে হইতে একটা নির্দ্দিষ্ট সীমার নীচে পৌঁছিলে, তখন শব্দের সুর এত খাদে নামিয়া আসে যে, তাহা আর আমাদের শ্রবণেন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য হয় না। শ্রবণশক্তির ন্যায় আমাদের দৃষ্টিশক্তিরও সীমা আছে। মানবচক্ষু রক্তপীতাদি কেবল কয়েকটী মাত্র বর্ণ দেখিতে পারে; গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে ঈথর-কণাসকল প্রতিসেকেণ্ডে চারিশত লক্ষ কোটীবার (Four hundred billions) স্পন্দিত হইয়া যে আলোক উৎপন্ন করে, তাহাই আমাদের নিকট প্রাথমিক বর্ণ অর্থাৎ রক্তা-লোক রূপে প্রতিভাত হয়। তারপর স্পন্দনসংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে থাকিলে যথাক্রমে পীত, হরিৎ ও ভায়লেটাদি বর্ণের অস্তিত্ব আমরা উপলব্ধি করিতে পারি। কিন্তু সেই সংখ্যা লোহিতালোক উৎপাদক স্পন্দনের দ্বিগুণ হইয়া পড়িলে, সে কম্পনে আমাদের চক্ষু আর সাড়া দিতে পারে না। স্থূল কথায় বলিতে গেলে, রক্তবর্ণোৎপাদক কম্পন অপেক্ষা ধীর এবং ভায়লেট আলোকজনক তরঙ্গ অপেক্ষা দ্রুত আকাশকম্পন দ্বারা যে আলোক উৎপন্ন হয়, তাহা দেখিতে মানবচক্ষু চিরবঞ্চিত। আধুনিক বৈদ্যুতিক সিদ্ধান্তমতে, আলোকতরঙ্গ ও বিদ্যুৎউৎপাদক আকাশ-কম্পন একই ব্যাপার হইলেও, বিদ্যুৎতরঙ্গ ধীর; এজন্য ইহা আমাদের দর্শনেন্দ্রিয়কে উত্তেজিত করিতে পারে না। ইহার বিকাশ আমরা কেবল তড়িতেই দেখিয়া থাকি।

আলোকজনক কম্পন ও বৈদ্যুতিক তরঙ্গ উভয়েই যে মূলে এক, তাহা অধ্যাপক ম্যাক্সওয়েল গণিতসাহায্যে আবিষ্কার করিয়া সর্ব্বপ্রথমে জগতে প্রচার করেন। কিন্তু প্রত্যক্ষ প্রমাণাভাবে এই নূতন কথাটা সেসময় সকলে অভ্রান্ত বলিয়া গ্রহণ করিতে পারেন নাই। ম্যাক্সওয়েলের পর আচার্য্য হেমহোলজের প্রিয়শিষ্য হার্জ সাহেব বিষয়টী লইয়া গবেষণা আরম্ভ করিয়াছিলেন, এবং পূর্ব্বোক্ত ইন্দ্রিয়া-গ্রাহ্য ধীর ঈথর-কম্পনই যে বিদ্যুতের উৎপাদক তাহা তিনি নানা পরীক্ষাদি দ্বারা বেশ বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু হার্জের অকালমৃত্যুতে এই গবেষণার শেষ হয় নাই। আজ কয়েক বৎসর হইল ভারতের সুসন্তান আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় স্বহস্তনির্ম্মিত যন্ত্র সাহায্যে হার্জের উক্তি এবং ম্যাক্সওয়েলের গণনা যে অভ্রান্ত তাহা দেখাইয়া জগতকে স্তম্ভিত করিয়াছেন। অদৃশ্যালোক-উৎপাদক তরঙ্গ ও বিদ্যুৎতরঙ্গ যে একই ব্যাপার এখন তাহা অনেকেই বুঝি-তেছেন।

তরঙ্গ থাকিলেই তাহার একটা medium * থাকা আবশ্যক। জলতরঙ্গের মীডিয়ম্ জল, বায়ুতরঙ্গের মীডি-য়ম্ বায়ু, সুতরাং কোন একটা বৈদ্যুতিক মীডিয়ম্ না থাকিলে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের উৎপত্তি হওয়া অসম্ভব। এই যুক্তিতে আধুনিক পণ্ডিতগণ বৈদ্যুতিক তরঙ্গের মীডিয়ম্ ঈথরকেই বিদ্যুৎ বলিয়া কল্পনা করিতেছেন। পদার্থের যে অবস্থাকে আমরা বিদ্যুদ্বান্ (electrified) সংজ্ঞা প্রদান করি, সেটা সেই বিদ্যুৎ বা ঈথরেরই অবস্থাবিশেষ ব্যতীত আর কিছুই নয়।'

ঈথর বা তড়িতের দুইটী বিভিন্ন ভাব আছে,—বৈজ্ঞানিক-গণ ইহাদিগকে positive ও negative সংজ্ঞায় আখ্যাত করিয়াছেন। ঈথরসাগরের ক্ষুদ্রতম স্থানেও এই দুই ভাবের একত্র সমাবেশ থাকে, তাই আমরা ঈথর অর্থাৎ বিদ্যুৎসাগরে ডুবিয়া থাকিয়াও বিদ্যুতের সন্ধান পাই না। কিন্তু কোন রেশমী কাপড় দ্বারা কাচদণ্ড ঘর্ষণ করিয়া বা প্রকারান্তরে অপর শক্তি প্রয়োগ করিয়া আমরা তাহার নিকটবর্ত্তী ঈথরের অবস্থা এরূপ করাইতে পারি যে তখন

* Medium কথাটির একটি বাঙ্গালা পারিভাষিক প্রতিশব্দ আবশ্যক। প্রঃ—সং।

সেখানে positive negative অর্থাৎ ধনঋণ ভাব আর একাধারে থাকিতে পারে না। এই প্রক্রিয়ায় ঈথরের যে অবস্থান্তর ঘটে তাহাই ঘর্ষণজ বা অচলতড়িৎ।

এখন বিদ্যুৎ প্রবাহের (electric current) উৎপত্তি কোথায় দেখা যাউক। বৈজ্ঞানিকগণ বলেন, ঘর্ষণজ স্থির তড়িতের সহিত বিদ্যুৎ প্রবাহের মূলে কোনই অনৈক্য নাই। দুই স্থানের মধ্যে উভয়বিধ তড়িতের গমনাগমনই তড়িৎপ্রবাহ। বিদ্যুতোৎপাদক কোনও ব্যাটারীর তার যখন বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকে, তখন তাহার একপ্রান্ত 'ধন' এবং অপর প্রান্ত 'ঋণ' তড়িতে পূর্ণ থাকে, বাতাসের বাধা ভেদ করিয়া উভয় তড়িত মিলিত হইতে পারে না, তাই তখন তড়িতপ্রবাহ দেখা যায় না। তারের প্রান্তদ্বয় সংযুক্ত করিয়া দাও, ধনাত্মক ও ঋণাত্মক তড়িত অবিচ্ছিন্ন ভাবে গমনাগমন করিয়া তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন করিবে। সুতরাং ঘর্ষণজ তড়িৎ ও বিদ্যুৎ প্রবাহ, এই উভয়ের কার্য্যের মধ্যে দৃশ্যতঃ অনৈক্য থাকিলেও মূলে তাহারা এক, এবং কাজে কাজেই তাহাদের উৎপত্তিতত্ত্বও এক।

বিদ্যুৎ প্রবাহের সহিত চুম্বকের একটা অতি নিকট আত্মীয়তা দেখা যায়। প্রাচীন পণ্ডিতগণও এই আত্মীয়তার কথা জানিতেন। লৌহদণ্ডে তার জড়াইয়া, পরে সেই তারসাহায্যে বৈদ্যুতিকপ্রবাহ পরিচালিত করিলে লৌহখণ্ড ক্ষণিক চৌম্বক ধর্ম্ম প্রাপ্ত হয়। প্রবাহ রোধ কর, লৌহদণ্ডের আর আকর্ষণী শক্তি থাকিবে না। তবে কি স্বাভাবিক চুম্বককে ঘেরিয়া আমাদের অলক্ষিতে বিদ্যুৎ প্রবাহ চলিতেছে? বিখ্যাত তড়িত-বিদ্‌ আমপ্যায়ার ইহাই বিশ্বাস করিতেন এবং এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া একটা মতবাদও প্রচার করিয়াছিলেন। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতগণের গবেষণায় সে মতবাদ নিরর্থক হইয়া পড়িতেছে। আজকাল পণ্ডিতগণ বলিতেছেন, চৌম্বকধর্ম্ম ও সেই বিদ্যুৎ বা আকাশের কম্পনবিশেষের প্রত্যক্ষ ফল। অধ্যাপক লজ্‌ গণিতকৌশলে দেখাইয়াছেন, ঈথর আবর্ত্তাকারে কম্পিত হইতে থাকিলে আবর্ত্তগুলি চুম্বকের ন্যায় পরস্পর আকর্ষণ ও বিকর্ষণ করিয়া থাকে। আজ কাল অনেকে এই সূত্র অবলম্বন করিয়া বলিতেছেন, চৌম্বক পদার্থ মাত্রেরই অণুসকল অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম আবর্ত্তরচনা করিয়া ঘুরিতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে সন্নিহিত ঈথরকেও সেই প্রকারে আবর্ত্তিত করিতেছে। চৌম্বক ধর্ম্মটা এই সকল ঈথর আবর্ত্তের বিকাশ ব্যতীত আর কিছুই নয়।

বিদ্যুতের উৎপত্তিসম্বন্ধীয় নুতন মতবাদটী আধুনিক পণ্ডিত সমাজে খুব প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে সত্য, কিন্তু ইহার ভিত্তি যে চিরকাল অনিশ্চিত থাকিবে, তাহা কোনক্রমেই বলা যায় না। বিদ্যুৎতরঙ্গ ও আলোকস্পন্দন উভয়েই যে সমবেগে পরিচালিত হয়, তাহাতে আর এখন অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই, প্রত্যক্ষ পরীক্ষায় তাঁহার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু বৈদ্যুতিক তরঙ্গের কম্পনমাত্রা বাড়াইয়া আলোকতরঙ্গের উৎপত্তি না দেখাইতে পারিলে, বিদ্যুৎতরঙ্গ ও আলোকস্পন্দনের একত্ব সম্পূর্ণ প্রতিপন্ন হইবে না। আজও নূতন মতবাদটী শত ছিদ্রে পূর্ণ। কোন এক ভবিষ্য ফ্যারাডে বা ম্যাক্‌সওয়েল কর্ত্তৃক এই বিশাল মতবাদটীর ধ্বংসের সম্ভাবনা অদ্যাপি ইহাতে রহিয়া গিয়াছে।

শ্রীজগদানন্দ রায়।

বিবাহের ফলাফল।

(প্রাচীন দৈবজ্ঞদিগের গণনা)

আমার ক্ষুদ্র বিবেচনায় জন্ম ও মৃত্যু অপেক্ষা, বিবাহ-ক্রিয়া গুরুতর প্রয়োজনীয় ঘটনা। কর্ম্মবন্ধন ছিন্ন না হইলে, সর্ব্বপ্রকার সুখ ও দুঃখের সম্পূর্ণরূপে ক্ষয় না হইলে, জন্মজন্মান্তরীণ অদৃষ্ট সংস্কার বশতঃ মনুষ্যকে পুনঃ পুনঃ সংসারক্ষেত্রে আগমন করিতে হয়, সুতরাং মানবজন্মের বিশেষত্ব কিছুই নাই; "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুর্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ" অর্থাৎ জন্ম হইলেই মৃত্যু হইবে, ইহা ধ্রুব সত্য —জন্ম মরণের কারণ – সুতরাং মৃত্যুতে বিশেষত্ব কিছুই দেখি না; ইহা স্বাভাবিক ঘটনা এবং প্রত্যেক জীবই এই ঐশ্বরিক নিয়মের অধীন; কিন্তু বিবাহ তাহা নহে, ইহা তোমার ও আমার বাসনাসম্ভূত ক্রিয়াবিশেষ। বিবাহ আমাদের সুখ, স্বচ্ছন্দতা, সুবিধা ও সংকল্পের নিমিত্ত মাত্র ক্রিয়াস্বরূপে পরিগণিত হইলেও ইহা একটি অতীব প্রয়োজনীয় বিরাট্‌ ব্যাপার—ইহা আমাদের সামাজিক, পারিবারিক, আধ্যাত্মিক, ধর্ম্মনৈতিক এবং জাতিগত মহোৎসব।

এই জন্য অনেক কাঠ খড় পোড়াইয়া বিবাহ হয়—এই জন্য অনেক তর্ক বিতর্ক বাগ্‌বিতণ্ডা, অনুসন্ধান অনুনয়, ভাল মন্দের বিচার প্রভৃতি না হইলে বিবাহের বন্দোবস্ত শেষ হয় না। বিবাহবিভ্রাটে মহা অনিষ্ট, মহা গোলযোগ, মহা উপদ্রব সংঘটিত হইবার সম্ভাবনা; এই জন্য প্রাচীন কালের লোকেরা অতি সাবধানে বিবাহ সম্বন্ধে শেষসিদ্ধান্তে উপনীত হইতেন। প্রস্তাবিত বিবাহটি ভাল হইবে কি মন্দ হইবে, তাহা স্থির করিবার জন্য তাঁহারা গ্রহাচার্য্য, দৈবজ্ঞ, গ্রহবিপ্র, জ্যোতিষী, পণ্ডিত, ভবিষ্যত্তত্ত্বজ্ঞ, সাধুসন্ন্যাসী প্রভৃতির নিকটে গমন করিয়া, বিশেষ অনুনয় ও অনুরোধের সহিত, বিবাহের সুফল বা কুফলসম্বন্ধে প্রশ্ন করিতেন। সে কালের দৈবজ্ঞগণ এই রূপ প্রশ্নসম্বন্ধে যে সকল অতীব কৌতুকাবহ গণনা দ্বারা ফলাফলের মীমাংসা করিতেন, তাহার কতকটা পৃথিবীর সভ্য ও শিক্ষিত সমাজে এখনও প্রচলিত আছে; খৃষ্টীয়, ইসলামীয়, হিন্দু, হিব্রু, পার্শিক, জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রে ও প্রাচীন জোতিষশাস্ত্র হইতে এই সকল কৌতুকাবহ গণনার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিবার আকাঙ্ক্ষা করি। বিবাহের কথা উঠিলে, প্রবাসীর আমোদপ্রিয় পাঠকপাঠিকাগণ, এই কৌতুকাবহ তালিকা মিলাইয়া দেখিতে পারেন।

১ম। বর্গগণনা—পাত্রের নামের প্রথম অক্ষর এবং পাত্রীর নামের প্রথম অক্ষর যদি এক বর্গ ভুক্ত হয়, তাহা হইলে (দৈবজ্ঞেরা বলিতেন) বিবাহ শুভফলদায়ক। দৃষ্টান্ত—পাত্রের নাম বলরাম, পাত্রীর নাম মানকুমারী, পাত্রের নামের প্রথম অক্ষর ব এবং পাত্রীর নামের প্রথম অক্ষর ম—এতদুভয়ই প বর্গের অন্তর্গত, সুতরাং সেকালের দৈবজ্ঞদিগের মতে এইরূপ বিবাহ শুভকর।

২য়। যুক্তগণনা—পাত্র ও পাত্রীর নামের প্রথম অক্ষর যদি এক হয়, অথবা কেবল হ্রস্বত্ব দীর্ঘত্বের প্রভেদ থাকে, তাহা হইলে সেই বিবাহ নিতান্ত অশুভকর। দৃষ্টান্ত—পাত্রের নাম উমাকান্ত এবং পাত্রীর নাম উমাময়ী; এইরূপ বিবাহ অশুভফলপ্রদ। পাত্রের নাম ঈশ্বরদাস এবং পাত্রীর নাম ইচ্ছাময়ী, এরূপ সম্মিলনে (দৈবজ্ঞদিগের মতে) অকল্যাণকর।

৩য়। গ্রহসংজ্ঞা গণনা—বরের নাম চন্দ্র এবং কন্যার নাম নক্ষত্র ব্যঞ্জক হইলে বিবাহ খুব ভাল।

৪র্থ। পাদপব্রততী গণনা—পুরুষ এবং স্ত্রী এতদুভয়েরই নাম যদি বৃক্ষ বা লতাব্যঞ্জক হয়, তাহা হইলে বিবাহ একেবারে বন্ধ করা কর্ত্তব্য।

৫ম। গরলামৃত গণনা—পুরুষ ও স্ত্রীর যদি পরস্পর বিরোধী নাম হয়, (মনে কর বরের নাম অমৃত এবং কন্যার নাম গরলময়ী বা কালকূটী) তাহা হইলে এরূপ বিবাহ দ্বারা উভয়েরই সত্বর মৃত্যু হইয়া থাকে! সাপ ও নেউল নামে বিবাহ হয় না।

৬ষ্ঠ। অহি গণনা।—পাত্রীর নাম যাহাই হউক, পাত্রের নাম সর্পের পরিচায়ক হইলে, গ্রীষ্ম বা বসন্ত ঋতুতে বিবাহ দিবে না। অন্য ঋতুতে বিবাহ হইলে ক্ষতি নাই। বিবাহের অন্ততঃ এক সপ্তাহ পূর্ব্বে মনসা পূজা করা আবশ্যক।

৭ম। স্ত্রীর নাম পুরুষের মত এবং পুরুষের নাম স্ত্রীর মত, থাকিলে বিবাহে বর কন্যা উভয়েই দরিদ্র হয়।

৮ম। যে পাত্রের রাশি "সিংহ" তাহার বুধবারে বিবাহ হইলে, বিবাহ ভয়ানক রোগ, শোক, চিন্তা, ভয় ও বিপদের কারণ হয়।

৯ম। য়িহুদীদিগের মতে পাত্রের নামে পূর্ব্বদিকের পরিচয় এবং পাত্রীর নামে পশ্চিমদিকের পরিচয় পাওয়া গেলে বুঝিতে হইবে, এরূপ বিবাহের প্রস্তাব একেবারেই বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত।

১০ম। প্রাচীন রোমানক্যাথলিকদিগের দৈবজ্ঞ সাধুদিগের মতে শুক্রবারে বিবাহ একেবারে নিষিদ্ধ।

১১শ। হিন্দুদিগের মতে দিবায় বিবাহ হইলে, গৃহদাহ, গৃহপালিত পশুর অকালমৃত্যু, মাতাপিতার সত্বর বিয়োগ, পাত্রীর সত্বর বৈধব্য, সঞ্চিত অর্থ নাশ, গুরুর অভিশাপ, ব্রহ্মবিবাদ, দরিদ্রতা, রোগ, বিলাপ প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। মরক্কোর মুসলমানদিগের দিনে বিবাহ হয় না।

১২শ। পুরুষের নাম ভৃঙ্গব্যঞ্জক এবং পাত্রীর নাম পুষ্পব্যঞ্জক অথবা মধু কিম্বা মিষ্টতাব্যঞ্জক হইলে পারিবারিক শান্তি অক্ষুণ্ণ থাকে। রাজপুতানায় ইহাকে "গুলভোওঁরা" গণনা বলে।

১৩শ। পাত্র ও পাত্রীর নাম সরস্বতী লক্ষ্মীর নাম হইলে উভয়ে অত্যন্ত সুখী হয়। মাদ্রাজে ইহাকে "আনৃচি—ভেল্লু" গণনা বলে।



১৪শ। পারসীকদিগের দৈবজ্ঞবৃন্দের মতে পাত্রের নামে স্থল এবং পাত্রীর নামে জল বুঝাইলে বিবাহ খুব ভাল ফল-প্রদায়ক হইয়া থাকে।

১৫শ। কোচিন দেশে সোমবার হইতে রবিবার পর্য্যন্ত যতগুলি বার আছে, ইহার মধ্যে পাত্র বা পাত্রীর কাহারও নামে রবি, সোম, মঙ্গল এবং বৃহস্পতিবারব্যঞ্জক শব্দ থাকিলে বিবাহ খুব আনন্দদায়ক হয়। ইহাকে সে দেশে দ্বীপ-চালী গণনা বলে।

১৬। ঋতু গণনা।—কানাড় (কর্ণাট) দেশে পাত্র পাত্রীর উভয়ের নাম ঋতুব্যঞ্জক হইলে বিবাহ অত্যন্ত মঙ্গলজনক হয়। দৃষ্টান্ত—পাত্রের নাম বসন্তকুমার, পাত্রীর নাম হেমন্তকুমারী।

১৭। আরবের প্রাচীন কোরিশ বংশের দৈবজ্ঞেরা গলার মালার যোড় বিযোড় দেখিয়া বিবাহের ফলাফল নির্ণয় করিতেন; টঙ্ক, মুর্শিদাবাদ, হায়দ্রাবাদ, মুলতান প্রভৃতি স্থানে এখনও এইরূপ প্রথা প্রচলিত আছে। ইহাকে আরবী ভাষায় "আশ্‌তক্ খরা" বলে। দৈবজ্ঞেরা গলার মালা হাতে লইয়া, প্রশ্নকর্ত্তাকে তাহা স্পর্শ করিতে বলেন; মালার যে "দানা"টি স্পর্শ করা হয়, তাহা হইতে মালার শেষ দানা পর্য্যন্ত গণনা করিয়া যদি যুগ্ম সংখ্যা (যোড়) পাওয়া গেল, তাহা হইলেই বিবাহ ভাল, নতুবা বিবাহ মন্দ। মুর্শিদাবাদের নবাববংশে "আশ্‌তক্‌খরা" দ্বারা এখনও প্রতিদিন নানাপ্রকার শুভাশুভ ঘটনার গণনা হইয়া থাকে।

১৮শ। "ফেল-ফায়েল" গণনা।—ভারতবর্ষের এবং ভারতবর্ষের বহির্দ্দেশস্থ পৃথিবীর প্রায় সকল স্থানের মুসলমান দৈবজ্ঞেরা কোরাণ দেখিয়া একপ্রকার শুভাশুভ ফল নির্ণয় করেন, ইহারই নাম ফেল-ফায়েল গণনা। আরব্য ভাষায় ফেল্ শব্দে কর্ত্তা (subject) এবং ফায়েল্ শব্দে ক্রিয়া (predicate) বুঝায়। আমার বিবেচনায় প্রাচীন য়িহুদীদিগের নিকট হইতে খৃষ্টানেরা এবং খৃষ্টানদিগের নিকট হইতে মুসলমানেরা এইরূপ গণনার অনুকরণ করিয়াছেন। দৈবজ্ঞেরা চক্ষু মুদ্রিত করিয়া সর্ব্ব প্রথমে

"বিশ্‌মিল্লা আর্ রহমা নির্ রহিম্।
লাইল্লা হোইল্লা মহম্মদ রসুলেল্লা।
আল্ হাম্‌দো লিল্লা হু রব্ উল্ আলমীণ॥"

এই কথাগুলি সভক্তি উচ্চারণ করিয়া, চক্ষু উন্মীলনপূর্ব্বক, কোরাণ খুলিয়া থাকেন। কোরাণের যে শব্দ বা যে অক্ষর তাঁহার সর্ব্বপ্রথম চক্ষুগোচর হয়, তাহা যদি কল্যাণব্যঞ্জক হয়, তাহা হইলেই বিবাহ শুভদায়ক, নতুবা নহে। মনেকর, কোরাণ খুলিয়াই দৈবজ্ঞ পড়িলেন—

"লা হোল্ বেল্-আ কুবতে ইল্লা
বিল্‌লা হীল্, অলি্‌উল আজীম্॥"

তাহা হইলে বিবাহ অশুভফলদায়ক হইল, কারণ "লা হোল্ বেল্-আ" শব্দ ঘৃণা, বিরক্তি, নিরানন্দ ও বিস্ময়-ব্যঞ্জক শব্দ। কিন্তু যদি দৈবজ্ঞ মহাশয় পড়েন—

"আজতগ্ ফের উল্লা রব্ মিন্ কুল্লে
জম্বীহী, য়োয়া অতুবে ইলাহী।"

তাহা হইলে বিবাহ শুভফলপ্রদায়ক, কারণ এই আয়েতের প্রথম শব্দ এবং সম্পূর্ণ আয়েতের অর্থ, আশা ও আনন্দ দায়ক। প্রাচীন রোমানকাথলিক পাদ্রীগণ বাইবেল লইয়াও এইরূপ গণনা করিতেন। তাঁহারা প্রথমে Our Father which art in heaven নামক সুপ্রসিদ্ধ Lord's Prayer উচ্চারণ করিয়া বাইবেল খুলিতেন। মনে কর, তাঁহারা পড়িলেন—

"In that day shall the Lord of hosts be for a crown of glory, and for a diadem of beauty, unto the residue of his people."

Isiah, xxviii 5

তাহা হইলে বিবাহে ভাল ফল হইবারই কথা। যদি তাঁহারা পড়িলেন—

"For I know this, that many grievous wolves shall enter in among you, not sparing the flock."

Acts.xx 29

তাহা হইলে, প্রস্তাবিত বিবাহকে কল্যাণকর বলিয়া বিশ্বাস করা গেল না।

১৯শ। বুর জাতিরা অত্যন্ত বীর্য্যশালী এবং খুব স্বাধীনতাপ্রিয়, কিন্তু বিবাহের প্রস্তাব হইলে প্রাচীন কুসংস্কারকে অনেকে সহজে পরিত্যাগ করিতে সম্মত হয় না। বুর জাতির অনেকে এখনও গাছের পাতার রং, ফুলের গন্ধ, আকাশের নক্ষত্র, বোতলের রং, গির্জ্জার প্রথম

আগন্তুকের নামের অর্থ এবং জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব প্রভৃতি দেখিয়া বিবাহের ফলাফল নির্ণয় করিয়া থাকে।

২০শ। মাদ্রাজের পরেয়া জাতি, বিবাহের প্রস্তাব হইলে, রাত্রিতে জলপূর্ণ পাত্রে যব ভিজাইয়া রাখে। প্রভাতে তাহাতে পূর্ণাকারে অঙ্কুর দেখিলে আনন্দে উৎফুল্ল হয় এবং প্রস্তাবিত বিবাহকে সুফলদায়ক বলিয়া বিশ্বাস করে।

আর অধিক প্রমাণ বা দৃষ্টান্ত দিবার আবশ্যক নাই। আরও প্রমাণ তুলিলে প্রবন্ধ আরও কৌতুকাবহ হইতে পারে বটে, কিন্তু অধিকতর কৌতুকাবহ করিবার আকাঙ্ক্ষা নাই। গণনায় ভালমন্দ যাহাই হউক, আসল কথা এই যে, সভ্য জাতির ও শিক্ষিত সমাজের "বিবাহ" ক্রিয়াটা এতই গুরুতর প্রয়োজনীয় ব্যাপার যে খুব সাবধানতার সহিত ভালমন্দের বিশেষ বিচার না করিয়া বিবাহসমুদ্রে লম্ফ দেওয়া বড়ই বাতুলতার কর্ম্ম। পিতা, মাতা বা অভিভাবকেরা অন্যায় বিবাহের প্রশ্রয় দিলে, সকল শাস্ত্রমতে, মানবসমাজ ও পরমেশ্বরের নিকট ঘোরতর অপরাধী বলিয়া গণ্য হয়েন।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

প্রবাসে বঙ্গসাহিত্য-চর্চ্চা।

উত্তরপশ্চিম, অযোধ্যা এবং পঞ্জাবপ্রবাসী বাঙ্গালীগণের মধ্যে যাঁহারা প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের তালিকা সম্পূর্ণ করা একপ্রকার অসম্ভব। তবে যতদূর সাধ্য আমাদের শ্রম ও অনুসন্ধানের ত্রুটি হইবে না। বর্ত্তমান যশস্বিদিগের তালিকা নানাকারণে সঙ্কুচিত করিতে হইয়াছে। অপরপক্ষে কোন কোন প্রসিদ্ধ প্রবাসীর বহুঘটনাপূর্ণ গৌরবময় জীবনের অতিসংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। একত্রে সকল উপকরণগুলি সংগৃহীত হইলে প্রবন্ধে ক্রম এবং শৃঙ্খলা বজায় রাখিতে পারা যায়; কিন্তু এই প্রবাসী বাঙ্গালীর ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহকরণবিষয়ে যে কত বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হইতেছে তাহা যাঁহারা এইরূপ কার্য্যে ব্রতী আছেন তাঁহারাই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। প্রবন্ধমধ্যে যাঁহাদিগের নাম ইতিপূর্ব্বে অতিসংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে, তাঁহাদের অনেকের শিক্ষাপ্রদ গৌরবময় জীবনের বিশেষ বিবরণ পরে সংগৃহীত হওয়ায় যথাস্থানে সন্নিবেশিত হইতে পারে নাই। সেই সকল কৌতূহলপ্রদ বৃত্তান্ত ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা রহিল। এই সকল কারণে এই শ্রেণীর প্রবন্ধে সামঞ্জস্য, শৃঙ্খলা ও বিষয়সমাবেশের ব্যতিক্রম অনিবার্য্য এবং পাঠকগণেরও ধৈর্য্যচ্যুতির বিলক্ষণ সম্ভাবনা। সুতরাং অনুসন্ধিৎসু লেখকের অপেক্ষা কৌতূহলী পাঠকের ধৈর্য্য একান্ত প্রার্থনীয়।

বর্ত্তমান প্রবন্ধে উত্তরপশ্চিম এবং পঞ্চনদ প্রবাসী বাঙ্গালীদিগের মধ্যে বঙ্গসাহিত্যচর্চ্চার সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এতদঞ্চলে বঙ্গ সাহিত্যের চর্চ্চা ছিল কিনা, আমরা তাহার প্রমাণ পাই নাই। তবে বৃন্দাবনবাসী ৺লালদাস * বাবাজী সার্দ্ধশতবৎসর পূর্ব্বে বৈষ্ণব ভক্তবৃন্দের জীবনী ভক্তমাল গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালা ভক্তমাল গ্রন্থ রচিত হইবার এক শতাব্দীরও পূর্ব্বে চৈতন্যচরিতামৃত বঙ্গভাষায় রচিত হইয়াছিল। বোধ হয় প্রবাসের উহাই প্রথম বাঙ্গালা গ্রন্থ। যখন জীবগোস্বামী বৃন্দাবনে অবস্থিতি করিয়াছিলেন, সেইসময়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবনপ্রবাসী হয়েন। এখানে ইনি রাধাকুণ্ড তীরে অবস্থিতি করিয়া বৃদ্ধবয়সে চৈতন্যচরিতামৃত সুললিত বাঙ্গালা পদ্যে রচনা করিয়াছিলেন। ১৫৭৩ শকে উহা সমাপ্ত হয়। কিন্তু জীবগোস্বামীকে দেখাইলে তিনি সেই অশেষযত্নলিখিত পাণ্ডুলিপিখানি যমুনার জলে নিক্ষেপ করেন। কথিত আছে জীবগোস্বামী পুস্তকের রচনাপরিপাট্য দর্শনে স্বীয় সংস্কৃত গ্রন্থের অনাদর হইবে ভাবিয়া এরূপ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণদাস তাহাতে মর্ম্মাহত হইয়া মথুরায় গমন করেন এবং তথায় বিষণ্ণ চিত্তে কালাতিপাত করিতে থাকেন; কিন্তু দৈবযোগে কিছু কাল পরে গ্রন্থখানি হস্তগত হওয়ায় পুনর্জ্জীবন লাভ করেন। চৈতন্যচরিতামৃতের পুনরুদ্ধারের কৌতুকজনক বিবরণ বিশ্বকোষে প্রদত্ত হইয়াছে। বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে, অর্থাৎ সিপাহী বিদ্রোহের কিছু পূর্ব্বে—যে প্রবাসী বাঙ্গালীদের মধ্যে মাতৃভাষার চর্চ্চা ছিল, তাহার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে। সিপাহীবিদ্রোহের পর যখন চতুর্দ্দিকে শান্তি স্থাপিত হয়, তখন প্রবাসিগণ জাতীয় সাহি

---

* কৃষ্ণদাস ইঁহার কল্পিত নাম।

ত্যের আলোচনা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এতদঞ্চলের যে যে স্থানে অধিক সংখ্যক বাঙ্গালীর বাস হইয়াছিল, সেই স্থানেই দেশীয় প্রথা অনুসারে বাঙ্গালী গুরুমহাশয় কোন নির্দ্দিষ্ট বাঙ্গালীর বাটীতে পাঠশালা খুলিয়াছিলেন। এইরূপ পাঠশালা কাশী, গাজীপুর, এলাহাবাদ, কানপুর, আগ্রা, মিরাট, লক্ষ্ণৌ, লাহোর, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে ছিল। গুরুমহাশয়ের নিকট যাঁহারা পড়িয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকের মুখে প্রবাসের পাঠশালার কথা এখনও শুনা যায়। শিক্ষা-বিভাগের প্রাথমিক শিক্ষার ভিন্ন বন্দোবস্ত হওয়ায় দেশীয় পাঠশালাগুলি যেমন হ্রাস প্রাপ্ত হইল, প্রবাসী পাঠশালাগুলি তেমনি উঠিয়া গেল। অনন্তর পাঠশালার পরিবর্ত্তে স্থানে স্থানে ইংরাজী-বাঙ্গলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইল। বারাণসী যেমন বাঙ্গালীর প্রথম প্রবাস, বঙ্গসাহিত্যের চর্চ্চারও তেমনি এখানে সূত্রপাত। পাঠশালা, বঙ্গবিদ্যালয়, পুস্তকাগার, বাঙ্গালা সংবাদ-পত্র, বাঙ্গালা গ্রন্থ প্রভৃতি সমস্তই কাশীতে সিপাহীযুদ্ধের বহু পূর্ব্বে প্রথমে প্রবর্ত্তিত হয়। বাঙ্গালীর প্রতিষ্ঠিত প্রাচীন চতুষ্পাঠীগুলির বিবরণ ইতিপূর্ব্বেই প্রদত্ত হইয়াছে। তাহার একটিতেও বঙ্গসাহিত্যের নামমাত্র ছিল না। স্বর্গীয় জয়নারায়ণ ঘোষাল একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করেন; তাহাতে ইংরাজী, পারস্য, হিন্দী এবং বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত ছিল। এই বিদ্যালয়ের জন্য কিছু জমীদারীর উপস্বত্ব এবং বিশ সহস্র মুদ্রা প্রদত্ত হইয়াছিল। এই জয়নারায়ণ বিদ্যালয়ের পরিচালনার ভার কলিকাতা মিশনরী সোসাইটির রেভরেণ্ড ডি কর্রির হস্তে ন্যস্ত হয়। বারাণসীর এই ঘোষাল মহাশয়ের নাম স্বদেশীয়গণের মধ্যে অতি অল্প লোকেই জানেন, কিন্তু সাহিত্যসেবী ইংরাজগণের নিকট তিনি তাঁহার মহৎ কীর্ত্তির জন্য বিলক্ষণ পরিচিত। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইবার বহু কাল পরে "বাঙ্গালীটোলা প্রেপারেটরি স্কুল" খুলা হয়। এখানে পূর্ব্বে বাঙ্গালা ভাষা অধীত হইত, কিন্তু গভর্ণমেণ্টের সাহায্য প্রাপ্তির পর হইতে সে পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে। সম্প্রতি বারাণসীতে বাঙ্গালী বালকগণের মাতৃভাষা শিক্ষা দিবার সুবন্দোবস্ত করা হইয়াছে। অসমর্থ দরিদ্র বালকগণের জন্য "অনাথ পাঠালয়" নামে একটী বাঙ্গালা পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে। এই পাঠশালায় দরিদ্র বালকগণ বিনাবেতনে শিক্ষা প্রাপ্ত হইতেছে। এতদ্ব্যতীত এখানে "Anglo-Bengali Middle School" নাম দিয়া নূতন একটী ইংরাজী-বাঙ্গালা মাধ্যমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গভর্ণমেণ্ট অথবা তৎসংশ্লিষ্ট ইংরাজী বিদ্যালয়ে যে সকল বালকের বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষার পথ বন্ধ হইয়াছে, এখানে তাহাদিগকে ইংরাজীর সঙ্গে সঙ্গে উত্তমরূপে বাঙ্গালা ভাষা শিক্ষা দেওয়া হইতেছে। এই উদ্যম অতীব প্রশংসনীয়। এতদ্দ্বারা প্রতিষ্ঠাতাগণ বাঙ্গালীসাধারণের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন সন্দেহ নাই। কাশী ও এলাহাবাদ ব্যতীত উত্তর-পশ্চিমের অন্য কোন স্থানে বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত নাই। এতদঞ্চলের বড় বড় সহরের স্থানীয় বঙ্গসন্তানগণ বারাণসীর "অনাথ পাঠালয়" ও "মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের" প্রতিষ্ঠাতাগণের প্রদর্শিত পথানুবর্ত্তী হইলে সমূহ মঙ্গল সাধিত হইতে পারে।

আগ্রা-বঙ্গসাহিত্যসমিতি যে প্রণালী অবলম্বনে বালক বালিকাদিগকে বাঙ্গালা শিক্ষা দিতেছেন, তাহা প্রবাসের সর্ব্বত্রই অনুকরণীয়। এই সাহিত্যসমিতির বিবরণ আমরা "প্রবাসী" ১ম ভাগ, ৪র্থ সংখ্যায় দিয়াছি। কাশী, এলাহাবাদ, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, গোরক্ষপুর, নাইনিতাল, রাওলপিণ্ডি, সিমলা প্রভৃতি স্থানের বঙ্গসাহিত্যসমাজ ও পুস্তকালয়-গুলিরও বিবরণ ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। সে সকলের পুনরুল্লেখ করিবার আবশ্যক নাই। এক্ষণে সাহিত্যচর্চ্চার সর্ব্বপ্রধান যন্ত্রস্বরূপ মুদ্রাযন্ত্র এবং প্রবাসী লেখকগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইবে। এ প্রদেশে বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র বহুকাল পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছে এবং সংস্কৃত ও হিন্দীর সহিত বাঙ্গালা মুদ্রাঙ্কণ কার্য্যও চলিতেছে। ইহার অভাব অযোধ্যা ও পঞ্চনদ প্রদেশে এখনও সম্পূর্ণরূপে বর্ত্তমান। বারাণসীতে যে সকল বাঙ্গালা যন্ত্রালয় আছে, তাহার পূর্ব্বে কোন্ কোন্ মুদ্রাযন্ত্র ছিল, আমরা তাহা অবগত হই নাই, কিন্তু শুনা যায় বাবু গোবিন্দচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত বিলুপ্ত কাশীবার্ত্তাপ্রকাশিকা * যখন কাশীধাম হইতে প্রচারিত হইত, তখন বাঙ্গালা যন্ত্রালয় ছিল। কাশীবার্ত্তাপ্রকাশিকা বোধ হয় সাময়িক পত্রিকা, কারণ এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত "প্রয়াগদূত"এর পূর্ব্বে এতদঞ্চলে একখানিও বাঙ্গালা সংবাদপত্র ছিলনা।

* আমরা এই পত্রিকা দেখি নাই।

প্রয়াগদূত প্রতিমাসের ১লা ও ১৬ই তারিখে প্রয়াগদূত যন্ত্রে মুদ্রিত হইয়া এলাহাবাদ মৌসিমগঞ্জ হইতে প্রকাশিত হইত। "উন্নতি এবং অপচয়" প্রণেতা ৺বিষ্ণুচন্দ্র মৈত্র মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺মধুসূদন মৈত্র মহাশয় এই পাক্ষিকপত্রের প্রবর্ত্তক। ১৭৯০ শকে অর্থাৎ ১৮৬৯ খৃঃ অব্দের ১লা বৈশাখে ইহার জন্ম হয়। এই সময় কোন প্রবাসী প্রয়াগদূতে লিখিয়াছিলেন,*"সম্পাদক মহাশয়! উ, প, প্রদেশে ক্রমশঃ বঙ্গবাসী কতকগুলি লোক আসিয়া অবস্থিতি করিতেছেন। কিন্তু বাঙ্গলা সংবাদপত্র এখানে একখানিও ছিল না; প্রয়াগদূত সম্প্রতি এই অভাব মোচন করিয়া উদিত হওয়াতে আমরা আনন্দিত হইয়াছি।" প্রয়াগদূতে বিলুপ্ত কাশীবার্ত্তাপ্রকাশিকার সম্পাদক মহাশয় যে পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাহইতেও জানা যায়, উত্তর-পশ্চিমে প্রয়াগদূতই + প্রথম বাঙ্গালা সংবাদ পত্র। এই সংবাদপত্র প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে এলাহাবাদের যে সকল অভাব ছিল, উপর্য্যুপরি আন্দোলনে তাহার দূরীভূত হয়, রাস্তাঘাট পরিস্কৃত হইয়া রাজধানীর আবর্জ্জনা দূর হয় এবং শিক্ষার উন্নতি ও বিস্তার হয়। এই পত্রিকার ভিতর দিয়া সাধারণের অভাবঅভিযোগ গভর্ণমেণ্টের গোচরে আইসে এবং সকল সম্প্রদায়ের অশেষ কল্যাণ সাধিত হয়। দুঃখের বিষয় কাগজখানি অল্পদিনেই উঠিয়া যায়। ঐ পত্রে অনেকগুলি প্রবাসী বাঙ্গালীর প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হইত। তাঁহাদের মধ্যে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রী দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় নানাবিধ উপাদেয় পদ্য ও গদ্য প্রবন্ধ লিখিতেন। আজিও বৃদ্ধ বয়সে বঙ্গসাহিত্যসেবায় তাঁহার উৎসাহ এবং অধ্যবসায় সকলের অনুকরণীয়। প্রয়াগদূত প্রচারকালে ইনি ইটাওয়া প্রবাসী ছিলেন। প্রায় ৩০।৩২ বৎসর পূর্ব্বে ইনি ভারতবর্ষের দক্ষিণ অঞ্চলে অবস্থিতি করেন। তথায় দ্বাদশবৎসর কাল যাপন করিয়া কয়েকজন মহারাষ্ট্রীয় সাধুর জীবনবৃত্তান্ত সংগ্রহ করেন; এবং কাশীর ধর্ম্মপ্রচারক, ও বঙ্গের নব্যভারতে তৎসম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদি ক্রমে ক্রমে প্রকাশ করেন। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় কমলকলিকা কাব্য, একতাব্রতকাব্য, বিবিধ দর্শন কাব্য, তুকারামের জীবনচরিত, হিন্দুধর্ম্মের আন্দোলন ও সংস্কার প্রভৃতি পুস্তক লিখিয়াছেন। এই সকল গ্রন্থব্যতীত Memoir of Raja Rammohan Ray, ও Hindu Religion নামে দুইখানি ইংরাজী পুস্তকও প্রণয়ন করিয়াছেন। তাঁহার পুস্তকগুলি আর্য্যপ্রতিভা, তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা, পাক্ষিকসমালোচক, নব্যভারত, ইণ্ডিয়ন্‌মিরার প্রভৃতি অনেক সাময়িক ও সংবাদপত্রে প্রশংসিত হইয়াছে। পুস্তক রচনা এবং প্রবন্ধ লেখা ব্যতীত ইনি ইংরাজী ও বাঙ্গালায় অনেকগুলি সারগর্ভ বক্তৃতা করিয়াছেন। উহাদিগের মধ্যে কতকগুলি স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে এবং দেশীয় ও বিলাতের কোন কোন ইংরাজী সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হয়। ইনি অফিসের কর্ম্ম করিয়াও অনেকগুলি সাহিত্যসভায় যোগদান করিতেন এবং প্রায় ১৭।১৮ খানি বাঙ্গালা ও ইংরাজী সংবাদ ও সাময়িক পত্রে প্রবন্ধ লিখিতেন। ইহাঁর সমসাময়িক ইটাওয়া, পরে এলাহাবাদ এবং শেষে কাণপুর প্রবাসী ৺মহেন্দ্রনাথ ঘোষাল প্রয়াগদূত, কাশী ধর্ম্মপ্রচারক প্রভৃতি সাময়িক পত্রে লিখিতেন। ইনি কয়েকখানি বাঙ্গালা পুস্তক ও প্রণয়ন করিয়াছিলেন। ইহাঁদের বহুপূর্ব্বে বাবু কাশীদাস মিত্র মুস্তোফী এ প্রদেশে প্রবাসী হন। ইনি সুখরিয়া নিবাসী ৺দেওয়ান গোবিন্দচন্দ্র মিত্রের পৌত্র। ইহাঁদের অধিবাস নবদ্বীপাধিপতির অধিকারভুক্ত উলা, আধুনিক বীরনগরে। ইহাঁর উর্দ্ধতন ষষ্ঠ পুরুষ ৺রামেশ্বর মিত্র ঢাকায় নবাবের নিকট সম্মানিত হইয়া মুস্তোফী পদবী প্রাপ্ত হন। কাশীদাস মিত্র মহাশয় বহুদিন এলাহাবাদে কর্ম্ম করিয়া অবশেষে কাশীতে স্থায়ী বাস স্থাপন করেন। ইনি পারস্য ভাষায় অসাধারণ অধিকার লাভ করেন এবং ইহাঁর সমসাময়িক দুই একজন সম্ভ্রান্ত প্রাচীন ব্যক্তির নিকট শুনা যায়, ইনি বাঙ্গালা অপেক্ষা পারস্য ভাষায় অধিক দক্ষ ছিলেন। পরে কাশীবাসী হইয়া সংস্কৃত ও বাঙ্গালা-ভাষানুরাগী হন। ইহাঁর প্রণীত অঞ্জন-শলাকা, আত্মানুভূতি, কাশিকা, শক্তিতত্ত্বসার, গুপ্তলীলা, প্রয়াগমাহাত্ম্য, বিবেকরত্নাবলী, বিচারদীপিকা, জ্ঞানরসায়ন, তত্ত্বপ্রকাশ, বিচারতরঙ্গিনী, প্রেমানন্দলহরী, সজ্জনরঞ্জন এবং শঙ্কর-বিজয়-জয়ন্তী প্রবাসী বাঙ্গালীর বঙ্গসাহিত্যচর্চ্চার নিদর্শন। শঙ্কর-বিজয়জয়ন্তী গ্রন্থকারের শেষ গ্রন্থ। উহা ১৮৬৯ সালে কাশী সোণারপুরার বাটীতে লিখিত হইয়া এলাহাবাদ প্রয়াগদূত'যন্ত্রে ১৮৭১ সালে মুদ্রিত হয়।

* পত্রখানি প্রথম বৎসরের প্রয়াগদূতের ৯৪ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হয়।
ইহার বার্ষিক মূল্য পাঁচ টাকা ছিল।

প্রয়াগদূত যন্ত্রালয় স্থাপিত হইবার ১০ বৎসর পরে বারাণসীতে "অমরযন্ত্রালয়" প্রতিষ্ঠিত হয়। এই যন্ত্র হইতে শ্রীযুক্ত শিবপ্রসন্ন মৈত্রেয় বিদ্যাভূষণ প্রণীত কাশীদর্শন, কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত চিত্তবিকাশ, ত্রৈলঙ্গস্বামীর জীবন চরিত, শ্রীযুক্ত নিবারণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক অনুবাদিত কাশীখণ্ড, কাশীমাহাত্ম্য এবং যোগোপদেশ প্রভৃতি গ্রন্থ মুদ্রিত হয়। পরে ১৩০২ সালের ভাদ্র হইতে শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক আনন্দকানন নামক ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মাসিক পত্র প্রচারিত হয়, কিন্তু সাধারণের সহানুভূতি অভাবে তিন বৎসর পরে উঠিয়া যায়। অতঃপর ১৮৮০ খৃঃ অব্দে কাশীতে ধর্ম্মামৃতযন্ত্রালয় স্থাপিত হয়। এই যন্ত্রালয় আজ ২১ বৎসর ধরিয়া ক্রমাগত বঙ্গসাহিত্যের কলেবর পুষ্ট করিয়া আসিতেছে। ইহা হইতে "ধর্ম্মপ্রচারক" নামে একখানি মাসিকপত্র পরমহংস পরিব্রাজক ৺ কৃষ্ণানন্দ স্বামীর সম্পাদকতায় ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভা কর্ত্তৃক কাশী ধর্ম্মনিকেতন হইতে প্রকাশিত হয়। যন্ত্রালয় প্রতিষ্ঠার বৎসর হইতেই ইহা প্রকাশিত হইতেছে। ধর্ম্মামৃত যন্ত্রালয় হইতে যে রাশি রাশি বাঙ্গালা গ্রন্থ মুদ্রিত হইয়াছে, তন্মধ্যে "গীতার্থ-সন্দীপনী" সর্ব্ব প্রধান এবং বহুজনপ্রশংসিত। সাহিত্যগুরু বঙ্কিমবাবু গীতার্থ-সন্দীপনী পাঠ করিয়া বলিয়াছেন যে "ইহার ভাব ও রচনা চির-দিন বাঙ্গালা ভাষার অপূর্ব্ব রত্নস্বরূপ বিরাজিত থাকিবে।" কৃষ্ণানন্দ স্বামী প্রণীত "সঙ্গীতমঞ্জরী", "প্রবোধ-কৌমুদী", "ভক্তি ও ভক্ত" "শ্রীকৃষ্ণপুষ্পাঞ্জলি", "পঞ্চামৃত", "রামগীতা", "শ্রাদ্ধতত্ত্ব" "স্বপ্নতত্ত্ব", "নীতিরত্নমালা", "শ্রীকৃষ্ণরত্নাবলী", "হরের্ণামৈব কেবলম্", "পরিব্রাজকের সঙ্গীত", "পরিব্রাজকের বক্তৃতা" প্রভৃতি ধর্ম্মপুস্তকগুলি প্রবাসী বঙ্গসাহিত্যভাণ্ডারের যত্নের সামগ্রী। ধর্ম্মপ্রচারকের উপস্বত্ব কাশী বেদবিদ্যালয়ের সেবায় নিয়োজিত হইয়া থাকে। এই পত্রিকার জন্ম হইবার পর বৎসর অর্থাৎ ১৮৮১ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদ হইতে বাবু গোবিন্দচন্দ্র মিত্রের তত্ত্বাবধানে "সাহস" নামে একখানি সংবাদপত্রের সৃষ্টি হয় এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে জনষ্টনগঞ্জ পল্লীতে "সাহস যন্ত্রালয়"ও প্রতিষ্ঠিত হয়। বাবু শশিভূষণ মুখোপাধ্যায় ইহার প্রথম সম্পাদক ছিলেন। "সাহস" স্থায়ী হইল না; দুই তিন বৎসর মধ্যেই যন্ত্রালয় সহ লুপ্ত হইল। অনেক অনুসন্ধানেও একখণ্ড "সাহস" কোথাও পাওয়া গেল না। গোবিন্দ বাবু এবং স্থানীয় "ফেয়ারম্যান কোম্পানীর" স্থাপয়িতা ৺ শ্যামাচরণ মিত্র বহু যত্নেও এই কাগজ খানি রক্ষা করিতে পারিলেন না। উত্তর-পশ্চিমে বাঙ্গালীর সংখ্যা তখনও ২৩ সহস্রের উপর। রাজধানীতে ধনীর সংখ্যাও তখন অল্প ছিল না। কিন্তু একমাত্র অর্থসাহায্যের অভাবে কাগজখানি উঠিয়া গেল। মুঠিগঞ্জনিবাসী ৺ আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কেবল কয়েক মাসের জন্য ইহার যাবতীয় ব্যয়ভার স্বয়ং বহন করিয়া সাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছিলেন। ভূপ্রদক্ষিণপ্রণেতা প্রসিদ্ধ পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত চন্দ্রশেখর সেন মহাশয় কিছু দিন "সাহসের" সম্পাদকতা করিয়াছিলেন। সাহস পরে ইংরাজী সংবাদপত্রে পরিণত হইয়া "Indian Union" নাম গ্রহণ করিল। সাহস যন্ত্রালয় হইতে যে সকল বাঙ্গালা পুস্তক প্রকাশিত হয় তন্মধ্যে বাবু নবীনকিশোর মিত্র প্রণীত "সৌহার্দ্দকুসুমাসব" আমাদিগের হস্তগত হইয়াছে।

সাহস যন্ত্রালয় স্থাপনার পর কাশীতে "প্রভাকর" যন্ত্রালয় স্থাপিত হয়, এবং ১৮৯৬ সালে অর্থাৎ কাশীর "যজ্ঞেশ্বর প্রেস" প্রতিষ্ঠার বৎসরে উঠিয়া যায়। ইহার পর বারাণসী "তারা প্রিন্টিং ওয়ার্ক্‌স" এবং "ভারতজীবন" যন্ত্রালয়ের নাম করা যাইতে পারে, কারণ শীঘ্রই এখানে বাঙ্গালা মুদ্রাঙ্কণ কার্য্য আরম্ভ হইবে শুনা যাইতেছে। প্রভাকর প্রেস হইতে উল্লেখযোগ্য বাঙ্গালা গ্রন্থ অল্পই বাহির হইয়াছে। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত হারানচন্দ্র তপস্বী প্রণীত "সঙ্গীত সুধাকরের" নাম করা যাইতে পারে। বারাণসীপ্রবাসী লেখক এবং তাঁহাদের প্রণীত গ্রন্থের মধ্যে পণ্ডিত রাজেন্দ্রনারায়ণ শাস্ত্ররত্ন প্রণীত "ন্যায়মুকুল", বাবু অবিনাশচন্দ্র সরকার প্রণীত "রামলীলা", বাবু রাজেন্দ্রমোহন বসু প্রণীত "কাশ্মীর-কুসুম", ; পণ্ডিত হরকুমার ভট্টাচার্য্য প্রণীত "শঙ্করাচার্য্য" ও "নূরজাহান" এবং বাবু গোবিন্দচন্দ্র বসু প্রণীত "কবিতা-কলাপ" উল্লেখযোগ্য। ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিপিনবিহারী চট্টোপাধ্যায় "অপেরা" ও "আনন্দকানন" নামে দুইখানি দৃশ্যকাব্য লিখিয়াছেন। এই দুইখানি এক্ষণে যন্ত্রস্থ। কবিতাকলাপ কাশীতে লিখিত এবং এলাহাবাদ ইণ্ডিয়ান প্রেসে মুদ্রিত হয়। নব্যভারত প্রভৃতি মাসিকপত্রের লেখক এবং উন্নতি ও অপচয় প্রণেতা শ্রদ্ধাস্পদ ৺বিষ্ণুচন্দ্র

মৈত্র ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ৺ মধুসূদন মৈত্র মহাশয়ই এলাহাবাদে বঙ্গসাহিত্যচর্চ্চার প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন এবং প্রকৃতপক্ষে তাঁহাদিগের দ্বারাই এখানে মাতৃভাষানুশীলনের সূত্রপাত হইয়াছিল। প্রয়াগ বঙ্গসাহিত্যমন্দিরের সম্পাদক কবিরাজ শ্রীযুক্ত নীলমাধব সেনগুপ্ত মহাশয় প্রবাসী বঙ্গসাহিত্যসেবিগণের মধ্যে অন্যতম। ইনি প্রয়াগপ্রবাসী হইবার পূর্ব্বে কিছুকাল বিষ্ণুপুর রাজার এষ্টেটের ম্যানেজার এবং রাজচিকিৎসক ছিলেন। "ঠানদিদির কবিরাজী" নামে ইনি সরল বাঙ্গালায় একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত কোন কোন সংবাদ ও সাময়িক পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিয়া থাকেন। দেরাডুন-প্রবাসী শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ মুখোপাধ্যায়, এম. এ, "বুয়ার যুদ্ধের ইতিহাস" লিখিয়াছেন এবং শ্রীযুক্ত ঈশানচন্দ্র দেব প্রভৃতি স্থানীয় মাতৃভাষানুরাগী কয়েকজন প্রবাসী বঙ্গসাহিত্যসমিতি করিয়া ও মাতৃভাষায় প্রবন্ধাদি লিখিয়া জাতীয় সাহিত্যানুরাগের পরিচয় দিতেছেন। ইহাঁদিগের মধ্যে ইম্পীরিয়াল ফরেষ্ট স্কুলের শিক্ষক রায়বাহাদুর উপেন্দ্রনাথ কাঞ্জিলালের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বেরেলীপ্রবাসী শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি ঘোষ বহুকাল হইতে বঙ্গসাহিত্যসেবা করিতেছেন। এতদঞ্চলের স্থানে স্থানে বঙ্গসাহিত্যসেবী অনেকেই অবস্থান করিতেছেন এবং বহুদিবস বাস করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু সকলের সন্ধান এখনও আমরা প্রাপ্ত হই নাই। তাঁহাদের মধ্যে হয়ত অনেকের রচনা বঙ্গের ঘরে ঘরে আদৃত হইতেছে, অথচ গ্রন্থকারসম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গ আমরা অনেকেই অবগত নহি! দৃষ্টান্তস্বরূপ আগ্রাপ্রবাসী বাবু গোবিন্দচন্দ্র রায়ের নাম করা যাইতে পারে। তাঁহার অমর লেখনী নিঃসৃত যমুনালহরী, জাতীয়সঙ্গীত এবং গীতিকবিতা (৪ খণ্ড) প্রবাসী বাঙ্গালীর কীর্ত্তি এবং বঙ্গভাষার গৌরব ঘোষণা করিতেছে। তাঁহার রচিত অন্ততঃ দুই একটি সঙ্গীতও গান করেন নাই অথবা শ্রবণ করেন নাই, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে অদ্যাবধি এমন কোন শিক্ষিত বাঙ্গালী আছেন কিনা জানি না। এই প্রবাসী কবি প্রথমে কাশীপ্রবাসী হন। এখানে বিষয়কর্ম্ম করিবার সঙ্গে সঙ্গে কিছু কিছু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা শিক্ষা করেন। তাঁহার সমসাময়িক বাবু লোকনাথ মৈত্র প্রথমে সব-ওভারসিয়ার ছিলেন, পরে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করেন। সেই সময়ে, প্রায় ৩০।৪০ বৎসর পূর্ব্বে, আগ্রার তৎকালীন জজ জে, বি, আয়রণসাইড মহোদয়ের পত্নী কঠিন রোগে আক্রান্ত হন, এবং সকল চিকিৎসা ব্যর্থ হইলে অবশেষে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসার গুণে আরোগ্য লাভ করেন। সেই হইতে জজ সাহেবের উক্ত চিকিৎসাপ্রণালীর উপর আন্তরিক শ্রদ্ধা জন্মে। তিনি নিজব্যয়ে এবং পরে বড় বড় লোকদিগের সহানুভূতিক্রমে একটি চিকিৎসাসমিতি গঠন করেন এবং তাহাতে তিন জন বাঙ্গালী হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক (প্রত্যেককে ১০০৲ টাকা মাসিক বৃত্তি দিয়া) নিযুক্ত করেন। এই প্রবাসকবি গোবিন্দ বাবু সেই তিন জনের মধ্যে বিশেষ খ্যাতি প্রতিপত্তি লাভ করেন। সহৃদয় আয়রণসাইড সাহেবের জজীয়তির পর ঐতিহাসিক কীন সাহেব আগ্রায় জজ হইয়া কিছু দিন সাধারণের হিতকর দাতব্যচিকিৎসার বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। ক্রমে উহা উঠিয়া যায় এবং গোবিন্দ বাবু স্বাধীন চিকিৎসা ব্যবসায়ে বিলক্ষণ সুযশ লাভ করেন। পুস্তক প্রণয়ন ব্যতীত ইনি প্রথম প্রচারিত পল্লব, আলোচনা প্রভৃতি মাসিক পত্রে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। প্রবাসী নবীন লেখকের সংখ্যা ক্রমে বৃদ্ধি পাইতেছে; কিন্তু পুরাতন প্রবাসীদিগের মধ্যে যাঁহারা আজিও উৎসাহ ও অধ্যবসায়ের সহিত মাতৃভাষার সেবা করিতেছেন, তন্মধ্যে কবিবর শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ সেন, এম এ, এবং মাইনপুরীর সুযোগ্য উকীল শ্রীযুক্ত ননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য। অশোকগুচ্ছের কবি সাহিত্যজগতে সুপ্রতিষ্ঠিত; বিগত ৩৬।৩৭ বৎসরের মধ্যে ইহাঁর রাশি রাশি কবিতা বঙ্গের প্রধান প্রধান সাময়িক পত্রগুলিকে গৌরবান্বিত করিয়াছে। বাণীচরণে অর্পিত কাব্যকাননের সেই সুরভিকুসুমগুলি স্তবকে স্তবকে সজ্জিত হইয়া জননী মাতৃভাষার অপূর্ব শ্রীসম্পাদন করিতেছে। প্রবাসী কবির উর্ম্মিলাকাব্য, নির্ঝরিণী এবং ফুলবালা প্রভৃতি প্রথম প্রস্ফুটিত প্রবাসকুসুমগুলি বহুকাল হইল বঙ্গকাব্যকানন সুরভিত করিয়াছিল। আজি তাঁহার "অশোক গুচ্ছ" কি স্বদেশে কি প্রবাসে প্রত্যেক কাব্যরসগ্রাহীজনের হৃদয় মুগ্ধ করিতেছে। [ক্রমশঃ।

কলিকাতা পুরাদ্রব্যালয়।

সকলেই জানেন যে কলিকাতায় একটি প্রধান পুরাদ্রব্যালয় আছে। পূর্ব্বে ইহা এশিয়াটিক সোসাইটিভুক্ত ছিল। গবর্ণমেণ্ট তাহা সভাদিগের নিকট হইতে ক্রয় করিয়া লয়েন



বরাহ অবতার।

এবং এই প্রকাণ্ড হর্ম্ম্য নির্ম্মাণ করেন। তথায় প্রাচীন মূর্ত্তি সংগ্রহ করা হয়। তদ্ব্যতীত জীবতত্ত্ব ও ভূতত্ত্ব ইত্যাদি বিভাগ খোলা হয়। কিছু বৎসর পরে পূর্ব্বদিকে আর একটি অট্টালিকা নির্ম্মিত হয়; ইহাতে শিল্প ও কৃষিবিভাগ স্থাপিত হয়। শ্রীযুক্ত বাবু ত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় এই বিভাগের অধ্যক্ষ ছিলেন, এবং তিনি বিশেষ বিদ্যা ও নৈপুণ্যের সহিত সকল দ্রব্য সাজাইয়াছিলেন। এই কার্য্যে তাঁহার বিশেষ খ্যাতি আছে।

এশিয়াটিক সোসাইটীর সম্পর্কে যে পুরাতত্ত্ববিভাগ ছিল, তাহার অধ্যক্ষ রাজা—তখন বাবু—রাজেন্দ্রলাল মিত্র বাহাদুর ছিলেন। পুরাদ্রব্যাদির এক তালিকা তিনি প্রস্তুত করেন। পরে যখন উক্ত প্রতিমাদি নূতন মিউজিয়মে আনীত হয়, তখন দেশ বিদেশ হইতে আরও সামগ্রী সংগ্রহ করা হয়। তখন ডাক্তার এণ্ডার্সন প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি এক তালিকা তৈয়ার করেন। তাহা দুই খণ্ডে ছাপা হয় এবং এখনো ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। কিছু বৎসর পরে যখন সর্ চার্ল্‌স্ এলিয়ট সাহেব বঙ্গের ছোটলাট হয়েন, তখন তিনি বর্ত্তমান লেখককে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল হইতে আনাইয়া উক্ত পুরাতত্ত্ববিভাগের এক প্রকার অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন। লেখক বেহার ও উৎকল দেশাদি ভ্রমণ করিয়া অনেক প্রতিমা সংগ্রহ করেন এবং বেহার নামক ক্ষুদ্র নগরে পূর্ব্ব হইতে যে সকল বৌদ্ধ ও হিন্দুদের প্রতিমা সংগৃহীত ছিল, তাহাও কলিকাতাস্থ মিউজিয়মে আনয়ন করেন, এবং সমস্ত বারাণ্ডায় ও ভিতরের বড় ঘরে স্থাপিত করেন।

পুরাতত্ত্বাগার কতিপয় বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে। প্রথম অশোকগৃহ—যেখানে আনুমানিক মৌর্য্যরাজা অশোক রাজার সময়ের সামগ্রী সাজান আছে। তথায় ভারত নামক গ্রামের বৌদ্ধস্তূপের স্তম্ভাদি সাজান আছে, এবং পিপারোয়া নামক স্থানে আবিষ্কৃত কপিলবস্তুসম্বন্ধীয় বুদ্ধদেবের স্তূপ হইতে যে বৃহৎ প্রস্তর সিন্দুক ও তন্মধ্যস্থ যে পাঁচটি ভাঁড় পাওয়া গিয়াছে, তাহাও রাখা আছে। তাহাদের মধ্যে একটি অতি সুন্দর স্ফটিক পাথরে খোদা। আর একটিতে বুদ্ধের প্রায় সমসাময়িক লেখা আছে। উক্ত লেখার অর্থ এই যে উক্ত ভগবানের শাক্য-ভ্রাতা-ভগিনীরা তাঁহার ভস্মাবশেষ—"শরীরাণি"—এখানে রক্ষিত করিয়াছিলেন।

স্ফটিকভাণ্ডটির ঢাক্‌না মৎস্য-প্রমুখ—অতি নৈপুণ্যের সহিত খোদিত হইয়াছে। পৃথিবীতে ইহার দ্বিতীয় নাই। অশোক-ঘরে পাটলিপুত্রের প্রুপ্তস্থান—যাহা লেখক আবিষ্কার করিয়াছেন এবং যথা হইতে তিনি অনেক প্রাচীন চিহ্ন ভূগর্ভ হইতে বাহির করিয়াছেন, তাহারও কিছু কিছু প্রস্তর ও শালকাষ্ঠের সামগ্রী রক্ষিত আছে। প্রস্তর ও শালকাষ্ঠের জিনিসগুলি খুব কম আড়াই হাজার বৎসরের প্রাচীন হইবে।

পাট্‌না ও বাঁকীপুর ষ্টেশনের মধ্যে ও লৌহবর্ত্মের উত্তর ও দক্ষিণে অনেক স্থান লেখক খুঁড়িয়াছিলেন। তাঁহাকে

এসব দূরের কথা। অশোকাগারের পরে গান্ধারগৃহ। তথায় পঞ্জাবের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে যে সকল বৌদ্ধ প্রতিমা আদি পাওয়া গিয়াছে, তাহা রক্ষিত আছে। তাহার পশ্চিমে বড় দালান—তথায় বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণদের প্রতিমা আদি সাজান আছে। তাহার সংখ্যা সহস্রাধিক হইবে। তাহার পূর্ব্বে অপেক্ষাকৃত ছোট ঘর; তথায় লিখিত প্রস্তরাদি রাখা আছে। আরও দক্ষিণে পৃথক্ ঘরে প্রিয়দর্শী রাজার লিপির অনুকরণ রাখা আছে।

এতৎসম্বন্ধে তিনখানি ছবি প্রকাশ করা যাইতেছে।



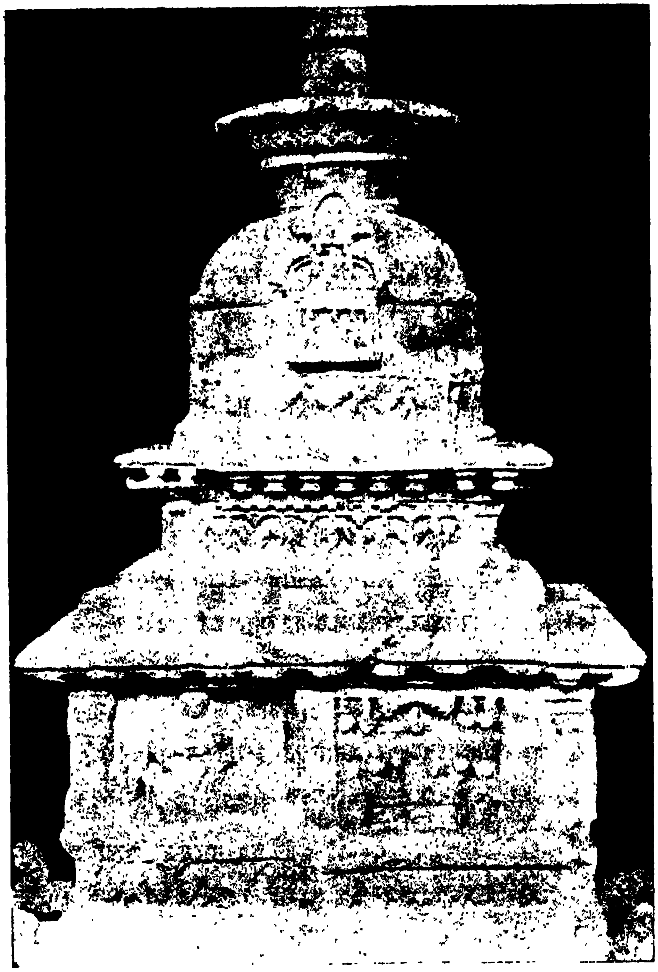
অমরাবতী স্তূপের ছুইটি দৃশ্য।

প্রায় ১৫ হস্ত নিম্নে ও ভূগর্ভে যাইতে হইয়াছিল। অনেক অনেক মৌর্য্যবংশীয় কীর্ত্তি-স্তম্ভ, প্রতিমা, ইষ্টক-নির্ম্মিত অট্টালিকা আদি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এতদ্-ব্যতীত শালকাষ্ঠের প্রাচীর ও নালাও পাওয়া গিয়াছিল। আজ তিন বৎসর হইল লেখক ঐ সকল খনন করিয়া বাহির করিয়াছিলেন। যে সময়ের উক্ত চিহ্ন পাওয়া গিয়াছিল, তখন শোণ নদী পাটনা ও বাঁকীপুরের দক্ষিণে বহিত। তাহারও বিশেষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।

প্রথমখানি নারায়ণের বরাহ অবতারের মূর্ত্তি; ইহা লেখক কর্ত্তৃক আনীত। পূর্ব্বে বেহারের নিকটবর্ত্তী আকসাঁড় গ্রামে পাওয়া গিয়াছিল। তথায় অনেক পুরাচিহ্ন আছে। বরাহদেব পৃথিবীকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। হিরণ্যাক্ষ অসুর পৃথিবীকে জলমগ্ন করিয়াছিল। বরাহের পদতলে উক্ত অসুর স্ত্রীর সহিত ভক্তভাবে খোদিত হইয়াছে এবং বাম হস্তের উপরে পৃথিবী দেবী উপবিষ্ট আছেন।

দ্বিতীয় ছবি গান্ধার দেশের একটি প্রস্তরনির্ম্মিত

স্তূপ দেখাইতেছে। তাহার পিঠে অর্থাৎ চৌকীর চতুকোণে সিংহ বা হস্তী খোদিত আছে। পিঠের উপর পাদ,



গান্ধারদেশের বৌদ্ধ স্তূপ।

পাদের গায়ে বুদ্ধদেবের জীবনীর দৃশ্যাদি অঙ্কিত হইয়াছে। তদুপরে আরো পিঠ ও পাদ নানা প্রকার কারুকার্য্যে সুসজ্জিত। তদুপরে স্তূপ—যাহার গাত্রে বুদ্ধদেব শিষ্যদিগকে উপদেশ দিতেছেন, এই দৃশ্য অঙ্কিত হইয়াছে। তদুপরে ছত্র ও চূড়া। প্রাচীন সময়ে হিন্দুদের মন্দিরের ন্যায় বৌদ্ধদেবের মন্দির, স্তূপ, সঙ্ঘারাম ও বিহার নানা অলঙ্কারে ও প্রতিমায় খোদিত হইত।

তৃতীয় ছবিখানি অমরাবতী স্তূপ হইতে আনীত। অমরাবতী মান্দ্রাজ প্রদেশের কৃষ্ণা নদীর নিকটবর্ত্তী। ইহাতে দুইটি দৃশ্য প্রস্তরে অঙ্কিত হইয়াছে। প্রথম দৃশ্য বুদ্ধদেবের কোন পূর্ব্বজন্ম দেখাইতেছে, যখন তিনি বোধিসত্ব ছিলেন—বুদ্ধ হন নাই। এখানে তিনি রাজসভায় বসিয়াছেন—প্রজারা বা সভাসদেরা মনোযোগী আছেন, এবং তিনি উপদেশ দিতেছেন। দ্বিতীয় দৃশ্যে কোন বরযাত্রীরা দলবলে চলিয়াছে—সঙ্গে বাজনা, সঙ্গীত ও নাচ; এবং এক কাঠের হাতী এক রথের মধ্যে কাহারেরা লইয়া যাইতেছে। সেকালের বেশভূষা আদি দেখিতে বড় চমৎকার। মধ্যে এক তোরণ দেখান হইয়াছে। রাজার সিংহাসনেও বিশেষ চারুকার্য্য ও নিপুণতা দেখা যাইতেছে।

পাটলিপুত্র।

"তৎ যথাসীন্মহীখণ্ডে আর্য্যাবর্ত্তে রসোত্তমে।
মগধভূপ্রদেশেঽত্র গঙ্গাতীরে পবিত্রিতে॥
নগরং পাটলিপুত্রং ভূকান্তাতিলকোত্তমং।
সুভিক্ষং কমলাবাসং সর্ব্বসম্পৎসমৃদ্ধিতম্॥
সাধুজন সমাকীর্ণং বিদ্বজ্জননিষেবিতং।
সর্ব্বদামঙ্গলোৎসাহ প্রবর্ত্তনাভিনন্দিতম্।
ঈতিভিরনতিক্রান্তং স্ফীতং ক্ষেমং শুভাশ্রয়ং।
সত্যধর্ম্মালয়ারামসুরম্যং স্বর্গসন্নিভম্॥"

অশোকাবদানম্।

মগধ সাম্রাজ্যের রাজধানী পাটলিপুত্রের নাম এক্ষণে জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে। তাহার সহিত ভারতবর্ষের নানা সুখ দুঃখের ইতিহাস জড়িত হইয়া, পাটলিপুত্রের পুরাতত্ত্ব সংকলনের জন্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতমণ্ডলীকে নিয়ত উৎসাহযুক্ত করিয়াছে। তাঁহারা পাটলিপুত্রের স্থাননির্দ্দেশের জন্য নানা তর্কবিতর্কের অবতারণা করিয়া, অবশেষে আধুনিক পাটনা নগরীকেই পুরাতন পাটলিপুত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। সম্প্রতি শ্রীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্নে তাহার ভূগর্ভনিহিত বিবিধ পুরাতন কীর্ত্তিচিহ্নও আবিষ্কৃত হইয়াছে।*

* A Report on the Excavation of the Ancient

মগধের পুরাতন নাম কীকট দেশ। তাহার রাজধানী রাজগৃহের ধ্বংসাবশেষ অদ্যাপি দেখিতে পাওয়া যায়। মগধাধিপতি জরাসন্ধ ভীমসেনের হস্তে নিহত হইবার কথা মহাভারতে উল্লিখিত আছে। বরাহমিহির ও কবি কহ্লণের মতে তাহা সার্দ্ধ চারি সহস্র বৎসরের কথা। জরাসন্ধের পুত্র সহদেব কুরুক্ষেত্র-সমরে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। পুরাণে তাঁহার সময় হইতেই মগধরাজবংশের নামাবলী লিখিত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণোক্ত বংশাবলীর সহিত অন্যান্য প্রমাণের কিছু কিছু অনৈক্য থাকিলেও; পৌরাণিক বংশকাহিনীর মধ্যে নানা ঐতিহাসিক তথ্য প্রচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে।

কোন্ সময়ে পুরাতন কীকট দেশের ক্ষুদ্র সীমা বিস্তীর্ণ হইয়া, প্রবলপরাক্রান্ত দিগন্তবিখ্যাত মগধসাম্রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল; পুরাণে তাহার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। খৃষ্টাবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভগবান্ সিদ্ধার্থ শাক্যসিংহ প্রাদুর্ভূত হইবার সময়ে মগধ যে সাম্রাজ্যরূপে পরিণত হয় নাই, তাহার যথেষ্ট পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তৎকালে (১) শ্রাবস্তীরাজ ব্রহ্মদত্তের পুত্র প্রসেনজিৎ, (২) মগধরাজ মহাপথের পুত্র বিম্বিসার, (৩) কৌশাম্বীরাজ শতানিকের পুত্র উদয়ন, এবং (৪) উজ্জয়িনীপতি অনন্তনেমির পুত্র প্রদ্যোত নামক ইতিহাসবিখ্যাত নরপতি-চতুষ্টয় ভূমিষ্ঠ হইবার কথা তিব্বতীয় বৌদ্ধ গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। * ললিতবিস্তর নামক বৌদ্ধগ্রন্থে এই সময়ে মিথিলা, হস্তিনাপুর, মথুরা, বৈশালী প্রভৃতি স্বস্বপ্রধান রাজধানী বর্ত্তমান থাকার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। † সুতরাং শাক্যাবির্ভাবকালে আর্য্যাবর্ত্ত কোনও মহারাজচক্রবর্ত্তীর করতলগত থাকা সিদ্ধান্ত করা যায় না। এই সময়ে রাজগৃহই যে মগধের রাজধানী বলিয়া পরিচিত ছিল, সমগ্র বৌদ্ধসাহিত্যে তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। সিদ্ধার্থ শাক্যসিংহ কিয়দ্দিবস মগধরাজধানী রাজগৃহের রাজপথে ভিক্ষা করিয়াছিলেন। তখনও পাটলিপুত্র মহা নগর বা রাজধানী বলিয়া পরিচিত হয় নাই। ‡

sites of Pataliputra in 1896-97——By Babu Purna Chandra Murkharji.

* Rockhill's Life of Buddha.

† ললিতবিস্তর।

‡ ততোহং কাল্যমেব সন্নিবাস্ত পাত্রচীবরমাদায় তপোদদ্বারেণ রাজগৃহং মহানগরং পিণ্ডায় প্রাবিক্ষং।—ললিতবিস্তরে ষোড়শাধ্যায়ঃ।

শাক্যসিংহ মহাপরিনির্ব্বাণ লাভের পূর্ব্বে একবার পাটলী নামক গ্রামে বিশ্রাম করিয়া, ভাগীরথী উত্তীর্ণ হইয়া, কুশীনগরাভিমুখে গমন করিবার কথা বৌদ্ধগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। * তৎকালে মগধের রাজধানী পূর্ব্ববৎ রাজগৃহেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। মগধেশ্বর অজাতশত্রু ভাগীরথীর বামতীরনিবাসী বৃজ্জিগণকে বশীভূত করিবার আশায় দক্ষিণতীরবর্ত্তী পাটলিগ্রামে একটি দুর্গনির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। যে সকল রাজকর্ম্মচারী এই দুর্গনির্ম্মাণ কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন, তন্মধ্যে বর্ষকার নামধেয় ব্রাহ্মণ শাক্যসিংহকে নিমন্ত্রণ করিবার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। শাক্যসিংহ তদুপলক্ষে সশিষ্যে পাটলিচৈত্য নামক গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন। পাটলিগ্রাম যে উত্তরকালে আর্য্যাবর্ত্তের রাজধানী হইবে, এই সময়ে শাক্যসিংহ তাহার ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করেন। তাঁহার নামানুসারে নবনগরের প্রধান তোরণদ্বার "গৌতমদ্বার," ও গঙ্গোত্তরণস্থান "গৌতমঘাট" নামে পরিচিত হইয়া, উত্তরকালে বৌদ্ধতীর্থ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিল। বৌদ্ধসাহিত্যে পাটলিগ্রাম, বর্ষকার-নির্ম্মিত দুর্গ ও পাটলিচৈত্যের বর্ণনা পাঠে বোধ হয়, অজাতশত্রু এই স্থানে সেনাসমাবেশ করিয়া, বৃজ্জিরাজ্য আক্রমণ করিবার আশায় একটি অচিরস্থায়ী সেনানিবাস নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন; ক্রমে তাহাই সমগ্র উত্তরভারতের রাজধানীরূপে পরিণত হয়।

পাটলিপুত্র একদা কুসুমপুর নামেও পরিচিত ছিল। মুদ্রারাক্ষসে কুসুমপুর ও পাটলিপুত্র উভয় নামই দেখিতে পাওয়া যায়। মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, কুসুমপুর নদীস্রোতে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইলে পাটলিপুত্রের অভ্যুদয় হয়। এই সিদ্ধান্ত সমর্থন করিবার উপযুক্ত কোন ঐতিহাসিক প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তবে মুখোপাধ্যায় মহাশয় আধুনিক পাটনা নগরীর নানা স্থান খনন করিয়া দেখিয়াছেন, ভূগর্ভের ১০ হইতে ২০ ফুট নিম্নে নানাস্তরে পুরাতন কীর্ত্তিচিহ্ন প্রোথিত হইয়া রহিয়াছে। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে, অজাতশত্রুর সেনানিবাস আধুনিক পাটনার কেল্লার অভ্যন্তরে ভূগর্ভে নিহিত আছে। শাক্যসিংহের মহাপরিনির্ব্বাণের তিন বৎসর পরে, অজাতশত্রু এই সেনানিবাস হইতে বিজয়যাত্রা করিয়া, বিদেহরাজ্য জয়

* Bigaudet's Gaudama

করিয়াছিলেন। কিন্তু তখনও মগধের রাজধানী রাজগৃহেই প্রতিষ্ঠিত ছিল। মহাকাশ্যপের উদ্যোগে শাক্যসিংহের তিরোভাবের পর যে প্রথম ভিক্ষু-সমিতির অধিবেশন হইয়াছিল, তাহা রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী ন্যগ্রোধগুহা নামক নির্জ্জন প্রদেশে সম্মিলিত হইবার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। এই অধিবেশনস্থান স্থির করিবার জন্য প্রথমে কুশীনগর ও পরে বোধিদ্রুমের কথা আলোচিত হইয়াছিল। অবশেষে কাশ্যপের প্রস্তাবে ভিক্ষুগণ রাজগৃহেই সম্মিলিত হন। কাশ্যপ বলেন, অজাতশত্রুর নিকট উপনীত হইলে, তিনি সভার ব্যয়ভার বহন করিতে কাতর হইবেন না। তদনুসারে ভিক্ষুগণ অজাতশত্রুর নিকট রাজগৃহের রাজধানীতে উপনীত হইয়াছিলেন। অজাতশত্রু পাটলিপুত্রের প্রতিষ্ঠাতা হইলেও, তাঁহার পুত্র উদয়েশ্বরের শাসনসময় হইতেই পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থানান্তরিত হইবার প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায়। মুখোপাধ্যায় মহাশয় বলেন, খৃষ্টাবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী ৫১৯ অব্দে এই ঘটনা সংঘটিত হয়।

অতঃপর পাটলিপুত্রের প্রবল প্রতাপ দিগ্‌দিগন্তে ব্যাপ্ত হইয়া, বৌদ্ধধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান আশ্রয়স্থান বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল। তদুপলক্ষে নানাদেশের বৌদ্ধতীর্থযাত্রী পাটলিপুত্রে পদার্পণ করিয়াছিলেন। সংস্কৃত ও পালি সাহিত্যে পাটলিপুত্রের নাম নানা কারণে সুপরিচিত। নাগরিক সুখসৌভাগ্য, শোভা ও সৌন্দর্য্যে পাটলিপুত্র স্বর্গের ন্যায় প্রতিভাত হইত বলিয়া, যে কবিকাহিনীর সন্ধান পাওয়া যায়, ভ্রমণকারিগণের প্রত্যক্ষীকৃত শোভাসৌন্দর্য্যের বর্ণনা পাঠ করিয়া, তাহাকে অতিশয়োক্তি বলিয়া সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাখ্যান করা যায় না। তথাপি বিবিধ কিংবদন্তী ভিন্ন পাটলিপুত্রের ধারাবাহিক ইতিহাস সংকলনের জন্য অন্য কোন বিশ্বাস্য বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই সকল কিংবদন্তী বহুবিতর্কের আধার। মুখোপাধ্যায় মহাশয় তদবলম্বনে পাটলিপুত্রের ইতিহাস সংকলন করায়, তাঁহার বহুযত্নসংকলিত প্রবন্ধ সাধারণ পাঠকবর্গের পক্ষে সুখপাঠ্য হইতে পারে নাই। নানা তর্ক, নানা মত, নানা অনুমানের অবতারণা করিয়া, মুখোপাধ্যায় মহাশয় যেরূপ ইতিহাসজ্ঞানের পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, সেরূপ রচনাকৌশলের পরিচয় প্রদান করিতে পারেন নাই।

বৌদ্ধসাহিত্য প্রথমে সংস্কৃত ও গাথাকাব্যের প্রচলিত ভাষায় লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। ক্রমে বৌদ্ধধর্ম্ম ভারতবর্ষের বাহিরে প্রচারিত হইল। পালি, চীন, তিব্বত, ব্রহ্ম, শ্যাম প্রভৃতি বিভিন্ন ভাষায় গ্রন্থনিবদ্ধ হয়। দেশভেদে, ভাষাভেদে, বুঝিবার ও বুঝাইবার তারতম্যবশতঃ, বৌদ্ধসাহিত্যে প্রায় প্রত্যেক ঐতিহাসিক ব্যাপারের নানা বর্ণন৷ দেখিতে পাওয়া যায়। শাক্যসিংহের আবির্ভাব ও তিরোভাবকাল লইয়াও মতভেদের অভাব নাই। এরূপ অবস্থায়, কোন বিশেষ দেশের বা বিশেষভাষার গ্রন্থ অবলম্বন করিয়া, প্রকৃত তথ্য সংকলন করিবার সম্ভাবনা অল্প বলিয়াই বোধ হয়। যাঁহারা বৌদ্ধসাহিত্যের আলোচনায় পাণ্ডিত্যলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই সংস্কৃতভাষানিবদ্ধ পুরাণাদি পরিত্যাগ করিয়া, বিভিন্ন ভাষানিবদ্ধ বিদেশীয় বৌদ্ধগ্রন্থ অবলম্বন করিয়াই তথ্যনির্ণয়ের চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন। তজ্জন্য পুরাণবর্ণিত মগধ রাজবংশের বিবরণ সময়ে সময়ে সমালোচিত হইলেও, ইতিহাস বলিয়া পরিগণিত হয় নাই। পুরাণের মত এইরূপে একেবারে উপেক্ষা করা সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। উপযুক্ত সমালোচনা প্রবর্ত্তিত হইলে, পুরাণ হইতেও ঐতিহাসিক তথ্য সংকলিত হইতে পারিবে।

বিষ্ণুপুরাণের চতুর্থাংশে একবিংশ অধ্যায়ে কৌশাম্বীর অধিপতি শতানিকের পুত্র উদয়ন, তৎপুত্র অহীনর, তৎপুত্র খণ্ডপাণি, তৎপুত্র নিরমিত্র, ও তৎপুত্র ক্ষেমকের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ষেমকের পর কৌশাম্বীর রাজবংশ বিলুপ্ত হইবার কথা লিখিত রহিয়াছে। তিব্বতীয় বৌদ্ধগ্রন্থেও কৌশাম্বীরাজ শতানিকের পুত্র উদয়নের নাম উল্লিখিত আছে। তিনি শাক্যসিংহের সমসাময়িক নরপতি ছিলেন। উদয়নের পরবর্ত্তী চারিজন উত্তরাধিকারী সিংহাসন অধিকার করিবার পর এই রাজবংশ বিলুপ্ত হইবার যে বিবরণ বিষ্ণুপুরাণে প্রাপ্ত হওয়া যায় তদ্দ্বারা মগধের রাজ্যবিস্তারকালে কৌশাম্বীঅধিকার করিবার বৌদ্ধগ্রন্থোক্ত কিংবদন্তী সম্পূর্ণরূপে সমর্থিত হয়।

শাক্যসিংহের সময়ে বিম্বিসার মগধের সিংহাসনে আরূঢ় ছিলেন। শাক্যসিংহ তাঁহার সহিত বিলক্ষণ পরিচিত ছিলেন। বিম্বিসারের পুত্র অজাতশত্রুর শাসনসময়ে শাক্যসিংহের পরিনির্ব্বাণ ও মগধগুহার বৌদ্ধসমিতির প্রথম

অধিবেশনের কথা বৌদ্ধগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরাণের মতেও বিম্বিসারের পুত্রের নাম অজাতশত্রু।

কুরুক্ষেত্র-সমরে মগধেশ্বর সহদেব অস্ত্রধারণ করেন। তিনি পৌরাণিক মতে "বার্হদ্রথবংশীয়"। এইবংশে সহদেবপ্রমুখ একবিংশতি নরপতি সহস্র বৎসর রাজ্যভোগ করিবার কথা বিষ্ণুপুরাণে দেখিতে পাওয়া যায়। তাহার পর প্রদ্যোতবংশীয় পঞ্চনরপাল ১৩৮ বৎসর মগধরাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। তাহার পর শিশুনাগবংশের অভ্যুদয়। এইবংশের দশজন নরপতি ৩৬২ বৎসর মগধের শাসনদণ্ড পরিচালন করেন। গড়ে ইঁহাদের রাজ্যকাল ৩৬ বৎসর গণনা করিতে হয়। এই বংশের পঞ্চমভূপতির নাম বিম্বিসার। তাঁহার শাসনকাল প্রকৃতপক্ষে কত বৎসর, পুরাণে তাহার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এইস্থলে বৌদ্ধগ্রন্থ হইতে প্রমাণ গ্রহণ করা যাইতে পারে। বৌদ্ধমতে অজাতশত্রুর শাসন সময়ের পঞ্চম বৎসরে শাক্যসিংহ পরিনির্ব্বাণ লাভ করেন। তৎকালে তাঁহার বয়ঃক্রম ৮০ বৎসর হইয়াছিল। ২৯ বৎসর বয়সে শাক্যসিংহ গৃহত্যাগ করিয়া, মগধে আসিয়া, বিম্বিসারকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত দেখিয়াছিলেন। সুতরাং বৌদ্ধগ্রন্থানুসারে শাক্যসিংহের তপস্যা ও ধর্ম্মপ্রচারকালে, ৪৬ বৎসর পর্য্যন্ত বিম্বিসারই মগধরাজ্যের শাসনক্ষমতা পরিচালন করিতেন। তাঁহার পরবর্ত্তী পঞ্চভূপতি প্রত্যেকে গড়ে ৩৬ বৎসর রাজ্যশাসন করা অনুমান করিলে, শাক্যসিংহের তিরোভাবের ১৮০ বৎসর পরে, পুরাণোক্ত শিশুনাগবংশ বিলুপ্ত হওয়া স্বীকার করিতে হয়।

শিশুনাগবংশের তিরোধানের পর নন্দবংশীয় নবনরপাল একশতবৎসর রাজ্যশাসন করিবার পর ইতিহাসবিখ্যাত মৌর্য্যবংশীয় চন্দ্রগুপ্ত চাণক্যকৌশলে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই ঘটনা বিষ্ণুপুরাণের গণনা অনুসারে বিম্বিসারের স্বর্গারোহণের ২৮০ বৎসর পরে সংঘটিত হওয়া অনুমান করিতে হয়। বিম্বিসারের স্বর্গারোহণও শাক্যসিংহের নির্ব্বাণলাভ প্রায় সমসাময়িক ঘটনা, কেবল পাঁচ বৎসরের তারতম্য দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং বৌদ্ধগ্রন্থের সহিত পৌরাণিক মত মিলিত করিলে, শাক্যসিংহের নির্ব্বাণলাভের ২৭৫ বৎসর পরে চন্দ্রগুপ্তের সিংহাসনপ্রাপ্তি কল্পনা করিতে হয়। তাহা গ্রীক ইতিহাসলেখকগণের মতে শেকন্দর শাহার ভারতাক্রমণের সমসাময়িক ঘটনা। এই ঘটনা খৃষ্টাবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী ৩২১ বৎসরের সমকালবর্ত্তী। ইহার সহিত ২৭৫ বৎসর যোগ করিলে, খৃষ্টাবির্ভাবের পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৯৬ বৎসরের সমসময়ে শাক্যসিংহের পরিনির্ব্বাণ ও ৬৭৬ বৎসরের সমসময়ে জন্মকাল নির্ণয় করিতে হয়। এই গণনার সহিত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের লিখিত শাক্যাবির্ভাবকালের কোন গুরুতর অনৈক্য দেখিতে পাওয়া যায় না। সুতরাং পৌরাণিক মত একেবারে অবজ্ঞা করা শোভা পায় না।* কিন্তু পৌরাণিক মত আদ্যোপান্ত উদ্ধৃত না করিয়া, মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন, "পৌরাণিক মতানুসারে চন্দ্রগুপ্তের পিতা মহানন্দ বা মহানন্দীর নামই কালাশোক। তিনি শিশুনাগের পুত্র এবং দ্বিতীয় পরশুরাম বলিয়া পুরাণে পরিচিত। এই কালাশোক খৃষ্টাবির্ভাবের ৮৬৩ বৎসর পূর্ব্বে বৈশালী হইতে পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন। মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই প্রমাণ ও এই সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিয়া, চন্দ্রগুপ্তের আবির্ভাবের পূর্ব্বেই, অশোক ও উপগুপ্তের আবির্ভাব স্থির করিয়া, কতক শিলালিপি কালাশোকের ও কতক ধর্ম্মাশোকের বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং কপিলবস্তুর লুম্বিনীবননিহিত গুপ্তলিপি এই কালাশোকের গুপ্তলিপি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। এই সিদ্ধান্ত সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

প্রথমতঃ, বিষ্ণুপুরাণে শিশুনাগবংশের যে বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে শিশুনাগের পুত্র কাকবর্ণ বিম্বিসারের প্রপিতামহ বলিয়া উল্লিখিত; তাঁহার শাসনকালে শাক্যসিংহের আদৌ জন্ম হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ, বিষ্ণুপুরাণে যিনি দ্বিতীয় পরশুরাম বলিয়া কথিত, তাঁহার নাম মহাপদ্মানন্দ;

* শাক্যাবির্ভাবকাল নানা তর্কবিতর্কে আচ্ছন্ন। এখানে কেবল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মত ও বিষ্ণুপুরাণের মত অনুসারে গণনার কথাই লিখিত হইল। প্রকৃত প্রস্তাবে শাক্যাবির্ভাবের কাল অদ্যাপি নিঃসন্দেহে নির্ণীত হয় নাই। সুতরাং ইউরোপীয় পণ্ডিতগণেরগণনার উপর নির্ভর করিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মত উপেক্ষা করা যায় না। তবে তাঁহার মত যে একেবারে নূতন নহে, পুরাণ অবলম্বনে, তাহারই আভাস প্রদত্ত হইল। মগধরাজবংশের ইতিহাস অদ্যাপি ধারাবাহিক রূপে বর্ণনা করিবার উপায় আবিষ্কৃত হয় নাই। কত মহাত্মা কত কথা লিখিতেছেন, তাহার সহিত মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের কথাও সংযুক্ত হইয়া তর্কজাল অধিক জটিল করিবার আশঙ্কা নাই।

তিনি বিষ্ণুপুরাণের মতে বিম্বিসারের অতিবৃদ্ধ প্রপৌত্র এবং মহানন্দীর উচ্ছেদকারী নন্দবংশপ্রতিষ্ঠাতা প্রথম নন্দভূপতি বলিয়া উল্লিখিত। সুতরাং শিশুনাগের পুত্র ও মহাপদ্মানন্দকে বিষ্ণুপুরাণ অনুসারে এক ব্যক্তি বলা অসম্ভব। অথচ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই সিদ্ধান্তের অবতারণা করিয়া অশোক স্তম্ভলিপি দুইশ্রেণীতে বিভক্ত করিয়া, অভিনব তর্ক বিতর্কের অবতারণা করিয়াছেন। কপিলবস্তুর লুম্বিনীবনের স্তম্ভলিপিতে "দেবানাং পিয়েন পিয়দশিনা লাজিনা" ইত্যাদি ধর্মাশোকের সুপরিচিত পরিচয়বাক্য খোদিত রহিয়াছে। তাহা কালাশোকের পরিচয়বিজ্ঞাপক বলিয়া গ্রহণ করা অসম্ভব। মুখোপাধ্যায় মহাশয় শাক্যসিংহের একটি ভবিষ্যদ্বাণী অবলম্বন করিয়া এই তর্ক উপস্থিত করিয়াছেন। শাক্যসিংহের পরিনির্ব্বাণের একশত বৎসর পরে উপগুপ্ত ও তৎশিষ্য অশোকের আবির্ভাবের কথা বৌদ্ধসাহিত্যে উল্লিখিত দেখিতে পাওয়া যায়। এই ভবিষ্যদ্বাণীর "শতবর্ষ" কথাটি সত্য না হইতেও পারে। পুরাণ অনুসারে ইহা মিথ্যা বলিয়াই বোধ হয়। কারণ, বিম্বিসারের শতবর্ষ পরে, চন্দ্রগুপ্তের পিতা বর্ত্তমান থাকা কোন ক্রমেই সিদ্ধান্ত করা যায় না। পৌরাণিক গণনা অনুসারে, চন্দ্রগুপ্ত বিম্বিসারের স্বর্গারোহণের ২৮০ বৎসর পরে প্রাদুর্ভূত হওয়া স্বীকার করিতে হয়। ইহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই সকল তর্কের মীমাংসা করিয়া, স্বমত সমর্থন করিতে পারিলে ভাল হইত। তিনি যাহা লিখিয়াছেন, তাহাতে সন্দেহ দূর হয় না; বৌদ্ধ সাহিত্যের যে সকল সিদ্ধান্ত সুপরিচিত হইয়াছে, তাহাও জটিলাকার ধারণ করে।

এই সকল তর্ক বিতর্কের জঞ্জালজাল হইতে দূরে দাঁড়াইয়া, বৌদ্ধ সাহিত্যের অনুসরণ করিয়া, পাটলিপুত্রের ইতিহাস সংকলন করা একেবারে অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। পাটলিপুত্রের ইতিহাস এবং বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের ইতিহাস একসূত্রে গ্রথিত বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। সুতরাং বৌদ্ধধর্ম্মপ্রচারের ইতিহাস কি, তাহাই সংক্ষেপে আলোচনা করা আবশ্যক।

মগধাধিপতি বিম্বিসারের শাসনসময়ে, মগধান্তর্গত উরুবিল্বগ্রামের বোধিবৃক্ষমূলে ভগবান্ শাক্যসিংহের বুদ্ধত্বলাভ করার সময় হইতে বৌদ্ধমত প্রচারের সূত্রপাত হয়। ইহার প্রথম প্রচারক্ষেত্র বারাণসী। শাক্যসিংহ যখন উৎকট তপশ্চর্য্যায় ব্যাপৃত হইলেন, তৎকালে জ্ঞানকৌণ্ডিন্য, অশ্বজিৎ, বাষ্প, মহানাম এবং ভদ্রিক নামক পঞ্চশিষ্য তাঁহার সেবা করিতেন। ইহারা শাক্যসিংহকে প্রথমে আহারত্যাগী ও পরে সহসা আহারে আসক্ত দেখিয়া, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া, বারাণসী ধামে গমন করিয়াছিলেন। শাক্যসিংহ বুদ্ধত্বলাভ করিবার পর, বারাণসীতে উপনীত হইলে, এই পুরাতন পঞ্চশিষ্যই প্রথমে বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। শাক্যসিংহ ইহাদিগকে "পঞ্চভদ্রবর্গীয়" বলিয়া সম্বোধন করায়, সেই নামই বৌদ্ধসাহিত্যে প্রচলিত হইয়াছিল। ইহার পর বারাণসীর ধনাঢ্য যশোদেব ও তাঁহার বন্ধুচতুষ্টয়, ও ক্রমে আরও পঞ্চাশৎ শিষ্য মন্ত্র গ্রহণ করিবার কথা বৌদ্ধগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। শাক্যসিংহ বারাণসী ত্যাগ করিবার পূর্ব্বে তাঁহার শিষ্যসংখ্যা ইহার অধিক হয় নাই। ইহারাই দুই দুই জন করিয়া এক এক দিকে ধর্ম্মপ্রচারার্থ প্রেরিত হইয়াছিলেন।

বারাণসী হইতে শাক্যসিংহ পুনরায় মগধান্তর্গত উরুবিল্ব প্রদেশে উপনীত হইয়াছিলেন। তথায় ৬০ জন ভদ্রলোক, কপিলবস্তুনিবাসী দেব নামক ব্রাহ্মণ ও তদীয় ব্রাহ্মণী, নন্দা ও নন্দবালা নাম্নী মহিলা, বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রহণ করিবার পর, উরুবিল্বকাশ্যপ, নদীকাশ্যপ ও গয়াকাশ্যপ নামক তিন ভ্রাতা বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করেন। উরুবিল্ব হইতে শাক্যসিংহ গয়াশীর্ষে গমন করেন। তৎকালে তাঁহার শিষ্যসংখ্যা এক সহস্র হইয়াছিল। এই সময়ে মগধরাজ বিম্বিসার নিমন্ত্রণ করায়, শাক্যসিংহ মগধের রাজধানী রাজগৃহে উপনীত হইয়া রাজা ও বহুসংখ্যক মগধবাসীকে নবধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। ইহার ফলস্বরূপ শাক্যসিংহ রাজা বিম্বিসারের নিকট বেণুবন নামক বিহার দান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহাই সর্ব্ব প্রথম বৌদ্ধ বিহার বলিয়া পরিচিত। শাক্যসিংহ এই বিহারে প্রথম বার্ষিক চতুর্মাস্যব্রত পালন করিয়াছিলেন। তৎকালে শারীপুত্র, মৌদ্‌গল্যায়ন ও কাত্যায়ন নামক শিষ্য ও অন্যান্য বহুলোকে বৌদ্ধধর্ম্ম গ্রহণ করিবার কথা শুনিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে শ্রাবস্তীনিবাসী সুদত্তের নাম বৌদ্ধসাহিত্যে বিশেষভাবে কীর্ত্তিত দেখিতে পাওয়া যায়। সুদত্ত কোশলান্তর্গত শ্রাবস্তী নগরের প্রসিদ্ধ ধনকুবের ছিলেন; তাঁহাকে লোকে "অনাথপিণ্ডদ" বলিত। তিনি প্রসেনজিৎ রাজার জ্যেষ্ঠপুত্রের জেতবন নামক উদ্যান বহু সুবর্ণমুদ্রা ব্যয়ে ক্রয় করিয়া, তথায় শাক্যসিংহের জন্য বিহার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তৎসূত্রে কোশলরাজ্যে বৌদ্ধ ধর্ম্ম জয়যুক্ত হইয়াছিল। প্রসেনজিৎ নবধর্ম্মে দীক্ষিত হইবার পর, শাক্যসিংহ কপিলবস্তু গমন করেন। তথায় কদলীবন নামক বিহার নির্ম্মিত হয়; এবং সমগ্র শাক্যকুল নবধর্ম্মের অনুরক্ত ভক্ত বলিয়া বৌদ্ধসমাজে পরিচিত হয়।

কপিলবস্তু হইতে শাক্যসিংহ বৈশালী গমন করেন। অতঃপর কৌশাম্বী নগরীও বৌদ্ধধর্ম্মের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। তাহার পর মগধরাজ বিম্বিসার স্বর্গারোহণ করায়, অজাতশত্রু মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার শাসনসময়ে, কোশলরাজ প্রসেনজিৎ পুত্রকর্ত্তৃক সিংহাসনচ্যুত হইয়া, ভিক্ষুবেশে মগধের রাজধানীতে উপনীত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। তখনও মগধের রাজধানী রাজগৃহেই অবস্থিত ছিল। প্রসেনজিতের পুত্র বিরূঢ়ক কপিলবস্তু

ধ্বংস করিয়াছিলেন। তাহার কিছুদিন পরে, শাক্যসিংহ পাটলিপুত্রে উপনীত হন। তৎকালে অজাতশত্রু দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইবার আশায়, সেনানিবাস নির্ম্মাণ করাইতেছিলেন। শাক্যসিংহের জীবনকালমধ্যে পাটলিপুত্রে রাজধানী স্থানান্তরিত হয় নাই; তাঁহার তিরোভাবের পর প্রথম বৌদ্ধ ভিক্ষুসমিতির অধিবেশনকালেও মগধের রাজধানী রাজগৃহেই অবস্থিত ছিল। রাজগৃহ হইতে ঠিক্ কোন সময়ে মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রে স্থানান্তরিত হইয়াছিল, তাহা নির্ণয় করিতে না পারিলেও, গ্রীক রাজদূত মেগাস্থিনিসের ভারতপ্রবাস সময়ে মগধের রাজধানী যেপাটলিপুত্রেই অবস্থিত ছিল, তাহাতে আর সন্দেহ প্রকাশের সম্ভাবনা নাই। মেগাস্থিনিস্ তাহাকে "পালিবোথ্রা" নামে অভিহিত করিয়া, গঙ্গা ও "এরনোবস্" নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত বলিয়া বর্ণনা করায়, এক সময়ে নানা তর্কবিতর্ক প্রচলিত হইয়াছিল। "এরনোবস্"ও হিরণ্যবাহু যে একই স্রোতস্বিনীর বিভিন্ন নাম, এবং তাহাই যে সুবিখ্যাত শোণ, তাহার প্রমাণ প্রাপ্ত হইয়া, লোকে "পালিবোথ্রাকেই" পাটলিপুত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছে। এই পাটলিপুত্রের নানা বর্ণনা সংস্কৃত, গ্রীক, এবং চীন ব্রহ্ম শ্যাম সিংহলের সাহিত্যে অদ্যাপি প্রাপ্ত হওয়া যায়। সে পুরাতন সাহিত্যবর্ণিত পাটলিপুত্রের দুর্গ, পরিখা, প্রাচীর, প্রাসাদ, চৈত্য, বিহার ও আরাম কালক্রমে ভূগর্ভে প্রোথিত হইয়া, লোকলোচনের অদৃশ্য হইয়া পড়িয়াছিল। মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্নে তাহার কোন কোন পুরাতন চিহ্ন পুনরায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। আবিষ্কৃত পদার্থনিচয় পুরাতন বর্ণনা সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করায়, আমরা মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রসাদে পুনরায় অতীতের স্বপ্নসমুদ্র সন্তরণ করিয়া ভারতবর্ষের গৌরবমণ্ডিত সৌভাগ্যরাশির বিলুপ্ত কীর্ত্তিচিহ্নের সম্মুখীন হইতে সক্ষম হইয়াছি। তাহাতে ভারতবর্ষের চিরবিস্মৃত ঐতিহাসিক কাহিনী কতদূর পর্য্যন্ত স্মৃতিপথে উদিত হইবে, তাহা ধীরে ধীরে আলোচনা করা আবশ্যক। সে আলোচনায় বিশ্ববিখ্যাত পাটলিপুত্রের কথাই বিশেষভাবে কীর্ত্তিত হইবে। বর্ত্তমান সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ তাহারই পূর্ব্বসূচনামাত্র।

বর্ত্তমান সংখ্যার চিত্র।

আমরা বর্ত্তমান সংখ্যায় র‍্যাফেএলের অঙ্কিত "পুণ্যশীলা সিসীলিয়া"র দ্বিবর্ণমুদ্রিত চিত্র দিলাম। মূল চিত্রখানি ইটালীর অন্তঃপাতী বোলোঞা নগরের "পিনাকোটেকা"তে আছে। সিসীলিয়ার ধর্ম্মশত্রুগণ তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাসের জন্য তাঁহার প্রাণবধ করিয়াছিল। কথিত আছে তিনি অর্গ্যান নামক বাদ্যযন্ত্র আবিষ্কার করিয়াছিলেন। একদিন তিনি অকস্মাৎ স্বর্গদূতগণের সঙ্গীত শুনিতে পান। ভক্তিরসাপ্লুত হৃদয়ে ও তদ্গতচিত্তে এই সঙ্গীত শুনিতে শুনিতে স্বর্গীয় সঙ্গীতের তুলনায় তাঁহার নিজ যন্ত্রের সুস্বর কিরূপ অকিঞ্চিৎকর, ইহা ভাবিতে ভাবিতে তাঁহার অর্গ্যান তাঁহার হস্ত হইতে খসিয়া পড়িতেছে। পদতলে আরও অনেক বাদ্যযন্ত্র পড়িয়া রহিয়াছে। সে সকলে আজ তাঁহার মন নাই। আজ তাঁহার আত্মা সুরলোকের আনন্দ উপভোগ করিবার জন্য ব্যাকুল। সিসীলিয়ার উভয় পার্শ্বে পুণ্যাত্মা পল, সাধু যোহন, মেরি ম্যাগডালীন এবং সাধু অগষ্টিন রহিয়াছেন। পল উন্মুক্ত তরবারির উপর ভর দিয়া মূর্ত্তিমান্ জ্ঞান ও প্রজ্ঞাস্বরূপ দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। সাধু যোহন ঐশী প্রীতির মূর্ত্তিস্বরূপ। মেরী ঐশীক্ষমারূপে অঙ্কিত হইয়াছেন। অগষ্টিন য়িহুদী ব্যতীত অপর খৃষ্টানদিগের প্রতিনিধিস্বরূপ অঙ্কিত হইয়াছেন। সমুদয় শিল্পকলা, ভক্তি প্রেম প্রভৃতি যে সকল মনোবৃত্তি আমাদিগকে অনন্তের সংস্পর্শে লইয়া যায়, তাহাদিগের প্রেরণায় চরম উৎকর্ষ লাভ করে। এই জন্য র‍্যাফেএলের অধিকাংশ উৎকৃষ্ট চিত্র ধর্ম্মবিষয়ক। ভবিষ্যতে আমরা র‍্যাফেএলের আরও চিত্র মুদ্রিত করিব।

***

শ্রীযুক্ত বামাপদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অঙ্কিত ছখানি ওলিওগ্রাফের প্রতিলিপি প্রবাসীর বর্ত্তমান সংখ্যায় মুদ্রিত হইল। বামাপদ বাবু ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা শিল্পপ্রদর্শনীতে স্বর্ণপদক পাইয়াছিলেন। তিনি কেশবচন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, স্যর রমেশচন্দ্র মিত্র, মনোমোহন ঘোষ, প্রভৃতির তৈলচিত্র অঙ্কিত করিয়া যশস্বী হইয়াছেন।



ম্যাডোনা ডিলা সেডিয়া

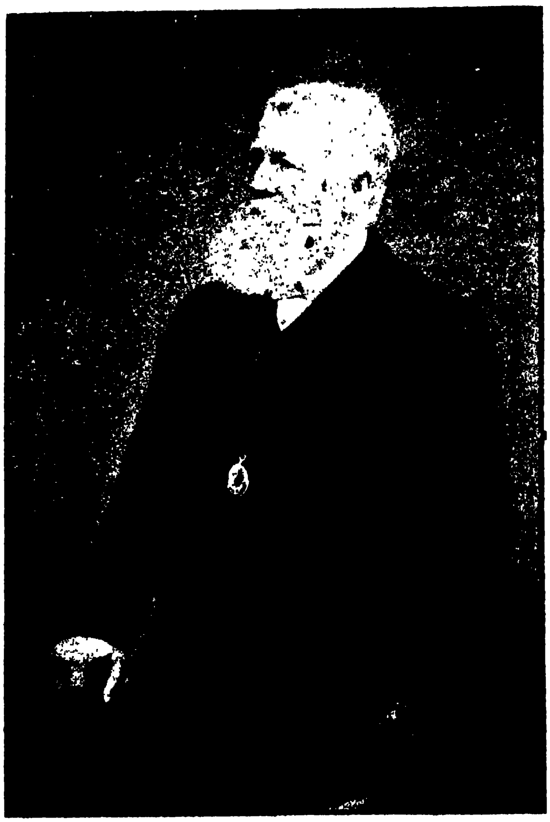
প্রবাসী

দ্বিতীয় ভাগ। | কার্ত্তিক, ১৩০৯। | ৭ম সংখ্যা।

ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাবকর্ত্তা।

প্রতদ্দেশের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সংস্কারনিমিত্ত ভারতবর্ষের গভর্ণর জেনারেল লর্ড কর্জন মহাশয় সম্প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এ দেশে পাঁচটী বিশ্ববিদ্যালয় আছে। তাহার মধ্যে তিনটী অর্থাৎ কলিকাতা, বম্বাই এবং মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি একই সময়ে স্থাপিত হয়। পঞ্জাব ও এলাহাবাদের বিশ্ববিদ্যালয় ঐ তিনটীর পর ও ভিন্ন ভিন্ন সময়ে গঠিত হয়। সিপাহী বিদ্রোহের কিছু দিন পরে লর্ড ক্যানিং সাহেবের ভারতশাসন সময়ে প্রথম তিনটী বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি হয়। আমাদের শিক্ষিত লোকেদের প্রায় অনেকের এইরূপ ধারণা যে লর্ড ক্যানিং সাহেবই ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাবকর্ত্তা। কিন্তু এ বিষয়ে একটু তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া দেখিলে ইহা প্রতীত হইবে যে লর্ড ক্যানিং সাহেব কর্ত্তৃক বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব উত্থাপিত হয় নাই। যে প্রণালীতে কলিকাতা, বম্বাই ও মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়গুলি গঠিত হইয়াছে, তাহার প্রস্তাবকর্ত্তার নাম আমাদের দেশের অতি অল্প লোকেই বিদিত আছেন।

ভারতে বিশ্ববিদ্যালয় সংস্থাপনের প্রস্তাবকর্ত্তা মোয়াট সাহেব নামক একজন ইংরাজ ডাক্তার। তিনি ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষে ডাক্তারী পদে নিযুক্ত হইয়া আইসেন। তৎসময়ে কলিকাতার মেডিকেল কালেজ অতি অল্প দিন পূর্ব্বে স্থাপিত হইয়াছিল। প্রথমে ডেভিড হেয়ার এই মেডিকেল কালেজের তত্ত্বাবধায়ক পদে নিযুক্ত হন। তিনি কিন্তু নিজে ডাক্তার ছিলেন না এবং ডাক্তারী শিক্ষার কিছু ধার ধারিতেন না। তাঁহার মৃত্যুর পরে ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে



ডাক্তার মোয়াট

মোয়াট সাহেব ঐ পদে নিযুক্ত হন। তখন পর্য্যন্ত মেডিকেল কালেজের কার্য্য ভালরূপ পরিচালিত হয় নাই। ডাক্তার মোয়াট সাহেবদ্বারা এই কালেজ উত্তমরূপে সংস্কৃত হইয়াছিল।

কলিকাতার মেডিকেল কালেজের বর্ত্তমান গৃহ ও হাঁসপাতাল ইহাঁর সময়ে নির্ম্মিত হয়। যে চারিজন বাঙ্গালী ছাত্র ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে বিলাতে চিকিৎসা শিক্ষা করিতে যান তাঁহারা ইহারই উত্তেজনায় ও পরামর্শে বিলাতে যাইতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। তিনি ডাক্তারী শিক্ষার উন্নতির নিমিত্ত যাহা যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহার বর্ণনা করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কিন্তু তিনি যে ডাক্তার হইয়াও সাধারণ শিক্ষার উন্নতির নিমিত্ত অনেক পরিশ্রম করিয়াছিলেন, তাহা সকলের জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য।

যখন লর্ড বেণ্টিং সাহেব মেকলে সাহেবের পরামর্শ গ্রহণ করিয়া এই স্থির করিলেন যে ইংরাজী ভাষাদ্বারা ভারতবাসীদিগের উচ্চ শিক্ষা হওয়া কর্ত্তব্য, তখন যাহাতে সুপ্রণালীতে বঙ্গদেশে শিক্ষার কার্য্য সম্পাদিত হইতে পারে তজ্জন্য একটী কমিটী গঠিত হয়। এই কমিটীর নাম "Council of Education" ছিল। ডাক্তার মোয়াট সাহেব ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে ইহার সেক্রেটরী নিযুক্ত হন। আজকাল যে সকল কার্য্য প্রত্যেক প্রদেশের ডিরেক্টর অব্ পবলিক ইনস্‌ট্রকৃশন দ্বারা সম্পাদিত হয়, তখন তাহা উক্ত কমিটীর সেক্রেটরী দ্বারা সম্পন্ন হইত।

তখন আজকালকার মত স্কুল ইনস্পেক্টরের পদের সৃষ্টি হয় নাই। কৌন্সিলের সেক্রেটরী মহাশয়কেই ঐ কাজও করিতে হইত। ডাক্তার মোয়াট সাহেব তজ্জন্য বঙ্গদেশের স্কুলসমূহ পরিদর্শন করিতেন। এই পর্য্যবেক্ষণের ফল তিনি এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

When I joined therefore and had personally visited all the colleges and schools under the charge of the council and had become acquainted with the standards in use, I was at once struck with the absence of any definite aim and object in the system of education adopted in all. It appeared to me that a great scheme of public instruction worked by an able staff and turning out annually numerous scholars of considerable merit and attainments needed some means of acknowledgment of the position they ought to occupy as men of culture and education. I rapidly arrived at the conclusion that nothing short of a university having the power to grant degrees would accomplish this purpose.

I accordingly placed myself at once in communication with my friend Professor Malden of University College in London. From the information which I placed before him, Professor Malden considered Bengal to be perfectly ready for the establishment of universities and sent me a copy of the history of those institutions in Europe written by himself. I then conferred with the President Mr Charles Haily Cameron on the subject, told him what I had done, &c &c. I was directed to prepare the scheme, which I did accordingly—&c &c.

তিনি যে প্রণালীতে কলিকাতায় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করিবার প্রস্তাব করেন, সেইরূপেই উহা সংস্থাপিত হইয়াছিল। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে সর চার্লস উড্ ভারতের গভর্ণর জেনারলের নিকট শিক্ষাসম্বন্ধে মন্তব্য (Educational Despatch) প্রেরণ করেন। ঐ মন্তব্যে ভারতবর্ষে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব ছিল। সেই প্রস্তাব অনুসারে লর্ড ক্যানিং সাহেব দ্বারা কলিকাতা, বম্বাই ও মাদ্রাজের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি স্থাপিত হয়।

১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ডাক্তার মোয়াট সাহেব কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের প্রস্তাব করেন। তাঁহার প্রস্তাবটী গভর্ণর জেনারেলের নিকট প্রেরণ করেন এবং গভর্ণর জেনারেল তাহা বিলাতে পাঠান। তদনুসারেই ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দের শিক্ষাসম্বন্ধীয় মন্তব্যে বিশ্ববিদ্যালয় সৃজনের প্রস্তাব হয়। ইহা সকলেই বিদিত আছেন যে আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে গঠিত হইয়াছে। ডাক্তার মোয়াট সাহেবই এই প্রণালীতে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় গঠনের প্রস্তাব করেন। তিনি এই প্রস্তাবসম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছিলেন।

After carefully studying the laws and constitutions of the universities of Oxford and Cambridge with those of the recently established university of London, the latter alone appears adapted to me to the wants of the native community.

সম্প্রতি যে বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল, তাহার প্রধান উদ্দেশ্য এই বলা যাইতে পারে যে লণ্ডন

বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রণালীতে গঠিত ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যেন সেইরূপ আর না থাকে এবং তাহাদিগের সংস্কার হওয়া উচিত।

ডাক্তার মোয়াট সাহেব কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তাবকর্ত্তা বলিয়াই সুখ্যাতিভাজন হন নাই। পরন্তু তিনি আরও অনেক সৎকার্য্য করিয়াছিলেন। তাহার জন্য তিনি আমাদের শ্রদ্ধার পাত্র। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে যে প্রণালীতে কলিকাতার মেডিকেল কালেজ পরিচালিত হইতেছে তাহার উদ্ভাবক তিনি। তাঁহার সেই প্রণালীতেই ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মেডিকেল কালেজেও কার্য্য হইতেছে। ইংরাজ এবং ভারতবাসীদিগের মধ্যে যাহাতে সদ্ভাব উৎপন্ন হইতে পারে, তজ্জন্য তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল। বেথুন সাহেবের স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ তাঁহারই অধ্যবসায়ে বেথুন সোসাইটী নামক একটী সভা গঠিত হয়। যাহাতে ভারতবাসী ও ভারতবর্ষপ্রবাসী ইংরাজদিগের ভিতর সদ্ভাব থাকিতে পারে, তাহাই এই সভার বিশেষ উদ্দেশ্য ছিল। বেথুন সাহেবের তিনি পরম বন্ধু ছিলেন। বেথুন সাহেবের মৃত্যু শয্যার কথা ডাক্তার মোয়াট সাহেব এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন।

"Two days before the close of his honored and valued life Mr. Bethune, at whose bedside I was watching and whose eyes I closed in their eternal sleep, asked me how long he had to live. "Don't conceal it from me" he said "as I wish to complete the last work of my life. When I mentioned to him that I could only measure it by hours, he called for his cheque book, drew a cheque for a very large amount and bid me hasten to realise it and keep it in my custody until he had passed away, for the benefit of the female school he had established. This was done. I was his executor and found that the whole of his large official income in India was spent in the country and chiefly in good works of which the foundation of the female school which bears his name, was the chief."

ভারতবাসীদিগকে ইংরাজেরা সচরাচর অকৃতজ্ঞ বলিয়া গালাগালি দিয়া থাকেন। ওয়ার্ড (Ward) নামক এক জন খৃষ্টান পাদরী বলিয়াছিলেন যে ইংরাজী Gratitude শব্দের সমার্থবোধক কথা ভারতবর্ষের কোন ভাষাতেই নাই। কিন্তু ডাক্তার মোয়াট সাহেব ভারতবাসীদিগকে ভালরূপে জানিতেন। অতএব তাঁহার মত ওয়ার্ড ও অন্যান্য খৃষ্টান দিগের মত অপেক্ষা শিরোধার্য্য। তিনি তাঁহার এক বক্তৃতায় ভারতবাসীদিগের কৃতজ্ঞতার বিষয়ে এইরূপ সাক্ষ্য দিয়া গিয়াছেন।

"'GRATITUDE' I sometimes hear many of my countrymen exclaim, who ought to know better, 'has no place in their (Indian) hearts. The word is unknown alike to their learned and their vulgar tongues ?' When I hear such expressions I always say 'stop a minute, my friend'; you travel too fast. You jump at your conclusions without thought or reflection. Have you rejoiced in their joys, have you sympathised with their sorrows ? have you thrown your doors open to welcome them, have you ever attempted to cultivate their friendship or to meet them as your social equals ? Until you do these things, you are not qualified to condemn them, or to assume that which has no existence save in yourprejudices and want of knowledge. So far as my limited experience extends I can give the most emphatic denial to the charge. * * * Among no people with whose history I am acquainted does the grateful memory of their real benefactors live and flourish in freshness and vigour, more than with the Hindoos who are the subjects of the British

—

১৮৭০ খৃষ্টাব্দে তিনি ভারতবর্ষ হইতে অবসর গ্রহণ করেন। তাঁহার ভারত ত্যাগ করাতে কলিকাতার শিক্ষিত অধিবাসিগণ কি হিন্দু কি মুসলমান সকলেই দুঃখিত হইয়াছিলেন। তখনকার খ্যাতনামা বাঙ্গালীরা তাঁহাকে ইংরাজীতে একখানি অভিনন্দন পত্র দেন। ইঁহারাই তাঁহার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবৎসর একটি রৌপ্যপদক দিবার জন্য অর্থদান করেন।

ভারত হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াও তাঁহার ভারতবাসীদিগের প্রতি ভালবাসা কমে নাই। আমার সহিত তাঁহার কিছুকাল পর্য্যন্ত চিঠিপত্র লেখালিখি ছিল। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে এক পত্রে তিনি আমাকে এইরূপ লিখিয়াছিলেন—

"* * * I am quite content to have earned the affection and goodwill of those amongst whom I worked and dwelt during the many years that I passed amongst them. I have, alas ! to mourn the removal of very many of my old friends, amongst

others, Pundit Ishwarchandra Vidyasagar, Mohammed Abdul Latif Khan Bahadour and the Revd. K.M. Bannerjee and many others too numerous to mention.

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারি মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর সময়ে ভারতবর্ষের লোকেরা তাঁহাকে প্রায় একেবারে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু মোয়াট সাহেবের নিকট আমরা অনেক বিষয়ে ঋণী। তাঁহার মত ইংরাজ এখন আর প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। এইজন্য তিনি আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতার পাত্র।

শ্রীবামনদাস বসু।

প্রবাসে বঙ্গসাহিত্য-চর্চ্চা।

ঔপন্যাসিক ননিবাবুর গ্রন্থগুলি বঙ্গীয় পাঠকগণের নিকট যথেষ্ট আদর পাইয়াছে। তাঁহার প্রণীত শৈলবালা, পরেশ-প্রসাদ, কোহিনুর, অমৃতপুলিন এবং যুগলপ্রদীপ বঙ্গসাহিত্য-ভাণ্ডারের আদরের সামগ্রী। তন্মধ্যে কোন কোন উপন্যাসের তৃতীয় সংস্করণ যন্ত্রস্থ। উপন্যাসগুলি দেশীয় প্রসিদ্ধ বাঙ্গালা ও ইংরাজী সাময়িক সংবাদপত্রে বিশেষরূপে প্রশংসিত। "শৈলবালা" ননিবাবুর প্রথম গ্রন্থ। উহা সাহিত্য-গুরু বঙ্কিমবাবুপ্রমুখ অপক্ষপাত সমালোচকগণকর্তৃক যথেষ্ট প্রশংসিত হইয়াছিল। বঙ্কিমবাবুই ননিবাবুকে গ্রন্থলিখনে উৎসাহিত করেন। গতবৎসর যুগলপ্রদীপ নামে একখানি বৃহৎ উপন্যাস লিখিয়া ননিবাবু বঙ্গীয় পাঠকগণকে উপহার দিয়াছেন। মুদ্রাযন্ত্রের প্রসাদে আজি যেরূপ রাশি রাশি উপন্যাস বাহির হইতেছে, অমৃতপুলিন বা যুগলপ্রদীপ সে শ্রেণীর উপন্যাস নহে। ভাষার ভঙ্গীতে, ঘটনার বৈচিত্রে, মানবচরিত্রচিত্রণে এবং উচ্চ আদর্শ সৃজনে এগুলির বিশেষত্ব আছে। সে কালের গ্রাম্য গুরু মহাশয়দিগের পাঠশালার নামে ছাত্রগণের হৃদয়ে কেন যে একটা আতঙ্ক উপস্থিত হইত এবং পুরাণপ্রসিদ্ধ "ষণ্ডামার্ক" হইতে উনবিংশ শতাব্দীর বিল্বগ্রামবাসী "রামধন সরকার" পর্য্যন্ত শিক্ষকগণ সরলমতি শিশুগণের ভবিষ্যজ্জীবনের আশাস্বরূপ জ্ঞানমন্দিরের দ্বার কিরূপ বিভীষিকাময় শমনদ্বারসদৃশ করিয়া রাখিয়াছিলেন, তাহারই একখানি হাস্যোদ্দীপক চিত্রে "যুগলপ্রদীপের" সূচনা। গ্রন্থগত চরিত্রগুলি কবির নিপুণ তুলিকাপাতে বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে।

জমিদার হরমোহন দত্তের ন্যায় কর্ত্তব্যপরায়ণ নৈষ্ঠিক হিন্দু, স্নেহময় পিতা, অনুরক্ত পতি, প্রজাবৎসল জমিদার, তপোবনবাসিনী ছায়ার স্বর্গীয় সরলতা, সংসারযোগিনী আদর্শ রমণী অন্নপূর্ণার আত্মবলিদান, শৈবালের পতিভক্তি, বশিষ্ঠের ন্যায় কুলপুরোহিত তারানাথের চরিত্র, আদর্শ বাঙ্গালী গুরুচরণের সৎসাহস, সত্যনিষ্ঠা, ঔদার্য্য এবং ত্যাগশীলতা, এবং মুখরা শৈলের আশৈশব আমোদজনক সরল দুষ্টামির চিত্র পাঠকের হৃদয় হইতে অনেক দিন মিলাইবে না। ননিবাবুর মধুর গম্ভীর ভাষায় স্বভাববর্ণনাগুলি বড়ই মনোমদ হইয়াছে। যুগলপ্রদীপের স্থানে স্থানে ঔপন্যাসিকের গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং মানবচরিত্র চিত্রাঙ্কণে শক্তির যথেষ্ট প্রমাণ আছে। ননিবাবুর সৃষ্ট চরিত্রগুলির মধ্য দিয়া তাঁহার অসীম মাতৃ-পিতৃ-ভক্তি, সত্যানুরাগ, দয়া, মহাপ্রাণতা এবং স্বদেশপ্রেমের আভাষ প্রাপ্ত হওয়া যায়। "ছায়া" নিদ্রাভঙ্গের পর স্বর্গীয় সৌন্দর্য্যময়ী লোকমনোমোহিনী প্রকৃতির অপূর্ব্ব সঙ্গীতধ্বনি শুনিয়া এবং গম্ভীর দৃশ্য দেখিয়া বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে চারিদিকে চাহিয়া যখন যোগিবর চন্দ্রচূড়কে জিজ্ঞাসা করিল, "গুরুদেব, এ কোন দেশে আমরা এসেছি"? তখন চন্দ্রচূড় উত্তর করিলেন "এ বঙ্গভূমি।" ছায়া বলিল "বঙ্গদেশ এমন সুন্দর? আমার বোধ হয় এ পৃথিবীতে এমন সুন্দর দেশ আর নাই"। এই খানে স্বদেশপ্রেমিক প্রবাসী কবির পূত হৃদয়মন্দাকিনী প্রকৃতির প্রেমনিকেতন জন্মভূমির নৈসর্গিক সৌন্দর্য্যের কথা ভাবিয়া আবেগময় ছন্দে অজস্রধারায় প্রবাহিত হইয়াছে, এবং পরক্ষণে আবার সেই জননীর দুঃখে কবিহৃদয় কাঁদিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার উপন্যাসগুলি পাঠকগণকে কখন হাসায়, কখন কাঁদায়, কখন ভয় বিস্ময় ও আনন্দে আপ্লুত করে; তাঁহাদের হৃদয়নিহিত প্রেম, ভক্তি ও ধর্ম্মভাব গুলি ধীরে ধীরে ফুটাইয়া তুলে।

* "যুগল প্রদীপের" কোন কোন চরিত্রের মধ্যে প্রবাসী বাঙ্গালীর গূঢ় ঐতিহাসিক রহস্য জড়িত আছে বলিয়াই বর্ত্তমান প্রবন্ধে পুস্তকখানির কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদত্ত হইল। বিশেষ অনুসন্ধানের পর সম্ভব হইলে সে রহস্য উদ্‌ঘাটন করা যাইবে। লেখক।

কিন্তু যাঁহার প্রভাব কাব্যের ভিতর দিয়া শত শত ব্যক্তির হৃদয়ে এইরূপ কার্য্য করিতেছে, তন্মধ্যে কয়টি হৃদয় কৃতজ্ঞতা ভরে সেই কবিকে জানিতে চাহেন ? জন্মভূমি হইতে কত শত মাইল দূরে আত্মীয়পরিজন হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া প্রবাসের নিভৃত কক্ষে বসিয়া, যিনি ভক্তিপূত হৃদয়ে নীরবে জননী মাতৃভাষার পূজা করিতেছেন এবং বিপুল অধ্যবসায়ে জাতীয় সাহিত্যভাণ্ডার ধীরে ধীরে পুষ্ট করিতেছেন, তাঁহার অতি সংক্ষিপ্ত জীবনী অদ্য প্রবাসীর পাঠকগণের নিকট উপস্থিত করিলাম.



শ্রীননিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়।

ননিবাবু ইংরাজী ১৮৫৬ সালের ৬ই জানুয়ারী তারিখে কলিকাতা হইতে ৭ মাইল দক্ষিণে বড়িশা বেহালা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি শৈশবাবধিই বিলক্ষণ মেধাবী, তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও পরিশ্রমী ছাত্র ছিলেন। বড়িশা হাইস্কুলে প্রথম শিক্ষালাভ করিয়া এবং তথা হইতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া ভবানীপুর লণ্ডন মিশনরী কলেজে অধ্যয়ন করেন। যাঁহারা উত্তরকালে গৌরবান্বিত জীবনলাভ করেন, অল্পবয়সে তাঁহাদের প্রতিভার পরিচয় প্রায় পাওয়া যায়। ছাত্রাবস্থায় ইঁহার অধ্যয়নে অনুরাগ, সহিষ্ণুতা, গাম্ভীর্য্য ও মানসিক বলের বিশেষ প্রমাণ পাওয়া গিয়াছিল। অধ্যয়নস্পৃহা পরিতৃপ্ত করিতে ইনি দূর দূরান্তর হইতে দুষ্প্রাপ্য ইংরাজী ও সংস্কৃত সদ্গ্রন্থ সকল সংগ্রহ করিয়া পাঠ করিতেন। অথচ সহপাঠীদিগের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ছাত্র বলিয়া প্রশংসিত ও সকলের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। বয়োজ্যেষ্ঠ মান্য ব্যক্তিগণের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শনে, বিনয়গুণে, সহৃদয়তা ও সারল্যে শৈশবে যেমন ছিলেন, এখনও প্রৌঢ়াবস্থায়ও সেইরূপ।

এই অনন্যসাধারণ গুণাবলীর পরিচয় পাইয়া গ্রামস্থ সকলেই ইঁহার শৈশবকালে বলিতেন "ননি কালে একজন বড়লোক হবে"। এক্ষণে ঐ সকল গুণপ্রভাবেই ইনি স্থানীয় জনসাধারণের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। ননিবাবু একজন লোকবিশ্রুত "বড়লোক" না হইলেও তিনি যে হৃদয়ে প্রকৃতই বড় এবং জন্মভূমির অকৃত্রিম সেবক, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। স্কুলের শিক্ষা সমাপ্ত করিবার পর কলিকাতায় অবস্থানকালে ননিবাবু আশৈশবের জ্ঞানার্জ্জনস্পৃহা পরিতৃপ্ত করিবার অনেক সুযোগ প্রাপ্ত হইলেন। এই সময় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেনের সহিত ইঁহার পরিচয় হয়। কেশববাবু যুবক ননিবাবুর মুখে প্রতিভার আলোক দর্শন করিয়া ইঁহাকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন।

শীঘ্রই ননিবাবু মেডিক্যাল কলেজে প্রবেশ করিলেন, কিন্তু অল্পকাল মধ্যে স্বাস্থ্যভঙ্গ হওয়ায় বাধ্য হইয়া উত্তর-পশ্চিম প্রদেশে প্রবাসী হইলেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি বায়ুপরিবর্ত্তনের জন্য এলাহাবাদে আইসেন এবং এখানকার জলবায়ুতে স্বাস্থ্য লাভ করায় এপ্রদেশেই স্থায়ী হন।

এখানে আইন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া কিছুদিন মৃজাপুরে ওকালতি করিয়াছিলেন, পরে ১৮৮১ অব্দে মাইনপুরী জেলা আদালতে ওকালতী আরম্ভ করেন। তদবধি ননিবাবু আগ্রা-বিভাগের অন্তর্গত মাইনপুরীপ্রবাসী হইয়াছেন। এতদঞ্চলে ইঁহার যথেষ্ট প্রতিপত্তি হইয়াছে। ইঁহার কার্য্যক্ষেত্র মাইনপুরীতেই আবদ্ধ নহে। স্থানীয় অনেকগুলি জেলা আদালতে ইঁহাকে প্রায়ই যাতায়াত করিতে হয়। দরিদ্রের

দুঃখে ইনি আন্তরিক ক্লেশ অনুভব করিয়া থাকেন এবং হৃদয়ের সহানুভূতি কার্য্যে পরিণত করেন। ননিবাবু বিনা পারিশ্রমিকে নিঃসম্বল বিপন্নের পক্ষ সমর্থন করিয়া পরম আনন্দ অনুভব করেন। অনেক সময় প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করিয়াও খুনী মোকদ্দমার এবং অপরাপর গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত নিরপরাধীর মুক্তির জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। এতদ্ব্যতীত যে কোন অবস্থায় হউক, প্রকৃত বিপন্ন ব্যক্তিকে যথাসাধ্য সাহায্য প্রদানে ইনি কখনও কুণ্ঠিত নহেন। স্থানীয় জনহিতকর প্রত্যেক সদনুষ্ঠানেই ইনি অগ্রণী।

প্রবাসী বাঙ্গালাদিগের মধ্যে ননিবাবুর বিশেষত্ব তাঁহার সাহিত্যসেবায়। ওকালতী ব্যবসায়ে সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিয়াও তিনি আন্তরিক যত্নসহকারে গত ২০ বৎসর মাতৃভাষার সেবা করিতেছেন। আমরা ইতিপূর্ব্বে তাঁহাকে ঔপন্যাসিক বলিয়াছি বলিয়া তিনি যে কেবলই উপন্যাস লিখিয়া থাকেন তাহা নহে। ইনি একজন চিন্তাশীল সান্দর্ভিক এবং কবি। ইঁহার পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাবোদ্দীপক নানাবিধ সন্দর্ভ ও কবিতাবলী শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত সুবিখ্যাত "আর্য্যদর্শন", "সুরভি ও পতাকা" প্রভৃতি প্রথম প্রকাশিত সাময়িক ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইত। ঐ সকল পত্রে প্রকাশিত কণ্বমুনি ও "প্রস্পেরো", সঙ্গীত ও উপাসনা, আমার স্বাধীনতা, ঊনবিংশ শতাব্দী ও কলিযুগ, প্রভৃতি, এবং বিধবাবিবাহ ও হিন্দু বালবিধবাসম্বন্ধীয় রচনাবলী বঙ্গসাহিত্যে বেশ উচ্চ স্থান পাইবার যোগ্য। ননিবাবু স্বীয় নাম গোপন রাখিয়া এই সকল প্রবন্ধ এবং প্রথমপ্রকাশিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্প ও উপন্যাসগুলি "পরিব্রাজক" এই নাম দিয়া প্রকাশিত করেন। এইজন্য ননিবাবু ২০।২২ বৎসর ধরিয়া সাহিত্যসেবা করিলেও বঙ্গীয় পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই তাঁহার নাম জানেন না। অল্পদিন হইল "অমৃতপুলিন" উপন্যাসের দ্বিতীয় সংস্করণকালে তাঁহার বিশিষ্ট বন্ধু ভূতপূর্ব্ব আর্য্যদর্শনের সহকারীসম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রচন্দ্র বসু মহাশয়ের অনুরোধে স্বীয় নাম প্রকাশ করেন এবং যুগলপ্রদীপেও নিজ নাম দিয়াছেন। ননিবাবু যে কেবল বঙ্গভাষায় একজন সুলেখক তাহা নহে, ইঁহার ইংরাজী ভাষাতেও যথেষ্ট অধিকার ও বাগ্মিতা আছে। ইনি ইংরাজী বক্তৃতা দ্বারা মাইনপুরী-অঞ্চলবাসী ইংরাজ ও দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে প্রতিষ্ঠাভাজন হইয়াছেন।

১৮৮৯ সালে ইনি একদিন "মাইনপুরী একম্যান ক্লবে" কোন অধিবেশনে বিধবাবিবাহ সম্বন্ধে একটী ইংরাজী প্রবন্ধ পাঠ করেন। এলাহাবাদ হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীযুক্ত একম্যান সাহেব তখন মাইনপুরীর সেশুন্স-জজ ছিলেন। তিনি উক্ত অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি ঐ প্রবন্ধটী শ্রবণ করিয়া প্রীত হন এবং সভাস্থলে ননিবাবুর অনেক প্রশংসা করেন। সে সময়ে জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ লাম্বের উক্ত প্রবন্ধ এতই ভাল লাগিয়াছিল যে তিনি একম্যান সাহেবকে বলিয়া উহা মুদ্রিত করিয়া ইংলণ্ডস্থ বন্ধুবান্ধবগণের মধ্যে প্রচার করেন। ননিবাবু জাতীয় মহাসভা কংগ্রেসের উন্নতিকল্পে স্বীয় প্রবাস স্থানে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। মহাসভার অধিবেশনে স্বয়ং ডেলিগেট হইয়া এলাহাবাদ বোম্বাই প্রভৃতি স্থানে যান এবং স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকে ডেলিগেট স্বরূপ পাঠাইয়া দেন।

ননিবাবু যখন আর্য্যদর্শনে লিখিতেন, তখন মহাত্মা কৃষ্ণদাস পাল জীবিত ছিলেন। তিনি হিন্দু পেট্রিয়টে ননিবাবুর উপন্যাসের যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন। (ক্রমশঃ)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।

বৈশ্যবর্ণ।

[৩]

আমরা পূর্ব্বপ্রবন্ধে দেখাইয়াছি যে, কৃষি, গোপালন ও বাণিজ্য, প্রধানতঃ এই তিন কর্ম্ম বৈশ্যের বৃত্তি হইলেও, কালক্রমে একমাত্র বাণিজ্যই বৈশ্যবৃত্তি বলিয়া পরিগণিত হইল। কৃষিসম্বন্ধে মহর্ষি মনু ও পরাশরের অভিমত পাঠকবর্গ ইতঃপূর্ব্বেই অবগত হইয়াছেন। সুতরাং বৈশ্যবর্গের মধ্যে একমাত্র বণিক্ বৈশ্যেরাই যে সমাজে সমধিক আদৃত হইবেন, তাহার আর বিচিত্রতা কি? ফলতঃ ধর্ম্মশাস্ত্রে, ইতিহাসে, পুরাণে, সর্ব্বত্রই বণিক্ শব্দ বৈশ্যের নামান্তর হইয়া দাঁড়াইল।

বণিক্ শব্দ বৈশ্যেরই নামান্তর মাত্র। রামায়ণে ও মহাভারতে যদি এ সম্বন্ধে কোনও প্রমাণ থাকে, প্রথমে

তাহারই আলোচনা করা যাউক। রামায়ণ অতীব প্রাচীন গ্রন্থ। মহর্ষি বাল্মীকি ও ভগবান্ রামচন্দ্র সমসাময়িক ব্যক্তি ছিলেন। রামায়ণ মহাকাব্য যে ভগবান্ রামচন্দ্রের রাজত্বকালেই রচিত হইয়াছিল, তাহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। সুতরাং এই গ্রন্থের প্রাচীনত্বসম্বন্ধে সন্দেহের কোনও কারণ নাই। রামায়ণের বালকাণ্ডের প্রথম সর্গে নিম্নলিখিত শ্লোকটি দৃষ্ট হয়। যথা—

পঠন্ দ্বিজো বাগৃষভত্বমীয়াৎ
স্যাৎ ক্ষত্রিয়ো ভূমিপতিত্বমীয়াৎ।
বণিগ্‌জনঃ পণ্যফলত্বমীয়াৎ
জনশ্চ শূদ্রোঽপি মহত্বমীয়াৎ ॥
(বালকাণ্ড ১ সর্গ, ১০০ শ্লোক)

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ রামায়ণ-মহাকাব্য পাঠ করিলে, শব্দ-ব্রহ্মপারগতা লাভ করেন; ক্ষত্রিয় পাঠ করিলে, ভূপতি হয়েন; বণিক্ পাঠ করিলে, পণ্যফলত্ব লাভ করেন এবং শূদ্র পাঠ করিলে, মহত্ব প্রাপ্ত হয়েন।

চতুর্ব্বর্ণেরই ব্যক্তি রামায়ণ মহাকাব্য পাঠ করিলে, কি কি ফললাভ করেন, তাহাই পূর্ব্বোক্ত শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে। প্রথমে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের উল্লেখ করিয়া, পরে বৈশ্যবর্ণের উল্লেখ করিবার কালে মহর্ষি বাল্মীকি "বৈশ্য" শব্দের ব্যবহার না করিয়া কেবল "বণিক্"শব্দই ব্যবহৃত করিলেন। ইহাতে স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, মহর্ষি বাল্মীকির সময়ে বণিক্ শব্দ বৈশ্যেরই নামান্তর হইয়াছিল। এ সম্বন্ধে আরও অনেক প্রমাণ আছে। যথা—

সামন্তরাজসঙ্ঘৈশ্চ বলিকর্ম্মভিরাবৃতাম্।
নানাদেশনিবাসৈশ্চ বণিগ্‌ভিরুপশোভিতাম ॥
(বাল ৫।১৪)

অর্থাৎ অযোধ্যা মহানগরী সামন্ত রাজবর্গে ও করদ ভূপতিগণে সমাবৃত এবং নানাদেশনিবাসী বণিক্‌সমূহে উপশোভিত ছিল।

ক্ষত্রিয় রাজবর্গের পরেই বণিক্‌সমূহের উল্লেখ দর্শনে তাহাদিগকে বৈশ্য বলিয়াই বুঝা যাইতেছে। আর বণিক্ শব্দে মহর্ষি বাল্মীকি যে বৈশ্যই বুঝিতেন, তাহা পূর্ব্বেই প্রমাণিত হইয়াছে।

পুনশ্চ—

ক্ষত্রং ব্রহ্মমুখং বাসীদ্ বৈশ্যাঃ ক্ষত্রমনুব্রতাঃ।
শূদ্রাঃ স্বকর্ম্মনিরতাস্ত্রীন্ বর্ণানুপচারিণঃ ॥
(বাল ৬।১৯)

অর্থাৎ ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের এবং বৈশ্য ক্ষত্রিয়ের অনুব্রত ছিল এবং স্বকর্ম্মনিরত শূদ্র, ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের পরিচারণা করিত।

এই শ্লোকে মহর্ষি বাল্মীকি তৃতীয়বর্ণসংজ্ঞক বৈশ্যশব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন। বণিক্ ও বৈশ্য শব্দের প্রয়োগ তাঁহার ইচ্ছাসাপেক্ষ। সুতরাং বণিক্ শব্দ যে তাঁহার নিকট বৈশ্যের নামান্তর মাত্র ছিল, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বণিকেরা বাণিজ্যদ্বারা প্রভূত ধনোপার্জ্জন করিয়া থাকেন; এই কারণে তাঁহারা "ধনী", "ধনবান" প্রভৃতি শব্দেও অভিহিত হইয়া থাকেন। এতৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত শাস্ত্রীয় প্রমাণ পাঠ করুন। যথা—

মুখজা ব্রাহ্মণাস্তাত বাহুজাঃ ক্ষত্রিয়াস্মৃতাঃ।
উরুজা ধনিনো রাজন্ পাদজাঃ পরিচারকাঃ ॥
(মহাভারত শান্তিপর্ব্ব, ২৯৬ অধ্যায়)

অর্থাৎ, হে রাজন্ ব্রাহ্মণগণ সৃষ্টিকর্ত্তার মুখ হইতে, ক্ষত্রিয়গণ বাহু হইতে, ধনী অর্থাৎ বৈশ্যগণ উরু হইতে এবং পরিচারক অর্থাৎ শূদ্রগণ পাদ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

পুনশ্চ বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণে 'ধন' শব্দ বৈশ্যের উপাধিরূপে দৃষ্ট হয়। যথা—

ধনো বৈশ্যে। * ইত্যাদি।

বিষ্ণুসংহিতার সপ্তবিংশ অধ্যায়েও নিম্নলিখিত পদ দৃষ্ট হয়। যথা—

ধনোপেতং বৈশ্যস্য।

অর্থাৎ বৈশ্যের নাম ও উপাধি ধনবাচক শব্দ।

সুতরাং ধন, * ধনী, ধনবান্ প্রভৃতি শব্দ যে বণিক-বৈশ্য অর্থেই প্রযুক্ত হইত, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

মহর্ষি বাল্মীকিপ্রণীত রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডের সপ্তষষ্টিতম অধ্যায়ে নিম্নলিখিত শ্লোক দৃষ্ট হয়। যথা—

নারাজকে জনপদে ধনবন্তঃ সুরক্ষিতাঃ।
শেরতে বিবৃতদ্বারাঃ কৃষিগোরক্ষজীবিনঃ ॥
(অযোধ্যা। ৬৭।১৮)

* ধন + অর্শ আদিভ্যোঽচ ৫।২।১২৭ (পাণিনিসূত্র) = ধনী।

অর্থাৎ, অরাজক রাজ্যে ধনবান ব্যক্তিরা (অর্থাৎ বণিক্ বৈশ্যেরা) সুরক্ষিত হয় না এবং কৃষক ও গোপালকেরা দ্বার উদ্ঘাটনপূর্ব্বক নিদ্রা যাইতেও সাহস করে না।

পাঠকবর্গ উদ্ধৃত শ্লোক মনোযোগসহকারে পাঠ করিলে বুঝিতে পারিবেন যে মহর্ষি বাল্মীকি "ধনবন্তঃ" এবং "কৃষিগোরক্ষজীবিনঃ" এই দুই শব্দ প্রয়োগদ্বারা প্রাচীন বৈশ্য জাতিরই উল্লেখ করিতেছেন। কিন্তু তাঁহার সময়ে ধনবন্তঃ অর্থাৎ বণিক্‌বৈশ্যেরা কৃষিগোরক্ষজীবী বৈশ্যসম্প্রদায় হইতে স্বতন্ত্র হইয়াছিলেন। এই কারণে তিনি বিভিন্ন শব্দ প্রয়োগদ্বারা প্রাচীন বৈশ্যজাতির বিভিন্ন শাখার উল্লেখ করিলেন। বণিক্‌বৈশ্যেরা কৃষক ও গোপালক বৈশ্যসম্প্রদায় হইতে পৃথক্ হইয়া পরিশেষে কিরূপে একমাত্র বৈশ্যজাতি বলিয়া সমাজে পরিগণিত হইয়াছিলেন, মহর্ষি বাল্মীকি প্রণীত রামায়ণ হইতে উদ্ধৃত শ্লোক পরম্পরা দ্বারা তাহা সুস্পষ্ট বোধগম্য হইতেছে।

বণিক্‌শব্দ বৈশ্যের নামান্তর কি না, তৎসম্বন্ধে অতঃপর মহাভারতের প্রমাণাদির আলোচনা করা যাউক। মহাভারতের শান্তিপর্ব্ব, মোক্ষধর্ম্ম, ২৬১তম অধ্যায়ে, জাজলি-তুলাধার সংবাদে মহর্ষি জাজলি তুলাধার বণিককে বলিতেছেন—

বিক্রীণানঃ সর্ব্বরসান সর্ব্বগন্ধাংশ্চ বাণিজ। *
বনস্পতীনোষধীশ্চ তেষাং ফলমূলানিচ।
অধ্যগা নৈষ্ঠিকীং বুদ্ধিং কুতস্ত্বামিদ মাগতম্।
এতদাচক্ষ্ব মে সর্ব্বং নিখিলেন মহামতে॥

অর্থাৎ হে বণিক্, তুমি সর্ব্বপ্রকার রস, সর্ব্বপ্রকার গন্ধদ্রব্য, বনস্পতি, ওষধি ও তাহাদের মূল ও ফল বিক্রয় কর। অথচ তুমি নৈষ্ঠিকী বুদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছ। হে মহামতে, ইহা তোমার কেমন করিয়া হইল, তাহা আমাকে আনুপূর্ব্বিক বল।

ভীষ্ম উবাচ।

এবমুক্তস্তুলাধারো ব্রাহ্মণেন যশস্বিনা।
উবাচ ধর্ম্মসূক্ষ্মাণি বৈশ্যো ধর্ম্মার্থতত্ত্ববিৎ॥
(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব, মোক্ষধর্ম্ম ২৬১ অধ্যায়)

অর্থাৎ, ভীষ্ম কহিলেন, সেই ধর্ম্মার্থতত্ত্বজ্ঞ বৈশ্য তুলাধার যশস্বী ব্রাহ্মণ জাজলিকর্তৃক এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া ধর্ম্মের সূক্ষ্ম তত্ত্বসকল কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

পাঠকবর্গ উদ্ধৃত শ্লোকসমূহে দেখিতে পাইবেন যে মহর্ষি বেদব্যাস বণিক্ শব্দ কেবল বৈশ্যশব্দেরই পরিবর্ত্তে প্রয়োগ করিয়াছেন।

অতঃপর বৃদ্ধগৌতমসংহিতাসন্নিবিষ্ট প্রমাণাদির আলোচনা করা যাউক। এই গ্রন্থে স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বক্তা এবং ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির শ্রোতা। ইহার দ্বিতীয় অধ্যায়ে নিম্নলিখিত শ্লোকনিচয় দৃষ্ট হয়। যথা—

শৃণু বর্ণক্রমেণৈব ধর্ম্মং ধর্ম্মভৃতাং বর।
নাস্তি কিঞ্চিন্নরশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণস্য তু বিক্রয়ঃ॥ ইত্যাদি

হে ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ, বর্ণক্রমে অর্থাৎ অগ্রে প্রথমবর্ণ ব্রাহ্মণের, পরে দ্বিতীয় বর্ণ ক্ষত্রিয়ের, তৎপরে তৃতীয়বর্ণ বৈশ্যের এবং সর্ব্বশেষে চতুর্থবর্ণ শূদ্রের ধর্ম্মবর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। কোন দ্রব্যই ব্রাহ্মণের বিক্রেয় নহে। ইত্যাদি

* * * * * * * *

তে নমস্কৃত কর্ম্মানো ব্রহ্মলোকং ব্রজন্তিতে।
ব্রহ্মলোকে ততঃ কামং গন্ধর্ব্বৈ ব্রহ্মগায়কৈঃ।
উপগীয়মানাঃ প্রিয় তৈঃ পূজ্যমানাঃ স্বয়ম্ভুবা।
ব্রহ্মলোকে প্রমোদন্তে যাবদ্ভূতস্য বিপ্লবম্॥

অর্থাৎ, স্বধর্ম্মপরায়ণ সেই সকল নমস্কৃতকর্ম্মা (ব্রাহ্মণ) ব্রহ্মলোকে গমন করিয়া ব্রহ্মগায়ক গন্ধর্ব্বগণকর্তৃক স্তুত ও স্বয়ম্ভূকর্তৃক পূজিত হন এবং সেখানে প্রলয়পর্য্যন্ত সুখে অবস্থান করেন।

ক্ষত্রিয়োঽপি স্থিতো রাজ্যে স্বধর্ম্মং পরিপালয়ন্।
সম্যক্ প্রজাঃ পালয়িতা স্বধর্ম্মনিরতঃ সদা।

* * * * * * * *

ক্ষত্রিয় উত্তমাং যাতি গতিং দেবনিষেবিতাম্।
তত্র দিব্যোপ্সরোভিস্তু গন্ধর্ব্বৈশ্চ প্রযত্নতঃ।
সেব্যমানো মহাতেজা মোদতে শক্রপূজিতঃ।
চতুর্যুগানি বৈ ত্রিংশদ্ মোদিত্বা তত্র দেববৎ।
ইহৈব মানুষে লোকে চতুর্ব্বেদী দ্বিজোভবেৎ॥

অর্থাৎ, ক্ষত্রিয়ও স্বধর্ম্মপালনার্থে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া যথাশাস্ত্র প্রজাপালন ও স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠান করিলে, উত্তম দৈবী

* নৈগমো বাণিজো বণিক্ ইত্যমরসিংহ।

গতি প্রাপ্ত হন। সেই মহাতেজা দেবলোকে অপ্সর ও গন্ধর্ব্বগণকর্ত্তৃক সেবিত ও দেবরাজ ইন্দ্র কর্ত্তৃক পূজিত হন এবং ত্রিংশৎ চতুর্যুগ পর্য্যন্ত স্বর্গভোগ করিয়া এই মনুষ্য লোকে চতুর্ব্বেদী ব্রাহ্মণ হইয়া জন্মগ্রহণ করেন।

কৃষিগোপালন নিরতঃ স্বধর্ম্মা বেক্ষণেরতঃ।
বণিক্ স্বকর্ম্মবাপ্নোতি পূজ্যমানোঽপ্সরোগণৈঃ॥
চতুর্যুগাণি বৈ ত্রিংশদ্ ঋদ্ধে দ্বাদশপঞ্চচ।
ইহ মানুষ্যকে রাজন্ রাজা ভবতি বীর্য্যবান্॥

অর্থাৎ, হে রাজন্ কৃষি ও গোপালনে প্রবৃত্ত স্বধর্ম্মপরায়ণ বণিক্ অপ্সরোগণকর্ত্তৃক পূজিত হইয়া স্বকীয় সুকৃত ভোগ করেন এবং সপ্তচত্বারিংশৎ মহাযুগ সমৃদ্ধিভোগের পর এই মনুষ্যলোকে বীর্য্যবান্ রাজা হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন।

উদ্ধৃত শ্লোকপরম্পরা পাঠ করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে সংহিতাকার বণিক্ শব্দকে বৈশ্যেরই নামান্তর রূপে প্রযুক্ত করিয়াছেন। উভয়শব্দই যে তৃতীয়বর্ণসংজ্ঞক ও একার্থের প্রতিপাদক, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ হইতেও নিম্নলিখিত প্রমাণ উদ্ধৃত হইতেছে। যথা—

তেষু বৈ মধ্যমো বিষ্ণুঃ সত্ত্বদেহঃ সনাতনঃ।
তস্যাভবন্ মুখাদ্বিপ্রাঃ সর্ব্ববেদসমাশ্রয়াঃ॥
বাহ্বোশ্চ ক্ষত্রিয়া জাতাঃ প্রজারক্ষণহেতবে।
উরুতো বণিজো জাতাঃ ধনরক্ষণ হেতবে।
ত্রয়ানাং সেবনার্থায় শূদ্রা জাতাস্তু পাদতঃ॥
(বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ, উত্তরখণ্ড)

অর্থাৎ, ইহাদের মধ্যে বিষ্ণুই মধ্যম। ইনি সনাতন ও সত্ত্বদেহ। ইহার মুখ হইতে চতুর্ব্বেদের আশ্রয়স্বরূপ বিপ্র বা ব্রাহ্মণ, বাহু হইতে প্রজারক্ষণার্থ ক্ষত্রিয় এবং উরু হইতে ধনরক্ষার্থ বণিক্ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। আর এই বর্ণত্রয়ের পরিচর্য্যার্থ পাদ হইতে শূদ্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিল।

উদ্ধৃত শ্লোকে "বণিক্" শব্দ যে তৃতীয় বর্ণ বৈশ্যার্থে প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা এস্থলে না বলিলেও চলে। *

পাঠকবর্গের সমক্ষে যে সমস্ত শাস্ত্রীয় প্রমাণ উপস্থাপিত হইল, তাহা হইতেই তাঁহারা অসংশয়িত রূপে বুঝিতে পারিবেন যে বণিক্ শব্দ কেবল বৈশ্যেরই নামান্তর মাত্র।

অতঃপর অস্মদ্দেশীয় প্রামাণিক কোষকারগণ "বণিক্" শব্দকে কোন পর্য্যায়ের অন্তর্নিবিষ্ট করিয়াছেন, তাহাও পাঠকবর্গকে দেখাইব।

অমরকোষের বৈশ্যবর্গে নিম্নলিখিত শ্লোক দৃষ্ট হয়। যথা—

বৈদেহকঃ সার্থবাহো নৈগমো বাণিজো বণিক্।
পণ্যাজীবো হ্যাপণিকঃ ক্রয়বিক্রয়িকশ্চ সঃ॥
ইতি বৈশ্যবর্গঃ, দ্বিতীয় কাণ্ডম্ ৯।৭৮

অর্থাৎ বৈদেহক, সার্থবাহ, নৈগম, বাণিজ, বণিক্, পণ্যাজীব, আপণিক, ক্রয়বিক্রয়িক এইগুলি বাণিজ্য নিবন্ধন বৈশ্যসাধারণের নাম।

পুনশ্চ—

বৈদেহঃ বিদেহঃ বাণিজঃ বাণিজিকঃ ক্রায়িকঃ বিক্রয়িকঃ ইতি ভরতাদয়ঃ।

অর্থাৎ ভরত প্রভৃতি বৈশ্যসাধারণের বৈদেহাদি নামের উল্লেখ করিয়াছেন।

অপিচ—

বাণিজিকঃ বাণিজ্যকারঃ ইতি শব্দরত্নাবলী। অর্থাৎ শব্দরত্নাবলীতে বৈশ্যের নাম বাণিজিক ও বাণিজ্যকার আছে।

পুনরপিচ—

বৈশ্যস্তু ব্যবহর্ত্তা বিট্ বার্ত্তিকঃ পণিকো বণিক্, ইতি রাজনির্ঘণ্টঃ। অর্থাৎ রাজনির্ঘণ্টের মতে বৈশ্য, ব্যবহর্ত্তা বিট, বার্ত্তিক, পণিক্ ও বণিক্ এইগুলি বৈশ্যের নাম।

অতএব দেখা যাইতেছে যে প্রামাণিক কোষকারগণের মতেও বণিক্‌শব্দ বৈশ্যেরই নামান্তরমাত্র। এস্থলে বলা কর্ত্তব্য যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বা শূদ্রবর্গের মধ্যে কোথাও বণিক্ শব্দের প্রয়োগ নাই। বাণিজ্য যে কেবল বৈশ্যেরই বৃত্তি এবং বণিক্ শব্দ যে কেবল বৈশ্যবর্ণ-বাচক, তাহা শাস্ত্রকার ও কোষকারগণের মতে অসংশয়িতরূপে প্রতিপন্ন হইতেছে।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস।

* উদ্ধৃত শাস্ত্রীয় প্রমাণের মধ্যে কতিপয় প্রমাণের জন্য আমি হাজারিবাগ জিলাস্কুলের প্রধান পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হৃষীকেশ ব্যাকরণ সরস্বতী মহাশয়ের নিকট ঋণী থাকিলাম। লেখক।

নূতন যুগের নূতন প্রশ্ন।

প্রাচীন কালের লোকের সংস্কার ছিল যে রাজা ভিন্ন রাজ্য চলে না। দেশে শান্তি ও সুনিয়ম স্থাপন, সামাজিক শৃঙ্খলা ও উন্নতি বিধান, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন, এ সমুদয় রাজার কাজ; রাজা না হলে একাজ অন্যে করিতে পারে না; সুতরাং রাজাহীন রাজ্য উৎসন্ন যায়। কেবল যে সাধারণ অজ্ঞ মানুষের মনে এরূপ সংস্কার ছিল, তাহা নহে; জ্ঞানিগণের অন্তরেও এই সংস্কার বদ্ধমূল ছিল। মহাভারতে আছে—

"অরাজকে জনপদে দোষা জায়ন্তি বৈ সদা।"

অর্থাৎ "জনপদ রাজাহীন হইলে নানা দোষের আলয় হয়।"

রাজা না থাকিলেও যে রাজ্য সুরক্ষিত হইতে পারে, প্রাচীনগণ ইহা ধারণা করিতেই পারিতেন না।

ইহার কারণ আছে। রাজ্যের রক্ষা ও সুশাসন বলিলে মানুষ যাহা বুঝিত তাহার সঙ্গে রাজশক্তি বহু বহু শতাব্দী হইতে জড়িত ছিল। আদিম বর্ব্বর মানুষ যখন সমাজবদ্ধ হইয়া বসিয়াছিল তখন হইতেই বোধ হয় রাজা ও রাজশক্তির অভ্যুদয় হইয়া থাকিবে। বর্ব্বর মানুষ আত্মরক্ষার জন্যই অপর দশজনের সঙ্গী হইয়াছিল; দেখিয়াছিল যে একাকী আপনাকে সম্পূর্ণরূপে রক্ষা করিতে পারে না; একাকী নিজের সকল অভাব পূরণ করিতে পারে না; একাকী প্রবল শত্রুকুলের হাত হইতে আপনাকে বাঁচাইতে পারে না; সুতরাং অপর দশ জনের সঙ্গ লওয়া আবশ্যক হইয়াছিল। কিন্তু যখন দশজনের সঙ্গ লইতে গেল, তখন তাহাদের সাহায্য লাভের পক্ষে এই নিয়ম স্থাপিত হইল, যে আবশ্যকমত তাহাকেও সেই দশজনের সাহায্যার্থে সময় ও সামর্থ্য দিতে হইবে। এটা মোটা কথা, যদি সাহায্য চাও, তবে সাহায্য দেও। মানুষ বর্ব্বর হইলেও তাহা অস্বীকার করিতে পারিল না। এইরূপে বর্ব্বরদিগের এক একটী মণ্ডলী স্থাপিত হইল। তৎপরে এই সকল যাযাবর মণ্ডলী যখন একস্থান হইতে অন্যস্থানে আহারান্বেষণে সঞ্চরণ করিতে লাগিল, তখন অপরাপর মণ্ডলীর সহিত যুদ্ধবিগ্রহ উপস্থিত হইতে লাগিল। এই সকল যুদ্ধবিগ্রহের দ্বারা মণ্ডলী সকলের ঘনসন্নিবিষ্টতা বর্দ্ধিত হইয়া এক একটী মণ্ডলী সামাজিক শক্তির এক একটী উৎস বা কেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইল এবং তাহাদের সমুদয় কার্য্য ও সকল প্রকার সামাজিক বিধি ব্যবস্থা সামরিক প্রয়োজনের দ্বারা নিয়মিত হইতে লাগিল। ইহাও স্বাভাবিক। এখনকার সামরিক আইন যেমন অপর আইন হইতে বিভিন্ন, তেমনি সেই আদিম সমাজের সামাজিক বিধি ব্যবস্থা সুসভ্য সময়ের বিধি ব্যবস্থা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ দুইটি বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রথম, অধিকাংশ প্রাচীন সমাজে বিকলাঙ্গ ও জন্মরুগ্ন শিশুদিগকে হত্যা করিবার নিয়ম ছিল এরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার যুক্তি সহজেই অনুমান করা যায়। সমাজপতিরা ভাবিতেন যাহারা বাঁচিয়া থাকিয়া যুদ্ধবিগ্রহের সময় কাজে লাগিবে না, অস্ত্র ধরিতে পারিবে না, শত্রুহস্ত হইতে আপনাদিগকে বাঁচাইতে পারিবে না, প্রত্যুত সমাজের উপরে ভারস্বরূপ হইবে, অপর লোকের শক্তি ও সময় অধিকার করিবে, তাহাদিগকে জীবিত রাখিবার প্রয়োজন কি? দ্বিতীয়, প্রাচীন সমাজ সকলের বহুবিবাহ প্রথাও বোধ হয় অনেকটা সামরিক কারণেই ঘটিয়া থাকিবে। কারণ যে মণ্ডলী মধ্যে নিরন্তর যুদ্ধবিগ্রহ ও তজ্জনিত সামাজিক বিপ্লব ঘটিয়া থাকে, তাহাতে নারীগণকে নিরন্তর বিপদাপন্ন হইতে হয়। সুতরাং সে মণ্ডলী মধ্যে নারীগণ স্বভাবতঃ বিক্রমশালী পুরুষকেই আশ্রয় করিতে চায়; এবং বলবান্ পুরুষেরাও অনেক সময়ে কর্ত্তব্যবোধে বহুসংখ্যক নারীকে নিজ আশ্রয়ে লইয়া থাকে। ইতিবৃত্তে দেখিতে পাই যে মহাপুরুষ মহম্মদের সমকালে আরবদেশে এই কারণেই বহুবিবাহের বহুল প্রচার ছিল। তবেই দেখা যাইতেছে, একমাত্র সামরিক অভাব ও সামরিক প্রয়োজনের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই প্রাচীন সমাজ সকলের অনেক বিধিব্যবস্থা রচিত হইয়াছিল।

যে সামরিক প্রয়োজন হইতে ঐ সকল বিধিব্যবস্থার অভ্যুদয়, সেই সামরিক প্রয়োজন হইতেই রাজার সৃষ্টি ও প্রজার ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতার বিলোপ। আদিম বর্ব্বরসমাজ যখন মণ্ডলীবদ্ধ হইয়া সমরে প্রবৃত্ত হইত, তখন যে প্রতিভাশালী নেতা নিজ শৌর্য্য বীর্য্য ও সমরকুশলতা প্রভৃতির গুণে নিজ মণ্ডলীকে জয়শ্রী দিতে পারিতেন, তাঁহারই প্রভাব সেই মণ্ডলীমধ্যে অদ্বিতীয় হইয়া উঠিত। এই প্রভাবশালী

নেতৃগণ মণ্ডলীর শক্তির সহায়তা পাইয়া ব্যক্তিগত শক্তিকে একেবারে পরাস্ত ও অভিভূত করিয়া আপনাপন শক্তিকে অবিসম্বাদিত ও অক্ষুণ্ণ করিয়া লইতেন। ইহাই মানব ইতিবৃত্তে রাজশক্তির প্রতিষ্ঠার মূল কারণ। যে শক্তি ও সম্পদ এক হস্তে প্রভূত পরিমাণে সঞ্চিত হইত, তাহা কালক্রমে উত্তরাধিকারিতাসূত্রে স্বীয় স্বীয় বংশমধ্যে নামিয়া যাওয়া কিছু অধিক কথা নহে। তাহাই সে কালের নিয়ম ছিল।

আদিম বর্ব্বর মণ্ডলীসকলের সামরিক প্রবৃত্তি হইতেই যেমন রাজা ও রাজশক্তির অভ্যুদয়, তেমনি তাহা হইতেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার বিলোপ। সমরে প্রবৃত্ত হইতে হইলে, শত্রুহস্ত হইতে আত্মরক্ষার্থ দলবদ্ধ হইতে হইলে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও স্বাতন্ত্র্য প্রবৃত্তিকে খর্ব্ব করিতে হয়, নতুবা সমর চলে না। সুতরাং অতি আদিম কাল হইতেই সামরিক প্রয়োজন বশতঃ মানবের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যপ্রবৃত্তি খর্ব্ব হইতে আরম্ভ হয়। বহু বহু শতাব্দী নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য প্রবৃত্তি বিলোপ করিতে অভ্যস্ত হওয়াতে অবশেষে দলপতি বা রাজার নিগড়ে গলদেশ অর্পণ করা সাধারণ প্রজাবৃন্দের পক্ষে সহজ হইয়া আসে। ক্রমে রাজশক্তির সম্মুখে প্রজাশক্তির দাঁড়াইবার ক্ষমতা বিলুপ্ত হইয়া যায়। সর্ব্বদেশেই এই দশা ঘটে। ইহার উপরে ভারতবর্ষে জাতিভেদ প্রথা প্রতিষ্ঠিত হওয়াতে সেই স্বাতন্ত্র্যপ্রবৃত্তিকে আরও খর্ব্ব করিয়াছে। জাতিভেদ প্রথা স্বজাতীয়গণের হস্তে এমন একটী শক্তি, এমন একটা অস্ত্র দিয়াছে, যাহা স্বজাতীয়গণ দলবদ্ধ হইয়া প্রয়োগ করিলেই ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য প্রবৃত্তিকে একেবারে দলন করিতে পারেন। সে শক্তির সমক্ষে বিদ্রোহী ভাবে দণ্ডায়মান হওয়া অল্পসংখ্যক ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব। সুতরাং সমাজের অঙ্গীভূত প্রত্যেক ব্যক্তিই অপর দশজনের ভয়ে জড়সড়। সকলেরই স্বাধীন চিন্তা ও কার্য্যের প্রসার সঙ্কুচিত। এইরূপে এদেশে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য-প্রবৃত্তি নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিলে হয়। তাহার ফলস্বরূপ প্রতিভা, মৌলিকতা, উদ্যোগ, বাণিজ্যাদিতে সাহস ও উদ্ভাবনশীলতা প্রভৃতি গুণ জাতীয় চরিত্র হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। এইটাকে জাতিভেদ প্রথার সুমহৎ সামাজিক অনিষ্টফল বলিয়া গণনা করা যাইতে পারে। প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ একটা বিষয় পরিষ্কার রূপে বুঝিয়াছিলেন এবং তদনুরূপ বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সেটা এই; ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য-প্রবৃত্তিকে সংযত করিয়াই সামাজিক শৃঙ্খলা রাখিতে হইবে। রাজনীতিতে প্রজাকে রাজার অধীন করিতে হইবে, সামাজিক জীবনে ব্রাহ্মণেতর জাতিসকলকে ব্রাহ্মণের অধীন করিতে হইবে, নারীকে সম্পূর্ণরূপে পুরুষের অধীন করিতে হইবে এবং ধর্ম্মজীবনে মানুষকে শাস্ত্র ও গুরুর বশবর্ত্তী করিতে হইবে। ইহা পরিষ্কাররূপে বুঝিয়াই তাঁহারা তদনুরূপ বিধিব্যবস্থা স্থাপন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সে বিষয়ে তাঁহাদের মনে দ্বিধা বা বিতর্ক কখনও উৎপন্ন হয় নাই। রাজা ভিন্ন রাজ্য থাকিতে পারে না, ব্রাহ্মণশক্তি ভিন্ন সমাজ থাকিতে পারে না, নারীকে পুরুষের অধীন করা ভিন্ন গৃহ পরিবার থাকিতে পারেনা, এবং শাস্ত্র ও গুরুর আনুগত্য ভিন্ন ধর্ম্মসাধন হইতে পারেনা, এগুলি তাঁহাদের পক্ষে স্বতঃসিদ্ধ সত্যরূপে দাঁড়াইয়াছিল।

কিন্তু বর্ত্তমানকালে বাস্তব ঘটনা পূর্ব্বোক্ত সংস্কারগুলির বিরুদ্ধে যাইতেছে; বিপরীত কথা প্রতিদিন প্রমাণিত হইতেছে। প্রাচীন রোম ও গ্রীসের কথা তুলিব না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে আমেরিকার যুক্তরাজ্যের অভ্যুদয় এবং বিগত শতাব্দীর শেষভাগে ফরাসি প্রজাতন্ত্রের অভ্যুদয় সপ্রমাণ করিয়াছে যে রাজা ভিন্নও রাজ্য থাকিতে পারে। এতদ্ভিন্ন ইউরোপের যে যে দেশে প্রাচীন প্রথানুসারে রাজা এখনও আছে, সে সকল দেশেও রাজশক্তি বহুল পরিমাণে প্রজাশক্তির দ্বারা নিয়মিত হইয়াছে। কেবল তাহা নহে; এবিষয়ে চিন্তা রাজ্যে এতদূর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে যে এখন রাজনীতিজ্ঞদিগের স্থির বিশ্বাস যে রাজ্যের শাসনশক্তি উপর হইতে না নামিয়া নিম্ন হইতেই উঠা উচিত, অর্থাৎ শাসনকার্য্যের উপরে প্রজাসাধারণের শক্তি থাকিলেই রাজ্য সুরক্ষিত হইবে। যে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্যপ্রবৃত্তিকে দমনে রাখিবার জন্য রাজার সর্ব্বময় কর্তৃত্বের সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই স্বাতন্ত্র্য-প্রবৃত্তিকে নিজ শক্তি প্রয়োগ করিতে দিয়া দেখা গিয়াছে যে তদ্দ্বারা রাজ্যের কল্যাণই হয়। কি সুমহৎ পরিবর্ত্তন!

সামাজিক বিষয়েও এই প্রকার পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ভারতবর্ষের প্রাচীন শাস্ত্রকারগণের বিশ্বাস ছিল, শূদ্র

প্রভৃতি জাতিকে সম্পূর্ণরূপে দাসত্বে রাখিতে হইবে, উচ্চজ্ঞান তাহাদের জন্য নহে, সামাজিক কোনও শক্তি বা অধিকার তাহাদের জন্য নহে, ব্রাহ্মণ সমাজের নিয়ন্তা, গুরু ও উপদেষ্টা, এ নিয়মের ব্যাঘাত করিলে

"উৎসীদেয়ুরিমে লোকাঃ কুলধর্ম্মাশ্চ শাশ্বতাঃ।"

"এই সমুদয় লোকস্থিতি ভগ্ন হইয়া যাইবে, এবং প্রাচীন কুলধর্ম্ম সকল বিনষ্ট হইবে"।

তাঁহারা ব্রাহ্মণদিগকে সমাজের নিয়ন্তা দেখিয়া দেখিয়া এরূপ অভ্যস্ত হইয়াছিলেন, যে শূদ্রদিগকে জ্ঞানে ও পদে উচ্চ করিলে যে সমাজ থাকিতে পারে, তাহা মনে কল্পনাও করিতে পারিতেন না।

সেইরূপ ইউরোপখণ্ডেও ধনিগণ মনে করিতেন, শ্রমজীবীদিগকে শিক্ষা ও রাজনৈতিক শক্তি দিলে সমাজ উৎসন্ন যাইবে। আমেরিকা দেশে ক্রীতদাসদিগকে স্বাধীনতা দিবার প্রস্তাব উঠিলে দাসত্ব প্রথার পক্ষীয়গণ তর্ক করিয়াছিলেন যে দাসদিগকে স্বাধীনতা দিলে সমাজ-শৃঙ্খলা একেবারে ভগ্ন হইয়া যাইবে। কিন্তু ফলে দেখা গিয়াছে যে রুসিয়ার সার্ফদিগকে ও আমেরিকার দাসদিগকে স্বাধীনতা দিয়া এমন কোনও অনিষ্ট ফল ফলে নাই, যাহা দেখিয়া অনুতপ্ত হইতে হয়; বরং তদ্দ্বারা উক্ত উভয় দেশ অনেকাংশে লাভবান হইয়াছে, এবং ইহা নিঃসংশয়ে বলিতে পারা যায়, যে যত দিন যাইবে ততই তাহার ইষ্ট ফল আরও দেখা যাইবে। ইংলণ্ড জার্ম্মানি ও ফ্রান্সের শ্রমজীবীদিগকে শিক্ষা ও রাজনৈতিক অধিকার দিয়া ঐ সকল দেশে অভূতপূর্ব্ব উন্নতি দৃষ্ট হইয়াছে; এবং তাহারা সামাজিক বিশৃঙ্খলা উৎপন্ন করা দূরে থাকুক, সর্ব্ববিধ সামাজিক উন্নতির সহায় হইয়াছে।

ভারতবর্ষে আমরা কি দেখিতেছি? মুসলমান রাজাদিগের সময় হইতে জাতিভেদের প্রকোপ শিথিল হইতেছে। ইংরাজরাজ্যে এই সাম্য-বিধান ক্রিয়া আরও প্রবল বেগে চলিতেছে। তাহার ফলস্বরূপ, যে সকল সম্প্রদায় প্রাচীন কালে ব্রাহ্মণদিগের পদদলিত হইয়া অতি ম্লান ভাবেই ছিল, তাহারা এখন মাথা তুলিয়া উঠিবার অবসর পাইয়াছে। তাহার ফল কি মন্দ হইয়াছে? অকপটে বল, রাজেন্দ্রলাল মিত্র, কৃষ্ণদাস পাল, মহেন্দ্রলাল সরকার, রমেশচন্দ্র দত্ত প্রভৃতি নেতৃগণ প্রতিষ্ঠাভাজন হওয়াতে দেশ লাভবান্ বা ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে? ইঁহারা সম্মান প্রাপ্ত হওয়াতে সমাজের কি ক্ষতি হইয়াছে? প্রাচীন সংস্কার যে কিরূপ অযৌক্তিক তাহা আমরা ইঁহাদের দৃষ্টান্ত দ্বারাই বুঝিতে পারিতেছি।

আর একটী বিবেচ্য বিষয়, নারীগণের সামাজিক শক্তি ও স্বাধীনতা। এ প্রশ্নের ভাল মন্দ বিচার করিবার সময় এখনও এদেশে উপস্থিত হয় নাই। কিন্তু ইংলণ্ডে ও আমেরিকাতে বিগত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে নারীগণের কার্য্যক্ষেত্র বহুল পরিমাণে বিস্তৃত হইয়াছে। নারীগণ প্রথমে যখন ঐ সকল ক্ষেত্রে পদার্পণ করেন, তখন প্রাচীনের পক্ষপাতিগণ মহা আর্ত্তনাদ করিয়া বলিয়াছিলেন, নারীগণ ঐ সকল পথে গেলে, নারীপ্রকৃতির কোমলকান্তগুণাবলী বিনষ্ট হইবে, গৃহপরিবারে রমণীদিগের মন থাকিবে না, গার্হস্থ্য ও সামাজিক নীতি রক্ষা পাইবে না, ইত্যাদি, ইত্যাদি। কিন্তু কার্য্যকালে দেখা গিয়াছে যে নারীগণ সামাজিক কার্য্যে হাত দেওয়াতে ও আপনাদের শক্তি প্রয়োগ করাতে মহোপকার সাধিত হইয়াছে। বিগত ত্রিশ বৎসরের মধ্যে আমেরিকার রমণীগণ পুরুষদিগের পানাসক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়া সুরাপানকে বহুপরিমাণে সংযত ও পুরুষদিগের স্বভাব চরিত্রকে অনেক পরিমাণে উন্নত করিয়া আনিয়াছেন। ইংলণ্ডের রমণীগণ নিজ শক্তি প্রয়োগ করিয়া কি করিয়াছেন তাহা দেখিবার জন্য বহু অন্বেষণ করিতে হইবে না। সুপ্রসিদ্ধ আইরিশ নেতা চার্লস পার্ণেল ও সার চার্লস ডিল্‌ককে তাঁহারা কিরূপ জব্দ করিয়াছেন, তাহা উল্লেখ করিলেই যথেষ্ট হইবে। যে পার্ণেল আয়র্লণ্ডের অনভিষিক্ত রাজা বলিয়া পরিগণিত হইতেন, সেই পার্ণেল নারীদিগের মুষ্ট্যাঘাত সহ্য করিয়া দাঁড়াইতে পারিলেন না! যে চার্লস ডিল্ক্‌ একদিন সর্ব্বপ্রধান রাজমন্ত্রী হইতে পারেন এরূপ কথা উঠিয়াছিল, সেই ডিল্ক্‌ নারীগণের অর্দ্ধচন্দ্র খাইয়া কোথায় নামিয়া গেলেন! নারীশক্তিপ্রয়োগের ফল কি তাহা সকলেই দেখিতে পাইতেছেন। সচরাচর লোকের মুখে শুনিতে পাই, যে তাঁহারা ভয় করেন যে নারীগণকে সামাজিক শক্তি ও স্বাধীনতা দিলে সামাজিক পবিত্রতা থাকিবে না। নারীচরিত্রের এই অবমাননা আমার সহ্য হয় না। ইহার বিপরীত কথা আমি সত্য বলিয়া মনে করি। নারীগণকে উন্নত কর, জ্ঞান ও সদনুষ্ঠানে অংশী কর, তাঁহাদের

অন্তরে আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান ফুটিতে দেও, তাঁহাদিগকে অবাধে নিজ নিজ ক্ষেত্রে কাজ করিতে দেও, দেখিবে গৃহপরিবারে শান্তি, সমাজে পবিত্রতা, পুরুষচরিত্রে সাধুতা প্রতিষ্ঠিত হইবে। গৃহপরিবার রমণীর স্বাভাবিক স্থান, সুতরাং রমণী স্বীয় শক্তি প্রয়োগ করিবার অবসর পাইলেই গৃহ-পরিবারকে শান্তি ও পবিত্রতার আলয় করিবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হইবেন, ইহা অসংশয়ে বলা যায়। প্রকৃত ঘটনাও তাহার প্রমাণ দিতেছে।

এইত গেল যে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে তাহার বিবরণ;—এখন এক নূতন প্রশ্ন মানবমনে জাগিয়াছে। তাহা এই; রাজ-নীতিতে এবং সামাজিক জীবনে যেমন ব্যক্তিগতস্বাতন্ত্র্য দিয়াও অনিষ্ট না হইয়া ইষ্টই হইয়াছে, ধর্ম্মসম্বন্ধেও কি সেই-রূপই হওয়া সম্ভব? ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রাচীন কালের লোকের সংস্কার এই ছিল, এবং এখনও অনেকের এই সংস্কার আছে, যে অভ্রান্ত শাস্ত্র ও অভ্রান্ত উপদেষ্টা ভিন্ন ধর্ম্ম জনসমাজে তিষ্ঠিতে পারে না। তাঁহারা বলেন, মানবাত্মার মুক্তির ন্যায় গুরুতর বিষয়ের ভার কি মানবের ভ্রান্তিশীল বুদ্ধির উপরে দেওয়া যায়? এই কারণে মানবাত্মার স্বাধীনতাকে সংকুচিত করিবার উদ্দেশ্যে নিগড়ের পর নিগড় সৃষ্টি করা হইয়াছে। কিন্তু যে জন্য নিগড় সৃষ্টি সে উদ্দেশ্য সফল হয় নাই; অর্থাৎ মানুষকে একভাবাপন্ন করিতে পারা যায় নাই। হিন্দুগণ সকলেই বেদকে অভ্রান্ত বলিয়া স্বীকার করেন, সকলেই শ্রুতি স্মৃতির অনুবর্ত্তী, অথচ তাঁহাদের মধ্যে কত সম্প্রদায় সৃষ্ট হইয়াছে তাহা একবার অক্ষয়কুমার দত্তের ভারতবর্ষীয় উপা-সক সম্প্রদায় নামক গ্রন্থ উদ্‌ঘাটন করিয়া দেখ। খ্রীষ্টীয়গণ বাইবেলকে অভ্রান্ত শাস্ত্র বলিয়া মানেন, অথচ এক ইংলণ্ডেই দুই শত প্রকার খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায় রহিয়াছে। ফলতঃ অভ্রান্ত ঈশ্বরদত্ত গ্রন্থ দিলে কি হইবে, তাহার ব্যাখ্যাকর্ত্তা ত ভ্রান্তি-শীল মানববুদ্ধি? তবেই বিচারাসনে মানব-বুদ্ধিকে বসান হইল।

এখন প্রশ্ন এই, অভ্রান্ত শাস্ত্র ও অভ্রান্ত উপদেষ্টা ব্যতীত কি ধর্ম্ম তিষ্ঠিতে পারে? তুমি আমি স্বাধীনভাবে চিন্তা করিব অথচ ধর্ম্মসমাজ থাকিবে, ধর্ম্মের বিধিব্যবস্থা সকল থাকিবে, একি সম্ভব? আমাদের স্বাধীন চিন্তার প্রভাবে ধর্ম্মসমাজ ও ধর্ম্মের ভিত্তিসকল কি ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইবে না? উত্তরে বক্তব্য এই, আমরা নৈসর্গিক ধর্ম্মে বিশ্বাস করি, আমরা মনে এমন কোনও ভয় রাখি না। বিষয়ব্যাপারে তুমি আমি প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে চিন্তা করি, অথচ বিষয়বাণিজ্য, আইন আদালত, প্রণয় পরিণয়, গৃহস্থালি সমুদয় চলিতেছে; কোথাও ভাঙ্গে কোথাও গড়ে; কেহ উচ্ছৃঙ্খল হয়, দশজনে তাহাকে শৃঙ্খলিত করে; এই ব্যাপার প্রতিদিন চলিতেছে; কৈ মানু-ষের স্বাধীন চিন্তার প্রভাবে জনসমাজত টুক্‌রা টুক্‌রা হইয়া যাইতেছে না; ধর্ম্মের বেলাই এত ভয় পাও কেন? ধর্ম্মের কি একজন রক্ষাকর্ত্তা নাই? মানুষ, তুমি কি মনে কর, তুমি একলাই এই রঙ্গভূমির একমাত্র নট, ইহার অধিকারী পশ্চাতে নাই? তা কেন ভাব? ধর্ম্মকে রাখিবার জন্য এক জন আছেন। যেমন এই পৃথিবীর প্রত্যেক পর-মাণুতে কেন্দ্রাপসারিণী ও কেন্দ্রাভিসারিণী দুই প্রকার গতি আছে, এক গতি কেন্দ্র হইতে প্রত্যেক পরমাণুকে দূরে লইতে চাহিতেছে, অপর গতি কেন্দ্রাভিমুখে লইতে চাহিতেছে; যেমন মানবহৃদয়ে ঈর্ষ্যা বিদ্বেষ, প্রতিহিংসা-প্রিয়তা প্রভৃতি আছে, যাহা পরস্পর হইতে পরস্পরকে দূরে লইতে চায়, আবার স্নেহ প্রণয়, মিত্রতা, প্রীতি, শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা প্রভৃতিও আছে, যাহা পরস্পরকে পরস্পরের সহিত বাঁধিতে চায়; তেমনি পূর্ণ রূপে চিন্তা করিয়া দেখ, মানবের স্বাধীন চিন্তার সঙ্গে ভক্তিও আছে, যাহা সাধুদের সঙ্গে ও ভগবানের সঙ্গে মানুষকে বাঁধিয়া রাখিতেছে। মানুষ-কে বাঁধিবার জন্য অভ্রান্ত গুরু বা অভ্রান্ত শাস্ত্রের প্রয়োজন নাই।

দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হই, যে ইউরোপের অনেক চিন্তাশীল ও বিচক্ষণ ব্যক্তিও মনে করেন যে মানবের ধর্ম্ম-জীবনের জন্য একটী বিশেষ আদর্শ চাই, একটী বিশেষ ছাঁচ চাই, যাহাতে সকল দেশের, সকল মানুষের জীবনকে ঢালিতে হইবে। তাঁহারা ইংরাজীতে একটী কথা সৃষ্টি করিয়াছেন Exemplar, একটী Exemplar চাই। তাঁহাদের মতে যীশু সেই Exem-plar। কিন্তু কেন যে একটী বিশেষ ছাঁচের প্রয়োজন যাহাতে সমস্ত মানব-জাতির সকল নরনারীর সকলের প্রকৃ-তিকে ঢালিতে হইবে, তাহা কেহ প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করেন নাই। বিষয়বাণিজ্যে একটি বিশেষ আদর্শের প্রয়োজন নাই, বিজ্ঞানরাজ্যে একটি বিশেষ আদর্শের প্রয়ো-

জন হয় নাই, মানবজীবনের কোনও বিভাগে একটি বিশেষ আদর্শের প্রয়োজন হয় নাই, কেন কেবল আধ্যাত্মিকতাতেই আমাদিগের সকলকে একটী বিশেষ ছাঁচে ঢালা প্রয়োজন হইতেছে, তাহা কেহই বুঝাইবার চেষ্টা করেন নাই। ধর্ম্মজীবনের এক এক ভাবের এক এক আদর্শ ত আমাদের সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন,—বুদ্ধের বৈরাগ্য, যীশুর প্রেম, মহম্মদের বিশ্বাস, চৈতন্যের ব্যাকুলতা ও ভক্তি ত আমাদের সমক্ষে রহিয়াছে। কেন সে সকল ঘুচাইয়া একটী বিশেষ আদর্শকে খাড়া করিতে হইবে, তাহার কারণ অনেক চিন্তা করিয়াও বুঝিতে পারি নাই। বরং দেখিতেছি বিচিত্রতা সৃষ্টির নিয়ম,—ঈশ্বর জগতের ইতিবৃত্তে সকল ভাবই অভিব্যক্ত করিয়াছেন; আমাদের শিক্ষার জন্য সকল প্রকার নমুনাই রাখিয়াছেন; সকল সাধুর চরণে আমাদিগকে বসিতে হইবে, কেহই আমাদের ত্যজ্য বা দ্বেষ্য নহেন। বিশেষ আদর্শ, বিশেষ নমুনা, বিশেষ ছাঁচ এসকল প্রাচীন সংস্কারের ভগ্নাবশেষ মাত্র।

মানবাত্মার স্বাধীনতাকে ভয় করিও না। তাহা মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির পরিপন্থী নহে। অনেক সময়ে মানুষ বিনয় হইতেই শাস্ত্র বা গুরুর চরণে আত্মসমর্পণ করে। যে ভাবে কবি লিখিয়াছেন:—

"আর আপন ভাবনা পারিনা ভাবিতে
তুমি লহ মোর ভার।"

এ সেই ভাব। মানুষ আপনার প্রবৃত্তির বশবর্ত্তী হইয়া পাপপঙ্কে ডুবিয়া, ভুগিয়া, কাঁদিয়া, শেষে বলে, "যে স্বাধীনতাতে আমাকে পাপে ডুবাইয়াছে তাহা আর চাহি না; গুরো! আপনি আমাকে যে পথে যাইতে বলিবেন সেই পথে যাইব; এই নিজের হাত পা বাঁধিলাম, এই বিল্বমঙ্গলের ন্যায় নিজ চক্ষু অন্ধ করিলাম, করিয়া আপনার হাতে আপনাকে দিলাম, আপনি আমাকে লইয়া যাউন"। এ বিনয়কে আমরা শ্রদ্ধা করি, কিন্তু বিনয়ের শেষ ফল দেখিয়া শোক করি।

ঈশ্বর মানব-প্রকৃতিতে যাহা দিয়াছেন তাহার কিছুই মানবের আধ্যাত্মিক উন্নতির বিরোধী নহে, গোড়ের উপরে এই একটা স্থূল সত্য মনে রাখিতে হইবে। স্বয়ং ঈশ্বর চান না যে আমরা অন্ধ হইয়া তাঁহার অনুসরণ করি। এই জন্যই মানবাত্মাকে স্বাধীন বিচারের শক্তি দিয়াছেন। নিশ্চয় জানিও এই রাস্তা দিয়াই মানবের স্বর্গধামে যাইবার পথ।

এত কথায়ও হয়ত অনেকের মনের সন্দেহ সম্পূর্ণ নিরস্ত হইবে না। তবু হয়ত তাঁহাদের মন বলিবে, প্রত্যেক মানুষকে স্বাধীনভাবে চিন্তা করিতে দিয়া কি সমাজমধ্যে ধর্ম্ম সাধনকে প্রতিষ্ঠিত রাখা যাইবে? ধর্ম্মসাধনের প্রধান লক্ষ্য যাহা তাহা কি সিদ্ধ হইবে? ধর্ম্মসাধনের প্রধান লক্ষ্য কি? প্রধান লক্ষ্য দুই। প্রথমে, প্রত্যেক ব্যক্তির অন্তরে পুণ্যে রুচি ও পাপে অরুচি উৎপন্ন করা, ঈশ্বর প্রেম ও নর-প্রেম উদ্দীপ্ত করা, বৈরাগ্য ও স্বার্থনাশের প্রবৃত্তি প্রবল করা; দ্বিতীয়, সমাজকে সুরক্ষিত ও সর্ব্ববিধ উন্নতির অনুকূল করা।

ধর্ম্মকে সাধন করিবার সময় পূর্ব্বোক্ত উভয় ক্ষেত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়। প্রথম ভাবিতে হয়, ইহা কিরূপে প্রত্যেক মানবের নিভৃত হৃদয়কন্দরে উদ্দীপনা (inspiration) রূপে বাস করিবে; দ্বিতীয় কিরূপে জনসমাজমধ্যে শাসনশক্তি (social discipline) রূপে প্রতিষ্ঠিত হইবে। ইহা সকলেই অনুভব করিবেন যে এক অপরের পোষক ও অনুকূল। ধর্ম্মকে কেবল মাত্র ব্যক্তিগত হৃদয়ের উদ্দীপনা করিলেও চলিবে না, আবার কেবল মাত্র সামাজিক শক্তি করিবার চেষ্টা করিলেও চলিবে না। এবিষয়ে আমরা প্রাচ্য প্রতীচ্যের প্রভেদ দেখিতে পাই। ভারতীয় জ্ঞানিগণ ধর্ম্মকে প্রধানতঃ নিভৃত হৃদয়ের উদ্দীপনা রূপে ধারণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন; অপর দিকে প্রতীচ্য কর্ম্মিগণ ইহার সামাজিক দিক লইয়াই ব্যস্ত।

আমাদিগকে ধর্ম্মসাধনে উভয় পথকে সম্মিলিত করিতে হইবে। এক দিকে শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনাদির দ্বারা নিজ নিজ অন্তরে আত্মা পরমাত্মার যোগ প্রতীতি করিতে হইবে। যতই তাঁহার সত্তা ও সান্নিধ্যজ্ঞান উজ্জ্বল হইবে ততই আত্মা এক নব উদ্দীপনা অনুভব করিবে। অপর দিকে আবার গৃহপরিবারে শাস্ত্রপাঠ, সদালোচনা, সাধুচরিতানুশীলন, স্তুতি, বন্দনা, কীর্ত্তনাদির রীতি প্রবর্ত্তিত রাখিতে হইবে। তাহা হইলে ধর্ম্ম সামাজিক শক্তিরূপে বাস করিয়া সামাজিক জীবনকে নিয়মিত করিবে।

মানব চিন্তাকে স্বাধীন ও উন্মুক্ত রাখিয়াও কেন ধর্ম্মকে উক্ত উভয় ভাবে সাধন করা কঠিন, তাহা আমরা হৃদগত

করিতে পারি না। যখনি যে পথে অগ্রসর হইতেছি, তখনি কোনও বিঘ্ন দেখিতেছি না। যাঁহারা সন্দেহ ও আশঙ্কা করিতেছেন, অথবা কঠিনতা অনুভব করিতেছেন, তাঁহাদের প্রধান কারণ বোধ হয় এই যে ধর্ম্মের নৈসর্গিকতাতে তাঁহাদের তাদৃশ বিশ্বাস নাই। ধর্ম্মের যে একটা নৈসর্গিক ভিত্তি আছে, যদুপরি সমুদয় গুরু, সমুদয় শাস্ত্র, সমুদয় বিধিব্যবস্থা দণ্ডায়মান, তাহা তাঁহারা অনুভব করেন না। মানবের বিচারশক্তির ন্যায় মানব প্রকৃতির একটা স্বাভাবিক রক্ষণশীলতাও আছে, যাহা জনসমাজকে ও ধর্ম্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখিতেছে ও চিরদিন রাখিবে, তাহাতে কিছু মাত্র সন্দেহ নাই। যেমন তোমার হাওয়াই যেদিকেই ছোড়, যতদূরই তোলো না কেন, ধরাপৃষ্ঠে তাহাকে আসিতেই হইবে, মানুষ স্বাধীনচিন্তারাজ্যে যতই ছোট না কেন, যে দিকে হাত পা ছড়াইতে ইচ্ছা হয় ছড়াও না কেন, চরমে সেই ধর্ম্মাবহ পুরুষের মঙ্গলকর নিয়মের মধ্যে পড়িতেই হইবে। বরং ধর্ম্মবিষয়ে মানুষ স্বাধীনভাবে চিন্তা করে, ইহাই প্রার্থনীয়। কারণ যে সত্য মানুষ নিজে খুঁজিয়া লাভ না করে সে সত্য তার নিজের নয়। যে ধর্ম্ম নিজের নয়, তাহা মানবাত্মাকে মুক্তি দিতে পারে না। অতএব নির্ভয়ে মুক্ত ভাবে ধর্ম্মকে সাধন কর।

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ-পরিচয়।

[আমরা "প্রবাসী"তে সমালোচনার্থ প্রাপ্ত সমুদয় গ্রন্থের পরিচয় দিতে পারিব না। পক্ষান্তরে, সমালোচনার জন্য পাই নাই, মধ্যে মধ্যে এরূপ গ্রন্থেরও পরিচয় দিব। আশা করি, সমালোচনার জন্য অনুরোধ উপরোধ করিয়া কেহ আমাদিগকে পত্র লিখিবেন না। পুস্তকবিশেষের সমালোচনা হইবে কিনা, বা কোন্ সংখ্যায় হইবে, আমরা এবম্বিধ প্রশ্নের কোন উত্তর দিতে অসমর্থ। "প্রবাসী" সম্পাদক।]

"সরমার সুখ। গীতি-কবিতা, পরিণয়-কাহিনী প্রভৃতি প্রণেতা শ্রীভবানীচরণ ঘোষ প্রণীত। কলিকাতা, সান্যাল এণ্ড কোম্পানী দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য—ফ্যান্সি কাগজের মলাট একটাকা; উৎকৃষ্ট বিলাতি বাঁধাই পাঁচ সিকা।"

সরমা বর্দ্ধমান জেলার কাঞ্চনপুর গ্রামের কুলীনকন্যা। তাহার পিতার ইচ্ছা অশীতিপর বৃদ্ধ বহুবিবাহিত এক কুলীনের সহিত তাহার বিবাহ দেন। ভ্রাতা নগেন্দ্রনাথ কলিকাতায় কলেজে পড়েন। তাঁহার ইচ্ছা শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ বন্ধু সুরেশচন্দ্রের সহিত তাহার বিবাহ হয়। সুরেশচন্দ্র নগেন্দ্রদের বাড়ী কখন কখন বন্দের সময় আসিতেন। সরমার প্রতি তাঁহার মন আকৃষ্ট হইয়াছিল। সরমাও মনে মনে বোধহয় সুরেশের প্রতি অনুরক্ত হইয়াছিল। তাহার সেরূপ বয়স হইয়াছিল। নগেন্দ্র পিতার সহিত অনেক তর্কবিতর্ক করিয়াও তাঁহার প্রতিজ্ঞা টলাইতে পারিলেন না। নগেন্দ্র ও সরমার মা ছিলেন না। বিমাতা ছিলেন। উপায়ান্তর না দেখিয়া নগেন্দ্র পিতা ও বিমাতার অজ্ঞাতসারে সরমাকে কলিকাতা লইয়া যাইতে চাহিলেন। উদ্দেশ্য সুরেশের সহিত বিবাহ দেওয়া। সরমা লোকলজ্জা ও নারীসুলভ লজ্জাবশতঃ যাইতে রাজী হইল না। সেই অশীতিপর বৃদ্ধের সহিত তাহার বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের অল্প দিন পরেই সে বিধবা হইল। বিমাতা ও বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃবধূর উৎপীড়ন ও গঞ্জনা বাড়িয়া চলিল। এমন সময়ে গ্রামের জমীদার অনন্ত বাবুর অনুগৃহীতা তেলিবৌ সরমাদের বাড়ী যাতায়াত আরম্ভ করিল। সে মিষ্ট কথা দ্বারা সরমার কতকটা বিশ্বাসভাজন হইল। সরমা তাহার হাতে ডাকে দিবার জন্য দাদার নামে এক খানা চিঠি দিল। চিঠি ডাকবাক্সে পড়িবার আগে অনন্তবাবুর হাতে পৌঁছিল। পোষ্টমাষ্টার অনন্তবাবুর আশ্রিত ব্যক্তি। বন্দোবস্ত হইল, সরমা যত চিঠি লিখিবে, বা তাহার নামে যত চিঠি আসিবে, সমুদয়ই আগে অনন্তবাবু পড়িবেন। সরমা দাদাকে লিখিয়াছিল, বাড়ীতে তিষ্ঠান অসম্ভব, ইত্যাদি। সুরেশচন্দ্র ও নগেন্দ্রনাথ এইরূপ পরামর্শ করিলেন যে পরীক্ষার পর নগেন্দ্র বাড়ী গিয়া পিতার অজ্ঞাতসারে ভগিনীকে কলিকাতা লইয়া আসিবেন। তথায় সুরেশের সহিত সরমার বিবাহ হইবে। তদনুসারে পরীক্ষার পর নগেন্দ্র বাড়ী গেলেন। সমুদয় বন্দোবস্ত ঠিক্। রাত্রিতে আহারাদি হইয়া গিয়াছে। এমন সময় পিতা ডাকিয়া নগেন্দ্রকে এক খানি বেনামী পত্র দেখাইলেন। পত্রে, নগেন্দ্র ভগ্নীর বিধবাবিবাহ দিবার জন্য তাহাকে গোপনে কলিকাতা লইয়া যাইবেন, ইত্যাদি

সংবাদ লেখা ছিল। পত্র পড়িয়া নগেন্দ্র স্তম্ভিত। পিতা-কর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়া নগেন্দ্র রাত্রেই গৃহত্যাগ করিয়া কলিকাতা গেলেন। পিতা সরমার সহিত দেখা করিতেও দিলেন না। এ দিকে বাক্যযন্ত্রণায়, লাঞ্ছনায়, সরমার প্রাণ ওষ্ঠাগত হইল। সুযোগ বুঝিয়া তেলিবৌ তাহাকে কলিকাতায় দাদার বাসায় পৌঁছাইয়া দিবে বলিয়া জোড়াসাঁকো-স্থিত অনন্তবাবুর পাপলালসাতৃপ্তিভবনে উপস্থিত করিল। তেলিবৌ তাহাকে সেখানে দুদণ্ড থাকিতেও কোন মতে রাজী করিতে পারিলনা। পাপীয়সী বিরক্ত হইয়া তাহাকে গৃহে বন্ধ করিয়া তাহার জলখাবার বন্দোবস্ত করিবার ব্যপদেশে বাহির গেল। সেই গৃহে পূর্ণানামে একটি স্ত্রীলোক থাকিত। অনন্তবাবু তেলিবৌয়ের সাহায্যে তাহার সর্ব্বনাশ করিয়াছিল। এখন সে আধপাগলী। পূর্ণা সরমার অবস্থা জানিল। সরমা তাহার হাতে কলেজষ্ট্রীটে দাদার বাসায় চিঠি দিল। দাদা ও সুরেশ আসিয়া সরমাকে সেই নরককুণ্ড হইতে উদ্ধার করিলেন। নগেন্দ্র সরমার কাছে সুরেশের সহিত বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। সমুদয় ঠিক হইয়া গেল। এমন সময় নগেন্দ্রের পিতা পূর্ব্বের মত আর একখানি বেনামী পত্র পাইলেন। তাহাতে সরমার কুলত্যাগ, জোড়াসাঁকোতে কুস্থানে অবস্থিতি, বিধবাবিবাহের প্রস্তাব, প্রভৃতির সংবাদ ছিল। পিতা সেই পত্র নগেন্দ্রকে পাঠাইয়া দিয়া লিখিলেন—"পাপীয়সী আমার কুলে কালি দিয়াছে; সে আমার কেহ নহে। যে তাহাকে আশ্রয় দিবে, সেও আমার কেহ নহে।" নগেন্দ্র চিঠিখানা পুড়াইয়া ফেলিতে চাহিলেন। কিন্তু দিয়াশলাইয়ের কাটি জ্বলিল না। নগেন্দ্র চিঠি খানা বাসায় এক যায়গায় লুকাইয়া রাখিলেন।

সুরেশ যে দিন সন্ধ্যার পর শুনিলেন যে নগেন্দ্র সরমার বিবাহে সম্মতিসূচক মনোভাব বুঝিয়াছেন, সেই দিন রাত্রে নিজের বাসায় ফিরিতেছেন, এমন সময় কে তাঁহার মাথা ফাটাইয়া দিয়া পলাইয়া গেল। হত্যাকারী ধরা পড়িল। সুরেশ অচেতনাবস্থায় বাসায় আনীত হইলেন। বহুকষ্টে তাঁহার চেতনা সঞ্চার হইল। তিনি পূর্ব্বেই মাকে সরমার সহিত নিজের বিবাহে তাঁহার সম্মতিভিক্ষা করিয়া পত্র লিখিয়াছিলেন। মা স্তম্ভিত হইয়া কি করিবেন ভাবিতেছিলেন; তৎপরদিন সুরেশের সংঘাতিক আঘাতপ্রাপ্তির সংবাদপূর্ণ নগেন্দ্রের লিখিত পত্র আসিল। মাতা তৎক্ষণাৎ কলিকাতা যাত্রা করিলেন। তথায় সরমার রূপে, কথায়, আচরণে মোহিত হইলেন। সুরেশ বাঁচিয়া উঠিলেন। মাতাকে আবার বিবাহের কথা বলিলেন। নানা কথার পর মা অনুমতি দিলেন।

সুরেশকে আঘাত করিয়াছিল, অনন্তবাবুর নিযুক্ত গুণ্ডা বিশে বাগদী। আদালতে তাহার অপরাধ প্রমাণিত হওয়ায় তাহার সাজা হইল। অনন্তবাবু জোড়াসাঁকোর বাড়ী হইতে ফেরার হইয়া নানা স্থানে ঘুরিয়া আগ্রায় ভিন্ন নাম ধরিয়া বাস করিতেছিল। ডিটেক্‌টিভের কৌশলে তাহার বাসা জানা পড়িল। পুলিশ তাহা ঘিরিল। অনন্ত পলাইবার চেষ্টায় গৃহের ছাদ হইতে লাফ দিতে গিয়া মাটীতে পড়িয়া প্রাণ হারাইল।

বিবাহের সমুদয় আয়োজন হইয়াছে; এমন সময় একদিন সরমা বাসাতে দাদার জিনিষপত্র গুছাইতে গুছাইতে ও পুস্তকাদি ঝাড়িতে ঝাড়িতে পিতৃলিখিত সেই পত্রটি পাইল। পড়িয়া তাহার হৃদয়ে যে ভীষণ ব্যথা লাগিল, তাহাতেই তাহার সাংঘাতিক জ্বর হইল। চিকিৎসার, সেবাশুশ্রূষার ত্রুটি হইল না। কিন্তু জীবনাশা রহিল না। একদিন সরমার অনুরোধে সুরেশ তাহার হস্তস্পর্শ করিলেন। চক্ষুমুদ্রিত করিয়া সরমা বলিল, "সুখ, কত সুখ"! সরমা বাঁচিল না।

ইহাই উপন্যাসখানির কাঠামো। আমরা ইহাকে একখানি উৎকৃষ্ট উপন্যাস বলিতে পারি। গ্রন্থকার আরও এরূপ উপন্যাস লিখিলে পাঠকবর্গের মনোরঞ্জন ও সমাজের উপকার করিতে পারিবেন। আমরা ইহা আগ্রহের সহিত আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছি। ইহার কোন পৃষ্ঠাই পড়িতে ক্লান্তি বোধ হয় না। গ্রন্থকারের ভাষা সরল ও সুরুচিসঙ্গত। তিনি পাঠকের কৌতূহল উদ্দীপ্ত করিতে ও তাহা অক্ষুণ্ণ রাখিতে জানেন। কৌলীন্যপ্রথার বিষময় ফল প্রদর্শন এখনও নিষ্প্রয়োজন নহে।

"বাজীরাও। শ্রীসখারাম গণেশ দেউস্কর প্রণীত। কলিকাতা। মূল্য বার আনা।" দেউস্কর মহাশয়ের এই পুস্তকখানি উৎকৃষ্ট হইয়াছে। ইহাতে পেশওয়ে বাজীরাওয়ের জীবনবৃত্তান্ত ব্যতীত, তাঁহার সময়ে ভারতবর্ষের অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহাও অবগত হওয়া যায়। ইংরাজীতে যাহাকে



রাজা রবিবর্ম্মা] অর্জ্জুন ও সুভদ্রা। [কর্ত্তৃক অঙ্কিত।

system of subsidiary alliance বলে, মহারাষ্ট্রবীরগণই যে তাহার প্রবর্ত্তক, লেখক তাহা প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহা চৌথাই বা চৌথপদ্ধতি নামে সুপরিচিত। অনেকের এখনও ধারণা আছে, যে মরাঠাগণ কেবল লুটপাট করিতেই দক্ষ ছিলেন; দেশোন্নতিকর সুশাসনপ্রথা প্রবর্ত্তনবিষয়ে তাঁহারা মনোযোগী ছিলেন না। যদিও বাজীরাও জীবনের অধিকাংশ সময় যুদ্ধবিগ্রহেই যাপন করিয়াছিলেন, তথাপি তাঁহার জীবনচরিত পাঠে এই ভ্রান্তি বহুপরিমাণে দূর হইবে। ভারতবর্ষের সর্ব্বত্র হিন্দুপ্রাধান্য স্থাপনই মরাঠাগণের লক্ষ্য ছিল। গ্রন্থকার স্বদেশ বা স্বজাতিপ্রীতি বশতঃ বাজীরাওয়ের কোন দোষ গোপন করেন নাই। দোষ গুণ উভয়ই বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি অনেক মূল চিঠিপত্রের সাহায্যে এই গ্রন্থ লিখিয়াছেন। তাঁহার লেখার প্রশংসা করা অনাবশ্যক। তিনি বাঙ্গলা লিখিতে আরম্ভ করায় এই এক অবান্তর সুফল ফলিয়াছে যে আমরা মরাঠা নামগুলির প্রকৃত উচ্চারণ জানিতে পারিয়াছি। এই পুস্তকে মহারাষ্ট্রসাম্রাজ্যের একটি মানচিত্র আছে।

গ্রন্থকার আখ্যাপত্রে 'ইস্ মুল্কমে এক বাজী ঔর্ সব্ পাজী' নিজাম উল্ মুল্কের এই বচনটি উদ্ধৃত করিয়াছেন। উহা কোন্‌সময়ে কথিত হইয়াছিল, তাহা পেশওয়ের সাহসসম্বন্ধীয় নিম্নবর্ণিত আখ্যান হইতে বুঝা যাইবে। "অতঃপর নিজাম বাজীরাওকে অভ্যর্থিত করিবার জন্য স্বীয় শিবিরে আহ্বান করিলেন। অসাধারণসাহসসম্পন্ন বাজীরাও দুই তিনজনমাত্র ভৃত্যসহ একাকী শত্রুশিবিরে গমনপূর্ব্বক নিজামের অভ্যর্থনা গ্রহণ করিলেন। কথিত আছে বাজীরাও নিজামের শিবিরে প্রবেশ করিলে মোগল সুভেদার তাঁহার সাহস পরীক্ষার জন্য একদল অস্ত্রধারী প্রহরীকে আহ্বান করেন। তাঁহার ইঙ্গিতক্রমে প্রহরিগণ বাজীরাওকে হত্যা করিবার ভয় প্রদর্শন করিয়া সহসা তাঁহার বিরুদ্ধে তরবারি উত্তোলিত করে। তখন নিজাম জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কেমন বাজীরাও! এখন তোমার প্রিয় সর্দ্দার শিন্দে হোলকর কোথায়? এই প্রহরিদল তোমায় আক্রমণ করিলে এখন কে তোমায় রক্ষা করিবে?" এই কথা শুনিবা মাত্র বাজীরাও অসি নিষ্কোশিত করিয়া বলিলেন, "আমার হস্তে এই তরবারি থাকিলে আমি এরূপ সহস্র প্রহরীর ব্যূহভেদ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে পারি। কিন্তু ভবাদৃশ ব্যক্তি এরূপ বিশ্বাসঘাত করিবেন বলিয়া আমার বোধ হয় না। তবে যদি এরূপ দুর্ঘটনাই ঘটে, তবে আমার শিন্দে হোলকর আমার নিকটেই থাকিবেন।" বাজীরাও এই কথা সমাপ্ত করিতে না করিতে সামান্য ভৃত্যবেশী রাণোজী শিন্দে ও মহ্লারাও হোলকর অগ্রসর হইয়া নিজামকে সেলাম করিলেন। নিজাম এই ব্যাপারে বাজীরাওয়ের অসাধারণ সাহস ও সারল্য দর্শনে অতিমাত্র বিস্মিত হইয়া বলিলেন,—ইস্ মুল্কমে এক বাজী, ঔর সব্ পাজী। অর্থাৎ এজগতে এক বাজীরাও ভিন্ন আর সকলেই পাজী (অধম)।"

"সচিত্র সরল ধাত্রীশিক্ষা। প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ। ফিজিশিয়ান ও সার্জন কলেজের ধাত্রীবিদ্যা-অধ্যাপক শ্রীসুন্দরীমোহন দাস, এম্ বি, প্রণীত। মূল্য ১৲টাকা মাত্র।" পুস্তকের বিজ্ঞাপনে লিখিত হইয়াছে—"এই দরিদ্রদেশে বহুপরিবারের ভারগ্রস্ত গৃহস্থ কথায় কথায় ধাত্রী ডাকিতে অসমর্থ। গৃহিণীমাত্রেই যাহাতে সহজপ্রসব ও শিশুপালনসম্বন্ধে সুশিক্ষিত হইতে পারেন, প্রথমভাগের তাহাই উদ্দেশ্য। দ্বিতীয়ভাগ ধাত্রীদের জন্য।" আমরা অব্যবসায়ী হইয়া যতটুকু বুঝিতে পারি, তাহাতে বোধহয় পুস্তক খানি গ্রন্থকারের উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপযোগী হইয়াছে। তিনি বহুদর্শী চিকিৎসক এবং ধাত্রীবিদ্যায় বিশেষ অভিজ্ঞ।

THE INDIA OF AURANGZIB (Topography, Statistics, and Roads) compared with the India of Akbar with extacts from the Khulasatut-Tawarikh and the Chahar Gulshan translated and annotated by Jadunath Sarkar, M.A., Professor of English Literature, Patna College. Calcutta: Bose Brothers; 54/1 College Street. Paper Rs 2.

গ্রন্থকার ঔরঙ্গজীবশাসিত ভারতবর্ষ সম্বন্ধে একখানি মূল্যবান্ গ্রন্থ প্রস্তুত করিয়াছেন। ভারতবর্ষসম্বন্ধীয় এরূপ বহি, এতদিন ইউরোপীয়েরাই লিখিয়া আসিতেছিলেন, ভারতবাসীরা এরূপ কাজে বড় একটা হাত দিতেন না। আমরা এজন্য যদুবাবুর পুস্তকখানি দেখিয়া অত্যন্ত সুখী হইয়াছি, এবং তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি। তিনি প্রথম অধ্যায়ে লিখিয়াছেন—

"Nobody can be more sensible of the imperfections of this book than the author. But he hopes that nobody who knows what it is to translate a Persian work bristling with obscure geographical names from a single and incorrectly transcribed manuscript, will be hard upon him for these imperfections"

বাস্তবিকই কেবল ভুক্তভোগীরাই জানেন ফারসী নাম পড়া কিরূপ কঠিন ব্যাপার। একেই ত ফারসীর শিকস্তা (টানা) লেখা ভাষায় দখল না থাকিলে পড়া যায় না, তাহার উপর মানুষের বা যায়গার নাম হইলে মহা বিপদ। হাইকোর্ট ও প্রিভি কৌন্সিলের অনেক মোকদ্দমায় নাম লইয়া অনেক গোলযোগ হয়। একটা নাম ঝাঙ্গুরী রায় ও চাখুরী রায়, দুইরকমেই পড়া যায় (See I. L R, 13 All. P, 57)। জনহা, বহজা ও সহজা, পরমানন্দ ও পরুবন্দ, উদিত নারায়ণ ও উদয় নারায়ণ, জয়নাথ ও বৈজনাথ, রিতুরায় ও আপুরায়, এক নামের এই প্রকার নানাবিধ পাঠ হইয়াছে।

পুস্তক খানি না দেখিলে ইহা প্রণয়ন করিতে লেখককে যে কিরূপ কঠোর ও নীরস পরিশ্রম করিতে হইয়াছে, তাহা কেহই বুঝিতে পারিবেন না। ইহা হইতে ঐতিহাসিক তত্ত্বজিজ্ঞাসু অনেক নূতন তথ্য জানিতে পারিবেন। ঔরঙ্গজীবের সাম্রাজ্য কি কি সুবা, সরকার, মহল প্রভৃতিতে বিভক্ত ছিল; আকবরের ও ঔরঙ্গজীবের রাজত্বের ভিন্ন ভিন্ন সনে উহাদের বিস্তৃতি, রাজস্ব প্রভৃতি কিরূপ ছিল; সাম্রাজ্যের প্রধান প্রধান রাজপথ কি কি ছিল; কোথায় কি কি প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান, পীরের কবর ছিল; কোন্ কোন্ স্থানে কি কি শস্য, খনিজদ্রব্য শিল্পসামগ্রী পাওয়া যাইত; কোন্ প্রদেশের অধিবাসীদের আহার পরিচ্ছদ, আচার, ব্যবহার কিরূপ ছিল, ইত্যাদি নানা প্রয়োজনীয় কথায় এই গ্রন্থখানি পূর্ণ। বাঙ্গালা ভাষায় ত এরূপ গ্রন্থ নাই-ই, ইংরাজীতেও ঔরঙ্গজীবের শাসনকাল সম্বন্ধে ইহাই এতাদৃশ প্রথম পুস্তক। সুতরাং যাঁহারা মোগলশাসনসময়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ বৃত্তান্ত জানিতে চান, তাঁহাদের পক্ষে আইন-ই-আকবরীর মত এই পুস্তকখানিও অবশ্য প্রয়োজনীয়। কিন্তু সাধারণ পাঠকবর্গও ইহা পড়িয়া জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করিতে পারিবেন। অবশ্য মূল ফারসী গ্রন্থদ্বয়ে অনেক আজগুবী আষাঢ়ে গল্পও আছে।

নমুনাস্বরূপ অনুবাদের দুইএক স্থল উদ্ধৃত করিতেছি।

"In the district of Monghyr a stone wall has been built from the river Ganges to the hill. This is regarded as the boundary of Bengal. In this district, on the skirt of the hill, there is a place named the Jharkhand of Baijnath (Baidyanath), sacred to Mahadeva. Here a miraculous manifestation puzzles those who behold only the outside of things, that is to say, in this temple there is a *peepul* tree, of which nobody knows the origin. If any one of the attendants of the temple is in need of the money necessary for his expenses, he abstains from food and drink, sits under the tree and offers prayers to Mahadeva for the fulfilment of his desire. After two or three days, the tree puts forth a leaf, covered with lines in the Hindi character, written by an invisible pen, and containing an order on a certain inhabitant of any of the parts of the world for the payment of a certain sum to the person who had prayed for it. Although his residence may be 500 leagues [from Baidyanath], the names of that man and of his children, wife, father and grandfather, his quarter, country, home and other correct details about him are known from the writing on the leaf. The high priest, writing agreeably to it on a separate piece of paper, gives [it to that attendant of the temple]. This is called the *hundi* (cheque) of *Baijnath*. The suppliant, having taken this cheque goes to the place named on it according to the directions contained in it. The man upon whom the cheque has been drawn, pays the money without attempting evasion or guile. A Brahman once brought a *hundi* of Baijnath to the very writer of this book, and he knowing it to be a bringer of good fortune, paid the money and satisfied the Brahman. More wonderful than this is a cave at this holy place. The high-priest enters into the cave once a year, on the day of the *siva-brata*, and, having brought some earth out of it, gives a little to each of the ministers of the temple. Through the power of the truly powerful, this earth becomes turned into gold, in proportion to the degree of merit of each man."

বঙ্গদেশের বৃত্তান্ত হইতে দুই এক স্থল উদ্ধৃত করিতেছি।

"The staple food is rice and fish; wheat, barley, and other grains are not to the taste of the people. Nay more, they have not even the custom of eating bread. Having cooked brinjals, herbs, and lemon together, they keep it in cold water and eat it the next day. It is very delicious when mixed with salt. They carry it to distant places and sell it at a high price. * * * The betel-nut grown here is so good that the mouth is dyed red on chewing it. * * * Houses are built of reeds (bamboo); and some are so well made that a single one costs five thousand rupees; and they last a long time. Some mattresses are so finely woven that they look nicer than silk. They also make mattresses which are called *sital-pati*. * * * Men and women go naked."

কামরূপসম্বন্ধে খুলাসাতের গ্রন্থকার বলেন—

"The beauty of the women of this place is very great. Their magic, enchantment, and use of spells and jugglery are greater than one can imagine. Strange stories are told about them such as the following. By the force of magic they build houses, of which the pillars and ceiling are made of men These men remain alive, but have not the power of breathing and moving. By the power of magic they also turn men into quadrupeds and birds, so that these men get tails and ears like those of beasts. They conquer the heart of whomsoever they like and bring him under their command" &c. &c.

আমরা কেবল কৌতুকজনক দুই একটি স্থল উদ্ধৃত করিলাম। ইংরাজীশিক্ষাপ্রাপ্ত পাঠকগণ পুস্তকখানি পড়িলেই দেখিতে পাইবেন, ইহা বহু সারবান্ ও জ্ঞাতব্য তথ্যে পূর্ণ।

"মাধবী। শ্রীতারাপ্রসন্ন ঘোষ প্রণীত। সোল এজেন্ট, মজুমদার লাইব্রেরী, কলিকাতা।" ইহা একখানি ক্ষুদ্র কবিতা পুস্তক। কবিতাগুলি পড়িতে মিষ্ট। তারাপ্রসন্ন বাবুর দুটি কবিতা প্রবাসীতে মুদ্রিত হইয়াছিল।

"আভাস। কুমার শ্রীসুরেন্দ্রচন্দ্র দেববর্ম্মা প্রণীত। আগরতলা। স্বাধীনত্রিপুরা। ১৩১২ ত্রিপুরাব্দ।" আমরা রাজকুলোদ্ভব লেখকমহাশয়ের এই পুস্তকখানি পাইয়া বড় প্রীত হইয়াছি। ইহাতে তাঁহার স্বাধীন চিন্তা করিবার ক্ষমতার পরিচয় আছে। ভাবগুলি উন্নত। ভাষা একটুকু সংস্কৃত ঘেঁসা। ভরসা করি এই দোষ কালে সারিয়া যাইবে। লেখা ও ভাবের কিঞ্চিৎ নমুনা দিতেছি।

"সম্ভ্রান্ত পরিবারের সন্তান সাধারণের সহিত সমাগম অবজ্ঞাজনক মনে করেন। ইহা মনের একটি বিকৃত ভাব। ইহার পূর্ণ বিকাশ অভিমান। সচরাচর ইহাই সমাজমধ্যে আত্মমর্য্যাদা বলিয়া পরিগণিত হয়। এবম্বিধ প্রবৃত্তি মনের একটি ব্যাধিবিশেষ। মনের সুন্দরতা মর্য্যাদার সারাংশ। স্থূলতঃ মনুষ্যজীবন দুইজাতীয় মনোবৃত্তির অধীন। এক জাতি উর্দ্ধগ, মনকে সদাই উন্নীত এবং অপরজাতি অধোগ, মনকে নিম্নে পাতিত করে। এই উভয়ের সন্ধিস্থল আত্ম-মর্য্যাদার আকর। আত্মমর্য্যাদা উর্দ্ধগবৃত্তির সমব্যাপক এবং অধোগবৃত্তির প্রতিদ্বন্দ্বী।"

"মন্দ্র। শ্রীদ্বিজেন্দ্রলাল রায় প্রণীত। সন ১৩০৯ সাল। মূল্য দেড়টাকা মাত্র।" এই কবিতাপুস্তকের ভূমিকায় কবি বলিতেছেন—"সমালোচকদিগের প্রতি আমার একটি নিবেদন আছে। তাঁহারা যদি পুস্তকখানি সমালোচনা করেন, তাহা হইলে প্রথমতঃ তাঁহারা যেন তৎপূর্ব্বে গ্রন্থখানি পড়েন; দ্বিতীয়তঃ তাঁহারা যে বিষয় জানেন সেই বিষয়েই যেন তাঁহাদের "কশাঘাত" সংরুদ্ধ রাখেন।" আমরা কিন্তু বহিখানি কবির অনুরোধে পড়ি নাই। ভাল লাগিতেছিল, অপূর্ব্ব আনন্দ পাইতেছিলাম, বলিয়া আরম্ভ করিয়া শেষ না করিয়া ছাড়ি নাই। একটি শিশু জ্বরে দুর্ব্বল হইয়া বিছানায় পড়িয়াছিল। তাহাকে "সুখমৃত্যু" হইতে নিম্নোদ্ধৃত কয়েক ছত্র পড়িয়া শুনান হয়। তাহাতে সে কবিতার তারিফ করে। জানিনা ৪ বৎসরের শিশু ইহাতে কি রস পাইয়াছিল।

"আমি যবে মরিব, আমার নিজ খাটে গো,
'আয়েসে' মরিতে যেন পারি;
চাকরির জন্য, যেন আমার নিকটে গো,
কেহ নাহি করে উমেদারি;
পাচক ব্রাহ্মণ যেন ঝঙ্কার না করে গো,
উচ্চকণ্ঠে হুহুঙ্কার রোলে;
শুনিতে না হয় যেন কলহ করিয়া গো,
মানভরে, ঝি গিয়াছে চলে;
অসহ্য উত্তাপ যদি, বাতাস করিও গো,
বরফশীতল দিও বারি;
মশা যদি হয়, তবে খাটাইয়া দিও গো,
শ্যামবর্ণ নেটের মশারি;

[শিশুর নিকট অপঠিত কবিতার এই অংশের শেষ কয় পংক্তিও উদ্ধৃত করা গেল।]

লেপি চারু 'মাথঘষা' কবরীকুন্তলে গো,
কাছে এসে বসে যেন প্রিয়া;
একটি পেয়ালা পাই সুবর্ণ সুরভি, গো,
চা খাইতে, দুগ্ধ চিনি দিয়া;
রূপসী শ্যালিকা পড়ে একটি কবিতা গো,
যা'র শীঘ্র অর্থ হয় বোধ;
গাহিতে হাসির গান যেন সে সময় গো,
কেহ নাহি করে অনুরোধ।"

কবির মত যদি আর কাহারও সুখমৃত্যুর সাধ হয়, তাহা হইলে এই পুস্তকের যে কোন কবিতা পড়িয়া শুনাইলেই চলিবে। কারণ ইহার প্রত্যেক কবিতারই "শীঘ্র অর্থ হয় বোধ।" "মন্দ্রে" কুড়িটি কবিতা আছে। তন্মধ্যে ৯টি নূতন রচিত। বাকী ১১টি পূর্ব্বে নানা মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। 'দাঁড়াও', 'মিলন', 'কতিপয় ছত্র', 'আশীর্ব্বাদ', 'উদ্বোধন', 'সরলা ও সরোজ', 'তাজমহল,' এবং 'রাধার প্রতি কৃষ্ণ', এই কয়টি কবিতা আদ্যোপান্ত গম্ভীর ভাবে রচিত। অবশিষ্ট কবিতাগুলিতে গাম্ভীর্য্য

ও পরিহাসের অপূর্ব্ব সংমিশ্রণ আছে। কবিতার শাস্ত্রকারেরা কি বলেন জানি না, কিন্তু দ্বিজেন্দ্রবাবুর লেখায় এই সংমিশ্রণ ভালই লাগে। অন্যান্য রসের সহিত বিশুদ্ধ পরিহাসের একত্র সমাবেশে বঙ্গসাহিত্যে দ্বিজেন্দ্রবাবুকে কেহ পরাস্ত করিতে পারেন নাই। সমকক্ষ কেহ আছেন কিনা, বলা কঠিন। তাঁহার শিশু-ও-শৈশব-সম্বন্ধীয় কবিতাগুলি অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী; যেমন এই পুস্তকের "জীবন পথের নবীন পান্থ"। দ্বিজেন্দ্র বাবুর কবিতায় কোথাও ভাবের অস্ফুটতা, ভাষার জটিলতা, কষ্টকল্পনা নাই; বেশ একটি তাজা টাট্‌কা ভাব আছে। তিনি অনেক স্থলে উচ্চ আধ্যাত্মিক কথা বলিয়াছেন। দ্বিজেন্দ্র বাবুর শব্দনির্ব্বাচন এমন সুন্দর যে মনে হয় যেন তাঁহার কবিতার একটি শব্দ পরবর্ত্তী শব্দটির সহিত স্বভাবসান্নিধ্যে সম্বদ্ধ। সমুদয় শব্দ গুলি মিলিয়া মিশিয়া সুন্দর সঙ্গীতের সৃষ্টি করিয়াছে। "কুসুমে কণ্টক" কবিতাটিতে কবি নারীপ্রেমের কেবল এক দিক্ দেখিয়াছেন বলিয়া বোধ হয়। পদ্মের নাম পঙ্কজ বলিয়া পদ্মের আর সকল কথা ভুলিয়া গিয়া কেবল পঙ্কের কথা বর্ণনা করিলে ভাল লাগে না। তদ্রূপ নারীপ্রেমের মূল খুঁড়িয়া যদি কামই পাওয়া যায়, তাহা হইলেও কাম ও প্রেমের অভিন্নতা প্রমাণিত হয় না।

"মন্দ্রে"র কাগজ, ছাপা ও মলাট বেশ সুন্দর।

"আরতি। শ্রীপ্রমথনাথ রায়চৌধুরী প্রণীত। মূল্য ১৷৷০ টাকা।" এই পুস্তকখানিতে আরতি, বর্ষমঙ্গল, দুঃখের সীমানা, সিন্ধুর প্রতি, বিপত্নীক ও বিধবা, আভীরদম্পতি, চাঁদ সওদাগর, ভীষ্ম, রাণীর রণযাত্রা, বাঞ্ছিতা ও লাঞ্ছিতা, উত্থানগীতি, সমালোচনার সমালোচন, ও গৌরাঙ্গ এইকয়টি কবিতা আছে। ইহার মধ্যে 'সমালোচনার সমালোচন,' আরতি যাহার নাম এরূপ পুস্তকে না ছাপিলে ভাল হইত। কবিতাটিতে আরতির কোন গন্ধ নাই; বিদ্রূপ আছে। আরতিতে কেন, এটি একেবারে না ছাপিলেও বিশেষ ক্ষতি ছিল না।

আমরা যতটুকু কাব্যরস উপভোগ করিবার আশায় এই বহিখানি পড়িতে বসিয়াছিলাম, তদপেক্ষা অধিক উপভোগের বস্তু পাইয়াছি। কেবল যে আনন্দ লাভ করিয়াছি, তাহা নয়; ক্ষুদ্র হইতে মহতের দিকে, নীচ হইতে উচ্চের দিকে, প্রেয়ঃ হইতে শ্রেয়ের দিকে, অন্ততঃ কিয়ৎকালের জন্যও আত্মার লক্ষ্য ফিরিয়াছে। মোট কথা, প্রমথবাবুর নিকট হইতে নাজানি আরও কত কি পাইব, এইরূপ একটা আশা লইয়া পুস্তকখানি শেষ করিয়াছি। প্রত্যেক কবিতাই যে ভাল হইয়াছে, একথা বলিতে পারি না। 'সিন্ধুর প্রতি' আমাদের ভাল লাগে নাই। 'রাণীর রণযাত্রা'-ও ভাল লাগে নাই। এদুটি কবিতাতে কবি যেন চেষ্টা করিয়া কিছু বলিতে, পাঠকের মনে একটা ভাবের তরঙ্গ উঠাইতে, চাহিয়াছেন, আমাদের এরূপ মনে হইয়াছে।

পুস্তকের প্রধান কবিতা 'গৌরাঙ্গ' আমাদের খুব ভাল লাগিয়াছে। কবি চৈতন্যদেবকে ঠিক্ বুঝিয়াছেন বলিয়াই বোধ হয়। নিমাইয়ের প্রতি তাঁহার হৃদয়ের যেরূপ ভাব, সেই ভাবের তরঙ্গ তিনি পাঠকের প্রাণেও তুলিতে সমর্থ হইয়াছেন। কবিতাটীর কেবল একটি দোষ হইয়াছে। ইহা কেমন যেন হঠাৎ শেষ হইয়া গিয়াছে। এই জন্য যেন অসম্পূর্ণ মনে হয়। 'উত্থান-গীতি' তীব্র ভর্ৎসনা ও ধিক্কারপূর্ণ; কিন্তু সঙ্গেসঙ্গে উদ্দীপনাও আছে। 'বাঞ্ছিতা ও লাঞ্ছিতা' আর কেহ নয়, আমাদেরই মাতৃভূমি। কবি তাঁহার শোকোদ্দীপক চিত্র আঁকিয়াছেন। সত্যই—

"জন্মভূমি অয়ি,
তোর নামে চোখে আসে জল;
হে আনন্দময়ি,
তোর বুকে আজি চিতানল!"

কবি "চাঁদ সওদাগরে"র মূর্ত্তি বেশ উচ্চ আদর্শে গড়িয়াছেন। পুত্রশোকে অটল, প্রিয়তমা পত্নীর ক্রন্দনে অটল, চাঁদ প্রকৃত ভক্ত, প্রকৃত বিশ্বাসী। "আভীরদম্পতী" অতীব মর্ম্মস্পর্শী। নারীর মহিমা কতরূপ ধারণ করে, কে বর্ণনা করিয়া শেষ করিতে পারে? প্রেমে ভগবান্ অধিষ্ঠিত, অথবা তিনিই প্রেম। তাঁহার চন্দ্রসূর্য্যকিরণের মত এই প্রেম সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়; রাজার প্রাসাদে, দীনের কুটীরে, সম্ভ্রান্ত কুলে, 'ইতর' শ্রেণীর মধ্যে, সর্ব্বত্রই ইহার প্রভাব লক্ষিত হয়। যেখানে প্রেমের মহিমা উদ্ভাসিত, সেখানেই ভক্তিতে আমাদের মস্তক অবনত হয়। "আরতি"শীর্ষক কবিতায় স্থানে স্থানে কবির কল্পনা সসীম মর্ত্ত্যলোক ছাড়িয়া যেন অনেক ঊর্দ্ধে উঠিয়াছে। কিন্তু প্রমথবাবু কবিতার প্রত্যেক কথা প্রত্যেক

ছত্র নিখুঁত করিবার চেষ্টা করেন না কেন? "রহস্যের অগ্রে বিঁধে দিয়ে আসে আপনার আরাধনা" এই কথাগুলি দ্বারা তিনি যে ভাব ব্যক্ত করিতে চান, তাহা উচ্চ; কিন্তু আরাধনা বিঁধিয়া দেওয়ার কথা শুনিলেই কেমন রসভঙ্গ হয়। গৌরাঙ্গের বর্ণনায় কবি বলিতেছেন –

"বড় ভাল বাসে গোরা স্বভাবের শোভা!
আবেশজড়িত স্বপ্নে চেয়ে থাকে সেই
রূপসী প্রকৃতি পানে। সুনির্জ্জনে আসি'
রোগ তার, গোধূলির স্বর্ণশোভা দেখা!"

শেষ ছত্রে "রোগ" কথাটি হংসমধ্যে বকো যথা গোছ হইয়াছে। কোথায় আমরা গৌরাঙ্গের সহিত প্রকৃতির স্বপ্নরাজ্যে প্রবেশ করিতেছিলাম, হঠাৎ "রোগ" কথাটা আমাদিগকে হাটবাজারের জনতার মধ্যে, গৃহস্থালীর ছোট খুটিনাটির মধ্যে, ইয়ারদলের বৈঠকখানার মধ্যে, আনিয়া ফেলিল।

আমরা ছেলেবেলা কোন কোন খৃষ্টান পুস্তকবিক্রেতা মহাশয়ের নিকট কখন বা এক পয়সা দিয়া, কখন বা বিনামূল্যে "লুকলিখিত সুসমাচার" "মথিলিখিত সুসমাচার," প্রভৃতি পুস্তক পাইতাম। মনে পড়ে তাহাতে "ছাপাই খরচ অপেক্ষাও কমমূল্যে বিক্রীত" এই মর্ম্মের কথা মুদ্রিত থাকিত: প্রমথবাবুর পুস্তকের মসৃণ, স্পর্শসুখকর, চক্চকে পুরু কাগজ, উজ্জ্বল পরিষ্কার ছাপা, মনোজ্ঞ রেশমী কাপড়ের বাঁধাই দেখিয়া বাল্যকালে দৃষ্ট খৃষ্টীয়ধর্ম্মপুস্তকে মুদ্রিত ঐ কথা মনে পড়িল। প্রমথবাবু সাহিত্যব্যবসায়ী নন, প্রকাশকও নন; ধনবান্ জমীদার। এরূপ সস্তায় এরূপ বাহ্যসৌষ্ঠবসম্পন্ন পুস্তক দিয়া তিনি অজ্ঞাতসারে ক্রেতাদের মনে একটা ভ্রান্ত ধারণা জন্মাইতেছেন, বুঝি বা এদামে এমন পুস্তক ব্যবসাসূত্রে দেওয়া যায়! প্রমথবাবু অর্থের সদ্ব্যবহার করিতেছেন বটে, কিন্তু সাহিত্যব্যবসায়ী ও প্রকাশকগণের অন্ন মারিবার (অবশ্য ইচ্ছা করিয়া নয়) যোগাড় করিতেছেন! আমরা বলি, তিনি তাঁহার গ্রন্থগুলিতে "মথিলিখিত সুসমাচারে"র মলাটে যাহা লেখা থাকে, তদ্রূপ কিছু ছাপাইয়া দিউন।

"চিত্র বিচিত্র। শ্রীশৈলেশচন্দ্র মজুমদার প্রণীত। ২০নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, মজুমদার লাইব্রেরী হইতে শ্রীঅমূল্যনারায়ণ রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।" ইহাতে উমেদার, কেরানীজীবন, ডাক্তার বাবু, আমার কৃষাণী, গুরুঠাকুর, উকীলের কাহিনী, ডেপুটিতত্ত্ব, এডিটার, ঘাত প্রতিঘাত, কব্‌রেজ মশায়, আমার সম্পাদকী, বুড়া বয়সের কথা, ব্যারিষ্টার, দাদার কাণ্ড, হেমের অনধিকার, এই ১৫টি চিত্র বা নক্‌সা আছে। সব গুলিই বেশ উপভোগ্য উপাদেয় ও হইয়াছে। দুএকটিতে পুরাতন প্রচলিত গল্পের ছায়া আছে। দ্বিজেন্দ্র বাবুর রাজা গোপীনাথ রায়ের মত যাঁদের সময় কাটেনা, তাঁহারা এই সুরুচিসঙ্গত মনোরঞ্জক বহিখানি হাতে লইয়া দেখিলে সফলকাম হইবেন। শুধু যে সময় কাটিবে তাহা নয়, চোখও ফুটিবে। অনেকে নিজের চিত্রও দেখিতে পাইবেন। এরূপ পরিহাসপূর্ণ এতগুলি গল্পের একত্র সমাবেশ বোধহয় আর কোন বাঙ্গলা কেতাবে নাই। দুটি কারণে আমরা এই মুখরোচক জিনিষগুলির নমুনা দিতে পারিলামনা; ১—স্থানাভাব; ২—সংক্ষিপ্ত করিলে রস রক্ষা করিতে পারা যাইবেনা। গ্রন্থকার মাফ্ করিবেন।

সূতিকা-চিকিৎসা। লেডী ডাক্তার শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী কুলভি কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। বাঁকুড়া। মূল্য চারি আনা। ইহাতে গর্ভধারণকাল ও সাময়িক ব্যবস্থা, প্রসবকাল ও সূতিকাগৃহ, প্রসবক্রম ও তাৎকালিক ব্যবস্থা এবং সূতিকা-চিকিৎসা—এই চারিটি অধ্যায় আছে। যে সকল স্থানে শিক্ষিতা ধাত্রী নাই, তথাকার গৃহস্থগণ এই পুস্তিকাখানি রাখিলে নিশ্চয়ই অসময়ে অনেক উপকার পাইবেন।

সাহিত্য-প্রসঙ্গ।

বৈজ্ঞানিক প্রসঙ্গ লিখিতে গেলে, নিঃসন্দেহ মীমাংসার হয় ত বড়ই প্রয়োজন হয়; সেই জন্যই যোগেশ বাবু লিখিয়াছেন, যে সম্ভব অসম্ভবের কথা লইয়া তিনি কোন কথা কহিতে চাহেন না। কিন্তু আবার পরক্ষণেই দেখিতেছি যে তিনি কল্পনার রাশটি বেশ শিথিল করিয়া দিয়া কালিদাস যে কেন খৃষ্টপূর্ব্ব প্রথম শতাব্দীতে ছিলেন না, ইহার প্রমাণ চাহিয়াছেন। প্রাচীন ইতিহাস এতটা অন্ধকারসমাচ্ছন্ন, যে সাহিত্যচর্চ্চায় ঐ সম্ভব অসম্ভবের কথাটা বাদ দেওয়া চলে না। এক দিকে দেখান গিয়াছিল যে, কালিদাস

নিশ্চয়ই ৬০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে আবির্ভূত, এবং অন্য দিকে দেখাইবার প্রয়াস পাওয়া গিয়াছিল যে তিনি কদাপি ৫ম শতাব্দীর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হয়েন নাই। প্রবাদ আছে যে কালিদাস উজ্জয়িনীপতি বিক্রমাদিত্যের সময়ের লোক; যথন ৫ম হইতে ৭ম শতাব্দীর মধ্যে ঠিক উজ্জয়িনীতেই হর্ষবিক্রমাদিত্যের নাম পাওয়া যায়, তথন সেই সময়েই কালিদাসের অভ্যুদয় স্বীকার করিলে, সম্ভব অসম্ভবের হিসাবে কথাটা দাঁড়ায় ভাল। ঠিক্ সেই সময়ে একটি বরাহমিহিরও পাই, বররুচিও পাই, অমরসিংহও পাই। এরূপস্থলে, প্রবাদ এবং ইতিহাসের একতা বজায় রাখিয়া সিদ্ধান্ত না করিয়া, যদি বলি যে পূর্ব্বে আরও বরাহ ছিলেন, এ অমর সে অমর কি না, সন্দেহ, তাহা হইলে তর্কসাগর আলোড়িত হয় বটে, কিন্তু ভাগে সুধা কি গরল লাভ হয় বুঝিতে পারি না। কালিদাসের সময়ে প্রাকৃত ভাষা সাহিত্যে ব্যবহৃত হইবার উপযোগী ছিল, তাহার প্রমাণ তাঁহার নাটকে। পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব্বে প্রাকৃত ভাষার এপ্রকার পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল, ইহার কোনও প্রমাণ কোথাও পাওয়া যায় না; এবং সেই সময়েই প্রাকৃত ব্যাকরণ রচিত হওয়া সম্পূর্ণ সম্ভবপর। বররুচি প্রাকৃত ভাষার ব্যাকরণ লিখিয়াছেন; তাঁহারও নাম প্রবাদবাক্যে কালিদাসাদির সহিত গ্রথিত রহিয়াছে। এরূপ স্থলে অন্য প্রকার তর্ক করিতে যাওয়া সুবিধাজনক কি? এথন প্রাকৃত ভাষার উৎপত্তি, বিকাশ প্রভৃতির সময়ের তত্ত্ব লিখিতে গেলে, কালিদাসকে অবলম্বন করিয়া আদমের কথা পড়িতে হয়। পাণিনি বঙ্গভাষার ব্যাকরণ লিখিয়াছিলেন বলাও যাহা, প্রাকৃতপ্রকাশ খৃঃপূঃ কোনও শতাব্দীতে কিম্বা প্রথম শতাব্দীতে হইয়াছিল বলাও তাহাই। ৫ম শতাব্দীর পূর্ব্বে প্রাকৃত ভাষার বিকাশ হইয়াছিল, ইহার কোনও প্রমাণ যদি যোগেশ বাবু পাইয়া থাকেন, তবে সেটা জানিতে পারিলে, একটা নূতন তত্ত্ব জানা যায়।

(২) শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় বলেন, যে রঘুবংশ খ্রীঃ ৪৬৫—৪৮৫ অব্দের মধ্যে রচিত। যোগেশ বাবু হয়ত এ কথাও গ্রহণ করেন নাই; কারণ তিনি পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে ১ম শতাব্দীর কথা তুলিয়াছেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় বহু দিন প্রাচীন তত্ত্বের অনুসন্ধান করিতেছেন, এবং এবিষয়ে তাঁহার কৃতিত্বও যথেষ্ট। কিন্তু তাঁহার উক্ত সিদ্ধান্তটি গ্রহণ করিতে পারিতেছিনা। স্কন্দগুপ্তের রাজত্বের পর, অর্থাৎ মহারাজগুপ্তপ্রতিষ্ঠিত গুপ্তরাজবংশের গৌরবের অবসান সময়ে, ঠিক বুধগুপ্তের রাজত্বে, কালিদাসের আবির্ভাব হইয়াছিল, এটা অসম্ভব বলিয়াই মনে হয়। যে উজ্জয়িনীতে মহাকালমন্দির প্রতিষ্ঠিত, কালিদাস যে সেখানে বসিয়া কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ তাঁহার গ্রন্থ হইতেই সংগৃহীত হইতে পারে। বুধগুপ্ত, ভানুগুপ্ত এবং পরিব্রাজক মহারাজেরা কেহই পাটলিপুত্রে রাজত্ব করেন নাই। মহেন্দ্রাদিত্য, স্কন্দগুপ্ত প্রভৃতি প্রতিনিধিদ্বারা মালব শাসন করিতেন, প্রস্তরলিপিতে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ আছে। তাঁহাদের রাজত্বের অবসানে, ঐ প্রতিনিধিগণ, আর গুপ্তদের প্রাধান্য স্বীকার করেন নাই। বুধগুপ্ত হীনপ্রভ এবং ক্ষীণবীর্য্য ছিলেন; কেহই তাঁহাকে বড় মানিত না। তথন কি কোন উজ্জয়িনীর কবি মগধের প্রাধান্য স্বীকার করিয়া কবিতা লিখিতে পারেন? হীনগৌরব পাটলিপুত্রে বসিয়াও উজ্জয়িনীর মাহাত্ম্যকীর্ত্তন, বা উৎসবের কথা কহা সম্ভবপর নহে। কৃষ্ণগুপ্তের প্রপৌত্র (?) কুমারগুপ্তের সময়ে মগধের পূর্ব্ব গৌরব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু বুধগুপ্তের সময় একেবারে লোপ পাইয়াছিল। এই সময়ের কথার আভাষ দিয়া দশকুমারচরিতের কথা আরব্ধ হইয়াছে। বিশিষ্ট প্রমাণ না পাইলে কালিদাসের হর্ষবিক্রমাদিত্যের পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হওয়ার কথা গ্রহণ করা যাইতে পারে না।

(৩) কালিদাস যে ৫ম শতাব্দীর শেষ কিম্বা ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম সময়ের পূর্ব্বের লোক নহেন, সে সম্বন্ধে আরও দুইটি প্রমাণ দিতেছি। ১ম, কালিদাসের গ্রন্থে ভারতের পশ্চিম সীমায় হূন দিগের অভ্যুদয়ের কথা আছে। হূনেরা ৫ম শতাব্দীর শেষভাগে পঞ্জাবে আসিয়াছিল। ২য় আর্য্যভট্ট ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পৃথিবীর ছায়া পড়িয়া যে গ্রহণ হয়, একথা তাঁহার দ্বারা প্রথম আবিষ্কৃত। কালিদাস তাঁহার রঘুবংশে ঐ সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া লিখিয়াছেন। চতুর্দ্দশ সর্গের ৪০ শ্লোকে আছে—

ছায়া হি ভূমেঃ শশিনো মলত্বে-
নারোপিতা শুদ্ধিমতঃ প্রজাভিঃ।

আর্য্যভট্ট ৭১৮ বৎসর বয়সে যদি গ্রহণের তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়া থাকেন তাহা হইলেই ৬৮৫ অব্দের মধ্যে রঘুবংশ রচনা স্বীকার করা যায়। এখন কথা উঠিতে পারে যে হূনেরা ৫ম শতাব্দীর শেষে পঞ্জাবে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিল, অথবা আর্য্যভট্ট ৪৭৬ অব্দে জন্ম গ্রহণ করেন, তাহার প্রমাণ কি? এবিষয়ে পূর্ব্ব পূর্ব্ব পণ্ডিতদের সিদ্ধান্ত যদি না মানিতে হয়, অথবা যদি তাঁহাদের যুক্তিগুলির উল্লেখ করিতে হয়, তাহা হইলে কালিদাসের কথা লইয়া একেবারে আদমের সৃষ্টির ইতিহাস লিখিতে হয়। এ প্রমাণের পরেও কালিদাস যে ৬ষ্ঠ শতাব্দীর লোক নহেন, তাহা বলিবার সাহস আমার নাই।

(৪) ঘটকর্পরাদির কোন প্রামাণ্য রচনা পাওয়া যায় না, তাহা বিলক্ষণ অবগত আছি। কিন্তু প্রবাদ বলে, যে ঐ নামের কয়েকজন পণ্ডিত বিক্রমাদিত্যের সভাসদ্ ছিলেন। চারিটি পণ্ডিত পাইলাম; পাঁচটির নিদর্শন পাইলাম না। তাহাতে কি প্রমাণ হয়, সেই পাঁচটি আদৌ সে সময়ে ছিলেন না? প্রবাদ কথার সহিত ইতিহাসের যখন বিরোধ উপস্থিত হয় না, তখন ঐ নামের পণ্ডিতগণের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে, কি বৈজ্ঞানিক বাধা উপস্থিত হয়, বুঝিনা। যদি সঠিক সংবাদ পাওয়া যাইত, হইত ভাল; কিন্তু উপায় নাই।

(৫) আমি একথা বলি নাই যে কালিদাসের পূর্ব্বে উজ্জয়িনী নামে কোন নগরী ছিলনা। পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ের মালবরাজগণ অনার্য্য রাজা ছিলেন। তাঁহারা আর্য্যদের অনেক রীতি নীতির অনুকরণ করিয়া আর্য্য সমাজের দিকে খুব অগ্রসরও হইয়াছিলেন। অশোক নিজে উজ্জয়িনী শাসন করিতে গিয়াছিলেন, একথা আমি উল্লেখ করিয়াছিলাম। একথা লইয়া এখানে বেশী তর্ক করিবার প্রয়োজন নাই; কারণ কাজের কথা উপরে বলিয়া আসিয়াছি। হর্ষবিক্রমাদিত্যের পূর্ব্বে উজ্জয়িনীতে যে আর্য্যদের স্বতন্ত্র সমৃদ্ধ রাজ্য স্থাপিত হয় নাই, তাহা প্রমাণ করিতে গেলে অনেক কথা লিখিতে হয়। সম্প্রতি সেই কথাটি তত প্রাসঙ্গিক নহে।

(৬) আমি এ কথাও বলি নাই যে ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে এ দেশে প্রতিমাপূজা ছিলনা, বা দেবমন্দির হয় নাই। ষষ্ঠ শতাব্দীতে ওগুলি সুপ্রতিষ্ঠিত, এই কথা বলিয়াছিলাম। দ্বিতীয় শতাব্দীর পূর্ব্বে যে হিন্দুরা বৌদ্ধদের প্রতিমা এবং মন্দির ধার করে নাই, চতুর্থ শতাব্দীর পূর্ব্বে যে আর্য্য সমাজে উহার প্রচলন আরম্ভ হয় নাই. একথা রামায়ণের কাল নিরূপণের সময়ে আমাকে বিশেষ করিয়া লিখিতে হইবে। কাব্যযুগ নির্দ্দিষ্ট করিতে হইলে মহাভারত রামায়ণ প্রভৃতির কাল নির্দ্ধারণ, সর্ব্বপ্রথমে প্রয়োজন। এখন যখন বুঝিতে পারিতেছি যে এই সকল বিষয়ের প্রবন্ধ বঙ্গদেশে পঠিত হয়, তখন বিক্ষিপ্তভাবে কোন কথা না লিখিয়া ধারাবাহিক আলোচনা করাই ভাল।

(৭) রত্নতত্ত্বসম্বন্ধে আমি কোন কথা বলিব না, কারণ আমি আদার বেপারি।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

লজ্জাবতী।

[আখ্যায়িকা]

প্রথম অধ্যায়

শুভচিহ্ন

ঋষ্যমূক পর্ব্বতশ্রেণীর পাদতলে, অসংখ্যনির্ঝরিণী-পরিবর্দ্ধিতা চিত্রোৎপলা, রামায়ণপ্রসিদ্ধা সিদ্ধশবরীর আশ্রমগুহা ধৌত করিয়া, প্রবাহিত হইতেছিল, এবং তীরস্থিত শৈলপরিব্যাপী সুবিস্তীর্ণ বিশাল অরণ্য, চিত্রোৎপলা বা মহানদীর স্ফটিকস্বচ্ছজলে প্রতিবিম্বিত হইতেছিল। একদিন সেই নদীকূলে উন্মুক্ত আকাশতলে বসিয়া, রাজা অদ্রিদেব, বায়ুসেবন উপলক্ষ্য করিয়া, নানা চিন্তা করিতেছিলেন। এই হৈহয়বংশীয় রাজা আর্য্যধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। ঠিক এই সময়ে বঙ্গীয় রাজকুলতিলক দেবপাল, বঙ্গের সিংহাসনের গৌরব বর্দ্ধন করিতেছিলেন। রাজা দেবপাল, স্বীয় ভ্রাতা জয়পালের বীরত্বে, উত্তরে হিমাচল, পশ্চিমে কান্যোজ, দক্ষিণে কলিঙ্গ এবং পূর্ব্বে সুহ্মদেশ পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তৃত করিয়া, দক্ষিণ কোশল এবং মেকল প্রদেশ করায়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন। সেই জন্যই অদ্রিদেব বিজনে বসিয়া চিন্তা করিতেছিলেন, যে কি উপায়ে এই পরাক্রান্ত রাজার আক্রমণ হইতে দেশ রক্ষা করিবেন। অদ্রিদেবের রাজধানী রাজিমে ছিল।

অভিনেব চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে একটি শর, ঊর্দ্ধদেশ হইতে নিক্ষিপ্ত হইবার মত, তাঁহার সম্মুখভাগে মৃত্তিকায় দৃঢ় প্রোথিত হইল। রাজা সবিস্ময়ে ঊর্দ্ধে চাহিয়া দেখিলেন; কিছুই বুঝিতে পারিলেন না। দেখিতে দেখিতে আর একটি শর তাঁহার দক্ষিণ ভাগে আসিয়া ভূমিতে প্রোথিত হইল। বিস্ময় বাড়িল; রাজা গ্রীবা হেলাইয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। সহসা তৃতীয় শর তাঁহার নাসিকাগ্রের এক অঙ্গুলি ব্যবধান দিয়া অতি দ্রুতবেগে গিয়া একটি আম্রশাখায় বিদ্ধ হইল। রাজা তখন স্থির পাদ-বিক্ষেপে একটু দূরে গিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। তখন একটি গোঁড় যুবক হাসিতে হাসিতে ছুটিয়া আসিয়া রাজাকে "জুহর" (প্রণাম) করিয়া দাঁড়াইল। রাজা হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "চানাহু, তীরগুলি কি তুমি ছুঁড়িতেছিলে?" চানাহু আবার জুহর করিয়া বলিল, "হাঁ"। রাজা বলিলেন, "এ খেয়াল চাপিল কেন?" চানাহু গম্ভীর হইয়া বলিল, "মহারাজ, দেবীর প্রসাদে আগামী যুদ্ধে আপনার এবং আপনার প্রিয়জনের মঙ্গল হইবে। তীর ছুঁড়িয়া তাহার দৈবপরীক্ষা করিলাম।" কোন সংস্কার আমাদের থাকুক বা নাই থাকুক, মনের মত কথা বলিলে, সেটা মানিতে ইচ্ছা করে। রাজা প্রসন্ন হইলেন। চানাহু তাহা বুঝিল; এবং আবার জুহর করিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

দ্বিতীয় অধ্যায়

উদ্যোগ

চানাহুর কথা বলিয়াছি; একবার তাহার রূপ বর্ণনা করিব। সেই সুপুষ্ট নিটোল মাংসল দেহ, সেই মিস্‌মিসে কাল রং, সেই প্রফুল্ল চিন্তাশূন্য উজ্জ্বল চক্ষু, কিসের সহিত তুলনা করিব? পাহাড়ের পাদদেশে, অরণ্য বেষ্টিত অথচ সূর্য্যাদীপ্ত কাল জল ভরা সরোবর দেখিয়াছ? চানাহু সেই সরোবরের মত সুন্দর। পাথর ঠেলিয়া, লতা-পাতা ছিঁড়িয়া, নির্ঝর বহে; চানাহু সেই নির্ঝরের মত সুন্দর। কখনও গজশাবকের সৌন্দর্য্য অনুধ্যান করিয়াছ? চানাহু গজশাবকতুল্য মনোহর। চানাহু বলিল, "আমি অল্প দিনেই রাজার সঙ্গে গিয়া যুদ্ধ জয় করিয়া ফিরিয়া আসিব; তুই কাঁদিস্‌নে"। চানাহু অভিমন্যু অপেক্ষা বয়সে বড়; এবং যে কাঁদিতেছিল, সেও উত্তরা অপেক্ষা বয়োজ্যেষ্ঠা; বয়স প্রায় ১৭ বৎসর। পহিলী, জলভরা চোখে চানাহুর মুখের দিকে তাকাইয়া, দুহাতে তাহার বাঁ হাতখানি টানিয়া ধরিল। চানাহু, ডাহিনহাতখানি দিয়া, পহিলীর পীঠে হাত বুলাইতে লাগিল। চানাহু সুন্দর; পহিলী আরও সুন্দর। সেই মাংসল দেহ, সেই কৃষ্ণ বর্ণ, সেই স্বচ্ছতা। উপরন্তু সেই নির্ম্মল চক্ষু, জলভরা; উপরন্তু সেই অনার্য্যোচিত নগ্নবক্ষে স্বাস্থ্য এবং মাধুরীর তুঙ্গলীলা। এবং উপরন্তু আরও কিছু, যাহা পুরুষের চক্ষে, মোহ, দীপ্তি এবং শান্তি।

অরণ্য সুন্দর; কিন্তু আরণ্য জাতি কখনও সুন্দর বলিয়া খ্যাতি লাভ করে নাই। কাজেই সুসভ্য পাঠকদের নিকটে একথা লইয়া বেশী বাড়াবাড়ি করিব না।

চানাহু একজন সাধারণ সৈন্য মাত্র; তবে রাজার প্রিয়-পাত্র। আজি অপরাহ্ণে, দক্ষিণ কোশলের সৈন্যগণ, শুভ মুহূর্ত্তে যুদ্ধযাত্রা করিবে। সংবাদ আসিয়াছে, যে স্বয়ং রাজা দেবপাল এবং সৈন্যাধ্যক্ষ জয়পাল, কোশল অধিকার করিবার জন্য, অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছেন। চানাহু ধনুর্ব্বাণ লইয়া রাজসৈন্যের সঙ্গে যোগ দিতে গেল; এবং পহিলী, সেই কাল পহিলী, আরণ্য কুটীরের সম্মুখে দাঁড়াইয়া কাঁদিতে লাগিল।

তৃতীয় অধ্যায়

মায়ামৃগ

রাজিম হইতে দুই ক্রোশ দূরে মহানদীতটে, করকা নামক প্রান্তরে, একটি আম্রকাননে, রাজা দেবপালদেবের সৈন্যগণ যুদ্ধের আয়োজন করিতেছে, এবং রাজা পত্র-রচিত শিবিরে বসিয়া, জয়পাল এবং জয়পালের পুত্র বিগ্রহ-পালের সহিত কথোপকথন করিতেছেন। এমন সময়ে বৈতালিকেরা স্তুতি গান করিতে আরম্ভ করিল। তাহারা গাহিল—

দেবপাল নৃপমণ্ডলমণ্ডণ!
আশ্রিত সেবকজন হৃদিরঞ্জন!
অরিকুল দুর্দ্ধর! ভীম ভয়ঙ্কর
কৃতান্তসম তুমি সমরে।
বীর্য্য-নিকেতন! তব জয়কেতন
শোভে হিমগিরি শিখরে।

অর্ণবপথ বহি বহিত্র যতনে
কত ধন সম্পদ অর্পে চরণে।
চুম্বি চরণতব সাগর ভৈরব
মাগধ সমান বন্দে।
অরাতিবর্গ হিরণ্য অর্ঘ্য
ঢালে চরণ উপান্তে।

প্রোথিত বঙ্গে কীর্ত্তিস্তম্ভ;
অবনত অঙ্গ, পদাশ্রিত সুহ্ম;
মগধ, কনোজে, অনার্য্য রাজ্যে
লব্ধ সুবিস্তৃত সীমা।
কলিঙ্গ, উৎকল, কোশল, মেকল,
গাহে তব যশ মহিমা। *

বৈতালিকগীতির উত্তেজনা, সময়োপযোগী হইয়াছিল। রাজা, বিগ্রহপালের মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "এ রাজ্য পরাজিত হইলে, অচিরাৎ সমগ্র ভারত আমার করায়ত্ত হইবে; এবং তুমি ভারতের একাধীশ্বর রাজা হইবে।" দেবপাল নিঃসন্তান ছিলেন; সেই জন্য বিগ্রহপালকে উত্তরাধিকারী নির্দ্দিষ্ট করিয়াছিলেন। বিগ্রহপাল, অবনত মস্তকে অনুগ্রহ স্বীকার করিলেন।

সহসা চতুর্দ্দিক হইতে শরপাত হইতে লাগিল। কোথাও শত্রুসৈন্যের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেল না; অথচ শরপাতে রাজশিবির বিপদসঙ্কুল হইয়া উঠিল। জয়পাল এবং তাঁহার সৈন্যগণ সম্মুখসমরে পরাক্রান্ত; কিন্তু এপ্রকার লুক্কায়িত যুদ্ধে তাঁহারা অনভ্যস্ত। বিশেষ, সন্ধ্যা অতীত হইয়াছে; এ সময়ে শত্রুর অনুসন্ধান সুসাধ্য নহে। রাজা দেবপালের অনুমতি লইয়া, জয়পাল আদেশ করিলেন, যে শিবির পরিত্যাগ করিয়া সৈন্যেরা তাঁহার নির্দ্দেশমত অরণ্যে এবং পাহাড়ে লুকাইয়া থাকুক। বিগ্রহপাল, অল্প-সংখ্যক সৈন্য লইয়া, প্রচ্ছন্নভাবে মহানদীর কূল দিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন; রাজা নিজেও তেমনি ভাবে একটি পাহাড় লক্ষ্য করিয়া চলিলেন; জয়পাল, একজন মাত্র অনুচর লইয়া একটি অরণ্যের দিকে অগ্রসর হইলেন; এবং অন্যান্য সৈন্যেরাও গুপ্তভাবে যথানির্দ্দিষ্ট পথে অগ্রসর হইতে লাগিল। অন্ধকার গাঢ় হইয়া আসিল। সেই গাঢ় অন্ধকারে জয়পালের মনে হইল, যে কে যেন ক্ষিপ্রপদে তাঁহার সম্মুখ দিয়া চলিয়া গেল। জয়পাল, অতি সতর্কভাবে তাহার পদানুসরণ করিয়া ছুটিলেন। কিছু দূর গিয়া একটা ক্ষুদ্র জঙ্গলের নিকটে, যেন অগ্রগামীর পদশব্দ থামিল বলিয়া মনে হইল। জয়পাল, অনুচরকে ইঙ্গিত করিয়া, ক্ষুদ্র জঙ্গলের দিকে অগ্রসর হইলেন; এবং অল্প সময়ের মধ্যেই ২০।২৫ জন সৈন্য আসিয়া জঙ্গলটি ঘিরিয়া দাঁড়াইল। জয়পাল সৈন্যদিগকে আদেশ করিলেন, "তোমরা সমস্ত রাত্রি এখানে থাক; দেখিও, কেহ যেন জঙ্গল হইতে বাহির হইয়া না পালায়।" কিছু ক্ষণ পরেই চন্দ্রোদয় হইল। কিন্তু ক্ষুদ্র হইলেও, রাত্রিকালে সেই নিবিড় জঙ্গলে প্রবেশ করা উচিত নহে মনে করিয়া, জয়পাল, সৈন্য লইয়া জঙ্গল বেষ্টন করিয়া রহিলেন।

এমন সময়ে সেই জঙ্গলের মধ্য হইতে একটি রমণীর চীৎকার ধ্বনি উত্থিত হইল। স্ত্রীলোকটি কাঁদিয়া কহিল, "আমাকে রক্ষা কর।" তখন রোদনধ্বনি লক্ষ্য করিয়া, ৩।৪ জন অনুচর লইয়া, জয়পাল জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিলেন। দেখিলেন একটি আরণ্য যুবতী ধূলায় পড়িয়া কাঁদিতেছে। জয়পালকে দেখিয়া কাঁদিয়া বলিল, যে এক জন দস্যু তাহার সতীত্ব নষ্ট করিয়া পলাইয়াছে। রমণীর প্রতি অত্যাচার বীরের হৃদয়ে অসহ্য। জয়পাল জিজ্ঞাসা করিলেন, "দস্যু কোন দিকে গিয়াছে?" যুবতী একটি দিক লক্ষ্য করিয়া বলিল, "অধিক দূর যাইতে পারে নাই; আমার সঙ্গে একটু অগ্রসর হইলেই তাহাকে ধরিয়া দিতে পারিব।" জয়পাল অনুচর লইয়া যুবতীর সঙ্গে অগ্রসর হইলেন। একটু অগ্রসর হইবামাত্রই, বালিকা অঙ্গুলি তুলিয়া বলিল, "ঐ"। জয়পাল দেখিলেন, একজন লোক চুপে চুপে গাছের আড়াল দিয়া পালাইতেছে। নিজে তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ ছুটিলেন। অনুচরেরাও ছুটিল; এবং যাহারা জঙ্গল ঘিরিয়াছিল, তাহারাও জঙ্গলের মধ্যে প্রবেশ করিল। কিন্তু সে দস্যু কোথায় পালাইল? সে যুবতীই বা কোথায় গেল? জয়পাল অনেক অনুসন্ধানের পর একটু ক্লান্ত হইয়া দাঁড়াইলেন; এবং তখন দেখিলেন, তিনি অসংখ্য গৌড় সৈন্যদ্বারা অবরুদ্ধ হইয়াছেন।

* এই কবিতাটি হ্রস্বদীর্ঘ উচ্চারণ করিয়া পঠিতব্য।

দূরে একটা গাছের তলায় দাঁড়াইয়া, পহিলী চানাছকে বলিল, "আমি না আসিলে, এত বড় শীকার কত্তে পাত্তে কি ?" চানাছ পহিলীর মুখচুম্ব করিল।

চতুর্থ অধ্যায়

দ্বিতীয় বন্দী

রাজা দেবপালদেব প্রভাতে সংবাদ পাইলেন যে জয়পাল বন্দী হইয়াছেন। অসংখ্য সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করা বৃথা মনে করিয়া তিনি আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, এবং গোড়েরা তাঁহাকে রাজিমে লইয়া গিয়াছে। আরও সংবাদ আসিল যে জয়পাল বন্দী হইয়াছেন শুনিয়া, বিগ্রহপাল একাকী ছদ্মবেশে, কোশল অধিকার করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া, পথের তত্ত্ব লইতে চলিয়া গিয়াছেন। রাজা চিন্তাকুল হইলেন। হৈহয়পতি বা চেদিপতি বা কোশলেশ্বরের সৈন্যেরা আর কোন উপদ্রব করিল না। রাজা দেবপাল সৈন্যদল লইয়া যেখানে ছিলেন. সেখানেই রহিলেন ; এবং উৎকণ্ঠিতচিত্তে কুমারের আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

এদিকে কুমার বিগ্রহপাল সমস্ত দিন পরিভ্রমণ করিয়া অপরাহ্নসময়ে শ্রান্তপদে, মহানদীর বিজন কূলে শৈলাসনে উপবেশন করিলেন। দুঃখের দিনেও প্রকৃতির রমণীয়তা মমনোহন করে। চিত্রোৎপলার অপরাহ্ণ সূর্য্যকিরণ-চুম্বিত, গিরিগগনবিম্বিত, নির্ম্মল জলধারা; শ্রেণীবদ্ধ শৈলমালার প্রশান্ত স্নিগ্ধ শ্যামল কান্তি, হাস্যময়ী দিগ্বধূর প্রসন্ন রূপচ্ছবি, কুমারের নয়ন মন বিমোহিত করিল। তাহার উপর আবার বসন্তে মলয় সমীরণের মত, শরতে চন্দ্রিকাদীপ্তির মত, সেই শোভার উপর নব শোভা ফুটিয়া উঠিল। কুমার দেখিলেন, তিনটি যুবতী চিত্রোৎপলা-স্রোতে জলক্রীড়া করিতেছেন। দুইটি যুবতী কাল; সম্ভবতঃ অনার্য্যজাতীয়া। আর তৃতীয়টি ? কূলভরা যৌবন, গালভরা হাসি, অর্দ্ধসুপ্তিময় চক্ষু, পূর্ণদীপ্তিময় লাবণ্য। আমি যখনই স্বচ্ছ জলে আকাশের প্রতিবিম্ব দেখিয়াছি, তখনই দেখিয়াছি, যে স্বচ্ছ-আকাশেও জলের প্রতিবিম্ব পড়িয়াছে। কি করিয়া সম্ভব হয় জানি না, কিন্তু যাহা দেখিয়াছি তাহা বলিলাম। সৃষ্টির আদি হইতে চারি চক্ষুর মিলনের কথা চলিয়া আসিয়াছে। এখানেও তাহাই হইল। দুইটি হৃদয়ে দুইটি হৃদয়ের প্রতিবিম্ব পড়িল। "আর গৃহে ফিরিতে ইচ্ছা নাই ; কে তুমি ?" উভয়ের নয়নে নয়নে নিঃশব্দে ওই কথা হইল। যুবতী কতক্ষণ ছিলেন, চলিয়া যাইবার সময় পাথরে আঁচল বাঁধিয়াছিল কি না, সঙ্গিনীরা কিছু আঁচ পাইয়া পরিহাস করিয়াছিলেন কিনা, এসকল কথা লিখিবার অবসর হইল না। যুবতীগণ গৃহে চলিয়া যাইবার পর, কুমার যখন নদীকূল দিয়া অগ্রসর হইতেছিলেন, তখন চারি পাঁচ জন কোশলসৈন্য আসিয়া তাঁহাকে বন্দী করিল। অসভ্য কোশলসৈন্যগণের বুদ্ধির প্রখরতা দেখিয়া কুমার বিস্মিত হইলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

যুদ্ধ

জয়পাল বন্দী ; কুমার বিগ্রহপাল বন্দী। রাজা দেবপালদেব, তখন বীরোচিত দর্পে সৈন্যদল লইয়া, রাজিম আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। যাহারা সম্মুখযুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়াছিল, তাহারা স্রোতমুখে তৃণের মত ভাসিয়া গেল। আকাশ ছাপিয়া, সৈন্যের জয়হুঙ্কার উত্থিত হইতে লাগিল ; এবং ভাটেরা গাহিতে লাগিল, "দেবপাল নৃপমণ্ডলমণ্ডণ"। বঙ্গের সে গৌরবের দিন আর ফিরিবে না; কিন্তু আজিও তাহার স্মৃতি বড় সুখময়। হৈহয়পতি অদ্রিদেব, সন্ধির প্রস্তাব করিয়া লোক পাঠাইলেন। বলিলেন, তিনি বন্দীদিগকে ফিরাইয়া দিবেন, এবং রাজোচিত উপহার দান করিবেন। এ কথা বলিলে হিন্দুরাজারা কদাপি যুদ্ধ করিত না। দেবপাল স্বীকৃত হইলেন।

অপরাহ্নে রাজিমে বিস্তৃত সভামণ্ডপ রচনা করিয়া, হৈহয়পতি, বঙ্গেশ্বরকে আহ্বান করিলেন। বঙ্গেশ্বর সগর্ব্বে সভা প্রবেশ করিলেন। তিনি সভা প্রবেশ করিবার সময়ে, চানাছ তাঁহাকে কি যেন কানে কানে বলিতেছিল। দেবপালদেব, জয়পাল এবং বিগ্রহপাল, যথানির্দ্দিষ্ট আসনে উপবিষ্ট হইবার পর, হৈহয়পতি, দেবপালকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "আমি কিছু উপহার দিব বলিয়াছিলাম ; এই সভামধ্যেই তাহা অর্পণ করিব, সংকল্প করিয়াছি।" রাজার ইঙ্গিতে, পরিচারিকাপরিবৃতা রাজকুমারী, সভামধ্যে আনীতা হইলেন। বিগ্রহপাল দেখিলেন তিনিই তাঁহার হৃদয়মোহিনী। হৈহয়পতি বলিলেন, "আজি

আমার কন্যাটিকে ভাবী বঙ্গেশ্বরের পত্নীত্বে সম্প্রদান করিতেছি।" দেবপালদেব, আসন হইতে উঠিয়া, কুমারের এক হস্ত তুলিয়া ধরিলেন; অমনি অগ্নিদেব. কুমারী লজ্জাবতীর অপর হস্ত আনিয়া তাহাতে সম্বদ্ধ করিলেন। পুরোহিত পুষ্পমালা বাঁধিয়া দিলেন এবং পুরনারীগণ মঙ্গলধ্বনি করিলেন।

কানিংহামকর্তৃক আবিষ্কৃত, পালরাজাদের মুদ্রায় দেখা যায় যে, বিগ্রহপালের সহিত হৈহয়পতির দুহিতা লজ্জার বিবাহ হইয়াছিল। মুদ্রায় নামটী লজ্জা বলিয়া উল্লিখিত থাকিলেও, নামটি যে প্রকৃত পক্ষে লজ্জাবতী তাহাতে ভুল নাই।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

বাদশাহের বিবাহ।

গ্রীষ্ম কাল। সিন্ধুদেশের বাদশাহ আহমদশাহ নিজ রাজধানী পরিত্যাগ করিয়া রজতসরোবরনামক হ্রদের সমীপবর্ত্তী সুশীতল প্রাসাদে আমোদপ্রমোদে কাল যাপন করিতেছেন। তিনি বলিষ্ঠ রূপবান্ পুরুষ। এই সবে যৌবনে পদার্পণ করিয়াছেন, কিন্তু ইতিমধ্যেই যোদ্ধা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। সঙ্গীত, কবিতা, স্থাপত্য, প্রভৃতির উৎসাহদাতা বলিয়াও তাঁহার সুযশ আছে। সুন্দর হ্রদের মধ্যে কত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অরণ্যানীসমাচ্ছন্ন দ্বীপ রহিয়াছে। জ্যোৎস্নাবিধৌত রাত্রিকালে এই সকল দ্বীপের পার্শ্ব দিয়া তিনি কয়েকজন সহচরসহ প্রমোদতরণীতে ভাসিয়া চলিয়াছেন। গায়কগণ তাঁহার চিত্তবিনোদনার্থ নানা প্রকার গীত গাহিতেছে। মুসলমান গায়কগণ বাদশাহের সামরিক কীর্ত্তি, স্বর্গের হুরী, গোলাপ ও বুলবুলের প্রণয়কাহিনী, প্রভৃতি নানা বিষয়ে গীত রচনা করিয়া গাহিতেছে। ক্ষেপণীর তালে তালে, গায়ক-স্বর-লহরীর উত্থানপতনের সহিত বাদশাহের হৃদয় সুখে নৃত্য করিতেছে। তাঁহার মত সুখী কে? কিন্তু প্রেম ব্যতিরেকে মানুষের সুখ বা সুখের স্বপ্ন পূর্ণ হয় না। বাদশাহের সুখে এই জন্য যেন দুঃখের বেদনা ছিল। তাঁহার হৃদয় যেন নিজের অভাব বুঝিতে পারিতেছিল না। এমন সময় একজন হিন্দু গায়ক এক অনুপমরূপলাবণ্যবতী রাজপুত তরুণীর বিষয় গান করিয়া উঠিল। একে যৌবন, তাহার উপর জ্যোৎস্নাপ্লাবিতা রজনী, তদুপরি প্রকৃতির সুরম্য লীলানিকেতনম সুমধ্যমা, সীতাসমা তরুণীর কাহিনী! বাদশাহ কেবলমাত্র কল্পনানেত্রে এই রাজপুত নারীকে দেখিয়া তাঁহার প্রতি অনুরাগী হইয়া পড়িলেন; জিজ্ঞাসা করিলেন—"এই রমণীরত্ন কোথায় কোন্ যুগে পৃথিবীকে অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন? কোন্ কাফের তাঁহার স্বামী ছিল?" গায়ক উত্তর করিল—"তিনি অনূঢ়া এবং এখনও জীবিত আছেন। আমি আহোর-দুর্গপতি পর্ব্বতসিংহের কন্যা কমলাবতীর রূপগুণ কীর্ত্তন করিতে ছিলাম।" নৃপতি কহিলেন—"কমলাবতীর সৌন্দর্য্য যদি তোমার বর্ণনার অনুযায়ী হয়, তাহা হইলে আমি তাঁহাকে বিবাহ না করিয়া ছাড়িব না; না হইলে তোমার অত্যুক্তির ফলস্বরূপ তোমার প্রাণদণ্ড হইবে।" এই বলিয়া তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন, এবং প্রাসাদের তরঙ্গবিধৌত মর্ম্মরসোপানাবলীর নিকট নৌকা লাগাইতে বলিলেন।

পরদিন তিনি নিজ প্রধান ব্রাহ্মণ মন্ত্রীকে ডাকিয়া পাঠাইয়া তাঁহাকে পর্ব্বতসিংহের কন্যার বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। ব্রাহ্মণের উত্তরের সহিত কবির বর্ণনা অক্ষরে অক্ষরে মিলিয়া গেল। প্রেমাসক্ত বাদশাহ অবিলম্বে পর্ব্বতসিংহকে জানাইতে আদেশ করিলেন যে তিনি তাঁহার কন্যা কমলাবতীর পাণিগ্রহণ করিতে মনস্থ করিয়াছেন। অনেক রাজপুতনারী মুসলমান বাদশাহ ও ওমরাদিগের অন্তঃপুরবাসিনী হইয়াছিলেন। কিন্তু পর্ব্বতসিংহের নিকট বাদশাহের প্রস্তাব অত্যন্ত অপমানকর বোধ হইল। তাঁহার কন্যা মুসলমানের অঙ্কশায়িনী হইবে, তাঁহার পবিত্র কুল কলঙ্কিত হইবে, এ চিন্তা তাঁহার পক্ষে দুঃসহ বোধ হইল। কিন্তু আত্মরক্ষার জন্য সময় পাইবার নিমিত্ত তিনি নৃপতির প্রস্তাবে সম্মতির ভাণ করিলেন এবং ভিতরে ভিতরে আহোরের গিরিদুর্গে প্রস্থান করিয়া আহমদশাহের সঙ্কল্পিত অপমান হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য সমুদয় জ্ঞাতি কুটুম্ব ও অনুচরবর্গকে আহ্বান করিলেন।

এদিকে আহমদশাহ পর্ব্বতসিংহের সম্মতির সংবাদ পাইয়া দশ হাজার সুসজ্জিত সৈন্য লইয়া আহোর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তিনি নিজেই রৌপ্য হাওদার উপর হস্তিপৃষ্ঠে

আরোহণ করিয়া সৈন্যদল পরিচালনা করিয়া চলিলেন। পার্শ্বে কমলাবতীর জন্য আর একটি সুসজ্জিত হস্তী। এই প্রকারে আহমদশাহ আহোর দুর্গের প্রাচীরের সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া দুর্গাধিপতিকে দ্বার খুলিয়া দিতে বলিলেন। উত্তরে একটি তীর আসিয়া তাঁহার হাওদার উপরিস্থ মুকুটে বিদ্ধ হইয়া কাঁপিতে লাগিল। তীরে একটি পত্র বাঁধা ছিল —"যে তীরন্দাজ এই তীর ছুড়িয়াছিল, সে পর্ব্বত সিংহের কন্যার পাণিপ্রার্থী বর্ব্বরের মস্তিষ্কেও উহা বিদ্ধ করিতে পারিত। সময় থাকিতে সাবধান হও এবং গুরুতর বিপৎপাতের পূর্ব্বে পলায়ন কর।" সঙ্গে সঙ্গে বাদশাহকর্ত্তৃক নিজ ভাবীপত্নীর জন্য প্রেরিত উপহার, বহুমূল্য পরিচ্ছদ, অবজ্ঞার সহিত দেওয়ালের উপর দিয়া বাহিরে নিক্ষিপ্ত হইল। জীর্ণ মলিন বস্ত্রের মত উহা বাদশাহের হস্তীর পাদপ্রান্তে ধূল্যবলুণ্ঠিত হইল। এই প্রকারে উভয় পক্ষে আমরণ যুদ্ধ ঘোষিত হইল। মুসলমান সৈন্যদল যুদ্ধঘোষণার অব্যবহিত পরেই রাজপুত-শরবৃষ্টির ভয়ে প্রাচীরসমীপবর্ত্তী আশ্রয়বিহীন স্থান হইতে দূরে পলায়ন করিল।

আহমদ শাহের প্রেমযাচনা এখন দুর্গাবরোধে পরিণত হইল। কমলাবতী তাঁহার বাহুপাশে আবদ্ধা হইলেন না; পরিবর্ত্তে কমলাবতীর পিতৃদুর্গ শত্রুসৈন্যকর্ত্তৃক অবরুদ্ধ হইয়া পড়িল। আহমদশাহ পাত্রী ও তাঁহার পিতার মনস্তুষ্টির জন্য প্রচুর ধনরত্ন পাঠাইয়াছিলেন। পর্ব্বতসিংহ তদ্দ্বারা দুর্গপ্রাচীর দৃঢ়তর এবং দুর্গরক্ষক সৈন্যগণকে উৎকৃষ্টতর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিয়াছিলেন। অবরোধকগণ প্রাচীরসমীপে আসিবামাত্র শরবিদ্ধ, বা প্রাচীরোপরি রাশীকৃত বৃহৎ বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড নিক্ষেপে নিষ্পেষিত হইয়া প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল। দুর্গরক্ষকেরা কখন কখন অবরোধকদিগকে প্রাচীরগাত্রে সিঁড়ি লাগাইতে দিতেছিল; কিন্তু সিঁড়িতে সৈন্যেরা কিয়দ্দূর উঠিবামাত্র তাহা উল্টাইয়া ফেলিয়া তাহাদিগের প্রাণবধ করিতেছিল। এই প্রকারে বলপূর্ব্বক দুর্গপ্রবেশ করিবার চেষ্টা বিফল হওয়ায় আহমদশাহ ভিন্ন পন্থা অবলম্বন করিলেন। তিনি সৈন্যদল দ্বারা এরূপভাবে দুর্গ বেষ্টন করিয়া বসিয়া রহিলেন যে তাহার ভিতর আর কোন প্রকারে খাদ্যদ্রব্য আমদানী হইবার উপায় রহিল না। দুই তিনমাস পরে সঞ্চিত খাদ্য ফুরাইয়া আসিল। বাহির হইতে কেহ যে রাজপুতদিগের উদ্ধার সাধন করিবে, সে আশাও ছিল না। বাদশাহকে কন্যা সম্প্রদান করিতে রাজী হইলে কোন বিপদ ছিল না। কিন্তু পর্ব্বতসিংহ সে চিন্তাকে মনে স্থান দিলেন না।

রাজপুতেরা আহমদশাহের প্রস্তাবে সম্মত হওয়া বা বশ্যতা স্বীকার করা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়ঃ মনে করিল। কিন্তু মৃত্যুচিন্তাতেও ভয় আছে। তাহারা মরিলে তাহাদের পত্নী ও কন্যাগণ মুসলমানের পত্নী হইবে বা অধিকতর দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হইবে। উপায় ভীষণ জোহরব্রতাবলম্বন। অগ্রে নারী ও শিশুগণ অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জ্জন করিবে। তার পর যোদ্ধারা প্রাণের মায়া ছাড়িয়া দিয়া বেগে দুর্গ হইতে নিষ্ক্রমণপূর্ব্বক শত্রুদলকে আক্রমণ করিবে।

নারীগণ অগ্নিতে দেহাহুতি দিতে স্বীকৃত হইল। কেহ কেহ যোদ্ধৃবেশে পিতা, পতি বা ভ্রাতার পার্শ্বে দেহত্যাগ করা অধিকতর বাঞ্ছনীয় মনে করিল। দুর্গাভ্যন্তরে ভীষণ অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত হইল। প্রথমে তন্মধ্যে সমুদয় অলঙ্কার ও ধনরত্ন নিক্ষিপ্ত হইল। তাহার পর নারীগণ, কি বৃদ্ধা, কি প্রৌঢ়া, কি যুবতী, সকলে অনলে ঝম্প দিয়া পড়িল, কেহ কেহ বা স্বেচ্ছায় তরবারির উপর দেহ নিক্ষেপ করিয়া ভবলীলা সাঙ্গ করিল। আহোরে নারী বলিতে আর কেহ রহিল না। পরদিন প্রাতে পুরুষদের পালা। কিন্তু নারীদের বীরত্বেরই অধিক প্রশংসা করিতে হয়। যাহার মাতা, ভগিনী, স্ত্রী, কন্যা, মরিয়াছে, তাহার জীবনের মায়া না থাকাই সম্ভব। শত্রুতরবারির আঘাতে প্রাণত্যাগ করা, পুড়িয়া মরা অপেক্ষা অনেক সোজা। তাহার পর, যুদ্ধক্ষেত্রের উত্তেজনা আছে, উন্মাদনা আছে, প্রতিহিংসার ভীষণ আনন্দ আছে; শান্তচিত্তে পতিপুত্রের মুখ দেখিতে দেখিতে অনলকুণ্ডে ঝাঁপ দেওয়া—ইহাতে এ সকল কিছুই নাই। আছে কেবল নারীত্বের তেজ। পুরুষগণ শিরস্ত্রাণে তুলসীপত্র ধারণ করিল, গলায় শালগ্রাম শিলা বন্ধন করিল। তাহার পর আড়াই হাজার যোদ্ধা হরিদ্রাবর্ণ পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া দুর্গের সিংহদ্বারের নিকট সমবেত হইল। বিদায়ের শেষ আলিঙ্গন সমাপ্ত হইল। সিংহদ্বার উন্মুক্ত হইল। সর্ব্বাগ্রে পর্ব্বতসিংহ ও তাঁহার পুত্র রামসিংহ এবং পশ্চাৎ পশ্চাৎ অন্যান্য রাজপুত

যোদ্ধারা গিরিনদীর ন্যায় বেগে মুসলমানসৈন্যের উপর নিপতিত হইলেন। বাদশাহের রেশমী তাঁবুর উপর যেখানে মহম্মদের সবুজ নিশান উড়িতেছিল, রাজপুতগণ তদভিমুখে ধাবিত হইল।

মুসলমান শিবির একটি প্রকাণ্ড মাটির আইল দ্বারা রক্ষিত ছিল। প্রথম আক্রমণেই বিনা বাধায় এই মৃণ্ময় প্রাকার ভাঙ্গিয়া গেল। মুসলমানেরা হঠাৎ আক্রান্ত হওয়ায় কিছু কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িল। রাজপুতেরা তরবারির সাহায্যে পথ পরিষ্কার করিতে করিতে বাদশাহের তাঁবুর দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। আহমদশাহ তাড়াতাড়ি হস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন। রাজপুতদিগের ভীষণ আক্রমণে যে সকল সৈন্য হটিয়া গিয়াছিল, এখন তাহারা বাদশাহের হাতীর চারিদিকে আসিয়া জুটিতে লাগিল। কিন্তু শিবিরের দূরবর্ত্তী স্থান সমূহ হইতে সৈন্য আসিয়া জুটিতে অনেক সময় গেল। ইতিমধ্যে আহমদশাহের অবস্থা বড় সঙ্কটাপন্ন হইল। মৃত্যু কিম্বা বন্দিদশা অবশ্যম্ভাবী বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু আহমদশাহ কাপুরুষ ছিলেন না। তিনি কেবল যে আততায়ীদিগের প্রতি তীর নিক্ষেপ করিতেছিলেন, সাহসের সহিত আত্মরক্ষা করিতেছিলেন, তাহা নয়, অধিকন্তু উৎসাহপূর্ণ বাক্য ও হস্তসঞ্চালনাদি দ্বারা নিজ সৈন্যগণের হৃদয়েও নববলের সঞ্চার করিতেছিলেন। তাঁহার শরীররক্ষকেরা তাঁহার হস্তীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। যুদ্ধ করিতে করিতে তাহারা প্রত্যেকে প্রাণ হারাইল। অন্য একদল সৈন্য আসিয়া তাহাদের স্থান অধিকার করিল। কিন্তু রাজপুতদিগের অগ্রগতি নিবারিত হইল না। তাহারা ঘোরতর যুদ্ধ করিতে করিতে রাজার হস্তীর ঠিক্ সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল।

এই সময়ে রামসিংহের সাহসিকতায় রাজপুতবৈরনির্য্যাতনব্রতের উদ্‌যাপন হয় হয় হইল। তিনি সবেগে আহমদশাহের হস্তীর উদরের নীচে গিয়া পড়িলেন এবং বর্চ্ছি দিয়া তাহার হাওদার পেটী কাটিয়া ফেলিলেন। হাওদা উল্টিয়া পড়িয়া গেল, বাদশাহের দেহ ধূলিধূসরিত হইল। রামসিংহ নিজে এবং আরও দুএকজন রাজপুত লম্ফ দিয়া তাঁহার উপর আসিয়া পড়িলেন, কিন্তু তাঁহাকে হত্যা করিতে পারিলেন না। আহমদশাহ অবিলম্বে তরবারি হস্তে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং নিকটবর্ত্তী অনুচরগণ আসিয়া না পৌঁছা পর্য্যন্ত অতিশয় দক্ষতার সহিত আত্মরক্ষা করিতে লাগিলেন।

এখন কে হারে কে জিতে বলা যায় না। কিছুক্ষণ এই ভাবে যুদ্ধ চলার পর মুসলমানশিবিরের দূরতম স্থান সকল হইতে দলেদলে সৈন্য আসিয়া পৌঁছিতে লাগিল। রাজপুতগণ মুসলমানদিগকে তীব্রবেগে আক্রমণ করিয়া একেবারে তাহাদের শিবিরের কেন্দ্রস্থলে গিয়া পৌঁছিয়াছিল। এখন মুসলমানেরা তাহাদিগকে ঘিরিয়া ফেলিল। রাজপুতগণ বৃত্তাকারে শত্রুদলের সম্মুখীন হইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিল। মৃতসৈন্যগণের শবস্তূপই এখন তাহাদের আত্মরক্ষার একমাত্র উপায়স্বরূপ হইল। যতই তাহাদের সংখ্যা হ্রাস পাইতে লাগিল, তাহাদের ব্যূহও তত সংকীর্ণ হইয়া আসিতে লাগিল। তাহাদের তরবারি ভাঙ্গিয়া বা ভোঁতা হইয়া যাইতে লাগিল; অবিরত যুদ্ধে দেহ অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল। সুতরাং এখন তাহারা আক্রমণ পরিত্যাগ করিয়া কেবল আত্মরক্ষায় মন দিতে বাধ্য হইল। তথাপি মধ্যে মধ্যে দুপাঁচজন রাজপুত প্রাণের মায়া ছাড়িয়া দিয়া মুসলমান সৈন্যদলের মধ্যে সবেগে প্রবেশ করিয়া যত জনকে মারিতেছিল, হত্যা করিয়া বীরবাঞ্ছিত মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিতেছিল।

এখনও পর্ব্বতসিংহের ছত্র ও পতাকা উর্দ্ধে ধৃত হইয়াছিল। মুসলমানেরা সহস্র চেষ্টাতেও উহা দখল করিতে পারে নাই। শরবিদ্ধ হইয়া পর্ব্বতসিংহ মৃত্যুমুখে পতিত হইবামাত্র তাঁহার পুত্র রামসিংহ তাঁহার উত্তরাধিকারিস্বরূপ ছত্রের নীচে দণ্ডায়মান হইয়া ঘোরতর যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। তাঁহার তরবারি ভগ্ন হইবামাত্র তিনি একজন স্থূলকায় খাঁর হস্ত হইতে তরবারি কাড়িয়া লইয়া যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। এই অস্ত্র দ্বারা তিনজন শত্রুর প্রাণ বধ করিবার পর তিনিও আহত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলেন। এতক্ষণে এই ভীষণ যুদ্ধের অবসান হইল। পাঁচ হাজার মৃত সৈন্যের দেহ ধূলিসমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়া রহিল। এখন আর মুসলমানদিগের 'দীন দীন' রবের উত্তরে রাজপুতদিগের 'হর হর মহাদেব' ধ্বনি শ্রুত হইতেছিল না। আম্বেরের সমুদয় যোদ্ধা রণস্থলে

কালকবলে পতিত হইয়াছে। কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব্বে তাহারা সম বা অধিকসংখ্যক শত্রুকে শমনসদনে প্রেরণ করিয়াছে।

আহমদশাহ যখন প্রেমপাত্রী কমলাবতীকে নিজ প্রাসাদে লইয়া যাইবার জন্য অরক্ষিত দুর্গে প্রবেশ করিলেন, তখন তিনিআপনাকে নির্জ্জন প্রেতপুরীর মধ্যে অবস্থিত দেখিলেন। দুর্গপ্রাচীরের বাহিরে ও ভিতরে সমুদায় স্থান পূতিগন্ধময়। আহমদশাহ কমলাবতীর প্রেম যাচনার এই শোচনীয় পরিণামে প্রথমতঃ হৃদয়ে বড় অবসাদ অনুভব করিলেন। কিন্তু একজন গোয়েন্দা, কমলাবতী অনলকুণ্ডে দেহত্যাগ করেন নাই, এই সংবাদ দেওয়ায় তাঁহার হৃদয়ে আশা আবার অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল। আহোরদুর্গাবরোধের পূর্ব্বেই পর্ব্বত সিংহ দেবীকে বিশ্বস্ত এক প্রতিবেশী সর্দ্দারের নিকট প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইহা শুনিয়া আহমদশাহ ঐ সর্দ্দারকে বলিয়া পাঠাইলেন যেন তিনি কমলাবতীকে বাদশাহের হস্তে সমর্পণ করেন। পর্ব্বতসিংহের বন্ধু তাঁহারই মত প্রাণপণ করিয়া কমলাবতীকে বাদশাহের বিরুদ্ধে রক্ষা করিতে প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু কমলাবতী অধিকতর রক্তপাতের কারণ হইতে অস্বীকার করিলেন। তিনি বলিলেন "বাদশাহ যখন আমাকে বিবাহ করিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন, তখন তাঁহারই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক। মনোরথ পূরণ জন্য তাঁহাকে যেন কখনও অনুতাপ করিতে না হয়।" কমলাবতী কেবল যে বাদশাহকে বিবাহ করিতে সম্মত হইলেন তাহা নয়, বিবাহবাসরে পরিধান করিবার জন্য তাঁহাকে স্বর্ণরত্নাদিখচিত বহুমূল্য পরিচ্ছদ প্রেরণ করিতে অঙ্গীকার করিলেন। নিজ কুলোচ্ছেদক শত্রুকে বিবাহ করিতে, নিজ পিতা ও ভ্রাতার রক্তে কলঙ্কিতহস্ত মুসলমানের পত্নী হইতে, ইচ্ছুক এই কুলকলঙ্কিনীকে রাজপুতমাত্রেই অভিসম্পাত করিতে লাগিল।

রজতসরোবরের কূলে বাদশাহের প্রাসাদের মর্ম্মরপ্রস্তরনির্ম্মিত বারাণ্ডায় বিবাহোৎসব সম্পন্ন হইবে। হিন্দুমুসলমান যাহাতে ভবিষ্যতে মিলিয়া মিশিয়া তাঁহার রাজত্বে বাস করিতে পারে, এইজন্য তিনি বিশেষ আড়ম্বরের সহিত এই শুভকার্য্য সমাধা করিতে মনস্থ করিলেন। যে সকল রাজপুত তৎকালে বা অন্য কোনও সময়ে তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়াছিল, তিনি তাহাদের সকলকেই ক্ষমা করিলেন। যতদূর সম্ভব হিন্দুপ্রথা অনুসারে বিবাহ সমাধানের আয়োজন হইল। বিবাহের দিন সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণভোজনের বন্দোবস্ত হইল। দেশবিদেশ হইতে দলেদলে লোক আসিতে লাগিল। তিনি রাজোচিত সমারোহে সকলের অতিথিসৎকার করিতে লাগিলেন।

আজ আহমদশাহের সুখের সীমা নাই। আজ তাঁহার বিবাহের দিন। কমলাবতী ও আহমদশাহ পুষ্পমালা পরিয়া পাশাপাশি বসিয়াছেন। বাদশাহ কমলাবতীর প্রদত্ত রত্নখচিত পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছেন। মুসলমানেরা দেখিয়া অত্যন্ত বিরক্ত হইলেন যে আহমদশাহ তুলসীপত্র হস্তে লইয়া কমলাবতীর পাণি পীড়ন করিলেন, বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইয়া গেল।

শুভকার্য্য সম্পন্ন হইয়াগেল। কমলাবতী গাত্রোত্থান করিলেন, এবং বাদশাহের হাত ধরিয়া তাঁহাকে বারাণ্ডার কিনারায় লইয়া গিয়া বলিলেন, "স্বামিন্! এখন আপনি একবার সূর্য্যালোকে দাঁড়াইয়া প্রজাবৃন্দকে দর্শন দিয়া তাহাদিগকে পুলকিত করুন।" বাদশাহ সূর্য্যালোকে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সহস্র কণ্ঠের জয়ধ্বনি যুগপৎ তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিল। সমুদয় হ্রদ ও উপকূল জনাকীর্ণ। যতদূর চক্ষু যায়, পর্ব্বত, উপত্যকা, প্রান্তর, অরণ্যানী, সমুদায়ই তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভূত। সর্ব্বোপরি, তাঁহার প্রেমাস্পদা কমলাবতী আজ তাঁহার; বাহুবলে শত্রুকুলকে পরাজিত ও নির্ম্মূল করিয়া, সমুদয় বাধা অতিক্রম করিয়া, তিনি কমলাবতীকে বিবাহ করিয়াছেন। ঐশ্বর্য্য ও সৌভাগ্যগর্ব্বে তাঁহার বক্ষস্থল স্ফীত হইয়া উঠিল। সম্পদের মোহ তাঁহাকে অভিভূত করিয়া ফেলিতে লাগিল। তাঁহার তরুণী নববধূ তাঁহার চক্ষুর উপর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। ইহা ভীরু নববধূর সলজ্জ অপাঙ্গদৃষ্টি নহে। ইহা কেমন যেন রহস্যময়। কমলাবতী গম্ভীর ভাবে তাঁহাকে বলিলেন, "স্বামিন্! এই গৌরবের ঐশ্বর্য্যের, সাফল্যের আবেশময় মুহূর্ত্ত যতক্ষণ থাকে, সম্ভোগ করুন। কিন্তু স্মরণ রাখিবেন, মানুষ যখন সম্পদের সর্ব্বোচ্চ শিখরে আরূঢ় হয়, তখনই সে দেবতাগণের দর্পহারিণী শক্তির লক্ষ্যস্থল হইয়া উঠে। আমরা এক্ষণে যৌবন, স্বাস্থ্য ও প্রেমের পূর্ণস্রোতে ভাসমান; কিন্তু একদিনে, এমন কি এক মুহূর্ত্তে কালের করাল আবর্ত্ত আমাদিগকে গ্রাস করিতে পারে।" আহমদশাহ একটু

হাসিলেন। তাঁহার হৃদয় এখন প্রেমে এরূপ পূর্ণ ছিল, যে কমলাবতী যাহা বলেন, যাহা করেন, তাহাই তাঁহাকে তাঁহার চক্ষে সুন্দরতর করিয়া তুলে।

বারাণ্ডাস্থিত সভাসদ্‌গণ এবং হ্রদতটবর্ত্তী ও হ্রদে ভাসমান নৌকায় সমাসীন প্রজাবৃন্দ বিস্ময়ের সহিত দেখিতেছিল যে সূর্য্যালোকে বাদশাহের পরিচ্ছদের হীরক সকল যেন ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিতেছিল। হঠাৎ তাহারা দেখিয়া ভীত ও স্তম্ভিত হইল যে তাঁহার দক্ষিণ স্কন্ধ হইতে সত্যসত্যই অগ্নিশিখা উত্থিত হইতেছে। একি স্বপ্ন, না তাহাদের চক্ষের ভ্রম?

কমলাবতী যে পরিচ্ছদ বাদশাহকে উপহার দিয়াছিলেন, তাহাতে সহজদাহ্য বিষাক্ত পদার্থ সকল মাখান ছিল। সূর্য্যোত্তাপে তৎসমুদয় জ্বলিয়া উঠিল। যুদ্ধক্ষেত্রে আহমদশাহ ভয় কাহাকে বলে জানিতেন না। কিন্তু এই ভীষণ মৃত্যুর সম্মুখে তিনি সামান্য মানবের মত ভয়ে দিশাহারা হইলেন। বিষাক্ত পোষাক দহ্যমান দেহ হইতে ছিঁড়িয়া ফেলিবার চেষ্টা করিতে করিতে তিনি ঘোরতর যাতনাসূচক চীৎকার করিয়া ইতস্ততঃ দৌড়িতে লাগিলেন। বেশী ক্ষণ দৌড়িতে হইল না। তাঁহার সর্ব্ব শরীর দেখিতে দেখিতে অগ্নিশিখা-পরিব্যাপ্ত হইয়া উঠিল, এবং মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রবলপরাক্রান্ত বাদ শাহের রত্নখচিত দেহ অঙ্গারস্তূপে পর্য্যবসিত হইল। এতক্ষণ কমলাবতী বারাণ্ডার আলিসায় উঠিয়া পরস্পর-বিরোধী নানাভাবপূর্ণ হৃদয়ে বাদশাহের মৃত্যুযন্ত্রণা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। যখন বুঝিলেন যে তাঁহার পিতা, ভ্রাতা ও জ্ঞাতিবর্গের উচ্ছেদের প্রতিশোধ লওয়া হইয়াছে, তখন রজতহ্রদের গভীর জলে লম্ফ দিয়া পড়িলেন।*

রসাতলাগ্নি।

আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে নৈসর্গিক বিষয়ের বর্ণনা পাঠ করিতে করিতে একটা কথা সর্ব্বদা মনে হইয়াছে যে, প্রাচীনেরা বহু বিষয়ের কথা কহিয়াছেন, কিন্তু আগ্নেয়-গিরির উৎক্ষেপের কথা কহেন নাই। জ্যোতির্ব্বিসংহিতায়, পুরাণে, মহাভারতে বহুবিধ নৈসর্গিক ঘটনার উল্লেখ আছে, পৌরাণিক কথাচ্ছলে বহুবিধ অদ্ভুত উপাখ্যান আছে, কিন্তু আগ্নেয়গিরির ভয়ঙ্কর উৎক্ষেপ লইয়া পৌরাণিকী কথা পাই না। এই উৎক্ষেপব্যাপারটা জানিয়া শুনিয়া পুরাতন শাস্ত্র খুজিতে বসিলে, এবং "শাস্ত্রে অবশ্যই আছে" এই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইলে, দুই এক স্থানে ইহার উল্লেখ পাওয়া যাইতে পারে। সূর্য্যাগ্নি, বিদ্যুতাগ্নি, শমীবৃক্ষাগ্নি, হুতাগ্নি প্রভৃতি বহুবিধ অগ্নির সহিত রসাতলাগ্নির কথাও আছে। এই সকল অগ্নির প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করিলে রসাতলাগ্নিকে আগ্নেয়গিরির অগ্নি বলিতে সন্দেহ থাকে না। মহাভারতে (আদিঃ ১৭৯ অঃ) এবং বিষ্ণুপুরাণাদিতে ঊর্ব্বমুনি সাগরে অগ্নি জাত করিয়াছিলেন। সে অগ্নি বাড়বাগ্নি নামে খ্যাত। বড়বাসম্বন্ধীয় অগ্নি প্রায়ই সমুদ্রাগ্নি বুঝায়। কিন্তু বড়বা অর্থে অশ্ব, ও পাতালও আছে। অশ্ব কারণ ঔর্ব্বাগ্নি হইতে হয়শিরা অসুরের উৎপত্তি হইয়াছিল। দক্ষিণে সমুদ্র, দক্ষিণে পাতাল ইহা চিরপ্রসিদ্ধ কথা। ঔর্ব্বঘটিত উপাখ্যান যাহাই হউক, বড়বাগ্নি অর্থে অনেকেই আগ্নেয়গিরির অগ্নি বুঝিয়াছেন। বড়বা দক্ষিণে অবস্থিত। আজকাল আমরা যাহাকে কুমেরু বলিয়া থাকি, তাহার প্রাচীন নাম বড়বা।

যদি বড়বানলে আগ্নেয়গিরির উল্লেখ হইয়া থাকে, তাহা হইলে কি প্রাচীনেরা যাবা দ্বীপের আগ্নেয়গিরির উৎক্ষেপ সংবাদ পাইয়াছিলেন? পূর্ব্বকালে বঙ্গোপসাগরের বারেন দ্বীপের আগ্নেয়গিরির ঘন ঘন উৎক্ষেপ হইত। ঐ দ্বীপের বর্ত্তমান অবস্থা স্মরণ করিলে উহার প্রাচীন কাহিনী অনুমিত হয়। যাবা দ্বীপের সহিত প্রাচীন আর্য্যগণের পরিচয় ছিল। তথাকার হিন্দু দেবদেবীর প্রতিমা কলিকাতার কৌতুকাগারে রক্ষিত হইয়াছে। যে দ্বীপের নিকটস্থ সাণ্ডা নামক প্রণালীতে ক্রাকাতোয়া আগ্নেয়গিরির উৎক্ষেপের প্রচণ্ডতার তুলনায় সকল জ্ঞাত আগ্নেয়গিরির উৎক্ষেপ যৎসামান্য বলিয়া বোধ হইয়াছে, তাহার সংবাদ আমাদের প্রাচীনেরা শুনিয়া থাকিবেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় তাঁহারা রোমক-পুরবাসীদিগের নিকট বিসুবিয়সের অগ্নি উদ্গিরণ শুনিতে পান নাই। যে সময়ে বিসুবিয়সের অগ্নিময় পাংশুজালে ইতিহাসখ্যাত পম্পী ও হর্কিলিনিয়ম প্রোথিত হইয়া যায়, সে সময়ে যবনদিগের সহিত এদেশবাসীর পরিচয় বিলক্ষণ ছিল। অথচ এমন একটা অদ্ভুত নৈসর্গিক ব্যাপারের বিন্দু

* একটি ইংরাজী গল্প অবলম্বন করিয়া লিখিত।

বিসর্গ সংহিতাজ্যোতিষে কিংবা পুরাণে স্থান পায় নাই। ইহাতে বোধ হয় যেন কেবল শোনা কথায় আমাদের প্রাচীনেরা কান দিতেন না।

বিশ বৎসর পূর্ব্বে ক্রাকাতোয়ার ভয়ঙ্কর কাণ্ড হইয়া গিয়াছে। তজ্জনিত দিগ্দাহ আমরা এখানে বসিয়া প্রত্যক্ষ করিয়াছি। তাহার পর গত মে মাসের পিলীগিরির উৎক্ষেপে মানবজগৎ স্তব্ধ হইয়াছে। দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরে কারিব সাগরের পূর্ব্বভাগে অনেকগুলি ছোট বড় দ্বীপ আছে। তাহাদের একটার নাম মার্টিনিক। দ্বীপটি ফরাসীদের। উহার রাজধানী বা প্রধান নগর সেণ্টপিরী, জনসংখ্যা চল্লিশ হাজার। কিন্তু দেড় মিনিটের মধ্যে সেই চল্লিশ হাজার নরনারী,—শিশু যুবা বৃদ্ধ, দ্বীপের পশুপক্ষী কীটপতঙ্গ, বৃক্ষ লতাতৃণ, সমুদয় অগ্নিময় পাংশুস্পর্শে দগ্ধ হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছে। ৮ই মে প্রাতে প্রায় ৮ টার সময় এই লোমহর্ষণ কাণ্ডদ্বারা মানবের তুচ্ছতা ও প্রাকৃতিক বিশাল শক্তির জলন্ত দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে। উহার এক সপ্তাহ হইতে মৃদু মৃদু ভূকম্পে নিকটস্থ কোন কোন দ্বীপ কাঁপিয়া উঠিয়াছিল। পিলীগিরিও মার্টিনিক দ্বীপে আগ্নেয় ধূলি বর্ষণ করিয়াছিল। চারিদিন পূর্ব্বে পিরীনগরবাসীরা উৎপাতের পূর্ব্বসূচনা ভাবিয়াও ভাবে নাই। তিন দিন পূর্ব্বে পিলীর গহ্বর উচ্ছ্বসিত করিয়া আগ্নেয় নিস্রব প্রায় পাঁচমাইল দূরবর্ত্তী সাগরজলে প্রবাহিত হইয়াছিল। সেই অগ্নি ও জলের সংগ্রামে বিশাল তরঙ্গ উৎপন্ন হইয়া পিরী নগরের কিয়দংশ নিমজ্জিত করিয়াছিল। আগ্নেয়গিরির গভীর গর্জ্জনে, উদ্গীর্ণ ধূমে, ভূমির কম্পনে, পিরীবাসীদিগের মন কিরূপ আতঙ্কে বিহ্বল হইয়াছিল, তাহা আমরা কল্পনাও করিতে পারি না। উৎক্ষেপের পূর্ব্বদিন পর্জ্জন্যও ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। উৎক্ষেপের দিন বজ্রাঘাত ও ঝঞ্ঝাবাত শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করিতে দেখিয়া নগরবাসীরা সুসজ্জিত হইয়া গির্জ্জায় যাইবার উদ্যোগ করিতেছিল। সে দিন তাহাদের একটা পর্ব্বদিন। কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই গাঢ় অন্ধকার, শ্বাসরোধকারী অত্যুষ্ণ পাংশুজাল তাহাদের নশ্বরত্ব প্রমাণিত করিল। রোদ্দাম নামক একখানা জাহাজ উহার অল্পক্ষণ পূর্ব্বে পিরীর বন্দরে আসিয়া উপস্থিত হয়। সেই জাহাজের কাপ্তেন সেই হৃদয়বিদারক কাণ্ডের যে বিবরণ দিয়াছেন * তাহা পড়িতে পড়িতে মনে হয় যে, তাহার তুলনায় বাতাবর্ত্তজনিত সাগরতরঙ্গে দক্ষিণ সাবাজপুরের ধ্বংস যেন কিছুই নয়। সেই তরঙ্গের গ্রাস হইতে যাহারা রক্ষা পাইয়াছিল, তাহাদের এক জনের মুখে বিপত্তির বর্ণনা শুনিয়াছি। ফল্‌স পয়েণ্টের সাগরতরঙ্গের জলপ্লাবন উৎকলের পূর্ব্বকূলবাসীর নিকট শুনিয়াছি, কিন্তু বিষাক্ত অগ্নিময় ধূলিদ্বারা শ্বাসরোধের যন্ত্রণার তুলনা পাই না। ঢাকার ও মৈমনসিংহের ঘূর্ণিঝড় ঝড়ের পরাকাষ্ঠা বটে, কিন্তু যে ধূলি স্পর্শে গাত্র দগ্ধ হইয়া অঙ্গারবৎ হয়, সেই রূপ ধূলির ঘূর্ণিঝড় কি মর্ম্মভেদী কাতরধ্বনি বহিয়া লইয়া গিয়াছিল! সে ধূলির এত উত্তাপ যে, তাহার স্পর্শে কাষ্ঠাদি পদার্থ প্রজ্বলিত হইয়াছিল। লোহার খুঁটা বাঁকিয়া ধনুরাকৃতি হইয়াছিল। ইহার সহিত ভূমিকম্প। এতভীষণ যে, ৫০।৬০ মণ ভারী পাথর পাঁচ ছয় হাত দূরে গিয়া পড়িয়াছিল।

মার্টিনিক দ্বীপের দক্ষিণে, প্রায় সাত মাইল দূরে, সেণ্ট ভিনসেণ্ট নামক একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে। দ্বীপটি ইংরাজদিগের। তাহাতেও একটা আগ্নেয়গিরি আছে। পিলীর উৎক্ষেপের কয়েক দিন পূর্ব্বে ইহারও উৎক্ষেপ হইয়াছিল। সেই ধাতুনিঃস্রবে ১৬০০ শত লোক জীবন বিসর্জ্জন করে। কি জানি কবে, মার্টিনিকের দশা ভিনসেণ্টের ঘটে, এই ভাবনায়—ভিনসেণ্টের দশ সহস্র লোক দ্বীপ হইতে পলায়ন করিয়াছে। উহাতে কিন্তু এখনও লক্ষাধিক লোক আছে। দক্ষিণ সাবাজপুরের জনসংখ্যা কম হইয়াছে কি?

এই সকল দৈবী বিপত্তির কারণ জানিলেও নিস্তারের উপায় নাই। হয়ত আকস্মিক রন্ধ্রপথে সাগরজল পিলীর অগ্নিময় গহ্বরে প্রবেশ করিয়াছিল, তাহারই বাষ্পোৎক্ষেপে অগ্নির যুদ্ধ ঘটিয়াছিল। পাতালে কি হইয়াছে, কে জানে? তবে, ইহা যে রসাতলাগ্নির যুদ্ধ, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে।

বোধ করি, প্রাচীন আর্য্যগণ সাগরাম্বরা জম্বুদ্বীপের মধ্যে অশ্বত্থপত্রাকার ভারতবর্ষকে বাসভূমি নির্ব্বাচন করিয়া পরম কল্যাণকর ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। এবর্ষে শীত যেমন, গ্রীষ্মও তেমন; বৃষ্টি যেমন, অনাবৃষ্টিও তেমন; পর্ব্বত যেমন, সমস্থলীও তেমন; অনুর্ব্বর ক্ষেত্র যেমন,

* Pearson's Magazine—Sep.

নদীমাতৃকভূমিও তেমন; গ্রীষ্মমণ্ডলের প্রাণী উদ্ভিদ যেমন ইয়ত্তাহীন, শীতমণ্ডলেরও তেমন;—খনিজও তেমন; কি নাই; তাহা দেখিতে পাই না। কেবল একটি জিনিস তাঁহারা রাখিয়া যান নাই, সেটি এই বিপুল সম্পত্তির ভোক্তা।

দীনের মালা।

অতি ক্ষুদ্র গন্ধহীন ছোট মালা গাছি
দীন এলো সঁপিবারে দেবের দুয়ারে।
সুবাসিত মালা কত, কত রত্নরাজি,
দেখিলেক পূর্ব্বে যথা সজ্জীকৃত থরে,
স্থাপিতে তথায় তার হীন মালা গাছি
ভরে গেল চক্ষু দুটি নীরব রোদনে।
না বলি একটি কথা তার পর, হায়!
চলে গেল দূর পথে আকুল সরমে।
সহসা মন্দিরে ধ্বনি উঠিল বিষাদে,
দেবতার দীর্ঘশ্বাস, কাঁদিল বাঁশরী
অধীর রাগিণী গানে, হলো হীনজ্যোতি
আরতির দীপশিখা, পড়িলেক ঝরি
মঙ্গলমালতীমালা দুয়ার অঙ্গনে।
সমস্ত মন্দির ভরি নীরব বেদনে
ছোট মালাটির হায় অভাবকাহিনী
সারাবেলা দেবতার কাঁদিল চরণে।
লুঠিল সমস্ত দিন একটি আহ্বান,
দীন যথা দূর পথে করেছে প্রয়াণ।

লজ্জাবতী বসু।

মিনতি।

ত্রয়োবিংশ বর্ষ গেল, দেখিতে দেখিতে,
অনন্ত-সাগরে মিলায়ে তরঙ্গপ্রায়,
লক্ষ্যহীন, কর্ম্মহীন! কি কাজ সাধিতে
ওরে মৌন! ওরে দীন! আসিলি হেথায়!
কোন্ শুভলগ্ন তুই পবিত্র করিলি
অজানিত ক্ষুদ্র গেহে জনম লভিয়া?
কোন্ ইতিহাসপত্রে ধরায় রাখিলি
জননীরে মহীয়সী করি'? বিতরিয়া
কোন্ পুণ্যকুসুম-সুবাস হৃদি কা'র
মোহিতে অন্তরে তোর সাধ? কিছু নাই?
নির্গন্ধ কিংশুকসম কোন্ অন্ধকার
বনতলে প্রচ্ছন্ন পত্রের মাঝে, তাই
রহ দিবানিশি নর-চক্ষু অগোচরে
নির্জীব সভয় ক্ষুদ্র পরিধি ভিতরে।
ক্ষুদ্র কূপমণ্ডূকের মত আপনার
ক্ষুদ্র পরিধিরে দেখ ব্রহ্মাণ্ড আকার
অনন্ত অসীম? বিশাল পৃথিবীমাঝে
রেণুতে মিশিয়া কত মহাত্মা বিরাজে
ইয়ত্তা কি করিয়াছ তার?,ভাব মনে
তুমি এক অপূর্ব্ব কাহিনী এ ভুবনে
রেখে যাবে—কীর্ত্তিরথে করি আরোহণ,—
তোমার বন্দনাগানে নরনারীগণ—
নিজ কণ্ঠ পবিত্র করিবে। মূঢ় ওরে!
ভাব নিত্য অহঙ্কারে প্রত্যেক বৎসরে
তোমার প্রস্তর মূর্ত্তি কুসুম সজ্জায়
হবে সুসজ্জিত। দুরাশা কেবলি হায়!
অজ্ঞানমদিরামত্ত মস্তিষ্ক তোমার
শূন্যে বিরচিছে হর্ম্ম্য প্রকাণ্ড আকার।
প্রমত্ত হৃদয় ওরে! তোর উপাসনা
জানিনাকি শূন্য গর্ভ? কাঙ্গাল কামনা
প্রতি পুষ্পে পত্রে তোর নিত্য জাগি' রহে
মেলিয়া তৃষ্ণার্ত্ত নেত্র—ভক্তি মাত্র বহে
দেহে তব শীর্ণা রুদ্ধা তটিনীর প্রায়
আভরণ সম ঘন চন্দন চর্চ্চায়।
ধার্ম্মিক বিপক্ষে তব বিনাশের আশে
দাও না কি বলিদান দেবতার পাশে
মহোল্লাসে সৃজিয়া রুধির নদী? নিজ
কল্যাণ কামনা করি পুরোহিত দ্বিজ
নিয়োজিত করনা কি হোমে? দেহ নাই
শত মুদ্রা মানসিক করি দেব ঠাঁই
কল্যাণের মূল্য রূপে? এ পূজা তোমার

দয়া আকর্ষিবে কহ কোন্ দেবতার ?
বিয়োগে বৈরাগ্য তব বাহিরে উদিত
মাথায় বিভূতি। আছে ভিতরে গোপিত
চিক্কণ বিলাস বাঞ্ছা ক্রোধ-আবরণে।
অঙ্গনার অঙ্গযষ্টি তোমার নয়নে
দুরন্ত তৃষার ছবি করে সমুদিত ;
তবু তুমি আপনারে কর লুক্কায়িত
আপনার ঘৃণিত ভিতরে! কর রোধ
বাসনায় বিবেকের আঁখি। রে অবোধ!
এই তুমি চাহ নিত্য গুরুর আসন
উচ্চ শিক্ষা শিখাতে মানবে? যে আপন
অন্ধকারে আপনি বিভোর, সাজে তারে
আদর্শ আসন? অতি তুচ্ছ হেতু যারে
ক্রোধে লোভে মোহে নিত্য তুলে নাচাইয়া—
সে র'বে আদর্শ উচ্চে কেমনে বসিয়া?
অলঙ্ঘ্য কর্ম্মের বন্ধ জান যদি মন!
অন্তরে করহ তবে মৌন উপাসনা
বাসনারে দিয়ে বলিদান। এ জীবন
ক্ষুদ্র মান' তৃণ সম। জাগিলে কামনা
বুঝিও অন্তরে—উপাসনা নহে তব
সাধনার ধন।—অনুদিত সে বিভব
আজিও তোমার। "কিসে করি আত্মজয়"
এই হোক্ দীক্ষামন্ত্র তব। যদি হয়
সিদ্ধি সমুদিত—তবে জেন সর্ব্বজয়ী
তুমি বীর,—সর্ব্বত্যাগী তথাপি বিষয়ী।
চেষ্টার নাহিক' কাজ—আপনা হইতে
আসিবে অনন্ত শক্তি—বিশ্বের কল্যাণে
আপনি রহিবে বদ্ধ – মগ্ন মহাজ্ঞানে;—
পৃথিবী ত্যজিয়া তবু র'বে পৃথিবীতে।
তাই কহি—ত্যজ' মন! অহঙ্কার যত,
অনন্ত জ্ঞানের দ্বারে শির করি নত
সম্ভ্রমের ভরে। কর্কশতা ত্যাগ কর—
ত্যাগ কর নিষ্ফল গৌরব। পরিহর
বিজ্ঞতম বিচারের তুলাদণ্ড তব
সমদর্শী মহাত্মার পদে। যে বিভব
লভিবে অজ্ঞান! অনিন্দ্য আলোক তার
জুড়াইবে অলস নয়ন। ন্যায় আর
সত্য হোক্ জীবনের সাথী — সুখে দুঃখে
তাহার মর্য্যাদা সদা রেখো হাসিমুখে।
সর্ব্ব-জীবে হোক্ প্রেম মধুরতাময়—
জীবন সমুদ্র পথে আলোক অক্ষয়।
তার পরে সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন যে জন—
ভক্তি পুষ্পে পূজা কোরো তাঁহার চরণ।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, বি. এ.।

বর্ত্তমান সংখ্যার চিত্র।

র্যাফেএলের "ম্যাডোনা ডিলা সেডিয়া"নামে পরিচিত মাতৃদেবীমূর্ত্তি জগদ্বিখ্যাত। মূলচিত্রখানি ইতালীর অন্তঃপাতী ফ্লোরেন্স নগরের পিতি প্রাসাদে আছে। ইহার সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করা নিষ্প্রয়োজন। শিশু ঈশা মাতৃক্রোড়ে উপবিষ্ট আছেন এবং সাধু যোহন ভক্তিভরে তাঁহার দিকে তাকাইয়া আছেন। মূল চিত্রখানির নানাবিধ প্রতিলিপি মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু মূলের সৌন্দর্য্য কোনটিতেই পূর্ণমাত্রায় সংরক্ষিত হয় নাই।

অর্জ্জুন যে রূপে কৃষ্ণের সম্মতিক্রমে তাঁহার ভগিনী সুভদ্রাকে হরণ করিয়া আনিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন, মহাভারতের পাঠকমাত্রেই তাহা অবগত আছেন।

বালুকার ঘর।

জীবন-জলধি-তটে ছিনু দীর্ঘ দিন
বাল্য ধূলিখেলা-লীন ; একান্ত যতনে
আছিনু রচিতে গৃহ বেলা-বালু সনে ;
শিলা-খণ্ড দিয়া,— সিক্ত, উন্মুক্ত পুলিন
অঙ্কিত করিতেছিনু, কল্পনা-সম্ভব
বিচিত্র নবীন সুখ-চিত্র রেখা-পাতে ;—
সহসা, শুনিনু দূরে ঝঞ্ঝাবাত সাথে
সমুত্থিত সিন্ধু-রোল। সহসা, সে রব
ভাঙ্গিল চমক মোর! দেখিনু চাহিয়া
শ্রান্ত দিন গতপ্রায় ; ছাইয়া আকাশ
ঘিরিছে জলদ-জাল ; ফেলি' দীর্ঘশ্বাস,
হেরিনু উচ্ছ্বাস-উর্ম্মি আসিছে বাহিয়া!
নিমেষে সে বেলাভূমি গ্রাসল সাগর,
ভেসে গেল খেলাধুলা বালুকার ঘর!

শ্রীসুরেশচন্দ্র সরকার।



ছিন্নমস্তা।













বীয়াট্রিস্ চেঞ্চী।

গুইডো রেনী কর্ত্তৃক অঙ্কিত

KUNTALINE PRESS

প্রবাসী

দ্বিতীয় ভাগ। } অগ্রহায়ণ, ১৩০৯। { অষ্টম সংখ্যা।

কুকী-পুঞ্জী।

কার্য্যোপলক্ষে আমায় সম্প্রতি যে স্থানটিতে যাইতে হইয়াছিল, তাহার নাম কৈলাসহর। আসাম-বঙ্গ রেল-পথের সমসেরনগর ষ্টেশন হইতে শিবিকারোহণে বা হস্তিপৃষ্ঠে কয়েকটি সুচারু-বিন্যস্ত বিস্তীর্ণ চা-বাগান অতিক্রম করিয়া মনুনাম্নী খরবেগা পার্ব্বত্য স্রোতস্বিনী বাহিয়া এস্থানে উপনীত হইতে হয়। স্থানটি স্বাধীন ত্রিপুরা রাজ্যের অন্তর্গত একটি সবডিভিজন, ব্রিটিশ রাজ্যের শ্রীহট্ট জেলার সন্নিকট। স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্য মনোরম। পূর্ব্বদিকে উত্তর-দক্ষিণ-বিলম্বী শ্যামলশস্পাচ্ছাদিত 'সাত-আইন' পাহাড়-শ্রেণী অদূরেই দৃষ্টি প্রতিহত করে, পশ্চিমে খরস্রোতা মনু আঁকিয়া বাঁকিয়া নিরন্তর একদিকে প্রবাহিতা হইতেছে। এখানকার জলবায়ু ভাল, ফলমূল ও শাকসব্জী প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। ক্ষুদ্র গ্রামটির মধ্যস্থলে শতদল-বহুল 'কাতলের দীঘি।' অতি স্বচ্ছ নির্ম্মল বারিরাশিতে সরোবরটি কূলে কূলে ভরা। দীঘিকাটির পূর্ব্ব ও পশ্চিম পাড়ে আমলা উকীল ও হাকিমবর্গের বাসা, দক্ষিণে কারাগার, উত্তর ও উত্তর-পূর্ব্ব কোণে আদালত গৃহ, থানা ও সেনানিবাস। অদূরে পানিচুপির বৃহৎ বাজার। সুতরাং জঙ্গলের মধ্যে ক্ষুদ্র মহকুমাটিতে সভ্যতানুযায়ী সর্ব্বপ্রকার বিধানই আছে বলিতে হইবে।

স্থানীয় অধিবাসিবৃন্দের মধ্যে মুসলমানই অধিক; তদ্ভিন্ন মণিপুরী, কুকী ও ত্রিপুরাও আছে। বাঙ্গালীর সংখ্যা অতি কম। মণিপুরী ও কুকীদের ভাষা বঙ্গভাষা হইতে পৃথক হইলেও, যাহারা কৈলাসহরের প্রান্তবাসী, তাহারা বাঙ্গালা বলিতে পারে, যদিও তাহা বুঝিতে হইলে অনেকস্থলেই আমাদিগকে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। কুকীগণ ত্রিপুরেশ্বরের প্রজা এবং অসভ্য বলিয়াই পরিগণিত, কিন্তু তাহাদের স্বস্ব সামন্ত দলপতিও আছে, তাহাদিগকে তাহারা 'রাজা' আখ্যায় অভিহিত করে। উহারা পাহাড়ের সানুদেশে এক 'পাড়ায়' স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র 'পুঞ্জী' বা অস্থায়ী আবাস নির্ম্মাণ করিয়া বাস করে, এবং নিকটবর্ত্তী অরণ্য দাহ ও আবাদ করিয়া দা দিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত্ত খনন পূর্ব্বক তন্মধ্যে একসঙ্গে সমুদয় শস্য বপন করিয়া দেয়। ইহাকে তাহারা 'জুম' বলে। 'জুমে' উৎপন্ন কচু, কুমড়া, প্রভৃতি অত্যন্ত সুস্বাদু হয়। এইরূপ দুই তিন বৎসর জুম কৃষিদ্বারা ভূমির উর্ব্বরতা যখন খর্ব্ব হইয়া আসে, উষর মৃত্তিকা যখন অত্যাবশ্যক আহার্য্য যোগাইতেও আপত্তি করে, তখন কুকীগণ অন্যত্র গিয়া পুনরায় আবাস সংস্থাপন করে। স্থানীয় পাহাড়সমূহে বহুসংখ্যক হস্তী পাওয়া যায়। পূর্ব্বে কুকীগণ কেবল গজদন্ত উপহার দিয়াই রাজকর হইতে অব্যাহতি পাইত। এখন প্রত্যেক গৃহস্থ দম্পতীকে প্রতি বৎসর ন্যূনাধিক চারি টাকা করিয়া কর দিতে হয়। তদ্ব্যতীত রাজসরকারে তাহাদের অন্য কোন দায়িত্ব নাই। অবশ্য কোন গুরুতর ফৌজদারী অপরাধ করিলে তাহারা রাজদ্বারে দণ্ডনীয় হয়, কিন্তু স্বীয় দলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাসনকার্য্য দলপতি বা রাজাই নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন।

এই কৌতূহলোদ্দীপক প্রসিদ্ধ পার্ব্বত্য জাতির এত সন্নিকটে অবস্থান করিয়া ইহাদের সম্বন্ধে আরও কিছু জানিতে ইচ্ছা হওয়াই স্বাভাবিক, এবং আমার ও হইয়াছিল। আমরা তজ্জন্য অবসর অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। শুনিলাম অনতিদূরে বানকাম্পুই [দীর্ঘবাহু] নামক এক কুকী রাজা বাস করেন, কৈলাসহর হইতে তাঁহার বাড়ী ৪।৫ মাইলের ব্যবধান নহে। কুকীদের মধ্যে তিনি নাকি একজন বড় রাজা, বহু ভূসম্পত্তি ও দুটি 'জীবন্ত' গজরাজের অধীশ্বর।• আমাদের প্ল্যান্ ঠিক করিতে অনেক সময় লাগিল না। বানকাম্পুই রাজার 'পাড়ায়'ই যাইব স্থির করিয়া তিনটি হস্তী ভাড়া করিয়া আনিলাম। বুধবার—স্বাধীন ত্রিপুরার রবিবারস্থানীয়, স্বর্গীয় মহারাজের জন্মবার বলিয়া উহা সাপ্তাহিক বিশ্রামবার নিরূপিত হইয়াছে। যদিও আমাদের চিরাভ্যস্ত নেত্রে উহা প্রথমতঃ কিঞ্চিৎ বিসদৃশ বোধ হইয়াছিল, কিন্তু ইংরেজের অব্যাহত প্রভুত্বের প্রতিকূলে স্বাধীনতার এই ক্ষীণ আত্মবিকাশ-চেষ্টা ক্রমে যেন আমাদের চিত্তে আমাদের বাঙ্গালীত্বের গৌরব বেশ একটু বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিল, এবং ভারতবর্ষের মানচিত্রে রক্তাভ ব্রিটিশ-বঙ্গের পূর্ব্ব কোণে ক্ষুদ্র একটি পীতরঞ্জিত পার্ব্বত্য রাজ্যের অস্তিত্ব বিশেষরূপে স্মরণ করাইয়া দিয়াছিল। আমরা ব্রিটিশরাজ্যবাসী বলিয়া যদিও প্রাচীন রোমকের Civis Romanorum এর ন্যায় গর্ব্ব করিতে অধিকারী, তথাপি স্বজাতীয়ত্বের এমনই মহিমা যে কোন দেশীয় রাজ্যে আসিলে তাহা যেন চিরপরিচিত আপনার বলিয়া মনে হয়, তাহার দোষভাগ উপেক্ষা করিয়া গুণভাগ দেখিতেই ইচ্ছা করে, প্রীতি-উচ্ছ্বসিত প্রাণে তাহাকে আমাদের অতি পুরাতন সগর্ব্ব স্বাধীনতা ও বর্ত্তমান নিদারুণ পরাধীনতার মধ্যবর্ত্তী সৌরভময় স্মৃতিশৃঙ্খল বলিয়া আলিঙ্গন করিতে বাঞ্ছা জন্মে। যাহা হউক, বুধবার আমাদের শুভ অভিযানের দিন নির্দ্ধারিত হইল। সহর হইতে কয়েক মাইল দূরে নূতন আবাদী একটি 'টিলা'র [উচ্চ ভূমিতে] বন-ভোজনের ব্যবস্থা হইল। বেলা দুপ্রহরের সময় আমরা হস্তিপৃষ্ঠে কুকী রাজদর্শনে চলিলাম।

কৈলাসহর হইতে একটি রাজবর্ত্ম বরাবর মনুনদীর পার পর্য্যন্ত গিয়াছে। নদী ও সড়কের সংযোগ স্থলে পূর্ব্বকথিত পানিচুপির বাজার অবস্থিত। পার্ব্বত্য বাঁশ, বেত ও বৃক্ষের কারবারে প্রতিবৎসর তথায় বহুসহস্র মুদ্রার ক্রয়বিক্রয় হইয়া থাকে। সেখানে আমরা হস্তিপৃষ্ঠ হইতে অবতরণ করিয়া খেয়া নৌকার সাহায্যে, ও আমাদের বিপুলকায় বলিষ্ঠ বাহকগণ সন্তরণপূর্ব্বক পরপারে উত্তীর্ণ হইলাম। তথা হইতে পুনরায় গজপৃষ্ঠে হেলিয়া দুলিয়া গন্তব্য স্থানাভিমুখে যাত্রা করিলাম। আমাদের সঙ্গে একটি করভ ছিল, তাহার শিশুসুলভ লীলাবিভ্রম সকলেরই আমোদ জন্মাইয়াছিল। এতক্ষণ আমরা বক্রগতি মনুর তীরাবলম্বনে অপেক্ষাকৃত ঋজু ও সমতল পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়াছিলাম, কিন্তু এখন ক্রমে উচ্চ ও বন্ধুর শ্বাপদসঙ্কুল কাননপ্রদেশে প্রবেশ করিতে লাগিলাম। ক্রমশঃ পথ সঙ্কীর্ণ, পিচ্ছিল ও দুর্গম হইয়া পড়িল, আমরা স্থানে স্থানে অন্ধকাররাশি ভেদ করিয়া চলিতে লাগিলাম। মধ্যে মধ্যে দুএকটি অধিত্যকা দৃষ্টিগোচর হইল। চতুর্দ্দিকে ভীষণ অরণ্য, কেন্দ্রভাগ অপেক্ষাকৃত পরিষ্কৃত, কিন্তু ব্যাঘ্র, সর্প, বন্যকুক্কুট, হরিণ ও গবয় [গরু ও মহিষের মধ্যবর্ত্তী ভীষণকায় জন্তুবিশেষ] প্রভৃতি বনজন্তু কর্ত্তৃক অধ্যুষিত। এক প্রকার কলাগাছ দেখা গেল, নাম 'রাম কলা'; দেখিতে কদলীর ন্যায় বটে কিন্তু ফল বিস্বাদ। উপযুক্তরূপ চাষ করিলে হয়ত উহার ফলও গোলআলুর ন্যায় ক্রমশঃ সুখাদ্য হইয়া উঠিতে পারে। সেইরূপ বন্য এক প্রকার কাঁঠালগাছ দেখিলাম, তাহার ফলও কণ্টকীসদৃশ, কিন্তু দুঃখের বিষয় মানবের ভক্ষ্য নহে। এই জনপ্রাণিহীন উচ্চাবচ কাননশ্রেণীর মধ্যে ক্ষুদ্র একটি পার্ব্বত্য পথ কোনমতে চতুর্দ্দিকস্থ জঙ্গলসমূহ হইতে স্বীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া মনুষ্যসমাগমের পরিচয় দিতেছে। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া খানিকটা ভূমি হলকর্ষিত ও নবোদ্গত ধান্যসম্ভারে অলঙ্কৃত দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। কিন্তু নিকটেই একটি 'টিলা'র উপর কয়েকখানি ঘর ও গুটী দুই বাঙ্গালী ভদ্রলোক দেখিয়া বিস্ময় দূর হইল। শুনিলাম, উহারা শ্রীহট্টদেশীয় ব্রাহ্মণ, অল্পমূল্যে ভূমি বন্দোবস্ত পাইয়া লাভের আশায় এই বিজন অরণ্যে বাস করিয়া

কৃষি করিতেছেন। এরূপ সাহস করিয়া আরও কয়েক ঘর ভদ্রলোক এখানে আসিয়া চাষবাসের আড্ডা খুলিলে স্বয়ংও লাভবান হইতে পারেন, এরাজ্যেরও উন্নতি হয়। এ স্থানের ভূমি নিতান্ত উর্ব্বরা, কুকীগণ একরকম বিনা পরিশ্রমেই 'জুম' করিয়া প্রচুর ফসল উৎপন্ন করে, তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। আমাদের শিবপুর কৃষিবিদ্যালয়ের উত্তীর্ণ ছাত্রগণের মনোযোগ এদিকে আকর্ষিত হয় না কি?

যাহা হউক সূর্য্যদেব ক্রমে পশ্চিমাভিমুখ হইতে লাগিলেন, আমরাও অবশেষে বানকাম্পুই রাজার 'পাড়ায়' আসিয়া উপস্থিত হইলাম। যে স্থানে তাঁহার রাজধানী স্থাপিত, তাহার চতুর্দ্দিক কিছু অধিক দুর্গম, বোধ হয় শত্রুর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত বাছিয়াই ঐ স্থানে বাসস্থান নির্ম্মিত হইয়াছে। 'পাড়া'টি একটি টিলার উপর অবস্থিত, এরূপ অরণ্যবেষ্টিত যে একশত হাত দূর হইতেও দৃষ্টিগোচর হয় না। গভীর অরণ্য অতিক্রম করিয়া হঠাৎ আমরা যে এক অদৃষ্টপূর্ব্ব দৃশ্য নয়নগোচর করিলাম, তাহাতে আমাদের সমুদয় পথশ্রম সার্থক হইল। দেখিলাম বাঁশের খুটির উপর অবস্থিত অর্দ্ধগোলাকৃতি তিনসারি ঘর বা 'পুঞ্জী',— অনেকটা আমাদের দেশের নৌকার ছাদের ন্যায়—মধ্যে দুটি সরল পথ, পুঞ্জীমধ্য হইতে শতশত চক্ষু আমাদের প্রতি উৎক্ষিপ্ত। আমরা ধীরে ধীরে বারণপৃষ্ঠে পাড়ার মধ্যস্থলে উপনীত হইলাম। আগন্তুক বাঙ্গালীদের অভ্যর্থনার জন্য রাজা তথায় একখানি গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, আমরা অবতরণ করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম। গৃহটি আগাগোড়া 'মূলী' বাঁশ নির্ম্মিত, মধ্যভাগে কয়েকখানি সাধারণ খাট, বেড়ায় কয়েকটি মনুষ্য ও পশুর কষ্টকল্পিত চিত্র দেশীয় গণকের শিল্পনৈপুণ্যের পরিচয় দান করিতেছে। এক পার্শ্বে কয়েকটি উৎকৃষ্ট বন্দুক যত্নসহকারে রক্ষিত, দেখিয়াই সুব্যবহৃত বলিয়া বোধ হইল। বিছানার উপর আমাদের নিমিত্ত একখানি মণিপুরী 'খেশে'র উপর দুটি ময়লা তাকিয়া বিছান ছিল, নীচে বসিয়া রাজার কুকী ভৃত্য নূতন হুকায় সুগন্ধি তাম্রকূট সাজিতেছিল। একটি খাটের উপর একখানি রামায়ণ ও বিলাতী পেটেণ্ট ঔষধের এক বিজ্ঞাপন যেন এই দুর্গম অরণ্যে সভ্যতার প্রভাবের সাক্ষ্য দিতেছিল। মস্তকের উপর ক্ষুদ্র একখানি টানাপাখা কোন প্রকারে আত্মপ্রকাশের প্রয়াস পাইতেছিল। বেড়ার ফাঁক, জানালা, প্রবেশদ্বার প্রভৃতি প্রত্যেক ছিদ্রপথে অসংখ্য নগ্নকল্প পুরুষ ও স্ত্রীমূর্ত্তি কৌতুকবিস্ফারিতনেত্রে আমাদিগকে নিরীক্ষণ করিতেছিল।

আমরা তাম্রকূট-ধূমের সহিত এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিতেছি, এমন সময় রাজা স্বয়ং গৃহে প্রবেশ করিয়া আমাদের প্রত্যেকের সহিত করমর্দ্দন করিলেন।

তাঁহার পরিচ্ছদ একখানি মলিন বস্ত্র, গায়ে একটি অপরিষ্কৃত কালবর্ণের পিরিহান, পায়ে চটি জুতা, কর্ণে অঙ্গুরীয়ক, মস্তকের চুল খোপাবাঁধা। রাজা খর্ব্বাকার, তাঁহার মুখমণ্ডল প্রায় গুম্ফ-ও-শ্মশ্রুবিরহিত, নাসিকা চাপা, গণ্ডদ্বয়ের অস্থি উন্নত, বর্ণ কটা। একখানি ভিন্ন খাটে তিনি উপবেশন করিলেন। শ্রীযুত ত্রিপুরেশ্বর বাহাদুরের নিযুক্ত দোভাষী সঙ্গে ছিল; তাহার সাহায্যে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। রাজা বাঙ্গালা জানেন, কিন্তু বঙ্গভাষায় আমাদের সঙ্গে কথা বলা বোধ হয় মর্য্যাদাবিরুদ্ধ বিবেচনা করিলেন। আমরা রাজার কুকী সৈন্য দেখিতে ইচ্ছুক হওয়ায় দুইজন পদাতিক সৈন্য আসিয়া উপস্থিত হইল। স্কন্ধদেশবিলম্বী স্বহস্তরচিত বিবিধবর্ণ-বিচিত্রিত এক একখানি কম্বলে তাহাদের গাত্র মণ্ডিত, হস্তে বন্দুক, কোমরে বৃহৎ একখানি শাণিত ছুরী, মস্তকে পক্ষীর পালক ও ছাগপুচ্ছের উষ্ণীষ,—মোটের উপর দেখিতে খুব কৌতুকাবহ, অনেকটা স্কচ হাইলেণ্ডারের মত, যদিও প্রভেদ যথেষ্ট। উহারা চলিয়া গেলে কয়েকজন কুকী গোটা কয়েক 'গং' (কাঁসর) লইয়া আসিল, তন্মধ্যে একটা খুব বৃহৎ ও গম্ভীরারাবী। যুদ্ধ ও নৃত্যকালে মদ্যপানে উল্লসিত হইয়া কুকীগণ ঐগুলি বাজাইয়া থাকে। তাহারা স্বহস্তে এক প্রকার মদ্য প্রস্তুত করে, তাহা পান করিয়া সঙ্গীতের তালে তালে পুরুষ স্ত্রী একত্র হইয়া নৃত্য করে। আমরা নৃত্য দেখিবার নিমিত্ত আগ্রহ করিলাম না,—তাহা আমাদের সুসভ্য চক্ষে ঠিক শ্লীলতার রীত্যনুযায়ী হইবে না এই আশঙ্কায়—বাদ্য শুনিলাম মাত্র। শুনিলাম বটে, কিছু বুঝিলাম না। রাজা আমা-

দের জলযোগের নিমিত্ত মহকুমা হইতে মিষ্টান্ন আনাইয়াছিলেন, আমরা এখন তাহার সদ্ব্যবহারার্থ গাত্রোত্থান করিলাম। নিকটেই একটি 'ছড়া' (ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য স্রোতস্বতী) ছিল। আমরা টিলা হইতে অতি কষ্টে আল্পস-পর্ব্বতযাত্রীর এল্পিনষ্টিকের ন্যায় লাঠির সাহায্যে তথায় অবতরণ করিলাম, এবং কদলীপত্র বিছাইয়া মিষ্টমুখ করিয়া 'ছড়া'র সুশীতল জলে পিপাসা নিবৃত্তি করিলাম। ফিরিয়া আসিবার কালে দেখিলাম কয়েকজন কুকী মহাসমারোহে একটা শূকর কাটিতেছে। একটা ঘরে প্রবেশ করিলাম। মাটির উপর বাঁশের মাচা, তদুপরি অর্দ্ধগোলাকৃতি ছাদ, তন্মধ্যে সমগ্র পরিবার বাস করে। বলা বাহুল্য, ঘরের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন কক্ষ নাই, স্বামী স্ত্রী, পুত্র কন্যা সকলে একসঙ্গে থাকে। গৃহাভ্যন্তর হইতে যে সৌরভ নির্গত হইতেছিল, তাহাকে কিছুতেই নাসাপ্রীতিকর বলা যায় না। মাচার নীচে শূকর, কুকুর ও কুক্কুট প্রভৃতি গৃহপালিত পশুপক্ষীর আবাস এবং সর্ব্বপ্রকার আবর্জ্জনার শেষ বিশ্রামস্থল। কেবল প্রবল সত্যানুসন্ধিৎসাই আমাদিগকে এরূপ 'পুঞ্জী'র ভিতরে প্রবেশ করিতে প্রণোদিত করিয়াছিল, তজ্জন্য পাঠকবর্গ মনে মনে আমাদিগকে লিভিংষ্টোন, ষ্ট্যানলি অথবা নান্‌সেনের সহিত একাসনে স্থাপন করিবেন, সন্দেহ নাই।

ফিরিয়া আসিয়া আমরা সকলে রাজার বৈঠকখানা গৃহে সমবেত হইলাম। আমাদের সঙ্গে একটি কিশোরী বালিকা ও একটি বালক ছিল। তাহাদিগকে রাণীসন্দর্শনে পাঠাইলাম। রাজার দুই রাণী। ইনিই প্রধানা, নাম লালমুড়ী। দেখিতে নাকি খুব সুন্দরী, গঠন প্রায় বাঙ্গালীর মত। আমাদের সঙ্গীয় বালিকাটির সুশোভন পরিচ্ছদ ও গৌরকান্তি দেহ দেখিয়া রাণী ও তাঁহার সহচরীবৃন্দ নিশ্চয়ই তাহাকে কোন স্বর্গচ্যুত 'পাতিয়েন' (দেবী) মনে করিয়াছিলেন। রাণীও নাকি বাঙ্গালা জানেন, আগন্তুকদিগকে বসিতে দিয়া তাহাদের সহিত দুই একটি কথোপকথন করিয়াছিলেন এবং বিদায়কালে প্রত্যেককে এক টাকা দক্ষিণা দিয়াছিলেন। আমাদের সঙ্গীয় বালকবালিকাদ্বয়ও সৌজন্যে পরাস্ত হইবার নহে, তাহারা আবার দ্বিগুণিত করিয়া রাজপুত্রদিগকে 'নজর' দিয়া আসিয়াছিল।

এইরূপে একঘণ্টা কাল আমরা এই অপেক্ষাকৃত সভ্যতালোকপ্রাপ্ত কুকীপাড়ায় অবস্থিতি করিয়া রাজার নিকট বিদায় গ্রহণ করিলাম।* সমগ্র পাড়াটি দীর্ঘ প্রস্থে আমাদের দেশের একজন সম্ভ্রান্ত গ্রাম্য গৃহস্থের বাড়ী অপেক্ষা বড় নহে, অথচ ইহার মধ্যে পঁচিশ ঘর বা তদূর্দ্ধসংখ্যক গৃহস্থ এবং প্রায় তিন শত কুকী বাস করে। রাজার সহিত বিদায়কালে রাজপুত্রদিগকে বাঙ্গালা ভাষা ও সভ্যতানুমোদিত রীতিনীতি শিক্ষা দিতে উপদেশ দিয়া আসিতে বিস্মৃত হইলাম না। সে দিন একটি ক্যামেরা লইয়া আসি নাই বলিয়া প্রত্যাবর্ত্তনকালে অনেক অনুতাপ করিতে লাগিলাম।

বেলা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল, জঠরানলও নিতান্তই প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠিয়াছিল, সুতরাং আর বিলম্ব সমীচীন নহে বিবেচনা করিয়া যে স্থলে আহার্য্যের ব্যবস্থা হইয়াছিল, আমরা সেইদিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। এই বন্ধুর পার্ব্বত্যপথে হস্তী যেরূপ সন্তর্পণের সহিত গমন করে, তাহা দর্শনযোগ্য। এরূপ প্রকাণ্ড জন্তুটাকে মাহুত যেন কলের পুত্তলিকার ন্যায় যথেচ্ছা পরিচালিত করে। হস্তীর বল বুদ্ধি দুই-ই আছে, তবে তাহার এই অধীনতা কেন? সেও বাঙ্গালীরই মত ভীরুস্বভাব বলিয়া কি? এইরূপ দার্শনিক গবেষণায় নিমগ্ন আছি, এমন সময় আমাদের অগ্রবর্ত্তী হাতীর উপরে বন্ধুগণ ব্রহ্মসঙ্গীত ধরিয়া দিলেন। গোধূলির মৃদু-আলোকে মঙ্গলময়ের নামকীর্ত্তনে বিজন ভীষণ অরণ্য প্রকৃতিবক্ষ মুখরিত করিয়া শ্যামায়মান বনশ্রেণীর শোভা দেখিতে দেখিতে আমরা নির্দ্দিষ্ট স্থানে উপনীত হইলাম। সেখানে পরিপূর্ণ ভোজনে উদর তৃপ্ত করিয়া কিয়ৎকাল বিশ্রাম করা গেল। ক্রমে রাত্রি গভীর হইতেছে দেখিয়া পুনরায় গৃহাভিমুখে যাত্রা করিলাম। যখন আমরা মনু নদী পার হইলাম, তখন শারদ গগনে কৃষ্ণা চতুর্থীর বিমল চন্দ্র শুভ্র মেঘের অন্তরাল হইতে ঈষৎ হাসিতেছিল, ও মৃদু নৈশ পবন শ্যামল শস্যক্ষেত্র আন্দোলিত করিয়া ঝুরু ঝুরু বহিতেছিল। বারণপৃষ্ঠের সমতান আন্দোলনে আমাদের চক্ষুও

* রাজা বামকাম্পুই পরে কৈলাসহরে আমার বাসায় আসিয়া আমার সহিত প্রতিসাক্ষাৎ করিয়া গিয়াছিলেন।

নিদ্রালস হইয়া আসিয়াছিল। অতএব গৃহে পৌঁছিয়াই শ্রান্তদেহে ক্লান্তমনে সন্তাপহারিণী নিদ্রাদেবীর ক্রোড়ে গাত্র ঢালিয়া দিলাম।

প্রবন্ধের উপসংহারে কুকীজাতি সম্বন্ধে পাঠকদিগকে আর একটু সুস্পষ্ট ধারণা দেওয়া অসঙ্গত হইবে না। কৈলাসহরের রাজকীয় দপ্তরে কুকীদের সম্বন্ধে যে সকল কাগজপত্র খুঁজিয়া পাইয়াছি, এবং স্থানীয় দোভাষী হইতে যে সকল তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি, তাহা হইতে নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত বিবরণ সঙ্কলিত করিয়া দিলাম। যাঁহারা এ বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ জানিতে চাহেন, তাঁহারা শ্রীযুক্ত কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহোদয় কৃত 'রাজমালা' পড়িয়া দেখিবেন।

কুকীগণ মঙ্গোলীয়জাতীয়। তাহাদের বর্ণ কটা, নাসিকা চাপা, ওষ্ঠাধর পুরু, কপোল উন্নত, এবং মুখ গুম্ফ-ও-শ্মশ্রু-বিরল। তাহারা দীর্ঘাকৃতি না হইলেও বলিষ্ঠদেহ। তাহাদের ভাষায় বর্ণমালা নাই, উহা লিখিত ভাষা নহে, কেবল কথোপকথনের ভাষা। শুনিতে অনেকটা চীন ভাষার ন্যায়, অনুস্বারবহুল ও অনুনাসিক। কুকীগণ মৃগয়া ও ধনুর্বিদ্যায় পারদর্শী ও উগ্রপ্রকৃতি। লুসাইদের সহিত তাহাদের অনেকবার যুদ্ধ হইয়া গিয়াছে, এবং পূর্ব্বে তাহারা নিকটস্থ অনেক নিরীহ বাঙ্গালী ও অন্যান্য সমতুলবাসীদিগকে বধ করিয়া পুনঃ পুনঃ উপদ্রব ঘটাইয়াছে। ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বেও স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতির রাজ্য মধ্যে তাহারা নানাপ্রকার অশান্তি ঘটাইত। সে সমুদয়ের বিস্তৃত বিবরণ 'রাজমালা'র দ্রষ্টব্য। এখন যদিও তাহারা অনেক শান্ত হইয়াছে, তথাপি শীত ঋতুতে পথ ঘাট সুগম হইলে কৈলাসহরের স্থানীয় অধিবাসিগণ কুকীকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবার ভয় করিয়া থাকে।

কুকীগণ নির্জ্জন পাহাড়ে স্বাধীনভাবে বাস করিতে ভালবাসে। রাজা ও পিতামাতার প্রতি তাহাদের প্রগাঢ় অনুরাগ।

কুকীগণ মূর্ত্তিপূজক নহে। তাহাদের মধ্যে ব্রাহ্মণের ন্যায় কোন শ্রেষ্ঠ বর্ণ অথবা পুরোহিত বা যাজক সম্প্রদায় নাই। সকলেই সমভাবে দেবপূজার অধিকারী। কুকীদের পরমেশ্বরের নাম 'লাচি'। তাহার অধীনে দুইটি প্রধান দেবতা আছে, 'পাতিয়েন' (পা=পুরুষ, তিয়েন=অনাদি), এবং 'তারপা' (পা=পুরুষ, তার=বৃদ্ধ)। ইহারা 'লাচি'র প্রতিনিধি। লাচি নিরাকার। এতদ্ব্যতীত কুকীদের অনেক দেব দেবী আছে, কুকীগণ তাহাদেরও পূজা করিয়া থাকে। যেমন 'থং পাতিয়েন' (নদী দেবতা), 'হং পাতিয়েন' (প্রস্তর-দেবতা) ইত্যাদি। ভূতপ্রেতও আছে, তাহাদের নাম 'থড়ি'। কুকীগণ পরলোক বিশ্বাস করে। যাহাদের স্বাভাবিক মৃত্যু হয় এবং যাহারা সমধিক পুণ্যশীল নহে, তাহাদের আত্মা 'থিথুয়া' অর্থাৎ যমালয়ে (Purgatory) গমন করিয়া থাকে। যাঁহারা দুষ্কর্ম্মান্বিত এবং যাহাদের অপমৃত্যু ঘটে, তাহাদের আত্মা 'ছারথুয়া' অর্থাৎ নরকে (Hell) গমন করিয়া থাকে। ধার্ম্মিক ব্যক্তির আত্মা 'টেস্তরাল' অর্থাৎ স্বর্গে (Paradise) গমন করে। দেবতা-পূজার বিশেষ কোন উপকরণ নাই, যে যাহা ইচ্ছা তদ্দ্বারাই পূজা করিতে পারে। 'জুম' কৃষির সময় ইহারা নানাপ্রকার উৎসব করিয়া থাকে। তখন মদ্য, মাংস ও নৃত্যের খুব ঘটা পড়িয়া যায়। পীড়া হইলে তাহারা নানাপ্রকার দেবতার আরাধনা করে। যে দেবতার পূজার পর রোগ আরোগ্য হয়, তিনিই রোগীর শরীরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন মনে করে। অবশ্য পীড়িতাবস্থায় ইহারা খাদ্যাদির কোন বিচার করে না।

অলঙ্কারের মধ্যে এক প্রকার রক্তবর্ণ প্রস্তরই কুকীদিগের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়। ইহারা স্ত্রীপুরুষ সকলেই কর্ণাভরণ ব্যবহার করে। মস্তকের কেশ স্ত্রীপুরুষ অভেদে দীর্ঘবেণীসম্বদ্ধ।

মৃত্যুর পর মৃতদেহ সমাহিত হয়। দরিদ্র ব্যক্তির মৃত্যু হইলেই তাহার দেহ মৃত্তিকাগর্ভে প্রোথিত হয়, অবস্থাপন্ন ব্যক্তির মৃতদেহ কুকীগণ কাষ্ঠাবরণে ঢাকিয়া তিন মাস অগ্নিসমীপে রক্ষা করে এবং পরে এক নির্দ্দিষ্ট তারিখে আত্মীয় স্বজন একত্র হইয়া পান ভোজন করতঃ ভূগর্ভনিহিত করে। মৃতব্যক্তি পুরুষ হইলে কুকীরা তাহার সঙ্গে পশুর মাথা, দা, বন্দুক ও অন্যান্য প্রিয় বস্তু সমাহিত করে। স্ত্রীলোকের মৃতদেহের সহিত চরকা, অন্নব্যঞ্জন প্রভৃতি দিয়া থাকে। জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদি উপলক্ষ্যে কুকীদের মধ্যে কোন অশৌচপালনের নিয়ম নাই।

বিবাহের দুই নিয়ম আছে; (১) অভিভাবকের প্রস্তাবানুসারে বিবাহ, (২) পাত্রপাত্রীর মনের মিল হইলে অভিভাবকের অনুমতিগ্রহণপূর্ব্বক বিবাহ,—অনেকটা শাস্ত্রীয় গান্ধর্ব্ব বিবাহের ন্যায়। বিবাহে কন্যার পিতা জামাতার নিকট হইতে পণ গ্রহণ করিয়া থাকে। সাধারণতঃ কুকী রমণীগণ যৌবনসীমায় পদার্পণ করিবার পূর্ব্বে বিবাহিত হয় না। বিবাহ উপলক্ষ্যে মদ্যপান ও মাংসাহারের ধূম পড়িয়া যায়। বিবাহকালে পাত্রপাত্রীর মধ্যস্থলে একটি মদ্যপূর্ণ কলস থাকে, উভয়ে একই সময় নলসংযোগে তাহা হইতে মদ্যপান করে। তখন পাত্র-পাত্রীর চুলে চুলে গিট দেওয়া হয়। ইহাই বিবাহের প্রধান নিয়ম। কুকীদের মধ্যে বিবাহ-বিচ্ছেদের প্রথা বর্ত্তমান আছে। যে পক্ষের ইচ্ছানুসারে বিবাহ বিচ্ছিন্ন হয়, তাহাকে অর্থদণ্ড দিতে হয়। এরূপ স্থলে সন্তানগণ পিতার গৃহেই থাকে। ইহাদের মধ্যে খুড়তুতভগ্নীকে বিবাহ করার বিধি আছে।

কুকীদের উত্তরাধিকারের নিয়ম এই যে পুত্র কিম্বা ভ্রাতুষ্পুত্র না থাকিলে সম্পত্তি শ্রীযুক্ত মহারাজা বাহাদুরের সরকারে বাজেয়াপ্ত হয়। পিতার সকল পুত্র তুল্যাংশে উত্তরাধিকারী হয়। রাজার যে পুত্রকে পাড়ার সকলে দলপতিরূপে নির্ব্বাচন করে, সেই রাজপদে অধিষ্ঠিত হয়।

ভূচর, খেচর ও জলচরের মধ্যে এরূপ প্রাণী বোধ হয় নাই, কুকীগণ যাহার মাংস ভক্ষণ না করে। হস্তীর মৃতদেহ, কুকুর, শূকর, সর্প, শুষ্ক মৎস্য প্রভৃতি তাহাদের উপাদেয় খাদ্য। মদ্য ব্যতীত তাহাদের কোন উৎসবই সম্পন্ন হয় না। গোদুগ্ধ কিন্তু উহারা বিষবৎ পরিত্যাগ করে। উহাদের পরিধেয় বস্ত্রাদি স্ত্রীলোকে বাড়ীতেই নির্ম্মাণ করে। স্ত্রীপুরুষ একত্র হইয়া জুমে কার্য্য করে।

কুকীদের মধ্যে অবরোধ-প্রথা নাই। স্বামী অথবা স্ত্রী পরিত্যাগের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। বিধবাবিবাহও উহাদের মধ্যে প্রচলিত। অতিথিসৎকার উহাদের একটী মহৎ গুণ। আমাদের অভ্যর্থনাই তাহার যথেষ্ট প্রমাণ। কুকীগণ সরলপ্রকৃতি ও সত্যবাদী, তবে শুনিতেছি সভ্যতার সংঘর্ষে প্রকৃতির শিশুগণের এই সকল সদ্গুণ ক্রমেই বিরল হইয়া আসিতেছে। কুকীরমণীগণ পুরুষসমক্ষে বাহির হইতে লজ্জা করে না। তবে মহিষী লালমুঁড়ী কিয়ৎপরিমাণে সভ্যতালোকপ্রাপ্তা বলিয়া বোধ হয় আমাদের ন্যায় ভিন্নজাতীয় পুরুষদিগকে দর্শনদানে কৃতার্থ করেন নাই।

আমাদের মধ্যে গোজাতি দ্বারা যেরূপ নানাবিধ উপকার সাধিত হয়, কুকীদিগের বাঁশগাছ দ্বারা তদ্রূপ সর্ব্ববিধ কার্য্য নিষ্পন্ন হয়। বাঁশ (মূলী) দ্বারা তাহারা গৃহ ও শয্যা নির্ম্মাণ করে। বসিবার আসন, জল আনিবার নল, ধনুকের দণ্ড ও বাণ, দড়ি প্রভৃতি প্রস্তুত করে। কুকীদের ব্যবহার্য্য অধিকাংশ দ্রব্যই বংশসাহায্যে নির্ম্মিত হয়।

যদিও কুকীগণ অৰ্দ্ধনগ্ন থাকে, এবং স্ত্রীপুরুষ একত্রে সম্পূর্ণ উলঙ্গদেহে স্নানাদি করিয়া থাকে, তথাপি ইহা সর্ব্ববাদিসম্মত যে উহাদের যৌন নীতি খুব প্রশংসনীয়। এ বিষয়ে তাহাদের সমাজশাসন যথেষ্ট কঠোর। ইহা আশ্চর্য্য যে, সভ্যদেশসমূহে দুর্নীতির স্রোত যতদূর প্রবল, পৃথিবীর যাবতীয় অসভ্য দেশসমূহে তদপেক্ষা অনেক কম। এ বিষয়ে অসভ্যদিগের অজ্ঞতাই তাহাদের বর্ম্ম। 'সুরুচি' বলিতেই 'কুরুচি'র অভিজ্ঞতা বুঝা যায়। তাহাদের মধ্যে কুনীতি কম, সুতরাং সুরুচি কুরুচির ধার তাহারা ধারে না। অতএব পাঠকগণ যেন কুকীদের নগ্নশরীরের কথা কল্পনা করিয়া শিহরিয়া উঠেন না। এ বিষয়ে একজন বিখ্যাত বহুদর্শী ইংরাজ রাজপুরুষের মত উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

"On the other hand, the pigmies [of the Semliki forest in East Central Africa] appear to be extremely moral, and a sense of decency is often very highly developed, especially among those races who dispense with clothes as a superfluity.. Sir Harry Johnston declares that the naked races are much less prurient-minded than is the case among clothed peoples. This is still the case among American-Indians in many parts of South America, and among the Australian aborigines."*

শ্রীযুক্ত ত্রিপুরেশ্বর বাহাদুরের চেষ্টায় বানকাম্পুই রাজার পাড়ায় সম্প্রতি এক পাঠশালা স্থাপিত হইয়াছে।

* Character sketch of Sir Harry Johnston and review of his great work "The Uganda Protectorate" in the *Review of Reviews* for July, 1902.

বুধবার ছুটীর দিন বলিয়া আমরা উহা পরিদর্শন করিয়া আসিতে পারি নাই। মহারাজা বাহাদুরের সমুদয় কুকী প্রজা কিয়ৎপরিমাণে সভ্য ও শিক্ষিত হইয়া রীতিমত হালচাষ পূর্ব্বক গ্রামে বাস করিতে অভ্যস্ত হইলে ত্রিপুরা রাজ্যের অনেক উন্নতি হইতে পারে।

ইংরাজী ভাষায় বাঙ্গালী লেখক।

নিজ মাতৃভাষা ভিন্ন অন্য ভাষায় কেহ সহজে আপনার মনের ভাব ভাল ও শুদ্ধরূপে প্রকাশ করিতে পারে না, এ কথা বোধ করি এখন সকলেই স্বীকার করেন। দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে যখন ইউরোপের সমুদয় দেশের রাজসভায় রাজনৈতিক কার্য্য ফরাশি ভাষায় সম্পাদিত হইত, তখন জার্ম্মেনীর রাজা ফ্রেডরিক ফরাশি ভাষায় সম্যক্ ব্যুৎপত্তি লাভ করিবার জন্য বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি প্রায় সর্ব্বদা ফরাশি ভৃত্যগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিতেন এবং সেই ভাষায় সর্ব্বদা কথোপকথন করিতেন। ঐ ভাষায় তিনি অনেক পদ্য ও গদ্য লিখিয়াছিলেন। খ্যাতনামা ফরাশি লেখক ভল্টেয়ারকে যখন তিনি নিজের রচনা সকল শুদ্ধ করিবার জন্য পাঠাইতেন, তখন ভল্টেয়ার প্রায় এই কথা বলিতেন যে Frederick has sent me his dirty linen to wash. একজন রাজার পক্ষে নানা যত্ন ও উদ্যোগ সত্ত্বেও যখন একটি অব্যবহিত নিকটবর্ত্তী দেশের ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভকরা অসম্ভব হইয়াছিল, তখন যে এতদ্দেশীয় শিক্ষিত লোকেরা ইংরাজী ভাষা লিখিতে ও বলিতে অনেক ভুল করিবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? ফ্রেড্রিকের ফ্রেঞ্চ শিক্ষার মত আমাদের ইংরাজী শিক্ষার কোন সুবিধা নাই। ভারতবর্ষে প্রবাসী ইংরাজেরা যতদূর সম্ভব এতদ্দেশীয় লোকেদের সহিত কোন প্রকার সংস্রব রাখিতে চাহেন না। এই কারণেই বোধ করি "Babu English" এর সৃজন হইয়াছে। মাননীয় ও সুবিখ্যাত ব্যারিষ্টার Mr. W. C. Bonnerji মহাশয় ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে এলাহাবাদের জাতীয় মহাসভার অধিবেশনে সভাপতি মনোনীত হইয়া যে বক্তৃতা করেন, তাহার এক স্থলে এইরূপ বলিয়াছেন :—

"You may read the books of a country, you may know its literature well, but unless you have a familiar acquaintance with the people of the country, unless you have mixed familiarly with them, it is impossible for you to understand the language these people speak. Why is there so much outcry about what is called Babu English? Many Babus and in this designation I include my countrymen from all parts of India, know English literature better, I make bold to say, than many educated men in England (cheers). They know English better and English literature better than many continental English scholars. They know English History, as well, if not better, than Englishmen themselves. Why is it then that when they write English, when they speak English, they sometimes make grievous blunders? Why is it then that their composition is called stilted? Because their knowledge is derived from books only and not from contact with the people of England. If an English gentleman were to write a book or write a letter, in the Vernacular with which he is supposed to be most familiar, I am afraid his composition would bear a great family likeness to 'Babu English.' It would be 'English Vernacular.' It would contain grammatical mistakes which would even shame our average schoolboy."

সম্প্রতি যে ইউনিভার্সিটি কমিশন বসিয়াছিল, তাহার সমক্ষে অনেকেই এইরূপ সাক্ষ্য দিয়াছিলেন যে আজকালকার বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার্থীদের ভিতর অতি অল্প লোকেই শুদ্ধ ইংরাজী লিখিতে ও বলিতে সক্ষম। কেহ কেহ এই জন্য এতদূর পর্য্যন্তও বলিয়াছেন যে কালেজ ও স্কুলে ইংরাজী শিক্ষা দিবার নিমিত্ত ইংরাজ শিক্ষক নিযুক্ত করা উচিত। কেবল ইংরাজ শিক্ষক নিযুক্ত করিলেই যে বেশী উপকার হইবে, তাহা বোধ হয় না। এতদ্দেশের কালেজ ও স্কুলের ইংরাজ শিক্ষকগণ এখন অন্যান্য এংগ্লো-ইণ্ডিয়ানদিগের মত ভারতবাসীদিগকে ঘৃণা করেন ও তাহাদিগের সহিত মিশিতে চাহেন না। বিলাতের বিশ্ববিদ্যালয় ও স্কুলের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদিগের ভিতর যেরূপ সদ্ভাব থাকে, তাহা এদেশে ইংরাজী শিক্ষক ও এতদ্দেশীয় শিক্ষার্থীদের ভিতরে একেবারেই নাই। এইরূপ অবস্থায় স্কুল ও কালেজে কেবল ইংরাজ শিক্ষকদিগের সংখ্যা বাড়াইলেই যে বেশী উপকার দর্শিবে, তাহার প্রমাণ কি?

হিন্দু কালেজের ও ডফ সাহেবের ছাত্রেরা যেরূপ ভাল ইংরাজী বলিতে ও লিখিতে পারিতেন, তাহা এখনকার বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারীরা প্রায় পারেন না, তাহার বিশেষ এক কারণ এই হইতে পারে যে পূর্ব্বে যেরূপ ডিরোজিও ও কাপ্তেন রিচার্ডসন হেয়ার ও ডফ সাহেব প্রভৃতি এতদ্দেশীয় ছাত্রদিগের সহিত মিলিতেন মিশিতেন, এখনকার এগ্লো-ইণ্ডিয়ান শিক্ষকগণ প্রায় তাহা করেন না।

"Babu English" কথাটার সৃষ্টিকর্ত্তা রো এবং ওয়েব সাহেবেরা বড় বড় মাহিনাতে বঙ্গদেশের শিক্ষা-বিভাগে কাজ করিতেন। তাঁহারা আমাদের শিক্ষিত ব্যক্তিদিগকে অশুদ্ধ ইংরাজী লিখিবার ও বলিবার দরুণ বড়ই বিদ্রূপ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু যাহাতে এতদ্দেশীয়েরা ইংরাজী লিখিতে কিম্বা বলিতে ভুল না করেন, তাহার উপায় বলেন নাই। উঁহাদিগের মধ্যে একজন "English Etiquette for Indian Gentlemen" নামক পুস্তিকার গ্রন্থকার। ঐ পুস্তিকার নাম যদি "English Discourtesy for Indian Gentlemen" রাখা হইত তাহা হইলে বোধ করি, ঠিক হইত। কারণ উহা পাঠ করিলে প্রবাসী ইংরাজদিগের ভারতবাসীদিগের প্রতি কোন কর্ত্তব্য আছে বলিয়া বোধ হয় না। ইংরাজ ও ভারতবাসীদিগের ভিতর যে কোনরূপ সদ্ভাব হয় তাহা বোধ করি গ্রন্থকারের উদ্দেশ্য ছিল না।

এইরূপ অবস্থা সত্ত্বেও যে অনেক ভারতবাসী শুদ্ধ ও ভাল ইংরাজী লিখিতে ও বলিতে পারেন, তাহাই আশ্চর্য্যের বিষয়। ভারতে অনেক ইংরাজ প্রবাসী হইয়া আছেন। কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কয়জন লোক এতদ্দেশীয় ভাষায় পারদর্শিতা দেখাইতে সক্ষম? কয়জন ইংরাজ শুদ্ধ বাঙ্গলা কিম্বা হিন্দী লিখিতে কিম্বা বলিতে পারেন? কোন কোন ইংরাজ পাদরী নিজের পাণ্ডিত্য দেখাইবার জন্য কোনও ভারতবাসীর সাহায্য না লইয়া দেশীয় ভাষায় বাইবেলের অনুবাদ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য যে তাঁহাদের অনুবাদ পড়িয়া এতদ্দেশীয় লোকেরা খুব মন খুলিয়া হাসে। কোন ধর্ম্মের প্রতি বিদ্রূপ করা অত্যন্ত অন্যায়। কিন্তু যেরূপ ভাষায় বাইবেলের এতদ্দেশীয়, বিশেষতঃ বাঙ্গলা, ভাষায় অনুবাদ হইয়াছে, তাহাতে জনসাধারণের খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি হইতে পারে না।

অনেক বাঙ্গালী এরূপ উৎকৃষ্ট ভাষায় ইংরাজী গদ্য ও পদ্য গ্রন্থ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, যে সেরূপ ভাষায় অনেক ইংরাজেও লিখিতে অক্ষম। এই সকল লেখকদের ভিতর হইতে কয়েক জন লোকের ও তাঁহাদিগের প্রণীত গ্রন্থের নাম এই প্রবন্ধে দেওয়া হইবে।

১। রাজা রামমোহন রায়।

বাঙ্গালীদের মধ্যে যিনি প্রথম ইংরাজী ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন এবং যাঁহার ইংরাজী ভাষায় লিখিত পুস্তক সকল এপর্য্যন্ত ইউরোপ ও আমেরিকার প্রধান প্রধান দার্শনিক ও অন্যান্য চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ পাঠ করেন, তাঁহার নাম জনসাধারণের সুপরিচিত মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়। ইনি নব্য ভারতের সকল বিষয়ের পথপ্রদর্শক। বিজাতীয় ইংরাজী ভাষাতেও যে আমাদের মনের ভাব ব্যক্ত করা ও পুস্তক প্রভৃতি লেখা আবশ্যক, তাহা তিনি ভালরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। যেমন তিনি আধুনিক বাঙ্গালা গদ্যের সৃষ্টি কর্ত্তা, তেমনই তিনি ভারতবাসীদিগের মধ্যে প্রথম ইংরাজী-লেখক। তাঁহার সময়ে ইংরাজী ভাষা শিক্ষার নিমিত্ত এদেশে কোন পাঠশালা ছিল না। তিনি নিজের যত্নে নানাপ্রকার কষ্ট সহ্য করিয়া ইংরাজী ভাষা শিখিয়াছিলেন। ইংরাজী ভাষায় তিনি যে সকল পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন, তাহার ভাষা প্রাঞ্জল এবং বিশুদ্ধ। এই জন্য অনেকে এইরূপ সন্দেহ করেন যে এই সকল পুস্তকের ভাষা তিনি কোন ইংরাজ কর্ত্তৃক শুদ্ধ করাইয়া লইয়াছিলেন। ৺কিশোরীচাঁদ মিত্র মহাশয় 'কলিকাতা রিভিউ' পত্রে রাজা রামমোহন রায়ের ইংরাজী লেখার সম্বন্ধে এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন :—

"But we would have it distinctly understood that his English writings do not furnish a legitimate criterion of his English knowledge. They were, to a certain extent, the production of his European friends, though the thoughts and sentiments embodied in them owed their paternity to him alone. The matter was his, but not wholly the manner of expression; his acquaintance with

the English language was, as we have said, highly respectable and no more—though, *for his time*, it might well be pronounced remarkable. In writing his religious and political pamphlets, in drawing up papers or even letters of any importance, he had constant assistance from an intelligent and highly educated friend. He did not send a line to the press without submitting it to his revision. The truth is that Ram Mohun Ray was exceedingly ambitious of literary fame."

বোধ হয় তিনি প্রথমে যে সকল ইংরাজী পুস্তক লিখিয়াছিলেন, তৎসমুদয় কোন ইংরাজ কর্তৃক সংশোধিত করাইয়া লইয়াছিলেন। ইহাতে কোন বিশেষ আশ্চর্য্যের কারণ নাই। ভট্ট মোক্ষমূলার জর্ম্মনদেশীয় লোক ছিলেন। তিনি যখন ইংলণ্ডে আসিয়া ইংরাজী ভাষাতে লিখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার লেখা প্রথম প্রথম একজন ইংরাজ কর্ত্তৃক সংশোধিত হইত। ইহা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। রাজা রামমোহন রায়ের কোন স্কুলে ইংরাজী শিক্ষা হয় নাই। অতএব ইহা সম্ভব যে তাঁহার প্রথম রচনা গুলির সংশোধনার্থে তিনি কোন ইংরাজের সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছিলেন।*

রাজা রামমোহন রায়ের সমুদয় ইংরাজী লেখা এখন একত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। এই প্রকাশিত গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে রাজা রামমোহন রায় কেবল ধর্ম্মচর্চ্চা ও সমাজসংস্কারের আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন না, তিনি রাজনৈতিক বিষয়েও আন্দোলন করিতেন। তাঁহার চিন্তাশীল ও যুক্তিসঙ্গত লেখা সমস্ত শিক্ষিত ভারতবাসীর পাঠোপযোগী ও আদর্শস্থল। তাঁহার রচনাগুলির একটী সুলভ সংস্করণ হওয়া কর্ত্তব্য। তাহা হইলে উহার খুব প্রচার হইবে।

রাজা রামমোহন রায় বিলাতে আর্ণট নামক একজন ইংরাজকে নিজের সেক্রেটরী নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এই ইংরাজের নাকি তিনি কিছু টাকা ধারিতেন। তজ্জন্য তাঁহাকে অনেক তাগাদা সহ্য করিতে হইয়াছিল। ভট্ট হোরেস উইলসন অনেক কাল ভারতবর্ষে ছিলেন। তাঁহার সঙ্গে রামমোহন রায়ের কলিকাতায় আলাপ হয়। তিনি রামমোহন রায়ের মৃত্যু সম্বন্ধে যে পত্র দেওয়ান রামকমল সেনকে লিখিয়াছিলেন তাহাতে স্পষ্টই বলিয়াছিলেন যে রামমোহন রায় ঋণগ্রস্ত হইয়াছিলেন বলিয়াই সেই ভাবনায় ও দুশ্চিন্তাতেই পীড়িত ও কালকবলে পতিত হন। তাঁহার উত্তমর্ণ এই আর্ণট সাহেব ছিল। টাকার জন্য ঐ সাহেব রামমোহন রায়কে অত্যন্ত ত্যক্ত বিরক্ত করিয়াছিল। উইলসন সাহেব ঐ চিঠিতে এরূপও লিখিয়াছেন যে আর্ণট সাহেব রামমোহন রায়কে এই বলিয়া ভয় দেখাইয়াছিল যে যদি তুমি আমার ঋণ পরিশোধ না কর, তাহা হইলে আমি তোমার অপ্রকাশিত হস্তলিখিত বই গুলি লইয়া নিজের নামে প্রকাশ করিব। রামমোহন রায়ের মৃত্যুর পরে নাকি সেই সকল বই আর্ণট সাহেব নিজের নামে প্রকাশিত করিয়াছিল। আর্ণট সাহেবের নামে প্রকাশিত, কিন্তু বাস্তবিক রামমোহন রায়ের লিখিত, এই বই গুলির বিশেষ অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। এ দেশে ঐ সকল বই পাওয়া বোধ করি অসম্ভব। কিন্তু বিলাতের ব্রিটিশ মিউজিয়মের পুস্তকালয়ে তাহা থাকিতে পারে। কোন ইংলণ্ডপ্রবাসী বাঙ্গালী যদি কষ্টস্বীকার করিয়া ঐ বইগুলির অনুসন্ধান করেন, তাহা হইলে বড় ভাল হয়। ইহা আশা করিতে পারা যায় যে এই অনুসন্ধানের ফলে রাজা রামমোহন রায়ের লিখিত অনেক পুস্তকের পুনরুদ্ধার হইতে পারিবেক।

* বোধ করি কিশোরী বাবু বিলাতের Annual Register for 1833 দেখেন নাই। উহাতে রাজা রামমোহন রায়ের জীবনী প্রকাশিত হইয়াছিল। তাহার ৩১৬ পৃষ্ঠার পাদটীকায় এইরূপ লিখিত আছে:—

"The Raja was constantly in the habit of dictating to those who were for the time acting as amanuenses in phraseology requiring no improvement, whether for the press, or for the formation of official documents—such verbal amendments only excepted as his own careful revision supplied before the final completion of the manuscript. He was remarkably tenacious of his own modes of expression; and may be said to have piqued himself on his grammatical knowledge of our language, and his proper selection and arrangement of words. When dictating, he rarely departed from his judgment in either; and when revising, it was he who made the corrections. His friends have often been struck with his quick and correct diction, and his immediate perception of occasional errors, when he came to revise the matter."

২। বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ।

ইংরাজী শিক্ষার জন্য এ দেশে হিন্দু কালেজ সর্ব্বপ্রথমে সংস্থাপিত হয়। এই কালেজে যে যে শিক্ষক নিযুক্ত হইয়াছিলেন, তাঁহারা শিক্ষার্থীদের সহিত মিশিতেন ও তাঁহাদের শারীরিক, মানসিক ও সাংসারিক উন্নতির জন্য বিশেষ যত্ন করিতেন; যদিও শিক্ষক সকল ইংরাজ ছিলেন, তথাপি তাঁহাদের ভারতবাসীদের সহিত বিশেষ সহানুভূতি ছিল। সেই কারণেই তাঁহাদের ছাত্রেরা প্রায় সকলেই ভালরূপ ইংরাজী লিখিতে ও বলিতে পারিতেন।

ডিরোজিও এবং কাপ্তেন রিচার্ডসন এক সময়ে ঐ হিন্দুকালেজের খ্যাতনামা শিক্ষক ছিলেন। তাঁহাদের ইংরাজী ভাষায় কবিতা লিখিবারও বেশ ক্ষমতা ছিল। ডিরোজিও সাহেব ইউরেশিয়ন ছিলেন। সচরাচর ইতর ইউরেশিয়নদিগের মত ভারতবাসী ও ভারতবর্ষকে তিনি ঘৃণা করিতেন না। তাঁহার নিম্নলিখিত ইংরাজী কবিতাটী আমাদের প্রায় সকল শিক্ষিত ব্যক্তিই অবগত আছেন।

My country! in thy day of glory past
A beauteous halo circled round thy brow,
And worshipped as a deity thou wast—
Where is that glory, where that reverence now?
Thy eagle pinion is chained down at last,
And grovelling in the lowly dust art thou:
Thy minstrel hath no wreath to weave for thee
Save the sad story of thy misery!—
Well—let me dive into the depths of time,
And bring from out the ages that have rolled,
A few small fragments of those wrecks sublime,
Which human eye may never more behold;
And let the guerdon of my labour be
My fallen country! one kind wish for thee!

ডিরোজিও সাহেবের অতি অল্প বয়সে মৃত্যু হয়, কিন্তু যে অল্পকাল তিনি হিন্দু কালেজে শিক্ষকের কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তাহাতেই তিনি অনেককে সাহিত্যচর্চ্চার আগ্রহ দিয়া যাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার ছাত্রদিগের উন্নতির জন্য বিশেষ যত্নবান ছিলেন ও তাঁহাদিগকে বড় ভাল বাসিতেন। কাপ্তেন রিচার্ডসন সাহেবও সাহিত্যচর্চ্চায় ব্যাপৃত থাকিতেন। তিনি অনেক কবিতা লিখিয়া গিয়াছেন। ভারতবর্ষকে তিনি ভাল বাসিতেন।

বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ হিন্দু কালেজে ডিরোজিও এবং রিচার্ডসন সাহেবের নিকট শিক্ষা লাভ করেন।



৺কাশীপ্রসাদ ঘোষ।

তাঁহাদের কবিতাশক্তি দেখিয়া বোধ করি তিনিও ইংরাজী ভাষাতে কবিতা লিখিতে আরম্ভ করেন এবং ইহাও অসম্ভব নহে যে তাঁহারাই ইহাঁকে কবিতা লিখিতে উৎসাহপ্রদান ও তাঁহার প্রণীত কবিতার ভাষা সংশোধন করেন।

বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষ যে The Shair and other Poems কবিতাপুস্তকখানি ইংরাজীতে রচনা করেন, ইংলণ্ডেও তাহার বেশ প্রচার হইয়াছিল। একজন ভারতবাসী যে বিজাতীয় ভাষায় এরূপ সুন্দর ও মধুর কবিতা লিখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাহাতেই অনেক ইংরাজ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। সেই সময় ইংলণ্ডে Fishers "Drawing-room Scrap Album" বলিয়া প্রতি বৎসর একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইত। এই পুস্তকে ভাল ভাল চিত্র ও পাঠোপযোগী কবিতা থাকিত। এই সকল পুস্তক এখন পাওয়া অতি দুষ্কর। কখন কখন পুরাতন পুস্তকবিক্রেতাদের নিকট ঐ পুস্তকের দুই এক খণ্ড পাওয়া যায় কিন্তু প্রায়ই তাহারা ঐ সকল পুস্তক অতিশয় চড়া দামে বিক্রয় করে। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে

যে "Drawing-room Scrap Album" প্রকাশিত হয়, তাহাতে বাবু কাশীপ্রসাদ ঘোষের প্রতিমূর্ত্তি, জীবনী ও তাঁহার রচিত একটী কবিতা থাকে। তাঁহার সেই প্রতিমূর্ত্তিটী আবার Fisher's Views in India, China and on the Shores of the Red Sea নামক গ্রন্থের দ্বিতীয়ভাগের আখ্যাপত্রে দেওয়া হইয়াছিল। সেই প্রতিমূর্ত্তি ও সেই কবিতাটী প্রবাসীর এই সংখ্যায় দেওয়া গেল। বাঙ্গালীদের ভিতর ইনি সর্ব্বপ্রথম ইংরাজী ভাষায় কবিতা লেখেন এবং তাহাতে তিনি যথেষ্ট পরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন।

THE BOATMEN'S SONG TO GANGA.

Gold river! gold river! how gallantly now
Our bark on thy bright breast is lifting her prow,
In the pride of her beauty, how swifty she flies:
Like a white-winged spirit thro' topaz-paved skies.

Gold river! gold river! thy bosom is calm,
And o'er thee, the breezes are shedding their balm:
And Nature beholds her fair features pourtrayed
In the glass of thy bosom—serenely displayed.

Gold river! gold river! the sun to thy waves
Is fleeting to rest in thy cool coral caves;
And thence, with his tiar of light, at the morn
He will rise, and the skies with his glory adorn.

Gold river! gold river! how bright is the beam
Which brightens and crimsons thy soft-flowing stream;
Whose waters beneath make a musical clashing,
Whose ripples like dimples in childhood are flashing.

Gold river! gold river! the moon will soon grace
The hall of the stars with her light-shedding face:
The wandering planets her palace will throng,
And seraphs will waken their music and song.

Gold river! gold river! our brief course is done,
And safe in the city our home we have won;
And now as the bright sun who drops from our view,
So Ganga, we bid thee a cheerful adieu!

৩। বাবু কিশোরীচাঁদ মিত্র।

ইনি ও হিন্দুকালেজে শিক্ষা লাভ করেন। ইনি বাবু প্যারীচাঁদ মিত্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দে "কলিকাতা রিভিউ" নামক ত্রৈমাসিক পত্রিকা কলিকাতা হইতে প্রকাশিত হইতে আরম্ভ হয়। খ্যাতনামা সার্ জন্ কে ইহার প্রথম সম্পাদক হন। প্রথম সংখ্যার সমুদয় প্রবন্ধই তাঁহার রচিত। তাহার পর হইতে ভারতের



৺কিশোরীচাঁদ মিত্র।

অনেক খ্যাতনামা ইংরাজ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এই পত্রিকা এখন পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে। ইহার আরম্ভ অবধি ইহা সাহিত্যজগতে সুপরিচিত ও আদৃত। এই পত্রিকার সর্ব্বপ্রথম বাঙ্গালী লেখক কিশোরী বাবু। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দের এক সংখ্যায় তাঁহার রামমোহন রায়ের উপর প্রবন্ধটী প্রকাশিত হয়। এই প্রবন্ধটী যে একজন ভারতবাসীর লিখিত, তাহা সম্পাদক মহাশয় এক টিপ্পনীতে প্রকাশ করিয়াছিলেন। এই প্রবন্ধটির লেখা এত ভাল হইয়াছিল যে প্রবাদ আছে যে তখনকার বঙ্গদেশের শাসনকর্ত্তা এই প্রবন্ধ পাঠ করিয়া কিশোরী বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিলেন এবং সাক্ষাৎ হইলে পর তাঁহাকে একেবারে ডেপুটী কলেক্টারের পদে নিযুক্ত করেন। কলিকাতা রিভিউএ কিশোরী বাবু আরও অনেক গুলি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি স্বয়ং একটি ইংরাজী পত্রিকা সম্পাদন করিতেন। কিন্তু তিনি ইংরাজী ভাষায় কোন পুস্তক রচনা করিয়া যান নাই।

৪। বাবু প্যারীচাঁদ মিত্র।

ইনি কিশোরীচাঁদ মিত্রের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন এবং তাঁহার মত হিন্দুকালেজে শিক্ষা লাভ করেন। গতবৎসরের প্রবাসীর এক সংখ্যাতে ইঁহার সচিত্র জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে। এই জন্য এই স্থলে তাঁহার বিষয় বেশী লিখিবার কিছু আবশ্যক নাই। বঙ্গভাষায় রচিত বহুসংখ্যক পুস্তকের জন্য ইঁহার নাম বঙ্গসাহিত্যে চিরকাল প্রসিদ্ধ থাকিবেক। ইনি ইংরাজীতেও একজন সুলেখক ছিলেন। তাঁহার ইংরাজী ভাষায় লিখিত পুস্তক সকল, যথা Life of David Hare, Life of Ram Comal Sen, The soul its nature and development ইংলণ্ডে ও আমেরিকায় অনেকে আদরের সহিত পাঠ করেন।

৫। পাদরী কৃষ্ণমোহন বন্দোপাধ্যায়।

ইনি হিন্দুকালেজে শিক্ষা লাভ করিয়া অতি অল্প বয়সে ডফসাহেব কর্ত্তৃক খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন। ডফ সাহেব কর্ত্তৃক যতজন খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে ইনি সর্ব্বপ্রধান ছিলেন। এইজন্য ইঁহাকে "The Prince of Indian Converts" বলা হইত। বঙ্গসাহিত্যের উন্নতির জন্য ইনি অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়াছিলেন। তিনি ভারতের অনেকগুলি চলিত ভাষা জানিতেন এবং তাঁহার সংস্কৃত ভাষায়ও বেশ পাণ্ডিত্য ছিল। এই হেতু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সম্মানপ্রদর্শনার্থ ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে Doctor of Laws উপাধি দান করেন। তিনি ইংরাজী ভাষাতে সুলেখক ও সুবক্তা ছিলেন। সেই ভাষাতে অনেক প্রবন্ধ ও পুস্তক লিখিয়াছিলেন। তাঁহার দুই খানি ইংরাজী পুস্তক বিদ্বান খৃষ্টান মণ্ডলীতে সুপরিচিত। এই দুই পুস্তকের নাম "Dialogues on Hindoo Philosophy" এবং "Aryan Witness." তিনি গোঁড়া খৃষ্টান ছিলেন বলিয়া হিন্দু দর্শন শাস্ত্রের প্রতি অনাদর অশ্রদ্ধা ও অভক্তি দেখাইতে ত্রুটি করেন নাই। এই কারণেই তাঁহার ইংরাজী বই গুলি এতদ্দেশীয় শিক্ষিত ব্যক্তিগণ আর পড়েন না এবং ইহাও অসম্ভব নহে যে আর কিছু বৎসর পরে তাঁহার নাম লোকে বিস্মৃত হইয়া যাইবে।

৬। বাবু রামগোপাল ঘোষ।

ইনিও হিন্দুকালেজে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীদিগের ভিতর ইনি সর্ব্বপ্রথম যেরূপ ইংরাজী ভাষায় সুবক্তা হইয়াছিলেন, তাহাতে তিনি বাঙ্গালীদের গৌরবস্থল ছিলেন। তাঁহার ইংরাজী বক্তৃতা শুনিয়া অনেক ইংরাজ পর্য্যন্ত মুগ্ধ হইতেন। প্রসিদ্ধ বাগ্মী বর্ক ইঁহার আদর্শ ছিল বলিয়া ইঁহাকে সচরাচর লোকে "The Burke of Bengal" বলিত। কেহ কেহ তাঁহাকে "Indian Demosthenes" ও বলিয়া থাকেন। সম্প্রতি রামগোপাল ঘোষের বক্তৃতাগুলি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। তিনি যে তাঁহার বক্তৃতা দ্বারা কলিকাতার অনেক উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তাহা যাঁহারা ভারতের রাজধানীর ইতিহাস জানেন, তাঁহাদিগকেই স্বীকার করিতে হইবে।

৭। বাবু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ইংরাজীভাষায় সাময়িক পত্রিকা সম্পাদিত করিয়া যে ভারতবাসী প্রথমে ইংরাজ এবং এতদ্দেশীয় জনসাধারণের মধ্যে সুখ্যাতি লাভ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তাঁহার নাম বাবু হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়। ইঁহার পূর্ব্বেও অনেক বাঙ্গালী ইংরাজী পত্রিকাতে প্রবন্ধাদি লিখিতেন, কিন্তু রীতিমত রাজনৈতিক বিষয়ের আলোচনার নিমিত্ত বাঙ্গালী কর্ত্তৃক সম্পাদিত কোন প্রসিদ্ধ পত্রিকা ছিল না। "হিন্দুপেট্রিয়ট" পত্রিকা সর্ব্বপ্রথম ইঁহা কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয় এবং মৃত্যু পর্য্যন্ত অতি দক্ষতার সহিত তিনি ইহা সম্পাদন করিয়াছিলেন। ভারতবাসী চিরকাল ইঁহার নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে বদ্ধ থাকিবে। কারণ ইনি সিপাহিবিদ্রোহের সময়ে নিজের লেখা দ্বারা ভারতবর্ষের অনেক উপকার সাধন করিয়াছিলেন, এবং তৎপরে নীলকরদিগের অত্যাচারের বিরুদ্ধেও আন্দোলন করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় বঙ্গদেশের শিক্ষিত সম্প্রদায় ইঁহার স্মৃতিচিহ্নের নিমিত্ত কিছুই করেন নাই। ইঁহার যে জীবন-

চরিত লেখা হয় তাহা কোন বাঙ্গালী কর্ত্তৃক হয় নাই। কিন্তু এক জন বোম্বাই প্রদেশের পার্শী ইঁহার ইংরাজী লেখা পাঠ করিয়া এতদূর মোহিত হইয়াছিলেন যে ইঁহার মৃত্যুর পর তিনি অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়া ইহাঁর জীবনচরিত লেখেন। "Lights and shades of the East নামক বই খানি যে ফ্রামজী বোমানজী রচিত করেন, তাহা বোধ হয় এখন শিক্ষিত বাঙ্গালীরা বিস্মৃত হইয়াছেন। তিনি কিরূপ ভক্তিভাবে হরিশ্চন্দ্র বাবুর জীবনের কার্য্যের বিবর সমালোচনা করিয়াছেন, তাহা তাঁহার নিম্নলিখিত গুটিকতক কথাতে স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে। তিনি লিখিয়াছেনঃ—

In all respects save one, which we will point out in its proper place, this Baboo approaches to a just conception of what an educated young Native should be, what that *Light* of India, without the accompanying *Shades*, must be, that is to shed a halo of lustre in the wide East; and it is by examples like his that we would enforce our lessons of instruction.

(আগামী সংখ্যায় সমাপ্য।)

শ্রীবামনদাস বসু।

আহেরিয়া।

বসন্তের প্রথম আগমনে যখন জলে স্থলে অন্তরীক্ষে সৌন্দর্য্যের সঙ্গীত ধ্বনিত হয়—যখন কমনীয়া বাসন্তী শ্রী, কোমল অনুপম মাধুর্য্য, সর্ব্বত্রই নবীন ফুল্ল হরিতিমায় চতুর্দ্দিকে সৌন্দর্য্যের তরঙ্গ তুলে, তখন বহিঃপ্রকৃতির এই পুলকচঞ্চল আবেগ মানবমনে প্রতিধ্বনিত হয়—তাহার প্রতি শিরায় বসন্তের এই আনন্দকম্পন স্পন্দিত হইয়া তাহাকে আবেগচঞ্চল করিয়া তোলে। এজন্য সকল দেশেই এই সময় লোকদিগকে কোন না কোন উৎসবে মত্ত হইতে দেখা যায়। প্রাচীন রোমানদের স্যাটার্ণেলিয়া পর্ব্বই বল, আর আমাদের দেশের বসন্তোৎসবই বল, উভয়েরই মূলে একই কারণ নিহিত। প্রাচীন মিশর, রোম, গ্রীস, ইহুদী, সীরিয়, ক্যালডীয় সকল জাতিরই মধ্যে এইরূপ একটী না একটী পর্ব্ব প্রচলিত থাকার কথা পাঠ করা যায়। প্রাচীন তাতার জাতির মধ্যে যে খুশরোজ পর্ব্ব প্রচলিত ছিল, তাহারই রূপান্তর ঐ জাতিরই শ্রেণীবিশেষ, চাঘটাই মোগল সম্রাটদের মধ্যে, বিশেষতঃ সম্রাটশ্রেষ্ঠ আকবরের হাতে, 'নওরোজা' নামে অভিনব বেশ ধারণ করিয়াছিল। বর্ত্তমান প্রবন্ধে উক্ত উৎসব রাজপুত জাতির মধ্যে রূপান্তর গ্রহণ করিয়া কিভাবে প্রচলিত আছে, তাহার একটী সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে।

আমাদের দেশে মাঘ মাসের শুক্লাপঞ্চমী হইতেই প্রকৃতপক্ষে বসন্তের প্রারম্ভ। বসন্ত পঞ্চমীর দিন আমরা নূতন আম্রমুকুল ও তরুণ ধান্যের শীষ দিয়া বসন্ত-লক্ষ্মীর আবাহন করি। তিনি মানসিক সৌন্দর্য্যের প্রতিমারূপিণী, সকল বিদ্যা ও সকল শিল্পকলার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা। রাজপুতানায়ও এই দিন হইতে বসন্তোৎসবের প্রারম্ভ—এই দিন হইতে চৈত্র মাসের কয়েক দিন পর্য্যন্ত এ আনন্দ প্রবাহিত থাকে। তবে মাঘ ফাল্গুনে আনন্দস্রোত যেরূপ প্রখর, চৈত্রে উহাতে যেন ভাটা পড়িয়া যায়। প্রথমে বসন্ত পঞ্চমী, তাহার দুদিন পর ভানুসপ্তমী, তাহার পরবর্ত্তী কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দ্দশীতে মাঘ সংক্রান্তির একদিন পূর্ব্বে শিবরাত্রি, (ঐতিহাসিক টড্ এখানে রাজপুতদের চান্দ্র মাসের হিসাবে গণনা করিয়াছেন; স্মরণ রাখিতে হইবে যে এ পর্ব্ব আমাদের দেশে প্রায় ফাল্গুন মাসেই পড়িয়া যায়।) তাহার পর ফাল্গুনের প্রথমে আহেরিয়া পর্ব্ব, তাহার পর দোল পূর্ণিমা, চৈত্রের প্রথম দিনে 'সম্বৎসরী' বা 'মহাসতী' দর্শন (যেখানে রাণার পিতৃপুরুষের সমাধিস্থলে যাইয়া তর্পণাদি করিতে হয়), সপ্তম দিনে শীতলা দেবীর পূজা (টড্ যেমন বর্ণনা করিয়াছেন তাহাতে ইহাকে আমাদের দেশের বসন্তরোগের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা না বুঝিয়া শিশুদিগের রক্ষয়িত্রী ষষ্ঠীদেবীকে মনে পড়ে,) তাহার পর কুসুমোৎসব, তাহার পর 'গঙ্গোরী'* (বা অনেকটা আমাদের দেশের অন্নপূর্ণা পূজা) প্রভৃতি পর্ব্বে ক্রমান্বয়ে দেশকে উৎসবময় করিয়া রাখে।

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে বসন্তপঞ্চমী ও দোলপূর্ণিমা প্রকৃতপক্ষে বসন্তোৎসবের আরম্ভ ও শেষ সীমা। রাজ-

* টড্ এ কথাটী 'Gangore' লিখিয়াছেন। ইহার কোন অর্থ করিতে পারিলাম না।

পুতানার সত্যপ্রিয় সমদর্শী উদারহৃদয় ঐতিহাসিক মহাত্মা টড্ বলিতেছেন যে এ কয়দিন যাবৎ, বিশেষ হোলির কয়দিন, সমস্ত রাজপুতানা প্রমোদময় হইয়া উঠে। তখন রাজা প্রজায় প্রভেদ থাকে না। স্বয়ং উদয়পুরের মহারাণা ও অপরাপর অধীন রাজন্যবর্গ ঠাকুর ও ভুইঞারা, সকলেই, স্ব স্ব পদমর্য্যাদার অলঙ্ঘনীয় গাম্ভীর্য্য দূরে রাখিয়া, উচ্ছৃঙ্খল প্রমোদে মত্ত হইয়া পড়েন। সে কয়দিন রাজ্যময় যেন আনন্দের প্রবাহ বহিতে থাকে। উক্ত সম্ভ্রান্ত রাজপুত প্রধানেরা, যাঁহারা অন্য সময় সামান্য মাত্র অশ্লীল বিদ্রূপের কথা উচ্চারণ করিতেও নিতান্ত সঙ্কুচিত হন, তাঁহারা এই মদনমহোৎসবে সে কয়দিন নিম্নশ্রেণীর অভদ্রলোকদের সহিত প্রকাশ্য রাজপথে অশ্লীল গীতাদি গাহিতে তিল মাত্র সঙ্কোচ বোধ করেন না। এই ঘটনায় টড্ সাহেবের প্রাচীন রোমানদের স্যাটার্ণেলিয়া উৎসবের কথা মনে পড়িয়াছে—যে সময় রোমান্ সেনেটের প্রাচীনতম ও বিজ্ঞতম সভাসদেরাও এক অবাধ উচ্ছৃঙ্খলতায় মত্ত হইয়া পড়িতেন। পার্ব্বত্য ভীল বা অসভ্য মের নিজের কৃষ্ণ দেহ বাসন্তীবর্ণে রঞ্জিত বস্ত্রে ও নিজের কৃষ্ণবর্ণ প্রচুর কেশরাশি ছিন্ন শিরস্ত্রাণে কতকাংশে সংযত করিয়া মল্লিকা ও যুথির মালায় জড়িত করিয়া, মৃদঙ্গ ও মাদলের বাদ্যভাণ্ডে রাজপথ উচ্চ আনন্দের কোলাহলে মুখরিত করিয়া রাখে।

বসন্ত পঞ্চমীর দুইদিন পরে 'ভানু সপ্তমী'। উদয়পুরের মহারাণা সূর্য্যবংশীয়—সূর্য্যদেব তাঁহার বংশের আদি পুরুষ ও প্রতিষ্ঠাতা। আর উদয়পুরের মহারাণা স্বয়ং রাজপুতকুলের চূড়া। আভিজাত্যে বংশমর্য্যাদায় সমস্ত রাজপুতানার রাজন্যবর্গের মধ্যে তাঁহার সমকক্ষ কেহ নাই। যে বংশে স্বয়ং নৃপকুলোত্তম রামচন্দ্র জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, ভারতের দুর্দ্দিনে অম্বর, বুঁদি, মাড়ওয়ার, বিকানীর প্রভৃতি রাজপুত প্রধানেরাও যে সময় মোগল সম্রাটদের সঙ্গে কুটুম্বিতা স্থাপিত হওয়া বিশেষ আত্মসম্মানের বিষয় মনে করিতেন, সে সময়ও যে বংশে কখন তুর্কির সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত হয় নাই—যে বংশে তখনও রামচন্দ্র, বাপ্পারাও, সমরসিংহ, প্রতাপ সিংহ প্রভৃতি পুণ্যশ্লোক নৃপতিদের পবিত্র রক্ত প্রবাহিত হইতেছিল, তাহার গৌরব অন্য কোন্ বংশে সম্ভবে? সুতরাং সমস্ত রাজপুতানায়, বিশেষতঃ উদয়পুরে, সূর্য্যদেবের পূজার প্রাধান্য। এমন কি রাজ্যের সমস্ত দ্রব্যই সূর্য্যের নাম বিশিষ্ট—রাজধানীর প্রধান তোরণের নাম 'সূর্য্যপোল' রাজপ্রাসাদের নাম 'সূর্য্যমহল'। প্রাসাদের যে গবাক্ষ হইতে মেঘদুর্দ্দিন বর্ষায়, ভগবান মরীচিমালীর পার্থিব প্রতিনিধি মহারাণা প্রজাবর্গকে দর্শনদানে কৃতার্থ করেন, তাহার নাম 'সূর্য্যগোক্র'। টড্ লিখিয়াছেন 'গোক্র' কিন্তু ইহা সম্ভবতঃ 'চক্র' হইবে। উক্ত ইতিহাসের পাঠক মাত্রেই জানেন যে দেশী নামগুলির উহাতে কিরূপ উৎকট রূপান্তর হইয়াছে, এমন দাঁড়াইয়াছে যে উহার অর্থ নির্ণয় করা একান্ত দুঃসাধ্য! মহারাণার দরবারগৃহের সিংহাসনের অব্যবহিত পশ্চাদ্ভাগে বৃহৎ সূর্য্যপরিধিবৎ মণ্ডলাকার সূর্য্যকিরণসঙ্কাশ স্বর্ণমণ্ডিত সূর্য্যদেবের প্রতিমূর্ত্তি স্থাপিত। রাজচ্ছত্রের নাম 'কির্ণিয়া' ('কিরণ' অর্থাৎ সূর্য্যকিরণ হইতে এ শব্দের উৎপত্তি)। তাঁহার পবিত্র রাজকেতন "চঙ্গী" চতুষ্পার্শ্বে কৃষ্ণবর্ণ পক্ষিপক্ষশোভিত, মধ্যদেশে সূর্য্যমণ্ডলজ্ঞাপক বর্ত্তুলাকার স্বর্ণফলকে উক্ত দেবেরই প্রতিমূর্ত্তি! সর্ব্বত্রই উক্ত দেবের প্রতিমূর্ত্তি পরিদৃষ্ট ও সমস্ত রাজচিহ্নেই ইহা পরিলক্ষিত।

এই 'ভান্ সপ্তমী'র ('ভান্', 'ভানুর' হিন্দী অপভ্রংশ) পর মাঘ মাসের একদিন থাকিতে শিবরাত্রি—মহারাণা এ পর্ব্ব অনাহারে অনিদ্রায় অতি কঠোর নিয়মে পালন করেন। তাহারি পর ফাল্গুনের প্রথম দিনে 'আহেরিয়া' পর্ব্বের প্রারম্ভ হয়। পর্ব্বের পূর্ব্বদিন রাণা তাঁহার অধীন সমস্ত সামন্ত ও অনুচরবর্গকে হরিদ্বর্ণ পরিচ্ছদ বিতরণ করেন। সকলকে আপাদমস্তক হরিদ্বর্ণ পরিচ্ছদ বিতরণ করা যায় না—কাহারও সমস্ত পরিচ্ছদই, কাহারও বা উষ্ণীষ, উত্তরীয় প্রভৃতি দেহের কতক পরিচ্ছদ হরিদ্বর্ণ—কিন্তু একটা ঐ বর্ণের হওয়াই চাই। বসন্তে সর্ব্বত্র হরিদ্বর্ণের বিকাশ; তাই কি এই পর্ব্বে উক্ত বর্ণের পরিচ্ছদে বাসন্তীলক্ষ্মীর আবাহন? রাজস্থানের ঐতিহাসিক তাহার কোন মীমাংসাই করেন নাই। যাহা হউক, এই নয়নশোভন পরিচ্ছদ ধারণ করিয়া সকলেই অতি প্রত্যুষে

সজ্জিত হইয়া যাত্রার জন্য প্রস্তুত থাকে। বিজ্ঞ রাজ-জ্যোতিষিগণ পঞ্জিকা দেখিয়া যাত্রার শুভলগ্ন নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলে, মহারাণা ও তাঁহার পুত্রেরা, উৎসবার্থ সমাগত বা রাজসভাসদ্ অন্যান্য রাজপুত সামন্ত ও প্রধানেরা, অনুচর পরিচারকেরা, সকলে ভগবতী দেবীর উদ্দেশে এই বরাহ শিকারে বহির্গত হয়। শুভ মুহূর্ত্ত দেখিয়া শিকারে যাত্রা করা হয় বলিয়া এই পর্ব্বের নাম মুহুরৎকা শিকার। বৎসরের শুভ ফলাফল অনেকটা শিকারের সাফল্যের উপর নির্ভর করে। এ জন্যে অতি সাবধানে শিকারের আশ্রয়-স্থান পূর্ব্বাহ্নেই নির্ণীত হয়। শিকার সম্মুখে পড়িলে পলাইয়া হাতছাড়া হইয়া না যায় এজন্য প্রাণপণ চেষ্টা করা হয়। স্বয়ং মহারাণা, সমস্ত সামন্তবর্গ ও তাঁহার অনুচর পার্শ্বচারক, প্রত্যেকে খুব উৎকৃষ্ট সুসজ্জিত অশ্বে সমারূঢ় হইয়া, সে দিন সমবেত শিকারীদের মধ্যে কে কাহাকে কার্য্যক্ষেত্রে ক্ষিপ্রকারিতায়, সাহসে ও বিক্রমে অতিক্রম করিবে, পরস্পরের মনে এ ভাব জাগরূক থাকে। প্রায়ই কোন না কোন গিরিসঙ্কট বা উপত্যকায় বরাহ দৃষ্ট হয়। তখন শিকারীদের উৎসাহ দেখে কে? তাহাদের তুমুল 'বনগাহনকোলাহলে' মৃগ্য 'ঢোকয়া' (বন্যবরাহ) দ্রুত পলায়ন করিবার প্রয়াসী হয়, শিকারীরা চতুর্দ্দিক হইতে 'বিরছি' (বর্শা) হস্তে আক্রমণ করে। কখন কখনও এরূপ একটী পার্ব্বত্য প্রদেশে একের পরিবর্ত্তে একদল বন্যবরাহ শিকারীদের আনন্দোৎফুল্ল নেত্রপথের পথিক হয়। তখন শিকারীরা বর্শাহস্তে অকুতোভয়ে সম্মুখের ক্ষুদ্র পার্ব্বত্য নদী, বৃক্ষ বা গিরিদ্রোণী কোন কিছুরই বাধা না মানিয়া এই দীর্ঘরোমা শিকারের পশ্চাদ্ধাবিত হয়। এরূপ নির্দ্দয়ভাবে তাড়িত হইলে বেচারাদের রক্ষার কোন উপায় থাকে না—এরূপ হঠকারিতায় উভয় পক্ষেরই প্রায় বিপদ্ ঘটে। অনেক সময় পর্ব্বত-সানুদেশ আরোহীর অশ্ব, শিকার ও শিকারীর রক্তে অনুরঞ্জিত হয়। টড্ বলিয়াছেন, যে অদম্য সাহস ও নির্ভীকতার সহিত এ শিকারীরা, বন্য পার্ব্বত্য মৃগের মত, পথের সমস্ত বাধাবিপত্তি উল্লঙ্ঘন করিয়া—গভীর তৃণগুল্মাচ্ছাদিত দুর্ভেদ্য জঙ্গল, দুরারোহ তৃণমাত্র-পরিশূন্য গিরিসানুপ্রদেশ অতিক্রম করিয়া, উন্মুক্ত কৃপাণ বা বর্শাফলকে প্রভাতপবন বিদ্ধিত করিয়া, অশ্বের বল্গা ধরিয়া ঝুলিতে ঝুলিতে বরাহকে বিদ্ধ করে, তাহা স্বচক্ষে দেখিলে কোনও অতিবড় সাহসী য়ুরোপীয় শিকারীকেও ভয়বিহ্বল হইতে হয়! তাঁহার মতে, রাজপুতেরা তাহাদের সীদিয় পূর্ব্বপুরুষদের নিকট হইতে মৃগয়ায় তীব্র আনন্দ উত্তরাধিকার করিয়াছিল। চোহান বংশীয় হিন্দুকুলরবি সম্রাট পৃথ্বীরাজ অনেক সময় অরাতি-শাসিত নিষিদ্ধ প্রদেশে শিকার করিয়া ইহার দণ্ডস্বরূপ প্রতিপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে বাধ্য হইতেন। তাঁহার এই জঙ্গলে চৌর্য্যবৃত্তি খুব প্রখর ছিল। ইহা কথিত আছে রাভী নদীর তীরে এরূপ একবার শিকারে প্রবৃত্ত অবস্থাতেই তাতারদের সঙ্গে তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হয়। তাঁহার রাজ্যের প্রধান শিকারী অজানবাহু (আজানুবাহু) যেরূপ সমরক্ষেত্রে শৌর্য্যে অতুল, তদ্রূপ শিকারেও অদ্বিতীয় ছিলেন। কবি চন্দ্ তাহার "চৌহান রাশৌ" গ্রন্থে তাঁহার সহিত মৃগয়ার্থ কত প্রকার কুকুর লইয়া যাওয়া হইত তাহারও বিস্তৃত বর্ণনা করিয়াছেন। সে যাহা হউক, টড্ স্বয়ং রাণার সহিত এরূপ একটী শিকারে গিয়াছিলেন। সে দিন হামিরগড়ের অধিপতি চন্দাবৎ হামিরের পা ভাঙ্গিয়া যায় ও রাণার নিকট আত্মীয় শিবধন সিংহের হাতের মধ্যে পার্শ্বস্থ কোন শিকারীর বর্শা বিঁধিয়া যায়। সালুম্ব্রাধিপতি পদ্মাসিংহের 'বিরছি'তে বা হামিরগড়ের অধিপতি হামিরের 'খাণ্ডা'য় কত এরূপ ভগবতী গৌরীর শত্রু নিপাতিত হইয়াছিল, তাহার বিশদ বর্ণনা কৌতূহলী পাঠক উক্ত গ্রন্থে অনুসন্ধান করিবেন।

মহারাণার রাজকীয় পাকশালাও এই শিকারীদের অনুগমন করে। তিনবার বরাহ শিকারের পর সেই পার্ব্বত্য প্রদেশের কোন পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট পরিষ্কৃত ভূখণ্ডে বরাহমাংস রন্ধন করা হয়। পাকক্রিয়া সমাপ্ত হইলে মহারাণা ও তাঁহার সমবেত অমাত্যবর্গ একত্রে আহারে উপবেশন করেন। ভোজনান্তে "মনুওয়ার পেয়ালা" বা নিমন্ত্রণের পানপাত্রে সুরাপানও চলিতে থাকে। এই অনার্য্য বরাহমাংস ভোজন প্রথা অনেকের চক্ষে বিস্ময়কর বোধ হইতে পারে, কারণ এই পশু আর্য্যজাতির চক্ষে চিরকাল ঘৃণ্য। ইহা মহর্ষি মনুপ্রোক্ত পঞ্চনখী জীব বা

গোধা শল্লকী প্রভৃতির পবিত্র আহার্য্য মাংসের মধ্যে পড়িতেছে না। কিন্তু সত্যপ্রিয় ঐতিহাসিক টড্ বলিতেছেন যে প্রাচীন স্কাণ্ডিনেভীয় বা প্রাচীন গ্রীকদের মত রাজপুত জাতি বড় বরাহমাংসপ্রিয়। হর যেমন রাজপুতদের যুদ্ধ-দেবতা, ভগবতী গৌরীও সেরূপ তাহাদের আরাধ্যা মহাদেবী। বন্য বরাহ ভগবতী ভবানীদেবীর শত্রুর মধ্যে গণ্য। বরাহবংশোচ্ছেদ এজন্য কেবল মৃগয়ার ক্রীড়া মাত্র নহে, ইহা প্রকৃত ধর্ম্মোৎসব।— সুতরাং 'আহেরিয়া' উৎসবের মূলে রাজপুতদের ধর্ম্মসংস্কার নিহিত। প্রাচীন মিশরে যেমন আইসিস্ দেবীর, প্রাচীন গ্রীসে যেমন সিরিস্ দেবীর, নর্থম্যান্দের মধ্যে ফ্রেয়ার পূজায় যেমন বরাহবলি দেওয়া হইত, রাজপুত জাতির মধ্যেও অনেকটা তাই। রাজপুত জাতির যুদ্ধদেব হরের পানপাত্রও স্কাণ্ডিনেভীয় যুদ্ধদেবের মত, নরকপালে নির্ম্মিত!

ফাল্গুনের যতদিন যাইতে থাকে, এই মদোন্মত্ত নাগরিকদের আনন্দস্রোতের বেগ ততই বর্দ্ধিত হয়। প্রকাশ্য রাজপথে পরস্পরের গাত্রে আবীর নিক্ষেপ করিয়া রাজপথ রক্তবর্ণ ও পিচকারী দিয়া তাহাদের পরিচ্ছদ আপাদমস্তক রাগানুরঞ্জিত করিয়া দেয়। ফাল্গুনের অষ্টমদিবসের (চান্দ্র) নাম 'ফাগ' বা 'ফগুৎসব'। সে দিন মহারাণার শুদ্ধান্তপ্রদেশে মহারাণা নিজের বহুসংখ্যক পট্টমহিষী প্রভৃতির সহিত আবীরপ্রক্ষেপ ক্রীড়ায় মত্ত থাকেন, তখন সম্ভ্রম ও পদমর্য্যাদা আনন্দস্রোতে ভাসিয়া যায়! সে দৃশ্য কোন পুরুষ ঐতিহাসিকের নয়নপথে পতিত হয় না। সুতরাং টড্ সে ঘটনার কোনও বিশদ বর্ণনা করিতে পারেন নাই। তবে তাঁহার মতে যে দিন প্রাসাদের সম্মুখস্থ বিস্তৃত অলিন্দে মহারাণা ও তাঁহার ওমরারা অশ্বারূঢ় হইয়া পরস্পরের গাত্রে আবীর ও কুঙ্কুম বৃষ্টি করিতে থাকেন, সে এক অদ্ভুত দৃশ্য! প্রত্যেক সামন্ত যিনি এ ক্রীড়ায় যোগ দেন, তাঁহার নিকট অনেকগুলি কুঙ্কুম সঞ্চিত থাকে। যখন এ ক্রীড়ায় মত্ত হন, তখন বিচিত্র অশ্বচালনকৌশলের সহিত একে অন্যকে অনুসরণ করিয়া পরস্পর পরস্পরের গাত্রে কুঙ্কুম নিক্ষেপ করেন। চতুর্দ্দিক রক্তপরাগময় ও প্রাসাদ উচ্চ হাস্যকৌতুকে শব্দিত হইতে থাকে। এই কুঙ্কুমনিক্ষেপ প্রথা রূপান্তরে প্রচলিত রোমান্ কার্ণিভ্যাল্ উৎসবে এরূপ প্রথার কথা বিশেষজ্ঞের মনে জাগরিত করিবে।

পূর্ণিমার দিনে এই হোলিকোৎসব সম্পূর্ণ হয়। তখন নহবৎখানা হইতে নাকারার গম্ভীর ধ্বনি শ্রুত হয়। ঐ বাদ্যধ্বনিতে আমন্ত্রিত ও সভাসদ রাজপুত প্রধানেরা উচ্চ দরবারগৃহে 'চৌগাঁয়' মহারাণার অনুগমন করেন। এই বৃহৎ 'শালা' একটি প্রকাণ্ড হল, চতুর্দ্দিক অনাবৃত অর্থাৎ গবাক্ষাদিবিরহিত, চতুষ্কোণ বৃহৎ স্তম্ভোপরি স্থাপিত। এই স্থানে স্বয়ং 'ভগবান' একলিঙ্গদেবের দেওয়ান মহারাণা ও তাঁহার সামন্তবর্গ দুইদণ্ড ধরিয়া বসিয়া হোলিকার স্তুতিগীতশ্রবণে অতিবাহিত করেন। হয়ত জনতা ভেদ করিয়া কোন নর্ম্মচতুর নাগরিক মহারাণার উদ্দেশে একটী অশ্লীল গীত গাহিয়া উঠিল। আভিজাত্য ও উচ্চপদমর্য্যাদা সেদিন এই উচ্ছৃঙ্খল আমোদে বাধা দিতে পারে না। যখন মহারাণা ও তাঁহার অনুচরবর্গ এরূপ আমোদে ব্যাপৃত, তখন তাঁহার সাঙ্গবর্গের গাত্রে জনসাধারণে আবীর প্রক্ষেপ করিতেছে। যিনি একার্য্যে বিরক্তি বা আপত্তি প্রকাশ করিবেন তাঁহারই বিপত্তি! তাঁহার আর রক্ষা নাই—সকলে মিলিয়া সে হতভাগ্যের উপর দ্বিগুণ অত্যাচার আরম্ভ করিবে!

শেষ দিনে মহারাণা আমন্ত্রিত সামন্ত ও প্রধানদের মধ্যে "খাণ্ডানারিয়েল" অর্থাৎ এক একখানি কাষ্ঠনির্ম্মিত তরবারি ও নারিকেলখণ্ড বিতরণ করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দেন। যাঁহারা মহারাণার বিশেষ সম্ভ্রম ও মর্য্যাদার পাত্র তাঁহাদের মধ্যেই এই উপহার বিতরিত হয়। এই কাষ্ঠনির্ম্মিত অস্ত্রগুলি বিচিত্রবর্ণে চিত্রিত ও দীর্ঘ কিরিচের আকারে গঠিত। টড্ বলেন যে হোলির কয় দিন 'মদন-মহোৎসবের' দিন, সে সময় ভগবান মকরকেতনের সমারাধনার সময়। তখন প্রজাবৃদ্ধিই প্রজাপতির অনুশাসন—এপর্ব্বের সহিত লোকক্ষয়কর যুদ্ধের কোন সংস্রব নাই। সেজন্য বোধ হয় যেন যুদ্ধবৃত্তিকে পরিহাসচ্ছলে এই মিথ্যা যুদ্ধযন্ত্র বিতরিত হয়।

এই চত্বারিংশৎদিবসব্যাপী মদনমহোৎসবের শেষ রাত্রিতে 'হোলিকাসুরকে' (যাহা আমাদের দেশে 'মেড়া

পোড়া' বলিয়া প্রচলিত) দগ্ধ করা হয়। বৃহৎ অগ্নিকুণ্ডে বৃহৎ বৃক্ষের কাণ্ড ও অন্যান্য ইন্ধন, ঘৃত, লাজাবলি, কুঙ্কুম, আবীর প্রভৃতি নিক্ষিপ্ত হয়। আমাদের দেশে অভিষেকের পর শালগ্রাম শিলা এই অগ্নিকুণ্ডে একবার স্থাপিত করা হয়। রাজপথের স্থানে স্থানে এরূপ অগ্নিকুণ্ড জ্বলিতে থাকে ও তাহার চতুষ্পার্শে উৎসবার্থ সমাগত বালকেরা ভীষণ তাণ্ডবনৃত্য ও উচ্চচীৎকারে চতুর্দ্দিক ধ্বনিত করিতে থাকে। পরদিন অর্থাৎ চৈত্রের প্রথম দিনে সূর্য্যোদয়ের দুই তিন দণ্ডের পর পর্য্যন্তও এই আনন্দস্রোত দ্বিগুণিত বেগে প্রবাহিত থাকে। তাহার পর উৎসবোন্মত্ত নাগরিকেরা স্নানান্তে বেশ পরিবর্ত্তন ও পূজাহ্নিক সমাপন করিয়া সৌম্য শান্তমূর্ত্তি ধারণ করে। সে সময় রাজকুমারগণ ও সামন্তেরা স্বীয় পরিচারকদের নিকটে অনেক উপঢৌকন প্রাপ্ত হন।

শ্রীবীরেশ্বর গোস্বামী।

ভ্রাতৃবিচ্ছেদ।

যাও যাও, দূরে যাও, দল ভেঙ্গে চলে যাও,
রাজভক্তদল,
আমাদের স্পর্শে হায়, ভক্তি যদি ছুটে যায় ;
লও গিয়ে রাজদ্বারে চতুর্ব্বর্গ ফল !
শিরোপা পরিয়া সুখে উপাধি বাঁধিয়া বুকে
দাঁড়াও ;—দেশের মুখ হবে সমুজ্জ্বল !
এরি এত অহঙ্কার,— বসিয়াছ, চাটুকার,
রাজপার্শ্বে উচ্চ মঞ্চ করিয়া দখল ?

একে একে দশে দশে চলে যাও, কমলার
প্রিয়পাত্রগণ ;
মাতারে সঙ্কটে ফেলি ভ্রাতাদের অবহেলি
ছাড়িয়া যেতেছ ? যাও করি না বারণ !
জননীও হাস্যমুখে বিদায় দিলেন সুখে,
আর তাঁর প্রাণে নাই কোন আকিঞ্চন ;
অনেক আঘাত সহি, বহু যাতনায় দহি
আজ তাঁর দৃঢ় মন, বিশুষ্ক নয়ন।

আমরা সহিব লাজ, যে ক'জন আছি আজ
জননীরে ধরি',
অক্ষম দুর্ব্বল হই, বিশ্বাসঘাতক নই ;
যে কোলে জন্মেছি, যেন সেই কোলে মরি !
এপক্ষ লয়েছি যবে, জানি, জয় নাহি হবে,
সিদ্ধি দুর্ব্বলেরে দেখে দূরে র'বে সরি ;
স্বজনের অবিশ্বাস, দুর্জ্জনের উপহাস,
আমরা মায়ের দাস,—কিছু নাহি ডরি !

কিন্তু জেনো, ভেবেছিনু, তা'রে তা'রে মায়ের কাজে
রব একপ্রাণ ;
বহু তপস্যার ফল তোমাদের ধনবল
ধরিবে মায়ের পাছে,—সে আশা নির্ব্বাণ !
ভাণ্ডার যে হ'ল খালি, বিবেকে যে দিলে ডালি !
বল দেখি, কি পাইলে তার প্রতিদান ?
হাঁ, মানি, সোহাগমাখা পেয়েছ বাহবা ফাঁকা ;
--ও যে নিদারুণ ব্যঙ্গ, ওযে শুধু ভাণ !

এই দলাদলি ছাড়ি' মিলিব সবাই যবে
তাঁহার চরণে,
দুটি পক্ষ পাশাপাশি নীরবে দাঁড়াব আসি'
চরম পরম এক ধর্ম্মাধিকরণে ;
কা'রা চির-পুরস্কৃত, হবে সেথা তিরস্কৃত
বিদ্রোহের বিপ্লবের অপবাদ সনে ?
ক্ষণ-পরাজয় বহি' কা'রা হবে চিরজয়ী,
—দেখিতেছি তাহা যে গো, নশ্বর দর্পণে।

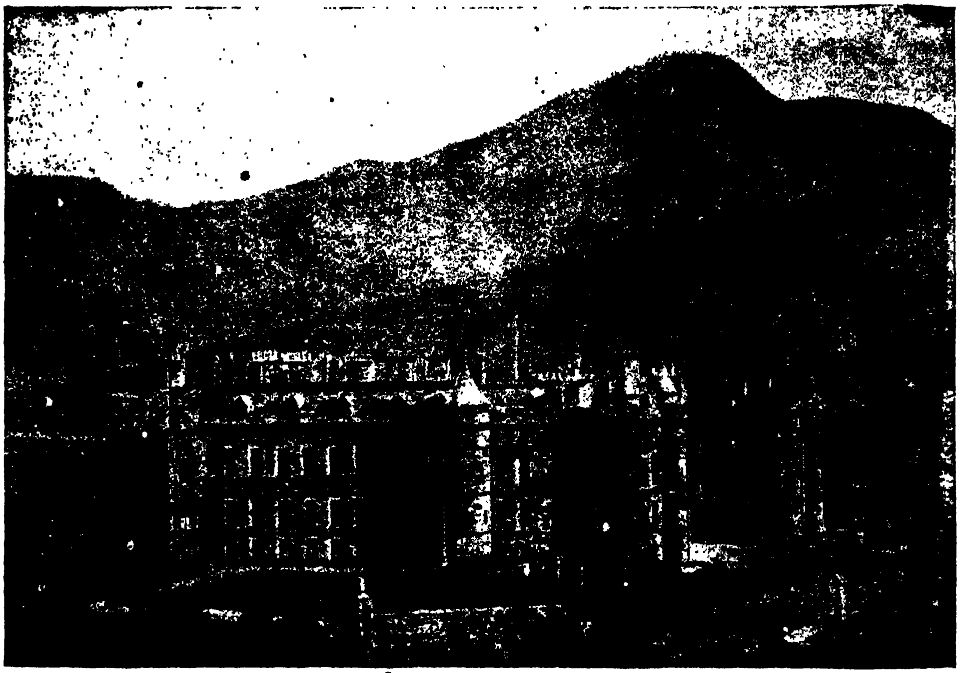
শ্রীপ্রমথনাথ রায় চৌধুরী।

এডিনবরা-বিশ্ববিদ্যালয়-সন্দেশ

এ জীবনে আকৈশোর যে সকল কামনা করুণভাবে হৃদয়কে জুড়াইয়াছিল, ঘটনার বৈচিত্র্যে, যৌবনের উষায় তাহাদের একটি বাসনা পূরিল। দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে—বসন্তের অবসানে—একদিন জননী, জন্মভূমি ও প্রিয়জনসকলকে ছাড়িয়া দূর দেশান্তরে চলিলাম। বাল্যের আকুল, আকাঙ্ক্ষা মিটিল—আধুনিক ভারতের পুণ্য-

তীর্থ ব্রিটিশক্ষেত্রের মহিমা, চক্ষুকর্ণের বিবাদ ভঞ্জন করিয়া দেখিলাম। এই দীর্ঘ প্রবাসের পর স্বদেশে ফিরিয়া আসিয়া আজ মনে হইতেছে যেন কোন সুমধুর স্বপন প্রাণের উপর দিয়া চলিয়া যাইবার কালে যে ছাপ রাখিয়া গিয়াছে, তাহা আর মুছিবেনা। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় সেই সুখ-স্মৃতি-বিজড়িত। বিলাতপ্রবাসের দিনগুলি মনে হইলেই সর্ব্বাগ্রে এডিনবরার ছাত্রজীবনের শত খুঁটিনাটির ছবি হৃদয়ে জাগিয়া উঠে। তাই আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা ও ছাত্রজীবনের গল্পই শুধু বলিব।

প্রকৃতিদেবী এডিনবরার প্রতি বড়ই সুপ্রসন্না। অনতিদূরে সাগরের উত্তাল তরঙ্গ রঙ্গভঙ্গে কূলে লুটাইতেছে,—আবার সহরের বুকের উপরে ক্ষীণকায়া সলিলবাহিনী, তুষারমণ্ডিত গিরিশৃঙ্গ প্রভৃতি কবিজনপ্রিয় 'স্বভাবের' কোন অভাবই নাই। একদিকে নিসর্গের অকাতর দান—অপরদিকে শিল্পবিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষের ফল—এ উভয়ের অপূর্ব্ব মিলনে এডিনবরা রূপগৌরবে অতুলনীয়া। কালের স্রোতে, পরিবর্ত্তনের ঢেউয়ে প্রাচীন সহরকে এখন ভাঙ্গিয়া চুরিয়া অনেকটা নূতন করিয়া গড়িয়াছে। কিন্তু পুরাতন ও নূতনের এরূপ একত্র সমাবেশ আর দেখি নাই। একদিকে নূতন সহর শুক্লপক্ষের চাঁদের ন্যায় দিন দিন আয়তন ও সৌন্দর্য্যে বাড়িতেছে—অপরদিকে প্রাচীন অট্টালিকাসমূহের ভগ্নাবশেষ স্কটলাণ্ডের পুরানো সুখদুঃখের স্মৃতিকে সজাগ রাখিতেছে।



হলিরুড প্রাসাদ।

পুরাতন সহরের বর্ত্মে বর্ত্মে অতীতের দৃশ্যপট; যে দিকে চাও, যেন অক্ষরজীবী সার ওয়াল্টার স্কটের ঔপন্যাসিক চিত্রসকল মূর্ত্তিমান হইয়া চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়ায়। ঐ দেখ কত রক্তের দাগ, কত ঐতিহাসিক কালিমা অঙ্গে মাখিয়া হলিরুড রাজপ্রাসাদ আজিও দাঁড়াইয়া আছে। আজিও সে প্রাসাদকক্ষে প্রবেশ করিলে মনে হয় যেন হতভাগিনী মেরীর বিষাদময়ী মূর্ত্তি সকরুণ নয়নে চাহিয়া আছে। কথিত আছে, যে স্থান এক দিন রাজ্ঞী মেরীর হতভাগ্য স্বামী ডার্ণলীর হত্যায় কলঙ্কিত হইয়াছিল—আজ তাহারি উপর এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপুল প্রাসাদ দাঁড়াইয়া আছে। অক্ষর বটবৃক্ষের মত মাথা উচু করিয়া ঐপ্রকাণ্ডকায় অট্টালিকা

আজ কতকাল ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, জনসাধারণে বড় তাহার খোঁজ লয় না। আশৈশব বাড়ীর ধারে যে প্রাচীন অশ্বত্থগাছ দেখিয়া আসিয়াছি কোন দিন তাহার বয়স নির্দ্ধারণের বা জন্মকথা জানিবার জন্য মাথা ঘাটাই নাই। মনে পড়ে ছেলে বেলায় কেমন এক সবিস্ময় ভক্তির সহিত তাহার দিকে চাহিতাম ও তাহাকে আকাশের চন্দ্রসূর্য্যের সমসাময়িক ধরিয়া লইতাম! আমার মনে হয় এডিনবরায় এমন অনেক লোক আছেন, যাঁহারা আজন্মকাল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীর দেখিয়া দেখিয়া এমন হইয়া গিয়াছেন, যে এখন আর ভাবিতেই পারেন না যে, এখন সময় ছিল যখন ইহার অস্তিত্বও ছিল না!

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে ষষ্ঠ জেম্‌সের রাজত্বকালে, এডিনবরার ভদ্রসন্তানদিগের উচ্চশিক্ষার্থে এক বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। স্বয়ং জেম্‌স্ এই শিশু বিদ্যালয়ের মুরুব্বি হইলেন। রাজকৃপাকটাক্ষে, অধিনায়কদিগের যত্নে ইহা দিন দিন বাড়িতে লাগিল। এখন ইহার যশঃসৌরভ দিগ্‌দিগন্তপ্রসারিত এবং ইহার নেতাগণ বিজ্ঞানরাজ্যে সমাদৃত ও সাহিত্যজগতে লব্ধপ্রতিষ্ঠ। এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছয়টি স্বতন্ত্র বিভাগ আছে:— সাধারণ, বিজ্ঞান, তত্ত্ববিদ্যা, ব্যবহার-শাস্ত্র, সঙ্গীত ও চিকিৎসা-বিদ্যা। এই সকল বিভিন্ন বিভাগে সম্যকরূপে শিক্ষা দিবার উপযুক্ত আয়োজনের জন্য অকাতরে অর্থব্যয় হইয়া থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরিক কার্য্য সেনেট দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকগণকে লইয়া এই সেনেট সংগঠিত। অধ্যক্ষই সেনেটের সভাপতি, ও তিনি আমরণ ঐ পদ অধিকার করিয়া থাকেন। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর অশীতিপর সার উইলিয়ম মিয়র বর্ত্তমান অধ্যক্ষ। এই সেনেটের কার্য্য তদন্ত করিবার জন্ত আবার এক 'দরবার' আছে। এই দরবারের সভাপতির নাম লর্ড রেক্টার। তিন বৎসর অন্তর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের দ্বারা লর্ড রেক্টার নির্ব্বাচিত হন। প্রত্যেক ছাত্রের একটি করিয়া 'ভোট' দিবার ক্ষমতা আছে। এই 'ভোট' গণনা করিয়া নির্ব্বাচনের মীমাংসা হয়। লর্ড রেক্টার নির্ব্বাচন এক মহা ব্যাপার। এডিনবরার ছাত্রমহলে এমন হুজুগ



সার্ উইলিয়ম মিয়র।

আর নাই। এই নির্ব্বাচনের আন্দোলনে রাজনৈতিক গোঁড়ামী ষোল আনা বজায় থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের মধ্যে দুইটি রাজনৈতিক সভা আছে। একটি উদারনৈতিক, অপরটি রক্ষণশীল। উভয় দলই আপন আপন লর্ড-রেক্টার-পদপ্রার্থী মনোনীত করিয়া থাকেন —তার পর 'ভোটে' যাঁহার জয় হয়, তিনি উক্ত পদে প্রতিষ্ঠিত হন। বিলাতে অবস্থান কালে আমি তিনবার লর্ড রেক্টার নির্ব্বাচন দেখিয়াছি। কেবল প্রথমবারই আমার ছাত্রাবস্থায় ঘটে, সুতরাং সেই বারই আমি বিশেষ ভাবে সে হুজুগে যোগ দিয়াছি। সেই বারের কথাই এখানে বলিব।

একদিকে কন্সার্ভেটিভ সভা এডিনবরার প্রধান বিচারপতি রবার্টসনের নির্ব্বাচনের পৃষ্ঠপোষক; অপরদিকে লিবারেল সভা, বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব গভর্ণর লর্ড রেকে রেক্টার পদে প্রতিষ্ঠিত দেখিবার জন্ত ব্যস্ত। সেবারকার সংগ্রামে বিচারপতি রবার্টসনই জয়ী হইলেন। বলা বাহুল্য এডিনবরা-প্রবাসী ভারতীয় যুবকগণ সকলেই লর্ড রের পক্ষ সমর্থন করিয়াছিলেন। 'ভোট'গণনার দিন এক স্মরণীয় ব্যাপার। পূর্ব্বাহ্ন দশটা হইতে বারটা পর্য্যন্ত 'ভোট' দিবার সময় ছিল। সাড়ে বারটার সময় কর্ত্তৃপক্ষগণ গণনার ফল প্রকাশ করিবেন। ইতিমধ্যে লিবারেল ও কন্সার্ভেটিভ উভয় দলেরই কয়েক জন 'পাণ্ডা' বিশ্ববিদ্যালয়ের চারিদিকে 'ভোট' ওয়ালা খুঁজিয়া

বেড়াইতেছেন ও নানা রকমে ভজাইতেছেন। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিস্তীর্ণ প্রাঙ্গণে তুমুল লড়াই বাধিয়াছে। প্রাঙ্গণের মধ্যভাগে লিবারেল দল আপনাদের নিশান উড়াইয়া যুদ্ধসাজে সাজিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। ও দিকে প্রাঙ্গণের এক প্রান্তে কন্সার্ভেটিভ দল দুর্গ গাড়িয়াছেন। দেখিতে দেখিতে নানা প্রকার রংয়ের ঢেলা ছুটিতে লাগিল, বিচিত্র বর্ণে যোদ্ধাগণ ভূত সাজিলেন—হুঙ্কার রবে চারিদিক প্রতিধ্বনিত হইতে লাগিল। কন্সার্ভেটিভ দল অপর দলকে আক্রমণ করিয়া তাহাদের নিশান লুটিয়া লইবার প্রয়াসী হইলেন—দুইদলে ঘোর যুদ্ধ বাধিল। কন্সার্ভেটিভ দল কিছু পশ্চাতে হটিয়া গেলেন। এইবার লিবারেল দল ভীম বলে ছুটিয়া একেবারে অপর দলের দুর্গ আক্রমণ করিলেন। লিবারেল দলের এক সর্দ্দার অপর দলের নিশানের এক টুকরা ছিঁড়িয়া লইয়াছে,—তাহা আদায়ের জন্য কন্সার্ভেটিভ সেনারা তাহাকে আক্রমণ করিয়াছে; কয়েকজনে মিলিয়া দুইহাত ও মাথা ধরিয়া তাহাকে টানিয়া লইবার চেষ্টা করিতেছে,—আর একদিকে তাহার নিজ দলের লোকেরা পদদ্বয় ও কটিদেশ ধরিয়া তাহাকে সাম্‌লাইয়া রাখিয়াছে। এ বিষম টানাটানির মুখে ভুক্তভোগী কেমন আরাম বোধ করিতেছেন! এই যুবক একজন অষ্ট্রেলিয়ান;—এমন চমৎকার 'দলের সর্দ্দার' সহজে মিলেনা। অসাধারণ দৈর্ঘ্য বশতঃ এই যুবক "লম্বা অষ্ট্রেলিয়ান" নামে এডিনবরায় সুপরিচিত ছিল। লোকারণ্যের মাঝে ইহার মাথা সকলের উপর জাগিয়া থাকিত।

সাড়ে বারোটার সময় ভোটগণনার ফল প্রকাশিত হইল—রবার্ট্‌সনের জয়। কন্সার্ভেটিভ দলের উল্লাস আর দেখে কে? তাহাদের জয়ধ্বনিতে চারিদিক কাঁপিয়া উঠিল ও তাহার প্রতিধ্বনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কক্ষে কক্ষে গুম্ গুম্ করিতে লাগিল। এই খানেই শেষ নহে। সেই দিন রাত্রিতে, দুই দল একত্র হইয়া লর্ডরেক্টরের সম্মানার্থে প্রায় পাঁচশত ছাত্র মশাল হস্তে রাজপথে আনন্দ করিয়া বেড়াইয়াছে। ঝড় বৃষ্টিতে ইহাদের উৎসাহ দমাইতে পারে না। সে রাত্রিতে বৃষ্টি হইতেছিল—তবুও সেই দুর্য্যোগ মাথায় করিয়া তাহারা ঘুরিয়াছে।

'লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়' বলিলে কেবল কঠিন পরীক্ষা সমূহ ও তাহার ফলস্বরূপ উপাধিরাশি মনে হয়। এ ভিন্ন ছাত্রদিগের সহিত লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় একটা সম্বন্ধ নাই। কিন্তু এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সহিত ইহার ছাত্রদের প্রাণের যোগ আছে। ইহার ক্রোড়ে তাহাদের ছাত্রজীবন সযত্নে বৰ্দ্ধিত হইতেছে। প্রায় চল্লিশ জন খ্যাতনামা অধ্যাপক ইহার বিবিধ বিভাগে শিক্ষাদানে নিযুক্ত। পরীক্ষার কষ্টিপাথরে ছাত্রদিগকে ঘষিবার অপেক্ষা—তাহাদের সুশিক্ষা দিবার জন্য এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয় অধিক প্রয়াসী। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়াই যদি একমাত্র লক্ষ্য হয়, এবং কেবল এই লক্ষ্য ধরিয়াই শিক্ষা দেওয়া হয় তবে তাহা শিক্ষার ব্যভিচার মাত্র। ইহাতে শিক্ষার্থীর স্বাধীন চিন্তাশক্তি স্ফূর্ত্তি পায় না। রাশি রাশি গ্রন্থের চুম্বক সংগ্রহ করিয়া পরীক্ষার্থীর মস্তিষ্ক বোঝাই হওয়াতে, তাহাদের সংঘর্ষণে স্বাধীন চিন্তার অঙ্কুর শুকাইয়া যায়, এবং এই মানসিক পরাধীনতায় উত্তরোত্তর সেই চিন্তাশক্তি হীনবল হইয়া পড়ে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় লণ্ডনের আদর্শে গঠিত। কেবল ছাত্রদের পরীক্ষা করা ও তাহার ফলানুসারে ছাত্রদের 'মার্কা' মারিয়া দেওয়াই ইহার উদ্দেশ্য। যত দিন ছাত্রদের সহিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্বন্ধ ঘনিষ্টতর না হইবে, ততদিন ইহা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ আদর্শ হইতে অনেক দূরে থাকিবে। লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় অনেকটা ফরাসী একাডেমির ছাঁচে ঢালা। ফরাসী একাডেমির "নিয়তমন্ত্রের ভয়ানক বাঁধাবাঁধি আঁটাআঁটি"। ফরাসী যুবক একাডেমির আতঙ্কজনক পরীক্ষার সসম্মানে উত্তীর্ণ হইলেন; অধ্যাপক হওয়াই এখন তাঁর চরম আকাঙ্ক্ষা। সে আসনে বসিয়াও গণ্ডীর বাহিরে যাইবার যো নাই;—সেই পুরাতন একঘেয়ে সুর। কিন্তু তাঁহার অধ্যাপনার 'কায়দা কানুন' একেবারে নিখুঁত। অধ্যাপনা-প্রণালীর সুগঠনে, ব্যাখ্যানের লালিত্যে, ভাবার পারিপাট্যে ফরাসী অধ্যাপক কাহারও নিকট পরাস্ত হইবার নহেন। কিন্তু সাহিত্য, দর্শন বা বিজ্ঞানজগতে জর্ম্মানী যে অগ্রণী, তাহা কি অস্বীকার করিবার কথা? সকল বিভাগেই জর্ম্মানদিগের গভীর



বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু।

KUNTALINE PRESS.

গবেষণায় শ্রেষ্ঠত্ব সর্ব্ববাদিসম্মত। অথচ দেখ, জর্ম্মান বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা অপেক্ষা ফরাসী একাডেমির পরীক্ষা যে অধিকতর দুরূহ তাহাতে সন্দেহ নাই! জর্ম্মান অধ্যাপকগণ যেন স্বভাবজাত শিক্ষক; তাহাদের অধ্যাপনায় ফরাসী বক্তৃতার চাকচিক্য ও স্ফাটিক প্রভা পাইবে না বটে, কিন্তু তাহা স্রোতস্বিনীর ন্যায় তর তর বেগে ধায়,—তাহার নিরাবিল বক্ষে নিত্য নূতন নূতন ভাবের তরঙ্গ খেলে।

স্কটলাণ্ডের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ অনেকটা জর্ম্মানীর আদর্শে গঠিত। সেখানে ছাত্রদিগের বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা ও স্বাধীন চিন্তা যথেষ্ট উৎসাহ পাইয়া থাকে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম্ এ পরীক্ষার্থীদের মধ্যে যদি একজন বিশেষ সুলক্ষণাক্রান্ত ছাত্র বাছিয়া লওয়া যায় ও বিলাতের সেইরূপ একজন ছাত্রের সহিত তাঁহার তুলনা করা যায়,—তবে আপাততঃ বড় প্রভেদ দেখা যাইবে না; উভয়েই বুদ্ধির প্রখরতা, উদ্যমশীলতা ও পুঁথিগত বিদ্যায় উভয়ের সমকক্ষ। কিন্তু কয়েক বৎসর অপেক্ষা করিয়া দেখ, তাঁহাদের মধ্যে প্রভেদ কত। একজন কলেজ ছাড়িয়া হয়ত "উকীল" হইয়া অল্প সময়ের মধ্যেই বিলক্ষণ 'পসার' জাঁকাইয়াছেন, চারিদিকে খুব নাম ডাক হইয়াছে, লক্ষ্মী তাঁহার প্রতি বিশেষ সদয়—ধনের উপর ধন বাড়িতেছে। তাঁহার ছাত্রজীবনের ঋণ এইখানে পরিশোধ হইল। কিন্তু দেখ, অপর জন হয়ত সেই সময়ে জর্ম্মানীর কোন সুবিখ্যাত অধ্যাপকের কর্ত্তৃত্বাধীনে কোন পরীক্ষায় নিযুক্ত, অথবা কোন ল্যাবরেটরীতে দিনরাত পড়িয়া কোন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত; ভোগসুখের প্রতি দৃকপাত নাই,—তাপসেরমত প্রাণ মন ঢালিয়া দিয়া কঠোর সাধনে নিযুক্ত! ইহার ফলস্বরূপ হয়ত কয়েক বৎসরের মধ্যে এমন কিছু উপার্জ্জন করিলেন, যাহা নিজের বলিয়া বিজ্ঞানজগৎকে উপহার দিতে সমর্থ হইলেন।

সত্য বটে অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র তাঁহার বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে, এবং পরাঞ্জপ্যে ও বালকরাম তাঁহাদের অসাধারণ প্রতিভায় ভারতের মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের এত দুর্গতি হইয়াছে যে আমরা গুণের আদরও ভাল করিয়া করিতে পারিনা। তাই আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসা উৎসাহের অভাবে শুকাইয়া যায়। তাই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবের পাত্রেরা আজ 'মুষ্টিভিক্ষা তরে পথের কাঙ্গালী'।

স্কটলাণ্ডের দরিদ্র ছাত্রদিগের উচ্চ শিক্ষার জন্য স্বচ্ছ ধনকুবের এণ্ড্রু কার্ণেগীর অশ্রুতপূর্ব্ব দান আজ সমগ্র জগৎকে চমকিত করিয়াছে। এ দৃশ্যের তুলনা কি ভারতে মিলিবে? পার্সীকুলতিলক তাতার প্রস্তাবিত বৈজ্ঞানিকগবেষণামন্দির সংস্থাপিত হইবার পথে এখনও কত প্রতিবন্ধক জুটিতেছে; এ দুঃখ কি রাখিবার স্থান আছে?

বিলাতে যুবকদিগের সুস্থ ও সবল দেহের সুঠাম গঠন দেখিলে আনন্দ হয়। দুরন্ত শীতে যথেষ্ট স্বাস্থ্যকর ব্যায়াম না করিলে সেখানে বাঁচা দায়। মুক্ত বায়ুতে নানাপ্রকার ক্রীড়া বিলাতে ছাত্রজীবনের একটি প্রধান অঙ্গ। প্রধানতঃ ক্রিকেট ও ফুটবল এই দুইটি ছাত্রদিগের মধ্যে প্রিয়। মহিলাদিগের মধ্যে টেনিস্ ও গল্ফ এ দুয়ের বিশেষ আদর দেখিতে পাওয়া যায়। উপাধিবিতরণের দিন, যে যুবককে নানাবিধ সম্মানে ভূষিত হইতে দেখিলাম,—ক্রীড়াভূমিতে গিয়া দেখি ক্রিকেট ম্যাচে তাহারই 'দৌড়' সর্ব্বাপেক্ষা অধিক! দশ বৎসর পরে দেশে আসিয়া আমাদের যুবকদের মধ্যে ব্যায়ামচর্চ্চায় আগ্রহ জন্মিয়াছে দেখিয়া বড়ই আনন্দ হইল। কিন্তু এখনও আমাদের দেশে মানসিক উৎকর্ষ ও শারীরিক স্বাস্থ্যে যেন কেমন বিরোধ দেখা যায়। পরীক্ষাগৃহে প্রবেশ করিয়া দেখ, অবিরাম কঠোর মস্তিষ্কচালনার কি ফল,—বিশ্ববিদ্যালয় যাহাদের লইয়া গৌরব করেন হয়ত তাহাদের অনেককে দেখিয়া দুঃখ হইবে,—মুণ্ডিত মস্তকে মধ্যমনারায়ণ তৈল, কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষে কালিমা, উদরে দাওয়াইখানা! বিলাতে কোন শ্রেণীতে কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে ঢুকিয়া দেখ, সে গৃহ কি সজীবতাময়। শত শত ছাত্রের যৌবনস্বভাবসুলভ তেজ ও স্বাস্থ্যজনিত স্ফূর্ত্তি উথলিয়া পড়িতেছে—তাহাদের অট্টহাস্যে ও সঙ্গীতধ্বনিতে ঘর যেন ফাটিয়া যাইতেছে। অধ্যাপক প্রবেশ করিলেন—তখনও সঙ্গীত শেষ হয়

নাই—অধ্যাপক সস্মিত বদনে বলিলেন, "ছাত্রগণ, তোমাদের সঙ্গীত শেষ হইলে আমি কার্য্যারম্ভ করিতে পারি!" সঙ্গীত থামিয়া সে গৃহে আবার নীরব শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল!

বিলাতে ছাত্রগণ সাধারণতই খুব সঙ্গীতপ্রিয়, প্রায় সকলেই বাল্যকাল হইতে কোন না কোন প্রকার গীত বাদ্য শিক্ষা করে। সুতরাং তাহাদের মধ্যে নানা প্রকার আমোদ প্রমোদের উপায় সহজেই মিলে। ছাত্রদের উদ্যোগে গীতিনাট্য বা অন্য কোন অভিনয় প্রায়ই হইয়া থাকে। আমাদের দেশে ছাত্রদের জন্য কোন প্রকার নির্দ্দোষ আমোদের ব্যবস্থা অতি বিরল। মাঝে মাঝে মনটাকে গম্ভীর বিষয় হইতে অবসর লইয়া কিছুক্ষণের জন্য নিরাবিল আমোদের স্রোতে সাঁতরাইয়া আসিলে যে তাহাতে চিত্তের স্ফূর্ত্তি ও কার্য্যক্ষমতা বাড়িয়া যায়, তাহা কি অস্বীকার করিবার কথা? আমাদের ছাত্রদের জন্য নানা প্রকার নির্দ্দোষ আমোদ যোগান আবশ্যক। এ বিষয়ে বিদ্যালয়সমূহের কর্ত্তৃপক্ষগণের ও সমাজের নেতাদিগের মনোযোগ বিশেষ ভাবে আকৃষ্ট হওয়া উচিত।

এডিনবরার ছাত্রদের বড়ই দুর্দ্দান্ত প্রতাপ। পুরুষানুক্রমে তাহারা এই আধিপত্যের অধিকারী হইয়া আসিতেছে। একদিকে যেমন বাহিরে তাহাদের চপলতার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়—পক্ষান্তরে আবার তাহাদের শিষ্টাচার ও সহৃদয়তার পরিচয়ে মুগ্ধ হইতে হয়। পরদুঃখকাতরতা ছাত্রদের প্রাণে কিরূপ সজাগ, তাহার একটি প্রমাণ দিতেছি। ১৮৯৭ খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে ভারতে যখন ভয়ানক দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়, তখন আমরা কতিপয় এডিনবরাপ্রবাসী ভারতীয় যুবক দুর্ভিক্ষ পীড়িত লোকদের সাহায্যার্থে অর্থ সংগ্রহ করিতে সঙ্কল্প করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের সহানুভূতি প্রার্থনা করিলাম। ছাত্রেরা বিশেষ আগ্রহের সহিত আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। তাঁহাদের উদ্যোগে এডিনবরাতে তিনটি কন্সার্ট দেওয়া হইল, এবং এই তিন রাত্রিতেই আমরা তিন সহস্র মুদ্রা সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইলাম!

এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধিবিতরণ বৎসরে দুইবার হইয়া থাকে—শরতের প্রারম্ভে, ও বসন্তের পূর্ণ যৌবনে। শারদীয় অধিবেশনেই সাধারণতঃ অধিক সমারোহ হইয়া থাকে। কিন্তু আমার মনে হয়, আট বৎসর পূর্ব্বে বাসন্তী যজ্ঞে যে অভিনব দৃশ্য দেখিয়াছিলাম, এডিনবরাবাসিগণ তাহা শীঘ্র ভুলিবে না। সরস্বতীর বরপুত্রগণ যখন স্ব স্ব মর্য্যাদানুসারে দক্ষিণা লাভ করিতেছেন, তখন দেখা গেল—সাতজন গাউনপরিহিতা রমণীও এম্ এ উপাধিপ্রার্থীদিগের মধ্যে দণ্ডায়মানা; হর্ষোৎফুল্ল বদনে লজ্জার এক কমনীয় রক্তিমা ছড়াইয়া পড়িয়াছে—সুবর্ণ জালের ন্যায় কেশগুচ্ছ ললাটে লুটাইয়া আছে; সে বরাননে একাডেমীর বিচিত্র উষ্ণীষ বড়ই শোভা পাইতেছে! এ রমণীয় দৃশ্য, এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে অভূতপূর্ব্ব: মহিলাদিগের প্রতি এতদিন পর্য্যন্ত এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্গল রুদ্ধ ছিল! এতদিন পরে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়কে চিরন্তন প্রথা হইতে দূরে যাইতে দেখিয়া রক্ষণশীলদিগের মধ্যে কেহ কেহ ক্ষুব্ধ হইলেন বটে—কিন্তু সাধারণে সকৌতুক নয়নে এই অভিনব ব্যাপারের দিকে চাহিয়া বলিলেন—"বেশ ত"! কেবল কতকগুলি নিষ্কর্ম্মা লোক—যাঁহারা আপনাদিগকে "সুরসিক" ভাবিয়া থাকেন ও সময়ে অসময়ে তাহার পরিচয় দিতে চেষ্টা করেন (এরূপ বিচিত্র জীব সকল দেশেই মিলে!) তাঁহারা এই ঘটনার উদ্দেশে তীব্র ব্যঙ্গোক্তি করিতে ছাড়িলেন না।

তিন শতাব্দী পরে পুরুষদিগের সহিত মহিলারাও যে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়প্রদত্ত শিক্ষা, সুযোগ ও সম্মানের সমাধিকারিণী হইবার আকাঙ্ক্ষা করিবেন—তাহা ইহার প্রতিষ্ঠাতাগণের স্বপ্নেরও অতীত ছিল। কিন্তু আজ সভ্য জগতে এক সামাজিক মহাবিপ্লব উপস্থিত। স্তরে স্তরে সমাজের আভ্যন্তরিক গঠন জগতের সম্মুখে উদ্ঘাটিত হইয়াছে। পুরুষের একাধিপত্য ও হৃদয়শূন্যতার মূল সমাজের গভীরতম প্রদেশেও ব্যাপ্ত দেখিয়া সভ্য জগৎ লজ্জিত হইতেছেন। রমণী তাঁহার স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত অধিকারের দাবী করিয়াছেন। ইহার ফলে পুরুষ অন্ততঃ তাঁহার স্বার্থপরতা খর্ব্ব করিতে শিখিবেন।

অধ্যাপকদিগের দু একজনের কথা না বলিলে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা কিছুই বলা হয় না।

বিলাতের ছাত্রদের সহিত অধ্যাপকদিগের এক সুমধুর সম্বন্ধ আছে। কোন প্রকার আতঙ্ক ছাত্রদিগের হৃদয়কে বিড়ম্বিত করে না। ছাত্রদের জন্ত অধ্যাপকদিগের প্রাণের টান আছে। সেই জন্তই তাঁহারা ইহাদের হৃদয়ের গভীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা আকর্ষণ করিতে সমর্থ হন।

দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে প্রথম যখন এডিনবরায় উপস্থিত হই, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকদিগের অনেকের মস্তককেই শুভ্র কেশে সাজাইয়াছিল। ইঁহাদের কয়েকজন এখন পরলোকগত হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রাতঃ-

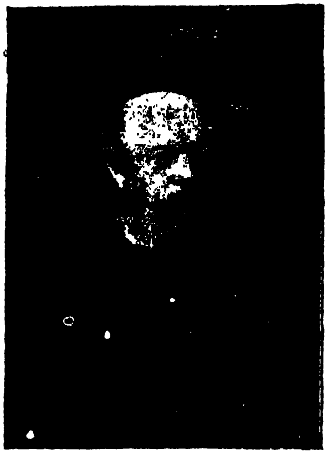


৺অধ্যাপক ব্লাকী।

স্মরণীয় ব্ল্যাকীর নামই প্রথম মনে জাগিতেছে। মৃত্যুর কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই ব্ল্যাকী অধ্যাপনা কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তখনও ছাত্রদিগের মায়া কাটাইতে পারিতেন না। এই স্কচ্ ঋষিবরকে যে একবার দেখিয়াছে সে আর তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্বের কথা ভুলিতে পারিবে না। দুর্দ্দমনীয় ষ্টুয়ার্ট-শোণিত তাঁহার শিরায় শিরায় প্রবাহিত; রজতশুভ্র কুন্তলগুচ্ছ কর্ণপ্রান্ত দিয়া গলদেশে গড়াইয়া পড়িয়াছে;— ঐ দেখ ষ্টুয়ার্টের বিচিত্র পাহাড়ী উত্তরীয় স্কন্ধে জড়াইয়া পণ্ডিতপ্রবর রাজপথে ছুটিয়াছেন। কে বলে ব্ল্যাকী বার্দ্ধক্যে জড়িত? তাঁহার হৃদয়ের উৎসাহ ও আনন্দ দেখিলে মনে হইত তথায় স্থির যৌবন বিরাজ করিতেছে। আমার মনে পড়ে, তাঁহার মৃত্যুর এক বৎসর পূর্ব্বে একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে এই আধুনিক এথীনিয়ানের শুভ্র মূর্ত্তি দেখা দিবা মাত্র মুহূর্ত্তমধ্যে ছাত্রগণ আনন্দকোলাহল করিয়া তাঁহার চারিদিকে ঘেরিল। অশীতিপর তাঁহার প্রাচীন মস্তক নাড়িয়া, আনন্দস্ফুরিত বচনে গ্রীকভাষায় আশীর্ব্বাদবাণী উচ্চারণ করিলেন। মুক্ত আকাশে ছাত্রদের আনন্দরোলের ঢেউ খেলিতে লাগিল।

কয়েক বৎসর ধরিয়া এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ বিষাদের মেঘে আচ্ছন্ন হইয়াছে। কতিপয় অধ্যাপকের মৃত্যুতে উপর্য্যুপরি তাঁহার প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিয়াছে।

কয়েক মাস পূর্ব্বে অধ্যাপক টেটের পরলোকগমনে বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহার প্রধান গৌরব হারাইয়াছেন। এ ক্ষতি শীঘ্র পূরণ হইবার নহে। বিজ্ঞানজগতে টেট একজন শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। টেট ছত্রিশ বৎসর কাল প্রকৃতিবিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন। এই বিভাগের ছাত্রদের মধ্যে খুঁজিলে এমন অনেককে পাওয়া যাইত, যাঁহারা পুরুষানুক্রমে টেটের ছাত্র হইয়াছেন। আমার সহপাঠী এক বন্ধুর নিকট তাঁহার পিতার ছাত্রাবস্থায় লিখিত টেটের বক্তৃতার 'নোট' দেখিলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের অপর সকল বিভাগ অপেক্ষা প্রকৃতিবিজ্ঞানের বিভাগে অধিকসংখ্যক মহিলা যোগ দিয়াছিলেন। ইহাতেই বুঝা যায়, টেটের বক্তৃতা কি আকর্ষণের সামগ্রী ছিল। সমসংস্থান ও গতিবিজ্ঞানের অতি জটিল প্রশ্ন সকল টেট যেরূপ বিশদরূপে বুঝাইয়া দিতেন, তদপেক্ষা অধিকতর সহজ বোধগম্য ব্যাখ্যা আর কি হইতে পারে জানি না। জড়জগতে শক্তিসংগ্রামের কথা বলিতে বলিতে যেন তিনি একেবারে মাতিয়া উঠিতেন। টেট যখন ধীরে ধীরে, প্রকৃতির আশে পাশে—পরমাণুর আড়ালে বিজ্ঞানের নিগূঢ় রহস্তের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিতেন, তখন অবাক হইয়া সেই বিরাট মূর্ত্তির দিকে চাহিয়া থাকিতাম। মনে হইত, তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় চক্ষু দুটি দিয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইত। টেটের সৌম্যমূর্ত্তি অনেক দিন ছাত্রদের হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিবে। লিখিতে লিখিতে, তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি যেন চক্ষের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল— গাউনপরিহিত সমুন্নত দেহের উপর বিপুল মস্তিষ্কের



৺অধ্যাপক টেট।

আধার (সে বড় ছোট নহে!) শোভা পাইতেছে; উদার বিস্তৃত ললাট মসৃণ মস্তকের কোন স্থান হইতে গড়াইয়া পড়িয়াছে তাহা জানিবার যো নাই;—মস্তকের দুই পার্শ্ব ও পশ্চাৎ ব্যতীত অন্যত্র কেশের আশঙ্কাও দেখা যাইত না! সে প্রবীণ মস্তক অর্দ্ধশতাব্দীর বৈজ্ঞানিক আন্দোলনের মাঝে জাগিয়াছিল। কিন্তু দেখ মস্তিষ্কবিলোড়নকারী গণিতের অবিরাম সংঘর্ষণেও তাঁহার হৃদয় হইতে কোমল ভাব চলিয়া যায় নাই;—অমর কবি টেনিসনের কবিতাপুস্তক তাঁহার অবসর-সহচর ছিল! জড়প্রকৃতির সহিত দিন রাত কারবার করিয়াও তাঁহার ধর্ম্মবিশ্বাস অটুট ছিল।

প্রাচীন অধ্যাপকদিগের মধ্যে একমাত্র ম্যাসন (Masson) এখন জীবিত আছেন। ম্যাসন বত্রিশ বৎসর ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপকের আসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। বার্দ্ধক্যবশতঃ এখন সে পদ হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। ইংরাজী সাহিত্যজগতে তাঁহার নাম কে না জানে? অন্ধকবি মিল্টন ও আফিমখোর ডিকুইন্সির উপর ম্যাসনের যেমন দখল এমন আর অন্য কার? কৃষাণকবি বার্ন্সের কবিতা ম্যাসনের মুখে যে কি মধুর শুনাইত, তাহা আর বলিতে পারি না। লোকে বলে, কার্লাইলের চেহারার সহিত ম্যাসনের মুখের সাদৃশ্য দিন দিন বাড়িতেছে। সেত বড় অনেক কালের কথা নহে—যখন কার্লাইল ও ম্যাসন একত্র বসিয়া ধূমপান করিয়াছেন। উভয়েই উক্ত ব্যাপারে বিশেষ পারদর্শী! ম্যাসনের গম্ভীর মুখখানি দেখিলে কার্লাইলের মুখ মনে পড়ে তাহা সত্য, কিন্তু শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপকের মুখের গাম্ভীর্য্যের আড়ালে এক কমনীয়তা আছে, যাহা ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধে ধরা পড়ে। চেল্‌সীর যোগিবরের ছবি দেখিলে মনে হয়, যেন সে চিন্তাশীল মুখে এক বিতৃষ্ণা ও বিরাগের ছায়া প্রতিভাত; কিন্তু ম্যাসনের সস্নেহ ব্যবহার লোককে সহজে আকৃষ্ট করে। প্রতিবৎসর শীত ঋতুর প্রারম্ভে অধ্যাপক ম্যাসন কোন সাহিত্যবিষয়ক প্রবন্ধ পাঠ করিতেন। ইহা এক উপভোগের সামগ্রী ছিল। সম্বৎসর ধরিয়া শত শত মহিলা ও ভদ্রলোক এই দিনের আশায় চাহিয়া থাকিতেন। ম্যাসন যখন খাম্বাজে তান চড়াইয়া, তাঁহার সুললিত প্রবন্ধ পাঠ করিতেন—তখন সে অননুকরণীয় ভাষার মাধুরী, কল্পনার ঐন্দ্রজালিক প্রভাব, অলঙ্কারের ছটা এবং রুদ্র, করুণ ও হাস্যরসের অপূর্ব্ব মিলনে শ্রোতাগণ মুগ্ধ হইয়া যাইতেন।

এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা লিখিতে আমি ক্লান্ত হই না। কিন্তু পাঠকদিগের ধৈর্য্যের উপর আর দাবী চলে না সুতরাং এই খানেই উপসংহার করি। ছাত্রাবস্থার পুরানো স্মৃতিকে একবার জাগাইয়া তুলিলে সে সব কথা বলিতে বলিতে আর সহজে থামা যায় না। দিনের পর দিন যায়, ছাত্রজীবন হইতে যত দূরে সরিয়া পড়ি, ততই মন ব্যাকুল হইয়া ফিরিয়া ফিরিয়া সেই দিকেই চায়; ইচ্ছা হয়, ছাত্রজীবনের সে সরল সৌহার্দ্দ্য ও অমিত উৎসাহ, প্রাণের শত কামনা ও সকল সুখ দুঃখ লইয়াই সে সব দিন আবার ফিরিয়া আসুক।

শ্রীসুবোধচন্দ্র মহলানবিশ।

দাস-নন্দিনী।

গিয়াসুদ্দীনের আসনের চারিদিকে একজন ক্রীতদাস গোলাপজল ছড়াইতেছিল। এই সুন্দর যুবাপুরুষ একবিংশ বৎসর বয়সে দাক্ষিণাত্যের অন্তর্ভূত বাহমনী রাজ্যের

সিংহাসন আরোহণ করিয়াছেন। তিনি রাজ্যলাভ করিয়া নিজ পরিবারের প্রতি অনুরক্ত অমাত্যদিগকে নানা প্রকারে পুরস্কৃত করিয়াছেন, এবং রাজপ্রাসাদের কোন কোন ভৃত্যকে উচ্চপদে নিযুক্ত করিয়াছেন। লালচীন্ প্রাসাদের প্রধান তুর্কি দাস। সে আশা করিয়াছিল যে ঘিয়াসুদ্দীন তাহার দাসত্ব মোচন করিয়া তাহাকেও কোন উচ্চপদ প্রদান করিবেন। রাজা তাহা না করায় লালচীন অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়াছিল এবং মুখে কিছু না বলিলেও নানা প্রকারে অসন্তোষ প্রকাশ করিত। রাজা বলিলেন—"লালচীন্, তোমাকে এরূপ অসন্তুষ্ট বোধ হইতেছে কেন? আমার সিংহাসনারোহণের পর আমার ব্যবহারে সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছে বোধ হয়; তোমার বেলাই কেন ইহার ব্যতিক্রম দেখিতেছি?"

দাস। দাসত্বের কোন অবস্থাতেই দাসের সন্তোষের কারণ দেখিতে পাই না; কিন্তু বিশ্বস্ত ভৃত্যেরা পুরস্কৃত না হইলে তাহাদের পক্ষে অসন্তুষ্ট হওয়া ন্যায়সঙ্গত।

রাজা। যতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রভু অবিচার না করেন, ততক্ষণ তাহাদের অসন্তোষের কোন কারণ থাকিতে পারে না। দাসেরা রাজপুত্রদের মত ব্যবহার পাইবার আশা করিতে পারে না।

দাস। কিন্তু দাসদের অন্য মানুষের মত ন্যায় অন্যায় বুঝিবার ক্ষমতা আছে। তাহারা মানুষের মত ব্যবহার পাইবার আশা করিতে পারে।

রাজা। আমি কিন্তু কোনও দাসকে স্বাধীন মানুষের সমান পদবীতে প্রতিষ্ঠিত করা অন্যায় মনে করি। ভাগ্যদোষে তাহাকে দাসত্বশৃঙ্খলে বদ্ধ হইতে হইয়াছে; সুতরাং তাহাকে শৃঙ্খল পরিয়াই থাকিতে হইবে। দাসদিগকে সম্মানসূচক পদে স্থাপন করা আমি ভাল বাসি না।

দাস। মহারাজ কি ভুলিয়া যাইতেছেন যে রাণীমা এক সময়ে সেই শ্রেণীভুক্তা ছিলেন, যে শ্রেণীর লোককে মহারাজ সম্মানিত করিতে এত অনিচ্ছুক?

রাজা। অধীনতা বা দাসত্ব স্ত্রীলোকের পক্ষে অপমানকর নহে; কারণ নারী বিধাতার হস্তে মনুষ্যজাতির সংরক্ষণ জন্য উপায় মাত্র। পুত্র মায়ের নিকট হইতে সম্মান বা তাহার বিপরীত কিছুই লাভ করে না। সুতরাং মা রাজকন্যা কি দাসী, তাহাতে কিছুই আসে যায় না।

নাতিপ্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের সহিত লালচীন বলিল, "মহারাজ নৈয়ায়িকের মত তর্ক করিতেছেন। গোলামের কি সাধ্য যে বাদশাহের সহিত তর্কে আঁটিয়া উঠে?"

রাজা বলিলেন, "কিন্তু আমার তর্কে তুমি যে বড় আস্থাবান্, তাহা ত বোধ হয় না। যাহাই হউক, ভবিষ্যতের জন্য জানিয়া রাখিও যে দাসদিগকে স্বাধীন মানুষদের সমাবস্থাপন্ন না করা আমার অন্যতম শাসননীতি।"

লালচীন ঘিয়াসের পিতার একজন প্রিয় ভৃত্য ছিল। এই জন্য পিতৃভক্ত ঘিয়াস তাহার স্পষ্টবাদিতা সহ্য করিতেন। দাস রাজার কথায় মর্ম্মাহত হইল। সে এখন দাস হইলেও, সাহসী স্বাধীনতাপ্রিয় অসভ্য জাতির মধ্যে জন্ম লাভ করিয়াছিল। সে ভূতপূর্ব্ব রাজার সদয় ব্যবহারে দাসত্ব ভুলিয়াছিল, কিন্তু ঘিয়াসের কথায় দাসত্বশৃঙ্খল যেন মাংসভেদ করিয়া তাহার অস্থির উপর ঘর্ষণ করিতে লাগিল। সে প্রতিশোধ লইতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইল।

লালচীনের একটী কন্যা ছিল। তাহার রূপের যশ রাজার কর্ণে পৌঁছিল। জুলেখা যেমন রূপবতী, তেমনি গুণশালিনী ছিল। গীতবাদ্যে রাজধানীর শ্রেষ্ঠ পেশাদার গায়ক বাদকেরাও তাহার নিকট পরাভব স্বীকার করিয়াছিল। নৃত্য, চিত্রকলা প্রভৃতিতেও জুলেখার পারদর্শিতা সর্ব্বজনবিদিত ছিল। তাহার রূপগুণের খ্যাতিতে অনেকে তাহার অনুরাগী হইয়া পড়িয়াছিল। রাজাও তাহাকে দেখিতে চাহিলেন। এই অবসরে রাজাকে জব্দ করিবার, অন্ততঃ মর্ম্মাহত করিবার, সুযোগ ঘটিতে পারে ভাবিয়া লালচীন খুসী হইল। সে জুলেখা যাহাতে রাজার দৃষ্টিপথবর্ত্তিনী হয়, এরূপ সময়ে তাহাকে প্রাসাদসংলগ্ন উদ্যানে পাঠাইয়া দিতে সঙ্কল্প করিল।

রাজা একদিন নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতা শমসুদ্দীনের সহিত বাগানে বেড়াইতেছিলেন, এমন সময় শমসুদ্দীন জিজ্ঞাসা করিলেন, "পুকুরের নিকট ও কে রহিয়াছে?" রাজা বলিলেন, "জানিনা, কিন্তু চলন ও গঠনে বোধ হইতেছে, তারিফ করিবার মত কিছু বটে।" শমসুদ্দীন বলিলেন, "অপরিচিতা মহিলা সরিয়া যাইতেছেন; আমার বোধ হয়, আমরা, বুঝিবা, তিনি কে, তাহা জানিবার সুযোগ

পাইব না।" রাজা বলিলেন, "শীঘ্র যাও এবং তাঁহাকে থামিতে বল;—বল, রাজা তাঁহাকে কিছু বলিতে চান।"

শমসুদ্দীন দৌড়িয়া গেলেন, এবং তরুণী একটি লতা-কুঞ্জে প্রবেশ করিতে যাইতেছেন, এমন সময় বলিলেন, "ভদ্রে, একটু অপেক্ষা করুন; রাজা আপনার সহিত কথা কহিতে চান।" অপরিচিতা তাঁহার দিকে ফিরিলেন। তাঁহার অলোকসামান্য সৌন্দর্য্য দেখিয়া শমসুদ্দীন বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া রহিলেন। জুলেখা বিনয়নম্র ভাবে তথায় রাজার জন্য অপেক্ষা করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। রাজাও তাহাকে দেখিয়া বিস্মিত হইয়া কহিলেন, "আমার রাজধানীর গৌরবস্থানীয়া বলিয়া যাঁহার খ্যাতি আছে, তাঁহাকে দেখিয়াই কি আমার চক্ষু সার্থক হইল?"

জুলেখা কহিল, "মহারাজ তাঁহার গোলামের কন্যাকে দেখিতেছেন।"

রাজা জুলেখার আরও নিকটে গিয়া তাহার হস্তধারণোদ্যত হইয়া কহিলেন, "আজ হইতে তাহার কন্যার জন্য লালচীন স্বাধীন হইল।"

জুলেখা সরিয়া দাঁড়াইয়া গম্ভীরভাবে কহিল, "আমি অনাহুত ভাবে এই উদ্যানে আসিয়াছি; এখন এখান হইতে চলিয়া যাইতে অনুমতি করুন। ভবিষ্যতে রাজার নির্জ্জন ভ্রমণে বাধা না জন্মাইতে সচেষ্ট থাকিব।"

রাজা বলিলেন, "এরূপ বিঘ্নের বিনিময়ে সম্রাটগণ আনন্দের সহিত নিজ মুকুট প্রদান করিতে প্রস্তুত হইবেন। সৌন্দর্য্যের রাণী! কে বলিল আপনি অনাহুতা? উদ্যান কেন, প্রাসাদের সকল অংশ আপনার জন্য অবারিতদ্বার। শুচিস্মিতে! আপনার হাস্যের আলোক যে স্থানে পতিত হইবে, তাহাই আনন্দের সুবিমল জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইবে।"

জুলেখা কহিল, "দাসের কন্যা হাজার ভাল হইলেও অবজ্ঞার পাত্রী; কিন্তু মহারাজের বিদ্রূপ তাহাকে তাহার ঘৃণিত অবস্থার কথা পূর্ণমাত্রায় স্মরণ করাইয়া দিতেছে।" এই বলিয়া জুলেখা অন্তর্হিত হইল, দুইভাই বিস্মিত হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। শমসুদ্দীন মনেমনে ভাবিলেন যে যদি তিনি রাজসিংহাসনের অধিকারী হইতেন, তাহা হইলে সেই মুহূর্ত্তেই জুলেখাকে তাহার অর্দ্ধাংশভাগিনী করিতেন। গিয়াসের মনের ভাব তদ্রূপ পবিত্র ছিল না। তাঁহার মনে হইল, দাসের কন্যা তাঁহার উপরাণী হইতে কখনই আপত্তি করিবে না, এবং এরূপ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অন্য কোনরূপ বিঘ্নও উপস্থিত হইবে না। গিয়াস জিজ্ঞাসা করিলেন, "ভায়া, এই বালিকার সম্বন্ধে কি মনে কর?" শমসুদ্দীন বলিলেন, "উহাকে দেখিবার পূর্ব্বে আমার সুরসুন্দরীগণের সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না। আমার হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়াছে। আমি রাজা হইলে ইহাকে রাণী করিতাম।" রাজা বলিলেন, "মূর্খ বালক, দাসকন্যারা সিংহাসনের উপযুক্ত নয়।" শমসুদ্দীন বলিলেন, "কিন্তু এইক্ষণে এক দাসকন্যা রাজমাতা হইয়াছেন।" গিয়াস বলিলেন, "খারাপ নজীর অনুসারে কাজ করা ভাল নয়। অতএব এবিষয়ে আর কথার দরকার নাই। ইহার সম্বন্ধে তোমার মনের আবেগ দমন কর। লালচীনের কন্যা আমার অন্তঃপুরভুক্তা হইবে। আমার সুখের পথে কাঁটা দিও না।"

এইরূপ ভয়প্রদর্শনে শমসুদ্দীন্ মর্ম্মাহত হইলেন, কিন্তু বিন্দুমাত্রও ভীত হইলেন না। তিনি জুলেখার সৌন্দর্য্যে যেন ঈশ্বরের পবিত্র শিল্পনৈপুণ্যের সাক্ষাৎ পরিচয় পাইয়াছিলেন। জুলেখা তাঁহার পক্ষে বিধাতার সুন্দরতম সৃষ্টি বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছিল। বিবাহে যাহা পর্য্যবসিত হয়, তিনি এবম্বিধ পবিত্র পূর্ব্বরাগের কথা জুলেখার পিতাকে অবিলম্বে জানাইতে মনস্থ করিলেন; এবং তদনুসারে লালচীনকে খুঁজিয়া বাহির করিয়া তাহার নিকট অবিলম্বে জুলেখার সহিত বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। লালচীনের কোন আপত্তি ছিল না। কিন্তু সে বলিল, "শাহজাদা, বাদশাহ এরূপ সম্বন্ধের কথা শুনিলে কি বলিবেন? তিনি কখনই দাসকন্যার সহিত আপনার বিবাহে সম্মতি দিবেন না।"

শমসুদ্দীন বলিলেন, "আমার যাহাকে খুসি বিবাহ করিব। আমার পারিবারিক সুখে বাধা দিতে রাজার কোন অধিকার নাই। আমার সঙ্কল্প স্থির করিয়াছি; এখন তোমার মত হইলেই হয়।"

দাস। শাহজাদা, আপনার প্রস্তাব যে বিশেষ সম্মানকর মনে করিতেছি, তাহা বলাই বাহুল্য। যদি আপনি

জুলেখার সম্মত পান, তাহা হইলে একটি সর্ত্তে আমিও সম্মতি দিতেছি; অর্থা এই যে আমি যেন স্বাধীনতা লাভ করি। কারণ, দাসের জামাতা হওয়া শাহজাদার উপযুক্ত কার্য্য হইবে না।

শমসুদ্দীন স্বীকৃত হইলেন। বলিলেন, "ভ্রাতার সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনায় রাজা নিশ্চয়ই তোমার দাসত্ব মোচন করিবেন।"

লালচীন গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া কন্যাকে তাহার প্রতি শমসুদ্দীনের পবিত্র অনুরাগের কথা জানাইল এবং তাহাকে রাজভ্রাতাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য প্রস্তুত হইতে বলিল। জুলেখা এই সংবাদে নিরতিশয় প্রীত হইল। কারণ, সেও শমসুদ্দীনকে দেখিয়া অবধি তাঁহার পক্ষপাতিনী হইয়া পড়িয়াছিল। তাহা হইবারই কথা; কেন না, এখনও শমসুদ্দীনের যৌবনোজ্জ্বল সুন্দর মুখমণ্ডলে ইন্দ্রিয়পরায়ণতার বিন্দুমাত্রও ছায়া পড়ে নাই।

সেই দিনই শমসুদ্দীন লালচীনের গৃহে জুলেখার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং উভয়েই উভয়ের প্রেমপাশে বদ্ধ হইয়া পড়িলেন।

ঘিয়াসুদ্দীন যেদিন জুলেখাকে দেখিয়াছিলেন, সেই দিনই লালচীনকে ডাকিয়া আনাইয়া কহিলেন:—

"লালচীন, আমি তোমার পরিচর্য্যায় সন্তুষ্ট হইয়াছি এবং তোমাকে পুরস্কৃত করিতে ইচ্ছা করিয়াছি; এই মুহূর্ত্ত হইতে তুমি স্বাধীন হইলে।"

দাস। আমি কৃতজ্ঞতার সহিত আপনার প্রসাদ গ্রহণ করিলাম; কিন্তু আপনার এই আকস্মিক মতপরিবর্ত্তনে বিস্মিত হইতেছি।

রাজা। তোমার একটি কন্যা আছে।

দাস। সত্য।

রাজা। তাহারই জন্য আমি মত পরিবর্ত্তন করিয়াছি; কিন্তু তোমাকে স্বাধীনতার মূল্য দিতে হইবে।

দাস। কত দিতে হইবে আজ্ঞা করুন। আমার ধনের অভাব নাই। (এখানে বলা আবশ্যক, লালচীন দাস হইলেও ঐশ্বর্য্যশালী ছিল; তাহার বাসভবন সম্ভ্রান্ত ওমরাহও অনুপযুক্ত ছিল না।)

রাজা। আমি কেবল একটি মাত্র রত্ন চাই।

দাস। আমার ভাণ্ডারে যদি তাহা থাকে, তাহা হইলে বাদশাহের কেবলমাত্র ইচ্ছা প্রকাশের অপেক্ষা। জাহাঁপনা কি রত্ন চান?

রাজা। তোমার কন্যারত্ন।

দাস। হাঁ! গোলামের এই সম্মান গভীরভাবে অনুভব করা উচিত! কিন্তু দাক্ষিণাত্যের অধীশ্বর দাসনন্দিনীকে বিবাহ করিলে তাঁহার অপমান হইবে না?

রাজা। দাসতনয়াকে বিবাহ করিলে তাঁহার মানের লাঘব হইবে বটে; কিন্তু রাজা সে কল্পনাকে স্বপ্নেও মনে স্থান দেন নাই। আমি যদি তোমাকে স্বাধীনতা দি, তাহা হইলে আমার নিজের সর্ত্ত অনুসারে তোমার কন্যাকে চাই।

দাস। রাজন্! আমি আপনার দাস, কিন্তু আপনার ইন্দ্রিয়লালসার দালাল নহি। যে সর্ত্তে আপনি আমাকে স্বাধীনতা দিতে চান, আমি সে সর্ত্তে স্বাধীনতালাভকে ঘৃণা করি। আমার কন্যা ঘিয়াসুদ্দীন অপেক্ষা বহু গুণ ক্ষমতাশালী রাজার সহিতও অপবিত্র সম্বন্ধকে ঘৃণা করে। অনেক সম্ভ্রান্তকুলোদ্ভব ব্যক্তি তাহার পবিত্র প্রেমের ভিখারী।

রাজা। তবে আমার প্রস্তাবে তুমি সম্মত নও? আচ্ছা! যে শক্তি এক বিস্তৃত সাম্রাজ্যের উপর প্রভুত্ব করিতেছে, তাহাকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া সহজে পার পাওয়া যায় না। তোমাকে এই হঠকারিতার জন্য অনুতাপ করিতে হইবে।—যাও।

লালচীন ক্রোধে, অপমানে অধীর হইয়া রাজপ্রাসাদ হইতে স্বগৃহাভিমুখে যাত্রা করিল। রাজা কি মনে করেন যে সে এতই নীচ যে নিজ কন্যার চরমদুর্গতির বিনিময়ে স্বাধীনতা ক্রয় করিবে? তাহার কন্যাও কি এমনই অপদার্থ যে এরূপ জঘন্য প্রস্তাবে সম্মত হইবে? যতই লালচীন এই সকল কথা ভাবিতে লাগিল, ততই তাহার ভীষণ প্রতিশোধস্পৃহা জ্বলিয়া উঠিতে লাগিল। এ অপমান ভুলিবার নয়, ক্ষমা করিবার নয়। সে যখন জুলেখার কক্ষে প্রবেশ করিল তখন তাহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ দেখিয়া জুলেখা জিজ্ঞাসিল:—"বাবা, তোমার কি হয়েছে?"

পিতা। রাজা আমার চিত্তের স্থৈর্য্য নষ্ট করিয়াছেন।

কন্যা। কেমন করিয়া?

পিতা। তিনি আমাকে স্বাধীনতা দিতে চান।

কন্যা। বেশ ত; তা কি খুব সুখের বিষয় নয়!

পিতা। আমার কন্যার ইজ্জতের বিনিময়ে?

জুলেখার মুখমণ্ডল গাঢ় রক্তিমাভা ধারণ করিল। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার জঘন্য প্রস্তাবের তুলনায় কনিষ্ঠের প্রস্তাব জুলেখার মানস-নেত্রে অনির্ব্বচনীয় স্বর্গীয় শোভা ধারণ করিল।

লালচীন কহিল;—"জুলেখা, বাদশাহকে কি জবাব দিব?" জুলেখা সতীসুলভ দৃপ্তস্বরে উত্তর করিল, "কি উত্তর দিবে, তাহা কি তোমাকে শিখাইয়া দিতে হইবে? তোমার হৃদয়ের মধ্যে কি সে উত্তর খুঁজিয়া পাও নাই? বিষধর সর্প আমাকে দংশন করিবার অনুমতি চাহিলে আমি যে উত্তর দি, রাজাকেও তদ্রূপ উত্তর দেওয়া উচিত।" লালচীন বলিল, "বৎসে, আমি তোমার মন জানি; আমি রাজাকে কোন আশা দি নাই। কিন্তু তিনি আমাকে শাসাইয়াছেন। সুতরাং কৌশল দ্বারা তাঁহার কুঅভিসন্ধি ব্যর্থ করিতে হইবে। আপাততঃ যেন তাঁহার প্রস্তাবে আমরা সম্মত আছি, এইরূপ ভাণ করিতে হইবে। এই প্রকারে তাঁহার মনের সন্দেহ দূর হইলে আমি তাঁহাকে তোমার সহিত সাক্ষাৎ করাইবার ব্যপদেশে নিমন্ত্রণ করিব। তাহার পর রাজা বুঝিতে পারিবেন, যে বাদশাহ দাসকেও অপমান করিয়া সহজে পার পান না।"

লালচীন রাজাকে সম্মতি জ্ঞাপন করিল, কিন্তু কোন না কোন ওজর করিয়া জুলেখার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকারে বিলম্ব ঘটাইতে লাগিল। রাজা জুলেখার সম্মতি আছে জানিয়া এতদূর উল্লসিত হইয়াছিলেন যে এই বিলম্বে তাঁহার মনে কোনই সন্দেহ হইল না। এদিকে লালচীন, যে সকল ওমরা রাজা দ্বারা পুরস্কৃত না হওয়ায় অসন্তুষ্ট ছিল, তাহাদের মন বুঝিতে লাগিল। উদ্দেশ্য খিয়াসুদ্দীনকে কোন প্রকারে রাজ্যচ্যুত করিয়া শমসুদ্দীনকে সিংহাসনে স্থাপন। তাহা হইলে জুলেখা রাজরাণী হইতে পারে। দাস বুঝিতে পারিল যে অনেকেই অসন্তুষ্ট। খিয়াসুদ্দীন কিন্তু অধিকাংশ ওমরাকে পুরস্কৃত ও সম্মানিত করিয়া অবশিষ্ট সকলের অসন্তোষকে অগ্রাহ্য করিয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন।

সমস্ত আয়োজন ঠিক্ হইয়া গেলে লালচীন সমুদয় অমাত্যসহ রাজাকে স্বালয়ে নিমন্ত্রণ করিল। তাহার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া ওমরারা চমৎকৃত হইয়া গেলেন। ভোজনের পর নৃত্যগীত চলিতে লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে সুরার পেয়ালা অবিরাম গতিতে হাতে হাতে ফিরিতে লাগিল। খিয়াস্ জুলেখার সহিত মিলনাশায় উৎফুল্ল হইয়া অতিরিক্ত মাত্রায় পান করিতে লাগিলেন। লালচীন কিন্তু সতর্কতার সহিত অতি অল্পই পান করিতেছিল। সে যখন দেখিল যে সকলেই নেশায় বিভোর হইয়াছে, তখন রাজাকে কাণে কাণে কক্ষান্তরে গিয়া জুলেখার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আহ্বান করিল, এবং কোনও ছলে ওমরাদিগকে বিদায় দিতে বলিল। রাজা, লালচীনের সহিত গোপনীয় কথা আছে বলিয়া, ওমরাদিগকে স্ব স্ব গৃহে ফিরিয়া যাইতে বলিলেন। তাঁহারা টলিতে টলিতে অট্টহাস্য ও গান করিতে করিতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। রাজা লালচীনের সহিত কক্ষান্তরে গেলেন। গিয়াই সেখানে জুলেখাকে না দেখিয়া তাহাকে ডাকিতে বলিলেন। লালচীন জুলেখাকে ডাকিবার জন্য গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল। এদিকে কিন্তু দাস নিজ কন্যাকে নিজ ষড়যন্ত্রের কথা কিছুই বলে নাই। বরং, পাছে সে গৃহে থাকিলে তাহার চক্রান্ত বিফল হইয়া যায় এই ভয়ে তাহাকে সে দিন স্থানান্তরে পাঠাইয়া দিয়াছিল। কয়েক মাস পরে শমসুদ্দীনের সহিত তাহার বিবাহও ঠিক্ হইয়া গিয়াছিল। কিয়ৎক্ষণ পরে লালচীন উন্মুক্ত বর্চ্ছি হস্তে কক্ষে প্রবেশ করিল। রাজা জিজ্ঞাসিলেন, "জুলেখা কোথায়?" দাস বর্চ্ছি উত্তোলন করিয়া তাঁহাকে বলিল, "এই জুলেখা!" রাজা তাহার হাত হইতে অস্ত্র কাড়িয়া লইবার জন্য অগ্রসর হইতেছিলেন, কিন্তু নেশার ঝোঁকে পড়িয়া গেলেন। তৎক্ষণাৎ দুজন খোজা পাশের ঘর হইতে আসিয়া তাঁহাকে চিৎ করিয়া শোয়াইয়া রাখিল, এবং একজন বর্চ্ছি দ্বারা দুই চক্ষু অন্ধ করিয়া দিল।

আর পশ্চাৎপদ হইবার যো নাই। লালচীন দেখিল সে অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। সুতরাং প্রারব্ধ



ঈশার ক্রুশবহন।
র‍্যাফেএল কর্ত্তৃক অঙ্কিত।

KUNTALINE PRESS.

ভীষণ কার্য্য সমাপ্ত করিতে সংকল্প করিল। সে রাজার নাম লইয়া জরুরী কাজের ছল করিয়া নিমন্ত্রিত স্বগৃহে প্রত্যাবৃত্ত ওমরাদিগকে একে একে ডাকিয়া পাঠাইল। তাঁহারা যেমন এক এক জন করিয়া আসিতে লাগিলেন, অমনি লালচীনের নিযুক্ত ঘাতকেরা তাঁহাদের প্রাণবধ করিতে লাগিল। এইরূপে ভীষণ প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ হইলে দাস অসন্তুষ্ট ওমরাদিগকে সংবাদ দিল। তাহারা সকলেই আসিয়া জুটিল, এবং রাজমাতার সম্মতিক্রমে শমসুদ্দীনকে রাজপদে অভিষিক্ত করিল। রাজমাতা কনিষ্ঠ পুত্রকেই অধিক স্নেহ করিতেন। রাজমাতা সহায় হওয়ায় সম্ভ্রান্ত প্রজাবৃন্দ কেহ মুখ ফুটিয়া এই লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে পারিল না। তদ্ভিন্ন, ঘিয়াসুদ্দীন সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই যেরূপ সকলের অনুরাগ লাভ করিয়াছিলেন, ইন্দ্রিয়লালসার স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়া কিয়দ্দিবসের মধ্যেই সেই অনুরাগ হারাইয়াছিলেন। সুতরাং লালচীন অনায়াসে শমসুদ্দীনকে সিংহাসনারূঢ় করিতে সমর্থ হইল। ঘিয়াসুদ্দীন বন্দিভাবে সাগর-দুর্গে প্রেরিত হইলেন।

জুলেখার কথাও বলিতেছি।*

(ক্রমশঃ।)

প্রবাসে বঙ্গসাহিত্য চর্চ্চা।

উত্তরপশ্চিম প্রদেশে কাশী এবং প্রয়াগ বাঙ্গালীর জাতীয় সাহিত্যানুশীলনের কেন্দ্রস্থল হইয়াছে। কিন্তু বৃন্দাবন, যাহাকে আমরা প্রবাসী বঙ্গসাহিত্যের জন্মস্থান মনে করি, যথায় অষ্টসহস্রের অধিক বাঙ্গালীর বাস, এসম্বন্ধে বহু পশ্চাদ্‌বর্ত্তী। স্থানীয় কোন কোন কুঞ্জে জনসাধারণকে কথাচ্ছলে বঙ্গভাষায় জ্ঞান ধর্ম্ম শিক্ষা দিবার প্রথা আছে। মথুরায় বাঙ্গালা যন্ত্রালয়ও আছে। কিন্তু এতদ্দ্বারা এখানে মাতৃভাষার কিরূপ উন্নতি হইতেছে জানা যায় নাই। বৃন্দাবন বাঙ্গালীর বহু পুরাতন উপনিবেশ স্থান। এখানে ঔপনিবেশিকগণের পুরাতন কীর্ত্তি কালসহকারে লুপ্ত হইলেও এখনও অনেক বিদ্যমান আছে। সেই সকলের প্রকৃত তথ্য সংগ্রহ করিতে পারিলে প্রবাসী বাঙ্গালীর ইতিহাসের কতকটা উদ্ধার হইতে পারে। এবিষয়ে মথুরার নিগমাগম-মণ্ডলী চেষ্টা করিলে কার্য্যসিদ্ধি হইবার সম্ভাবনা আছে। এই নিগমাগম-মণ্ডলীকে সন্ন্যাসিসম্প্রদায়প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মসভা বলা যাইতে পারে। ইহা অধিকরূপে এদেশীয়দিগের দ্বারা গঠিত হইলেও ইহার মূল প্রবর্ত্তক একজন বাঙ্গালী ব্রহ্মচারী। কেশবানন্দ স্বামী নামেই তিনি প্রসিদ্ধ। এই মণ্ডলী দ্বারা হিন্দী সাহিত্য বিশেষ পুষ্টিলাভ করিতেছে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গসাহিত্যচর্চ্চারও সূত্রপাত হইয়াছে। বারাণসী এবং মথুরা পশ্চিমোত্তর প্রদেশের দুই প্রান্তে অবস্থিত হইয়া বাঙ্গালা ও পঞ্জাব এই দুই প্রদেশকে সমসূত্রে বাঁধিবার সুবর্ণশৃঙ্খলস্বরূপ হইয়াছে। এই গ্রন্থিদ্বয় বাঙ্গালীরই চেষ্টা-প্রসূত। এক প্রান্তসীমায় "ধর্ম্মপ্রচারক", অপর প্রান্তে "নিগমাগম পত্রিকা" এবং মধ্যে "সরস্বতী" ও "প্রবাসী" হিমালয়ের পাদমূল হইতে বঙ্গের সীমা পর্য্যন্ত প্রবাসী বাঙ্গালীর জ্ঞানশিক্ষা-প্রসারিণী প্রতিভার সার্থকতা করিতেছে।

নিগমাগম-মণ্ডলী হিন্দুধর্ম্মপ্রচার ব্যপদেশে স্থানে স্থানে সভা স্থাপনা করিয়া গভীর গবেষণা ও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যপূর্ণ সংস্কৃত হিন্দী ও বাঙ্গালা গ্রন্থ সকল প্রচারিত করিয়া ভারতের লুপ্ত রত্নরাজী উদ্ধার করিতেছেন। "নিগমাগম বৃহৎ কোষ," ভিন্ন ভিন্ন ভাষায় মুদ্রিত নিগমাগম গ্রন্থাবলী এবং "নিগমাগম চন্দ্রিকা" তাহারই ফল। গ্রন্থাবলীর মধ্যে "শ্রীমধুসূদন সংহিতা," (মূল ও বঙ্গানুবাদ) এবং "নবীন দৃষ্টিমে প্রবীণ ভারত" (হিন্দী) এই দুইখানি গ্রন্থ আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই মূল্যবান গ্রন্থদ্বয়ের পরিচয় দিবার স্থান এখানে নাই। প্রথমখানি ভারতের নানা স্থানের ধর্ম্মপাঠশালায় পাঠ্য হইয়াছে। "নবীন দৃষ্টিতে প্রবীণ ভারত" পাঠ করিলে অনেক ভারতনিন্দুক অজ্ঞানের চক্ষু ফুটিতে পারে। এই মণ্ডলী-প্রকাশিত গ্রন্থাদিতে বাঙ্গালীর লেখনীনিঃসৃত মার্জ্জিত হিন্দী পাঠ করিলে বিস্মিত হইতে হয়। বাঙ্গালী-পরিচালিত পঞ্জাব ট্রিবিউন, পিউপিল্‌স্‌ সার্ভ্যাণ্ট, নিগমাগম চন্দ্রিকা, সরস্বতী, প্রবাসী, ধর্ম্মপ্রচারক প্রভৃতি দেশীয় ধর্ম্ম, সমাজ শিক্ষা সম্বন্ধীয় বা রাজনৈতিক মুখপত্রগুলি এবং জাতীয় সাহিত্যের চর্চ্চা উত্তর প্রবাসী

---

* ইংরাজী গল্প অবলম্বন করিয়া লিখিত।

ও দেশবাসীদিগের কল্যাণের পথ কতদূর প্রসারিত করিয়াছে তাহা যথাস্থানে প্রদর্শিত হইবে। কিন্তু বড়ই পরিতাপের বিষয় যে প্রবাসী বঙ্গীয়সমাজ তাহা হইতে স্বকীয় কার্য্য উদ্ধার করিতে পশ্চাদ্‌পদ হইয়া বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছেন। প্রবাসীর এই বর্ত্তমান উপেক্ষার জন্য কালে মূল অধিবাসিগণের নিকট কিরূপ উপেক্ষিত হইতে হইবে, তাহারও আভাস ক্রমে প্রদর্শিত হইবে।

অনুসন্ধান করিলে এতদঞ্চলে প্রবাসী অনেক বাঙ্গালী সাহিত্যসেবীর সংবাদ পাওয়া যায় কিন্তু পঞ্চনদ প্রদেশে তাঁহাদের সংখ্যা অতীব বিরল। এখানে বঙ্গসাহিত্যচর্চ্চার সূত্রপাতও অতি অল্পদিন হইতে হইয়াছে। সুদূর প্রবাসে আসিয়া বাঙ্গালীগণ পাছে স্বীয় জাতীয়ত্ব হারাইয়া ফেলেন, এজন্য মহাত্মা কৃষ্ণানন্দ ব্রহ্মচারী তাহার প্রতিবিধানে প্রথম উদ্যোগী হইয়াছিলেন। এক স্থানে সকলে মিলিত হইয়া ধর্ম্ম, সমাজ ও সাহিত্যজীবন গঠন করিতে এবং সন্তানদিগকে মাতৃভাষা শিক্ষা দিতে পারেন, তাহার উপায় তিনিই প্রথমে উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। কিন্তু "বাঙ্গালীর কালীবাড়ী" মহাত্মাকল্পিত উদ্দেশ্য কতদূর সিদ্ধ করিয়াছে তাহা আমরা জানিতে পারি নাই। তবে ১৮৮৪ সালে কতিপয় মাতৃভাষানুরাগী লাহোরপ্রবাসী কর্ত্তৃক জাতীয় সাহিত্যানুশীলনের অনুকূল স্বতন্ত্র সভা ও পুস্তকালয় প্রথম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কাশীপ্রবাসী সাহিত্যানুরাগী শ্রীযুক্ত যদুনাথ চৌধুরী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র, চুনার হাঁসপাতালের বর্ত্তমান আসিষ্ট্যাণ্ট সার্জ্জন ডাক্তর রাজেন্দ্রনাথ চৌধুরী, বাবু বিহারীলাল গাঙ্গুলী এবং কৃষ্ণচন্দ্র সুর—উক্ত লাহোর "বঙ্গসাহিত্যসভার" প্রতিষ্ঠাতাগণের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন। ইহাঁরা মাননীয় প্রতুলবাবু, উকীল কালীপ্রসন্নবাবু এবং বার্ণ কোম্পানীর হেড্ ক্লার্ক হেমবাবু প্রমুখ বদান্য ব্যক্তিগণ ও জনসাধারণের সাহায্যে প্রথম ৪০০৲ টাকা ও ৬০০ শত পুস্তক লইয়া "শিখসভা" বাটীর একাংশে বঙ্গসাহিত্যসভার কার্য্য আরম্ভ করেন। ১৮৮৭ সালে এখানে প্রায় ১২০০ বাঙ্গালা পুস্তক সংগৃহীত হইয়াছিল। অল্পদিনের মধ্যে এই সভা বাঙ্গালী জনসাধারণের প্রতিনিধি স্বরূপ বলিয়া বিবেচিত হয়। লাহোর বঙ্গসাহিত্যসভা স্থাপনার দশ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৮৯৫সালে রাওয়ালপিণ্ডিতে "প্রোবোনো পাব্লিকো লাইব্রেরী" ও "কালীবাড়ী রিডিংরুম" নামে দুইটি ইংরাজী বাঙ্গালা পুস্তকালয় এবং তাহার দুইবৎসর পরে সিমলা টাউনে "অমরাবতী লাইব্রেরী" নামে একটী বাঙ্গালা পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। শেষোক্ত তিনটী পুস্তকালয়ের বিবরণ আমরা প্রবাসীতে ইতিপূর্ব্বে প্রকাশ করিয়াছি। দিল্লীতে বহুকাল হইতে বাঙ্গালীর বাস হইলেও এখানে একটীও বাঙ্গালা পুস্তকালয় বা বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপিত হয় নাই। পাঁচ বৎসর হইল লাহোরে একটী বঙ্গবিদ্যালয় ছিল কিন্তু সাধারণের সহানুভূতি অভাবে তাহা উঠিয়া যায়। সম্প্রতি দিল্লীতে ডাকবিভাগের একটি বড় দপ্তর উঠিয়া যাওয়ায় প্রায় ২০০ নূতন বাঙ্গালী দিল্লীপ্রবাসী হইয়াছেন। এই সময়ে স্থানীয় বাঙ্গালী সমাজের শীর্ষস্থানীয় সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন ইচ্ছা করিলে অনায়াসে বালকদিগের মাতৃভাষা শিক্ষার সুবিধা করিয়া দিতে পারেন। পঞ্জাবের স্থানে স্থানে যে সকল কালীবাড়ী, ব্রাহ্মসমাজ এবং হরিসভা আছে তাহাদের অধ্যক্ষগণ চেষ্টা করিলে প্রবাসে বঙ্গসাহিত্যচর্চ্চার পথ উন্মুক্ত করিয়া দিতে পারেন। লাহোর ব্রাহ্মসমাজ ও কালীবাড়ী, সিমলা ব্রাহ্মসভা, হরিসভা ও গৌরসভা, পুস্তকালয়গুলির সহযোগে এ বিষয়ে পথ প্রদর্শন করিলে ভাল হয়। সমগ্র পঞ্জাব প্রদেশে একটীও বাঙ্গালা মুদ্রাযন্ত্র বা সাময়িক পত্র নাই।

(ক্রমশঃ।)

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপরিচয়।

"রামদাস-গ্রন্থাবলী। ১ম ভাগ। ঐতিহাসিক রহস্য। রামদাস সেন মহাশয়ের পুত্রগণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা।" বঙ্কিম বাবু বঙ্গদর্শন প্রবর্ত্তিত করিয়া, বঙ্গসাহিত্যের নূতন যুগের সূত্রপাত করিয়াছিলেন। তিনি নিজে অতি উত্তম ইংরাজি রচনা করিতে পারিতেন; যাঁহারা বঙ্গদর্শন পরিচালনে তাঁহার সহকারী ছিলেন, তাঁহাদের মধ্যেও অনেকের ঐ ক্ষমতা ছিল; কিন্তু যাহা

কিছু লিখিব, বাঙ্গালায় লিখিব, নিজে এই পণ করিয়া, অন্ত দশজনকেও এই ব্রতে ব্রতী করাইয়াছিলেন। রামদাসবাবু তাঁহার ঐতিহাসিক রহস্তের ১২৮১ সালের বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছিলেন, যে বঙ্গদর্শন-সম্পাদকের অনুরোধক্রমেই তাঁহার তৎসাময়িক প্রবন্ধগুলি রচিত হইয়াছিল। যাঁহারা পুরাতত্ত্বের আলোচনা করিয়া বঙ্গদর্শনে প্রবন্ধ লিখিতেন, তাঁহাদের মধ্যে রামদাসবাবু এবং রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সুপ্রসিদ্ধ; ইহাঁদের উভয়েরই অকাল বিয়োগে বঙ্গসাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

বঙ্গভাষায় পুরাতত্ত্ব হউক, সমাজতত্ত্ব হউক, যে কোন তত্ত্বকথা লইয়া প্রবন্ধ লেখাই বিড়ম্বনার বিষয় ছিল। যাঁহারা সুশিক্ষিত, তাঁহারা ইংরাজী ছাড়া অন্ত কিছু পড়িতেন না, একালেও পড়েন কিনা জানিনা। বাঙ্গলা পড়াটা, বিদ্যালয়ের ছাত্র এবং অন্তঃপুরের ছাত্রীদিগের উপরই ন্যস্ত ছিল। এই জন্য ৺ভূদেব মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ৺রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রনাথ ঘোষ এবং রামদাস সেন প্রভৃতি লেখক দিগের সুচিন্তিত এবং শিক্ষাপ্রদ প্রবন্ধগুলি, কেহ কখনও বড় স্পর্শ করিত না। পাঠকেরা প্রায় দূর হইতেই বাহবা দিয়া উহাদিগকে বিদায় দিতেন। আমি দূর প্রবাসবাসী, জানি না, এখন সে দিন অতিবাহিত হইয়াছে কিনা; এবং বাঙ্গলার পাঠকেরা এখন "সারসত্যের আলোচনায়" মনোনিবেশ করেন কিনা।

রামদাসবাবু অতি পরিশ্রম সহকারে ঐতিহাসিক তত্ত্বের উদ্ধার করিতেন, এবং যোগ্যতার সহিত প্রবন্ধ লিখিতেন। তিনি যে কত বিবিধ বিষয়ের তত্ত্বের আলোচনা করিতেন, তাহা তাঁহার পুত্রগণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত গ্রন্থাবলীর সূচীপত্রটুকু দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। ধর্ম্মমত, দর্শন শাস্ত্র, পুরাণ, কাব্য, সঙ্গীত, নৃত্য প্রভৃতি সকল বিষয়েরই পুরাতত্ত্ব সমালোচিত হইয়াছে।

গ্রন্থাবলীর প্রথমভাগে, পাণিনি প্রবন্ধটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। যুক্তি এবং ঐতিহ্য লইয়া তিনি পাণিনির কাল নির্ণয় করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহা বেশ যুক্তিযুক্ত। কিন্তু যে প্রমাণের বলে ন্যায়ভাষ্যকার বাৎস্যায়ন এবং চাণক্যকে এক ব্যক্তি বলিয়াছেন, তাহা সংশয়পূর্ণ। কালিদাস প্রবন্ধে, দ্বিতীয় কালিদাসের সহিত যদি প্রথম কালিদাসকে জড়াইয়া না ফেলিতেন, তাহা হইলে যে সকল স্থলে তাঁহার সংশয় উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা আদৌ হইত না। রত্নাবলী ও নাগানন্দ বাণভট্ট রচিতই হউক অথবা স্বয়ং রাজা হর্ষবর্দ্ধনেরই হউক, ঐ নাটক দুখানি যে সপ্তম শতাব্দীর, তাহাতে সন্দেহ নাই। কোন প্রকারেই ঐ দুখানি দ্বাদশ শতাব্দীর কাশ্মীরপতির স্কন্ধে চাপান চলে না। রামদাস বাবু নিজেই তাহা বুঝিতে পারিয়া. কাশ্মীররাজের সময় সম্বন্ধে সন্দিহান হইয়াছিলেন। কিন্তু সন্দেহটা যদি অন্যদিকে হইত, তাহা হইলে তাঁহার মত তীক্ষ্ণধী ব্যক্তি যথার্থ মীমাংসায় উপস্থিত হইতে পারিতেন।

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুচারিটি বিষয়ে ত্রুটি অনিবার্য্য। কিন্তু গুণসাগরের মধ্যে এগুলি এত লুক্কায়িত, যে একথার উত্থাপন না করিলেও চলিত। রামদাসবাবুর জীবনচরিতটি, ভাল করিয়া লেখা উচিত ছিল; কেবল তাঁহার মৃত্যুসময়ে কয়েকখানি সংবাদপত্রে যাহা লিখিত হইয়াছিল, তাহাই দিয়া জীবনচরিত সাজান ভাল হয় নাই। তিনি অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন, লেখা আছে। কিন্তু আমরা যাহা জানি, তাহাও পরিষ্কাররূপে লিখিত হয় নাই। এখনও যদি তাঁহার পুত্রগণের, সে বিষয়ে কিছু লিখিতে আপত্তি থাকে, তাহা হইলে কথা নাই। তাহা না থাকিলে, তিনি যে দুএকটি বিশেষ বিদেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন, এবং সেখানকার বর্ণনায় যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন, তাহার উল্লেখ এবং মুদ্রণ প্রার্থনীয়।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

চিত্র।

"ষ্টুডিও" বিলাতের একখানি শ্রেষ্ঠ শিল্পবিষয়ক মাসিক পত্র। তাহার বিগত অক্টোবর সংখ্যায় শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অঙ্কিত কয়েক খানি চিত্র বাহির হইয়াছে। তদ্বিষয়ক প্রবন্ধটী কলিকাতা শিল্পবিদ্যালয়ের প্রিন্সিপ্যাল হাবেল সাহেবের লিখিত। ষ্টুডিওতে প্রকাশিত শ্রেষ্ঠ ছবি দুখানি, আমরা গত শীতকালে কলিকাতায় অবনীন্দ্র বাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া

প্রবাসীতে মুদ্রিত করিবার অনুমতি পাইয়াছিলাম। কিন্তু তৎকালে কলিকাতায় নানা বর্ণে রঞ্জিত করিয়া ছবি মুদ্রিত করিবার উপায় ছিল না বলিয়া আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় নাই।

বর্ত্তমান সংখ্যায় আমরা তিন খানি চিত্র স্বতন্ত্র মুদ্রিত করিয়া দিলাম। বিজ্ঞানাচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের পরিচয় দেওয়া অনাবশ্যক। তাঁহার আবিষ্ক্রিয়াতে জড় ও জীবের সাদৃশ্য ও পার্থক্য সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক চিন্তারাজ্যে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। যে পুস্তকে এই আবিষ্ক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে, বিলাতের লংম্যানস্, গ্রীন এণ্ড কোম্পানী তাহা প্রকাশিত করিয়াছেন। বর্ত্তমান সংখ্যায় উক্ত পুস্তকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু প্রকাশকগণের বোম্বাইস্থিত পুস্তকালয়ে উহা এখন না থাকায় আমাদের ইচ্ছা পূর্ণ হইল না।

ইংরাজীউচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি মাত্রেই শেলীর চেঞ্চী নামক কাব্যের কথা অবগত আছেন। বীয়াট্রিস চেঞ্চীর পিতা ফ্রান্সেস্কো তাঁহার উপর নানাবিধ পাশব অত্যাচার করায় তাঁহার ভ্রাতা ও বিমাতার চক্রান্তে ফ্রান্সেস্কো হত হন। এই নরহত্যা-কার্য্যে বীয়াট্রিসও জড়িত আছেন, এই সন্দেহে তাঁহার বিচার ও প্রাণদণ্ড হয়। মশানে নীত হইবার সময় বীয়াট্রিস্ যে প্রকার নৈরাশ্য-ও-বিষাদপূর্ণ দৃষ্টিতে দর্শকদিগের প্রতি তাকাইয়াছিলেন, চিত্রকর গুইডো রেনী তাহাই অঙ্কিত করিয়াছেন বলিয়া একটি গল্প প্রচলিত আছে। কিন্তু চিত্রটি কাহার এবং কে আঁকিয়াছিল, তৎসম্বন্ধে নিঃসংশয়ে কিছু বলা যায় না। মূল ছবিখানি রোমনগরীস্থিত বার্বেরিনি-প্রাসাদের সযত্নরক্ষিত অন্যতম রত্ন। ইহাকে অনেক শিল্পসমালোচক জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিষাদব্যঞ্জক চিত্র বলিয়া থাকেন।

"ঈশার ক্রুশবহন" রাফেএলের একখানি শ্রেষ্ঠ চিত্র। ক্রুশের ভারে অবসন্নদেহ ঈশা করুণ নেত্রে মাতা মেরী প্রভৃতি নারীগণের দিকে চাহিয়া আছেন। একজন রোমানসৈন্য তাঁহাকে দড়ি দিয়া বাঁধিয়া লইয়া যাইতেছে। তদ্ভিন্ন দর্শক ও আরও কয়েকজন সৈন্যের ছবি আছে।

সম্প্রতি বিলাতের বিখ্যাত ষ্ট্র্যাণ্ড ম্যাগাজিন ইউরোপের প্রধান প্রধান চিত্রশালার কোন্ চিত্রটি সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তাহা প্রত্যেক চিত্রশালার তত্ত্বাবধায়ককে জিজ্ঞাসা করেন। উত্তরগুলি কয়েকখানি চিত্রসহ নবেম্বর মাসের ষ্ট্র্যাণ্ডে বাহির হইয়াছে। শ্রেষ্ঠ কয়েক খানি চিত্রের মধ্যে দুইখানি আমরা পূর্ব্বেই ছাপিয়াছি। দুইখানিই র‍্যাফেএলের। আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে আমাদের গত মাসের ছবিখানি ষ্ট্র্যাণ্ডের ছবিখানি অপেক্ষা ভাল হইয়াছে। ষ্ট্র্যাণ্ডে উল্লিখিত আরও একখানি ছবির ফোটোগ্রাফ আমরা মাসাধিক হইল বিলাত হইতে আনাইয়া রাখিয়াছি ও শীঘ্রই প্রকাশিত করিব। উহা বিখ্যাত স্পেনদেশীয় চিত্রকর ম্যুরিলোর অঙ্কিত। বলা বাহুল্য, এ সকল ছবি আমরা ষ্ট্র্যাণ্ডের তালিকা বাহির হইবার পূর্ব্ব হইতেই সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছি। আমাদের নিকট এত উৎকৃষ্ট ছবি সংগৃহীত আছে, যে এখনও অনেক মাস তাহাতেই চলিতে পারে।

হে বিহগি!

হে বিহগি! চিরদিন রেখো ঝঙ্কারিত
আমার দিবসগুলি সঙ্গীতে তোমার।
এনো তুমি চয়নিয়া ঊষার চুম্বন
পক্ষদুটি ভ'রে তব, প্রভাতে আমার
সুষুপ্ত দুয়ারে। বিজন ঘুমেতে মোর,
স্তব্ধ অস্তাচল হ'তে এনো তুমি হ'রে
সায়াহ্নের নীরবতা; লুঠিয়া অবাধে
আরো এনো পূর্ণ তব কণ্ঠখানি ভ'রে
যেথাকার যত সব মধুর স্বপন।
সারা রাত সে সবারে মোহিনী মায়ায়ে
তব গীত পানে আরো করি' ভরপুর
নীরব দুয়ারে মম রাখিও ভুলা'য়ে।
ঘুমের ছায়াটি তব ছায়াখানি ছায়ে
করিও নিবিড়, ঘোর নিশি যবে ভায়।

লজ্জাবতী বসু।

কলিকাতা, ৫নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কুন্তলীন প্রেসে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত

প্রবাসী

দ্বিতীয় ভাগ। পৌষ, ১৩০৯। নবম সংখ্যা।

সমাজিক শক্তির ঘাত প্রতিঘাত।

(প্রথম প্রস্তাব)

আমরা প্রতিদিন সংবাদ পাইতেছি যে ইংলণ্ড, ফ্রান্স, ইউনাইটেড ষ্টেটস্ প্রভৃতি দেশ সকলের শ্রমজীবিগণ হাজার হাজার লোকে দলবদ্ধ হইয়া ধর্ম্ম ঘট করিতেছে, এবং ধনী মালিকদিগকে বেতন বৃদ্ধি করিতে বাধ্য করিতেছে। এক এক সময়ে চল্লিশ হাজার, পঞ্চাশ হাজার, ষাট হাজার লোক এক মতাপন্ন ও এক ভাবাপন্ন হইয়া কাজ ছাড়িয়া দিতেছে, এবং দারিদ্র্য ও অনাহার-যন্ত্রণা সহ্য করিয়া সে প্রতিজ্ঞাকে রক্ষা করিতেছে।

আমরা এই দূর দেশ হইতে যুগপৎ দুইটী বিষয় লক্ষ্য করিয়া বিস্মিত হইয়া যাইতেছি। প্রথম একদিকে পাশ্চাত্য জগতের বর্দ্ধনশীল ব্যক্তিত্ব-প্রধান স্বাধীনতা-প্রবৃত্তি, অপরদিকে সেই ব্যক্তিগত স্বাধীনতা-প্রবৃত্তি সত্বেও অদ্ভুত একতার প্রবৃত্তি ও সমবেত ভাবে কার্য্য করিবার শক্তি। এই সমবায়-প্রবৃত্তি দ্বারা ব্যক্তিগত শক্তি ঘনীভূত হইয়া প্রবল সমাজিক শক্তির আকার ধারণ করিতেছে; এবং অপর সমাজিক শক্তির সহিত ঘাত প্রতিঘাত উৎপন্ন করিয়া স্বকার্য্য সাধন করিয়া লইতেছে। জন ষ্টুয়ার্ট মিল একস্থলে বলিয়াছেন সমবায়-প্রবৃত্তি ও সমবায়-শক্তিই সভ্যতার একটী প্রধান লক্ষণ। ইহা বহুল পরিমাণে সত্য তাহাতে সন্দেহ কি? বর্ব্বর জাতিদিগের একটা প্রধান লক্ষণ এই যে তাহারা অনেক সময়ে আত্মরক্ষার জন্য ও সমবেত ভাবে কার্য্য করিতে পারে না। বাঘ ভালুক যদি সমবেত হইতে জানিত, তাহা হইলে কি মানুষ এত সহজে তাহাদিগকে পরাভূত করিতে পারিত? সেইরূপ জগতের বর্ব্বর ও অর্দ্ধ বর্ব্বর জাতিরা যদি সমবেত ভাবে কার্য্য করিতে পারিত, তাহা হইলে কি তাহারা এত শীঘ্র ও এত সহজে সভ্য জাতিদিগের দ্বারা নিগৃহীত হইত? সভ্যতার মঞ্চে আরোহণের ক্রম অনুসারেই একতা-প্রবৃত্তি মানব-চরিত্রে জাগিয়াছে। মানব-সমাজের শাসন ও উন্নতি বহুজনের সম্মিলিত চেষ্টার দ্বারা সাধিত হইতেছে।

যাহা হউক আমরা এই বিংশ শতাব্দীতে মানবের সমাজিক শক্তির প্রয়োগ ও কার্য্য সম্বন্ধে এক নবযুগে প্রবেশ করিতেছি। আমরা দুইটী অবস্থাকে অতিক্রম করিয়া তৃতীয় অবস্থাতে পদার্পণ করিতেছি। প্রথম অবস্থাতে ছিল সমাজিক শক্তিই সকলি, ব্যক্তিগত শক্তি কিছুই নয়; দ্বিতীয় অবস্থাতে ছিল ব্যক্তিগত শক্তিই প্রধান সামাজিক শক্তি তাহার পোষক ও বর্দ্ধক মাত্র; তৃতীয় অবস্থা আসিতেছে যাহাতে দেখা যাইবে যে ব্যক্তিগত শক্তি ও সামাজিক শক্তি অভিন্ন, এক অপরের সহায়, অর্থাৎ সামাজিক উন্নতির জন্য ব্যক্তিগত শক্তির প্রয়োগ এবং ব্যক্তিগত উন্নতির জন্য সামাজিক শক্তির প্রয়োগ উভয়ই সমানভাবে আবশ্যক। আমাদের বোধ হয় ইহাই প্রকৃত মীমাংসা ও চরম মীমাংসা। কিন্তু এই পরিবর্ত্তন একদিনে ঘটে নাই। পাশ্চাত্য জগতে এই

সামাজিক শক্তির ঘাত প্রতিঘাতের অভিনয় চলিতেছে বটে, কিন্তু এই পরিবর্ত্তন-ক্রিয়া অল্পাধিক পরিমাণে সকল দেশেই ঘটিতেছে।

প্রথমে এই পরিবর্ত্তনের প্রকার ও প্রণালী কিঞ্চিৎ নির্দ্দেশ করিব; তৎপরে ইহা হইতে কোন কোনও কার্য্য-নীতি নির্দ্দেশ করিবার চেষ্টা করিব।

ইহা আমরা সকলেই জানি, যে প্রাচীনকালে সর্ব্বদেশেই, সকল জাতি মধ্যেই, ব্যক্তিগত শক্তি সম্পূর্ণরূপে সামাজিক শক্তির বশীভূত ছিল। অগ্রে এক প্রবন্ধে বিবৃত করিয়াছি যে সামরিক প্রবৃত্তি ও সামরিক প্রয়োজন হইতেই এই অবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল। প্রাচীনকালে রাজার শক্তি বা সমরজয়ী দলপতির শক্তি বা স্বীয় মণ্ডলীর শক্তিই প্রধান সামাজিক শক্তি ছিল। কারণ বহুজনের অনুরাগ বা বাধ্যতার উপরে রাজা বা দলপতি দণ্ডায়মান থাকিতেন; সুতরাং সমাজ মধ্যে তাঁহাদের যে শক্তি থাকিত তাহা বহুজনের শক্তির দ্বারা বিধৃত হইয়াই থাকিত। মণ্ডলীর ত কথাই নাই। স্বীয় স্বীয় মণ্ডলী বা দলের জয়-পরাজয়ের উপরে তদন্তর্ভূত মানবগণের দৃষ্টি এতই নিবদ্ধ থাকিত, যে তদর্থে যে কোনও ব্যক্তির স্বার্থ বা স্বাধীনতার ব্যাঘাত করাকে তাহারা অত্যাচার বলিয়া মনে করিত না। এইরূপে প্রাচীন সমাজে ব্যক্তিগতভাবে মানবাত্মার মহত্বজ্ঞান স্ফুটিবার অবসর পায় নাই।

দৃষ্টান্তস্বরূপ দুইটী বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহা সকলেই অবগত আছেন যে সময়ে পরাজিত ও বন্দীকৃত ব্যক্তিদিগকে সম্পূর্ণ দাসত্বে পরিণত করিতে প্রাচীনকালের কোনও জাতিই সংকোচ বোধ করিত না। তাহাদিগকে ক্রয় বিক্রয় করা যাইত; তাহাদের প্রভুরা তাহাদিগকে অবাধে হত আহত করিতে পারিতেন; তাহার জন্য কাহারও নিকট দায়ী হইতে হইত না। রোম সম্রাজ্যের ইতিবৃত্ত পাঠ করিলে দেখিতে পাই এরূপ সম্পন্ন ও বর্দ্ধিষ্ণু রোমকের গৃহই ছিল না, যেখানে বিশ, পঁচিশ, শত, দুইশত বা তদধিক ক্রীতদাস থাকিত না। ধনিগণ এই হতভাগ্য দাসদিগকে নিজ নিজ ভবনে বা আরাম-কাননে, বা শস্যক্ষেত্রে খাটিবার জন্ত ক্রয় করিতেন; গোমহোষির ন্যায় পালন করিতেন; সিংহ ব্যাঘ্রের মুখে ফেলিয়া দিয়া বন্ধু বান্ধবকে ক্রীড়া দেখাইতেন; সামান্য অপরাধে অসহ্য যাতনা দিতেন; কখন কখনও তাহাতেই তাহাদের প্রাণ যাইত। কয়েকটী মাত্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতেছি। ইপিকৃটিটাস একজন প্রাচীন রোমের সুপ্রসিদ্ধ জ্ঞানী পুরুষ। তিনি খঞ্জ ছিলেন। তাহার খঞ্জ হইবার বিবরণ এই; তিনি এক সময় একজন ক্রীতদাস ছিলেন। একদা তাঁহার প্রভু কোনও সামান্য অপরাধে তাঁহার প্রতি বিরক্ত হইয়া, তাঁহার পা মুচড়াইয়া তাঁহাকে সাজা দিতে আদেশ করেন। মুচড়াইতে মুচড়াইতে পা খানা ভাঙ্গিয়া দুখান হইয়া গেল। ইপিকৃটিটস ধীর ও শান্ত ভাবে বলিলেন—"আমি ত বলেছিলাম আর মুচড়াইলে ভাঙ্গিয়া যাইবে।" এই জন্যই তাঁর জ্ঞানী বলিয়া এত প্রশংসা। একবার সম্রাট আগষ্টস একস্থানে নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন। তাঁহারা যখন আহারে বসিয়াছেন, তখন তাঁহার বন্ধুর একটি বালক দাস একটী স্ফটিক নির্ম্মিত পুষ্পদান বহিয়া আনিতেছিল; আনিতে আনিতে হঠাৎ হস্ত হইতে পড়িয়া সেটী ভাঙ্গিয়া গেল। ইহাতে প্রভু এত বিরক্ত হইলেন যে বালকটীর হাত পা বাঁধিয়া মাছ ও কচ্ছপের চৌবাচ্চাতে ফেলিয়া তাহাদের দ্বারা খাওয়াইয়া মারিতে আদেশ দিলেন। তৎক্ষণাৎ তাহা করা হইল। ইহা দেখিয়া সম্রাট ক্রুদ্ধ হইয়া সেই প্রভুকে শাস্তি দিয়া চলিয়া গেলেন। একজন সম্ভ্রান্ত রোমীয় মহিলার একটি দাসী মুখের উপরে জবাব দেওয়াতে তিনি নিজের মাথার খোপার পিন খুলিয়া তাহার জিহ্বাতে ফুঁড়িয়া জিহ্বা ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। ইহাতে তাঁহার মহিলা বন্ধুগণ যখন বলিলেন "মানুষকে কি এত ক্লেশ দিতে হয়।" তখন ঐ মহিলা বলিলেন "হাঁ ওরা আবার মানুষ!"

আর অধিক উদাহরণ নিষ্প্রয়োজন। এদেশীয় কেহ যেন মনে করিবেন না যে এইরূপ দাসত্ব প্রথা কেবল প্রাচীন রোমেই ছিল, আমাদের দেশে এরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল না। বলিতে কি প্রাচীন ভারতের সমগ্র শূদ্র জাতি এইরূপ দাস ছিল। তাহাদের কোনও সামাজিক অধিকার ছিল না; কোনও স্বাধীনতা ছিল না। এমন কি নিজ নিজ দেহের উপরে ও অধিকার ছিল না। তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক শ্রম করান যাইত, অবাধে হত আহত

করা যাইত, তাহারা যাহা উপার্জ্জন করিত তদুপরি তাহাদের অধিকার থাকিত না। আমার এরূপ উক্তিকে পাছে কেহ অতিরঞ্জিত মনে করেন, সেজন্য প্রাচীন শাস্ত্রকারদিগের দোহাই দিতেছি।

মনু বলিয়াছেন :—

"শূদ্রন্তু কারয়েৎ দাস্যং ক্রীত মক্রীতমেববা।"

অর্থ "শূদ্র তোমার ক্রীত হউক আর অক্রীতই হউক তাহাকে তুমি ধরিয়া খাটাইয়া লইতে পার।"

আর একস্থলে আছে—

ভার্য্যা, পুত্রশ্চ, দাসশ্চ ত্রয় এবাধনাঃ স্মৃতাঃ।

যত্তে সবধিগচ্ছন্তি যস্যৈতে তস্য তদ্ধনং॥

অর্থ—ভার্য্যা, পুত্রও দাস তিনের ধনে অধিকার নাই; ইহারা যাহা কিছু উপার্জ্জন করিবে ইহারা যার সে ধন তার।

কেবল প্রাচীন কালেই বা কেন, কতিপয় বৎসর পূর্ব্বে আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেটসের ন্যায় সভ্য দেশেও ত এই ক্রীতদাস প্রথা প্রচলিত ছিল; এবং এখনও ত দক্ষিণ আফ্রিকাতে হতভাগ্য কাফ্রিগণ শুক্ল বর্ণ খ্রীষ্টীয় ঔপনিবেশিক প্রভুদের অধীনে এক প্রকার ক্রীতদাসের অবস্থাতেই বাস করিতেছে। সৌভাগ্য ক্রমে ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সের উত্তরাংশের অধিবাসিগণ অভ্যুত্থিত হইয়া ঘোর যুদ্ধ বিগ্রহের পর দাসত্বপ্রথা রহিত করিয়াছেন, তাই ক্রীতদাসদিগের দুর্দ্দশার কাহিনী লোকের স্মৃতি হইতে দিন দিন বিলুপ্ত হইতেছে; কিন্তু ৩০।৩৫ বৎসর পূর্ব্বে সেই ঘোর কাহিনী সকল পাঠ করিয়া অপরাপর দেশের মানবের শরীরের শোণিত উষ্ণ হইয়া উঠিয়াছিল। মানুষ মানুষের প্রতি এরূপ অত্যাচার করিতে পারে, ইহা ভাবিলেও মানব-প্রকৃতির উপরে ঘৃণা জন্মে। সেই সকল অত্যাচারের ভিতরকার কথা এই ছিল, যে শুক্লবর্ণ খ্রীষ্টশিষ্যগণ কৃষ্ণবর্ণ দাসদিগের আত্মার ও মনুষ্যত্বের মহত্ব কিছুই অনুভব করিতেন না। আপনাদিগকে যে সকল সামাজিক অধিকারের উপযুক্ত মনে করিতেন, তাহাদিগকে তাহা করিতেন না। ফল কথা এই, মানুষের আত্মার একটা মহত্ব আছে, তাহাকে এরূপ ব্যবহার করিবার অধিকার সমাজের নাই, এইরূপ জ্ঞান থাকিলে এরূপ ব্যবহার সম্ভব নয়।

এক দিকে সমরে বন্দীকৃত পুরুষদিগকে দাসত্বে পরিণত করা যেমন নিয়ম ছিল, অপর দিকে বন্দীকৃতা নারীদিগকে "বাঁদী" করিয়া রাখারও প্রথা ছিল। অনেক স্থলে সমরবিজয়ী নেতৃগণ পরাজিত জাতির রাজকুলের সুন্দরীগণকে নিজ নিজ অন্তঃপুরের রাণী ও উপরাণীগণের সামিল করিয়া লইতেন; এবং বন্দীকৃত অপর স্ত্রীগণকে বাঁদীরূপে দান বা বিক্রয় করিতেন। তৎপরে তাহাদের কি দশা হইত তাহা আর লেখনীদ্বারা লিখিব না, বা পাঠকের কল্পনার চক্ষের সমক্ষে আঁকিব না। মহম্মদকে বহু বিবাহের জন্য অনেকে নিন্দা করেন। মহম্মদের জীবন চরিতকারদিগের মধ্যে অনেকে বলিয়াছেন যে তাঁহার পত্নীদিগের মধ্যে অনেকে এইরূপ সময়ে বন্দীকৃতা নারী ছিলেন। তাঁহাদের কেহ কেহ সম্ভ্রান্ত ঘরের কন্যা ছিলেন; সুতরাং তাঁহাদিগকে শোচনীয় বাঁদীর দশা হইতে বাঁচাইবার উদ্দেশেই মহম্মদ দয়া-পরবশ হইয়া তাঁহাদিগকে পত্নী করিয়া লইয়াছিলেন।

এই উপরাণী ও বাঁদীর ব্যাপার দেখিবার জন্য আরবদেশে যাইবারই বা প্রয়োজন কি? আমাদের দেশেও প্রাচীনকালে এইরূপ প্রথা প্রচলিত ছিল। বালিকে হত্যা করিয়া সুগ্রীব তারাকে লইলেন; রাবণ হত হইলে বিভীষণ মন্দোদরীকে গ্রহণ করিলেন, ইত্যাদি আখ্যায়িকাও উক্ত প্রথার সাক্ষ্য দিতেছে। আর প্রাচীন কালেই বা যাই কেন। অধিক দিনের কথা নয়; শুনিয়াছি, পঞ্চনদাধিপতি রণজিৎসিংহের অবরোধ এই প্রকার উপরাণীতে পূর্ণ ছিল। তিনি যে সকল রাজাকে রণে নিহত করিতেন, তাঁহাদের অবরোধের অঙ্গনাগণকে নিজ অবরোধের সামিল করিয়া লইতেন। অধিক কি এরূপ জনশ্রুতিও আছে যে তাঁহার সেনাপতিগণের মধ্যে যিনি শৌর্য্য বীর্য্য বা সমর-কুশলতাতে তাঁহার চিত্তকে আকৃষ্ট করিতেন, তাঁহাকে নিজ অবরোধ হইতে হয়ত কোনও সুন্দরী উপরাণীকে বক্‌শিস দিতেন। এই বিবরণকে অনেকে অতিরঞ্জিত কিম্বদন্তী বলিয়া মনে করিতে পারেন; কিন্তু আমি অমৃত সহরের শিখ গবর্ণর সর্দ্দার লেনা সিংহের পুত্র সর্দ্দার দয়াল সিংহের মুখে শুনিয়াছি যে তাঁহার বাল্যকালে তিনি দেখিয়াছেন যে তাঁহাদের অন্তঃপুর উপহাররূপে প্রাপ্ত স্ত্রীলোকেপূর্ণ ছিল।

৫০।৮০০এরও অধিক হইবে। বিশেষভাবে এক দিনের কথা তিনি বলিয়াছিলেন। এক দিন প্রাতঃকালে তাঁহার পিতা বাহির বাড়ীতে নিজের আপিসে বসিয়া একজন সমাগত বন্ধুর সহিত কথোপকথন করিতেছেন, এমন সময়ে কোনও পার্ব্বত্য জাতির শাসন-কর্ত্তার নিকট হইতে উপহার ও পত্র লইয়া দুইটি লোক আসিল। উপহারের সামগ্রীর মধ্যে একটা বাজপাখী, কতকগুলি মৃগ ও অপরাপর প্রাণীর চর্ম্ম, একখানি বহুমূল্য তরবারি, ও দুইটী যুবতী স্ত্রীলোক। ঐ দুই যুবতীকে দেখিয়াই তাঁহার পিতা বিরক্ত হইয়া উঠিলেন; কারণ তাঁহার অন্তঃপুর তখন এইরূপ স্ত্রীলোকে পূর্ণ ছিল। অবশেষে কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া সর্দ্দার লেনাসিং সমাগত বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করিলেন "মেয়ে দুটো তুমি নেবে?" তিনি বলিলেন "আচ্ছা দেও।" সেখান হইতেই যুবতীদ্বয়কে বিদাইয়া দেওয়া হইল; আর অন্তঃপুরে প্রবেশ করান হইল না।

স্ত্রীজাতির এরূপ ব্যবহারে কোনও মহিলা পাঠিকা হয়ত কোপাবিষ্ট হইতে পারেন; কিন্তু ইহা অপেক্ষা স্ত্রীজাতির প্রতি নৃশংসতর ব্যবহার এদেশে হইয়াছে, তাহার ইতিবৃত্ত আমার হস্তে আছে; তাহা অপ্রাসঙ্গিক বোধে এখানে আর দিলাম না। আশা করি আমার বক্তব্য যাহা, তাহা সকলে অনুভব করিতে পারিতেছেন। দাসত্ব প্রথা ও রমণীর বাঁদী দশা দৃষ্টান্ত মাত্র; এতদ্বারা অনুভব করা যাইতেছে প্রাচীন সামরিক সময়ে মানবাত্মার মহত্ত্ব জ্ঞান জাতি সকলের মনে কিরূপ অপরিস্ফুট ছিল; মানবের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার আদর কিরূপ অল্পই লক্ষিত হইত; এবং সমাজ মধ্যে বলশালী ব্যক্তিগণ সামাজিক শক্তির সাহায্যে কিরূপে দুর্ব্বলকে পীড়ন করিতে পারিত।

ভারতের জাতিভেদ প্রথা এই আতিরিক্ত সামাজিকতা-প্রধান সভ্যতার আর এক নিদর্শন। সামাজিক শক্তির সমক্ষে ব্যক্তিগত শক্তি কিছুই নয়, ইহা আমরা ভারতক্ষেত্রে প্রতিদিন লক্ষ্য করিতেছি। এই প্রথা সামাজিকগণের হস্তে এরূপ শক্তি রাখিয়াছে যে তাঁহারা সমবেত হইয়া তাহা প্রয়োগ করিলেই তদঙ্গীভূত ব্যক্তিবিশেষকে কঠোর শাস্তি দিতে পারেন। সেই কারণে এ দেশের প্রত্যেক ব্যক্তি অপর দশজনের ভয়ে ভয়ে বাস করে। তাহার ফলস্বরূপ মানুষের চিত্তের প্রসার নাই; প্রতিভা, মৌলিকত্ব, উদ্যোগ, উৎসাহ, সমুদয় জাতীয় জীবন হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে। এদেশে যেমন সামাজিকতার আতিশয্য ও ব্যক্তিগত শক্তির দুর্ব্বলতা, পশ্চিমে তেমনি বর্ত্তমান সময়ে ব্যক্তিগত শক্তির আতিশয্য ও সামাজিক শক্তির দুর্ব্বলতা।

পাশ্চাত্য জগতে তিনটী প্রধান কারণে ব্যক্তিগত শক্তির এই আতিশয্য ঘটিয়াছে। প্রথম, কোন কোনও চিন্তাশীল ব্যক্তি বলেন, যে খ্রীষ্টীয় ধর্ম্মের অভ্যুদয় ও প্রচার মানবাত্মায় মহত্ত্ব ঘোষণার প্রথম ভেরীনিনাদ। প্রত্যেক মানব আপনার আত্মার মুক্তি সাধনে সমর্থ, এবং ঈশ্বরের চক্ষে একটা পাপী আত্মার মূল্য এত অধিক যে তাহাকে পরিত্রাণ দিবার জন্যই তাঁর অবতার স্বীকার করা;—এই ভাব মানব মনে ব্যাপ্ত হওয়াতেই ধনী দরিদ্র ও পণ্ডিত মূর্খ সকলের আত্মার একটা দাম বাড়িয়া গেল! খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম মানুষকে বলিল দরিদ্র যে সে ধন্য, কারণ পার্থিব সম্পদে তাহার যে অভাব আছে, আধ্যাত্মিক সম্পদের দ্বারা তাহা পূর্ণ হইবে; যে ক্রীত দাস সে যদি সত্য ধর্ম্মে বিশ্বাসী হয় তবে সে প্রকৃতভাবে স্বাধীন এবং তাহার অত্যাচারী প্রভু অপেক্ষা সৌভাগ্য-শালী। এই ভাব মানব মনে এক মহা-আকাঙ্ক্ষার উদয় করিয়া, এক মহা পরিবর্ত্তন আনিয়া দিল! মানুষ মানবাত্মার মহত্ত্ব ও উচ্চ অধিকার হৃদয়ে অনুভব করিতে শিখিল। তাঁহারা বলেন ইহা হইতেই পাশ্চাত্য জগতে শিশু হত্যা, গ্লাডিয়েটার ক্রীড়া, নারীর বন্ধন-দশা প্রভৃতি তিরোহিত হইল।

এইমত সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও যে কিয়ৎপরিমাণে সত্য তাঁহাতে সন্দেহ নাই। খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম এই মহা পরিবর্ত্তনের এক মাত্র কারণ না হইলে ও অপরাপর কারণের মধ্যে অন্যতম কারণ, তাহা নিঃসংশয় রূপে বলিতে পারা যায়।

দ্বিতীয় কারণ লুথার প্রবর্ত্তিত সংস্কারান্দোলন। গুরু, শাস্ত্র ও মানবের নিজের বিচার, ইহার মধ্যে মানবের নিজের বিচার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ; ধর্ম্ম বিষয়ে মানব ভাল মন্দ বিচার

করিয়া লইবার অধিকারী; এই মহাসত্য যখন প্রচারিত হইল, তখন সর্ব্ববিধ স্বাধীন বিচারের দ্বার উন্মুক্ত হইয়া গেল। এই আধ্যাত্মিক ভিত্তিকে পাইয়া মানবাত্মার মহত্ত্ব-জ্ঞান সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে স্থাপিত হইয়া গেল; কারণ এ চিন্তা স্বভাবতঃই মানব মনে উঠিল, যে সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতম ও পবিত্রতম যে বিষয় তাহাতেই যদি মানবের মন স্বাধীন ভাবে বিচার করিতে সমর্থ হইল, তবে রাজনীতি, সমাজ-নীতি প্রভৃতির ন্যায় অপরাপর বিষয়ে কেন করিবে না? ইহার অনিবার্য্য ফলস্বরূপ, জাতীয় জীবনের সর্ব্ববিভাগেই মানবাত্মার স্বাধীন বিচারের কার্য্য দেখিতে পাওয়া গেল। মানব-চিন্তা প্রাচীনের নিগড় ছিন্ন করিয়া যখন একবার উন্মুক্ত ও অনাবৃত ক্ষেত্রে বাহির হইয়া পড়িল, তখন আর তাহাকে নূতন নিগড়ে বদ্ধ করিতে পারা গেল না। অনেকে বলেন, এবং সে কথা সত্য, যে লুথারের কামানের গোলাবৃষ্টি-জনিত কম্পন এখনও পাশ্চাত্য সমাজে রহিয়াছে। মানবের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ভাব এখনও বর্দ্ধনশীল।

তৃতীয় কারণ ফরাসী বিপ্লব। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ভল্টেয়ার, রুসো, দাদেরো প্রভৃতি কয়েকজন প্রাচীন-বিদ্বেষী ও উৎকট-ব্যক্তিত্ব-প্রধান ফরাসী লেখক দেখা দেন। ইঁহাদের অসাধারণ প্রতিভা প্রাচীন-নিরপেক্ষ হইয়া, বলগা-বিহীন অশ্বের ন্যায়, আপনাদের চিন্তাকে যথেচ্ছ পথে ধাবিত হইতে দিয়া, সমাজকে, ব্যক্তিগত জীবনের সুখ ও উন্নতির অধীন করিবার জন্য, ভাঙ্গিয়া নূতন করিয়া গড়িতে প্রবৃত্ত হয়। ইঁহাদেরই প্রভাবে ফরাসী-দেশীয়দিগের মনে, ধনী, রাজা, পুরোহিত, বিবাহ-বন্ধন প্রভৃতি, সামাজিক শক্তির নিদর্শন স্বরূপ যত কিছু বিধি-ব্যবস্থা, সকলের প্রতি ঘোরতর বিতৃষ্ণা জন্মে। তাহারই ফল-স্বরূপ ঘোর বিপ্লব উপস্থিত হয়। যদি এই বিপ্লব প্রধানতঃ রাজনীতি-ক্ষেত্রেই ঘটিয়াছিল, তথাপি ইহার ফল কেবল মাত্র রাজনীতির মধ্যেই বদ্ধ থাকে নাই; সর্ব্ববিভাগেই ইহার প্রভাব অনুভূত হইয়াছে। প্রজাগণ গা ঝাড়া দিয়া রাজশক্তিকে ভাঙ্গিয়া চুরমার করিতে পারে, দরিদ্র-গণ ধনীদিগকে সাজা দিয়া নিজ নিজ অধিকার স্থাপন করিতে পারে, এই দৃষ্টান্তের উন্মাদিনী শক্তি যে এক সময়ে মানব মনে কিরূপ কার্য্য করিয়াছিল, এখন আমাদের তাহা ধারণা করিবার সম্ভাবনাই নাই। ফরাসী বিপ্লবে যে তরঙ্গ তুলিয়াছিল, তাহার ধাক্কা অনেক দূর পৌঁছিয়াছে এবং এখনও পাশ্চাত্য সমাজকে কম্পিত করিতেছে। ইহাতে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ভাবকে কতগুণ বর্দ্ধিত করিয়াছে তাহা বলা যায় না। বলিতে কি এই বিপ্লবকে সামাজিক শক্তির বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত শক্তির অভ্যুত্থান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

মুদ্রা যন্ত্রের অভূত-পূর্ব্ব বিকাশ এই ভাবের সঞ্চারণ বিষয়ে যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে তাহা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। তাহা সকলেই অবগত আছেন। বিগত শতাব্দীর প্রারম্ভে পাশ্চাত্য জগতে এই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ভাব অতিরিক্ত মাত্রায় প্রবল হইয়া উঠে। চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ কি রাজনীতি, কি সমাজ-নীতি সকলকেই এই ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ভিত্তির উপরে স্থাপন করিবার প্রয়াস পান। তাহার ফলস্বরূপ জাতীয় জীবনের সকল বিভাগেই ব্যক্তিগত শক্তির প্রাধান্য লক্ষিত হইতে থাকে। এমন কি সুপ্রসিদ্ধ ডারউইন যে বিবর্ত্তবাদের মত আবিষ্কার করেন, তাহাতেও এই ব্যক্তিগত শক্তির প্রাধান্যের ভাবকে পোষণ করে। সেই বিবর্ত্তবাদে ইহা স্থাপন করে, যে জগতে সর্ব্বরাজ্যে, সর্ব্ববিভাগে, অবিশ্রান্ত প্রতিদ্বন্দ্বতা চলিতেছে; প্রত্যেকেই স্বীয় স্বীয় অভীষ্ট পদার্থ বা সুখলাভের জন্য নিরন্তর চেষ্টা করিতেছে; সেই চেষ্টায় ফলস্বরূপ সেই অভীষ্ট-সিদ্ধির অনুরূপ গুণ ও শক্তি বিকশিত হইতেছে এবং সেই সকল গুণ ও শক্তিতে শ্রেষ্ঠ যাহারা তাহারাই জয়-শালী হইয়া বাচিতেছে; অপরেরা বিলুপ্ত হইতেছে। এই বিবর্ত্তবাদ ও পরোক্ষভাবে ব্যক্তিগত শক্তি ও স্বাধীনতার ভাবকে মানব মনে প্রবল করিয়া তুলে।

ইহারই ফলস্বরূপ বিগত শতাব্দীর মধ্যভাগে ইউ-রোপের জাতিগণের মধ্যে কল কারখানার মালিক ধনিগণ ও শ্রমজীবীদিগের মধ্যে ঘোর প্রতিদ্বন্দ্বিতা উৎপন্ন হয়। এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে, তাহা ভাবিয়া সমাজতত্ত্ববিদ্ ব্যক্তিগণ চিন্তিত হইয়া পড়েন। যাহাদের হৃদয় অপেক্ষাকৃত পরদুঃখ কাতর ও উত্তেজনা-

গ্রহণ তাহারা ইহার তাড়নাতে, এই অতিরিক্তও উৎকট ব্যক্তিত্বের প্রতিক্রিয়া স্বরূপ সোসিয়ালিজম ও নিহিলিজম আশ্রয় করে।

এই বিবাদ বিসম্বাদ হইতে এক নব শক্তি জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। শ্রমজীবিগণ দেখিয়াছে, যে সমবেত ভাবে কার্য্য না করিলে, তাহারা মালিকদের সমক্ষে দাঁড়াইতে পারিবে না। অর্থাৎ কাঁটা দিয়া যেমন কাঁটা তুলিতে হয়, তেমনি ব্যক্তিগত শক্তিকে সমবায় দ্বারা সামাজিক শক্তিতে পরিণত করিয়া সমাজিক শক্তির দ্বারা সামাজিক শক্তিকে জয় করিতে হইবে। এইজন্য বহুল পরিমাণে ধর্ম্মঘট করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। শ্রমজীবীরা একত্র হইয়া "ট্রেড ইউনিয়ান" নামে এক এক সভা স্থাপন করিয়া সকলে তাহার অন্তর্গত হইতেছে। এই সকল সভার উদ্দেশ্য শ্রমজীবীদিগের স্বার্থ রক্ষা করা। ইহাদের অঙ্গীভূত প্রত্যেক শ্রমজীবীকে নিজের আয়ের নির্দ্দিষ্ট অংশ সভার হস্তে জমা দিতে হয়। শর্ত্ত এই থাকে, যে শ্রমজীবিগণ বেতন বৃদ্ধি করাইবার জন্য ধর্ম্মঘট করিয়া যখন কর্ম্ম পরিত্যাগ করিবে, তখন "ট্রেড ইউনিয়ান" তাহাদিগকে খাইতে দিবে। অল্পকালের মধ্যেই দেখা গেল যে "ট্রেড ইউনিয়ানগুলি" এক একটী সামাজিক শক্তির প্রবল উৎস হইয়া দাঁড়াইল। তদন্তর্গত শ্রমজীবিগণ যখন দেখে যে মালিক ধনিগণ বেতন বৃদ্ধি করিয়া তাহাদিগকে নিজ নিজ শ্রমজাত পদার্থের মূল্যের ন্যায্য অংশ দিতে প্রস্তুত নহেন, তখন তাহারা "ইউনিয়নের" কর্ত্তৃপক্ষের সম্মতিক্রমে ধর্ম্মঘট করে ও কাজ ছাড়িয়া বসে। যে কাজ তাহারা ছাড়ে, ইউনিয়ানের বহির্ভূত কোনও লোক তাহা লইতে সাহস করে না; লইলেই তাহার প্রতি বিবিধ প্রকারে অত্যাচার হইতে থাকে। এইরূপে মালিকদিগকে ত্বরায় বেতন বৃদ্ধি করিতে সম্মত হইতে হয়।

ব্যক্তিগত শক্তিকে এইরূপে সামাজিক শক্তিরূপে পরিণত করা, বর্ত্তমান সময়ের একটা প্রধান আলোচ্য বিষয়। সংস্কৃত নীতিশাস্ত্রকার বলিয়াছেন—

স্বল্পানামপি বস্তূনাং সংহতিঃ কার্য্য-সাধিকা।
তৃণৈগুণত্বমাপন্নৈর্বধ্যন্তে মত্তদন্তিনঃ॥

অর্থ—অতি ক্ষুদ্রকায় বস্তু সকলকেও একত্র করিলে তদ্দ্বারা অনেক মহৎ কার্য্য সাধন করা যায়; তৃণ সকলকে পাকাইয়া রজ্জু করিলে তদ্দ্বারা মত্ত হস্তীকে বাঁধা যায়।

ইহার প্রমাণ আমরা পাশ্চত্য জগতে দেখিতেছি। সহস্র সহস্র শ্রমজীবী লোক আপন আপন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত শক্তিকে সম্মিলিত ও সামাজিক শক্তিরূপে পরিণত করিয়া মহৎ কার্য্য সাধন করিয়া লইতেছে। কেবল যে তাহারা ঐ প্রকার করিতেছে তাহা নহে, মালিকগণও একা একা সংগ্রাম করা দুঃসাধ্য দেখিয়া দলবদ্ধ হইতে শিক্ষা করিয়াছেন। এইরূপে পাশ্চাত্য সামাজিক জীবনে সামাজিক শক্তির গুরুতর ঘাত প্রতিঘাত উপস্থিত হইয়াছে।

সমবেত হইতে গেলেই মানুষকে কিছু ছাড়িতে হয়, কিছু দিতে হয়, নিজের প্রবৃত্তি বা ইচ্ছা বিরুদ্ধ কিছু করিতে হয়; ঠিক মনের মত জিনিসটী পাওয়া যায় না। সুতরাং এই সমবায়-প্রবৃত্তি মানব-চরিত্রের নিঃস্বার্থতা ও সামাজিকতা শিক্ষার একটী প্রধান উপায় স্বরূপ হইতেছে। সে সিক্ষার ফলও পাশ্চাত্য জগতে আমরা ইতিমধ্যে দেখিতে পাইতেছি। মানুষ বুঝিতেছে যে সমাজের হিতাহিতের প্রতি উদাসীন হইয়া ব্যক্তিগত জীবনের উন্নতি হইতে পারে না; আবার ব্যক্তিগত জীবনের সুখ ও উন্নতির প্রতি উদাসীন থাকিয়া সম্পূর্ণ সামাজিক উন্নতি লাভ করা যাইতে পারে না। এক অপরের সহিত অভিন্নরূপে সম্বদ্ধ।

নবরত্ন ও কালিদাস।

গত কার্ত্তিক মাসে সাহিত্য-প্রসঙ্গে বিজয়বাবু ঠিকই বলিয়াছেন, আমাদের দেশের প্রাচীন ইতিহাস অন্ধকার-সমাচ্ছন্ন। এই জন্যই প্রখর আলোক চাহিতেছি। কিন্তু দীপ প্রজ্জলিত করিবার পূর্ব্বে আর একবার মনে করিয়া দেখি, আমরা অন্ধকারে কি খুঁজিতেছি। অবশ্য বিজয় বাবুর মনে আছে, আমরা বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভা অন্বেষণ করিতেছি। সেই নবরত্নের মধ্যে অবশ্য কবি কালিদাস আছেন।

শুনিয়াছি, বিক্রমাদিত্যের নবরত্নসভা ছিল। কিন্তু কেবল শোনা কথায় নির্ভর না করিয়া কিংবদন্তির মূলে সত্য আছে কি না, তাহাই আমাদের আলোচ্য। যিনি কিংবদন্তিটা শ্লোকবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাকে পাওয়া গিয়াছে। তাঁহাকে ১ নম্বর সাক্ষী বলা যাইতে পারে। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন, তাঁহার নাম কালিদাস, তিনি ধন্বন্তরিক্ষপণকাদি নবরত্নের এক রত্ন, তিনি মানবেন্দ্র শ্রীবিক্রমার্কনৃপতির সখা, তিনি রঘুবংশাদি কাব্যত্রয়ের কর্ত্তা, এবং তিনি

বর্ষৈঃ সিন্ধুর দর্শনাম্বরগুণৈর্যাতে কলৌ সম্মিতে

কলির ৩০৬৮ বর্ষগতে জ্যোতির্বিদাভরণ গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। এই বিক্রমার্ক কে? এই সাক্ষী বলেন, সেই বিক্রমার্ক যাঁহার রাজধানী উজ্জয়িনীতে ছিল, যে উজ্জয়িনীতে মহাকাল-মহেশযোগিনী সমাশ্রয় করিয়াছিলেন, যে বিক্রমার্ক রুমদেশাধিপতি শকেশ্বরকে মহাযুদ্ধে জয় ও গ্রহণ করিয়া মুক্ত করিয়াছিলেন, যাঁহার সভায় নবরত্ন ব্যতীত মণিরঙ্গদত্ত, জিষ্ণু, ত্রিলোচন, হরি, সত্য, বরাহমিহির, শ্রুতসেন, বাদরায়ণ, মণিথ, কুমারসিংহ, শ্রীকালতন্ত্রকবি প্রভৃতি অনেক সভাসদ ছিলেন, ইত্যাদি।

প্রাচীনকালের নবরত্নসভার সাক্ষীর মধ্যে এই এক সাক্ষী ব্যতীত অপর সাক্ষী বিজয় বাবু উপস্থিত করেন নাই। এই সাক্ষীর কথায় বিশ্বাস করিতে হইলে রঘুবংশ খ্রীঃ পূঃ ১ম শতাব্দীর হয়। ইঁহার উক্তির কিয়দংশ বিশ্বাস করিব, কিয়দংশ বিশ্বাস করিব না, এ যুক্তি সঙ্গত বোধ হয় না। কিয়দংশ বিশ্বাস করিতে বা না করিতে হইলে সেই বিষয়ের অপর প্রমাণ আবশ্যক।

উক্ত সাক্ষী স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন যে, তিনি খ্রীঃ পূঃ ১ম শতাব্দীতে ছিলেন।* আমার প্রতিবাদে এই কথারই উল্লেখ ছিল। হয়ত নবরত্নসভা ছিল, হয়ত বিভিন্ন সময়ের খ্যাতনামা কয়েকজন পণ্ডিত কিংবদন্তির মূল হইয়াছিলেন। এই দুই কল্পের মধ্যে কোন্‌টি সত্য তাহা এখনও বুঝিতে পারিতেছি না। বিজয় বাবু জিজ্ঞাসা করিয়াছেন, প্রবাদের নবরত্নের মধ্যে "চারিটি পণ্ডিত পাইলাম; পাঁচটির নিদর্শন পাইলাম না। তাহাতে কি প্রমাণ হয়, সে পাঁচটি আদৌ সে সময়ে ছিলেন না।" আমি বলি, তাহাতে প্রমাণও হয় না, অপ্রমাণও হয় না। মনে রাখিতে হইবে, আমরা প্রবাদের মূল অন্বেষণ করিতেছি, সুতরাং প্রবাদকেই সাক্ষী করা যাইতে পারে না।

উপরে স্বীকার করা গিয়াছে যে, চারিজন পণ্ডিতের আবির্ভাবকাল নিশ্চিত হইয়াছে। বাস্তবিক কি তাই? এক বরাহ ব্যতীত কালিদাস, অমরসিংহ ও বররুচির কাল নিঃসন্দেহে জানা গিয়াছে কি? বিজয়বাবু আমদের ইতিহাস উদ্‌ঘাটন করিতে অনিচ্ছুক। সেই জন্যই আলোচ্য বিষয়ে পূর্ব্ব পূর্ব্ব পণ্ডিতদের সিদ্ধান্ত উল্লেখ করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম। কালিদাসের সময়ই ধরুন। বড় বড় পণ্ডিতদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন, কালিদাস ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে, কেহ কেহ বলেন পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে ছিলেন। মনোমোহন বাবু বলেন, রঘুবংশ খ্রীঃ ৪৬৫—৪৮৫ অব্দের মধ্যে রচিত। বিজয় বাবু বলেন, কালিদাস ৬ষ্ঠ শতাব্দীর লোক, তাহার পূর্ব্বের হইতে পারে না। কিন্তু কোন পণ্ডিতই বিনা প্রমাণে কথা কহেন নাই। যখন পণ্ডিতে পণ্ডিতে তর্ক, তখন আমার ন্যায় অনভিজ্ঞের পক্ষে মধ্যপথ আশ্রয় করাই শ্রেয়ঃ। ঐ সকল কালের মধ্য লইলে বোধ হয় যে, কালিদাস পঞ্চম শতাব্দীতে ছিলেন। তিনি ঐ শতাব্দীর শেষেও থাকিতে পারেন, এমন কি, যদি কেহ জোর করিয়া বলেন যে, কালিদাস ৬ষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমেও ছিলেন, তাঁহারও অনুমান মিথ্যা বলিতে পারি না। আমার বিবেচনায় এইরূপ স্থূল কালনির্দ্দেশ ব্যতীত গত্যন্তর নাই। দুঃখের বিষয় বিজয়বাবুর সূক্ষ্মগণনার বিরোধী হইবার সামর্থ্য আমার নাই। বোধ করি, তিনিও তাঁহার সমান প্রতিবাদী না পাওয়াতে দুঃখিত হইয়াছেন। এজন্য তাঁহার নিকট মনোমোহন বাবুকে উপস্থিত করিয়াছিলাম।

জানি, অসমযুদ্ধে দুর্ব্বলেরই পরাজয় হয়। তথাপি বিজয়বাবুর সাক্ষীকে দুই একটা জেরা করিতে চাই। এবার তিনি ছয়টি সাক্ষী উপস্থিত করিয়াছেন। তন্মধ্যে তিনি ৫ ও ৬ নং সাক্ষীর কথায় জোর দিতে চান না। উপরে নবরত্ন সম্বন্ধে ৪নং সাক্ষীকে জেরা করা গিয়াছে। ২নং সাক্ষীকে মনোমোহন বাবু জেরা করিলেই ভাল হয়।

* বাস্তবিক কিন্তু ছিলেন না।

এজন্য তাঁহার নিমিত্ত রাখিলাম। এখন ১ ও ৩নং সাক্ষী।

১নং সাক্ষী প্রাকৃতভাষার পূর্ণবিকাশ-কাল। বিজয় বাবু বলেন, "৫ম শতাব্দীর পূর্ব্বে পূর্ণবিকাশ হইবার কোনও প্রমাণ কোথাও পাওয়া যায় না। কালিদাসের সময়ে প্রাকৃতভাষা সাহিত্যে ব্যবহৃত হইবার উপযোগী ছিল, তাহার প্রমাণ তাঁহার নাটকে।" এখানে 'অত-এব' টানিবার পূর্ব্বে প্রথম প্রতিজ্ঞাটি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করি, অভাবাত্মক প্রমাণ হইতে ভাব সিদ্ধ হয় কি? অঙ্গীকার করা গেল যেন, ৫ম শতাব্দীর পূর্ব্বের প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ইহা হইতে কি বলিতে পারা যায়, ঐ শতাব্দীর পূর্ব্বে প্রাকৃতভাষার বিকাশ বা পূর্ণ বিকাশ হয় নাই?* ভাষার আরম্ভ, বিকাশ বা শেষ কাল নির্দ্দেশ করা দুরূহ মনে করি। প্রমাণ য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক বৈদিক সাহিত্যের কাল নির্দ্দেশে মতভেদ।

৩নং সাক্ষী দুইটি। (১) রঘুবংশে হূনসংবাদ, (২) চন্দ্রগ্রহণ কারণ বর্ণন। মনোমোহন বাবু ও বিজয় বাবু উভয়েই হূনসংবাদটি উপস্থিত করিয়াছেন। এখানে আদম ও হবার কথা নহে, ইতিহাসের কথা। অবশ্য সকল ইতিহাসই অভ্রান্ত নহে। যাহা হউক, সম্প্রতি

---

* প্রাকৃত ভাষার বিকাশ এবং হর্ষবিক্রমাদিত্যের কাল সম্বন্ধে মনোমোহন বাবুকে অভিজ্ঞসাক্ষী স্বরূপ উপস্থিত করিতেছি। আমার প্রশ্ন ও তাঁহার উত্তর নিম্নে প্রদত্ত হইল:

১ম প্রশ্ন—পঞ্চম শতাব্দীর পূর্ব্বে প্রাকৃত ভাষার বিকাশ হইয়াছিল কি না, ও ইহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় কি না।

উঃ—হাঁ। যথেষ্ট প্রমাণ আছে।

"প্রাকৃত ভাষা" এই কথায় গ্রাম্য বা চলিত ভাষা, কি "শুদ্ধ প্রকৃত বা সাধু" (Literary Prakrita) বুঝিতে হইবে?

শুদ্ধ প্রাকৃত (Literary Prakrita) বহু প্রাচীন। উদাহরণ, ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যে যথেষ্ট পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মণ সাহিত্য—পাতঞ্জলীর মহাভাষ্যে কিছু কিছু, পাণিনীয় শিক্ষায় বিস্তর প্রাকৃত কথার উদাহরণ আছে। আমার বোধ হয়, স্ত্রীলোকের প্রাকৃত বলা, অপভ্রংশ ও অন্যান্য প্রাকৃত ভাষার উল্লেখ, মহাভারত, বৌধায়ন প্রভৃতি প্রাচীন ধর্ম্মসূত্র, মনু, যাজ্ঞবল্ক্য ইত্যাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে উল্লেখ আছে। মৃচ্ছকটিকের সময় এখনও ঠিক হয় নাই। তবে তাহা যে চতুর্থ শতাব্দীর পুর্ব্বতন,এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। শালিবাহনের সপ্তশতীর সময় ঐ রকম। তবে সম্ভবতঃ পঞ্চম শতাব্দীর পুর্ব্ববর্ত্তী। সপ্তশতীর আগাগোড়া প্রাকৃত। মৃচ্ছ-কটিকের প্রাকৃতের ত কথাই নাই।

বৌদ্ধ সাহিত্য—ব্রাহ্মণগণের সংস্কৃত ভাষা থাকাতে প্রাকৃত ভাষা বিশেষ আবশ্যক হয় নাই। উহার পূর্ণ বিকাশের ভূরি ভূরি প্রমাণ বৌদ্ধ ও জৈন প্রাচীন সাহিত্যে পাওয়া যায়। বৌদ্ধগণের সর্ব্বপ্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র ত্রিপিটক, ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাব্য ধম্মপদ, আগা-গোড়া পালি। পালি হয় মাগধীর অপভ্রংশ, না হয় স্বতন্ত্র প্রাকৃত ভাষা। ললিতবিস্তারে বিস্তর প্রাকৃত গাথা উদ্ধৃত হইয়াছে। ত্রিপি-টকের সময়, খ্রীষ্টপূর্ব্ব ৩য় শতাব্দীর পর নহে, ধম্মপদ ও ললিত-বিস্তার খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দীর পর নহে।

জৈন সাহিত্য—জৈন প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্র সকল সূত্র নামে খ্যাত, ও আগাগোড়া অর্দ্ধমাগধী প্রাকৃতে রচিত; যথা, ভগবতীসূত্র, নন্দি-সূত্র, উত্তরাধ্যায়নসূত্র, সূত্রকৃতাঙ্গসূত্র, দশবৈকালিকসূত্র, ইত্যাদি। সূত্রগুলি সাধারণতঃ ১ম বা ২য় শতাব্দীর পরবর্ত্তী নহে।

সাহিত্য ছাড়া, লিপি, মুদ্রা, পুঁথি ইত্যাদিতে প্রাকৃত ভাষার যথেষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়।

অশোকের সমস্ত লিপি (শিলা বা স্তম্ভ) মাগধী প্রাকৃতে রচিত, কিংবা প্রাদেশিক প্রাকৃতে পরিবর্ত্তিত। এতদ্ব্যতীত প্রাচীন আন্ধ্র শিলা-লিপি, মথুরার কুষাণরাজবংশীয় লিপি, উড়িষ্যা বা বোম্বাইর প্রাচীন শিলালিপি, সাঞ্চী, ভারহুত বা অমরাবতী প্রভৃতির পুরাতন প্রস্তর-লিপি প্রায় কোন না কোন প্রাকৃত ভাষায় লিখিত। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পুর্ব্ববর্ত্তী অধিকাংশ লিপিই পূর্ণ প্রাকৃত, বা প্রাকৃতসংস্কৃত-মিশ্রিত ভাষায় রচিত হইয়াছিল।

প্রাচীন মুদ্রাসমূহেও এইরূপ; যথা, বাকট্রিয়ান, কুষাণ, আন্ধ্র, ক্ষত্রপ মুদ্রাবলী। প্রাচীন হস্তলিখিত পুঁথিতেও এইরূপ; যথা, বাওয়ার পুঁথি, মধ্য এসিয়ার পুঁথি। বাওয়ার পুঁথির সময় আনুমানিক ৫ম শতাব্দী, সুতরাং তদ্ধৃত গ্রন্থ আরও প্রাচীন।

২য় প্রশ্ন—হর্ষবিক্রমাদিত্য কোন সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন?

উঃ—ইতিহাসে কয়েক হর্ষের উল্লেখ আছে। সর্ব্বপ্রসিদ্ধ ও সম্ভবতঃ সর্ব্বপ্রাচীন হর্ষরাজ হর্ষবর্দ্ধন শিলাদিত্য নামে বিখ্যাত। তাঁহার সময়ে চীনপরিব্রাজক হাওন্ থসাঙ্গ ভারতবর্ষে আসেন। শ্রীহর্ষ-চরিতকার বাণভট্ট তাঁহার সভামাত্য ছিলেন। রত্নাবলী এবং নাগা-নন্দ তাঁহার সভায় অভিনীত হইত। তাঁহার আনুমানিক সময় সপ্তম শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ (৬০৬—৬৪৮ খৃষ্টাব্দ)। তাঁহার "বিক্রমাদিত্য" উপাধি থাকা আমার স্মরণ হয় না। আলবেরুনি তাঁহার একটি সনের (শ্রীহর্ষাব্দ) উল্লেখ করিয়াছেন। কান্যকুব্জ সম্ভবতঃ তাঁহার রাজ-ধানী ছিল। রাজতরঙ্গিনীতে মাতৃগুপ্ত সম্বন্ধে এক হর্ষদেবের উল্লেখ আছে। কিন্তু তাহা প্রবাদমূলক, এখনও ইতিহাস দ্বারা প্রমাণিত হয় নাই।

এ কথায় 'হাঁ' 'না' বলিতে পারিলাম না। ৫ম শতাব্দীর পূর্ব্বে হুনেরা নাকি এদেশের পশ্চিম সীমায় বাস করে নাই। এ কথাটি সত্য হইলে কালিদাসের সময় ঠিক হইতে পারিবে।

কালিদাসের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে মনীষী প্রত্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বহু আলোচনা করিয়াছেন। বম্বে প্রদেশের নন্দরসিকার-সম্পাদিত রঘুবংশ ও মেঘদূত, কালে-সম্পাদিত শকুন্তলা এবং কাশীনাথবাপু-পাঠক-সম্পাদিত মেঘদূতে পণ্ডিতগণের মতামত সবিস্তরে বর্ণিত আছে। এই কয়েকখানি গ্রন্থের ভূমিকা পাঠ করিতে বিজয়বাবুকে অনুরোধ করিয়া আমি প্রতিবাদ-ক্ষেত্র হইতে নিবৃত্ত হইতেছি।

এদেশে চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণ-জ্ঞান।

বিজয় বাবু বলেন, পৃথিবীর ছায়া দ্বারা চন্দ্র গ্রস্ত হয়, এ তত্ত্ব আর্য্যভট প্রথমে আবিষ্কার করেন। এই কারণের উল্লেখ রঘুবংশে আছে। সুতরাং আর্য্যভটের পরে কালিদাস। এই প্রথম আবিষ্কারের কথাটা নূতন শুনিতেছি। এজন্য এ বিষয়ে কিছু অধিক আলোচনা করিতে চাই।

আর্য্যভট ৩৯৮ শকে অর্থাৎ ৪৭৬ খ্রীষ্টাব্দে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার ২৩ বর্ষ বয়ঃক্রমে তিনি তাঁহার জ্যোতিষতন্ত্র লেখেন। অতএব, বিজয় বাবুর অনুমান সত্য হইলে ৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে এদেশের লোকেরা গ্রহণের প্রকৃত কারণ জানিত না। আমার অনুমানে কথাটা সত্য নহে।

জ্যোতিষগ্রন্থেই এ বিষয়ের স্পষ্ট প্রমাণ পাইবার কথা। কিন্তু হায়! আর্য্যভটের পূর্ব্বের জ্যোতিষগ্রন্থ অন্ধকারসমাচ্ছন্নই বটে। কিন্তু অন্ধকারের মধ্যে হাতড়াইতে হাতড়াইতে কখন কখন আকাঙ্ক্ষিত দ্রব্যও হাতে ঠেকে। এস্থলে এই প্রকার হাতড়ান ব্যতীত গত্যন্তর নাই।

৪৯৯ খ্রীষ্টাব্দে আর্য্যভট এবং তাঁহার ৬ বৎসর পরে বরাহ চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণের কারণ তাঁহাদের জ্যোতিষগ্রন্থে স্পষ্ট লিখিয়া গিয়াছেন। বরাহ আর্য্যভটের নাম শুনিয়াছিলেন; সম্ভবতঃ আর্য্যভটের গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন। সুতরাং আর্য্যভটকেই আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। আর্য্যভটের পূর্ব্বের গ্রন্থ ঠিক পাওয়া যায় না।

কিন্তু পাওয়া যায় না বলিয়া, ছিল না বলিতে পারা যায় না। ফলে তাহাই ঘটিয়াছে। বরাহ চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণের কারণ, গ্রহণগণনা, ছেদ্যক বিধি (Graphic Construction) বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি নিজের মতে গণনা করেন নাই; পৌলিশ মতে চন্দ্রসূর্য্য, রোমকমতে সূর্য্য, এবং সূর্য্যসিদ্ধান্ত মতে চন্দ্রসূর্য্যগ্রহণ গণনা, এবং ছেদ্যক বিধি দ্বারা গ্রহণ প্রদর্শন (অনুবর্ণন) করিয়াছেন।

গ্রহণ বিষয়ে আর্য্যভটকে বরাহে দেখিতে পাই না। কিন্তু অন্যত্র বরাহ আর্য্যভটের মত উল্লেখ করিয়াছেন। অতএব বোধ হয়, আর্য্যভট গ্রহণকারণ আবিষ্কার করেন নাই। তাঁহার পূর্ব্বেই একথা এদেশে জানা ছিল। বস্তুতঃ তাই। গ্রহণগণনায় পৌলিশ, রোমক, ও সূর্য্যসিদ্ধান্ত পাইতেছি। বরাহ ঐ তিন গ্রন্থ হইতে সার সংকলন করিয়াছিলেন। সুতরাং বরাহের (৫০৫ খ্রীঃ) পূর্ব্বেই অন্ততঃ ঐ তিন জন গ্রহণকারণ সবিশেষ অবগত ছিলেন। ইহাঁরা কোন্ সময়ে ছিলেন, তাহা ঠিক করিয়া বলিবার উপায় প্রায় নাই। যে সময়েই হউক, সূর্য্যসিদ্ধান্তের পূর্ব্বে রোমক ও পৌলিশ, রোমকের পূর্ব্বে পৌলিশ, ইহা সকলেই স্বীকার করেন। কারণ বরাহ এ কথা ইঙ্গিত করিয়াছেন, গণনাক্রমেও এইরূপ পৌর্ব্বাপর্য্য জানা যায়। সৌভাগ্যক্রমে সূর্য্যসিদ্ধান্তেই উহার রচনা কালের একটা নিদর্শন পাওয়া যায়। এই নিদর্শনে বলিতে পারি যে, উহা খ্রীষ্টাব্দ ২য় শতাব্দীতে ছিল।* এই সময়কে উহার রচনাকালের উত্তর সীমা মনে করা যাইতে পারে। অতএব জানা যাইতেছে যে, খ্রীঃ ২য় শতাব্দীর পূর্ব্বে এদেশের জ্যোতিষীরা গ্রহণকারণ জানিতেন। কারণ রোমক ও পৌলিশ সূর্য্যসিদ্ধান্তের পূর্ব্বের গ্রন্থ। [এখানে আর একটি কথা মনে হইতেছে। আর্য্যভটের পূর্ব্বের গ্রন্থ পাওয়া যায় না বলিয়া য়ুরোপীয়

* যাঁহারা আমাদের জ্যোতিষের ইতিহাস আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের চক্ষে এই নিদর্শনটি পড়ে নাই। এখানে ইহার বিস্তৃত আলোচনা সম্ভবপর নহে। এ বিষয়ের আভাষ সিদ্ধান্তদর্পণের ইংরাজি মুখবন্ধে দ্রষ্টব্য

পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, আমাদের প্রকৃত জ্যোতির্গণিত তৎপূর্ব্বে ছিল না! অর্থাৎ অভাব হইতে ভাব অনুমান।]

মহাভারতের মধ্যেও সূর্য্যগ্রহণের কারণ ব্যক্ত আছে। 'আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা'য় সে কারণ অন্বেষণ করিতে হয় না, স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। বনপর্ব্বে (২২৩ অঃ) মার্কণ্ডেয়সমস্যাপর্ব্বাধ্যায়ে কার্ত্তিকেয়জন্মবৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। সেখানে দেবাসুর সংগ্রামের পূর্ব্বে ইন্দ্র দেখিতে পাইলেন, "মহাদ্যুতি ভাস্কর উদয়াচলে সমুদিত এবং চন্দ্রমা তাঁহার শরীরে প্রবিষ্ট হইতেছেন। সেই রৌদ্র মুহূর্ত্তে অমাবস্যা সমুপস্থিত হইল, উদয়াচলে দেবাসুরের ঘোরতর সংগ্রাম হইতে লাগিল। প্রাতঃকাল রক্তবর্ণ মেঘবৃন্দে আবৃত, ও পূর্ব্বদিগ্‌ভাগ লোহিতবর্ণ হইল। * * * পুরন্দর শশিদিবাকরের একতা ও সেই রৌদ্র সমবায় সমবলোকন করিয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন, সূর্য্য ও চন্দ্রমার ঘোর পরিবেশ দৃষ্ট হইতেছে, এই রজনীর অবসানে অবশ্যই মহাযুদ্ধ হইবে; * * * সূর্য্যের সহিত চন্দ্রে অদ্ভুত সমাগম হইতেছে।" [পর দিন প্রতিপদ্ তিথিতে স্কন্দের জন্ম এবং শুক্লষষ্ঠীতে দেবাসুরের সংগ্রাম হয়।]

*এখানে মূল মহাভারত মিলাইয়া কালীপ্রসন্ন সিংহ মহোদয়ের অনুবাদ অবিকল উদ্ধৃত করিলাম। দেবাসুরের সংগ্রাম, কার্ত্তিকেয়ের জন্ম প্রভৃতির ব্যাখ্যা যাহাই হউক, ইন্দ্র একদিন প্রাতঃকালে সূর্য্যের সম্পূর্ণ গ্রাস দেখিয়াছিলেন, এবং সেই গ্রাসের কারণ চন্দ্র বলিয়া জানিয়াছিলেন।

বোধ করি, ঋক্‌সংহিতাতেও অত্রি ঋষি গ্রহণের কারণ কতকটা অনুমান করিয়াছিলেন। "হে সূর্য্য! যখন আসুর স্বর্ভানু তোমাকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করিয়াছিল, নিজ স্থাননিরূপণে অসমর্থ হতবুদ্ধি ব্যক্তি যেরূপ দৃষ্ট হয়, তৎকালে ত্রিভুবনও সেইরূপ লক্ষিত হইয়াছিল।" "হে ইন্দ্র! যখন তুমি সূর্য্যের অধঃস্থিত স্বর্ভানুর সেই সকল মায়া (অন্ধকার) দূরে অপসারিত করিয়াছিলে, তখন অত্রি চারিটি ঋকের দ্বারা কার্য্যবিঘাতক অন্ধকার দ্বারা সমাচ্ছন্ন সূর্য্যকে প্রকাশিত করিলেন।" "আসুর স্বর্ভানু অন্ধকার দ্বারা সূর্য্যকে আবৃত করিল, অত্রিপুত্রগণ অবশেষে তাঁহাকে মুক্ত করিয়াছিলেন, আর কেহই সমর্থ হয় নাই।" (ঋক্ সং ৫।৪০ রমেশ বাবুর অনুবাদ)। এখানে সূর্য্যের পূর্ণ গ্রাসের উল্লেখ পাওয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে 'অধঃস্থিত আসুর স্বর্ভানু'কেও পাওয়া যায়।

এই কয়েক ঋক্ লইয়া বড় বড় পণ্ডিতেরা তর্ক বিতর্ক করিয়াছেন। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক মহাশয় উপরি উক্ত 'চারিটি ঋকের' (তুরীয়েণ্, ব্রহ্মণা) বিস্তৃত আলোচনা করিয়া বলেন যে, এখানে অত্রি ঋষি যন্ত্রবিশেষ দ্বারা সূর্য্যগ্রহণ ও গ্রহণের মোক্ষকাল পূর্ব্বেই অবগত হইতে পারিয়াছিলেন। এই ঘটনা হইতে চন্দ্রের নাম অত্রিনেত্রোদ্ভব, আত্রেয় প্রভৃতি হইয়াছে।

আর একটি কথা বলিয়া ক্ষান্ত হইতেছি। ঋগ্‌বেদের বর্ণনায় ভয়ের লক্ষণ দেখিতে পাই না। সূর্য্যগ্রহণ অনেক হয়, কিন্তু স্থল বিশেষে অল্প দৃশ্য হয়, আরও অল্প পূর্ণ গ্রহণ। কিন্তু ঋগ্‌বেদের বর্ণনা হইতে জানা যায়, এরূপ গ্রহণ অত্যাশ্চর্য্য কিংবা ভয়জনক বলিয়া লোকেরা মনে করিত না। অথচ কেবল অত্রি ঐ গ্রহণে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। অতএব মনে করা অন্যায় নহে যে, অত্রি এবং তাঁহার বংশধরগণ কোন প্রকার গ্রহণ গণনা জানিতেন। আর একটি বিষয় দ্রষ্টব্য। স্বর্ভানু সূর্য্যকে গ্রাস করে নাই, তমঃদ্বারা সূর্য্যকে আচ্ছাদিত করিয়াছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৪।০।৫) দেখা যায়, অমাবস্যা তিথিতে চন্দ্র সূর্য্যে প্রবেশ করে, পরে আদিত্য হইতে চন্দ্রের জন্ম হয়। এইরূপ, ৺ শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিত অন্যান্য ব্রাহ্মণ হইতে দেখাইয়াছেন যে, স্বর্ভানু সূর্য্যকে তমঃদ্বারা বিদ্ধ করিলে গ্রহণ হয়, এইরূপ জ্ঞান ব্রাহ্মণের ঋষিগণের ছিল।

মহাভারতে রাহুগ্রস্ত দিবাকরের উল্লেখ আছে। কিন্তু ক্ষীরোদসমুদ্র মন্থনের পর দেবাসুরের মধ্যে কলহ উপস্থিত হইলে রাহুর গ্রহত্ব প্রাপ্তি হয়। তৎপূর্ব্বে অসুর রাহু ছিল না। মহাভারতের বর্ণনায় পূর্ব্বকালের গ্রহণ দেখিতে পাই, মহাভারত রচনা কালের নহে। ভারত যুদ্ধের পূর্ব্বে দেবাসুরের সংগ্রাম হইয়াছিল, এবং সেই সংগ্রাম উপলক্ষে গ্রহণের কথা আসিয়াছে। এই কাল সম্বন্ধে একটা অনুমান করিতে হইলে খ্রীষ্টজন্মের ৪০০০ বর্ষ পূর্ব্বে

যাইতে হইবে। সে যাহা হউক, দেখা গেল সাধারণ লোকেরা গ্রহণের কারণ রাহুকে জানিলেও, সেকালে এমন দুই একজন লোক ছিলেন যাঁহারা জানিতেন যে, সূর্য্যে চন্দ্র প্রবেশ করিলে সূর্য্যগ্রহণ হয়। অবশ্য বিজয় বাবু এ তর্ক তুলিবেন না যে, মহাভারতে চন্দ্রগ্রহণের কারণ লিখিত নাই, অতএব মহাভারতরচনার সময় এই কারণ এদেশে অজ্ঞাত ছিল। কর্কশ তর্কশাস্ত্র কলনে কোন উপকার নাই। তথাপি বলিতে বাধ্য যে, বিজয় বাবু নিজেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব পণ্ডিতদের সিদ্ধান্ত মানেন না, স্থল বিশেষে আমিও মানিতে চাই না। কাজেই কখন কখন একেবারে আদমের সৃষ্টির ইতিহাস না উল্টাইলে যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিতে হয়। এই তিমির নাশের নিমিত্ত বিজয় বাবুর ধারাবাহিক আলোচনা পাঠ করিতে উৎসুক রহিলাম।

খাসিয়া জাতি।

বিদেশীয় সভ্যতার আলোক প্রাপ্ত হইয়া ভারতের যে সকল অসভ্যজাতি অপেক্ষাকৃত অল্প কাল মধ্যে নানা বিষয়ে উন্নতি সাধন করিতে সমর্থ হইয়াছে, খাসিয়াজাতি তাহাদেরই অন্যতম। এই সভ্যতার শক্তি অল্পে অল্পে বিস্তৃত হইয়া গত ৩০।৩৫ বৎসরের মধ্যে খাসিয়াজাতিকে নূতন করিয়া গঠন করিয়াছে। যাহাদের পুরাতন কিছু থাকে, তাহাদের মধ্যে বিদেশীয় কোনও নূতন ভাব সহজে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারে না। ধর্ম্মশাস্ত্র, কোনওরূপ সামাজিক কঠোর নিয়ম, অথবা প্রাচীন কোনও বদ্ধমূল সংস্কার না থাকাতেই রক্ষণশীলতা এই জাতির মধ্যে স্থান পায় নাই। খাসিয়াগণ বিজাতীয় রীতিনীতি এবং সভ্যতার উপকরণ অবাধে গ্রহণ করিতে পারিতেছে। সেইজন্য পরিবর্ত্তনের স্রোত নিরন্তর অপ্রতিহতভাবে প্রবাহিত হইয়া একদিকে খাসিয়াদিগকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছে, অন্যদিকে তাহাদিগের সরল ও স্বাভাবিক ভাবকে বিকৃত করিয়া তাহাদিগকে জীবনসংগ্রাম এবং সভ্যতাজনিত নানা প্রকার কুফলের সম্মুখীন করিতেছে। খাসিয়াজাতি ক্রমে ক্রমে সভ্যজগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে, এবং অনেক ইংরাজ কর্ম্মচারী ইহাদের ইতিহাসকে বিস্ময়াবহ ও আলোচনার যোগ্য বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। বিগত ১৩।০ বৎসর এই জাতির মধ্যে বাস করিয়া তাহাদের সম্বন্ধে আমার অনেক দেখিবার ও জানিবার সুবিধা হইয়াছে। এই অভিজ্ঞতার সঙ্গে সরকারী কাগজপত্রে প্রকাশিত বিবরণ সংযুক্ত করিয়া এই প্রবন্ধ লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

ভৌগোলিক এবং প্রাকৃতিক অবস্থা।

ইংরাজশাসনাধীনে খাসিয়া ও জয়ন্তিয়া পাহাড় এক জেলাভুক্ত হইয়াছে। এই জেলা অতিশয় ক্ষুদ্রায়তন। ইহার পরিমাণ ৬,০২৭ বর্গমাইল মাত্র এবং ইহাতে সর্ব্বশুদ্ধ ১,৮৪০ টী মাত্র গ্রাম আছে। বিদেশীয়গণকে লইয়া একত্রে গণনা করিয়া গত ১৯০১ খৃষ্টাব্দের সেন্‌সসে ইহার অধিবাসীর সংখ্যা দুইলক্ষ দুইহাজার আড়াই শত মাত্র নির্দ্ধারিত হইয়াছে। খাসিয়া পাহাড়ের উত্তরে কামরূপ ও নওগাং জেলা, দক্ষিণে শ্রীহট্ট জেলা, পূর্ব্বে উত্তর কাছাড়, নাগাপাহাড় ও কপিলী নদী এবং পশ্চিমে গারোপর্ব্বত। অধিকাংশ স্থান পর্ব্বত-পৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া সমস্ত বৎসর ব্যাপিয়া সে সকল স্থানে শীত থাকে, এবং উচ্চ উচ্চ স্থানে শীতকালে জল জমিয়া যাইতে দেখা যায়। চেরাপুঞ্জীতে পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বৃষ্টি নিপতিত হয়। এ বৎসরে একদিন ২৯ ইঞ্চি এবং অপর দুই দিন ২৩ ইঞ্চি করিয়া বৃষ্টি জল পড়িয়াছিল। এই তিন দিনের নিপতিত জলের সমষ্টি যত হয়, বঙ্গদেশের অনেক স্থানে সমস্ত বৎসর ধরিয়াও তাহার অধিক বৃষ্টি পতিত হয় না। চৈত্র মাসের শেষভাগে বর্ষা আরম্ভ হইয়া আশ্বিন মাসের মধ্য বা শেষ ভাগে শেষ হয়। বর্ষাকালে সময়ে সময়ে ৮।১০ দিন পর্য্যন্ত আকাশ মেঘে আচ্ছন্ন হইয়া দিন রাত্রি অবিশ্রাম মূষলধারে বৃষ্টি পড়িতে থাকে। তখন ঘরের বাহির হওয়া একপ্রকার অসম্ভব হয়, সূর্য্যের মুখ একবারেই দেখিতে পাওয়া যায় না এবং আলো জ্বালিয়া গৃহের মধ্যে কাজ করিতে হয়। বৃষ্টির প্রাবল্যবশতঃ চেরাপুঞ্জীর গৃহনির্ম্মাণপ্রণালীও স্বতন্ত্র প্রকার হইয়াছে।

খাসিয়া পাহাড়ের প্রাকৃতিক দৃশ্য অতিশয় মনোরম। কয়েক বৎসর হইল ভারতের প্রধান সেনাপতির সফরানুগামী (tour clerk) একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক এই পাহাড়ে আসিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি ভারতবর্ষের অন্তর্গত গভর্ণমেণ্টের সকল শৈলাবাস গুলি দেখিয়া আসিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন যে চেরাপুঞ্জীর নিকটবর্ত্তী অধিত্যকার মধ্যে তিনি যে সুন্দর দৃশ্য দেখিয়াছেন, কুত্রাপি আর সেরূপ তাঁহার নয়নগোচর হয় নাই। বিধাতার হস্ত বিচিত্র সাজে এই পাহাড়কে সাজাইয়া রাখিয়াছে। শত শত পর্ব্বতশৃঙ্গ ঊর্দ্ধাকাশে মস্তক উত্তোলন করিয়া যেন তাঁহারই জয় ঘোষণা করিতেছে। দূর হইতে দেখিলে কোন কোন স্থানে বোধ হয় যেন পাহাড়ের তরঙ্গ খেলিতেছে। শিলং শৃঙ্গই খাসিয়াপাহাড়ের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চ পর্ব্বত; ইহার উচ্চতা ৬৪৪৯ ফুট। নির্জ্জন অরণ্যভূমিকে খাসিয়াগণ উপদেবতাদিগের আবাসস্থান বলিয়া বিশ্বাস করে। এজন্য বহুকাল হইতে তাহারা তাহার একটীও বৃক্ষ কর্ত্তন করিতে সাহস করে নাই। সেই সকল পুরাতন নিবিড় অরণ্যরাজীর নীলিমাময় সৌন্দর্য্যে যেন অধিত্যকা সকল উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িতেছে। শত শত স্রোতস্বতী পাষাণসংঘর্ষণে ফেনরাশি উদ্গিরণ করিতে করিতে গিরিসঙ্কট বাহিয়া গভীর নির্ঘোষে নিম্নভূমির দিকে ছুটিয়াছে। অনেক জলপ্রপাত বিগলিত রৌপ্যধারার ন্যায় পাহাড়ের গাত্র বাহিয়া নিপতিত হইতেছে। মৌসমাই নামক স্থানের জলপ্রপাত* উচ্চতাতে পৃথিবীর সকল জলপ্রপাতকে পরাস্ত করিয়াছে। কাছাড় জেলার প্রান্তভাগে খাসিয়াপাহাড়েরই মধ্যে কপিলী নদীর তীরে সুমির নামক স্থানে একটী উষ্ণপ্রস্রবণ আছে। পাহাড়ের স্থানে স্থানে গভীর গহ্বর দেখা যায়। চেরাপুঞ্জীর নিকটে এক বহুদূরব্যাপী প্রকাণ্ড গহ্বর আছে। রূপনাথ নামক স্থানের গহ্বর মৃত্তিকার নিম্নে এত অধিক দূর গিয়াছে যে তাহা হইতে এক প্রবাদ প্রচলিত হইয়াছে যে পূর্ব্বকালে একদল সৈন্য ভারত আক্রমণার্থ চীনদেশ হইতে এই পথ দিয়া আসিয়াছিল।

* ১৮৯৭ সালের ভীষণ ভূমিকম্পের পরে ইহা ক্ষীণ আকার ধারণ করিয়াছে।

পূর্ব্ব ইতিহাস।

খাসিয়াজাতির পূর্ব্ব ইতিহাস সম্বন্ধে নিশ্চয় কিছু জানিবার উপায় নাই। মুখাকৃতি দেখিয়া তাহাদিগকে মঙ্গোলীয় বংশসম্ভূত বলিয়া সকলেই বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে "ষ্টেটস্‌ম্যান" পত্রিকায় লিখিত হইয়াছিল যে খাসিয়াগণ ৪০০ বৎসর পূর্ব্বে শ্রীহট্টে বাস করিত। তাহারা সাহ জীলালের অনুচরগণ কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া পাহাড়ে আসিয়াছে।† কোন্ প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া সম্পাদক যে এরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বলা যায় না। ৪০০ বৎসরের অনেক পূর্ব্বে যে খাসিয়াগণ আসিয়া পাহাড় অধিকার করিয়াছে তাহার যথেষ্ট নিদর্শন দেখা যায়। এত অল্প সময়ের মধ্যে আচার ব্যবহারের এত পরিবর্ত্তন কখনই হইতে পারে না এবং ভাষাও এরূপ স্বতন্ত্র আকার ধারণ করিতে পারে না। অনেক অনুসন্ধান ও গবেষণার পরে অল্পদিন হইল ভাষাতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতগণ এই মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন যে চীনের উত্তরপশ্চিমাংশে হংহো এবং ইয়াংসিকিয়াং নদীদ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী ভূভাগ হইতে সময়ে সময়ে কয়েক দল লোক উপনিবেশ স্থাপনের জন্য আসাম ও ভারতের অন্যত্র আসিয়াছে। মন-আনাম (Mon-annam) দলই সর্ব্বপ্রথম, ইহারা এখনও আনাম এবং কাম্বোডিয়াতে বাস করিতেছে। * খাসিয়াজাতি তাহাদেরই এক শাখা।

অতিশয় প্রাচীন কাল হইতে খাসিয়াপাহাড়ের চূণ বঙ্গদেশের চারিদিকে নীত হইত। শ্রীহট্ট জেলার অধিবাসিগণই সাধারণতঃ খাসিয়াগণের নিকট হইতে চুণের পাথর ক্রয় করিত। তাহারা পাহাড়ের পাদদেশস্থ হাট সকলে তৈল, লবণ এবং অন্যান্য ব্যবহার্য্য দ্রব্য খাসিয়াদিগের নিকট বিক্রয় করিত। পাহাড়ের খনিজ লৌহ ও তন্নির্ম্মিত দ্রব্যও সমতলবাসীদিগের নিকট এই সময়ে বিক্রীত

† "The Khasias, we know, were driven up into the hills from Sylhet by the followers of Shah Jelall, who went on a proselytising expedition under the auspices of the Subadar of Dacca." (400 years ago)—The Statesman, Friday.

The 19th May, 1893.

* Dr. Grierson quoted in the Census Report of Assam for 1901.

হইত। এইরূপে বাণিজ্যসূত্রে খাসিয়াগণ নিকটবর্ত্তী সমতলবাসীদিগের নিকট অন্ততঃ তিন চারি শতাব্দী পূর্ব্ব হইতে পরিচিত হইয়াছে। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাঙ্গালাদেশের দেওয়ানী প্রাপ্ত হন। শ্রীহট্ট জেলাও তাহার অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া ঐসঙ্গে তাঁহাদের হস্তগত হয়। মুসলমানসম্রাটগণ খাসিয়াপাহাড় অধিকার করিতে পারেন নাই, এজন্য খাসিয়াগণ তখনও পর্য্যন্ত স্বাধীনতাসম্ভোগ করিতেছিল। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে একজন ইংরাজ কর্ম্মচারী শ্রীহট্টের ভার প্রাপ্ত হইয়া ঢাকা হইতে আগমন করেন। চূণ পাথরের ব্যবসায় সম্বন্ধে চুক্তি করিবার জন্য তিনি পাহাড়ের দক্ষিণ পাদদেশে চেরাপুঞ্জী হইতে ১৪ মাইল নীচে পাণ্ডুয়া নামক স্থানে খাসিয়া-দলপতিগণের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির প্রতিনিধির সহিত খাসিয়াগণের এই প্রথম পরিচয়।* কিন্তু ইহারও পূর্ব্বে এই বাণিজ্য উপলক্ষে তাহাদের আরমানীয়, গ্রীক, এবং অন্যান্য নিম্নশ্রেণীর ইউরোপীয়গণের সহিত দেখাসাক্ষাৎ হইত। সম্ভবতঃ ১৮২৬ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে কোনও ইউরোপীয় খাসিয়াপাহাড়ে গমন করেন নাই। ঐ বৎসর নংখ্লাউ নামক খাসিয়াপাহাড়স্থ এক প্রদেশের রাজা ইংরাজগণকে আপনার রাজ্যের ভিতর দিয়া মধ্য আসাম হইতে সুর্ম্মা উপত্যকা পর্য্যন্ত একটী রাস্তা করিতে দিবেন বলিয়া অঙ্গীকারসূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁহাদের নংখ্লাউএ অবস্থান কালে বিবাদের সূত্রপাত হয় এবং তাঁহাদের অনুচরগণের অসদাচরণে শেষে এই বিবাদানল বিশেষভাবে প্রধূমিত হইয়া উঠে। ১৮২৯ খৃষ্টাব্দে ৪ঠা এপ্রেল খাসিয়াগণ ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিয়া দুইজন লেফটনাণ্ট এবং কয়েক জন সিপাহীকে হত্যা করে। এই কারণে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট খাসিয়াগণের সঙ্গে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হন। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের সকল রাজা ও দলপতিগণকে বশীভূত করিতে গভর্ণমেণ্টকে ১৮৩৩ সাল পর্য্যন্ত সংগ্রাম করিতে হয় এবং পাহাড়ের শাসনকার্য্য পরিচালনের জন্য দুই বৎসর পরে (১৮৩৫) একজন পোলিটিক্যাল এজেণ্ট নিযুক্ত হন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে ইংরাজ শাসনাধীনে খাসিয়া ও জয়ন্তীয়া পাহাড় এক জেলা ভুক্ত হইয়াছে। এই জয়ন্তীয়া পাহাড়ও ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ্যভুক্ত হয়। জয়ন্তীয়ার রাজা ইন্দ্রসিংহের কয়েকজন প্রজা তিন জন ব্রিটিশ প্রজাকে ধরিয়া লইয়া গিয়া কালীর মন্দিরে নৃশংসভাবে তাহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি ছেদন করে। তদুপলক্ষে ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট সমতল প্রদেশে রাজার যে সকল অধিকৃত স্থান ছিল তাহা অধিকার করেন। কিয়ৎকাল পরে গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে মাসিক পাঁচ শত টাকা বৃত্তি লইয়া রাজা আপনার পাহাড়স্থ রাজ্যাংশও ছাড়িয়া দেন। কিন্তু জয়ন্তীয়া-পাহাড়বাসী সিণ্টেংগণ সহজে গভর্ণমেণ্টের অধীনতা স্বীকার করে নাই। পূর্ব্বে তাহাদিগকে কোনওরূপ কর দিতে হইত না, কিন্তু গৃহের খাজনা এবং অন্যান্য কর স্থাপিত হওয়াতে তাহারা অসন্তোষ প্রকাশ করিতে লাগিল। পরে পুলিশের লোকে তাহাদের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কোনও অনুষ্ঠানে হস্তক্ষেপ করাতে তাহারা বিদ্রোহী হইয়া গভর্ণমেণ্টের শক্তিকে উপেক্ষা করিতে লাগিল। কয়েক বৎসর রীতিমত যুদ্ধ করিয়া বিদ্রোহদমনপূর্ব্বক শেষে তাহাদিগকে জয় করিতে হইয়াছিল। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দ হইতে পাহাড়ে সম্পূর্ণরূপে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে। তদবধি খাসিয়া ও সিণ্টেংগণ গভর্ণমেণ্টের অনুগত প্রজা হইয়া নির্ব্বিবাদে বাস করিতেছে। প্রথমে চেরাপুঞ্জীতেই আসামের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল, এবং সেখানেই গভর্ণরজেনারালের পোলিটিক্যাল এজেণ্ট ও তৎপরে চীফকমিশনার বাস করিতেন। বর্ষার প্রাবল্যবশতঃ ১৮৬৪-৬৫ খৃষ্টাব্দে আসামের রাজধানী তথা হইতে শিলঙ্গে স্থানান্তরিত হইয়াছে।

দেশীয় স্বাধীনরাজ্য।

খাসিয়াপাহাড় ইংরাজাধিকারভুক্ত হইলেও অদ্যাবধি কতকগুলি স্থান দেশীয় রাজা, সর্দ্দার, ওহ্দেদার এবং খাসিয়াপুরোহিতগণের (Lyngdoh) শাসনাধীন রহিয়াছে। স্বায়ত্তশাসনের ভার তাহাদের হস্তে থাকাতে তাহারা অনেক পরিমাণে আপনাদের পুরাতন স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারিতেছে। ইহাদের প্রায় সকলেরই

* Extracts from the *Lives of the Lindsays* published as appendix to the Statistical Account of Sylhet by W. W. Hunter, B. A., Lld, C. I. E.

সাধারণ মোকর্দ্দমা বিচার করিবার এবং অপরাধীকে শাস্তি দিবার ক্ষমতা আছে। কোন কোন রাজার কয়েদ করিবার ক্ষমতাও রহিয়াছে, কিন্তু হত্যাকারীকে দণ্ড দিবার অধিকার কাহারও নাই। যদিও রাজবংশের লোকেই রাজা হয় বটে; কিন্তু মনোনয়ন প্রথানুসারে রাজা নির্ব্বাচিত করা হইয়া থাকে এবং তৎপরে গভর্ণমেণ্টের সম্মতি গ্রহণ করিতে হয়। সর্দ্দার ও ওহ্‌দেদারগণও এইরূপে মনোনীত হইয়া থাকে। চেরাপুঞ্জী, মল্লিম, নংক্রেম, নংখ্লাউ এবং ওয়ারবার রাজাই উল্লেখযোগ্য। অপর সকল রাজার অবস্থা নিতান্ত হীন। ভূমির উপর রাজাদিগের কোনও স্বত্ব নাই। তাহা সাধারণের সম্পত্তি, অথবা তাহা অধিকারী ব্যক্তির সম্পত্তি। এজন্য রাজা ভূমির কোনও রূপ খাজানা আদায় করিতে পারেন না। বাজারগামী লোকদিগের নিকট হইতে শুল্ক আদায়, অপরাধী ব্যক্তিগণের নিকট অর্থদণ্ড আদায়, রাজ্যরক্ষার্থ সময়ে সময়ে বিশেষ চাঁদা আদায় এবং খনিজ দ্রব্য সকলের আয়ের অর্দ্ধাংশ—ইহা হইতেই রাজগণের সকল ব্যয় নির্ব্বাহিত হয়।



আদিম বেশে খাসিয়া।

গৃহ ও তৈজসপত্রাদি।

বঙ্গদেশের দরিদ্র লোকদিগের গৃহ অপেক্ষা সাধারণ খাসিয়াগণের গৃহ অনেক পরিমাণে শ্রেষ্ঠ। কিন্তু প্রায় সকলেই একখানি মাত্র গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। তাহার একদিকে চুল্লী স্থাপিত হয়। প্রায় সকল খাসিয়াগৃহে সমস্ত দিন অগ্নি রক্ষিত হয়। এই অগ্নির চারিদিকে বসিয়া তাহারা গল্প কৌতুক করিয়া থাকে। ইহাই তাহাদের বৈঠকখানা। গৃহের ভিন্ন ভিন্ন দিকে এক একটা শয্যা বা শয়নের স্থান থাকে। এই শয়নস্থানটুকু কেহ বা চেটাই দ্বারা ঘেরিয়া লয়, এবং কেহ বা শয়ন কালে ব্যবহারের বস্ত্র দ্বারা আড়াল করিয়া থাকে। তাহারই মধ্যে এক দম্পতির শয়নের স্থান। এইরূপে একগৃহে দুই তিন দম্পতি বাস করে, তদ্ব্যতীত গৃহের মধ্য স্থানে বাড়ীর অন্যান্য লোকে বা আগন্তুকগণ শয়ন করিয়া থাকে। শীতপ্রধান দেশ হইলেও সাধারণ লোকের শয়নের জন্য অধিক বস্ত্রের আবশ্যক হয় না। তাহারা একখানি চেটাইতে শয়ন করিয়া একখণ্ড কাষ্ঠ মাথায় দিয়া থাকে এবং দিবসে যে গাত্রবস্ত্র ব্যবহার করে তাহার দ্বারাই তাহাদের লেপের কাজ চলিয়া

যায়। যাহারা সভ্য হইয়াছে, তাহারা খাট গদি ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে।

যেখানে যথেষ্ট পাথর পাওয়া যায়, সেখানে অনেকেই প্রস্তর দ্বারা গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। এই গৃহ সাধারণতঃ গবাক্ষহীন, এবং অনেক স্থানেই একদ্বারবিশিষ্ট। অনেক গৃহ এরূপ অন্ধকারময় যে প্রবেশ করিলে হঠাৎ কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। পুস্তক পড়া দূরে থাকুক, সকল সময় মানুষ চেনা দুষ্কর বলিয়া মনে হয়। বর্ষার প্রাবল্য ও শীতের আতিশয্যই এইরূপ গৃহ নির্ম্মাণ করিবার কারণ। সভ্য খাসিয়া, বিশেষতঃ খৃষ্টানগণ অনেকেই এখন গবাক্ষসংযুক্ত সুন্দর গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে এবং নানা প্রকার বিলাতী সরঞ্জামে উপযুক্তরূপে সাজাইয়াছে। নিতান্ত হীনাবস্থ খাসিয়া ব্যতীত প্রায় সকলেই আপন আপন গৃহে তক্তা দ্বারা পাটাতন (Platform) নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। কদাচিৎ তাহারা মাটীতে শয়ন করিয়া থাকে। অধিত্যকাবাসিগণ কাষ্ঠ ও বংশের দ্বারা গৃহ প্রস্তুত করিয়া থাকে। তাহাদের গৃহের পাটাতন বাঁশের দ্বারাই নির্ম্মিত হয়। অনেক গ্রামে পাহাড়ের গায়ে নিতান্ত ঢালু স্থানেও তাহারা বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। এই সকল গৃহ মঞ্চের উপরেই প্রতিষ্ঠিত হয়। তাহার একদিক মাটীর নিকটে, অপর দিক অবশ্য মাটী হইতে অনেক উচ্চে থাকে। বাঁশের সিঁড়ি দিয়া ভারী বোঝা লইয়া অক্লেশে স্ত্রীলোকেরা গৃহে উঠিয়া থাকে। এমন কি বিড়াল, কুকুর ও ক্ষুদ্র শিশুগণ অবলীলাক্রমে এই উচ্চ সিঁড়ি বাহিয়া যাতায়াত করে।

বাসন, কাচের দ্রব্য এবং অন্যান্য দর্শনযোগ্য তৈজসপত্রাদি তাহারা গৃহের এমন স্থানে রাখে, যেখানে সহজেই লোকের দৃষ্টি পড়িতে পারে। অবস্থাপন্ন লোকের গৃহে অনেক পিত্তল ও কাংস্যনির্ম্মিত দ্রব্য থাকে। বাঁশ বা কাঠের আলমারির ন্যায় প্রস্তুত করিয়া সেই সকল তৈজসপত্র উত্তমরূপে পরিষ্কার করতঃ তাহার উপর সুন্দর ভাবে সাজাইয়া রাখে। গৃহের বড় বড় পিত্তলপাত্রে জল রাখিবার নির্দ্দিষ্ট স্থান থাকে। মৃৎপাত্র পাহাড়ে অতি অল্পই প্রস্তুত হইয়া থাকে, এজন্য দরিদ্র ও অসভ্য লোক মোটা ২।৩ হস্ত দীর্ঘ বাঁশের চোঙ্গাতেই জল রাখিয়া থাকে। ক্ষুদ্র চোঙ্গাই তাহাদের জল পান করিবার পাত্র। দরিদ্র লোকে মাটী বা কাঠের সরাতে অথবা তদভাবে সুপারী গাছের খোলাতে ভাত খাইয়া থাকে।

[ক্রমশঃ।]

শ্রীনীলমণি চক্রবর্ত্তী।

প্রাকৃতভাষা।

১। উৎপত্তি।

যে ভাষায় বেদাদি শাস্ত্রগ্রন্থ রচিত, সেই বিশুদ্ধ ভাষার নাম সংস্কৃত। এবং সংস্কৃত ভাষা পরিবর্ত্তিত হইয়া, যে ভাষা লোকসাধারণের মধ্যে একসময়ে প্রচলিত হইয়াছিল, যে ভাষায় সচরাচর সেই সময়ে কথাবার্ত্তা চলিত, সেই 'স্বাভাবিক' ভাষার নাম হইয়াছিল প্রাকৃত। লোকের জন্ম মৃত্যু, রাজার রাজত্ব প্রভৃতির একটা নির্দ্দিষ্ট সন তারিখ পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু কোন ভাষার উৎপত্তি বা বিলয়ের সময় নির্ণয় করিতে গেলে, একটি তারিখ বা বৎসর পাওয়া অসম্ভব। বৎসরের স্থলে শতাব্দী লইয়া গণনা করিলেও গণনা ঠিক হয় না। যাহার বিকাশ এবং বিলয় বহুকালসাপেক্ষ, তাহা কি, কিয়ৎপরিমাণে বিকশিত বা বিলীন দেখিতে না পাইলে, এই সময়ে ফুটিল, বা এই সময়ে লয় পাইল, বলিতে পারা যায়?

বৈদিক ঋষিগণ যে ভাষায় কথা কহিতেন, তাহা দেবভাষা বটে। একালে যে ভাষায় কেবল আনন্দময় দেবচরিত্রই বর্ণিত দেখিতে পাই, তাহা দেবভাষা নহে ত কি? বুদ্ধদেবের অভ্যুদয়ের সময়ে, যে এই ভাষা কেবল শাস্ত্রের ভাষা ছিল, তাহা তাঁহার এই উক্তিটি হইতেই জানা যায়;—"আমি সর্ব্বসাধারণের কাছে মুক্তির কথা কহিতে আসিয়াছি, পণ্ডিতের জন্য শাস্ত্র রচনা করিতে আসিনাই; আমার কথা বা উপদেশ লোক-ব্যবহৃত ভাষায় লিখিও।" বুদ্ধদেবের সময়, আনুমানিক ৫৫৭ হইতে ৪৭৭ খৃঃ পূঃ পর্য্যন্ত। বুদ্ধদেবের সময়ের ভাষার সহিত, খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীর ভাষার কতদূর বিভিন্নতা

জন্মিয়াছিল, তাহা সম্পূর্ণ জানা যায় না। সাধারণতঃ বলা যাইতে পারে, যে উভয় সময়ে একই ভাষা প্রচলিত ছিল। এই ভাষাটি একালে পালিনামে পরিচিত।

'ভারতীয় খোদিত লিপিসংগ্রহ' গ্রন্থের প্রথম ভাগে, অশোকের সময়ের লিপিগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। ঐ লিপিগুলি যে তৎসাময়িক কথিত ভাষায় লিখিত, তাহা ঐ গ্রন্থসংগ্রহকার কনিংহম্ সাহেব, অতি যোগ্যতার সহিত দেখাইয়াছেন। লিপিমালা হইতে ইহাও জানা গিয়াছে, যে খৃঃ পূঃ ৩য় শতাব্দীতে সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে একই ভাষা প্রচলিত ছিল। ভারতের সে শুভদিন বুঝি আর ফিরিবে না। পশ্চিম, মধ্য এবং পূর্ব্ব প্রদেশে, সেই একই ভাষায় অতি বৎসামান্য প্রভেদ লক্ষিত হইত; সেই অতি ক্ষুদ্র প্রভেদটুকু লইয়াও কনিংহাম সাহেব পালিভাষাকে, পাঞ্জাবী, উজ্জয়িনী এবং মাগধীনামে বিভাগ করিয়াছেন। দেবপ্রিয় প্রিয়দর্শীর সময়ে সুবিস্তীর্ণ আর্য্যাবর্ত্তে একছত্র রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া, এবং অনেক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল বলিয়া, ঐ সময়ে, এবং কিছু দিন পর্য্যন্ত পরবর্ত্তী সময়ে, পালিভাষার অধিকতর উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। অশোকরাজার পূর্ব্বে অন্ততঃ তিন শত বৎসর পর্য্যন্ত যে ভাষা প্রচলিত ছিল, এবং অশোকের সময়ে যাহা সমধিক উন্নতি লাভ করিয়াছিল, অল্প সময়ের মধ্যে সে ভাষার বিনাশ বা বিলোপ হয় নাই বলিয়াই মনে করা সঙ্গত। সংস্কৃত যেমন হিন্দুদিগের শাস্ত্র লিখিবার ভাষা হইয়াছিল, পালিভাষাও কালক্রমে সেইরূপ বৌদ্ধদিগের গ্রন্থের ভাষা হইয়া উঠিয়াছিল। এই জন্যই ঠিক ধরিতে পারা যায় না, যে খৃষ্টোত্তর প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীতে পূর্ণাঙ্গ পালিভাষা প্রচলিত ছিল কি না। কিন্তু ৩০০ বৎসরের মধ্যেই যে একটি সুবিকশিত ভাষার বিলোপ হইয়াছিল, তাহাও বলা চলে না।

ইহার পূর্ব্ব হইতেই কিন্তু আর্য্যসমাজে নূতন যুগের সূত্রপাত হইয়াছিল। বৌদ্ধদিগের অবনতি, এবং নূতন হিন্দুধর্ম্মের অভ্যুদয়ে, সকল প্রকার সামাজিক অবস্থারই পরিবর্ত্তন আরম্ভ হইয়াছিল। বৌদ্ধপ্রভাব হীন হওয়াতে, এবং হিন্দু প্রভাবের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃতের আদর অধিক হওয়াতে, যে প্রচলিত ভাষার পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। সম্ভবতঃ উহারই ফলে, পালিভাষা পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রাকৃতভাষার জন্ম। তৃতীয় শতাব্দী হইতেই যে নব হিন্দু ধর্ম্মের সমধিক উন্নতি, তাহা অন্যান্য প্রবন্ধে বিশেষ ভাবে দেখাইবার প্রয়োজন হইবে। এই সময় হইতেই যে প্রাকৃত ভাষার জন্ম, তাহা অন্যান্য অবস্থা হইতেও অনুমিত হয়।

গুপ্তরাজগণ, নবযুগের হিন্দুরাজা। তাঁহাদের সময়ের যত খোদিত লিপি পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে, সর্ব্ব প্রথম যে তাম্রলিপি খানিতে, সংস্কৃতের সহিত প্রাকৃতের মিশ্রণ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা ৪৯৩ খৃষ্টাব্দের। ইহার পরবর্ত্তী অন্যান্য লিপিতেও প্রাকৃতভাষার নিদর্শন পাওয়া যায়, কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী কোনও লিপিতেই পাওয়া যায় না। ভানুগুপ্তের সময়, ৫১০ খৃষ্টাব্দ বলিয়া নির্ণীত। ইহার ভাগিনেয় ভগবদ্দোষ, প্রাকৃতভাষায় কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, এবং প্রাকৃতভাষা ব্যবহারের কতকগুলি বিধান রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে মনে হয়, যে ঐ সময়ের বড় বহু পূর্ব্বে, প্রাকৃতভাষা, সাহিত্যে ব্যবহৃত হইবার মত হইয়া উঠে নাই। ভগবদ্দোষের রচনাদি একটু নূতন রকমের জিনিষ বলিয়াই, দেবোত্তরের দলিলেও তাঁহার প্রাকৃত রচনার কথা উল্লিখিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

ফাহিয়ানের লেখায় মনে হয়, যে পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভেও গান্ধার হইতে মগধ পর্য্যন্ত পালিভাষাই প্রচলিত ছিল। বিদেশীয়ের পক্ষে, নবজাত অনধিক প্রচলিত ভাষার ব্যবহার লক্ষ্য করা সম্ভবপর নহে। বিশেষতঃ তিনি যখন প্রচলিত ভাষার প্রকৃতি সম্বন্ধে কিছু লিখেন নাই, তখন তাঁহাকে সাক্ষীশ্রেণীভুক্ত না করাই ভাল।

ষষ্ঠশতাব্দীর নাটকে, এবং ঐ সময়ের জৈনগ্রন্থে, বিকশিত এবং সুসম্বদ্ধ প্রাকৃতভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। একদিনে কোন ভাষাই বিকশিত হয় না; অন্য দিকে আবার পালিভাষাটি পরিবর্ত্তিত হইয়া নূতন প্রাকৃত গঠিত হইতেও সময় লাগিয়াছিল। এই হিসাবে যদি তৃতীয় শতাব্দীর শেষ, অথবা চতুর্থ শতাব্দীর প্রারম্ভ, প্রাকৃতভাষার উৎপত্তি কাল বলিয়া ধরা যায়, তাহা হইলে অসঙ্গত অনুমান করা হইবে না। কেবল যে ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্ব-



বিশ্বামিত্রের রামযাচনা।

শ্রীযুক্ত এম. ভি. ধুরন্ধর কর্ত্তৃক অঙ্কিত অপ্রকাশিত তৈলচিত্র হইতে।

বর্ত্তী কোন হিন্দু সাহিত্যে প্রাকৃতের ব্যবহার দৃষ্ট হয় না, তাহাই নয়। জৈনেরা দেশীয় ভাষা ব্যবহার করিতেন; অথচ ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্ব্বে, তাঁহাদের কোন গ্রন্থ প্রাকৃত ভাষায় লিখিত হয় নাই। এ প্রকার অবস্থায়, ঐ ভাষা যে আরও পূর্ব্ববর্ত্তী সময়ে সাহিত্যে ব্যবহৃত হইবার মত হইয়াছিল, তাহা বলিতে পারা যায় না। যাঁহারা প্রাকৃত ভাষায় অধিক প্রাচীনতা দেখাইতে চাহেন, প্রমাণের ভার তাঁদের উপর।

২। প্রকৃতি, প্রসার এবং বিকৃতি।

একছত্র রাজত্ব ছিলনা বলিয়া, এবং অধিকন্তু বিভিন্ন স্থানে অনেকগুলি সম্পূর্ণ স্বাধীনরাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া, পূর্ব্বকালে ভাষার যে একতা ছিল, তাহা অনেক পরিমাণে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। পূর্ব্বে দেখিয়াছিলাম যে এক পালিভাষা, অতি অল্পমাত্র প্রভেদে, পাশ্চাত্য, মাধ্য এবং প্রাচী পালিরূপে ব্যবহৃত হইত। ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রাকৃত-প্রকাশে যে চারিটি প্রাকৃতভাষার উল্লেখ পাওয়া যায়, তাহাতে প্রাচীন তিনটির অতিরিক্ত একটা দক্ষিণদেশীয় পৈশাচিক প্রাকৃতের নাম পাওয়া যায়। বৃহৎকথা, এই ভাষায় রচিত হইয়াছিল। বররুচির সময়েও আর্য্যাবর্ত্তের প্রাকৃত তিনটিতে বড় প্রভেদ ছিলনা। পৈশাচীটি, যে একটু পরিশ্রম করিয়া পড়িতে হইত, তাহা সুবন্ধু এবং বাণভট্টের লেখায় পাওয়া যায়। কাদম্বরীতে আছে যে রাজকুমার যেমন অন্যান্য বিদ্যা শিখিয়াছিলেন, তেমনি বৃহৎ-কথা-কুশল ছিলেন। বিশেষভাবে শিখিতে হইলেই কুশলতার প্রয়োজন। কিন্তু ইহার পর অতি শীঘ্রই বহুবিধ প্রাকৃত, বিভিন্ন স্থানে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। পরবর্ত্তী সময়ের অলঙ্কার গ্রন্থে অনেকগুলি প্রাকৃতের নাম পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাহার মধ্যে কয়েকটি যবন এবং অনার্য্যজাতির ভাষা।

প্রাকৃতভাষা সাধরণ লোকের মধ্যে যতটা স্বাভাবিক ভাবেই বিকশিত হউক না কেন, ঐ ভাষাটী যাহাতে অপভাষা না হইয়া যায়, তাহার জন্য যথাসম্ভব চেষ্টাদ্বারা, উহাকে সংস্কৃত আদর্শের কাছাকাছি রাখিবার যত্ন হইত। ইহারই ফলে আদর্শ শৌরসেনী প্রাকৃত। কিন্তু যত ইচ্ছা বাঁধন দিলেও, ভাষার প্রসার এবং অবয়ব বৃদ্ধিতে, সকল বাঁধন ছিঁড়িয়া যায়। ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম সময়ের প্রাকৃতের সহিত, পরবর্ত্তী সময়ের প্রাকৃতের তুলনা করিলে দেখা যায়, যে দিন দিন সংস্কৃতের নৈকট্য দূরীভূত হইতেছিল। কোন্ প্রাকৃত পূর্ব্ববর্ত্তী এবং কোন্‌টি পরবর্ত্তী, তাহাও এই পরীক্ষায় ধরা যাইতে পারে। যে নাটকগুলির সময়ের পৌর্ব্বাপর্য্য সম্বন্ধে সন্দেহ নাই, তাহা হইতেই দৃষ্টান্ত দিতেছি।

কালিদাসব্যবহৃত প্রাকৃতে এমন একটি শব্দও পাওয়া যায় না, যাহার ব্যুৎপাদক স্বরূপে একটি ঠিক অনুরূপ সংস্কৃত শব্দ পাওয়া যায় না। কালিদাসের সময়ে প্রাকৃত শব্দগুলি সংস্কৃতের যত কাছাকাছি, রত্নাবলীতেও ততটা দেখা যায় না। সংস্কৃত আত্মশব্দ হইতে, একালের 'আপন' কথার উৎপত্তি। কালিদাসের সময়ে আত্মা, আত্মনঃ প্রভৃতিস্থলে, অত্তা এবং অত্তন দেখিতে পাই। কিন্তু রত্নাবলীতে অপ্পা, অপ্পন এবং অপ্পানয়ং পদগুলি পাই। 'কহেহি' শব্দ 'বোলইস্সং' অপেক্ষা সংস্কৃত শব্দের বেশী নিকটবর্ত্তী। আরও পরবর্ত্তী সময়ের প্রাকৃতে এমন সকল শব্দ পাওয়া যায়, যে গুলিকে সংস্কৃত করিতে হইলে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শব্দের দ্বারা অর্থ করিয়া লইতে হয়। মৃচ্ছকটিকে এই শেষোক্ত শ্রেণীর প্রাকৃত শব্দ খুব বেশী। ছিনালিয়াপুত্ত (পুংশ্চলীপুত্র), গোড় (পা), মগ্‌গিদুং (প্রার্থয়িতুং), ফেলন্থ (ক্ষিপত), প্রভৃতি অনেক দৃষ্টান্ত আছে। কেবল এইকথা দ্বারাই মৃচ্ছকটিকের আধুনিকত্ব প্রমাণিত না হইতে পারে। একথা বলা যাইতে পারে, যে অন্য কবিগণ, ঘসিয়া মাজিয়া বিশুদ্ধ শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন; কিন্তু মৃচ্ছকটিকে ঠিক প্রচলিত শব্দই লিপিবদ্ধ। কিন্তু, এই সকল প্রাকৃত শব্দ, একালের শব্দের বড় নিকটবর্ত্তী বলিয়া, সন্দেহটা দূরীভূত হয় না।

যে সময়ে মুদ্রারাক্ষস বা বেণীসংহার রচিত হইয়াছিল, তখন যেন প্রাকৃতভাষাটা প্রায় লুপ্ত হইয়াছিল, বা হইতেছিল। নাটকে প্রাকৃত দিবার রীতি ছিল বলিয়াই যেন, টানাটানি করিয়া পড়া বিদ্যার জোরে প্রাকৃতের যোজনা হইয়াছে। কুসুমউরে (পুরে) কথাটার সহিত আস্ত সংস্কৃত—কৌমুদী মহোৎসব—জুড়িয়া দেওয়া, অথবা

তিপানং শব্দের পর অগ্নি শব্দ ব্যবহার কল্প, চলিত প্রাকৃতের ব্যবহারে খাটিত না। কালিদাসের নাটকে, রত্নাবলী প্রভৃতিতে, এবং সর্ব্বাপেক্ষা মৃচ্ছকটিক নাটকে, প্রাকৃত রচনায় যে প্রকার সরলতা, তেজস্বিতা, এবং স্বাভাবিকতা আছে, মুদ্রারাক্ষস বা বেণীসংহারে তাহা নাই।

সাহিত্যদর্পণকার, করম্ভক শ্রেণীর গ্রন্থের দৃষ্টান্ত দিতে গিয়া, স্বপ্রণীত ষোড়শভাষাময়ী প্রশস্তিরত্নাবলীর নাম করিয়াছেন। এই গ্রন্থখানির কোন সন্ধান পাওয়া গেলে, শেষ যুগের বিভিন্ন প্রকারের প্রাকৃতের অনেক নমুনা পাওয়া যাইত। বোধায় অলংকারশুদ্ধ করিয়া রচনা করিতে গিয়া তাঁহার কোন গ্রন্থই হয় ত সুপাঠ্য হয় নাই। এই জন্যই হয় ত উঁহার কোন রচনাই আর পাওয়া যায় না। নহিলে সাহিত্যদর্পণে তাঁহার এত গ্রন্থের নাম আছে, অথচ এ কালে একখানাও দেখা যায় না।

সহসা একাদশ শতাব্দীর পরেই সকল দেশেই প্রায় ভাষা-রচনার আরম্ভ। পুষ্যকবি এবং খুমানসিং কি ভাষায় গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তাহা জানা যায় না; কিন্তু যে শ্রেণীর প্রাকৃত ভাঙ্গিয়া হিন্দি ভাষার উৎপত্তি, তাহার সহিত হিন্দি ভাষার অনেক মৌলিক প্রভেদ আছে। কোন প্রাকৃত ভাষাতেই ক্রিয়া পদে লিঙ্গভেদ ছিল না, অথচ অতি প্রাচীন হিন্দি রচনাতেও এই প্রভেদ। কোথা হইতে আসিয়া, কতদিনে ঐ ভাষার ঐ প্রকার বৃদ্ধি হইল, তাহা জানিতে পারিলে প্রাকৃত ভাষার লয়ের সময় নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। যে সময়ে হিন্দির প্রথম রচনা, সেই সময়েই বাঙ্গালা, তেলেগু প্রভৃতি ভাষায়ও রচনার আরম্ভ। নূতন ভাষাগুলির বিকাশ কালও, প্রাকৃত ভাষার বিলয়ের কালের মত অনির্দ্দিষ্ট।

সংক্ষেপতঃ বলিতে পারা যায়, যে আর্য্যাবর্ত্তে, খৃঃ পূঃ ৬০০ হইতে খৃষ্টোত্তর ৪০০ পর্য্যন্ত পালি; ৪০০ হইতে (অর্থাৎ চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সময় হইতে) ১০০০ পর্য্যন্ত প্রাকৃত, এবং তৎপরে নূতন ভাষা গুলির প্রচলন।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

সংক্ষিপ্ত গ্রন্থপরিচয়।

"সেণ্টপিটার্সবর্গ কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক, হাইদরাবাদ কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রিন্‌সিপল্‌ ও মহীশূর কলেজের বর্ত্তমান অধ্যাপক ডাক্তার শ্রীযুক্ত নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী। শ্রীহরিপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় বি, এ, বি, এল, কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ঢাকা গেণ্ডেরিয়া প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য পাঁচ আনা মাত্র।"

আমরা এই পুস্তক খানি হইতে নিশিকান্ত বাবুর একটি সংক্ষিপ্ত জীবনচরিত সংকলন করিয়া দিতেছি। ঢাকা বিক্রমপুরের অন্তর্গত পশ্চিমপাড়া গ্রামে সন ১২৫৯ সালে ৭ই শ্রাবণ ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা স্বর্গীয় কাশীকান্ত চট্টোপাধ্যায় ঢাকা জজ আদালতের একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ উকীল এবং তৎকালীন ঢাকা হিন্দুসমাজের প্রধান নেতা ছিলেন। ইনিই ঢাকা সনাতন ধর্ম্মরক্ষিণী সভা প্রতিষ্ঠিত এবং এক সময়ে পূর্ব্ববঙ্গের মুখপত্র "হিন্দুহিতৈষিণী" পত্রিকা প্রবর্ত্তিত করেন। ৺কাশীকান্তবাবু লক্ষাধিকটাকার সম্পত্তি রাখিয়া পরলোক গমন করেন। হিন্দুধর্ম্মে তাঁহার দৃঢ়বিশ্বাসবশতঃ উইলের একস্থানে লিখিয়া যান যে তাঁহার প্রথম তিন পুত্র (শ্যামাকান্ত বাবু, নবকান্ত বাবু এবং নিশিকান্তবাবু) হিন্দু সমাজে না থাকিলে কনিষ্ঠ পুত্র ৺শীতলাকান্ত বাবু সমস্ত বিষয়ের অধিকারী হইবেন। পিতার মৃত্যুর পর সকলেই প্রায় তিন বৎসর ধর্ম্মান্তর গ্রহণ করেন নাই। ইহার পর কনিষ্ঠ তিনজন ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু জ্যেষ্ঠ শ্যামাকান্ত বাবু তাঁহাদের নগদ কয়েক সহস্র টাকা দিয়া সমুদয় সম্পত্তি হস্তগত করেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য এবং সামান্য অর্থের জন্য ভ্রাতৃবিরোধ নিতান্ত অর্ব্বাচীনের কার্য্য ভাবিয়া ইহাতে কোন আপত্তি না করিয়া তাঁহার কনিষ্ট ভ্রাতৃত্রয় স্বার্থত্যাগ ভ্রাতৃবাৎসল্য এবং উচ্চাশয়তার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন।

নিশিকান্ত বাবু অল্পবয়সেই প্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া বৃত্তিলাভকরতঃ কলিকাতা প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্ত্তি হন। এখানে নিশিকান্ত বাবুর মন ব্রাহ্মধর্ম্মের দিকে আকৃষ্ট হয় এবং

তিনি ২য় বার্ষিক শ্রেণীর পাঠ সমাপ্ত না হইতেই বিলাত গমন করিতে উৎসুক হয়েন। এই সময় ইনি স্বদেশের নানাস্থান ভ্রমণ ও উত্তরপশ্চিমের স্থানে স্থানে বাস করিয়া প্রায় তিন বৎসর অতিবাহিত করেন। দেরাদুন অবস্থিতি কালে ইনি হিন্দি এবং উর্দ্দু ভাষা শিক্ষা করেন। ১৮৭৩ সালের মার্চ্চ মাসে নিশিবাবুর বিশেষ উদ্যোগে ঢাকা "বাল্যবিবাহনিবারিণী" সভা সংস্থাপিত হয়। এই সভা হইতে "মহাপাপ বাল্যবিবাহ" নামক মাসিক পত্রিকা বাহির হয়। শ্রীযুক্ত নবকান্ত বাবু উভয় সভা ও পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। একমাত্র বাল্যবিবাহনিবারণ জন্ত এরূপ অনুষ্ঠান এদেশে এই নূতন। নিশিকান্তবাবু সভায় বক্তৃতা করিয়া এবং উক্ত পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়া বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে ঘোর আন্দোলন করিয়াছিলেন। এই সময় "অবলাবান্ধব" পত্রিকাতেও ইনি প্রবন্ধাদি লিখিতেন।



ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

১৮৭৩ অব্দে নিশাকান্তবাবু বিলাত যাত্রা করেন, এবং ২১ বৎসর বয়সে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন। এখানে একবৎসর লাটিন ভাষা ও চিকিৎসাবিদ্যাশিক্ষা করিয়া ভাষাতত্ত্ব ও দর্শনাদি শিক্ষার জন্ত জর্ম্মনীর অতিপ্রাচীন ও প্রসিদ্ধ লাইপজিক্ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন এবং জর্ম্মনীতে প্রায় সাড়েতিন বৎসর জর্ম্মন, সংস্কৃত, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস, ন্যায় এবং দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আটমাস ফ্রান্সদেশে রুষ ও ফরাসীভাষা শিক্ষা করেন। অতঃপর দুইবৎসর রুষিয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকতা করিতে করিতে ভাষাতত্ত্ব এবং রুষভাষা উত্তমরূপে আয়ত্ত করিয়া লয়েন। রুষের কর্ম্মত্যাগকরতঃ নিশিকান্তবাবু সুইজারলণ্ডে পুনরায় জর্ম্মনভাষা, ভাষাতত্ত্ব, ইতিহাস, ন্যায় ও দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন।

জর্ম্মনিতে অবস্থানকালে ইনি মধ্যে মধ্যে অর্থাভাবে পড়িয়াছিলেন কিন্তু ভাল ভাল বিষয়ে বক্তৃতা করিয়া সে অভাব মোচন করেন। কারণ এ প্রদেশে কোন ভাল বিষয়ে বক্তৃতা দান করিলে অর্থাগম হইয়া থাকে। ধর্ম্মবিষয়ে বক্তৃতা করিয়া তিনি লাইপজিকের ধর্ম্মান্ধ খৃষ্টানগণের নিতান্ত বিরাগভাজন হন এবং নগরে তদ্বিষয়ে বক্তৃতা দিবার স্থান না পাইয়া উদারমতি খৃষ্টানগণের সাহায্যে নগরে বক্তৃতা করেন। এই আন্দোলনের মধ্যে তাঁহার নাম পণ্ডিত সমাজে বহুল প্রচারিত হয়।

জর্ম্মনির এবং সুইজারলণ্ডের অনেকগুলি বিখ্যাত পত্রিকা তাঁহার বক্তৃতার সারবত্তা এবং তাঁহার জর্ম্মনভাষার অধিকার সম্বন্ধে প্রশংসা করিতে লাগিলেন। তিনি তখন বক্তৃতার সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের অনেকগুলি প্রসিদ্ধ পত্রিকায় প্রবন্ধাদিও লিখিতে আরম্ভ করিলেন। এমন সময় রুষিয়ার শিক্ষাসচিব লাইপজিক্ নগরে আগমন করেন। তিনি তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ও প্রতিভা দর্শনে মুগ্ধ হন এবং তাঁহার দ্বারা স্বদেশের কিছু কাজ গুছাইয়া লইবার সঙ্কল্প করেন। কিন্তু নিশিকান্তবাবু তখন ফরাসীভাষা শিক্ষা না করায় তিনি রুষ গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে তাঁহাকে ফরাসীদেশে প্রেরণ করেন এবং ভাষা শিক্ষা শেষ হইলে সেণ্টপিটার্সবর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে যে ভারতের দিকে রুষ এতকাল লুব্ধনয়নে চাহিয়া আছেন, তাহারই বিষয়ে স্বদেশের জ্ঞান বৃদ্ধি করিবার মানসে তাঁহাকে আধুনিক ভারতীয় ভাষাসমূহের অধ্যাপকের সম্মানিত পদ প্রদান করেন। কিন্তু এই রাজান্তক (Nihilist) সম্প্রদায়সঙ্কুল রুষরাজ্যে ইংরাজ-প্রজা বুদ্ধিজীবী বাঙ্গালীর

গতিবিধি, সন্দিগ্ধচিত্ত রাজপুরুষগণনিযুক্ত গুপ্তচরের লক্ষ্য হওয়ায় স্বাধীনচিত্ত নিশিকান্তবাবু প্রায় দুই বৎসর পরে পদত্যাগ করিয়া Ph. D. উপাধি লাভ করিবার জন্ত জুরিক বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন এবং সেই কঠিনতম পরীক্ষায় গৌরবের সহিত প্রথমশ্রেণীতে উত্তীর্ণ হইয়া উক্ত উপাধিতে ভূষিত হন। নিশিকান্তবাবুর পূর্ব্বে এ দেশের আর কাহাকেও রুষদেশে অধ্যাপকতা করিতে অথবা এই পরীক্ষা দান করিতে শুনা যায় নাই।

১৮৮৩ সনের ২২ ফেব্রুয়ারী ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় ভারতে প্রত্যাগত হন। তাঁহার প্রত্যাগমনে জাতি-ধর্ম্ম-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে স্বপ্রদেশবাসী ও ভিন্ন প্রদেশবাসী এমন কি রাজপুরুষগণও স্থানে স্থানে অভ্যর্থনা সভায় যোগদান করিয়া তাঁহার সম্মাননা করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিয়া তিনি যে সকল চাকরী করিয়াছেন তৎসমুদয়ের বৃত্তান্ত দিবার প্রয়োজন নাই।

ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায় কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তন্মধ্যে বিলাতের Trubner কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রকাশিত "The Jatras or the Popular Dramas of Bengal," জুরিক হইতে প্রকাশিত "The Indische Essays" এবং "Buddhism and Christianity" ইউরোপে যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করিয়াছে। প্রথম খানি ইংরাজী হইতে জুরিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Henne জর্ম্মনভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। অপর দুইখানি সম্বন্ধে জর্ম্মন প্রেস একবাক্যে সুখ্যাতি করিয়াছেন।

নিশিকান্তবাবু দেশে ফিরিয়া আসিবার সময় তাঁহার বিদ্যাবত্তা আমাদের প্রাণে যেরূপ আশার সঞ্চার করিয়াছিল, তাহা এখনও পূর্ণ হয় নাই। পুস্তকখানিতে আরও অনেক জ্ঞাতব্য কথা আছে।

"লাহোর ট্রিবিউন পত্রিকার সুবিখ্যাত সম্পাদক স্বর্গীয় শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনী। শ্রীভগবানচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ঢাকা গোপীনাথ যন্ত্রে মুদ্রিত। মূল্য ৵০ আনা মাত্র।"

আমরা স্বজাতিপ্রিয় প্রত্যেক বাঙ্গালীকে এই পুস্তকখানি পাঠ করিতে অনুরোধ করিতেছি।

স্বর্গীয় শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায় ডাক্তার নিশিকান্ত চট্টোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ সহোদর ছিলেন। তিনি ১২৬৩ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যেরূপ চিররুগ্ন ছিলেন, তাহাতে শৈশবে কেহ তাঁহার জীবনের আশা করেন নাই।



৺শীতলাকান্ত চট্টোপাধ্যায়।

তিনি এই ভগ্নদেহ লইয়া জগতে যে কীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা এক অসাধ্যসাধন বলিয়াই মনে হয়। প্রভূত মানসিক শক্তি এবং ধর্ম্মনিষ্ঠাই তাঁহার সহায় হইয়াছিল। দারুণ মস্তিষ্করোগের জন্য অল্প বয়সেই তাঁহাকে কলেজ ছাড়িতে হয়। গ্রাম্য পাঠশালা ও চতুষ্পাঠীতে বাঙ্গালা ও সংস্কৃত অধ্যয়ন করিয়া তিনি ঢাকা গভর্ণমেণ্ট কলেজিয়েটস্কুলে ভর্ত্তি হন এবং তথা হইতে মাসিক ১০৲ টাকা বৃত্তি সহ প্রথম শ্রেণীতে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এফ এ পরীক্ষার ৩,৪ মাস পূর্ব্বেই লেখা পড়া এককালে বন্ধ করিতে বাধ্য হন। উদ্যমশীল এবং প্রতিভাবান যুবকের কলেজের শিক্ষা এইরূপেই পর্য্যবসিত হইল। শিরঃপীড়াই

অবশেষে তাঁহার অকালমৃত্যুর কারণ হইয়াছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধি লাভ না হইলেও উচ্চশিক্ষার ফল তাঁহার সম্যক লাভ হইয়াছিল। প্রবেশিকা পরীক্ষার পূর্ব্বেই অর্থাৎ ১৫ বৎসর বয়সে ইনি একজন সুলেখক বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। এই সময় তিনি ঢাকা ঈষ্ট পত্রিকা এবং তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা শ্রীযুক্ত নবকান্ত বাবুর সম্পাদিত "মহাপাপ বাল্যবিবাহ" নামক মাসিক পত্রিকায় নিয়মিত ইংরাজী ও বাঙ্গালা প্রবন্ধাদি লিখিতেন। ১৭ বৎসর বয়সে ইনি প্রকাশ্যভাবে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। পিতার উইলের মর্ম্মানুসারে বিষয়ের তিন ভাগ এবং কনিষ্ঠ পুত্র বলিয়া পিতার মৃত্যুকালে প্রদত্ত নগদ ১০ সহস্র টাকা শীতলাকান্ত বাবুর প্রাপ্য ছিল। কিন্তু সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ৮ শ্যামাকান্ত বাবু তাঁহাকে বিক্রমপুরস্থ একখানি ক্ষুদ্র তালুক দিয়া সমস্তই হস্তগত করিয়াছিলেন। শীতলাকান্ত বাবু তাহাতেই সন্তুষ্ট হইলেন। এই স্বার্থশূন্য পুরুষসিংহ যেমন ভ্রাতৃবৎসল ছিলেন, দেশের জন্যও তদ্রূপ তাঁহার প্রাণ কাঁদিত। ২০ বৎসর বয়সেই তিনি বিবিধ জনহিতকর কর্ম্মে ব্যাপৃত হন। সেই সময় তিনি "ঢাকা জনসাধারণ সভার" সহকারী সম্পাদক ও ছাত্র সভার (Dacca Institute) সভ্য হন এবং ভারত সভার (Indian Association) প্রতিনিধি হইয়া ময়মনসিংহ, সেরপুর ও আসাম অঞ্চলের নানা স্থানে ইংরাজী ও মাতৃভাষার সারগর্ভ এবং উদ্দীপনাপূর্ণ বক্তৃতা করিয়া শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের হৃদয় জাগ্রত করিয়া তুলেন। তাঁহার এত অল্প বয়সে এমন গভীর জ্ঞান, এরূপ চিন্তাপূর্ণ ওজস্বিনী বক্তৃতা, ইংরাজী ভাষায় এমন অসাধারণ অধিকার এবং তাঁহার প্রতিভাপূর্ণ প্রশান্ত নির্ভীকভাব ও আন্তরিক স্বদেশহিতৈষণা দর্শনে সকলেই চমৎকৃত হইলেন। বাগ্মিবর মাননীয় সুরেন্দ্র বাবু তখন প্রথমবার ঢাকায় আগমন করেন। এদিকে পঞ্জাবের স্বজাতিবৎসল স্বদেশহিতৈষী সর্দ্দার দয়ালসিংহ ঠিক এই সময় লাহোর হইতে একখানি ইংরাজী পত্রিকা প্রকাশ করিতে সঙ্কল্প করিয়া সুরেন্দ্র বাবুর উপর সম্পাদক নির্ব্বাচনের ভার অর্পণ করেন। তিনি শীতলাকান্ত বাবুর সত্যপ্রিয়তা, তেজস্বিতা এবং ইংরাজীভাষাভিজ্ঞতার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকেই প্রস্তাবিত পত্রিকার উপযুক্ত সম্পাদক বলিয়া স্থির করেন এবং উক্ত পদ গ্রহণ করিতে পরামর্শ দেন। অপটুশরীর লইয়া হৃদয়বলে বলীয়ান এই পুরুষসিংহ ১৯।২০ বয়সে সুদূর পঞ্জাবপ্রবাসে তাঁহার গৌরবময় কর্ম্মজীবনের সূত্রপাত করিলেন। তাঁহার সম্পাদকতায় সাপ্তাহিক "ট্রিবিউন" পত্রিকা প্রকাশিত হইল। এই সময়ে মুলতান সহরে গোবধ লইয়া হিন্দু মুসলমানে ভয়ানক বিরোধ চলিতেছিল। শীতলাকান্ত বাবুর সুযুক্তিপূর্ণ সতেজ লেখনীর পরিচালনে তৎপ্রতি গভর্ণমেণ্টের মনোযোগ আকর্ষিত হইল এবং তাহার ফলে মুলতানের ডিপুটি কমিশনরের দূষিত আচরণ নিবারিত হইয়া সর্ব্বত্র শান্তি বিরাজ করিতে লাগিল। প্রায় দুই বৎসর ট্রিবিউনের সম্পাদকতা করিয়া শীতলাকান্ত বাবু ১৮৮২ সালে উক্ত পদত্যাগ করেন, এবং ১৮৮৪ সালে ৪।৫ মাস এলাহাবাদে আইন অধ্যয়ন করিয়া ওকালতী পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। এই কয়মাস ইনি ১৫০৲ বেতনে "বিহার হেরল্ড" পত্রিকার সম্পাদকতা করেন। আইন পাশ করিয়া ইনি মীরাট জজ আদালতে ওকালতী আরম্ভ করেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে পসার করিয়া লয়েন; কিন্তু এই ব্যবসায়ে আদৌ তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল না, এজন্য উহা শীঘ্রই ত্যাগ করিলেন। এদিকে তাঁহার অনুপস্থিতিতে ট্রিবিউন পত্রিকার অনেক ক্ষতি হইলে পত্রিকার অধ্যক্ষ শীতলাকান্ত বাবুকে পুনরায় সম্পাদন করিতে বিশেষ অনুরোধ করেন। তদনুসারে তিনি ২০০ টাকা বেতনে ট্রিবিউনের কার্য্য লইয়া লাহোরপ্রবাসী হন। এবার তিনি অধিকতর উদ্যম এবং উৎসাহের সহিত পত্রিকা পরিচালন করিয়া ইহাকে ভারতের বিশেষতঃ পঞ্চনদ প্রদেশের এক মহাশক্তি করিয়া তুলিলেন। শীতলাকান্ত বাবুর লেখনী অবিচার ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে যমদণ্ড স্বরূপ সতত উদ্যত থাকিত। তাঁহার অমর লেখনীর পরিচালনে যেমন অনেক দুষ্টের দমন হইয়াছিল, তেমনি পঞ্জাব প্রদেশে অনেক হিতকর কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। পূর্ব্বে পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরাজীশিক্ষা ইচ্ছাধীন ছিল কিন্তু শীতলাকান্তবাবু এই বিষয়ে ক্রমাগত আন্দোলন করিয়া ওরিয়েণ্টাল কলেজে ইংরাজী শিক্ষা

অবশ্য শিক্ষণীয়রূপে নির্দ্ধারিত করান।—উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্টার সার্জেণ্ট সাহেব উৎকোচ গ্রহণ করিয়া রাজদ্বারে অভিযুক্ত হন। শীতলাকান্ত বাবু বিশেষ পরিশ্রম সহকারে প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া গভর্ণমেণ্ট দ্বারা কমিশন বসান। সার্জেণ্ট সাহেব তাহাতে কর্ম্মচ্যুত হন। "ট্রিবিউন" তখন না থাকিলে পঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের পঙ্কোদ্ধার হওয়া অসম্ভব হইত। এই কার্য্যে তিনি জনসাধারণের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছিলেন কিন্তু আর একটী সৎকীর্ত্তি করিয়া শীতলাকান্তবাবু এ প্রদেশে চিরযশস্বী হইয়াছেন।

অমৃতসর পুলিসের কর্ত্তা দুর্দ্দান্ত ওয়ারবার্টন সাহেবের নামে তৎপ্রদেশ তখন কম্পান্বিত হইত। তাঁহার অধীনস্থ পুলিশ কর্ম্মচারীদিগের অত্যাচারে সকলে উত্যক্ত হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের হস্তে নিরীহ প্রজাবর্গ এবং অসহায়া কুলকন্যাগণ প্রায়ই নিপীড়িত, লাঞ্ছিত এবং অপমানিত হইতে লাগিল। দুর্বৃত্তগণের প্রশ্রয়দাতা ওয়ারবার্টন সাহেব পুলিশকে যেরূপ কলঙ্কিত করিতেছিলেন, তদ্বিরুদ্ধে শীতলাকান্ত বাবুর নির্ভীক লেখনী উত্তোলিত না হইলে অত্যাচার অপনোদিত হইত কি না সন্দেহ। তিনি ক্রমাগত সাহেবের কুকীর্ত্তি সকল ট্রিবিউনে প্রকাশ করিয়া গভর্ণমেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন এবং তিনি যে সকল অভিযোগ আনিয়াছিলেন তাহার কতকগুলির সম্বন্ধে সাহেবকে দোষী সাব্যস্ত করায় গভর্ণমেণ্ট তাঁহাকে তিরস্কার করিলেন। অবশিষ্ট অভিযোগগুলি লইয়া তখন সাহেব ট্রিবিউন সম্পাদকের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা রুজু করিলেন। মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। স্থানীয় শ্বেতাঙ্গগণ পুলিশসাহেবের পক্ষাবলম্বন করিয়া এমন কি চাঁদা তুলিয়া তাঁহার মকদ্দমার সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। এদিকে স্বদেশবৎসল শীতলাকান্তবাবু পঞ্জাববাসীদিগের জন্য যে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া তাঁহাদের কতদূর মঙ্গল সাধন করিয়াছেন, তাহা স্মরণ করিয়া কৃতজ্ঞতাভরে তাঁহারা তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিতে উদ্যত হইলেন। দেখিতে দেখিতে ৩।৪ সহস্র টাকা সংগৃহীত হইল, কিন্তু নিঃস্বার্থ পরোপকারী শীতলাকান্ত বাবু তাহার এক কপর্দ্দকও না লইয়া সমস্ত পত্রিকার অধ্যক্ষ সর্দ্দার দয়ালসিংহের হস্তে অর্পণ করিলেন। এই সময় আত্মপক্ষসমর্থন, প্রমাণাদি সংগ্রহ এবং পূর্ব্ববৎ পত্রিকা পরিচালনা করিতে তাঁহাকে কিরূপ অমানুষী পরিশ্রম, মানসিক শক্তিব্যয় এবং ধৈর্য্যধারণ করিতে হইয়াছিল তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। যাহা হউক কর্ণেল ওয়ারবার্টনের মকদ্দমা আপোষে মিটিয়া গেল। এই ব্যাপারে শীতলাকান্ত বাবু গভর্ণমেণ্টের ধন্যবাদ এবং দেশীয় নরনারীর আন্তরিক প্রীতি ও পূজা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই ঘটনা লইয়া ভারতের মুখপত্রগুলি এবং বিলাতের মহামতি ডিগবী, হিউম, কেইন, পিনকট প্রমুখ ভারতবন্ধুগণ শীতলাকান্ত বাবুর শত মুখে প্রশংসা করিয়াছিলেন। ইহাঁরা যখন পত্রাদি লিখিতেন, তখন "My dear Friend," "My dear Brother" এইরূপ মধুমাখা কথায় তাঁহাকে সম্বোধন করিতেন।

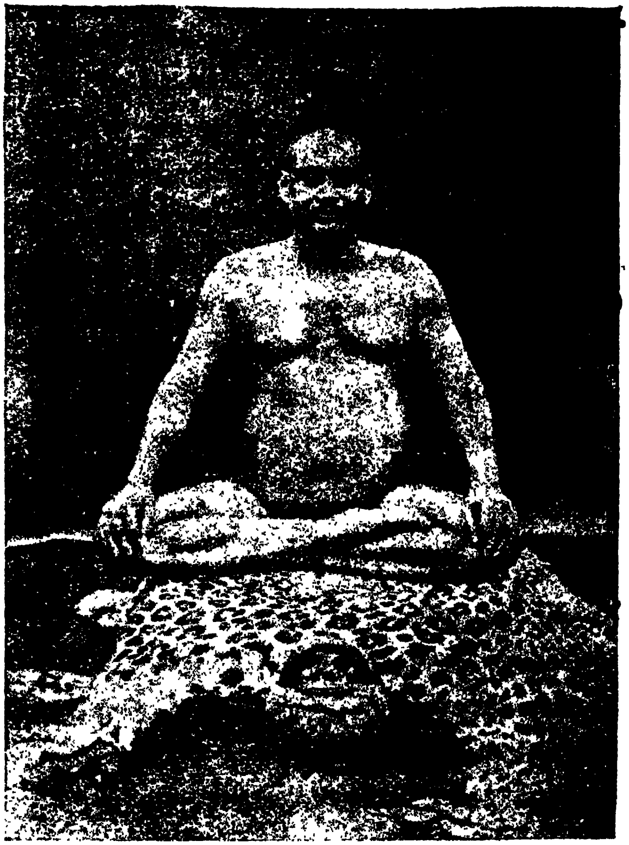
প্রকাশ্য সভায় অথবা সংবাদপত্রে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ব্যতীত পঞ্জাবের শিক্ষিত সম্প্রদায় শীতলাকান্ত বাবুকে যে সকল পত্রাদি লিখিতেন, তাহা হইতে বেশ উপলব্ধি হয়, তাঁহারা এই প্রবাসী বাঙ্গালীর প্রতি কতদূর শ্রদ্ধাবান ছিলেন। শীতলাকান্ত বাবুর জন্যই "ট্রিবিউন" দেশ বিদেশে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তাঁহারই অমর লেখনীর জন্য ইহার নাম হইয়াছিল "The terror of the Punjab" "The banner of the people." পঞ্জাবে লাট দরবারে শীতলাকান্ত বাবু সাদরে নিমন্ত্রিত হইতেন। কাশ্মীর এবং নাভার মহারাজা তাঁহাকে বিশেষ সমাদর করিতেন। একবার নাভার মহারাজা তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বীয় রাজধানী হইতে ২৫।৩০ মাইল-পথ অগ্রসর হইয়া মহাসমাদরে অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার জন্য মন্ত্রী ও অপরাপর কর্ম্মচারীদিগকে প্রেরণ করিয়াছিলেন। দেশীয় পত্রিকা-সম্পাদকের দায়িত্বপূর্ণ পদকে কতদূর গৌরবান্বিত করিতে হয়, এতদ্বারা শীতলাকান্ত বাবু বেশ দেখাইয়া গিয়াছেন। ইংরাজ গভর্ণমেণ্ট-কর্তৃক কাশ্মীররাজের ক্ষমতা অনেক খর্ব্ব হইলে ইনি ট্রিবিউনে মহারাজার প্রতি অন্যায় ব্যবহারের প্রতিবাদ করিয়া কয়েকটী প্রস্তাব লিখেন। কাশ্মীরপতি তাহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে অনেক টাকা পুরস্কার দিতে ইচ্ছা করেন এবং ১৮৯১ সনে শিরঃপীড়ার জন্য সম্পাদকতা ত্যাগ

করিলে মহারাজা তাঁহার দ্বারা কাশ্মীর হইতে একখানি পত্রিকা বাহির করিতে মনস্থ করেন। কিন্তু শীতলাকান্ত বাবুর শরীর ক্রমেই ভাঙ্গিয়া পড়ায় তাঁহার বাসনা পূর্ণ হইল না। পুরস্কারের কথায় তিনি কাশ্মীররাজকে জানাইয়াছিলেন যে তিনি অর্থলোভে তাঁহার পক্ষ সমর্থন করেন নাই, এবং যখন তাঁহারও কোন ত্রুটি দেখিবেন তাঁহারও বিরুদ্ধে লিখিতে কুণ্ঠিত হইবেন না। এইরূপ নির্ভীকতা এবং সৎসাহসেই তিনি অদ্বিতীয় ছিলেন। তাঁহার ন্যায় স্বাধীনচিত্ত ব্যক্তির পরমুখাপেক্ষী হওয়া অসম্ভব। তিনি ৩০০ টাকা বেতনের ট্রিবিউনের সম্পাদকতা ত্যাগ করায় মধ্যে মধ্যে অর্থাভাবে বিশেষ ক্লেশ অনুভব করিয়াছিলেন কিন্তু কখন পরমুখাপেক্ষী হন নাই। শিরঃপীড়ায় তিনি এতদূর আক্রান্ত হইলেন যে কোন কার্য্যই আর তাঁহার দ্বারা সম্ভব হইল না। তিনি প্রায় ৪ বৎসর রোগযন্ত্রণা ভোগ করিয়া ১৩০৪ সনের ২রা মাঘ ৪১ বৎসর বয়সে প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম সহোদর, স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব, স্বদেশ এবং প্রবাসের জনসাধারণকে কাঁদাইয়া অমরধামে গমন করিলেন। শীতলাকান্ত বাবু সততা, সত্যপ্রিয়তা, অধ্যবসায়, সৎসাহস এবং তেজস্বিতার জীবন্ত মূর্ত্তি ছিলেন। তিনি যে কেবল পঞ্জাবের হিতসাধনে জীবনপাত করিয়া গিয়াছেন তাহাই নহে, সুদূর প্রবাসে থাকিয়াও বঙ্গসাহিত্যের যথেষ্ট সেবা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার কৈশোরে লিখিত "বনকুসুম", "তত্ত্ববোধিনী", "ভারতী", "নব্যভারত", "সমালোচক," "সমদর্শী" প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁহার লিখিত "হার্ব্বার্ট স্পেন্সারের "অজ্ঞেয়বাদের প্রতিবাদ," "পঞ্জাবভ্রমণ" এবং শিক্ষা, সমাজ, ধর্ম্ম ও নীতিবিষয়ক গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ প্রবন্ধগুলি আজিও তাঁহার মাতৃভাষানুরাগের পরিচয় দিতেছে।

প্রবাসে বঙ্গসাহিত্য চর্চ্চা।

আমরা ইতিপূর্ব্বে "প্রবাসে বঙ্গসাহিত্য" শীর্ষক প্রবন্ধে পরমহংস পরিব্রাজক ৺কৃষ্ণানন্দ স্বামী এবং শ্রীযুক্ত দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের নামোল্লেখ মাত্র করিয়াছিলাম। এক্ষণে তাঁহাদের সাহিত্যিক জীবনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতেছি।

কাশীর ৺কৃষ্ণানন্দ স্বামীর নাম শুনেন নাই, এমন বাঙ্গালী বিরল। ইঁহার গার্হস্থ্যাশ্রমের নাম শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন গুপ্ত। হুগলী জেলার অন্তর্গত গুপ্তিপাড়ায় ১২৫৬



৺কৃষ্ণানন্দ স্বামী।

সালের শ্রাবণ মাসে ইঁহার জন্ম হয়। বাল্যকাল হইতেই শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্নের চিন্তাশীলতা ও রচনাশক্তি বিকাশ পাইতে থাকে। পঠদ্দশায় তিনি বিবিধ সুললিত কবিতা ও সঙ্গীত রচনা করিয়া তাঁহার ভাবী জীবনের অস্ফুট আভাস প্রদান করেন। তিনি যখন জামালপুরে রেলওয়ে আফিসে কার্য্য করিতেন, সেই সময়ে তাঁহার "সঙ্গীত-মঞ্জরী" ও "প্রবোধ-কৌমুদী" নামক পুস্তকদ্বয় প্রকাশিত হয়। তিনি বৎসরের দীর্ঘঅবকাশকালে তীর্থভ্রমণ ও ভার-

স্থানীয় ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানসমূহ দর্শন করিয়া অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। "হাবড়া-হিতকরী" প্রভৃতি সংবাদ পত্রে এই সমুদয় ভ্রমণবৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছিল। মুঙ্গের প্রবাসকালে শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন তন্নগরবাসী জনগণের মধ্যে ধর্ম্ম ও সুনীতির প্রচারার্থ আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভার প্রতিষ্ঠা করেন, এবং নীতি ও ধর্ম্মোপদেশ সাধারণের বোধগম্য করিবার জন্য সরল বাঙ্গলা ও হিন্দীতে "ধর্ম্ম-প্রচারক" নামক একখানি মাসিক পত্র প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। এই সময়ে তিনি স্বীয় চেষ্টায় হিন্দীভাষা ও সাহিত্যে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। অতঃপর সেনগুপ্ত মহাশয় সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন পূর্ব্বক কাশীকেই নিজ কার্য্যক্ষেত্রের কেন্দ্র নির্দ্ধারণ করেন। তথায় অবাস্থিতি করিয়া তিনি "গীতার্থসন্দীপনী" নামক শ্রীমদ্‌ভগবদ্ গীতার সুললিত ও বিশদব্যাখ্যা রচনা করেন। বঙ্কিম বাবু ইহা পাঠ করিয়া বলিয়াছিলেন, "সন্দীপনীর ভাব ও ভাষা চিরদিন বাঙ্গলা ভাষায় অপূর্ব্ব রত্নরূপে বিরাজিত থাকিবে।" এই সময়েই তিনি নারদ ও শাণ্ডিল্যকৃত ভক্তিসূত্রের ব্যাখ্যা করিয়া কতকগুলি সাধু মহাত্মার জীবনী সহ "ভক্তি ও ভক্ত" নামক একখানি উপাদেয় ভক্তিগ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থখানি এবং স্বামীজী প্রণীত "ভক্তিরসামৃত" পাঠ করিলে অনেক পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়। এতদ্ব্যতীত তিনি 'শ্রীকৃষ্ণ পুষ্পাঞ্জলি", "পঞ্চামৃত", "রামগীতা", "শ্রাদ্ধতত্ত্ব", "স্বপ্নতত্ত্ব", "নীতি-রত্নমালা", "শ্রীকৃষ্ণরত্নাবলী", "হরের্ণামৈবকেবলম্", "পরিব্রাজকের সঙ্গীত", প্রভৃতি অনেকগুলি পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন। বঙ্গভাষায় শাস্ত্রগ্রন্থ প্রচার করিয়া তিনি প্রবাসে মহৎকীর্ত্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি বিগত ৩রা আশ্বিন প্রতিষ্ঠিত কাশী যোগাশ্রমে তাঁহার আরাধ্যা-দেবী যোগেশ্বরীর পাদমূলে ইষ্টনাম জপ করিতে করিতে চিরসমাধিস্থ হইয়াছেন।



শ্রীযুক্ত দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়।

২৪ পরগণার অন্তর্গত হালিসহরে শ্রীযুক্ত দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের নিবাস। তাঁহার কর্ম্মবহুল জীবনের কথা অল্প লোকেই জানেন। তিনি একজন নামজাদা লোক নহেন, কিন্তু বঙ্গের বিখ্যাত লোকদের মধ্যেও অনেকে তাঁহার মত সমস্ত জীবন সাধারণ হিতকর কার্য্যে লিপ্ত থাকিতে পারেন নাই। তিনি পঠদ্দশায় কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের সংবাদ প্রভাকরে কবিতা এবং পাদরিগণ পরিচালিত অরুণোদয় পত্রে গদ্য প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। বিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপ্ত হইবার পর তিনি দুইজন বন্ধুর সহিত কাশী গমন করেন। তখন কেবল রাণীগঞ্জ পর্য্যন্ত রেল হইয়াছিল, বাকীপথ এক্কা যোগে অতিক্রম করিতে হইয়াছিল। কাশীতে আসিয়া তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত এবং কাশীস্থ মহারাষ্ট্রী ও অন্যান্য লোকদিগের আচার ব্যবহার সম্বন্ধে প্রভাকর পত্রে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন। কিছুদিন কাশীতে থাকিয়া, যখন

হালিসহর-নিবাসী শ্রীযুক্ত উমাচরণ মুখোপাধ্যায় Camel Corps নামক পল্টনের গোমস্তা হইয়া ভ্রমণে বহির্গত হন, তখন দীননাথ বাবু তাঁহার সঙ্গে নানাস্থান পরিভ্রমণ করেন। বিখ্যাত তাঁত্যাটোপীকে ধরিবার জন্য এই পল্টন গঠিত হয়। ইহা অযোধ্যা হইয়া রাজপুতানা অঞ্চলে গমন করে। দীননাথ বাবু তথা হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক এলাহাবাদে চাকরী গ্রহণ করিয়া দারাগঞ্জে অবস্থিতি করেন। এই সময়ে তাঁহার "বিবিধ দর্শন" কাব্য রচিত হয়।

তিনি ১৮৬৫ সালের মে মাসে ইটাওয়া বদলি হন। তথায় কয়েকজন পদস্থ শিক্ষিত ব্যক্তির সাহায্যে একটি সাহিত্যসভা প্রতিষ্ঠিত করেন। এই সভায় তিনি ধর্ম্ম ও সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে অনেকগুলি বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তৎসমুদয় আলীগড় ইনষ্টিটিউট্ গেজেটে প্রকাশিত হইত। ইটাওয়া হইতে তিনি সংবাদপ্রভাকর ও প্রয়াগদূতে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। অতঃপর দীননাথবাবু মোগলসরাইয়ে ডিষ্ট্রিক্ট এঞ্জিনিয়ারের আফিসে বদলী হন। তথায় কয়েকজন বন্ধুর সাহায্যে একটি সাহিত্যসভা স্থাপন করেন। ইহাতে সাহিত্যালোচনা ব্যতীত রেলওয়ে কর্ম্মচারী দিগের উন্নতিবিধানের চেষ্টাও হইত। ডিষ্ট্রিক্ট এঞ্জিনিয়ার কার্টার সাহেবের চেষ্টায় একটী সভাগৃহও নির্ম্মিত হইয়াছিল। এই সভায় পঠিত বক্তৃতা আলীগড় ইনষ্টিটিউট গেজেটে মুদ্রিত হইত। ইহার পর দীননাথবাবু গিরিডির কোন কয়লার খনির কার্য্যালয়ে চাকরী পান। তথায়ও তাঁহার সাহিত্যিক কার্য্য অক্লান্তভাবে চলিতে থাকে। ১৮৭৪ সালে তিনি পার্ব্বতীপুরে বদলী হন। তথায় নেটিভ্ ইম্প্রুভমেণ্ট সোসাইটি নামক একটি সভা স্থাপন করেন। রেলের কর্তৃপক্ষগণ গৃহ, পুস্তক ও অর্থ দিয়া এই সভাকে উৎসাহিত করেন। এখানে বক্তৃতা, কথকতা, ভোজ ও বিশুদ্ধ নাট্যাভিনয় হইত। দীননাথবাবু ইহার সংস্রবে ক্লোটিংক্লব নামক সভা স্থাপন করিয়া আত্মোন্নতিবিষয়ে উদাসীন সভ্যগণের গৃহে গৃহে গিয়া সদ্গ্রন্থ পাঠ ও বক্তৃতা করিতেন, এবং উদ্দীপনা পূর্ণ গীত গাহিয়া তাঁহাদের জড়তা দূর করিতে চেষ্টা করিতেন।

তিনি ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে দক্ষিণ মহারাষ্ট্ররেলওয়েতে বদলি হইয়া পুনা গমন করেন। তথায় পাঁচবৎসর অবস্থান কালে হীরাবাগ টাউনহলে ও প্রার্থনা সমাজে দীননাথবাবু যে সকল বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা ভিন্ন ভিন্ন নামে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। পুনাতেই তাঁহার "একতাব্রত" কাব্য প্রকাশিত হয়। এই সময়ে তাঁহার লেখা নব্যভারত, নবজীবন, হিন্দু হেরাল্ড, পুনা সার্ব্বজনিক সভা পত্রিকা, প্রভৃতিতে প্রকাশিত হইতে থাকে। তিনি প্রায় দুই বৎসর কাশী হইতে প্রকাশিত Motherland নামক ইংরাজী সাপ্তাহিক সম্পাদন করেন। পুনা হইতে তিনি ধারবারে গমন করেন এবং অত্রত্য মিত্রসমাজে যোগ দিয়া তাহার যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। এখানে তিনি বিশেষ প্রমত্ত উৎসাহ সহকারে হিন্দুসম্মিলনী নামক সভা স্থাপন করেন। এই সভা হইতে একদিকে যেমন সাহিত্যালোচনা চলিতে থাকে, অপরদিকে তেমনি অনাথ দরিদ্রগণের সাহায্যও হয়। দীননাথ বাবুর চেষ্টায় ধারবারের শ্মশানে একটি মুমূর্ষুগৃহ নির্ম্মিত হয়। স্থানীয় রেল কর্ম্মচারীদের উন্নতিবিধানার্থ তিনি রেল কর্ত্তৃপক্ষ ও বন্ধুগণের সাহায্যে ধারবার রেলওয়ে ইনষ্টিটিউট্ প্রতিষ্ঠিত করেন। সর্ব্বধর্ম্মাবলম্বী লোকে সদ্ভাবের সহিত এই সভায় যোগ দিতেন। বিশ হাজার টাকা ব্যয়ে ইহার গৃহ নির্ম্মিত হয়। এতদ্ভিন্ন Association for Railway Employees নামক আর একটি সভা রেল-কর্ম্মচারীদের বেতনবৃদ্ধি ও অবস্থার উন্নতিবিধানের জন্য ইহাঁরই উদ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। ধারবার হইতে তিনি পুনাস্থ বন্ধুগণের অনুরোধে তথায় গিয়া মধ্যে মধ্যে বক্তৃতা করিতেন। পুনায় পঠিত বঙ্গসাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা Calcutta Review পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই সময়ে তিনি নানাবিষয়ে আরও আট দশ খানি বাঙ্গালা, ইংরাজী, ও ইংরাজী-কানাড়ী পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখেন। স্থানাভাবে তৎসমুদয়ের উল্লেখ করা গেল না। ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে তিনি মান্দ্রাজ, মাদুরা, রামেশ্বর, কলম্বো প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করেন। তাঁহার ভ্রমণবৃত্তান্ত ও অন্যান্য প্রবন্ধ Madura Mailএ প্রকাশ করেন। এই সময়ে কৌলীন্য-প্রথা সংশোধন বিষয়ে প্রবন্ধ এবং কবীরের জীবনী লণ্ডন হইতে প্রকাশিত "The Indian Magazine and Review" পত্রিকায় লিখিতে আরম্ভ করেন; এবং তাঁহার জ্ঞানপ্রভা উপন্যাস "আর্য্যপ্রতিভা"

এবং "দৈনিক ও সমাচার চন্দ্রিকার" প্রকাশ করেন। এস্থান হইতে অবসর লইয়া ইনি হালিসহরে গমন করেন। এলাহাবাদ হইতে নব্যভারতে লিখিত "হিন্দু ধর্ম্মের আন্দোলন ও সংস্কার" পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়।

১৮৯৪ অব্দের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে ৫৫ বৎসর বয়সে দীননাথ বাবু গভর্ণমেণ্ট হইতে পেন্সন লইয়া আর একবার ত্রিবাঙ্কুর, বেলারী, ত্রিচিনপল্লী, চিদম্বরম, মাদুরা, টিনেভেলি, ত্রিভেন্দ্রাম ও মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ করেন। প্রত্যেক স্থানে বক্তৃতা করেন। বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া ইনি সাধক রামপ্রসাদ সেনের স্মৃতিচিহ্ন স্থাপন জন্য যত্নবান হন এবং অর্থ সংগ্রহের জন্য কলিকাতায় অবস্থিতি করিতে থাকেন। তাঁহার পেন্সনের টাকায় কলিকাতার ব্যয় নির্ব্বাহ হইত না বলিয়া প্রত্যহ বিশ্বকোষের কার্য্যালয়ে কয়েক ঘণ্টা লিখিয়া অবশিষ্ট কাল চাঁদা সংগ্রহে ব্যয় করিতেন। তৎপরে বিশ্বকোষের সম্পাদক শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু কার্য্যবশতঃ স্থানান্তরে গমন করিলে দীননাথ বাবু Buddhist Text Societyর অধ্যক্ষ হইয়া কয়েক মাস তাহার কার্য্য করেন। পরে সোসাইটির সম্পাদক শ্রীযুক্ত রায় শরচ্চন্দ্র দাস বাহাদুর সি, আই, ই, মহোদয়ের চেষ্টায় তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের একটী কর্ম্ম হইলে তিনি আর উক্তসভা হইতে পারিশ্রমিক গ্রহণ করিতেন না। এই সভায় পঠিত ও ইহার প্রকাশিত পত্রিকায় তাঁহার রামেশ্বর, কলম্বো প্রভৃতি ভ্রমণবৃত্তান্ত এবং চৈতন্যচরিত পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়। এই সময়ে তিনি কলিকাতা জাতীয় সমাজসংস্কার সমিতির কার্য্যনির্ব্বাহক সভার সম্পাদকের এবং কয়েক বৎসর কলিকাতার ভারতীয় শিল্পসমিতির সহযোগী সম্পাদকের কার্য্য করেন এবং বিবিধ বক্তৃতা দেন। এই কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি হালিসহর, কলিকাতা, সায়েদপুর, দেওঘর, ভাগলপুর, মুঙ্গের, জামালপুর, কাশী, প্রয়াগ, কানপুর, দিল্লী ও লাহোরে যে অসংখ্য বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা "Indian Mirror", "National Magazine", "South Indian Mail", "Illustrated Indian News", "Calcutta Review", "Cawpore Observer", "সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকা", "বিশ্বকোষ", "প্রবাসী", "সৎসঙ্গ", "সাহিত্য-সেবক", "ধরণী" ও "ধর্ম্মপ্রচারক" প্রভৃতি পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে ও হইতেছে।

সম্প্রতি ইনি স্বাস্থ্য, সদাচার, ঈশ্বরচিন্তা, গার্হস্থ্যধর্ম্ম, আপামরসাধারণের প্রতি কর্ত্তব্য এবং রাজধর্ম্ম বিষয়ে শাস্ত্রবচনসংগ্রহ সংকলন করিয়াছেন। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় এলাহাবাদে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের অনুশীলন, শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি, এবং দীনদিগের দুঃখ মোচন প্রভৃতি সদনুষ্ঠানের জন্য একটী সভা প্রতিষ্ঠা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং এ বিষয়ে মাননীয় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এবং মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত আদিত্যরাম ভট্টাচার্য্য তাঁহাকে বিশেষ উৎসাহ দিয়াছিলেন, কিন্তু সাধারণের সহানুভূতির অভাবে সে সঙ্কল্প বিসর্জ্জন করিয়া অবশেষে ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত রোশনলাল প্রভৃতির সাহায্যে "Society for celebrating anniversaries of Illustrious Indians" নামে একটী সভা সংস্থাপিত করেন। ইহার কার্য্য তিন বৎসর চলিয়াছিল। ইহার মধ্যে ৺রাজা রামমোহন রায়, ৺স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জীবনী সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা হইয়াছিল। এই সভায় পঠিত প্রবন্ধ "The Allahabad University Magazine" "The Kayasth Samachar" এবং "The Illustrated Indian News" পত্রিকায় ও কোনটী স্বতন্ত্র পুস্তিকাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল। একবার মান্দ্রাজের সুরাপাননিবারিণী সভা "The Drink Question in India" বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিবার জন্য ভারতের সকল প্রদেশের লোককে আহ্বান করেন এবং তন্মধ্যে যে চারিজনের প্রবন্ধ উৎকৃষ্ট হইবে তাঁহাদের পুরস্কৃত করিবেন বলিয়া ঘোষণা করেন। দীননাথবাবুর প্রবন্ধ সেই চারিজনের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট হওয়ায় তিনিই প্রথম পুরস্কার একটি সুবর্ণ-পদক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই প্রবন্ধ অপর তিনটীর সহিত স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। "বিচিত্র দর্পণ" নামে ইহার আর একখানি কাব্য আছে। তাহাতে একদিকে মানবের সদ্বৃত্তি ও অপর দিকে তাহার হীনবৃত্তি সমূহ আলো ও ছায়ার মত চিত্রিত

হইয়াছে। উহার কিয়দংশ ঢাকার মিত্রপ্রকাশে প্রকাশিত হইয়াছিল। সম্প্রতি ইনি কয়েকজন সাধুর জীবনী প্রকাশ করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। তাঁহার রচিত "জ্ঞানপ্রভা" উপন্যাসও সেই সঙ্গে মুদ্রিত করিবার ইচ্ছা আছে। কিন্তু অর্থাভাবে ইহাদের কোনখানিই বাহির হইতেছে না।

এখনও এই বার্দ্ধক্যে গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের অধ্যবসায়, উৎসাহ এবং কর্ম্মশক্তির সম্মুখে দেশের অনেক যুবা কর্ম্মবীরও মস্তক অবনত করিবেন সন্দেহ নাই।

[ক্রমশঃ।]

ইংরাজী ভাষায় বাঙ্গালী লেখক।

৮। বাবু কৃষ্ণদাস পাল।

হরিশ্চন্দ্রের মৃত্যুর পর ইনি তাঁহার মত দক্ষতার সহিত হিন্দুপেট্রিয়ট পত্রিকা মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সম্পাদিত করেন। ইহার ইংরাজী লেখা এত ভাল হইত যে বিলাতের ইংরাজগণ পর্য্যন্ত উহার প্রশংসা করিতেন। তিনি রাজনৈতিক বিষয় উত্তমরূপে বুঝিতেন। বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব্ব ছোটলাট সার রিচার্ড টেম্পল নিজের "Men and Events of my Time in India"নামক পুস্তকে লিখিয়াছেন যে রাজা সার তাঞ্জোর মাধবরাও ভিন্ন তিনি ভারতবর্ষে কৃষ্ণদাস পালের মত আর কোন রাজনীতিজ্ঞ পুরুষ দেখিতে পান নাই। তিনি ভাল ইংরাজী লিখিতে ও বলিতে পারিতেন বলিয়াই ভারতের ইংরাজ সমাজে বিশেষ সম্মানিত ছিলেন। তিনি ভিন্ন অন্য কোন এতদ্দেশীয় লোক প্রতিবৎসর কলিকাতানিবাসী স্কচদিগের সেণ্ট এণ্ড্রিউস ডিনারে নিমন্ত্রিত হন নাই। তিনি গবর্ণমেণ্ট হইতেও অনেক সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি গবর্ণর জেনারেল সাহেবের ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ছিলেন এবং অতিশয় দক্ষতার সহিত উক্ত পদের কার্য্য করিয়াছিলেন বলিয়া প্রাতঃস্মরণীয় লর্ড রিপন তাঁহার মৃত্যুতে দুঃখ প্রকাশ করিয়া একটী বিশেষ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন।

৯। বাবু শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

ইনি বাঙ্গালী কর্ত্তৃক সম্পাদিত ইংরাজী ভাষার মাসিক পত্রিকার পথপ্রদর্শক। ইহার "Mukherjea's Magazine" এক সময়ে ভারতের সর্ব্বত্র সুপ্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু নব্যসম্প্রদায়ের ভিতর তিনি "Reis and Rayyat" নামক সাপ্তাহিক পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন বলিয়া সুপ্রসিদ্ধ। তিনি ইংরাজী ভাষায় অনেকগুলি পুস্তক লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মত ইংরাজী ভারতে ইংরাজদিগের ভিতর অতি অল্প লোক লিখিতে সক্ষম। এই নিমিত্ত Skrine নামক একজন ইংরাজ সিভিলিয়ান কর্ত্তৃক তাঁহার জীবনী প্রণীত হইয়াছে।

১০। বাবু কেশবচন্দ্র সেন।

ইংলণ্ডের লোকেরা পূর্ব্বে প্রায় এইরূপ মনে করিত যে ভারতবাসীরা অর্দ্ধসভ্য বা বর্ব্বর জাতি। বাবু কেশবচন্দ্র সেন কর্ত্তৃক বহুপরিমাণে এই ধারণা দূরীকৃত হয়। ইহা সত্য যে তাঁহার পূর্ব্বে অনেক ভারতবাসী বিলাতে গিয়াছিলেন। কিন্তু ইঁহার পূর্ব্বে জনসাধারণকে কেহ ইংরাজী ভাষায় সুমধুর বক্তৃতা করিয়া মোহিত করিতে পারেন নাই। তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য লণ্ডন সহরে যে একটী সভা হয় তাহাতে বহুসহস্র ইংরাজ পুরুষ ও রমণী যোগ দিয়াছিলেন। কেশব বাবুর সেইদিনকার বক্তৃতা শুনিয়া সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন এবং ভারতবাসীরা যে অসভ্য এই ধারণা অনেকের মন হইতে দূরীভূত হইয়াছিল। তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য বিলাতে সহস্র সহস্র লোক একত্র হইত। ইহা এখন অনেক ইংরাজেরাও স্বীকার করেন যে তাঁহার মত বাগ্মিতা জগতে অতি অল্প লোকের ছিল। ইংরাজী ভাষায় তিনি অনেকগুলি ধর্ম্মবিষয়ক পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন।

১১। মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

আজ কাল এমন কোন ভদ্র বাঙ্গালী নাই, যিনি মাইকেলের কোন কাব্যগ্রন্থ পাঠ করেন নাই। তিনি বঙ্গসাহিত্যের যে উন্নতি সাধন করিয়া গিয়াছেন, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। তাঁহাকে যে সচরাচর "Milton of Bengal"বলা যায় তাহাতে কিছু মাত্র অত্যুক্তি নাই। যদিও

তিনি খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন তথাপি তাঁহার প্রণীত গ্রন্থ সকলে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অশ্রদ্ধা কিম্বা অভক্তি দৃষ্ট হয় না। তাঁহার গ্রন্থসকল পাঠ করিলে কাহারও এরূপ ধারণা হয় না যে তিনি হিন্দু ছিলেন না। তিনি বঙ্গভাষার পুস্তক লিখিবার পূর্ব্বে ইংরাজী ভাষাতেও বিস্তর গদ্য ও পদ্য লিখিয়াছিলেন। তিনি মান্দ্রাজে Atheneum নামক ইংরাজী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার ইংরাজী গদ্য ও পদ্য লিখিবার অসাধারণ শক্তি ছিল। তিনি অতি উত্তম ইংরাজী লিখিতে পারিতেন বলিয়াই একজন উচ্চঘরের এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান রমণী তাঁহার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। এতদ্দেশীয় যুবকেরা কেহ কেহ বিলাতে গিয়া মধ্যবিত্তঘরের ইংরাজ মহিলা বিবাহ করেন। অনেকস্থলে এই সব যুবকেরা নিজেদের "Indian Prince" বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হন না। যে ইংরাজ মহিলাগণ ইংলণ্ডে ভারতবাসী যুবকদিগকে বিবাহ করেন, তাঁহারা ভারতবর্ষের বিষয় প্রায় কিছুই জানেন না। এই কারণ বশতঃ এই সকল বিজাতীয় বিবাহ সুখদায়ক হয় না। কিন্তু যে ইংরাজ রমণী মাইকেল মধুসূদন দত্তের পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন তিনি মান্দ্রাজ কালেজের প্রিন্সিপালের কন্যা ছিলেন। সেই রমণী শিক্ষিতা ছিলেন এবং তাঁহার পিতা ও মাতা জীবিত থাকাতেও যে তিনি একজন ভারতবাসীকে বিবাহ করিয়াছিলেন তাহাতে ইহা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে যে তিনি মাইকেল মধুসূদনের ইংরাজী গদ্য ও পদ্য রচনায় মোহিত হইয়াছিলেন। কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী লিখিয়াছিলেন তাহাতে মাইকেলের ইংরাজী পদ্য লেখার অনেকটা নমুনা দেখাইয়াছেন। সম্প্রতি তাঁহার পদ্যগুলি একত্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত করা হইয়াছে।

১২। পাদরী লালবিহারী দে।

দে মহাশয় অতি অল্প বয়সে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। তাঁহার হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতি বিশেষ আক্রোশ ছিল। তিনি একজন অতি উত্তম লেখক ছিলেন। তাঁহার ইংরাজীভাষা ও সাহিত্যে খুব দখল ছিল। এই কারণেই তিনি হুগলী কালেজে ইংরাজী সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। তিনি প্রথমে "কলিকাতা রিভিউ"এ ইংরাজী ভাষায় প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। তৎপরে তিনি নিজে একখানি ইংরাজী মাসিক পত্রিকা সম্পাদিত করেন। এই মাসিক পত্রিকার নাম "Bengal Magazine" ছিল। ইহার অনেক সুযোগ্য লেখক ছিল। এই পত্রিকাতেই পাদরী রামচন্দ্র বসু ও খ্যাতনামা সিভিলিয়ান বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত অনেক প্রবন্ধ লিখিতেন। দে মহাশয় "Govinda Samanta" এবং "Folk Tales of Bengal" নামক দুই খানি গ্রন্থের জন্য ইংরাজী পাঠকদিগের নিকট বিশেষ পরিচিত। তাঁহার গোবিন্দ সামন্ত পুস্তকখানি পড়িয়া সুপ্রসিদ্ধ প্রাণিতত্ত্ববিদ্ ডারউইন অত্যন্ত আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। সম্প্রতি দে মহাশয়ের যে জীবনী একজন ইংরাজ পাদরী লিখিয়াছেন, তাহাতে ডারউইন সাহেবের সেই পত্রখানি মুদ্রিত হইয়াছে। যখন রো এবং ওয়েব সাহেব "Baboo English" বলিয়া বাঙ্গালীদিগের ইংরাজী লেখাকে বিদ্রূপ করিয়াছিলেন, তখন দে মহাশয় ঐ দুই ইংরাজের ইংরাজী লেখায় অনেক ভুল দেখাইয়া দিয়াছিলেন এবং এই বলিয়াছিলেন যে বঙ্গদেশে এখন অনেক বাঙ্গালী আছেন, যাঁহাদিগের নিকট রো এবং ওয়েব সাহেব বহুকাল পর্য্যন্ত ইংরাজী ভাষায় শিক্ষা লাভ করিতে পারেন।

১৩। বাবু প্যারীচরণ সরকার।

বাঙ্গালীদিগের ভিতর ইনি সর্ব্বপ্রথম কলিকাতার প্রেসিডেন্সি কালেজে ইংরাজীসাহিত্যের অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। ইনি ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন। ইনি ছাত্রদিগকে এত উত্তমরূপে শিক্ষা দান করিতে পারিতেন যে তজ্জন্য তাঁহাকে সচরাচর "Arrold of the East" বলা হইত; অর্থাৎ তাঁহাকে রগবী স্কুলের সুপ্রসিদ্ধ হেডমাষ্টার টমাস আর্ণোল্ড সাহেবের সহিত তুলনা করা হইত। ছাত্রদিগের জন্য পাঠ্য পুস্তক রচনা করা অত্যন্ত কঠিন। কোন বিষয়ে সুপণ্ডিত না হইলে এইরূপ পুস্তক রচনায় কৃতকার্য্যতা লাভ করা যায় না। প্যারীচরণবাবু বালকদিগের ইংরাজী শিক্ষার নিমিত্ত যে সকল পুস্তক রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে যে

তিনি বিশেষ কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন, তাহা বোধ করি কাহারও অবিদিত নাই। এই সকল পুস্তক এখন ভারতবর্ষের অনেক স্কুলে ব্যবহৃত হয়। সরকার মহাশয় সুরা পানের অত্যন্ত বিরোধী ছিলেন এবং তাহা নিবারণের জন্য বিশেষ যত্ন করিয়াছিলেন। এই জন্য তিনি এক খানি ইংরাজী মাসিক পত্রিকা সম্পাদন করেন। এই পত্রিকা খানির তাঁহার মৃত্যু পর্য্যন্ত বিশেষ প্রচার ছিল।

১৪। কুমারী তরুদত্ত।

ইংরাজী ভাষায় যত বাঙ্গালী লেখক হইয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের কাহারও লেখা বোধ করি ইংরাজী সাহিত্যে চিরস্থায়ী হইবেক না। কিন্তু ইহা আশা করা যাইতে পারে যে কুমারী তরুদত্তের পদ্য ইংরাজী সাহিত্যে চিরস্থায়িত্ব লাভ করিবেক। ইহার পদ্যপুস্তকের এ পর্য্যন্ত ৪।৫ সংস্করণ হইয়া গিয়াছে। ইহার বিষয় আমাদের দেশের শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই অবগত আছেন। ২১ বৎসর বয়সে ইহার মৃত্যু হয়। কিন্তু সেই অল্পবয়সের ভিতরে তিনি যেরূপ ইংরাজী ও ফরাসী ভাষায় পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন তাহা আশ্চর্য্যের বিষয়। তাঁহার ফ্রেঞ্চ ভাষায় লিখিত উপন্যাস ও ইংরাজী ভাষায় বিরচিত কবিতাগুলি ইউরোপ ও আমেরিকায় বিশেষ আদৃত। মৃত্যুর কিছু কাল পূর্ব্বে তিনি সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং সেই ভাষার কোন কোন পুস্তকের কোন কোন অংশ ইংরাজী পদ্যে অনুবাদ করেন। ইহাঁর ভগ্নী কুমারী অরুদত্তের ইংরাজী গদ্য ও পদ্য লিখিবার বিশেষ ক্ষমতা ছিল। কুমারী তরুদত্তের পূর্ব্বে তাঁহার মৃত্যু হয়। তজ্জন্য তিনি কোন পুস্তক রচনা করিয়া যাইতে পারেন নাই। কিন্তু তিনি যে সকল ইংরাজী কবিতা লিখিয়া গিয়াছিলেন, তাহা কুমারী তরুদত্তের পুস্তকে সঙ্কলিত হইয়াছে। ইহাদের পিতা বাবু গোবিন্দচন্দ্র দত্তও ইংরাজী ভাষাতে একজন সুলেখক ছিলেন। তিনি কলিকাতা রিভিউ পত্রিকাতে অনেকগুলি প্রবন্ধ লিখিয়া গিয়াছেন।

১৫। রায় বাহাদুর বাবু শশীচন্দ্র দত্ত।

ইংরাজী ভাষায় গদ্যে ও পদ্যে ইনি অনেক পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। কলিকাতা রিভিউ এ ইনি প্রথম ইংরাজী ভাষায় প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করেন। তৎপরে তিনি এত উত্তম ইংরাজী লিখিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন যে প্রবাদ আছে যে তিনি এক সময় ইংরাজী ছদ্ম নামে বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ "Blackwood's Magazine" এ উপন্যাস লেখেন। কিন্তু ঐ উপন্যাস যে একজন বাঙ্গালীর লেখা, ইংরাজের নহে, তাহা সেই পত্রিকার ইংরাজ সম্পাদক অনুমান করিতে পারেন নাই। ইহার প্রণীত "Bengaliana", "India past and present;" "Visions of Sumeru and other poems" প্রভৃতি পুস্তক এককালে সুপ্রসিদ্ধ ছিল। তিনি মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে আপনার সমস্ত পুস্তক বিলাত হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত করেন।

১৬। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র।

সুসভ্য জগতে এমন কোন দেশ নাই যেখানে রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের নাম পরিচিত নহে। ইনি ভারতের প্রত্নতত্ত্ববিদদিগের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন। নানাদেশের বিদ্বন্মণ্ডলীতে সম্মানিত ছিলেন বলিয়াই, তিনি কোন কোন নীচ প্রকৃতির ইংরাজদিগের হিংসা ও ঈর্ষাভাজন হইয়াছিলেন। ডাক্তার ফার্গুসন নামক একজন অতি কুৎসিত অন্তঃকরণের লোক তাঁহাকে ও তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য বাঙ্গালীদিগকে গালাগালি দিয়া একখানি বই লিখিয়াছিলেন। রাজেন্দ্রলাল মিত্র যে অতি উত্তম ইংরাজী লিখিতেন তাহা তাঁহার শত্রুরা পর্য্যন্ত স্বীকার করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রণীত "Indo-Aryans", "Buddha Gaya", "Antiquities of Orissa", "Notices of Sanskrit Manuscripts," "Nepalese Buddhist Literature" প্রভৃতি গ্রন্থ সকল প্রত্নতত্ত্ববিদ্ ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের মধ্যে সুপ্রসিদ্ধ। তাঁহাকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় "ডাক্তার অব লস" এই সম্মানসূচক উপাধি দান করেন। ইউরোপ ও আমেরিকার অনেক বিদ্বৎসমিতি তাঁহাকে সম্মানিত সভ্য নির্ব্বাচন করিয়াছিলেন। তিনি ভিন্ন আর কোন বাঙ্গালী এ পর্য্যন্ত কলিকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটীর সভাপতি পদে মনোনীত হন নাই।

১৭। পাদরী রামচন্দ্র বসু।

প্রবাসী খৃষ্টান বাঙ্গালীদিগের ভিতর ইনি সর্ব্বোত্তম ইংরাজী বলিতে ও লিখিতে পারিতেন। ইংরাজী ভাষাতে ইনি কতকগুলি পুস্তক লিখিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় হিন্দু ও ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে গালাগালি দেওয়া তাঁহার এই পুস্তকগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য। তজ্জন্য তাঁহার পুস্তকসকল এখন প্রায় কোন শিক্ষিত ভারতবাসী পাঠ করেন না। তিনি ইউরোপ ও আমেরিকায় ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ইংরাজী ভাষায় বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল বলিয়া মার্কিন দেশের একটী প্রসিদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁহাকে সম্মানসূচক M. A. উপাধি দান করেন। "Gossip about Europe and America" গ্রন্থে তিনি নিজের ইউরোপ ও মার্কিন দেশে ভ্রমণবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

১৮। ডাক্তার ভোলানাথ চন্দ্র।

ইনি ভারতের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া তদ্বিষয়ে ইংরাজী ভাষায় পুস্তক রচনা করেন। "Travels of a Hindoo" বলিয়া ইনি যে পুস্তক লেখেন তাহা এক সময়ে এংগ্লো-ইণ্ডিয়ানদিগের ভিতর সুপরিচিত ছিল। প্রসিদ্ধ ইতিহাসলেখক Sir John Kaye এবং Colonel Malleson তাঁহাদিগের সিপাহীবিদ্রোহনামক ইতিহাসে অনেকস্থলে ইঁহার পুস্তক হইতে কানপুর প্রভৃতি স্থানের বিদ্রোহের ঘটনার বিষয় উদ্ধৃত করিয়াছেন। "কলিকাতা রিভিউ", "কলিকাতা ইউনিবর্সিটি মেগেজিন" প্রভৃতি পত্রিকায় ইনি অনেক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন।

১৯। বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার।

যেমন কেশববাবু ইংলণ্ডে ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা দিয়া বাঙ্গালীদের মুখোজ্জ্বল করিয়াছিলেন, সেইরূপ প্রতাপবাবু মার্কিন দেশে ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা দিয়া ও প্রবন্ধ লিখিয়া ভারতবাসীরা যে অসভ্য নহে তাহার পরিচয় দেন। ইংরাজী ভাষাতে তিনি যেমন সুলেখক তেমনি সুবক্তা। ইঁহার রচিত "Oriental Christ" ও "Heart Beats" নামক দুইখানি পুস্তকের অনেক সংস্করণ বাহির হইয়াছে। তিনি কেশব বাবুর যে জীবনচরিত ইংরাজী ভাষায় লিখিয়াছেন, তদ্বিষয়ে মাদ্রাজের সুবিখ্যাত ডাক্তার মার্ডক সাহেব এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন যে প্রতাপ বাবু ভিন্ন আর কেহ এ দেশে জীবনচরিত লিখিতে জানেন না। এই পুস্তক লেখার দরুণ তাঁহাকে বস্‌-ওয়েলের সহিত তুলনা করা হয়। "Faith and progress of the Brahmo Somaj" নামক গ্রন্থে তিনি ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত অতি সুন্দর ভাষায় বর্ণনা করিয়াছেন।

২০। বাবু সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

আজ কাল যে ভারত ব্যাপিয়া রাজনৈতিক আন্দোলন ও আলোচনা হইতেছে ও ভারতবাসীদিগের ভিতর যে ঐক্যের ভাব দেখা দিয়াছে, তাহা বহু পরিমাণে সুরেন্দ্র বাবুর বক্তৃতার গুণে। সমস্ত ভারতের ভিন্ন ভিন্ন জাতি কিরূপে সুরেন্দ্রবাবুর ইংরাজী বক্তৃতায় উত্তেজিত হইয়াছে, ও তাঁহার নাম কিরূপ ভারতের সর্ব্বত্র সমাদৃত ও প্রসিদ্ধ, তাহা কটন সাহেব "New India" নামক গ্রন্থে বর্ণনা করিয়াছেন। সুরেন্দ্রবাবু ইংরাজী ভাষায় কোন গ্রন্থ রচনা করেন নাই কিন্তু তাঁহার মত ইংরাজী ভাষায় সুবক্তা ভারতে কেন, বিলাতেও অতি বিরল। তিনি যে ইংরাজী ভাষায় একজন সুলেখক, তাহা তাঁহার সম্পাদিত "বেঙ্গলী" নামক দৈনিক পত্রিকা পরিচয় দিতেছে।

২১। বাবু নগেন্দ্রনাথ ঘোষ।

এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান দিগের এইরূপ ভুল ধারণা আছে যে ভারতবাসী কর্ত্তৃক যত ইংরাজী ভাষায় সম্পাদিত পত্রিকা আছে, তাহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের উপর লোকদের অশ্রদ্ধা ও অভক্তি জন্মান। বোম্বাইয়ের ইণ্ডিয়ান স্পেক্টেটার ও বাবু নগেন্দ্রনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক সম্পাদিত ইণ্ডিয়ান নেশন পত্রদ্বয়কে তাঁহারা এই শ্রেণীভুক্ত মনে করেন না। শেষোক্ত পত্রিকাখানি ভারতবর্ষের এংগ্লো-ইণ্ডিয়ান সমাজে সুপরিচিত। বাবু নগেন্দ্রনাথ ঘোষ ইংরাজী ভাষায় একজন সুলেখক। তিনি ইণ্ডিয়ান নেশন পত্রিকার সম্পাদকতা ভিন্ন ইংরাজী ভাষায় কয়েক খানি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। তন্মধ্যে "Kristo Dass Pal—A Study" এবং "Memoirs of Maharaja Nub Kissen Bahadur" এই দুইখানি বই সুপ্রসিদ্ধ।

২৮। বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত।

ভারতবাসী সিভিলিয়ানদিগের মধ্যে রমেশবাবু সর্ব্বপ্রধান ছিলেন; কারণ যে পদ হইতে তিনি অবসর গ্রহণ করেন তাহা তাঁহার পূর্ব্বে অন্য কোন ভারতবাসী পান নাই। তিনি সরকারী কার্য্য ভিন্ন সাহিত্যচর্চ্চায় লিপ্ত থাকিতেন। বাঙ্গালা ভাষায় তিনি অনেক ঐতিহাসিক উপন্যাস লিখিয়াছেন। তিনি সিভিল সার্ব্বিস পরীক্ষায় ইংরাজী সাহিত্যে দ্বিতীয় স্থান লাভ করিয়া অনেক ইংরাজকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। এখন তিনি রাজনীতি ও সাহিত্যচর্চ্চায় দিন যাপন করেন। ইংরাজী ভাষায় তিনি যে সকল পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহার মধ্যে "History of civilization in Ancient India প্রধান। এই পুস্তকের জন্য বিশেষ করিয়া তিনি গবর্ণমেণ্ট হইতে C.I.E. উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি ইংরাজী পদ্যেও অনেকগুলি পুস্তক রচনা করিয়াছেন। সম্প্রতি সংক্ষেপে রামায়ণ ও মহাভারতের ইংরাজী পদ্য অনুবাদ করিয়া সুখ্যাতি লাভ করিয়াছেন। অল্পদিন হইল The Lake of Palms নাম দিয়া নিজ "সংসার" নামক উপন্যাসের ইংরাজী অনুবাদ মুদ্রিত করিয়াছেন।

উপসংহার।

উপরিলিখিত ব্যক্তিগণ ভিন্ন আরও অনেকে ইংরাজী ভাষায় পুস্তকাদি লিখিয়াছেন। অমৃতবাজার পত্রিকার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক বাবু শিশিরকুমার ঘোষ ইংরাজী ভাষায় যে চৈতন্যদেবের জীবনচরিত লিখিয়াছেন তাহা কেবল ভারতে নহে পরন্তু অন্যান্য দেশেও বিখ্যাত। বাঙ্গালাদের ভিতর বাবু কিশোরীলাল রায় ও এতদ্দেশীয় প্রবাসী স্বর্গীয় রামচন্দ্র সেন মহাশয় যেসকল দার্শনিক প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহা পাশ্চাত্য দেশেও সুপরিচিত। হিন্দুদিগের যোগ দর্শনের উপর বাবু শ্রীশচন্দ্র বসু যে সকল পুস্তক রচনা করিয়াছেন তাহা ইউরোপ ও আমেরিকার দার্শনিকদিগের ভিতর যেরূপ প্রসিদ্ধ আছে, তাহা ভট্ট মোক্ষমূলারের "Six Schools of Hindoo Philosophy" পাঠ করিলে জানিতে পারা যায়। বাবু প্রমথনাথ বসুর "History of Hindoo Civilization under the British Rule" নামক পুস্তকও সুলিখিত এবং শিক্ষিত ভারতবাসীদিগের ভিতর তাহা অবিদিত নহে। আইন লইয়া যে সকল পুস্তক বাবু শ্যামাচরণ সরকার, ডাক্তার যোগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, ডাক্তার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, ডাক্তার রাসবিহারী ঘোষ প্রভৃতি লিখিয়াছেন, তাহা আইনজ্ঞদিগের ভিতর সুপরিচিত। সম্প্রতি বিজ্ঞানাচার্য্য শ্রীজগদীশচন্দ্র বসু ও শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় বৈজ্ঞানিক বিষয়ে অতি উৎকৃষ্ট ইংরাজী পুস্তক লিখিয়াছেন। আমার বোধ হয় এমন কোনই বিষয় নাই, যাহা লইয়া বাঙ্গালীদিগের ভিতর কেহ না কেহ পুস্তক কিম্বা প্রবন্ধাদি লেখেন নাই। বাঙ্গালীদিগের ইংরাজী ভাষায় লিখিত পুস্তকের তালিকা করিলে বোধ হয় তাহার সংখ্যা পাঁচ শতের কম হইবে না।

প্রতিদিন ইংরাজী ভাষায় বাঙ্গালী লেখকদিগের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছে। একজন বাঙ্গালী যুবক যে এখন বিলাতে গিয়া ইংরাজী মাসিক পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে সমর্থ হইবে, ইহা বোধ করি "Baboo English" শব্দের স্রষ্টারা মনে করিতে পারিতেন না। বোধ করি অনেকে ইহা জানেন না যে মিষ্টর শরৎকুমার ঘোষ এখন বিলাতের অনেক মাসিক পত্রিকায় ভারতবর্ষ সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিয়া কিঞ্চিৎ পরিমাণে এতদ্দেশের উপকার সাধন করিতেছেন। শ্রীমতী সরোজিনী নায়ডু যেরূপ ইংরাজী ভাষায় কবিতা লেখেন, তাহা অতিশয় প্রশংসনীয়। শিক্ষিত বাঙ্গালীদিগের মধ্যে এখন আর কেহ জষ্টিস অনুকূলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জীবনী লেখকের মত ইংরাজী ভাষায় পুস্তক লেখেন না।

কিন্তু অনেক পরিশ্রম করিয়া শিক্ষিত ভারতবাসীরা যে ইংরাজী কবিতা কিম্বা অন্যান্য বিষয়ে পুস্তকাদি রচনা করেন, তাহা সেই ভাষার সাহিত্যে কখন কোন স্থায়ী স্থান লাভ করিবেক না। অতএব তাঁহাদের রচনার চিরস্থায়িত্ব অসম্ভব। মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইহা স্পষ্টরূপে বুঝিতে পারিয়াছিলেন বলিয়াই ইংরাজী পদ্য লেখা ছাড়িয়া বাঙ্গালা ভাষায় কাব্য লিখিতে আরম্ভ করেন। সম্প্রতি বিলাত হইতে ডাক্তার গার্ণেট সাহেবের সম্পাদকতায় যে ২০ ভাগে "International Library of Famous

Literature" বলিয়া পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে কুমারী তরুদত্তের এক কবিতা এবং ৺বাবু প্রতাপচন্দ্র রায়ের মহাভারতের ইংরাজী অনুবাদের কিয়দংশ ভিন্ন অন্য কোন ভারতবাসী ইংরাজী লেখকদের রচনা উদ্ধৃত করা হয় নাই। অনেক স্থলে পাশ্চাত্য যে সকল লেখকের রচনা উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহাদের নাম ও রচিত গ্রন্থ সকল প্রায় অপরিচিত এবং অধিকাংশ স্থলে জানিবার যোগ্যও নহে। কিন্তু ইংরাজদিগের ভিতর অন্য জাতির প্রতি হিংসা, দ্বেষ ও ঈর্ষা এতদূর প্রবল যে ভারতবাসী সুযোগ্য ইংরাজী লেখকদের রচনাকেও তাঁহারা দাবিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন ও তাঁহাদিগকে (যেমন কটন সাহেব তাঁহার প্রণীত "New India" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন) খুব ঘৃণা করেন। এরূপস্থলে ভারতবাসীদিগের নিজের দেশের ইংরাজী লেখকদিগের রচনা সংগ্রহ করা উচিত। 'কলিকাতা রিভিউ', 'বেঙ্গল মেগেজিন', 'মুখর্জিস্ মেগেজিন', 'হিন্দুপেট্রিয়ট' প্রভৃতি পত্রিকায় অনেক কৃতবিদ্য বাঙ্গালী লেখকদিগের উপকারী প্রবন্ধ সকল প্রোথিত হইয়া রহিয়াছে। প্রত্যেক লেখকের জীবনীর সহিত তাঁহার রচনা সঙ্কলিত করা উচিত। সভ্যজগতের জানিবার জন্য এতদ্দেশীয় ইংরাজী ভাষায় লেখকদিগের রচনা হইতে কোন কোন অংশ উদ্ধৃত করিয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিলে ভাল হয়।

যখন ইংরাজী ভাষায় লেখা ইংরাজী সাহিত্যে স্থায়িত্বলাভ করিতে পারিবেক না, তখন সেই ভাষায় লেখার আবশ্যক কি? অনেকে এরূপ প্রশ্ন করিতে পারেন। এই প্রশ্নের প্রথম উত্তর এই যে আমাদের মনের ভাব ও আমাদের সাংসারিক অভাব যাঁহারা আমাদের বর্ত্তমান শাসনকর্ত্তা তাঁহাদিগের নিকট প্রকাশ করিবার জন্য আমাদের ভিতর হইতে ইংরাজী লেখক ও বক্তার প্রয়োজন আছে। ইংলণ্ডের মত ক্ষুদ্র দ্বীপেরই ভাষা ইংরাজী নহে। পরন্তু উত্তর আমেরিকার অধিকাংশভাগের, অষ্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা এবং এশিয়ার কোন কোন দ্বীপপুঞ্জের ভাষা ইংরাজী। আমরা যে অসভ্য নই তাহা ঐ সকল দেশের লোকদের জানাইবার জন্য ইংরাজী ভাষাতে লেখা আবশ্যক। কেবল রাজনৈতিক আন্দোলনের নিমিত্তই ইংরাজী ভাষাতে লেখার আবশ্যক নহে। পরন্তু আমাদের শাস্ত্রে যে সকল উচ্চদরের কথা আছে তাহা পাশ্চাত্য জগতকে জানাইবার জন্য ইংরাজী ভাষায় লেখা আবশ্যক। খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী মিশনরীগণ যেরূপে আমাদিগকে সভ্য জগতের সম্মুখে চিত্রিত করিয়াছেন, সেই চিত্র মুছিয়া ফেলিবার জন্য ইংরাজী লেখকের আবশ্যক। ভারতবাসীদিগের মধ্যে যে একটা জাতীয় ঐক্যের ভাব এখন দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার অনেক অংশ ইংরাজী শিক্ষার ফলে। আমাদের ভিতর যত দিন এক সাধারণ জাতীয় ভাষার সৃষ্টি না হয়, ততদিন আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের ইংরাজী ভাষাকে সাধারণ জাতীয় ভাষাস্থলে ব্যবহার করা উচিত। এই সকল কারণে যাঁহারা ইংরাজী ভাষায় লিখিয়া ও বক্তৃতা করিয়া আমাদের জাতিকে সভ্য জগতের নিকট সম্মানিত করিয়াছেন, আমাদিগের তাঁহাদিগকে সম্মান প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। স্বামী বিবেকানন্দের ইংরাজী ভাষায় বলিবার ও লিখিবার শক্তি ছিল বলিয়াই হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি মার্কিন দেশবাসীদিগের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। অষ্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকায় আজকাল যে ভারতবাসীদিগকে "কুলী" মনে করিয়া ঘৃণা করে, আমাদের বোধ হয় সেই সব দেশে যদি লালমোহন ঘোষ ও কালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মত লোকেরা গিয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন, তাহা হইলে ভারতবাসীদিগের সম্বন্ধে যে তাহাদের একটী ভুল ধারণা আছে, তাহা দুরীকৃত হইবেক।

শ্রীবামনদাস বসু।

দাস-নন্দিনী।

হত্যাকাণ্ডের পরদিন জুলেখা পিতৃগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া যখন সমুদয় বৃত্তান্ত শ্রবণ করিল, তখন সে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া গেল। তাহার প্রাণে কি যে এক ঘোর অবসাদ আসিয়া উপস্থিত হইল, তাহা আর বর্ণনা করা যায় না। হায়! সে শমসুদ্দীনের সহিত পরিণয়সূত্রে মিলিত হইয়া কত সুখের কল্পনা করিয়াছিল; কত মানসী

শোভায় সংসারকে বিভূষিত করিয়াছিল। এক মুহূর্ত্তে তাহার পক্ষে সমস্ত সংসার যেন অন্ধকারময় হইয়া উঠিল; জীবনের প্রতি তাহার ঘোর বিতৃষ্ণা উপস্থিত হইল। সে অনুভব করিল যে আর কখন ও সে পিতাকে শ্রদ্ধাভক্তি করিতে পারিবে না। সে পিতাকে তাহার নিষ্ঠুরতার জন্য তিরস্কার করিতেছিল; কিন্তু লালচীন রূঢ়ভাবে ধমক দিয়া তাহার মুখ বন্ধ করিয়া দিল।

শমসুদ্দীন সিংহাসনে আরোহণ করিয়াই জুলেখাকে বিবাহ করিবার জন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। কিন্তু জুলেখা সম্মত হইল না। সে পিতার সহিত দেখা সাক্ষাৎ পর্য্যন্ত বন্ধ করিয়া দিল। শমসুদ্দীন তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া নির্ব্বন্ধাতিশয়সহকারে বলিলেন, "জুলেখা! তুমি কি আমাকে সুখী করিবে না?"

জুলেখা। অমঙ্গলে আপনার রাজত্বের সূত্রপাত হইয়াছে। যে রাজার সিংহাসনলাভের পথ রক্তে কলঙ্কিত, তাঁহার রাজসম্পদ পরিবর্দ্ধমান হইবার সম্ভাবনা কোথায়?

রাজা। উচ্চমনা জুলেখা! যে সঙ্কটে পড়িয়া আমাকে রাজদণ্ড ধারণ করিতে হইয়াছে, তাহাতে গত্যন্তর কি ছিল? যে ঘটনায় আমাকে রাজপদে উন্নীত করিয়াছে, তাহাতে তুমি যেমন দুঃখিত, আমিও তদ্রূপ। যাহারা আমার ভ্রাতার রক্তে কলঙ্কিত হস্তে আমাকে মসনদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে, আমি তাহাদিগকে ঘৃণা করি। কিন্তু তাঁহাকে রাজকার্য্য নির্ব্বাহে অক্ষম করিয়া ফেলায় অন্য একজন রাজার প্রয়োজন হইয়া উঠে, এবং আমিই তাঁহার নিকটতম আত্মীয়। তুমি জান বাহ্‌মনী রাজ্যের নিয়মানুসারে অন্ধরাজা রাজত্ব করিতে পারেন না। আমি যদি রাজদণ্ড পরিচালন করিতে অস্বীকার করি, তাহা হইলে আমি অনেক ক্ষমতাশালী লোকের সন্দেহ ভাজন হইব, এবং আমার জীবন সর্ব্বদাই সঙ্কটাপন্ন হইবে।

জুলেখা। মহারাজ! যিনি এরূপ ভীষণ ঘটনার সুযোগে রাজসম্মান লাভ করিয়াছেন, আমি তাঁহার পত্নী হইতে সঙ্কুচিত হইতেছি। যে ঘোরতর অপরাধ আপনাকে হঠাৎ মসনদে স্থাপিত করিয়াছে, আমি আপনাকে তাহাতে কলঙ্কিত মনে করি না, কিন্তু তথাপি আমি আপনার শোণিতরঞ্জিত গৌরবের অর্দ্ধাংশভাগিনী হইতে সম্মত নহি। আমি আমার পিতার দুরাকাঙ্ক্ষার কেবল কুফলই দেখিতে পাইতেছি। সিংহাসনচ্যুত বাদশাহ্, সতীনারীর পক্ষে যাহা ঘোরতম অত্যাচার, আমার প্রতি তদ্রূপ অত্যাচার করিলেও আমি নিজে প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা না করিয়া ন্যায়বান্ পরমেশ্বরের হস্তেই তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতাম। বিধাতার ন্যায়বিচার হইতে কাহারও নিষ্কৃতি নাই।

রাজা। জুলেখা! তোমার প্রেম হইতে বঞ্চিত হইবার মত কি কাজ করিয়াছি?

জুলেখা। আপনি আমার প্রেম হইতে বঞ্চিত হন নাই; আপনার পত্নী হইবার সম্মতি হইতে বঞ্চিত হইয়াছেন। আপনার ও আমার মধ্যে দুর্লঙ্ঘ্য বাধা রহিয়াছে।

রাজা। দেখ জুলেখা, আমিই আমার ভ্রাতার উত্তরাধিকারী ছিলাম। যুবরাজ থাকিতে থাকিতে যদি তোমায় সহিত বিবাহ হইয়া যাইত, তাহা হইলেও ত আমি কালক্রমে রাজা হইতাম ও তুমি রাণী হইতে। তোমার পিতার নিষ্ঠুরতায় কেবল শীঘ্র অকালে রাজা হইয়াছি, এইমাত্র প্রভেদ।

জুলেখা। কিন্তু আপনি কালক্রমে ন্যায়সূত্রে রাজা হইলে গৌরব ও সম্মানের সহিত রাজা হইতে পারিতেন; এখন অপযশের সহিত সিংহাসনারোহণ করিয়াছেন।

রাজা। আমি তোমার জন্ত সমুদয় রাজ্যসম্পদ পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি।

জুলেখা। তাহা কেমন করিয়া হইবে? আমি বিদায় চাহিতেছি। ভগবান্ আপনাকে সুখী করুন।

শমসুদ্দীন রাজা হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু নামে মাত্র। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার দুরবস্থা স্মরণ করিয়া তিনি ভয়ে লালচীনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোন কাজ করিতে সাহস পাইতেন না। প্রকৃত রাজশক্তি সমস্তই তাহার হস্তে ছিল। ওমরারাও ভয়ে তাহাকে মান্য করিয়া চলিত। রাজমাতা নিজে এক সময়ে বাঁদী ছিলেন; এই জন্ত তিনি লালচীনকে খুব খাতির করিতেন। পুত্রকে বলিতেন, "বাবা, তুমি প্রধান মন্ত্রী লালচীনের পরামর্শ অনুসারে চলিও। সেই তোমাকে সিংহাসনে স্থাপন করিয়াছে। তদ্ভিন্ন ইহাও তোমার স্মরণ রাখা উচিত যে যে ব্যক্তি এক ভ্রাতাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছে, সে অনায়াসে অপর ভ্রাতাকেও সিংহাসনচ্যুত করিতে পারে। অনেকে তাঁহার বিরুদ্ধে তোমাকে অনেক কথা বলিবে; কিন্তু তুমি কোন কথায় কান্ দিও না। তাহার প্রতি তোমার কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা উচিত।"

শমসুদ্দীন। মা, সিংহাসন পাইয়া আমার জীবন দুর্ব্বহ বোধ হইতেছে। সিংহাসন পাইয়াছি বটে, কিন্তু জুলেখার সহিত আমার বিবাহের কোন সম্ভাবনা নাই।

রাজমাতা। ইহা তোমার মনের ভ্রম। এখন তোমাকে অনেক রাজা কন্যা দিতে ব্যগ্র হইবে; এখন নিম্নশ্রেণীর লোকদের সহিত সম্বন্ধ না ঘটাই ভাল।

শমসুদ্দীন। কিন্তু তুমিই ত লালচীনের প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাইতে বলিতেছিলে।

মাতা। হাঁ; কিন্তু লালচীনের কন্যাকে বিবাহ না করিয়াও তাহার প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখান যাইতে পারে।

শমসুদ্দীন। কিন্তু জুলেখাকে বিবাহ করা আমার একান্ত বাসনা; তাহার পিতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন জন্ত নহে, স্নেহের গৌরব ও নারীকুলের ভূষণ স্বরূপিনী রমণীর প্রতি প্রেম প্রদর্শন জন্ত।

মাতা। বাছা, এ সকল যৌবনসুলভ ভাবোচ্ছ্বাসমাত্র; রাজকার্য্যের চিন্তায় শীঘ্রই এসকল তোমার হৃদয় হইতে অপনীত হইবে।

রাজা। না মা, আমার হৃদয় হইতে জুলেখার ছবি কখনও মুছিবার নয়।

এইরূপে রাজমাতা পুত্রকে জুলেখার পাণিগ্রহণ চিন্তা পরিত্যাগ করাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিলেন, কিন্তু সকল চেষ্টাই বিফল হইল। পুত্রের সহিত কোন পরাক্রমশালী রাজবংশের ঔদ্বাহিক সম্পর্ক ঘটিলে লালচীন আর তাহার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না, এই অভিপ্রায়েই শমসুদ্দীনের মাতা এই চেষ্টা করিতেছিলেন।

লালচীন এখন নিজ কন্যাকে রাজরাণী করিবার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করিতে লাগিল। শমসুদ্দীন জুলেখাকে বিবাহ করিবার জন্য ব্যগ্র ছিলেন; অথচ এই বিবাহে যাহার লাভ অধিক, সেই জুলেখাই অসম্মত! ইহাতে লালচীনের, কন্যার প্রতি, অত্যন্ত ক্রোধের উদয় হইল। সে কন্যাকে জোর করিয়া রাজার সহিত পরিণীতা করিতে প্রতিজ্ঞা করিল। সে কঠোরতার সহিত বলিল—

"জুলেখা, তুমি যাঁহাকে ভালবাস বলিয়া নিজমুখে স্বীকার করিয়াছ এবং যিনি তোমাকে সিংহাসনের অর্দ্ধাংশভাগিনী করিতে প্রস্তুত, তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাও না, এ কেমন কথা শুনিতেছি?"

জুলেখা। বাবা, ইহা সত্য। যে সিংহাসন উঁহার ন্যায্য অধিকারীর রক্তে কলঙ্কিত, আমি তাহাতে বসিতে কখনও সম্মত হইতে পারি না। বর্ত্তমান রাজা যতদিন ভূতপূর্ব্ব রাজার সিংহাসনচ্যুতির ফলভোগ করিবেন, ততদিন তিনি ঐ অপরাধেরও অংশী থাকিবেন।

লালচীন। পিতার প্রতি কন্যার এরূপ ভাষা প্রয়োগ করা উচিত নয়। তুমি জান, তুমি শমসুদ্দীন বাদশাহকে বিবাহ কর, ইহাই আমার হৃদয়ের প্রিয়তম অভিলাষ। তোমাকে যাঁহাকে বিবাহ করিতে বলিতেছি, তিনি যদি তোমার ঘৃণার পাত্র হইতেন, তাহা হইলে তোমার অসম্মতি যুক্তিসঙ্গত হইত। তাহা যখন নয়, তখন আশা করি তুমি অবিলম্বে বাদশাহের পত্নী হইবে।

জুলেখা। যতদিন তিনি রক্তকলঙ্কিত সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকিবেন, ততদিন নহে। তুমি আমার পিতা; তোমার ক্ষমতা আমি অবগত আছি। আমার প্রাণ তোমার হাতে, কিন্তু আমার ইচ্ছা নিজের। তুমি আমার প্রাণ বধ করিতে পার, কিন্তু বলপ্রয়োগ দ্বারা কখনই আমার ইচ্ছাকে তোমার ইচ্ছার বশবর্ত্তী করিতে পারিবে না।

লালচীন। না, জুলেখা, তোমার প্রাণ লইব না। কিন্তু তুমি জান তোমার স্বাধীনতাও আমার হস্তে। তুমি যদি আমার কথা না শুন, তাহা হইলে তোমাকে কারারুদ্ধ করিব। কারাগারে তুমি এমন শাস্তিভোগ করিবে, যাহা তুমি কখনও স্বপ্নেও ভাব নাই।

জুলেখা। আমি অবাধ্যতার ফলাফল ভাল করিয়াই বিবেচনা করিয়াছি। আমি শাস্তিভোগ করিতে প্রস্তুত আছি। যিনি নিজের রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করিতে ইতস্ততঃ করেন নাই, তিনি যে নিজ কন্যাকে কয়েদ করিতে কিছুই দ্বিধা বোধ করিবেন না, তাহা আমি বেশ বুঝি। কিন্তু আমার প্রতিজ্ঞা সম্বন্ধে তোমাকে সম্পূর্ণরূপে নিঃসন্দেহ করিবার জন্য বলিতেছি, আমি কখনই তোমার অভিলাষ অনুসারে কাজ করিব না। আমাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিতে পার।

লালচীন কোন উত্তর না দিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। এদিকে তাহার অবস্থা বিপৎসঙ্কুল হইয়া উঠিতে লাগিল। ঘিয়াসুদ্দীন ও শমসুদ্দীনের পিতা মামুদ শাহ মৃত্যুকালে নিজের দুই ভগিনীপতি ফিরোজ খাঁ ও আহমদ খাঁকে বিশ্বস্ততার সহিত ঘিয়াসের সাহায্য করিতে বলিয়া গিয়াছিলেন। লালচীন যে সময়ে ঘিয়াসকে অন্ধ করে ও তাঁহার অনুরক্ত ওমরাদের প্রাণবধ করে, তখন ফিরোজ খাঁ ও আহমদ খাঁ রাজধানী কুলবর্গায় না থাকায় তাঁহাদের প্রাণ রক্ষা হইয়াছিল। ঘিয়াস অন্ধ ও রাজ্যচ্যুত হওয়ায় এখন তাঁহার দুই পিতৃস্বসা নিজ নিজ স্বামীকে ইহার প্রতিশোধ লইতে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। তাঁহারাও স্বভাবতই লালচীনকে জব্দ করিতে ইচ্ছুক হইলেন, কিন্তু লালচীনের সর্ব্বত্রই গোয়েন্দা ছিল। সে ফিরোজ খাঁ ও আহমদ খাঁর অভিপ্রায় জানিতে পারিল। সে শমসুদ্দীনের নিকট গিয়া বলিল, "মহারাজ, আমাকে দণ্ড দেওয়া ইঁহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য নহে। ইঁহাদের উদ্দেশ্য আপনার ভ্রাতাকে পুনর্ব্বার সিংহাসনে স্থাপন করিয়া আপনার প্রাণবধ করা। অতএব আপনি অগ্রেই তাঁহাদিগকে গ্রেপ্তার করিয়া তাঁহাদের চক্রান্ত বিফল করুন।" শমসুদ্দীন নিজের এই দুই জন আত্মীয়কে অতিশয় সাহসী ও ক্ষমতাশালী বলিয়া জানিতেন। তজ্জন্য সহজে লালচীনের কথা অনুসারে কাজ করিতে রাজী হইলেন না। তদ্ভিন্ন লালচীনের প্রভুত্ব তাঁহার দিন দিন অসহ্য হইয়া উঠিতেছিল। রাজার দ্বারা সাক্ষাৎভাবে স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির সম্ভাবনা কম দেখিয়া লালচীন রাজমাতার নিকট গিয়া সমুদয় ব্যাপারটি এরূপভাবে বর্ণনা করিল যে তিনি পুত্রের ও নিজের অমঙ্গল আশঙ্কা করিয়া অত্যন্ত ভীত হইয়া উঠিলেন, এবং সত্বর পুত্রের নিকটে গিয়া তাঁহার পায়ে পড়িয়া বলিলেন, "বাবা, ফিরোজ খাঁ ও আহমদ খাঁকে এই মুহূর্ত্তে গ্রেপ্তার করিয়া নিজের ও আমার প্রাণরক্ষা কর।" শমসুদ্দীন মাতার নির্ব্বন্ধাতিশয় দেখিয়া তদ্রূপ হুকুম দিলেন। কিন্তু উক্ত দুইজন ওমরা পূর্ব্বেই সংবাদ পাইয়া কুলবর্গা হইতে সাগরদুর্গে পলায়ন করায় লালচীনের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হইল না।

তৎকালে সদ্ নামে একব্যক্তি সাগর-দুর্গের কিল্লাদার বা অধিপতি ছিলেন। ঘিয়াসুদ্দীন সদ্‌র বিশ্বস্ততা ও পরিচর্য্যায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহার দাসত্বমোচন পূর্ব্বক তাঁহাকে সাগরের শাসনকর্ত্তার পদে নিযুক্ত করেন। এই জন্য সদ্, ঘিয়াসের প্রতি অত্যাচার করায়, লালচীনকে শাস্তি দিবার অভিপ্রায় মনোমধ্যে বহুদিন হইতে পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন। এক্ষণে ফিরোজ খাঁ ও আহমদ খাঁ সাগরে আসিয়া উপস্থিত হওয়ায় সদ্ তাঁহাদিগকে আদরের সহিত দুর্গে স্থান দিলেন এবং তাঁহাদের সহিত লালচীনকে দণ্ডদিবার উপায় সম্বন্ধে পরামর্শ করিতে লাগিলেন। সাগরের দুর্গ দুর্ভেদ্য ছিল। যতদিন পর্য্যন্ত যথেষ্ট রসদ ও সৈন্য সংগ্রহ না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত ফিরোজ খাঁ ও আহমদ খাঁ সাগরে থাকাই নিরাপদ মনে করিলেন। তথা হইতে তাঁহারা বাদশাহ শমসুদ্দীন ও প্রধান প্রধান অমাত্যবর্গকে এই বলিয়া পত্র লিখিতে লাগিলেন যে তাঁহারা দুরাচার লালচীনকে উপযুক্ত শাস্তি দিবার জন্য সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন; এই সাধু উদ্যমে তাঁহারা বাদশাহ ও ওমরাদিগের সাহায্য পাইবার প্রত্যাশা করেন। তাঁহারা আরও লিখিলেন যে কেবল লালচীনকে দণ্ড দেওয়াই তাঁহাদের উদ্দেশ্য; সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়া গেলেই তাঁহারা শমসুদ্দীনের বশ্যতা স্বীকার করিবেন। শমসুদ্দীন মনে মনে লালচীনের প্রতি বিরক্ত ছিলেন। কেবল জুলেখার জন্যই তিনি লালচীনকে তাহার শত্রুদের হস্তে সমর্পণ বিষয়ে ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। "জুলেখার পিতার প্রাণবধে তাহার শত্রুদের সাহায্য করিলে জুলেখা কি আমাকে ভালবাসিতে পারিবে? ভালবাসা দূরে থাক্, সে কি আমাকে বিষধর সর্পের মত দূরে পরিহার করিবে না?" এইরূপ দশ পাঁচ ভাবিয়া রাজা লালচীনকে রক্ষা করাই স্থির করিলেন।

লালচীনও নিশ্চিন্ত ছিল না। সে এক্ষণে রাজার সহিত জুলেখার বিবাহ দিতে পূর্ব্বাপেক্ষা আরও অধিক উৎসুক হইয়া উঠিল। সে বেশ বুঝিতে পারিল যে এই বিবাহটা হইয়া গেলে রাজ্যে তাহার প্রভাব অপ্রতিহত হইবে এবং সে শমসুদ্দীনের সৈন্যবল ও ধনবল সমস্তই নিজ শত্রুদের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতে পারিবে। সে সৈন্যদের সমুদয় বকেয়া বেতন দিয়া দিল এবং তাহাদিগকে অভুক্তপূর্ব্ব অনেক অধিকার দিল। তাহাতে তাহারা তাহার প্রতি প্রভূত অনুরাগ প্রকাশ করিতে লাগিল। ওমরারাও তাহার জন্য প্রাণপণ করিতে প্রতিশ্রুত হইল। কিন্তু সে নিজে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া কাহারও কথায় সম্পূর্ণ আস্থা স্থাপন করিতে পারিল না। যাহা হউক, অন্য উপায়ও ছিল না। টাকায়, মিষ্টবাক্যে যত দূর হয়, সে তাহা করিল। কিন্তু জুলেখাকে সে কোন প্রকারেই বশীভূত করিতে পারিল না। সে কথা শুনিলে লালচীন তাহাকে কত ভালবাসিবে, তাহার সুখের জন্য কত কি করিবে, লালচীন তাহা কত ভাবে বলিল, কিন্তু তাহার প্রতিজ্ঞা টলিল না। তিরস্কারে, অবশেষে প্রহারেও তাহার সঙ্কল্প স্থির রহিল। প্রতিদিন লালচীনের কঠোরতা বাড়িয়া চলিতে লাগিল। এরূপ ব্যবহার সহ্য করিতে না পারিয়া জুলেখা কারাগারে তাহার দুই দাসীকে নিজের দেহ হইতে রত্নালঙ্কার খুলিয়া দিয়া বশ করিয়া গোপনে সাগর অভিমুখে পলায়ন করিল। তথায় ফিরোজ খাঁ ও আহমদ খাঁ তাহাকে সাদর অভ্যর্থনা করিয়া আশ্রয় দিলেন। তাঁহারা জুলেখার ধর্ম্মপ্রাণতায় বিমুগ্ধ হইলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জুলেখার জন্য শমসুদ্দীন লালচীনকে রক্ষা করিতে মনস্থ করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি এক্ষণে ফিরোজ খাঁ ও আহমদ খাঁকে এরূপ উত্তর দিলেন যে তাহাতে তাঁহাদের যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়া ব্যতিরেকে আর উপায় রহিল না। তাঁহারা সদ্‌র সাহায্যে বহুসহস্র পদাতিক ও অশ্বারোহী সৈন্য সংগ্রহ করিয়া কুলবর্গার অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিয়দ্দূর অগ্রসর হইয়া তাঁহারা সন্ধ্যাকালে সসৈন্যে ভীমা নদীর তীরে শিবির স্থাপন করিলেন। রাত্রির অন্ধকার বিদূরিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহারা ভীমা পার হইয়া কুলবর্গার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। তাঁহারা এরূপ ক্ষিপ্রকারিতার সহিত সমুদয় আয়োজন করিয়াছিলেন যে লালচীন ভীমাতটে তাঁহাদের গতিরোধ করিতে পারে নাই। এক্ষণে উভয় সৈন্যদল পরস্পরের সম্মুখীন হইল। রাজার সৈন্যদল পরাজিত হইল। শমসুদ্দীন জেতাদিগের হস্তে পতিত হইলেন। লালচীনেরও সেই দশা ঘটিল। ফিরোজ খাঁ ও আহমদ খাঁ দেখিলেন যে, প্রথমতঃ বাহমনী রাজ্যে অন্ধ রাজা হইবার নিয়ম নাই, দ্বিতীয়তঃ অন্ধ ঘিয়াসুদ্দীন রাজা হইলে প্রকৃত রাজশক্তি আর কাহারও দ্বারা পরিচালিত হইবে। সুতরাং তাঁহাদের বোধ হইল যে আর কেহ রাজা হইলে ভাল হয়। ঘিয়াসেরও রাজৈশ্বর্য্যের প্রতি বিতৃষ্ণা জন্মিয়াছিল। এইজন্য এইরূপ স্থির হইল ঘিয়াসের জ্যেষ্ঠা পিতৃষ্বসার স্বামী ফিরোজ খাঁই রাজা হইবেন।

এখন দণ্ডের পালা। লালচীন শমসুদ্দীন উভয়েই কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। ঘিয়াসুদ্দীন সাগর-দুর্গ হইতে আনীত হইলেন। ফিরোজ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন:—"আপনার জীবনের অবশিষ্টাংশ যাহাতে আপনি সুখে শান্তিতে কাটাইতে পারেন, তজ্জন্য কি বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে?" ঘিয়াস বলিলেন, "আমি মক্কায় গিয়া তথায় ঈশ্বরের ধ্যানধারণায় কাল কাটাইতে চাই, কিন্তু তৎপূর্ব্বে লালচীনকে স্বহস্তে দণ্ড দিতে ইচ্ছা

করি"। ফিরোজ তৎক্ষণাৎ খাজাঞ্চীকে খিয়াসুদ্দীনের সমুদয় পাথের ও বার্ষিক পাঁচহাজার আশ্রফী দিতে হুকুম করিলেন, এবং লালচীনকে খিয়াসের সম্মুখে উপস্থিত করিতে আদেশ দিলেন। শৃঙ্খলাবদ্ধ লালচীন উপস্থিত হইল। খিয়াস তাহা অবগত হইয়া বলিলেন:—"লালচীন, তোর নিষ্ঠুরতায় আমার চক্ষু অন্ধ হইয়াছে। তোর কি শাস্তি হওয়া উচিত?" উন্মুক্ত তরবারি হস্তে দণ্ডায়মান খিয়াসকে দেখিয়া দাসের বাক্যস্ফূর্তি হইল না। খিয়াসুদ্দীন সজোরে লালচীনের স্কন্ধদেশ পর্য্যন্ত তরবারি অবনত করিলেন, কিন্তু আঘাত করিলেন না। বলিলেন—"ঈশ্বর আমাকে ঘোরতর শত্রুকেও ক্ষমা করিতে আদেশ করিয়াছেন। আমি তোমাকে ক্ষমা করিলাম।" খিয়াস লালচীনকে ক্ষমা করিলেন কিন্তু সে রাজা ফিরোজ খাঁর আদেশে এক পিঞ্জরে বদ্ধ হইয়া বাজারের নিকটবর্ত্তী চৌরাস্তায় স্থাপিত হইল।

পরদিন জুলেখা রাজসমীপে উপস্থিত হইয়া শমসুদ্দীনের প্রতি দয়াভিক্ষা করিল। ফিরোজ জানিতেন, শমসুদ্দীন জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সিংহাসনচ্যুতি অপরাধে অপরাধী ছিলেন না। তিনি জানিতেন, শমসুদ্দীনের অপরাধ না থাকাতেও কেবল তিনি অন্যায়পূর্ব্বক অপহৃত ভ্রাতৃসিংহাসনে উপবিষ্ট ছিলেন বলিয়া তাঁহার প্রতি প্রগাঢ় প্রেম সত্ত্বেও জুলেখা তাঁহাকে বিবাহ করে নাই। সুতরাং ফিরোজ কেবল যে শমসুদ্দীনকে কারামুক্ত করিতে স্বীকৃত হইলেন, তাহা নয়, তিনি তাঁহাকে দৌলতাবাদের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত করিলেন। তিনি বলিলেন:—"জুলেখা, কারাগারে শমসুদ্দীনকে তুমিই এই সংবাদ দিবে।" জুলেখা তাঁহার পাদপ্রান্তে নিপতিত হইয়া কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিল। রাজা তাহাকে সস্নেহে উঠাইয়া কারাগারে যাইতে বলিলেন। জুলেখা শমসুদ্দীনের কক্ষের দ্বারদেশে উপস্থিত হইল। শমসুদ্দীন হাতে মাথা রাখিয়া মাটিতে বসিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছিলেন। যেন তাঁহার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া সেই নিশ্বাস বহির্গত হইতেছিল। জুলেখা অতিশয় প্রেমকোমল স্বরে ডাকিল:—"শমউদ্দীন!" শমসুদ্দীন তৎক্ষণাৎ চমকিয়া মাটি হইতে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। বলিলেন, "কে, জুলেখা আসিয়াছ? আমি মরিবার আগে কি আমাকে ক্ষমা জ্ঞাপন করিতে আসিয়াছ?"

জুলেখা। প্রিয়তম! আমি তোমার শৃঙ্খলমোচন করিতে আসিয়াছি। তুমি মনে করিয়াছ, আমি তোমাকে ভালবাসি না। তাহা ভুল; আমি তোমাকে ভালবাসিতাম, কিন্তু রাজাকে শ্রদ্ধা করিতে পার নাই বলিয়া তাঁহার সিংহাসনভাগিনী হইতে সম্মত হই নাই। বর্ত্তমান রাজা তোমাকে ক্ষমা করিয়াছেন। তাঁহার আদেশক্রমে জানাইতেছি যে তুমি দৌলতাবাদের শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইয়াছ। যদি তুমি এখনও দাসকন্যাকে তোমার প্রেমের যোগ্যপাত্রী মনে কর, তাহা হইলে সে নিজ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে প্রস্তুত আছে।"

শমসুদ্দীন কথা কহিতে পারিলেন না। তিনি জুলেখাকে প্রেমভরে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন। তাহার পর তাঁহাদের শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইল। ফিরোজ খাঁ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া কন্যার গুণের পুরস্কারস্বরূপ লালচীনকে পিঞ্জরমুক্ত করিয়া দিলেন। সে কিন্তু কুলবর্গায় রহিল না। মক্কায় গিয়া জীবনের শেষ কয়েক বৎসর পূর্ব্বপ্রভু খিয়াসুদ্দীনের পরিচর্য্যায় অতিবাহিত করিল।

সমাপ্ত।

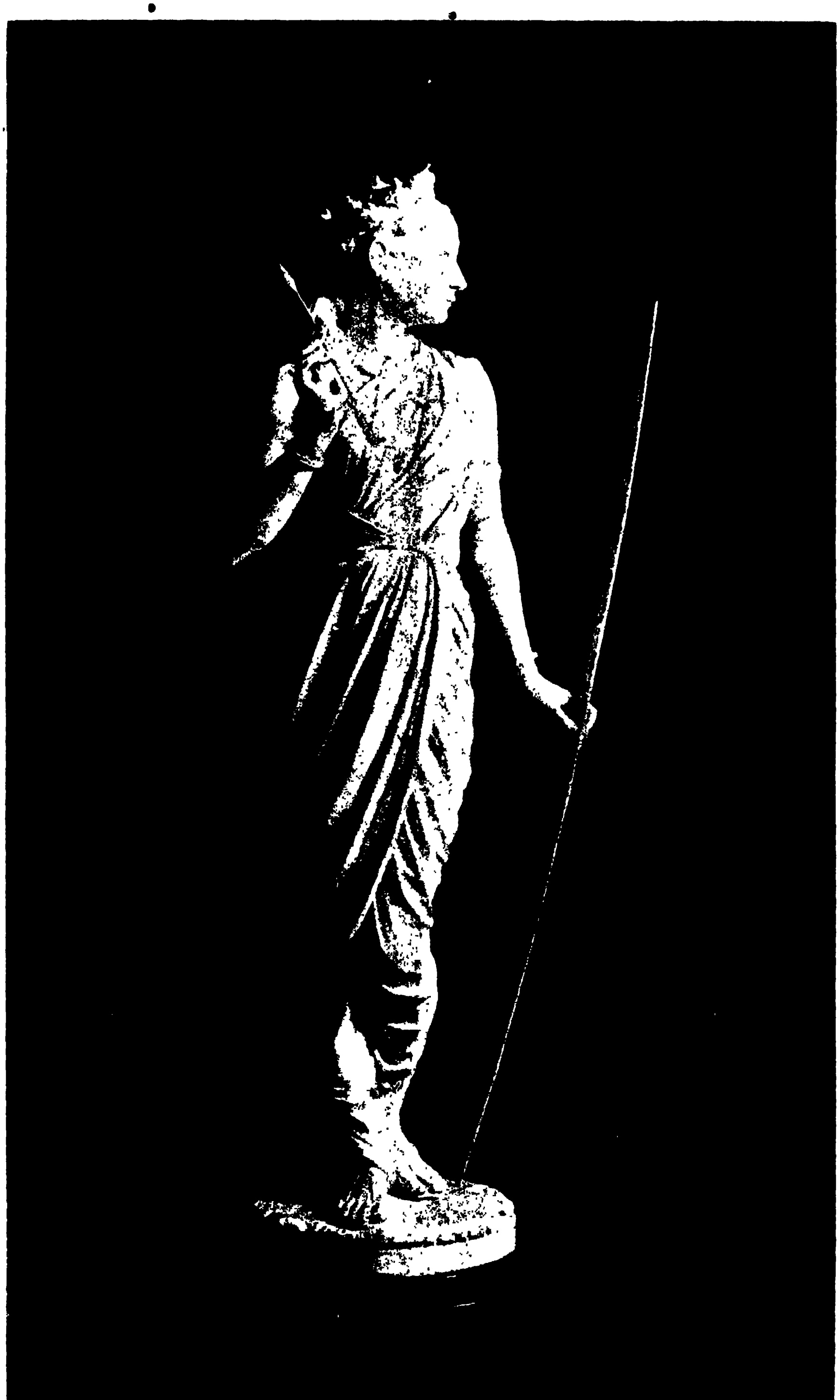
চিত্র।

বর্ত্তমান সংখ্যায় আমরা দুইখানি ছবি স্বতন্ত্র মুদ্রিত করিলাম। একখানি সুপ্রসিদ্ধ স্পেনদেশীয় চিত্রকর মুরিলো কর্ত্তৃক অঙ্কিত "তরমুজ-ভক্ষক"। মূল চিত্রখানি ম্যুনিক্ নগরের পিনাকোথেক্ চিত্রশালার সর্ব্বোৎকৃষ্ট চিত্র। আমরা গতসংখ্যায় এই চিত্রেরই উল্লেখ করিয়াছিলাম। দুটি ভিক্ষুক বালক তরমুজ খাইতেছে; তাহাদের কুকুরটি সতৃষ্ণ নয়নে তাকাইয়া আছে; ইহাই ছবির বিষয়।

দ্বিতীয় চিত্রখানি শ্রীযুক্ত মহাদেব বিশ্বনাথ ধুরন্ধর কর্ত্তৃক অঙ্কিত। ইনি বোম্বাইস্থিত সর্ জামশেদ্জী জীজীভাই শিল্পবিদ্যালয়ে চিত্রবিদ্যা শিক্ষা দেন। ইঁহার অনেক চিত্র ভারতবর্ষের নানাস্থানের শিল্পপ্রদর্শনীতে প্রশংসিত ও পুরস্কৃত হইয়াছে। আমরা ভবিষ্যতে ইঁহার আরও অনেক চিত্র মুদ্রিত করিব। বর্ত্তমান সংখ্যার চিত্রখানির বিষয় মূলরামায়ণের বালকাণ্ডের অষ্টাদশ হইতে দ্বাবিংশ সর্গে আছে। রাজর্ষি বিশ্বামিত্র এক যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ঐ যজ্ঞ সমাপ্ত হইতে না হইতেই মারীচ ও সুবাহু নামে কামরূপী দুই রাক্ষস উহার নানা প্রকার বিঘ্ন আচরণ এবং তাঁহার যজ্ঞবেদিতে মাংসখণ্ড নিক্ষেপ ও রক্তবৃষ্টি করায়, তিনি রাজা দশরথের নিকট আসিয়া এই যাচনা করেন যে তিনি যেন নিজ পুত্র রামকে রাক্ষসবধার্থ তাঁহার সঙ্গে আশ্রমে প্রেরণ করেন। বিশ্বামিত্র জলন্ত ভাষায় রাক্ষসগণের ভীষণ অত্যাচার বর্ণন করিতেছেন। সকলে কৌতূহলের সহিত, কেহ কেহ বা সভয়ে শ্রবণ করিতেছে।

শ্রীযুক্ত ধুরন্ধর এই চিত্রখানির জন্য ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দের মান্দ্রাজ শিল্পপ্রদর্শনীতে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি ইহা প্রবাসীতে প্রকাশ করিতে অনুমতি দেওয়ায় আমরা তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ রহিলাম।

কলিকাতা, ৫নং শিবনারায়ণদাসের লেন, কুন্তলীন প্রেসে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।



শবরীর বেশে পার্ব্বতী।

ক্ষাত্রে-নির্ম্মিত মূর্ত্তি হইতে।

KUNTALINE PRESS.

প্রবাসী

দ্বিতীয় ভাগ। } মাঘ ও ফাল্গুন, ১৩০৯। { ১০ম ও ১১শ সংখ্যা।

সুদূর।

আমি চঞ্চল হে,
আমি সুদূরের পিয়াসী।
দিন চলে যায়, আমি আনমনে
তারি আশা চেয়ে থাকি বাতায়নে,
ওগো প্রাণে মনে আমি যে তাহার
পরশ পাবার প্রয়াসী!
আমি সুদূরের পিয়াসী!
ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর! তুমি যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী!
মোর ডানা নাই, আছি এক ঠাঁই,
সে কথা যে যাই পাশরি'!

আমি উৎসুক হে,
হে সুদূর, আমি প্রবাসী!
তুমি দুর্লভ দুরাশার মত
কি কথা আমায় শুনাও সতত!
তব ভাষা শুনে তোমারে হৃদয়
জেনেছে তাহার সুভাষী!
হে সুদূর! আমি প্রবাসী!
ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর! তুমি যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী!
নাহি জানি পথ, নাহি মোর রথ,
সে কথা যে যাই পাশরি'!

আমি উন্মনা হে,
হে সুদূর, আমি উদাসী!
রৌদ্র-মাখানো অলস বেলায়
তরু-মর্ম্মরে, ছায়ার খেলায়,
কি মূরতি তব নীলাকাশশায়ী
নয়নে উঠে গো আভাসি'!
হে সুদূর, আমি উদাসী!
ওগো সুদূর, বিপুল সুদূর! তুমি যে
বাজাও ব্যাকুল বাঁশরী,
কক্ষে আমার রুদ্ধ দুয়ারি
সে কথা যে যাই পাশরি'!

অধ্যাপক বসুর কয়েকটি আবিষ্কার।

সাত আট বৎসর পূর্ব্বে ঈথর-আকাশস্পন্দনজাত অদৃশ্যকিরণ সম্বন্ধে নানা আবিষ্কার করিয়া, অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয় সমগ্র বৈজ্ঞানিক জগৎকে যে প্রকার চমকিত করিয়াছিলেন, তাহার কথা বোধ হয় পাঠকপাঠিকাগণের স্মরণ আছে। তার পর গত দুই বৎসর ইংলণ্ডে থাকিয়া অধ্যাপক মহাশয় আরো যে সকল বিস্ময়কর ব্যাপার আবিষ্কার করিয়া জগৎকে স্তম্ভিত করিয়াছেন, তাহার সংবাদও আমরা পাইয়াছি। বর্ত্তমান প্রবন্ধে অধ্যাপক বসু মহাশয়ের সেই সকল নূতন আবিষ্কারের মধ্যে কেবল কয়েকটির বিষয় আলোচনা করিব।

অধ্যাপক বসু মহাশয়ের প্রথম আবিষ্কারগুলি কেবল আকাশকম্পন ব্যাপারে সীমাবদ্ধ ছিল। তাপালোক ও তড়িতের ধর্ম্ম ও উৎপত্তিতত্ত্ব সম্বন্ধীয় নানা মৌলিক গবেষণায় আবিষ্কারবিবরণী পূর্ণ। অধ্যাপক বসুর নূতন আবিষ্কারগুলি বিজ্ঞানের কোনও এক বিশেষ বিভাগের বিষয়ীভূত নয়,—চেতন অচেতন, ধাতব অধাতব, প্রাণী উদ্ভিদ, পদার্থ মাত্রেই, সেই মহদাবিষ্কারের বিশাল গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ। নিউটনের মহাকর্ষণ সিদ্ধান্তের ন্যায়, অধ্যাপক বসুর সিদ্ধান্তগুলি পদার্থ মাত্রেই প্রযোজ্য, এবং মহাকর্ষণ সিদ্ধান্ত তাৎকালিক জ্যোতির্বিদ্যা ও জড়বিজ্ঞানকে যে প্রকার নূতন আকারে গঠন করিয়াছিল, অধ্যাপক বসুর আবিষ্কারদ্বারা আধুনিক শারীরতত্ত্ব ও জড়বিদ্যার চেহারাও তদ্রূপ পরিবর্ত্তিত হইবে বলিয়া মনে হইতেছে। মনস্তত্ত্বের উপরেও বসু মহাশয়ের আবিষ্কারের প্রভাব ধরা পড়িয়াছে।

আলোচ্য আবিষ্কারগুলির বিষয় বুঝিতে হইলে, আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ জড়জগৎকে কি ভাবে দেখেন, তাহা প্রথমে বুঝা আবশ্যক। মোটামুটি বলিতে গেলে বিজ্ঞানশাস্ত্র সমগ্র জড়জগৎকে জৈব ও অজৈব এই দুইটা প্রধান ভাবে বিভক্ত করিয়াছেন, বলা যাইতে পারে। গাছ, মানুষ, চর্ম্ম, রেশম, কয়লা সকলেরই মূলে জীব বর্ত্তমান, এজন্য ইহারা জৈব পদার্থ; মাটি, পাথর, লৌহ, তাম্র অজৈবশ্রেণীভুক্ত। জৈব পদার্থগুলির মধ্যে আবার প্রাণী উদ্ভিদ, চেতন অচেতন, সজীব নির্জ্জীব প্রভৃতি কয়েকটি উপবিভাগ আছে। প্রাণী সজীব এবং অনেক স্থলেই সচেতন। উদ্ভিদ সজীব বটে, কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতগণের মতে সচেতন নয়। কাঠ নির্জ্জীব ও অচেতন জৈব পদার্থ। বৈজ্ঞানিক শ্রেণীবিভাগ অনুসারে পাথর জীবশ্রেণীভুক্ত নয়। কাজেই তাহার সজীবতা বা সচেতনতা সম্বন্ধে কোন কথাই উঠিতে পারে না। মাটি, পাথর, স্বর্ণ, রৌপ্য চিরকালই অচেতন ও নির্জ্জীব।

বৈজ্ঞানিকগণ কোন্ পদ্ধতিক্রমে, জড়জগতের পূর্ব্বোক্ত শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেন, এখন দেখা যাউক। মোটামুটি দেখিতে গেলে, জৈব ও অজৈবের পার্থক্য ঠিক করা খুব কঠিন নয়। উদ্ভিদ ও প্রাণিদেহজাত পদার্থ মাত্রেই জৈব এবং তদ্ব্যতীত বস্তুমাত্রেই অজৈব বলিলে সকলই বুঝা যায়। কিন্তু প্রাণী উদ্ভিদ, এবং সচেতন ও অচেতনের পার্থক্য এত সহজে স্থির করা যায় না। প্রাণী ও উদ্ভিদ-রাজ্যের সন্ধিস্থল, দুই বৃহৎ রাজ্যের সীমান্ত প্রদেশের ন্যায় চিরকালই অব্যবস্থিত। এই প্রদেশস্থ পদার্থ উদ্ভিদ-শ্রেণীভুক্ত হইবে কি প্রাণিপদবাচ্য হইবে নির্দ্দেশ করা বড় কঠিন। নির্জ্জীব ও সজীব রাজ্যের সীমান্তপ্রদেশের অবস্থাও ঠিক্ পূর্ব্ববৎ।

চিকিৎসককে প্রাণীর সজীবতার লক্ষণের কথা জিজ্ঞাসা কর। তিনি বলিবেন, নাড়ীর স্পন্দন জীবনের একটা প্রধান লক্ষণ। সুস্থ প্রাণীমাত্রেরই ধমনী নিয়মিতভাবে স্পন্দিত হয়, এবং ক্রোধভয়াদি কারণে আকস্মিক উত্তেজনা উপস্থিত হইলে নাড়ীর স্পন্দনসংখ্যা বৃদ্ধির দ্বারা ঐ সকল উত্তেজক কারণের অস্তিত্বের কথাও জানিতে পারা যায়। তা'ছাড়া কোন কারণে প্রাণী অবসন্ন হইয়া পড়িলে, নাড়ীর ধীর দুর্ব্বল কম্পনে সেই অবসাদের লক্ষণও চিকিৎসকগণ ধরিতে পারেন। কোন্ অবস্থায় প্রাণীর ধমনীস্পন্দনমাত্রা কি প্রকারে পরিবর্ত্তিত হইতেছে, কেবল অঙ্গুলিস্পর্শে তাহা ঠিক্ করা বড় কঠিন। এইজন্য চিকিৎসা-শাস্ত্রে নাড়ির স্পন্দন রেখাঙ্কনদ্বারা ঠিক্ করিবার একটী সুন্দর উপায় দেখিতে পাওয়া যায়। এই পদ্ধতিতে একটী সোজা দণ্ডের (Lever) মধ্যস্থলটা আট্‌কাইয়া তাহার এক প্রান্ত প্রাণীর ধমনীতে সংলগ্ন রাখা হয় এবং অপরপ্রান্তে একটী পেন্‌সিল আবদ্ধ থাকে। স্পন্দনদ্বারা দণ্ডের ধমনী-সংলগ্ন প্রান্তটী আন্দোলিত হইতে থাকিলে, পেন্‌সিলযুক্ত প্রান্তটীও প্রথমোক্ত প্রান্তের অনুরূপ আন্দোলনগতি প্রাপ্ত হয়। এখন যদি এই পেন্‌সিলের সম্মুখে একখণ্ড কাগজ রাখা যায়, তাহা হইলে পেন্‌সিলের আন্দোলনের সহিত কাগজ-খণ্ডে যে কতকগুলি উচু নীচু রেখা অঙ্কিত হইতে থাকিবে, তাহা আমরা অনায়াসেই বুঝিতে পারি। কাগজে অঙ্কিত এই তরঙ্গায়িত রেখাই নাড়ীস্পন্দনলিপি। বলা বাহুল্য যাহাতে কাগজের একই অংশে পুনঃ পুনঃ রেখাপাত হইয়া চিত্রটীকে অস্পষ্ট করিয়া না তোলে, তজ্জন্য কাগজখানিকে নিয়মিতগতিতে পেন্‌সিলের সম্মুখ দিয়া টানিয়া লইবার ব্যবস্থাও যন্ত্রে আছে। সুস্থ প্রাণীর নাড়ীস্পন্দনলিপি

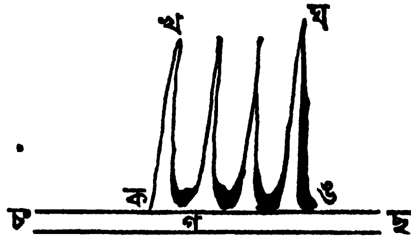
পরীক্ষা করিলে, উক্ত ঊর্দ্ধাধঃ রেখাগুলি খুব সুস্পষ্ট ও সুদীর্ঘ দেখায়; দুর্ব্বল ও রুগ্নব্যক্তির ধমনীস্পন্দন-রেখা খর্ব্ব ও অস্পষ্ট হইয়া অঙ্কিত হয়। মৃত প্রাণীর নাড়ীস্পন্দন নাই, কাজেই স্পন্দনচিত্রে সেই তরঙ্গরেখা দেখা যায় না; স্থির পেন্‌সিল্‌টাদ্বারা, চিত্রে কেবল একটী অভিন্ন সরল রেখা অঙ্কিত হইয়া পড়ে। চিকিৎসকদিগের নিকট ইহাই নাড়ীর মৃত্যুজ্ঞাপক স্পন্দনলিপি।

মাংসপেশীর সঙ্কোচন ও প্রসারণ প্রাণীর সজীবতার আর একটী লক্ষণ। পরীক্ষাদ্বারা দেখা গিয়াছে চিম্‌টি কাটিলে কিম্বা কোনপ্রকার চাপ বা মোচড় দিলে, সজীব মাংসপেশী মাত্রেই সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। তা'র পর সেই চাপ তুলিয়া লইলেই পেশী আবার পূর্ব্বের আকার পুনঃপ্রাপ্ত হয়। মাংসপেশীর এই আকুঞ্চন প্রসারণের চিত্রও, পূর্ব্বোক্ত নাড়ীস্পন্দনলিখন যন্ত্রের অনুরূপ ব্যবস্থায় অঙ্কিত করা যাইতে পারে। আঘাতপ্রাপ্তিমাত্র মাংসপেশী যেমন আকুঞ্চিত হইতে আরম্ভ করে, সঙ্গে সঙ্গে সেই দণ্ডসংলগ্ন পেন্‌সিলটাও কাগজের উপর একটী ঊর্দ্ধরেখা অঙ্কিত করিয়া ফেলে; তা'র পর সেই আঘাত রহিত করিবামাত্র মাংসপেশী যখন প্রকৃতিস্থ হইতে আরম্ভ করে, পেন্‌সিলটীও সেই সময়ে একটা পতনরেখা আঁকিয়া পেশীর পূর্ব্বাবস্থা পুনঃপ্রাপ্তির চিত্র লিপিবদ্ধ রাখে। ইহাই মাংসপেশীর সজীবতাজ্ঞাপক রেখাচিত্র।

মাংসপেশী যদি খুব সজীব থাকে, তবে বাহ্য আঘাত উত্তেজনায় সেটা খুব সবলে আকুঞ্চিত প্রসারিত হইয়া সাড়া দিতে থাকিবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে রেখা-চিত্রেও লম্বা লম্বা উঁচু নীচু দাগ পড়িতে থাকিবে। তা'র পর মাংসপেশী যতই জীবনীশক্তি হারাইয়া নিস্তেজ হইতে আরম্ভ করিবে, তাহার অসাড়তা বৃদ্ধির সহিত চিত্রস্থ রেখা গুলির দৈর্ঘ্যও ক্রমে হ্রাস হইতে দেখা যাইবে। শেষে সেটা সম্পূর্ণ নির্জীব হইয়া পড়িলে, তাহার মৃত্যুলক্ষণ, নাড়ীস্পন্দনরহিত মৃতব্যক্তির ধমনীলিপির ন্যায়, একটা অভিন্ন ঋজু রেখা দ্বারা ঘোষিত হইতে থাকিবে।

এতদ্ব্যতীত প্রাণীর মৃত্যু বা সজীবতার লক্ষণ ধরিবার আর একটী উপায় আছে। এটীকে সজীবতার বৈদ্যুতিক লক্ষণ বলা যাইতে পারে। সজীব মাংসপেশী বা স্নায়ুর কোন অংশে আঘাত দিলে বা চিম্‌টি কাটিলে তাহার আভ্যন্তরীণ আণবিক বিকৃতিদ্বারা, তাহাতে এক প্রকার তড়িৎপ্রবাহ উৎপন্ন হইয়া পড়ে। তা'র পর সেই আঘাত রহিত করিলে, মাংসপেশী যেমন পূর্ব্বাবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হয়, তড়িৎপ্রবাহও বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু মৃত মাংসপেশীতে সেই প্রকারে সহস্র আঘাত করিলে তাহাতে প্রবাহের চিহ্নমাত্র দেখা যায় না। সজীব ও টাট্‌কা মাংসপেশীতে আঘাত কর, তজ্জাত বৈদ্যুতিক প্রবাহ খর প্রবাহিত হইতে থাকিবে; তা'র পর সেটা কিঞ্চিৎ নির্জীব হইয়া পড়িলে আঘাত দাও, প্রবাহ স্পষ্ট মন্দীভূত হইতেছে দেখিবে। শেষে মাংসপেশী সম্পূর্ণ নির্জীব হইলে সহস্র তাড়নায়, তাহাতে অণুমাত্র তড়ৎপ্রবাহের চিহ্ন দেখিতে পাইবে না। সজীবতার হ্রাসবৃদ্ধির সহিত আঘাতজাত তড়িৎ-প্রবাহের যে হ্রাসবৃদ্ধি হয়, তাহা তড়িৎমাপক যন্ত্রের (Galvanometer) শলাকার বিচলনদ্বারা পরিমাপ করিবার একটী সুন্দর যন্ত্র অধ্যাপক বসু মহাশয় উদ্ভাবন করিয়াছেন। শলাকা কতদূর বিচলিত হইল, এবং প্রবাহ রোধের সহিত কতকাল পরে সেটা আবার সাম্যাবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হইল, এই সকলের স্পষ্ট রেখাচিত্র অঙ্কিত করিবার ব্যবস্থাও এই যন্ত্রে আছে। এই সকল চিত্রও পূর্ব্ববর্ণিত ধমনীস্পন্দন ও পেশীর আকুঞ্চন প্রকাশক চিত্রের ন্যায় রেখাময়। ইহাদের ঊর্দ্ধগামী রেখাগুলির দৈর্ঘ্যের দ্বারা আঘাতজাত তড়িৎপ্রবাহের প্রবলতা বুঝা যায়, এবং নিম্নগামী রেখাগুলি দ্বারা তড়িৎপ্রবাহের ক্রমিক লোপের লক্ষণ জানা যায়।

নীচে অঙ্কিত ১মচিত্রটি আঘাতজাত বৈদ্যুতিক প্রবাহের একটি রেখালিপি। ইহার ঊর্দ্ধগামী ক খ রেখাটী প্রবাহ-



১ম চিত্র।

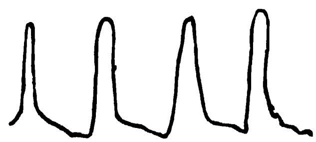
বৃদ্ধির সূচক; এবং আঘাতরোধ দ্বারা প্রবাহের যে ক্রমিক লোপ হয় তাহা নিম্নগামী খগ রেখা দ্বারা সূচিত হইতেছে।

যে চ ছু ভূমি-রেখা হইতে প্রবাহবৃদ্ধি-রেখা উঠিয়াছিল, প্রবাহের হ্রাসজ্ঞাপক পতনরেখা সেই ভূমিতে মিলিত হইলে, প্রবাহের অণুমাত্র অস্তিত্ব নাই অর্থাৎ আহত পদার্থটি পূর্ব্বাবস্থা পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। যে বৈদ্যুতিক প্রবাহ দ্বারা চিত্রের দক্ষিণপ্রান্তস্থ রেখাযুগল অঙ্কিত হইয়াছে,—অপর রেখাগুলির দৈর্ঘ্য তদপেক্ষা অপেক্ষাকৃত অধিক। ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে, যে আঘাতজাত তড়িৎপ্রবাহে প্রথমোক্ত রেখাদ্বয় অঙ্কিত হইয়াছিল, সেটা অপরাপর আঘাত অপেক্ষা প্রবল ছিল, কাজেই তজ্জাত বৈদ্যুতিক সাড়াও প্রবলতর হওয়ায় দীর্ঘতর রেখা অঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছে।

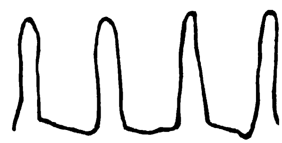
আঘাত উত্তেজনায় মাংসপেশীর আকুঞ্চন প্রসারণ ও তড়িৎপ্রবাহ উভয়ই যুগপৎ উৎপন্ন হয় এবং উভয়ের সাড়া-লিপিও ঠিক্ একই দেখায়। কিন্তু স্নায়ু ইত্যাদিতে আঘাত দিলে, তাহার আকুঞ্চন প্রসারণ রেখাচিত্রে লিপিবদ্ধ করা বড় কঠিন,—কাজেই এসকলস্থলে আঘাতজনিত বৈদ্যুতিক প্রবাহ দ্বারা পদার্থের সসাড়তা স্থির করা ব্যতীত আর উপায়ান্তর নাই। অধ্যাপক বসু মহাশয় এই জন্য সকল স্থলেই বৈদ্যুতিক রেখা-চিত্র-লিখন উপযোগী বলিয়া স্থির করিয়াছেন।

আঘাত তাড়না দ্বারা সজীব মাংসপেশীর আকুঞ্চন প্রসারণ ও তাহাদের বৈদ্যুতিক সাড়ার কথা ডাক্তার-ওয়ালার প্রমুখ আধুনিক পণ্ডিতগণ জানিতেন এবং ইহাকেই তাঁহারা প্রাণীর সজীবতার সূক্ষ্ম লক্ষণ বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। এই লক্ষণ ধরিয়া এপর্য্যন্ত প্রাণীকে উদ্ভিদ্ ও অজৈব পদার্থ হইতে পৃথক্ করা হইতেছিল। অধ্যাপক বসু মহাশয় তাঁহার বহুগবেষণালব্ধ পরীক্ষাদি দ্বারা দেখাইয়াছেন, ঐ লক্ষণটা কোন ক্রমেই প্রাণীর ও নির্জ্জীব পদার্থের স্বাতন্ত্র্যজ্ঞাপক নয়। আঘাত উত্তেজনাদ্বারা বৈদ্যুতিক প্রবাহের পরিবর্ত্তন সজীব মাংসপেশীর ন্যায় ধাতবপদার্থ ও সজীব উদ্ভিদেও দেখা যায়; সুতরাং যে হিসাবে মাংসপেশী সজীব ও সজাগ, উদ্ভিদ ও ধাতব পদার্থও ঠিক্ সেই হিসাবে সজীব ও সজাগ।

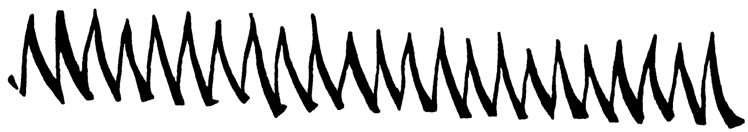
মাংসপেশীর সহিত উদ্ভিদ ও ধাতব পদার্থের ঐক্য কোথায়, এখন দেখা যাউক। অধ্যাপক বসু প্রথমে সজীব মাংসপেশীতে নিয়মিত আঘাত করিয়া, সেই তাড়নাজাত বৈদ্যুতিক প্রবাহের লিপি অঙ্কিত করিয়াছিলেন। তা'র পর যথাক্রমে সজীব উদ্ভিদদেহ ও ধাতুফলকে ঠিক্ পূর্ব্ববৎ আঘাত দিয়া যে চিত্র পাইয়াছিলেন, তাহা অবিকল মাংস-পেশীর বৈদ্যুতিক লিপির অনুরূপ দেখা গিয়াছিল। পাঠকপাঠিকাগণ মাংসপেশী, উদ্ভিদ ও ধাতুর পূর্ব্বোক্ত সাড়ালিপি যথাক্রমে ২য়, ৩য় ও ৪র্থ চিত্রে অঙ্কিত দেখিতে



২য় চিত্র।



৩য় চিত্র।



৪র্থ চিত্র।

পাইবেন; এবং এই চিত্রত্রয় তুলনা করিয়া দেখিলে একই প্রকারের আঘাতে তিনটী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পদার্থ যে প্রকারের সাড়া দিতে পারে, তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারিবেন।

অচেতন উদ্ভিদ ও নির্জ্জীব ধাতুপিণ্ডে আঘাত দিলে ইহারাও যে প্রাণীর ন্যায় বেদনার লক্ষণ প্রকাশ করিয়া সাড়া দিতে পারে, তাঁহা এ পর্য্যন্ত কোনও পণ্ডিত কল্পনাও করিতে পারেন নাই। অধ্যাপক বসু মহাশয় ইহার একমাত্র আবিষ্কারক। ইংলণ্ডের কয়েকজন জীবতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিত অধ্যাপক বসুর পরীক্ষালব্ধ উদ্ভিদ ও ধাতুর সাড়া-লিপি সেগুলি নিশ্চয়ই কোনও আহত মাংসপেশীর তড়িৎপ্রবাহ পরিবর্ত্তনের চিত্র বলিয়া স্থির করিয়াছিলেন; এবং শেষে অধ্যাপক বসু সেই সজীবতাজ্ঞাপক লক্ষণ নির্জ্জীব ধাতুপিণ্ড ও অচেতন উদ্ভিদেই পাওয়া যাইতে পারে, প্রত্যক্ষ দেখাইলে, সকলেই বিস্মিত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

ধাতুপিণ্ড সজীব কি না এবং মাংসপেশীর ন্যায় উদ্ভিদ

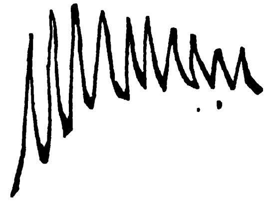
ও ধাতুর বেদনানুভব শক্তি আছে কি না, তৎসম্বন্ধে কোন কথাই এখন নিঃসন্দেহে বলা চলে না। তবে যে সকল লক্ষণ ধরিয়া শারীরতত্ত্ববিদ্‌গণ প্রাণীকে বেদনানুভবক্ষম ও সচেতন বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভিদ ও ধাতুকে প্রাণিরাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়াছেন, সে লক্ষণগুলি যে পূর্ণমাত্রায় ধাতু ও উদ্ভিদ উভয়েই বর্ত্তমান আছে, তাহা নিঃসঙ্কোচে বলা যাইতে পারে।

বাহ্য উত্তেজনায় সাড়া দেওয়া সম্বন্ধে পরবর্ত্তী পরীক্ষাগুলিদ্বারা জৈব অজৈব ও ধাতব পদার্থের একত্বের আরো অনেক আশ্চর্য্যজনক প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। এই পরীক্ষাগুলির মধ্যে একটীতে অধ্যাপক বসু একখণ্ড সজীব মাংসপেশীতে খুব ঘন ঘন আঘাত দিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। প্রথমে এই আঘাতজাত বৈদ্যুতিক প্রবাহ দ্বারা রেখাচিত্রে বেশ লম্বা লম্বা তরঙ্গরেখা অঙ্কিত হইতে আরম্ভ হইয়াছিল; কিন্তু বহুক্ষণ ধরিয়া আঘাত চালাইবার পর, প্রবাহজ্ঞাপক নূতন রেখাগুলি ক্রমেই খর্ব্বকায় হইয়া চিত্রে অঙ্কিত হইতে দেখা গিয়াছিল। বলা বাহুল্য পুনঃ পুনঃ আঘাতজনিত মাংসপেশীর অবসাদই এই ক্ষীণতর সাড়ার কারণ। উদ্ভিদদেহ ও ধাতবপদার্থ লইয়া পরীক্ষা করিয়া, অধ্যাপক বসু তাহাতেও পূর্ব্বোক্ত অবসাদজ্ঞাপক অবিকল চিত্র দেখিতে পাইয়াছেন। উদ্ভিদদেহ বা কোনও ধাতুপিণ্ডে ঘন ঘন আঘাত কর, সুদীর্ঘ রেখাময় চিত্রদ্বারা ইহাদের সসাড়তার বেশ পরিচয় পাইবে। কিন্তু এই আঘাত বহুক্ষণ চালাইলে প্রাণিদেহের ন্যায় ইহারাও ক্লান্ত হইয়া পড়িবে। কাজেই তখন তাহাদের আর সবলে সাড়া দিবার শক্তি থাকিবে না, এবং ইহার ফলে চিত্রে কতকগুলি ক্ষীণ ও খর্ব্বকায় রেখা অঙ্কিত দেখা যাইবে। ক্লান্তি অপনোদনের জন্য কিয়ৎকাল আঘাত প্রদান রহিত কর, এই সুযোগে বিশ্রান্ত প্রাণীর ন্যায় উদ্ভিদ ও ধাতু উভয়েই বলসঞ্চয় করিয়া লইবে এবং এখন ইহাদিগকে পুনঃ পুনঃ আঘাত দিলে পূর্ব্বের ন্যায় সসাড়তাজ্ঞাপক সুদীর্ঘ রেখা চিত্রে অঙ্কিত হইয়া পড়িবে; ইহাতে সেই অবসাদজ্ঞাপক খর্ব্ব রেখার আর চিহ্ন মাত্র দেখা যাইবে না।

পুনঃ পুনঃ আঘাতে উদ্ভিদদেহ ক্রমে অবসন্ন হইয়া পড়িলে, আঘাতজাত বৈদ্যুতিক সাড়ার ক্রমিক হ্রাসের রেখালিপির যে পরিবর্ত্তন হয় ৫ম চিত্রে তাহা লিখিত হইল। চিত্রের প্রথম অংশে উদ্ভিদদেহের প্রবল সাড়া চিহ্ন এবং



৫ম চিত্র।



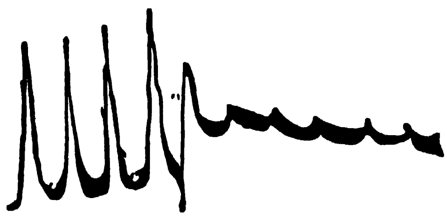
৬ষ্ঠ চিত্র।

মধ্যাংশে অবসাদের স্পষ্ট লক্ষণ দেখা যাইবে। তা'র পর বিগতশ্রম উদ্ভিদ আবার কিপ্রকার প্রবল সাড়া দেয়, তাহা ঐ চিত্রেরই শেষাংশে দৃষ্ট হইবে। ৬ষ্ঠ চিত্রটী অবসন্ন ধাতুর সাড়া-লিপি। সুস্থ ধাতু প্রাথমিক আঘাতগুলি দ্বারা যে প্রকার প্রবল সাড়া দেয়, চিত্রের প্রথমাংশে তাহা অঙ্কিত আছে। ইহার শেষাংশের খর্ব্বরেখাগুলি দ্বারা সেই ধাতুরই শ্রান্তাবস্থার ক্ষীণ ও দুর্ব্বল সাড়ার কথা প্রকাশ করিতেছে।

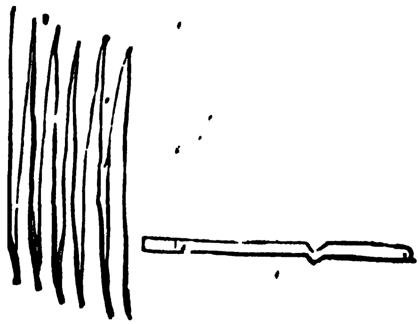
পাঠকপাঠিকাগণ দেখিয়া থাকিবেন, আমাদের দেহের কোনও অংশ পুনঃ পুনঃ সঞ্চালিত করিতে থাকিলে, কিয়ৎকাল মধ্যে আমরা সেই সঞ্চালিত অঙ্গের অবসাদ অনুভব করি, এবং ইহার পরও সঞ্চালন রহিত না করিলে, পূর্ণ অবসাদ বা ধনুষ্টঙ্কার আসিয়া অঙ্গকে আক্রমণ করে। তখন সহস্র বাহ্য তাড়নায় সেই অঙ্গের বেদনা অনুভব করিতে পারি না। উদ্ভিদ ও ধাতুপিণ্ডেও পূর্ব্বোক্ত ধনুষ্টঙ্কারের লক্ষণ ধরা পড়িয়াছে। আরো আশ্চর্য্যের বিষয়, চিকিৎসকগণ সজীবতা পুনঃপ্রাপ্তির জন্য ধনুষ্টঙ্কারগ্রস্ত প্রাণিশরীরে যে প্রকার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন, পূর্ণাবসন্ন উদ্ভিদ ও ধাতুর ঠিক্ তদনুরূপ সেবা করিয়া অধ্যাপক বসু মহাশয় ইহাদেরও সজীবতা ফিরাইয়া আনিয়াছিলেন।

বিষপ্রয়োগ বস্তুতঃ নির্জীবভাব প্রাপ্তি ও মৃত্যু, প্রাণীর একটা বিশেষ লক্ষণ। সপ্রাণ ও জড় পদার্থের পার্থক্য

দেখাইতে গিয়া আধুনিক শরীরতত্ত্ববিদ্‌গণ বিষের এই কার্য্যটাকে প্রাণীর বিশেষ ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন। অধ্যাপক বসু মহাশয় উদ্ভিদ ও ধাতুতে বিষপ্রয়োগ করিয়া, প্রাণিদেহের ন্যায় এগুলিতেও মৃত্যু-লক্ষণ আবিষ্কার করিয়াছেন। বসু মহাশয় সজীব মাংস-পেশীকে তীব্র পটাস দ্বারা বিষযুক্ত করিয়া, বার বার চিম্‌টি কাটিয়া ও মোচড় দিয়া, তাহাতে সাড়ার কোন লক্ষণই দেখিতে পান নাই,—সাড়াজ্ঞাপক রেখাচিত্রে এক দীর্ঘ ঋজুরেখাদ্বারা মাংসপেশীর মৃত্যু ঘোষিত হইয়াছিল। তা'র পর সুস্থ উদ্ভিদ ও ধাতুদেহ ঠিক্ পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বিষসংযুক্ত করিয়া, অধ্যাপক মহাশয় তাহাদের সাড়াচিত্রেও মৃত্যুলক্ষণ দেখিতে পাইয়াছিলেন। নিম্নস্থ ৭ম ও ৮ম চিত্র উদ্ভিদ ও ধাতুর সাড়াজ্ঞাপক লিপি। সুস্থ উদ্ভিদ-



৭ম চিত্র।

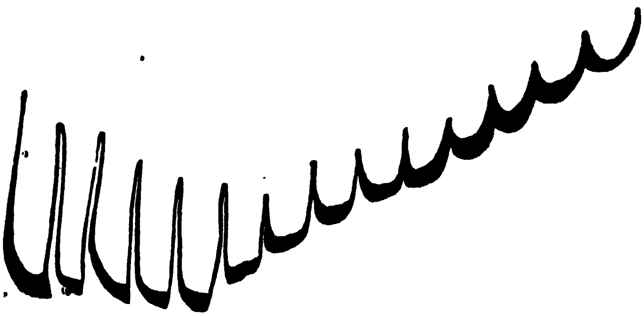


৮ম চিত্র।

দেহে আঘাত দিলে, সে প্রত্যেক আঘাতে কি প্রকার প্রবল সাড়া দেয়, ৭ম চিত্রের বামপার্শ্বস্থ অংশ দেখিলে, তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইবে। তা'র পর সেই সসাড় উদ্ভিদদেহে বিষ সংযুক্ত কর, ক্রমে সেটা অসাড় ও মৃত হইয়া পড়িবে। ঐ চিত্রের দক্ষিণপ্রান্তস্থ ঋজুরেখা, সেই বিষমৃত উদ্ভিদের মৃত্যুলিপি। ৮ম চিত্রের বাম অংশে একখণ্ড সুস্থ ধাতুফলকের প্রবল সাড়ার লিপি, এবং ইহার দক্ষিণ অংশে সেই ধাতুফলকেরই বিষপ্রয়োগে মৃত্যুর স্পষ্ট ছবি অঙ্কিত রহিয়াছে।

প্রয়োগমাত্রার সহিত ঔষধের কার্য্যকারিতার একটা অতি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে। যে ঔষধ অল্পমাত্রায় প্রয়োগ করিলে প্রাণী রোগমুক্ত হয়, তাহাই অধিক পরিমাণে দেহস্থ করিলে প্রায়ই মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হইতে দেখা যায়। অচেতন উদ্ভিদ ও জড় ধাতুপিণ্ডে অধ্যাপক বসু মহাশয় এই প্রাণি-লক্ষণটীও আবিষ্কার করিয়াছেন। উদ্ভিদ ও ধাতুকে অতি অল্প মাত্রায় অহিফেন আরসেনিক বা বেলেডোনা দ্বারা বিষসংযুক্ত করিয়া তাহাতে আঘাত দিতে থাক, উভয়েই সাধারণ অবস্থা অপেক্ষা প্রবলতর সাড়ার লক্ষণ দেখিবে। বিষের মাত্রা বাড়াইয়া দাও, অচিরাৎ মৃত্যু আসিয়া উভয়কেই আক্রমণ করিবে। তখন সাড়াজ্ঞাপক লিপিতে ৭ম ও ৮ম চিত্রের দক্ষিণাংশের অনুরূপ এক একটী সরল রেখাদ্বারা তাহাদের মৃত্যুর পরিচয় পাইবে। কতকগুলি পদার্থ ব্যবহারে প্রাণী যেমন মত্ত হইয়া উত্তেজনার লক্ষণ প্রকাশ করে, ঠিক্ সেই সকল পদার্থ ধাতু ও উদ্ভিদে প্রয়োগ করিয়া বসু মহাশয় উভয়েই মত্ততা ও উত্তেজনার লক্ষণ দেখিতে পাইয়াছেন।

ক্লোরোফরম্ প্রভৃতি কতকগুলি বিশেষ বিশেষ পদার্থের কার্য্য আমরা অনেকেই দেখিয়াছি। এই সকল পদার্থ ব্যবহার করিলে প্রাণী লুপ্তসংজ্ঞ হইয়া পড়ে এবং তাহাদের জীবনক্রিয়া অতি ক্ষীণভাবে চলিতে থাকে। উদ্ভিদ্ ও ধাতব পদার্থে ক্লোরোফরম্ ইত্যাদি প্রয়োগ করিয়া অধ্যাপক বসু মহাশয়, তাহাতে তদবস্থ প্রাণীর লক্ষণ দেখিতে পাইয়াছেন। উদ্ভিদদেহে ও ধাতুপিণ্ডে আঘাত কর, নিয়মিত আঘাতে উভয়েই নিয়মিতভাবে সাড়া দিতে থাকিবে। তা'র পর উভয়েই ক্লোরোফরম্ প্রয়োগ কর, রেখালিপিতে এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় প্রবল সাড়ার চিহ্ন দেখিতে পাইবে না,—সাড়াচিহ্ন খর্ব্বকায় ও অস্পষ্ট হইয়া অঙ্কিত হইতে থাকিবে। একটী উদ্ভিদ-পত্রে ক্লোরোফরম্ প্রয়োগ করিলে, হতজ্ঞান প্রাণীর ন্যায় সেটী কি প্রকার ক্ষীণ সাড়া দেয় ৯ম চিত্রের বাম অংশটা দেখিলে পাঠক বেশ বুঝিতে পারিবেন। দীর্ঘতর রেখাময় দক্ষিণাংশটী সেই পত্রেরই সুস্থাবস্থার সাড়ালিপি।



৯ম চিত্র।

শীত ও উষ্ণতার মাত্রানুসারে উদ্ভিদ ও ধাতুদেহের সাড়া কিপ্রকারে পরিবর্ত্তিত হয়, অধ্যাপক বসু মহাশয় তৎসম্বন্ধেও বহু গবেষণা করিয়াছেন। নানা পরীক্ষার ফল তুলনা করিয়া দেখা গিয়াছে, শীতাতপের প্রভাব প্রাণী, উদ্ভিদ ও ধাতুদেহে অবিকল এক। আমরা প্রতিদিনই দেখিতে পাই, প্রাণীর মধ্যে প্রত্যেক জাতিই এক একটা নির্দ্দিষ্ট উষ্ণতায় খুব কার্য্যক্ষম থাকে এবং সেই উত্তাপমাত্রার হ্রাস বৃদ্ধি হইলে, প্রাণী আর স্ফূর্ত্তির সহিত কাজ করিতে পারে না। ভেক সর্প প্রভৃতি প্রাণী নাতিশীতোষ্ণ ঋতুতে খুব সবল থাকে, অধিক শীতে বা অধিক গরমে তাহাদের কার্য্যক্ষমতা কমিয়া যায়। নানা জাতীয় মনুষ্যের মধ্যেও কার্য্যক্ষমতার এই প্রকার এক একটা সীমা দেখিতে পাওয়া যায়। শীতোষ্ণতার মাত্রানুসারে উদ্ভিদের কার্য্যক্ষমতারও এইপ্রকার এক একটা সীমা অধ্যাপক বসু মহাশয়ের পরীক্ষায় ধরা পড়িয়াছে। স্থূলতুষারাচ্ছন্ন বৃক্ষপত্রে প্রবল আঘাত দাও, সাড়ালিপিতে তাহার সজীবতার অণুমাত্র লক্ষণ দেখিতে পাইবে না। তুষারক্লিষ্ট ও লুপ্তসংজ্ঞ ব্যক্তির ন্যায় বৃক্ষপত্র শীতে আড়ষ্ট হইয়া থাকিবে। পত্রে তাপপ্রয়োগ কর, অপগতশৈত্য ব্যক্তির ন্যায়, সেটা সজাগ হইয়া সামান্য উত্তেজনাতেও প্রবল সাড়া দিতে থাকিবে। বহুক্ষণ তুষারাবৃত থাকিলে প্রাণীর যে প্রকার মৃত্যু হয়, অধ্যাপক বসু মহাশয় দীর্ঘকাল তুষারাচ্ছন্ন পল্লবেও সেই প্রকার অপমৃত্যু দেখিয়াছেন।

উদ্ভিদের উপর শীতোষ্ণতার আর কি প্রভাব আছে, এখন দেখা যাউক। এই সম্বন্ধীয় পরীক্ষায় অধ্যাপক বসু মহাশয় ছয়টী বিভিন্নজাতীয় মূলা উষ্ণজলে রাখিয়া জলের উষ্ণতা ক্রমে বাড়াইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। জলের উষ্ণতা ৫০ অংশ পর্য্যন্ত উঠিলেও, প্রত্যেকেই বাহ্য আঘাত তাড়নায় অল্পাধিক পরিমাণে সাড়া দিয়াছিল। তা'র পর জলের উষ্ণতা ৫৫ অংশে উঠিলে কাহারও সাড়া পাওয়া যায় নাই। কিন্তু অধ্যাপক বসু ঐ মূলক ও সেলেরি প্রভৃতি বিলাতী সব্জিতে ৬০ অংশ পর্য্যন্ত শুষ্কতাপ দিয়াও তাহাদিগকে জীবিত দেখিয়াছিলেন। উত্তপ্ত জল বা জলীয় বাষ্পদ্বারা প্রযুক্ত তাপ অপেক্ষা, কেবল শুষ্ক বায়ুদ্বারা চালিত তাপ যে উদ্ভিদ সকল অধিক পরিমাণে সহ্য করিতে পারে, তাহা অধ্যাপক বসুর এই পরীক্ষায় বেশ বুঝা গিয়াছিল। এই বিষয়ের পরীক্ষা আজও সম্পূর্ণ হয় নাই। কোন জাতীয় বৃক্ষের বৃদ্ধির পক্ষে, কতটা তাপ অনুকূল, তাহা এই প্রথায় ক্রমে আবিষ্কৃত হইলে,—উদ্যানপালন ও কৃষিকার্য্যের একটা মহদুপকার সাধিত হইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, প্রাণী ও উদ্ভিদ এবং উদ্ভিদ ও নির্জ্জীব রাজ্যের স্বাতন্ত্র্যজ্ঞাপক সীমান্তরেখা আবিষ্কারের জন্য প্রাচীন ও আধুনিক পণ্ডিতগণ বহুচেষ্টা করিয়াও সাফল্য লাভ করিতে পারেন নাই। কিন্তু আধুনিক পণ্ডিতগণের দাম্ভিকতা তাঁহাদের সেই পরাভব ঘোষণা করিতে দেয় নাই। "শারীরক্রিয়া", "জীবনীশক্তি" প্রভৃতি কতকগুলি নিরর্থক শব্দের কোলাহলে সত্য কথা চাপা দিয়া, কতকগুলি নিছক্ কাল্পনিক শ্রেণীবিভাগে এপর্য্যন্ত সকলেই ব্যস্ত ছিলেন। অধ্যাপক বসু মহাশয়ের অদ্ভুত আবিষ্কারগুলি দ্বারা আধুনিক পণ্ডিতগণের সেই কল্পনার মোহ ভাঙ্গিবার উপক্রম হইয়াছে। যে সকল লক্ষণ দ্বারা বিজ্ঞানবিদ্গণ জীবনীক্রিয়ার অস্তিত্ব বুঝিয়া কাহাকেও প্রাণী কাহাকেও উদ্ভিদ, এবং কাহাকেও বা নির্জ্জীব সংজ্ঞায় আখ্যাত করিতেন, অধ্যাপক বসু মহাশয়ের পরীক্ষায় সৃষ্ট পদার্থ মাত্রেই সেই সকল লক্ষণ ধরা পড়িয়াছে। সুতরাং বৈজ্ঞানিকগণ পূর্ব্বে যেমন বলিতেন,—"এইস্থলে জীবনী শক্তির কার্য্য আরম্ভ এবং এই স্থানে তাহার শেষ,"—এখন সে সকল কথা কোন ক্রমেই বলা

চলিবে না। ইঁহারা যে ভিত্তির উপর আধুনিক বিশাল শরীরবিজ্ঞাকে দাঁড় করাইয়াছেন, বসু মহাশয়ের আবিষ্কার দ্বারা তাহার ধ্বংস-সম্ভাবনা দেখা যাইতেছে। অধ্যাপক মহাশয় বলেন, সৃষ্টিতত্ত্বের কুহকর্ত্তার 'জীবনী শক্তি'র যাদুমন্ত্রে খুলিবে না। প্রাণিরাজ্যের রহস্য উদ্ভেদের একমাত্র পথ, অচেতন উদ্ভিদ ও জড় ধাতুর কার্য্য পরীক্ষা।*

শ্রীজগদানন্দ রায়।

একখানা প্রাচীন দলিল।

সম্প্রতি ঢাকাজিলার অন্তঃপাতী মুন্সীগঞ্জ মহকুমার আদালতে একটা মোকদ্দমা চলিতেছে। তাহার বিবরণ এই—

বিক্রমপুর পরগণার অন্তর্গত গ্রামবিশেষনিবাসী কোনও এক পরিবারের আর্থিক অবস্থা ইতিপূর্ব্বে ভাল ছিল না। আজকাল এই পরিবারের এক যুবক চাকরী করিয়া বেশ দুপয়সা সঞ্চয় করিয়াছেন। অবস্থা পরিবর্ত্তনের পর ইঁহারা পৈত্রিক বাড়ী ত্যাগ করিয়া উৎকৃষ্টতর এক নূতন বাড়ীতে বাস করিতেছেন, অথচ পৈত্রিক বাড়ীর উপর দাবী ছাড়িতেছেন না। উক্ত মোকদ্দমার বিষয় এই পৈত্রিক বাড়ী, এবং এই পরিবার বিবাদী।

বাদিপক্ষ বলেন, এই বাড়ীতে বিবাদীদের কোনও অধিকার নাই। বিবাদীদের পূর্ব্বপুরুষগণ বাদীর পূর্ব্বপুরুষদিগের নফর (অর্থাৎ ক্রীতদাস) ছিল। নফরকে ভরণপোষণ করা ও বাসস্থান দেওয়া মনিবের কর্ত্তব্য। সেই কর্ত্তব্যপালনার্থই বিবাদীদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে বাদীর পূর্ব্বপুরুষগণ এই বাড়ীতে বাস করিতে দিয়াছিলেন। কিন্তু বাসস্থানে ক্রীতদাসের কোনও স্বত্ব জন্মে না। এখন বিবাদিগণ এই বাড়ী ছাড়িয়া যাওয়াতে তাহাদের ভোগের স্বত্বও লোপ পাইয়াছে।

বিবাদীদিগের দাসত্ব প্রমাণ করিবার জন্য বাদী একখানা প্রাচীন দলিল আদালতে দাখিল করিয়াছেন। দলিলখানা বাঙ্গালা ১১৯১ সনের ফাল্গুন মাসে অর্থাৎ ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে লিখিত। আমরা দলিলখানা যেরূপ বুঝিতে পারিলাম, বর্ণবিন্যাস বা অন্য কোনও বিষয়ে কোনও রূপ পরিবর্ত্তন না করিয়া, এস্থলে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। দলিলের অপরপৃষ্ঠে সাক্ষীদের স্বাক্ষর; অনাবশ্যক বোধে শুধু সেই অংশ পরিত্যক্ত হইল। আমাদের ছেলেবেলায় দেখিয়াছি, বিক্রমপুরে কাগজীনামক একশ্রেণীর গ্রাম্য কারুকর একরূপ পুরু ও খস্‌খসে কাগজ প্রস্তুত করিত। সেই কাগজকে আমরা বাঙ্গালা কাগজ বলিতাম। বালীর কাগজ প্রচলনে বাঙ্গালা কাগজ বাজার হইতে দূরীভূত হইয়াছে। উক্ত দলিল খানা সেই বাঙ্গালা কাগজে লিখিত। দলিলের প্রতিলিপি এই—

শ্রীদুর্গাচরণ—

নিশানছহি
শ্রীঅপূর্ব্বা
দাসী
সাং আমবারাক

নিশানছহি
শ্রীস্বর্ণমোনী
পং স্বর্ণগাও
সাং তজা—

/৭ ইআদিকীর্দ্দ শ্রীইন্দ্রনারায়ন চক্রবর্ত্তি ওলদে জোগেশ্বর চক্রবর্ত্তি ইবনে দুর্গাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তি স্বচরিতেষু— লিখীতং শ্রীমতি অপূর্ব্বা ওলদে নারান দেও জওজে চান্দদেও ও শ্রীমতি স্বর্ণমনি ওলদে চান্দদেও জওজে উদয়রাম দেও ও আম্‌র পুত্র সানন্দরাম দেও বএস ৪ চাইর বৎসর ও তস্য ভগ্নীর বএস ৪ চাইর মাস মনিস্য আপ্ত বিক্রয় কবজ পত্রমিদং কার্য্যঞ্চ আগে আমরা আপনার স্থানে দস্তবদস্ত নগদ মূল্য পুরঃজন দহমাসী ২৫ পচিষ রূপাইয়া পাইয়া কবজ দিলাম ইতি সন ১১৯১ একানব্বই সন-— তেরিখ—১৮ ফাল্গুন—।

ইহার একটুক ব্যাখ্যা প্রয়োজন। /৭ এই চিহ্ন প্রাচীনেরা দলিলাদির পূর্ব্বে ব্যবহার করিতেন; শুনিয়াছি, ইহা মঙ্গলসূচক। ইবনে শব্দের ভাব এই যে ইন্দ্রনারায়ণ

---

* পরপ্রবন্ধে অধ্যাপক বসু মহাশয়ের আবিষ্কারগুলি বিশেষভাবে আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল।—লেখক।



বজ্রমুকুট ও পদ্মাবতী।

শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক অঙ্কিত।

KUNTALINE PRESS.

চক্রবর্ত্তী দুর্গাপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর পৌত্র। পুরওজন শব্দে বোধ হয় ইংরেজী standard value বা sterling বুঝাইতেছে। কিন্তু দহমাসী কথার কোনও অর্থ বুঝি নাই। কোন-কোন পারসীবিদের সঙ্গেও আলাপ করিয়াছিলাম; তাহাতেও অর্থ পরিষ্কার হইল না। সেকালের বাঙ্গালানবীশেরা ব্যঞ্জনবর্ণে উকার বা উকার সংযোগের পরিবর্ত্তে 'ব' ফলা দিতেন; দ্বর্গা ও ম্বল্য যথাক্রমে আমাদের দুর্গা ও মূল্য। এই দলিলের 'ব' ফলা বাস্তবিকই কোথায় ব-বাচক, তাহা পাঠক অনায়াসেই বুঝিতে পারিবেন।

এই দলিল হইতে দেখা যাইতেছে যে চান্দদেও নামক ব্যক্তির স্ত্রী, কন্যা, দৌহিত্র ও দৌহিত্রী, এই চারিজন লোক মোট ২৫৲ পঁচিশ টাকাতে আত্মবিক্রয় করে। সুতরাং একজন মানুষের তাৎকালিক মূল্য ৬।০ টাকা মাত্র। ইহা আজকাল একটা বড় ভেড়ার দামও নয়।

দলিলের তারিখ ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দ। ঐ সময়ে কোন উল্লেখযোগ্য দুর্ভিক্ষ ছিল বলিয়া জানি না। ভীষণ দুর্ভিক্ষ ছিয়াত্তরে মন্বন্তর ইহার পনর বৎসর পূর্ব্বের ঘটনা। তাই বিশেষ দুর্বৎসর বলিয়া এত অল্পমূল্যে মানুষ বিক্রয় হইয়াছিল, এরূপ অনুমান বোধ হয় সঙ্গত নহে।

সে সময়ে টাকার মূল্য বর্ত্তমান অপেক্ষা অধিক ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু টাকার তাৎকালিক মূল্য আধুনিক মূল্যের দ্বিগুণ ধরিলেও তদানীন্তন একজন মানুষের স্বাধীনতা সার্দ্ধদ্বাদশমুদ্রা পরিমিত মাত্র হয়।

অন্য একভাবেও একটা হিসাব ধরা যায়। ১৫।১৬ বৎসর হইল একজন প্রাচীনের সহিত আলাপ করিয়াছিলাম। তখন তাঁহার বয়স প্রায় ৬০ বৎসর। বাল্যকালে তাঁহার পিতৃবিয়োগের পর তিনি, তাঁহার অগ্রজ ও মা মাত্র ছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, প্রতি রবিবারে চারি আনা লইয়া তাঁহারা দুই ভাই হাটে যাইতেন; তাহাতেই তাঁহাদের তিন জনের এক সপ্তাহের খাদ্যোপযোগী ধান, ডাল, তেল, নুন, লঙ্কা প্রভৃতি পাওয়া যাইত। ধান টাকায় দুই মণের উপর ছিল। অপর এক বৃদ্ধের নিকট শুনিয়াছি, তাঁহার বাল্যকালে মাসিক ১৷।০ বেতনে একজন চাকর নিযুক্ত হওয়াতে তাঁহাদের পরিবারস্থ সকলেই বেতনটা অত্যন্ত গুরুতর বোধ করিয়াছিলেন। অবশ্য এই বেতনই চাকরের পরিবারের উপজীবিকা। উল্লিখিত উভয় বৃদ্ধই বিক্রমপুরের অধিবাসী। কাগজপত্রে বিগত শতাব্দীর প্রারম্ভে কলিকাতা অঞ্চলে খাদ্য দ্রব্যের যে মূল্য দেখা যায়, তাহার সহিত এই বৃদ্ধদ্বয়ের উক্তির অসঙ্গতি নাই। সেই রেলওয়েষ্টীমারবিহীন যুগে সুদূর মফস্বল পূর্ব্ববঙ্গে খাদ্যদ্রব্য কলিকাতা অপেক্ষা যে সুলভ ছিল, তাহা বিনাতর্কে স্বীকার করা যায়। যাহাহউক এই সকল হইতে বোধ হয় যে, যে শ্রেণীর লোক নফর হইত, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ২৫ টাকায় তাহাদের চারিজনের প্রায় দুই বৎসর চলিতে পারিত। এতদ্ব্যতীত নফরদের অন্নলাভও ছিল। তাহারা মনিবের নিকট বাসস্থান পাইত। অধিকন্তু উপায়ান্তর বিহীন হইলেই মনিব তাহাদিগকে প্রতিপালন করিতেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে শতবর্ষপূর্ব্বে বঙ্গদেশে নিম্নশ্রেণীস্থ লোক বাসস্থান, এককালীন কিছুদিনের সংস্থান-সম্ভাবনা এবং আপৎকালে সাহায্যপ্রত্যাশার পরিবর্ত্তে আত্মবিক্রয়ে প্রস্তুত ছিল।

বঙ্গসমাজের এই চিত্র হইতে আমরা বাঙ্গালী জাতির স্বাধীনতার আদর্শ সম্বন্ধে কয়েকটা সিদ্ধান্ত করিতে পারি। প্রথমতঃ, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগেও এদেশে মৃদুভাবে দাসত্ব-প্রথা প্রচলিত ছিল। দ্বিতীয়তঃ, জনসাধারণ দাসত্বকে তত ঘৃণার চক্ষে দেখিত না। তৃতীয়তঃ, অভিভাবকগণ নাবালকদিগকে দাসত্বে বিক্রয় করিতে পারিত। চতুর্থতঃ, স্বাধীনতার মূল্য অতি অকিঞ্চিৎকর ছিল।

এস্থলে আর কয়েকটী প্রশ্ন স্বতঃই মনে উদিত হয়। প্রথমতঃ, বঙ্গদেশের আর্থিক অবস্থা পূর্ব্বাপেক্ষা উন্নত কি অবনত হইয়াছে? দ্বিতীয়তঃ, ইংরেজাধিকারে উচ্চশ্রেণী কি নিম্নশ্রেণীর অবস্থার অধিকতর পরিবর্ত্তন হইয়াছে? তৃতীয়তঃ, এখন অর্থোপার্জ্জনের যত পন্থা আছে, শতবর্ষ পূর্ব্বে তত ছিল কি না? পাঠকবর্গকে এই সকল প্রশ্নের উত্তর চিন্তা করিবার অবসর দিয়া আজকার মত বিদায় লই।

শ্রীপরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

নাটকের উৎপত্তি।

যে কয়েকখানি সংস্কৃত নাটক পাওয়া যায়, এবং অলঙ্কারশাস্ত্রাদিতেও যে কয়েকখানির দৃষ্টান্ত উল্লিখিত আছে, সে সকলগুলিই পৌরাণিক যুগের। ঐ যুগের পূর্ব্বে নাট্যসাহিত্যে সৃষ্ট হইয়াছিল কি না, তাহার অনুসন্ধান করা সহজসাধ্য নহে।

মহাভারতের সভাপর্ব্বে, নারদ যেখানে ব্রহ্মার সভার কথা বর্ণনা করিয়াছেন, কেবল মাত্র সেইস্থানে উল্লিখিত আছে, যে ব্রহ্মার সভায় নাটক অভিনীত হইয়াছিল। নাটক এবং তাহার অভিনয় যে মহাভারতের সময় অপরিচিত ছিল না, তাহা এই একস্থানের একটী দৃষ্টান্তের দ্বারাই প্রমাণিত হইতে পারে। কিন্তু সে নাটক কি দৃশ্যকাব্য, অথবা সনৃত্য চরিতাবৃত্তি, তাহা বলা যায় না। যে সকল পণ্ডিতেরা মহাভারতেরও আলোচনা করিয়াছেন, এবং নাট্যসাহিত্যের উৎপত্তির কথারও আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা একথার কোন মীমাংসা করেন নাই। চোখে পড়ে নাই, এ কথা ত মনে হয় না। তবে হইতে পারে যে, যে অধ্যায়ে 'নাটক' কথার উল্লেখ আছে, পণ্ডিতেরা সেটিকে প্রক্ষিপ্ত মনে করেন। আমি কিন্তু কোন মহাভারত সমালোচনায়, ঐ অধ্যায়টি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া উল্লিখিত দেখি নাই।

রামায়ণের উত্তরাকাণ্ডটি যে কবির নিজকল্পিত, এবং প্রাচীনপ্রবাদের অনুযায়ী নহে, তাহা বাল্মীকির ভূমিকায়, এবং মহাভারতে উল্লিখিত রামায়ণ-কথা দ্বারাই প্রমাণিত। উত্তরাকাণ্ডের আখ্যায়িকাটি, রামচন্দ্রের পুত্র লব কুশ, ছদ্মবেশে গান গাহিয়া শুনাইয়াছিলেন। নাম দুটিও বোধ হয় যেন ছদ্মবেশের উপযোগী করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। যাহারা নাটক অভিনয় করিত, তাহার কুশী লব নামেই নাট্যশাস্ত্রে আখ্যাত। নট, সূত, মাগধেরাও পূর্ব্বকাল হইতে নৃত্য এবং আখ্যায়িকা গান করিত। সনৃত্য ভাববিশুদ্ধ আবৃত্তি, যে নাটক অভিনয় বলিয়া কীর্ত্তিত হইত, তাহাও ছলিক নাটক এবং প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্র হইতে জানিতে পারা যায়। এরূপস্থলে রামায়ণ রচিত হইবার সময়ে, যে চরিতবর্ণনাদ্বারা অভিনয় প্রচলিত ছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। কাজেই এই অনুমানটি অসঙ্গত হইবে না, যে অভিনয়কারী কুশীলব নায়, উপলক্ষ্য করিয়া রামচন্দ্রের পুত্রদ্বয়ের নামকরণ হইয়াছিল। মহাভারতের ঈক্ষাকুবংশের তালিকায়, লবকুশ নাম নাই।

মহাভারতের সাক্ষীই মানি, অথবা রামায়ণের দোহাই দি, কিছুতেই যখন বৌদ্ধযুগের পূর্ব্বে নাটকের উৎপত্তি হইয়াছিল বলিতে পারি না; এবং অপরপক্ষে যখন খৃঃ পূঃ ৫০০ হইতে ৪০০ বৎসরের মধ্যেই গ্রীক্ কবি এস্কাইলস্, সফক্লিস্ এবং ইউরিপাইডিসের আবির্ভাব; তখন ভারতানুরাগী মহাত্মারা, গ্রীস্ হইতে নাট্যকৌশলের আমদানির কথা বলিতে ছাড়িবেন না। এ কথা যাঁহারা বলেন, তাঁহারা বেশ বলিষ্ঠ এবং সাহসী। গ্রীক নাটক আগে, এবং গ্রীকজাতীয় জন কতক লোক আসিয়া ভারতের পশ্চিম প্রান্তে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন, কেবল এই মাত্র প্রমাণের বলে, যাঁহারা নাটক জিনিষটি ধারকরা সামগ্রী বলেন, এ যুগে তাঁহাদের বুদ্ধি এবং সাহসের যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা আছে। রাম, আগে টাকা সঞ্চয় করিয়াছিল, এবং শ্যাম তাহার পরে বড়মানুষ হয়; এই প্রমাণের বলে এবং বিলাতি নজির টুকুর আশীর্ব্বাদে, শ্যামের উপর যে রাম একটি ডিক্রি হাঁসিল করিতে পারিবে না কেন, তাহা ত বুঝিতে পারি না।

যে গ্রীক যবনেরা ভারত-সীমান্তে উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, মহাভারতের যুগে, তাহাদের গ্রীকত্ব ছিল কি? সম্পূর্ণ হিন্দু হইয়া যাইবার পূর্ব্বেও তাহাদের সামাজিক অবস্থা যেরূপ হইয়াছিল, তাহাতে পূর্ব্ব পুরুষের ভিটার সহিত তাহাদের কোন সম্পর্কই ছিল না। অথচ নাটক শিক্ষায় গুরু হইলেন এই যবনেরা। ইহারা নিজে কখনও কোন নাটক লিখিয়াছিল, অথবা অভিনয় করিত, ইতিহাস তাহার সাক্ষী দেয় না। মালবিকাগ্নিমিত্রে দেখিতে পাই, যে কালিদাসের পূর্ব্বে ছলিক নাটকাদি যাহা অভিনীত হইত, তাহাতে কেবল দুই একজন লোক, একটি কোন চরিত্র, বিশুদ্ধ ভাবভঙ্গীর সহিত মনোহর ভাবে আবৃত্তি করিত। গ্রীকদিগের নাটকের ইতিহাসেও দেখিতে পাই, যে দৃশ্য কাব্য সৃষ্ট হইবার পূর্ব্বে, ঐ প্রকার সনৃত্য অভিনয় ছিল। হিন্দুরা যখন গ্রীকদিগের নিকট নাট্য কৌশল ধার করিয়াছিলেন, তখন উৎপত্তির ইতিহাসটুকু ও

ধার করিতে ভুলেন নাই। সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ সুগঠিত নাটক থাকিতেও, তাঁহারা, ঠিক যেমন করিয়া গ্রীক নাটক বাড়িয়া উঠিয়াছিল, সেই প্রণালীতে নাটকটা বাড়াইয়া লইয়া, আস্ত নাটক রচনা করিয়াছিলেন! একেই বলে বেজায় নকল; এবং এই প্রমাণকে বলে "বলং বলং বাহুবলং"।

সকল দেশে এবং সকল জাতির মধ্যেই নৃত্য এবং গীত বিকশিত হয়, কেহ কাহারও কাছে ধার করিয়া শিখে না। নাচিয়া গান গাইবার সময় কোন বিশেষ জাতীয় চরিত্রও যে ভাবানুযায়ী আঙ্গিক এবং বাচিক অভিনয়ের সহিত গীত হয়, তাহাও প্রত্যেক জাতির পক্ষেই স্বাভাবিক। এই মৌলিক ভাব হইতেই যখন দৃশ্যকাব্যের বিকাশ বুঝিতে পারা যায়, তখন অমুক জাতি অমুক জাতির নাক কাণ কাটিয়া আনিয়া, আত্মশরীরে যোজনা করিয়াছিল, এ সকল কথা বলা বিড়ম্বনা মাত্র।

হিন্দুর দর্শন শাস্ত্র হইতে ইউরোপীয় দর্শন শাস্ত্র, বৌদ্ধধর্ম্মের শিক্ষার প্রভাবে যীশুর ধর্ম্মের উৎপত্তি; এই সকল কথা, ইউরোপীয়দিগের দ্বারাই প্রমাণিত হইয়াছে বলিয়া, কোন প্রকারে ভারতবর্ষকে ইউরোপের কাছে ঋণী করিবার চেষ্টায়, উপযুক্ত প্রমাণের অভাবেও, নানা কথার সৃষ্টি হইয়াছে।

অশোক রাজার সময়ে, বৌদ্ধদিগের মধ্যে গান গাহিয়া মহাপুরুষচরিত আখ্যাত হইত। সে গানে যে ভাব উদ্দীপনার জন্য অভিনয় হইত না, তাহা ত মনে হয় না। খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে কৃষ্ণ নামে একজন বীরপুরুষের নাম, ভারতবর্ষে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তখন, অথবা পরবর্ত্তী দ্বিতীয় শতাব্দীতেও তিনি বিষ্ণুর অংশ হয়েন নাই, অথবা মহাভারতের কথার সহিত যুক্ত হয়েন নাই। কিন্তু তৃতীয় শতাব্দীতে, বীরপূজার মত, তাঁহার লীলার নাট্যাভিনয় হইত বলিয়া নাকি, পতঞ্জলির মহাভাষ্যে উল্লিখিত আছে। ঐ গ্রন্থের সহিত আমার কিছুমাত্র পরিচয় নাই; কথাটি বার্থ সাহেবের গ্রন্থে (Religions of India by A. Barth) পড়িয়াছিলাম। রামায়ণ রচিত হইবার সময়েও হয়ত ঐশ্রেণীর অভিনয়ই প্রচলিত ছিল। কালিদাসের সময়ের পূর্ব্বেও যে সর্ব্বাঙ্গীন দৃশ্যকাব্য রচিত না হইয়া, কেবল দু একজনের নৃত্যগীতাভিনয়েই নাটক অভিনীত হইত, মালবিকাগ্নিমিত্রে ছলিক নামক নাটকের কথাতেই তাহাই সূচিত হয়। ধাবক ও সৌমিল্ল হয়ত প্রাচীন প্রথার অনুগামী ছিলেন বলিয়া, নূতন দৃশ্যকাব্য লিখিত হইবার সময়, কালিদাস লিখিয়াছিলেন :—

পুরাণ মিত্যেব ন সাধুসর্ব্বং
নচাপি কাব্যং নবমিত্যবদ্যং।

কেহ কেহ বলিতে পারেন, যে পূর্ব্বকালে কালিদাসাদিপ্রণীত নাটকের মত নাটক হয় নাই; এবং একেবারেই ঐ জিনিষটি জন্মিল; ইহা কি সম্ভবপর? এ সম্বন্ধে দুইটি উত্তর দিতে পারি। (১) হয়ত, ঐ সময়ের পূর্ব্বে দুই একখানির সৃষ্টি হইয়াছিল, কিন্তু হীনতা প্রযুক্ত সেগুলি শীঘ্রই লুপ্ত হইয়া গিয়াছিল। (২) গ্রীক নাটকের ইতিহাসে দেখিতে পাই, যে সনৃত্য দেবলীলার গান এবং কবিতাযুক্ত চলিতেছিল; এবং সহসা সেই ক্ষেত্রে প্রাচীন 'কোরস্'টি কাব্যের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়া, এস্কাইলস্, নাটকের অবতারণা করিলেন। প্রতিভার অভ্যুদয়ে, নূতন জিনিষের সৃষ্টি, এইরূপেই হইয়া থাকে। এখনকার লর্ড বিশপ কপলষ্টোন সাহেবের এস্কাইলাস্ নামক গ্রন্থে, গ্রীক নাটকের অতি সুন্দর সংক্ষিপ্ত ইতিহাস প্রদত্ত হইয়াছে।

কালিদাসের নাটকেও ভরতের নাম পাওয়া যায়; এবং ভরতই নাট্যশাস্ত্রের প্রণেতা বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। এই কথায় মনে হইতে পারে, যে কালিদাসের পূর্ব্বে নাটকের লক্ষণাদি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল এবং পূর্ণাবয়ব নাটকেরও অস্তিত্ব ছিল। একালে ভরতপ্রণীত বলিয়া যে নাট্য শাস্ত্র দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা অত্যন্ত আধুনিক। ৭ম শতাব্দীর কাদম্বরীতে দেখিতে পাই, যে রাজকুমার যত বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে যেখানে নাট্যশাস্ত্রের নাম আছে, সেই স্থানেই স্বতন্ত্র ভাবে ভরতপ্রণীত নৃত্যশাস্ত্রের উল্লেখ আছে। তখনও ভরত নাট্যশাস্ত্র প্রণেতা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন নাই। ছলিক নাটকের অভিনয় সময়েও নৃত্যের অনেক ব্যাখ্যা দেখিতে পাই। নৃত্যাভিনয় হইতেই নাটকের উৎপত্তি বলিয়া, সকল নাটকেই ভরতবাক্য পাওয়া যায়, এবং সেইজন্যই পরে ভরতের নামে নাট্য এবং নৃত্যশাস্ত্র একসঙ্গে

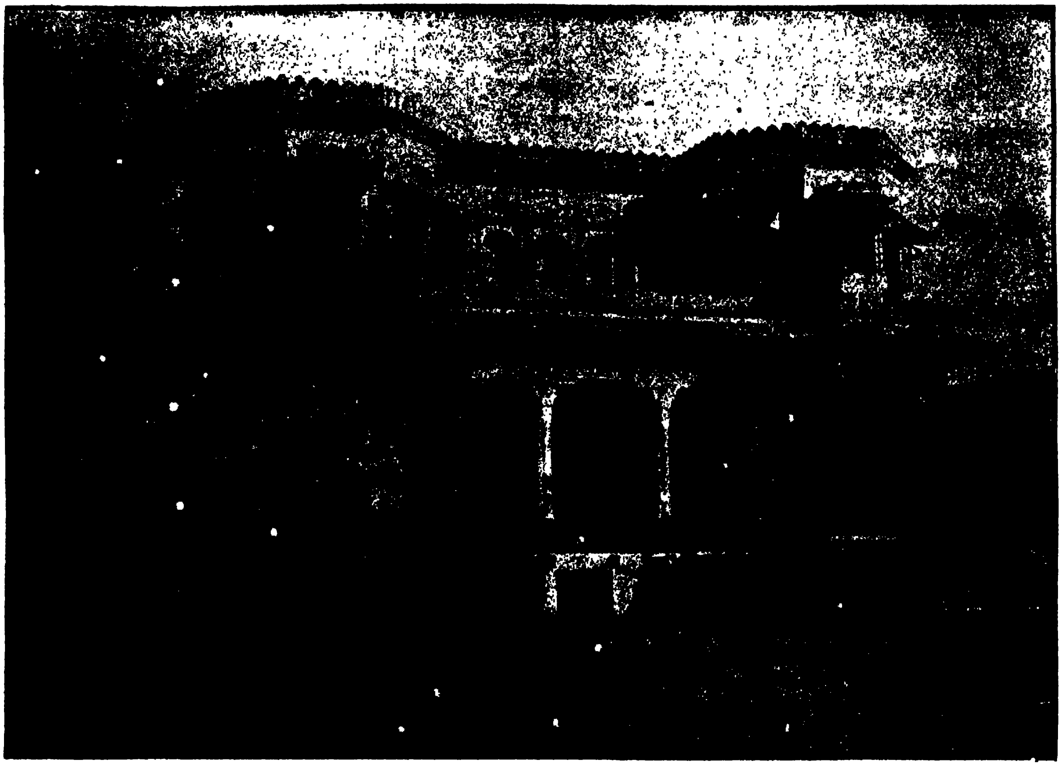
রচিত হইয়াছে। অপিচ, একালের নাট্যশাস্ত্র গ্রন্থে যখন অনেকগুলি প্রাকৃতের উল্লেখ আছে, তখন কদাচ ঐ গ্রন্থ ৮ম শতাব্দীর পূর্ব্বের নহে। বরং মনে হয়, যে বহুশ্রেণীর নাটকের সৃষ্টির পরেই রচিত হইয়াছিল। ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ৪টির বেশী প্রাকৃতের অস্তিত্বের কথা প্রাকৃতপ্রকাশে নাই। অন্য প্রবন্ধে এ বিষয়ে অনেক কথা লিখিয়াছি। এই সকল কারণেই মনে হয়, যে নূতন শ্রেণীর নাটক, পৌরাণিক যুগে কালিদাসাদি দ্বারাই প্রথম রচিত।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

আহমদাবাদে জাতীয় অনুষ্ঠান।

আহমদাবাদের দৃশ্য পরম রমণীয়। ইহা চতুর্দ্দিকে প্রাচীরবেষ্টিত। চারিদিকেই নগরপ্রবেশের জন্য কয়েকটি করিয়া সিংহদ্বার আছে। নগরের পশ্চিম প্রাচীরের পদতলে শবরমতী নদী প্রবাহিত। শবরমতীর পশ্চিমে অনুচ্চ পর্ব্বতমালা। নগরমধ্যে বহুসংখ্যক সুশোভিত মসজিদ ও সমাধিভবন এবং হিন্দুদেবমন্দির বিরাজিত। তদ্ভিন্ন এখানকার বহুসংখ্যক বৃহৎ কূপ, কঙ্করিয়া নামক সরোবর, বিহঙ্গমভোজনশালা, প্রভৃতিও দ্রষ্টব্য।

আহমদাবাদ প্রাচীন সহর। প্রায় পাঁচসাত বৎসর পূর্ব্বে সুলতান আহমদ ইহাকে বর্ত্তমান নাম প্রদান করেন। তৎপূর্ব্বে ইহা আসাওয়ালনামে পরিচিত ছিল। ইহা ভীলদলপতি আসা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলমানশাসনসময়ে অনেকবার ইহার ভাগ্যপরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ইহার অধিবাসিগণ কখন ঐশ্বর্য্যের মুখ দেখিয়াছে, কখন বা দরিদ্রদশায় নিপতিত হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইহা ইংরেজের অধীন হয়। তদবধি এখানকার লোকেরা শিল্প ও বাণিজ্য দ্বারা নানাপ্রকারে নগরের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়াছেন। এখানে বহুসংখ্যক কাপড়ের কল ও অন্যবিধ কারখানা আছে।



শাহীবাগ।

একসময়ে ভারতবর্ষে নানাবিধ শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত হইত। ভারতবাসীরা আপনাদের প্রয়োজনাতিরিক্ত নানাবিধ সামগ্রী বিদেশে চালান দিয়া প্রভূত অর্থোপার্জ্জন করিত।

নানাকারণে ভারতীয় সর্ব্বপ্রকার শিল্পের অবনতি হওয়ায় আমরা অত্যন্ত দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছি। শিল্পীদিগের বংশধরগণের পৈত্রিক জীবিকার্জ্জনের উপায় লোপ পাওয়ায়, তাহারা সকলেই কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইয়াছে। তাহাতে যাহারা কৃষক ছিল, তাহাদেরও উদরপূর্ত্তি হইতেছে না; এবং যাহারা নূতন করিয়া চাষ আরম্ভ করিতেছে, তাহাদেরও অন্নের সংস্থান হইতেছে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, ভারতীয় শিল্পের উন্নতি না হইলে, দেশের দুর্গতি নিবারণ অসম্ভব। আমাদের নেতাগণের এইদিকে দৃষ্টি পড়ায় ১৯০১ খৃষ্টাব্দ হইতে কংগ্রেসের অধিবেশনের সঙ্গে সঙ্গে শিল্পপ্রদর্শনীও বসিতে আরম্ভ হইয়াছে। তাই এবার আহমদাবাদে কংগ্রেস উপলক্ষে শিল্পপ্রদর্শনীও খোলা হইয়াছিল। অতিশয় সুখের বিষয় যে সুশিক্ষিত, স্বাধীনচেতা ও স্বদেশপ্রেমিক বরোদাধিপতি শ্রীসয়াজীরাও গায়কবাড় প্রদর্শনী-গৃহের দ্বার উদ্‌ঘাটন করেন। দ্বারোদ্‌ঘাটন উপলক্ষে তিনি যে বক্তৃতা করেন, তাহা অতিশয় সারবান্। স্থানাভাবে আমরা তাহা হইতে কেবল দুই একটি কথা এখানে সংকলন করিব।

গায়কবাড় বলেন আমরা দেশীয় কৃষিবাণিজ্য ও শিল্পের উন্নতি করিতে না পারিলে ক্রমে আরও দুর্ব্বল ও দরিদ্র হইয়া পড়িব; বিদেশী প্রভুদের কুলির মত থাকিয়া আমাদিগকে কোন প্রকারে জীবনযাপন করিতে হইবে। কিন্তু ধনবৃদ্ধি করিতে পারিলে, আমরা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের মত আবার বড় হইতে পারিব।

গ্রীষ্মপ্রধানদেশের লোকেরা নাতিশীতোষ্ণদেশের লোকদিগের অপেক্ষা বলবীর্য্য ও প্রতিভায় নিকৃষ্ট, গায়কবাড় একথা স্বীকার করেন না। বর্ত্তমানে নিকৃষ্ট হইলেও স্বাভাবিক এমন কোন নিয়ম নাই যে আমাদিগকে চিরকালই নিকৃষ্ট থাকিতে হইবে।

আমরা বহুকাল হইতে, প্রতিকূল অবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম না করিয়া, এরূপ কল্পনা করিয়া অবসন্নভাবে বসিয়া আছি, যে আমরা সম্পূর্ণ নিরুপায়; ইহাই আমাদের অক্ষমতার কারণ। দুর্দ্দশামোচনের সর্ব্ববিধ উপায় অবলম্বন করিয়া তবে আমাদের অবসন্ন হওয়া উচিত ছিল। তাহা না করিয়া আমরা প্রথম হইতেই হাল ছাড়িয়া দিয়াছি। আমরা "ঘরকুনো"; জাতি-রক্ষা বিষয়ে আমাদের কতকগুলা সেকেলে কুসংস্কার আছে। এইজন্য আমরা বিদেশে গিয়া নূতন নূতন শিল্প শিখিতে পারি না, নূতন নূতন হাটে আমাদের সামগ্রী সকল বিক্রয় করিবার চেষ্টা করিতে পারি না। সমুদ্র পার হইয়া বিদেশে যাওয়ার বিরুদ্ধে আমাদের দেশে যে সামাজিক বাধা আছে, এই বাধা সম্পূর্ণরূপে দূর করিয়া না দিলে আমাদের কখনও উন্নতি হইবে না। ইউরোপের উন্নতি মানসনেত্রে দর্শনপূর্ব্বক স্তম্ভিত হইয়া না থাকিয়া যদি আমরা আমাদের বাধাজনক কুসংস্কার ও লোকাচার সকল পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে আমাদের নিরাশ হইবার কোন কারণ নাই। কিন্তু তাহা না করিলে আমরা পৃথিবীর উন্নতিশীল ও সভ্যজাতিবর্গের মধ্যে স্থান লাভ করিবার আশা করিতে পারি না। গায়কবাড় আরও বলেন যে এই সকল বাধাজনক কুসংস্কার ও অনিষ্টকর লোকাচার হিন্দুধর্ম্মের সার অংশ নহে।

বিজ্ঞানদ্বারা আমাদের কৃষির উন্নতি হইতে পারে। কিন্তু চাষাদের অজ্ঞতা ও ঔদাসীন্য দূর না করিলে বৈজ্ঞানিক উপায়ে চাষ করিবে কে? এইজন্য সর্ব্বশ্রেণীর লোকের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। আরও একটি উপায় অবলম্বন করা উচিত। বর্ত্তমান শ্রেণীর কৃষকগণ অপেক্ষা বুদ্ধিমান্, শিক্ষিত ও উদ্যমশীল শ্রেণীর লোকেরা কৃষিবৃত্তি অবলম্বন করিলে চাষের অনেক উন্নতি হইতে পারে।

গায়কবাড় নিজরাজ্যে শিল্পশিক্ষা দিবার জন্য 'কলাভবন' স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু তিনি বলেন যে তাঁহার প্রজাবর্গ অদৃষ্টবাদজনিত ঔদাসীন্যে এরূপ জড়বৎ হইয়া পড়িয়াছে যে কলাভবন দ্বারা তাহাদের বিশেষ কোন উপকার হয় নাই। তিনি বলেন সাধারণ শিক্ষার বিস্তার ব্যতিরেকে শিল্পশিক্ষা দিবার চেষ্টা সফল হইবে না।

গায়কবাড়ের মতে আমাদের অবনতির আর একটি কারণ এই যে আমরা পরস্পরকে বিশ্বাস করি না। এই বিশ্বাস ও নির্ভরের অভাব কেন হইল, তাহার কারণও তিনি নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে ইহার প্রধান কারণ এই যে হিন্দুগণ বহুযুগ ধরিয়া নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র জাতি ও সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া রহিয়াছে। এইজন্য আমরা



হাথীসিংহের মন্দির।

নিজের নিজের বর্ণ ও তাহার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শাখা প্রশাখা মধ্যে কূপমণ্ডুকবৎ বাস করি; অপরের কথা ভাবি না, অপরকে চিনি না। এইরূপ সঙ্কীর্ণতা হইতেও অবিশ্বাসের উৎপত্তি হইয়াছে।

গায়কবাড় নিজ বক্তৃতায় দুটি কথা পুনঃপুনঃ জোরের সহিত বলিয়াছেন। প্রথম এই যে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার ব্যতিরেকে কৃষিশিল্পবাণিজ্যাদির উন্নতি অসম্ভব। দ্বিতীয় এই যে, যে সকল অনিষ্টকর দেশাচার ও কুসংস্কারে আমাদিগকে জড়প্রায় করিয়াছে, সাহসের সহিত অসঙ্কোচে তৎসমুদয়কে নির্মূল করিতে হইবে।

"You, gentlemen, are the leaders of India and if you fail, she fails. Let each of you make up his mind that he will live by what his reason tells him is right, no matter whether it be opposed or approved by any sage, custom or tradition. Think and then act at once. Enough time has been wasted, waiting for time to solve our problems. Wait no longer but strike and strike home."

"ভদ্রমহোদয়গণ, আপনারা ভারতবর্ষের নেতা। আপনারা সিদ্ধিলাভ করিতে না পারিলে, ভারতেরও কোন আশা নাই। আপনারা প্রত্যেকে এই সঙ্কল্প করুন যে আপনারা প্রত্যেকে যাহা ঠিক বলিয়া বুঝিবেন, তদনুসারে কার্য্য করিবেন;—তাহা কোন মুনিঋষির অনুমোদিত অথবা দেশাচার কিম্বা লৌকিক সংস্কারাদি সম্মত হউক আর নাই হউক। চিন্তা করিয়া কর্ত্তব্য নির্ণয় পূর্ব্বক অবিলম্বে কার্য্য করুন। আমাদের সমস্যাগুলির সমাধানার্থ সময়ের উপর নির্ভর করায় যথেষ্ট সময় নষ্ট হইয়াছে। আর বিলম্ব করিবেন না; এরূপভাবে আপনাদের শক্তি প্রয়োগ করুন, যাহাতে নিশ্চয়ই কার্য্যোদ্ধার হইতে পারে।"

আমরা এই কথাগুলির প্রত্যেক বর্ণের অনুমোদন করি।



শ্রীসয়াজীরাও গায়কবাড়।

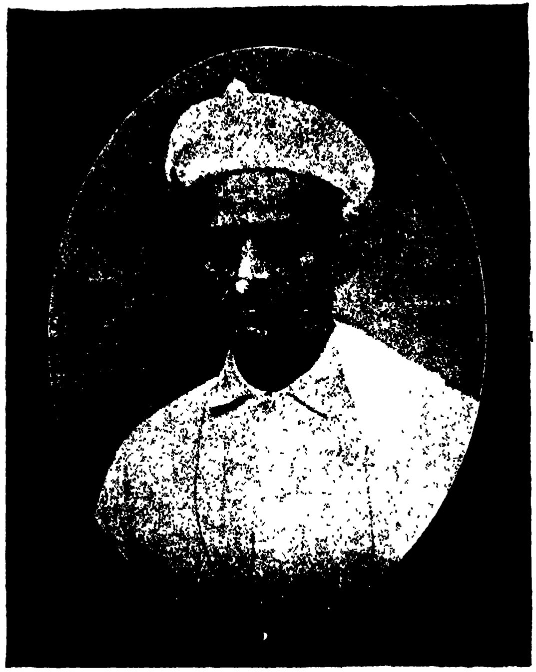


দেওয়ান বাহাদুর অম্বালাল সাকেরলাল দেশাই।

আহমদাবাদ শিল্পপ্রদর্শনীতে নানাবিধ সামগ্রী সংগৃহীত হইয়াছিল। সংবাদপত্রে ইতিপূর্ব্বে তৎসমুদয়ের বৃত্তান্ত প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষগণ, যাহা করিলে ব্যবসাদার ও ক্রেতাদের সুবিধা হয়, এবং যাহা না করিলে প্রদর্শনীর উদ্দেশ্য সম্পূর্ণরূপে সফল হইতে পারে না, তাহা করেন নাই। প্রদর্শনীতে রক্ষিত সমুদয় দ্রব্যের একটি মূল্যতালিকা ও প্রাপ্তিস্থানের তালিকা মুদ্রিত করা উচিত ছিল। সচিত্র তালিকা হইলে আরও ভাল হয়। আমরা শুনিয়াছিলাম যে কলিকাতা প্রদর্শনীর কর্ত্তৃপক্ষেরা এরূপ একটি তালিকা প্রকাশ করিবেন। কিন্তু এ পর্য্যন্ত উহা আমরা দেখিতে পাই নাই; প্রকাশিত হইয়াছে কি না, তাহাও জানি না। তাঁহারা একটি দেশীয় দ্রব্যের দোকান খুলিয়াছেন; কিন্তু আমরা মফঃস্বলে বসিয়া উহার ফলভাগী হইতে পারি না।

গত ১৫ই ডিসেম্বর প্রদর্শনী খোলা হয়। ঐ মাসেরই শেষ সপ্তাহে কংগ্রেসের অধিবেশন হয়। বরোদারাজ্যের ভূতপূর্ব্ব প্রধান বিচারপতি দেওয়ান বাহাদুর অম্বালাল সাকেরলাল দেশাই, এম্ এ, এল্ এল্ বি, অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। গুজরাতীরা এতদিন কেবল কৃষি ও বাণিজ্য ব্যবসায়েই কাল কাটাইত। তাহারা কেন রাজনৈতিক আন্দোলনে ব্রতী হইল, তাহার কারণ দেশাই মহাশয় বেশ বিশদভাবে বর্ণনা করেন। সংক্ষেপে তাঁহার বক্তব্য এই। "বিদেশের লোকে এবং আমাদের রাজা ইংরাজেরা রাজনৈতিক ক্ষমতার অপব্যবহার দ্বারা আমাদের বিনাশ সাধন করিতেছেন ও করিয়াছেন। আমরা আহমদাবাদে কাপড়ের কল স্থাপন করিয়াছি। কিন্তু আমাদের কারখানার জিনিসে ইংরাজ রাজা ট্যাক্স বসাইয়াছেন।" এইরূপ নানা দৃষ্টান্ত দ্বারা তিনি দেখান যে রাজনৈতিক অধিকার লাভ ব্যতিরেকে আমরা শিল্পবাণিজ্যেও উন্নতি লাভ করিতে পারি না। কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বক্তৃতা বেশ হইয়াছিল। দুঃখের বিষয় এবার পঞ্জাবের লোকেরা কংগ্রেসে যোগ দেন নাই। কংগ্রেসের নেতাগণ পঞ্জাবীদের অভিযোগের কারণ দূর করিলে ভাল

হয়। একেই ত মোটের উপর মুসলমানেরা কংগ্রেসের সংস্রবে থাকেন না, তাহার উপরে অতীত ও বর্ত্তমান কালে বুদ্ধবীর ও কর্ম্মবীর পঞ্জাবীগণ কংগ্রেস পরিত্যাগ করিলে ইহার প্রভাব বহুপরিমাণে কমিয়া যাইবে। বর্ত্তমান সময়ে কংগ্রেসে আরও কয়েকটি অসম্পূর্ণতা লক্ষিত হইয়া থাকে। সম্বৎসর কংগ্রেসের কোনই কার্য্য হয় না। বৎসরে একবার অধিবেশন হয় মাত্র। আমাদের বোধ হয়, সম্বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষীয় জনসাধারণের রাজনৈতিক শিক্ষার নিমিত্ত কংগ্রেসের দুইপ্রকার আয়োজন ও অনুষ্ঠান করা আবশ্যক। ইংরাজী ও দেশপ্রচলিত ভাষাসমূহে, কংগ্রেস যে সকল অভাব ও অভিযোগ লইয়া আন্দোলন করেন, তদ্বিষয়ক পুস্তিকা মুদ্রিত করিয়া অল্পমূল্যে বিক্রয় এবং স্থলবিশেষে বিনা মূল্যে বিতরণ করা কর্ত্তব্য। আমাদের দেশের সংবাদপত্রসমূহে এই সকল বিষয়ে আন্দোলন হয় বটে; কিন্তু অনেকস্থলেই সংবাদপত্রের প্রবন্ধগুলি শূন্যগর্ভ চীৎকার মাত্র। আমাদের প্রস্তাবিত পুস্তিকা সকল সারবান্ যুক্তি এবং সযত্ন-সংগৃহীত তথ্যে পূর্ণ হওয়া উচিত। দ্বিতীয় অনুষ্ঠান, বহুসংখ্যক বক্তার নিয়োগ। তাঁহারা সম্বৎসর দেশের নানাস্থানে গিয়া ইংরাজী ও দেশীয় ভাষায় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ও শিল্পবাণিজ্যাদিবিষয়ক বক্তৃতা করিবেন। আমরা ইণ্ডিয়ানামক কাগজ বিলাত হইতে প্রকাশ করি এবং ভারতবর্ষের অভাব জানাইবার জন্য অর্থব্যয় করিয়া মধ্যে মধ্যে বিলাতে বক্তৃতা দেওয়াইয়া থাকি। কিন্তু সমুদয় টাকা এরূপে ব্যয় না করিয়া আমাদের স্বদেশবাসীদের রাজনৈতিক শিক্ষার জন্যও অনেক টাকা ব্যয় করা উচিত। কংগ্রেসের আর একটি অসম্পূর্ণতা এই যে ইহার ভিত্তীভূত কোন নিয়মসমষ্টি বা constitution নাই। এইজন্য ইহার কার্য্যপ্রণালী, প্রতিনিধিনির্ব্বাচন-প্রণালী প্রভৃতি সমস্তই বহুপরিমাণে অনির্দ্দিষ্ট। কংগ্রেসের কার্য্য সাধারণতন্ত্রের মত নিয়মানুসারে পরিচালিত হওয়া উচিত। কিন্তু এপথে আর একটি বাধা আছে। আমরা যদি সকলে কংগ্রেসের কার্য্যপরিচালনসম্বন্ধে ক্ষমতা চাই, তাহা হইলে আমাদের সকলেরই কংগ্রেসের জন্য নিজ নিজ সাধ্যমত টাকা খরচ করিতে প্রস্তুত হওয়া উচিত। এখন কিন্তু কয়েকজন বড় লোক অধিকাংশ ব্যয় নির্ব্বাহ করেন। কাজেকাজেই তাঁহাদের স্বেচ্ছাচারিতায় বাধা দিবার কোন উপায় নাই। এবার সুরেন্দ্রবাবুর সভাপতিত্বে নিয়োগ ঠিক নিয়মসঙ্গত হয় নাই। কিন্তু কেহই ভবিষ্যতে এরূপ নিয়মভঙ্গ নিবারণের কোন উপায় করিলেন না বা করিতে পারিলেন না। অবশ্য তাঁহার সভাপতি হইবার যোগ্যতা সম্বন্ধে কোন কথাই উঠিতে পারে না। যে ভাবে তিনি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন, কেবল তাহারই সমালোচনা হইয়াছে।



শ্রীযুক্ত রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর।

কেবল রাজনৈতিক বিষয়ে আন্দোলন করিয়া এবং তদ্বিষয়ে শাসনকর্ত্তাদের নিকট দরখাস্ত করিয়া ও আরজি দিয়া কোনজাতি বড় হইতে পারে না। স্বদেশের উন্নতি সাধন করিতে হইলে স্বার্থত্যাগপূর্ব্বক অক্লান্ত পরিশ্রম করা দরকার। কেবল ধর্ম্মপ্রাণ লোকেরাই এইরূপে আত্মবলিদান করিয়া সংস্কারকার্য্যে ব্রতী হইতে পারেন। সংস্কার সর্ব্বাঙ্গীন না হইলে কখনও সাধিত হয় না। এইজন্য রাজনৈতিক সংস্কারের চেষ্টার সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সংস্কারও হওয়া কর্ত্তব্য; এবং সকলের মূলে ধর্ম্মসংস্কার হওয়া প্রার্থনীয়। আহমদাবাদে জাতীয় সমাজসংস্কারসমিতির অধিবেশন

হইয়াছিল। বিখ্যাত পণ্ডিত ও সমাজসংস্কারক সাধুচেতা আচার্য্য শ্রীরামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা অতিশয় সারগর্ভ হইয়াছিল। তিনি বলেন, ভারতবর্ষের ত্রিশকোটি লোক পাঁচ হাজার ভিন্ন ভিন্ন "জাতি" (Caste) তে বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে কোন সামাজিক আদান প্রদান নাই। জাত্যভিমান বশতঃ প্রত্যেক "জাতি"ই নিজেকে বড় মনে করে। এই কারণে ইহাদের মধ্যে পরস্পর ঈর্ষ্যা-বিদ্বেষ লক্ষিত হয় এবং বাদবিতণ্ডাও খুব হইতে থাকে। এমন অবস্থার সকলে মিলিয়া মিশিয়া কাজ করা অসম্ভব। কোন জাতিতে বিবাহযোগ্যা কন্যার অভাব, কোথাও বা পাত্র পাওয়া যায় না। অনেক প্রদেশে ভিন্নবর্ণের পাত্রীকে প্রতারণা দ্বারা কোন কোন বর্ণে বিবাহ দেওয়া হয়। নিম্নশ্রেণীর লোকদের অবস্থা অত্যন্ত হীন। অনেক-স্থলেই তাহাদের শিক্ষার কোন উপায় বিদ্যমান নাই। তাহারা অস্পৃশ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। তাহারা হিন্দুধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া খৃষ্টান হইলে ভদ্রলোক বলিয়া পরিগণিত হয়। স্ত্রীজাতির অবস্থা অত্যন্ত হীন। তাহাদের শিক্ষা হয় না। তাহাদের কার্য্যক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ। এইরূপে সমগ্র ভারতবাসীদিগের অর্দ্ধেক শক্তি কোন কাজেই লাগে না। বাল্যবিবাহ প্রচলিত থাকায় জাতীয় অবনতি ঘটিতেছে। বালবিধবাগণের বিবাহ না দেওয়ায় তাহারা আজীবন দুঃখ পায় এবং অনেকস্থলে পাপে পতিত হয়। যে সমাজ এ সকল দেখিয়াও দেখে না, তাহার যে অনেকটা অধোগতি হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। সমুদ্র পার হইয়া বিদেশ গেলে আমাদের জাতি যায়। ইহাতে আমাদের জাতির উদ্যমশীলতা (Spirit of enterprise) বিকশিত হইবার কোন সুযোগ হইতেছে না। দেশের উন্নতি করিতে হইলে এই সকল সামাজিক কুপ্রথা ও সংস্কারের উচ্ছেদসাধন করা কর্ত্তব্য। অনেকে মনে করেন, সময়ে আপনাপনি সংস্কার সাধিত হইবে। কিন্তু সময় একটা শক্তি নয়। উহা ঘটনাসমূহের পৌর্ব্বা-পর্য্য ও পার্থক্য বুঝিবার ও বুঝাইবার একটা সঙ্কেত বা উপায় মাত্র। মানুষের উদ্দেশ্য ও অভিসন্ধি এবং তৎসিদ্ধির জন্য উপায় অবলম্বনের চেষ্টা, এই সকল হইতেই সেই শক্তি জন্মে, যদ্দারা সামাজিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয়। কেবল-মাত্র অবস্থাবশে যে সকল পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহা অনেক সময় অনিষ্টকর হয়। বক্তা এরূপ সামাজিক পরিবর্ত্তনের অনেকগুলি দৃষ্টান্তও দিয়াছেন। দৃষ্টান্ত দিয়া তিনি বলেন যে যথেচ্ছ সামাজিক পরিবর্ত্তন ঘটিতে দেওয়া উচিত নয়; আমাদের বুদ্ধি দ্বারা পরিবর্ত্তনের স্রোতকে সুপথে চালিত করা উচিত। সামাজিক সংস্কারের জন্য অস্মদ্দেশে যথেষ্ট চেষ্টা হয় না বলিয়া সভাপতি মহাশয় দুঃখ প্রকাশ করেন। বাস্তবিক একথা সত্য। যাঁহারা এককালে সমাজসংস্কার-কার্য্যে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন (যেমন ব্রাহ্মসমাজের লোকেরা), তাঁহারাও যেন উদাসীন ও নিষ্ক্রিয় হইয়া পড়িয়াছেন। সমগ্র ভারতবর্ষে কেবল বোম্বাই হইতে ইণ্ডিয়ান সোশ্যাল রিফর্ম্মার নামক একখানি ইংরাজী সমাজসংস্কারবিষয়ক সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত হয়। প্রত্যেক প্রদেশে ইংরাজী ও দেশভাষায় সমাজসংস্কার-বিষয়ক পুস্তক ও পত্রিকার বহুল প্রচার হওয়া উচিত। সমাজসংস্কার না হইলে প্রতিদিন একবার করিয়া কংগ্রেস বসাইলেও দেশের উন্নতি হইবে না। সমুদয় সামাজিক সংস্কারের মূলে স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীজাতির অবস্থার উন্নতি।

বিশ্ববিদ্যালয় কমিশনের রিপোর্ট আলোচনা করিবার সময় কোন কোন ইংরেজ সম্পাদক এইরূপ মত প্রকাশ করেন যে ভারতবাসীরা শিক্ষার আদর করে না, শিক্ষার যে আর্থিক মূল্য আছে, তাহারই মর্য্যাদা বুঝে; অর্থাৎ তাহারা স্কুল কালেজে পড়িতে যায় এই জন্য যে লেখা পড়া শিখিয়া অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিবে। মানসিক উৎকর্ষলাভের জন্য তাহারা শিক্ষা চায় না। ইংরাজ সম্পাদকগণের এই মন্তব্যে আমরা চটিয়া উঠিয়াছিলাম। কিন্তু কথাটা কি সর্ব্বৈব মিথ্যা? যদি আমরা শিক্ষার মূল্য বুঝি, তাহা হইলে ভারতনারীগণকে শিক্ষা দি না কেন? আমরা সুন্দর বসন ও সুন্দর অলঙ্কারের মূল্য বুঝি; সেগুলিকে সুশোভন মনে করি। সুতরাং তদ্দারা পত্নী, ভগিনী ও কন্যাদের দেহ সজ্জিত করি। যদি শিক্ষার মূল্য বুঝিতাম, তাহা হইলে পত্নী, ভগিনী ও কন্যাদের মানসিক শ্রীবৃদ্ধির চেষ্টা করিতাম না কি? অনেকে বলেন, পুরুষদের ও স্ত্রীদের শিক্ষা ভিন্ন ভিন্ন রকমের হওয়া চাই। আচ্ছা, তাহাই

মানিয়া লইলাম। কিন্তু যাঁহারা একথা বলেন, তাঁহারা আপনাদের মনের মত স্ত্রীশিক্ষার জন্তও ত কোন চেষ্টা করিতেছেন না।

আহমদাবাদে একেশ্বর বাদীদিগেরও এক আলোচনা-সমিতি বসিয়াছিল।

প্রবাসে বঙ্গসাহিত্য-চর্চ্চা।

দিল্লী।

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয়
সমীপেষু—

মহাশয়!

ভবৎসম্পাদিত বিগত অগ্রহায়ণ মাসের প্রবাসীপত্রে শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস মহাশয়ের লিখিত "প্রবাসে বঙ্গসাহিত্য-চর্চ্চা" শীর্ষক প্রবন্ধে লেখক মহাশয় একস্থানে লিখিয়াছেন যে "দিল্লীতে বহুকাল হইতে বাঙ্গালীর বাস হইলেও এখানে একটিও বাঙ্গালা পুস্তকালয় বা বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপিত হয় নাই। সম্প্রতি দিল্লীতে ডাক বিভাগের একটী বড় দপ্তর উঠিয়া যাওয়ায় প্রায় দুইশত নূতন বাঙ্গালী দিল্লীপ্রবাসী হইয়াছেন। এইসময়ে স্থানীয় বাঙ্গালী সমাজের শীর্ষস্থানীয় সুপ্রসিদ্ধ ডাক্তার শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন ইচ্ছা করিলে অনায়াসে বালকদিগের মাতৃভাষা শিক্ষার সুবিধা করিয়া দিতে পারেন"।

এ সম্বন্ধে আমরা যাহা জানি, তাহা যথাযথ আপনাকে জানাইতেছি। পরহিতব্রত, উদারচেতা শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সেন মহাশয় প্রবাসী বঙ্গবাসিগণের বঙ্গসাহিত্যচর্চ্চার পথ উন্মুক্ত করিবার জন্য আন্তরিক সহানুভূতির সহিত কায়মনোবাক্যে যত্ন করিয়াছিলেন। পরোপকারে অর্থসাহায্য করিতে তিনি সর্ব্বদাই মুক্তহস্ত; সুতরাং একটী বাঙ্গালা পুস্তকালয় সংস্থাপনের আনুকূল্যে তাঁহার পক্ষ হইতে তাদৃশ সাহায্য প্রাপ্তিরও বিশিষ্ট সম্ভাবনা ছিল। তাঁহারই সাধু দৃষ্টান্তে এবং উদার প্রস্তাবে অপর দুইজন সুযোগ্য বাঙ্গালী ডাক্তার বিনা ভিজিটে অদ্যাবধি বাঙ্গালীগণের চিকিৎসা করিয়া আসিতেছেন এবং তাঁহারই যত্নে বাঙ্গালী বালকগণের বিদ্যাশিক্ষার উপায়স্বরূপ একটী ইংরাজি বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়া কিছুকাল চলিয়াছিল। এইরূপ ক্ষুদ্র মহৎ সকল কার্য্যেই ডাক্তার মহাশয়ের সহৃদয় সহানুভূতি লক্ষিত হইয়া থাকে। কিন্তু সাধারণের হিতকর কোন কার্য্যই একজনের যত্নে সম্পাদিত হইতে পারে না। বিশেষতঃ, যাহারা প্রত্যক্ষভাবে কোন কার্য্যের ফলভোগ করিবে, তাহারা যদি সেইকার্য্যে ঔদাসীন্য প্রকাশ করিয়া নিশ্চেষ্টভাব অবলম্বন করে, তাহা হইলে তৎসাধনে বহু বিঘ্ন উপস্থিত হয়। আর একটী কথা এই যে "প্রয়োজনমনুদ্দিশ্য ন মন্দোঽপি প্রবর্ত্ততে"। তাই বুভুক্ষুব্যক্তি অন্নাদি আহার্য্য সংগ্রহে যত্নবান হয় এবং তৃষিতব্যক্তি পানীয়জলের জন্য চেষ্টাশীল হইয়া থাকে। যদি এখানকার প্রবাসী বাঙ্গালীগণ বঙ্গসাহিত্যরসপিপাসু হইতেন, তাহাহইলে বঙ্গসাহিত্যের আলোচনায় তাঁহাদের চেষ্টাযত্ন ও উদ্যম অধ্যবসায় পরিদৃষ্ট হইত। বঙ্গসাহিত্যচর্চ্চা তাঁহাদের নিকট প্রয়োজনীয় বলিয়া প্রতিভাত হয় না। অপ্রয়োজনে উদ্যোগ আয়োজনও নাই। এই হেতু হেমবাবুর ন্যায় মহৎ ব্যক্তির সর্ব্ববিধ নিঃস্বার্থ সাহায্য এবং সরলহৃদয়ের সহানুভূতি উপেক্ষিত হইয়াছে। এই উপেক্ষার ফল বিষময় হইলেও বুদ্ধিবৃত্তির অবসাদ হেতু কেহই তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতেছেন না। হেমবাবুর যত্ন ও সহানুভূতির সহিত দিল্লীপ্রবাসী বাঙ্গালীগণ আপনাদের হৃদ্গত তত্তদ্গুণ মিলিত করিয়া কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে উক্ত প্রবন্ধোল্লিখিত প্রস্তাব অচিরে কার্য্যে পরিণত হইতে পারে।

বশম্বদ

শ্রীসারদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়।

মুঙ্গের।

মুঙ্গের অতি পুরাতন সহর, ইতিহাস পাঠকমাত্রেই তাহা জ্ঞাত আছেন। তবে মুসলমান আমলে কোন বাঙ্গালী এখানে বাস করিতেন কিনা তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। এখানকার স্বাস্থ্য ভাল বলিয়া ইদানীং অনেক বঙ্গবাসী জলবায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য এখানে আসেন ও অনেকে স্থায়ী ভাবে বসবাস করিয়াছেন। এখন প্রায় ৩০০ বাঙ্গালি এখানে বাস করিতেছেন। গত বৎসর

জামালপুর হইতে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে কোম্পানির অডিট আফিস উঠিয়া যাওয়ায় প্রায় ৪০০ ঘর বাঙ্গালী এখান হইতে কলিকাতা ও তন্নিকটবর্ত্তী স্থানে স্থানান্তরিত হইয়াছেন। এখানকার ডেপুটী, সবজজ, মুনসেফ, উকিল, কলেজের অধ্যাপকগণ, ডাক্তার ও অন্যান্য কর্ম্মচারী প্রায় সকলেই বাঙ্গালী। প্রায় ৩০ বৎসর পূর্ব্বে এখানে একটী "বাঙ্গলা পুস্তকালয়" প্রতিষ্ঠিত হয়; তাহা কেবল বাঙ্গালীদের দ্বারাই ২০ বৎসর কাল বেশ চলিয়াছিল। পরে নানা কারণবশতঃ প্রায় ১০ বৎসর পূর্ব্বে উক্ত লাইব্রেরী উঠিয়া যায়। ১৯০০ সালের জুন মাসে শ্রীযুক্ত বাবু অখিলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সব ডেপুটী কলেক্টরের অদম্য উৎসাহে ও নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টায় ছোটলাট স্যারজন উড্‌বরণ সাহেবের আগমন উপলক্ষে তদীয় নামে "উডবরণ পাব্‌লিক লাইব্রেরী" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তখন ৩ শ্রেণীতে ৭৩ জন গ্রাহক ছিলেন। তাহাতে ৪০৷০ টাকা আয় ছিল। এখনও গ্রাহক সংখ্যা ৭৪ জন কিন্তু আয় ৪৬৷০ টাকা হইয়াছে। ব্যয়ও প্রায় তদ্রূপ। পুস্তকসংখ্যা প্রায় সহস্রাধিক হইবে। তাহার মধ্যে বাঙ্গলাভাষায় প্রায় ৫৫০ খানি কিন্তু ইহারমধ্যে ৪১৪ খানা "বাঙ্গলা পুস্তকালয়" হইতে পাওয়া যায়। ইহা ভিন্ন সমস্ত পুস্তকই ক্রীত হইয়াছে। ২।১ জন বাঙ্গালী ১০।১২ খানা পুস্তক উপহার দিয়াছেন মাত্র। তন্মধ্যে শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ এম্, এর নাম উল্লেখযোগ্য। এই লাইব্রেরীতে বাঙ্গলা হিতবাদী, প্রবাসী, প্রদীপ, ভারতী, সাহিত্য, পন্থা ও বঙ্গদর্শন লওয়া হয়।

লাইব্রেরীর অবস্থা ভাল বলা যায় না। ফণ্ডে টাকা নাই, পুস্তকের বড়ই অভাব, এবং লাইব্রেরীর নিজবাটী নির্ম্মাণের জন্য প্রতিষ্ঠাতা ও প্রথম সম্পাদক অখিলবাবু যে চেষ্টা করিতেছিলেন, তাঁহার এস্থান হইতে বদলি হওয়ায় সে বিষয়ে কোন উদ্যম দেখা যায় না। ইহার প্রধান কারণ বোধ হয় বেহারি ভদ্রলোকগণ কার্য্যতঃ যোগদান করেন না। যাঁহাদের নাম খাতায় দেখা যায়, তাঁহারাও নিশ্চেষ্ট। স্থায়ী বাঙ্গালীর সংখ্যা খুব কম। তাঁহারাও তত সাহিত্যানুরাগী বলিয়া বোধ হয় না। ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুত বসন্তকৃষ্ণ বসু ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের সময় লাইব্রেরীর অবস্থা মন্দ ছিল না। পণ্ডিত রমাবল্লভ মিশ্র এম্, এ ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট সেক্রেটারির ও শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সবজজ প্রেসিডেন্টের কার্য্যভার অতি অল্প দিন হইল হাতে লইয়াছেন। তাঁহাদের ন্যায় কৃতবিদ্য কর্ম্মঠব্যক্তির নিকটে সাধারণে অনেক আশা করে।

শ্রী দ্বিজেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী।

নাগপুর।

গত ১লা আগষ্টে ফ্রেণ্ডস্‌ইউনিয়ন ক্লব নামক একটি ক্লব স্থাপিত হইয়াছে। ইহা তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম বিভাগে পুস্তকালয় ও পাঠাগার ও দ্বিতীয় বিভাগে ব্যায়ামশালা আছে। তৃতীয় বিভাগ, সাধারণ বিভাগ, অর্থাৎ এই বিভাগে তাস, দাবা ইত্যাদি খেলা হয়; সুবিধামত কখন কখন ভাল ভাল গায়কেরা গান বাজনা করেন এবং কোন কোন উৎসব উপলক্ষে প্রীতিভোজন দেওয়া হয়।

১। পুস্তকালয়ে প্রায় ৭০০ শত পুস্তক আছে। তাহার মধ্যে ৩০০ শত ইংরাজী। সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থকারদিগের গ্রন্থাবলী প্রায় সম্পূর্ণ আছে। তাহা ছাড়া অন্যান্য গ্রন্থকারদিগের পুস্তক আছে। অশ্লীল বা যাহারদ্বারা সাধারণের অনিষ্ট হয়, এমন কোন পুস্তক পাঠাগারে নাই এবং রাখিবার নিয়মও নাই। ইহাতে কেবল উপন্যাস ও নাটক রাখা হইয়াছে, তাহা নহে; ধর্ম্মপুস্তক, ইতিহাস, জীবনী ইত্যাদিও আছে। বাঙ্গালা উপন্যাসগুলির, বিশেষতঃ বঙ্কিমবাবুর, রমেশবাবুর, রবিবাবুর, বাবু অমৃতলাল বসুর, চণ্ডীচরণ সেন মহাশয়ের ও শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী দেবীর পুস্তকগুলির, পাঠকসংখ্যা অনেক বেশী। বঙ্কিমবাবুর বইগুলির পাঠক সংখ্যা এত বেশী যে এক এক খানি পুস্তকের ৫।৬ খণ্ড রাখিলেও বোধ হয় অভাব পূর্ণ হইবে না। পাঠাগারে অনেকগুলি ইংরাজী কাগজ এবং নিম্নলিখিত বাঙ্গালা পত্রিকা রাখা হয়:—সঞ্জীবনী, হিতবাদী, সমালোচনী, প্রবাসী, প্রতিবাসী, মুকুল ইত্যাদি।

২। ব্যায়াম প্রাতে এবং বৈকালে সকলে আপনার সুবিধামত করেন। ইহার কোন নির্দ্দিষ্ট সময় নাই। শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় ইহার ভার গ্রহণ করিয়াছেন। সাণ্ডোর নিয়মানুসারে ব্যায়াম করান হয়। তাহা ছাড়া মুগুরভাঁজা ইত্যাদিও হয়।

৩। সাধারণ বিভাগ—এই বিভাগে ছুটীর দিন তাস, দাবা, ইত্যাদি খেলা হয়। ইহার যদিও কোন সময় নির্দ্দিষ্ট নাই কিন্তু প্রায় দুপর বেলা, যখন প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগ বন্ধ থাকে, সেই সময় ২।৩ ঘণ্টা খেলা ইত্যাদি হয়। যে দিন প্রীতিভোজন হয়, সেই দিন প্রথম ও দ্বিতীয় বিভাগ কার্য্যনির্ব্বাহক সভার মত লইয়া বন্ধ করা হয়।

শ্রীযুক্ত বাবু অটলচন্দ্র মজুমদার নিজভবনে "Poor Cottage Library" নামে একটী বাঙ্গালা পুস্তকালয় স্থাপিত করেন এবং শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ ও রজনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় উভয়ে মিলিয়া একটী ঘর ভাড়া করিয়া পাঠাগার এবং ব্যায়ামশালা গত জানুয়ারী মাসে স্থাপিত করেন। ১লা আগষ্টে এগুলি একত্র সম্মিলিত হইয়া ফ্রেণ্ডস্ ইউনিয়ন্ ক্লব্ নামে অভিহিত হইতেছে।

মরিস কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত বাবু সারদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এম এ, ইহার সভাপতি এবং শ্রীযুক্ত বাবু নরসিংহচন্দ্র মিত্র সহকারী সভাপতি। ইনি ভবানীপুরস্থ "Cottage Library"র স্থাপয়িতা। ইহাঁর চেষ্টায় উহা উন্নতিলাভ করে এবং তিনি নিজের প্রায় ৩০০ টাকার পুস্তক উহাতে উপহারস্বরূপ দেন। আশা করা যায় ইহাঁর চেষ্টায় এই ক্লবেরও উন্নতি হইবে। ইনি এবং শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় এই ক্লব্‌টীর স্থাপনের জন্ম বিশেষ উৎসাহ দেন। ইহাঁরা ক্লবের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী এবং যাহাতে ইহার উন্নতি এবং মঙ্গলসাধন হয়, তাহার জন্ম অতিশয় যত্নবান; তজ্জন্ম ইহাঁরা ধন্যবাদার্হ।

বাবু সুরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ, নগেন্দ্রনাথ সিংহ, নেপালচন্দ্র মজুমদার, আশুতোষ গুপ্ত এবং অটলচন্দ্র মজুমদার ইহার প্রধান পৃষ্ঠপোষক। ইহাঁদের বিশেষ যত্নে এই ক্লবটি প্রতিপালিত। বিশেষতঃ বর্ত্তমান সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু সুরেন্দ্রকৃষ্ণ ঘোষ এবং পুস্তকালয়াধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু নগেন্দ্রনাথ সিংহ নিজেদের স্বার্থ ত্যাগ করিয়া ইহার উন্নতির জন্ম প্রাণপণে খাটিতেছেন। ইহাঁদিগকে ধন্যবাদ না দিয়া থাকা যায় না।

ঈশ্বরের কৃপায় এবং ইহাঁদের যত্নে ও চেষ্টায় এই সভার একণে ৬০।৬৫ জন সভ্য আছেন ও যাহা চাঁদা আদায় হয় তাহাতে একরকম খরচ পোষাইয়া যায়। কিন্তু নূতন কাগজ বা পুস্তক আনাইবার জন্ম টাকার অকুলান হওয়াতে এককালীন দান সংগ্রহ করা হইতেছে এবং কিছু করা হইয়াছে। তাহাতেও অভাব পূর্ণ হয় নাই। বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিগণ কিছু কিছু সাহায্য করিলে তাহা সাদরে গৃহীত হইবে।

সেকালের ও একালের যাত্রা।

বাল্যকালে প্রাচীনলোকদিগের মুখে যাত্রাওয়ালা গোবিন্দ অধিকারীর অত্যন্ত প্রশংসা শুনিতাম। তাঁহার মানভঞ্জনের পালা শুনিয়া শ্রোতাগণ নাকি মোহিত হইয়া যাইতেন, সঙ্গীতরসে আত্মহারা হইয়া পড়িতেন, রাধাকৃষ্ণের মধুরভাবে ভক্তিরসে মত্ত হইয়া উঠিতেন। কিন্তু আমরা তখন বালক; শাক্তের ঘরে আমাদের জন্ম; আমরা রাধাকৃষ্ণেরও তোয়াক্কা রাখিতাম না, দীর্ঘকালব্যাপী সঙ্গীতও আমাদের মিষ্ট বোধ হইত না; কাজেই প্রাচীনলোকদিগের সঙ্গে আমাদের মতের ঐক্য হইত না।

তবে এখন এই যৌবন ও প্রৌঢ় বয়সের সন্ধিস্থলে দাঁড়াইয়া যখন গোবিন্দ অধিকারীর সঙ্গীতগুলি পাঠ করি, এবং দৈবাৎ কোন প্রাচীন গায়কের মুখে গানগুলি শ্রবণ করি, তখন বুঝিতে পারি, প্রাচীন যাত্রাওয়ালাদের অভিনয়ে নাট্যকলার সম্পূর্ণ অভাবই থাকুক, অথবা সেই দাড়িগোঁফ-কামান রাধিকা ও বৃন্দাদূতীর অনুনাসিক স্বরের বক্তৃতাগুলি অত্যন্ত পীড়াদায়কই হউক; কিন্তু তাহারা তাহাদের আন্তরিকতাপূর্ণ সরল ও সজীব সঙ্গীতগুলি যখন বিশ্বাস ও ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত হইয়া মধুরকণ্ঠে গান করিত, তখন শ্রোতাদিগের হৃদয়ে যে একটি বিমল আনন্দ ও নির্ম্মল ধর্ম্মভাব জাগিয়া উঠিত, বুঝিবা একালের জ্ঞানগর্ব্বিত ও আড়ম্বরস্ফীত থিয়েটারগুলিতেও তেমনটি আর হয় না।

ইহার পর বয়স যখন বৃদ্ধি হইল, একটু ভাল মন্দ বিচার করিবার ক্ষমতা জন্মিল, তখন সর্ব্বত্রই যাত্রাওয়ালাদিগের প্রতিপত্তি। পরিষ্কার মনে আছে, আমাদের জমিদার বাড়ীর দুর্গোৎসবে, রাসযাত্রায় এবং বিবাহাদি শুভকর্ম্মে কোনবার বউকুণ্ড, কোনবার লোকা ধোপা, কোনবার

ব্রজরায়, কোনবার মতিরায় যখন প্রকাণ্ড যাত্রার দলটি লইয়া আমাদের পল্লীগ্রামে আগমন করিতেন, তখন মনে হইত, সুরলোক হইতে স্বয়ং শচীপতি যেন তাঁহার পারিষদ-বর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়াছেন। এই সকল যাত্রাওয়ালার আগমনে আমাদের পল্লী-অঞ্চল বীচিবিক্ষোভিত সমুদ্রের ন্যায় চঞ্চল হইয়া উঠিত; ছয় সাত ক্রোশ দূর হইতে আত্মীয় কুটুম্বগণ আসিয়া গ্রামখানি পূর্ণ করিয়া তুলিত; গৃহে গৃহে যাত্রার আলোচনা সভা বসিয়া যাইত; ছেলেরা আহার নিদ্রা ভুলিয়া গিয়া, স্কুলে যাওয়া বন্ধ করিয়া, যখন তখন যাত্রাওয়ালাদের পশ্চাতে পশ্চাতে ঘুরিয়া বেড়াইত। কোন কোন চালাক ছেলে যাত্রাওয়ালাদের সঙ্গে ভাব করিয়া আপনাকে বাহাদুর মনে করিত; এবং অন্যলোকেরা যখন লোলুপ দৃষ্টিতে সাজঘরের দিকে চাহিয়া থাকিত, ভিতরে কি আশ্চর্য্য কাণ্ড হইতেছে, তাহা দেখিবার জন্য উঁকি ঝুঁকি মারিত, তখন সেইসব বাহাদুর ছেলেরা ঘণ্টার মধ্যে দশবার সাজঘরে প্রবেশ করিত এবং দশবার বাহিরে আসিত। ইহাতে যাহারা নেহাৎ পাড়াগেঁয়ে, তাহাদের তাজ্জব লাগিয়া যাইত। আমরা তখন কলিকাতায় যাই, সহরে লোকের সঙ্গে মিশি; চৌদ্দটা অক্ষর বসাইয়া যাইতে পারিলেই অমিত্রাক্ষর হইল মনে করিয়া অমিত্রাক্ষরে কবিতা রচনা করি; বৃদ্ধেরা যখন যাত্রার গানের প্রতি অনুরাগ এবং বক্তৃতার প্রতি বিরাগ প্রকাশ করেন, তখন বৃদ্ধদের অজ্ঞতা বুঝাইয়া দিতেও প্রয়াস পাই। সুতরাং আমরা ঐ সকল বাহাদুর ছেলের নির্লজ্জভাব দর্শন করিয়া বিলক্ষণ আমোদ উপভোগ করিতাম।

এই সময় যাত্রার বেশ উন্নতি হইয়াছিল। অনেক অর্দ্ধশিক্ষিত লোক যাত্রার দলে প্রবেশ করিয়াছিলেন। যাত্রাওয়ালাদের রুচি উন্নত হইয়াছিল। সাজসজ্জা উত্তম হইয়াছিল। অভিনয় সেই সময়ের তুলনায় উৎকৃষ্টই হইয়াছিল।

আমার বেশ মনে পড়ে, ব্রজরায় যখন আমাদের জমিদার বাড়ী জ্যোতিরিন্দ্র বাবুর "সরোজিনী নাটক" অভিনয় করিলেন; তখন বিজয়সিংহ ও সরোজিনীর অভিনয়ে শিক্ষিতব্যক্তিরাও মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিলেন।

একটি কুসুমকান্তি তরুণ বালক সরোজিনী সাজিয়া যখন তাহার স্বাভাবিক সুমিষ্টস্বরে অভিনয় করিত এবং থিয়েটারের অনুকরণে একাই সঙ্গীত ধরিত, তখন করুণায় শ্রোতাদিগের হৃদয় আর্দ্র হইয়া যাইত, বালকটিকে সত্য সত্যই অত্যাচারপীড়িতা সরলা সরোজিনী বলিয়া মনে হইত। এইরূপ মতিরায় যখন নিমাইসন্ন্যাস অভিনয় করিতেন, তৎকালে তাঁহার কীর্ত্তনাঙ্গের সঙ্গীতে শ্রোতামাত্রেরই নয়ন অশ্রুসিক্ত হইত, বৃদ্ধ বৈষ্ণবেরাত ভাবাবেগে কাঁদিয়া ফেলিতেন। কিন্তু তখন এইসকল যাত্রার যে কোন দোষ ত্রুটি ছিল না, তাহা নহে।

প্রথমতঃ, এই সকল যাত্রার অধিকারীরা পালা তৈরি করিবার সময় দৃষ্টি রাখিতেন একমাত্র প্রাচীনদিগের প্রতি। কাজেই তাঁহাদের রচনার মধ্যে অনাবশ্যক অস্বাভাবিক অসম্ভব এমন অসংখ্য বিষয় থাকিয়া যাইত, যাহা নব্যরুচিসম্পন্ন শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের নিকট কেবল বিরক্তিকর নহে, অত্যন্ত পীড়াদায়ক বলিয়া মনে হইত।

দ্বিতীয়তঃ, এই সকল যাত্রার দলে বালকেরা যখন স্বাভাবিক মিষ্টস্বরে বালিকা এবং তরুণীদের পাঠ অভিনয় করিত, তখন বেশ মিষ্ট শুনাইত; কিন্তু একজন চল্লিশ বৎসরের প্রৌঢ় যখন গোঁফ কামাইয়া সাড়ী পরিয়া কুন্তী অথবা শচীমাতা সাজিয়া বিকৃতস্বরে কান্না ধুড়িয়া দিত, তখন সে কান্নার চেয়ে গর্দ্দভের স্বরও উত্তম মনে হইত। কারণ গর্দ্দভের স্বরের আর যে কোনই দোষ থাকুক, তাহা যে স্বাভাবিক, তাহা গর্দ্দভের অতিবড় শত্রুকেও স্বীকার করিতে হইবে।

তৃতীয়তঃ, একমিনিট পূর্ব্বে যিনি রাধিকা সাজিয়া আপনার বিরহবেদনায় শ্রোতাদিগের হৃদয় আকৃষ্ট করিতে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, যেই ছেলেরা গান ধরিল, অমনি তিনিই আবার আসরে বসিয়া হুঁকা টানিতে টানিতে সমবয়স্কদিগের সঙ্গে খুব একচোট হাস্য কৌতুক করিয়া লইলেন। তারপরেই পাশের একটি লোকের হস্ত হইতে একটা বাদ্যযন্ত্র লইয়া খুব কতকক্ষণ মাথা নাড়িতে আরম্ভ করিলেন। আবার গানটি থামিয়া যাইবামাত্র হুস্ করিয়া উঠিয়া পড়িয়া কৃষ্ণবিরহে বিলাপ করিতে লাগিলেন। এ সকল সৌন্দর্য্যগ্রাহী শ্রোতাদিগের পক্ষে অত্যন্ত রসভঙ্গোৎপাদক।

আমরা যে সময়ের কথা বর্ণনা করিতেছি, ইহার পর জীবনের মহাপরিবর্তন হইল। প্রকৃতির মনোরম শোভা ও আত্মীয়স্বজনের সুমিষ্ট প্রীতি পরিপূর্ণ পবিত্র পল্লীজীবনের পরিবর্ত্তে সহরের স্নেহশূন্য ও সংগ্রামপূর্ণ কঠোর কার্য্যময় জীবনের আরম্ভ হইল। নৈতিক আদর্শ বিষয়ে মতের পরিবর্ত্তন বশতঃ যাত্রার প্রতি অনুরাগ হ্রাস হইল। তৎপর বঙ্গভূমির নিকট হইতে অতি নির্দ্দয়ভাবে নির্ব্বাসিত হইতে হইল। এই সমস্ত কারণে বহুকালের মধ্যেও কোনপ্রকার উৎকৃষ্ট যাত্রাগান শ্রবণ করা আমাদের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে নাই। কিন্তু এই অক্টোবর মাসে হঠাৎ একদিন শুনিতে পাইলাম, আমাদের এই সর্ব্বপ্রকার আনন্দবর্জ্জিত সহরটিতেও কলিকাতার বড় এক যাত্রাওয়ালার আগমন হইয়াছে; একজন বাঙ্গালী উকিলের বাটীতে রাত্রি সাতটার সময় যাত্রাভিনয় হইবে। এই "যাত্রা" কথাটার সঙ্গে পল্লীজীবনের সুমধুর স্মৃতি এমন সুন্দরভাবে জড়িত ছিল যে আজ কতকাল পরে আবার সেই বৃক্ষলতাসুশোভিত নৃত্যগীতে মুখরিত শৈশবের স্বর্ণপল্লীর একটি অস্ফুটচিত্র হৃদয়ে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। আমি আকুল এবং উৎসুক চিত্তে সাতটার পূর্ব্বেই যাত্রা শুনিতে চলিলাম। কিন্তু ফিরিবার সময় বড় নিরাশ হইয়া ফিরিতে হইল।

ইহার কিছুদিন পরেই কলিকাতা হইতে আবার আর একটি যাত্রার দল আসিল। কৌতূহলবশতঃ পুনর্ব্বার যাত্রা শুনিতে গমন করিলাম। কিন্তু দেখিলাম, এ দলের চেয়ে বরং পূর্ব্বের দলটিই অনেক বিষয়ে প্রশংসা পাইবার যোগ্য। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত যাত্রার দলটিকেই লক্ষ্য করিয়া কিঞ্চিৎ সমালোচনা করি।

আমি ভাবিয়াছিলাম, এই পনের বৎসরে আমাদের পল্লীখানির যেমন অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তেমনি বুঝি যাত্রাওয়ালাদেরও অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কিন্তু কি দেখিলাম? দেখিলাম পরিবর্ত্তন হইয়াছে সত্য; তবে, সে পরিবর্ত্তনের গতি অবনতির দিকে। আগেকার যাত্রার সেই কুপ্রথাগুলি অবিকল রহিয়া গিয়াছে, অথচ অনেক উৎকৃষ্ট নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে।

পনের বৎসর পূর্ব্বেও যাত্রাওয়ালারা আসরে আসিয়া কতক্ষণ যন্ত্র লইয়া টুং টাং ভুং ভাং করিয়া শ্রোতাদিগকে বিরক্ত করিয়া তুলিত; গলার সুর থাকুক আর না থাকুক কিন্তু পাঁচ সাতজনে মিলিয়া একটা গানে ঘণ্টাখানেক রাগিণী ভাঁজিয়া শ্রোতাদিগের সহিষ্ণুতার অগ্নিপরীক্ষা করিত;—এখনও সে সনাতন নিয়ম পূর্ণভাবেই বর্ত্তমান আছে। তবে পূর্ব্বে যুদ্ধের সময় যখন দুইবীরে বাক্‌যুদ্ধ হইত, তখনই অমিত্রাক্ষর ছন্দে বীরদর্প চলিত; কিন্তু এবার দেখিলাম অমিত্রাক্ষরের শ্রাদ্ধ অনেকদূর গড়াইয়াছে। এটা বোধ হয় থিয়েটারের অনুকরণ।

কিন্তু অনুকরণ করিলে হইবে কি? দ্বিতীয় দৃশ্যে যখন একটি বালক কৃষ্ণ সাজিয়া চেয়ারে আসিয়া উপবিষ্ট হইল, তখন তাহার কালোচেহারায় এবং করুণ মুখে বেশ মানাইয়াছিল; পরে যখন ম্যালেরিয়াগ্রস্ত কৃষ্ণকায় বালক আপনার পুরুষ প্রকৃতির উপর নিতান্ত জুলুম করিয়া রুক্মিণী সাজিয়া আসরে আসিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে চেয়ারখানির উপর বসিয়া পড়িল, শ্রোতাদিগের হরিভক্তি তখনই অনেকটা কমিয়া আসিল। তৎপর সেই দুই অশিক্ষিত বালকের মুখ হইতে অমিত্রাক্ষরে যখন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের তত্ত্বকথা বাহির হইতে লাগিল, তখন বোধ হয় মনে মনে অনেকেই বলিয়া উঠিয়াছিলেন, হায় অমিত্রাক্ষর, হায় তত্ত্বকথা, আজ তোমাদের এই বালকদের হাতে পড়িয়া কি হাস্যাস্পদই হইতে হইল!

সে অমিত্রাক্ষরের কোথায় যে কমা, কোথায় দাঁড়ি, কোথায় যে আরম্ভ, কোথায় যে শেষ, কিছুই বুঝিতে পারা গেল না। কেবল বিকৃতস্বরে কতকগুলি শব্দের উচ্চারণ শুনিয়াই লজ্জায় মুখ নত করিতে হইল। বিশুদ্ধ গদ্য থাকিতে এই সব যাত্রাওয়ালারা কেন যে অমিত্রাক্ষর লইয়া এরূপ ছেলেখেলা করে, বুঝা যায় না। আমরা একথাও জানি, বাঙ্গালাদেশের অনেক সখের থিয়েটারেও এইরূপ অমিত্রাক্ষরের শ্রাদ্ধ গড়াইয়া থাকে। আমরা শুনিয়াছি কলিকাতার রঙ্গালয় সমূহের অভিনেতাদিগের অমিত্রাক্ষর-অভিনয়ও নাকি তেমন হৃদয়গ্রাহী নয়। এ কথা সত্য কি মিথ্যা ঠিক্ বলিতে পারি না। আমরা এইমাত্র বলিতে পারি, সৌন্দর্য্যগ্রাহী এবং সুকবি রবীন্দ্রনাথের অমিত্রাক্ষর উচ্চারণ অতি পরিষ্কার। একবার পার্কষ্ট্রীটে মাননীয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বাটীতে

রবীন্দ্রবাবু তাঁহাদের পরিবারস্থ যুবকদিগকে লইয়া বিসর্জ্জন অভিনয় করিয়াছিলেন। অভিনয়স্থলে আগরতলার মহারাজা, মাননীয় গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাননীয় চন্দ্রমাধব ঘোষ, মাননীয় রমেশচন্দ্র দত্ত, বাবু উমেশচন্দ্র দত্ত এবং সঞ্জীবনীর সম্পাদক প্রভৃতি অনেক শ্রদ্ধেয় ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। সৌভাগ্যক্রমে আমরাও সেই অভিনয়স্থলে উপস্থিত ছিলাম। সেদিন রবীন্দ্রবাবু রঘুপতি সাজিয়া এমন চমৎকার অভিনয় করিয়াছিলেন, যে সঞ্জীবনী-সম্পাদক মহাশয় একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখিয়া তাহার প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন; এবং আমাদের সম্মুখেই কোন কোন মাননীয় শ্রোতা বলিতেছিলেন, রবীন্দ্রবাবুর মত এমন স্বাভাবিক অবিকৃতস্বরে স্পষ্টরূপে অমিত্রাক্ষর উচ্চারণ করিতে আর কখনও শুনি নাই। রবীন্দ্রবাবুর সম্বন্ধে এত কথা বলিবার তাৎপর্য্য এই যে যাঁহারা অমিত্রাক্ষরে অভিনয় করিতে চাহেন, তাঁহারা যদি তাঁহাকে আদর্শ করিয়া চলেন, তাহা হইলে নাট্যাভিনয়ের অনেক উন্নতি হইতে পারে।

যাহা হউক, এই অমিত্রাক্ষরের পরে কৃষ্ণ যখন গদ্য বলিতে আরম্ভ করিল, তখনও তাহার স্বর একটু বিকৃত, কিন্তু বড় মিষ্ট। তবে অস্বাভাবিক তত্ত্বকথার হস্ত হইতে কিছুতেই নিস্তার নাই।

ইহারপর যদিও দীর্ঘ বক্তৃতায় এবং অমিত্রাক্ষরের উৎপীড়নে উৎপীড়িত হইতে হইত, তথাপি বালকেরা যখনই তাহাদের মধুরকণ্ঠে কীর্ত্তনের সুরে গান ধরিত, তখন ধীরে ধীরে প্রাণে একটি ঈশ্বরপ্রীতি সঞ্চারিত হইত, কিয়ৎকালের জন্য মনটাকে এই সংসার হইতে অনেক উর্দ্ধে লইয়া যাইত।

সুতরাং আজি কালিকার যাত্রায় যে প্রশংসার বিষয় কিছুই নাই, তাহা নহে। কিন্তু বড়ই আক্ষেপের বিষয়, যে, পনের বৎসর পূর্ব্বের তুলনায় যাত্রাওয়ালারা কিছুই উন্নতি করিতে পারে নাই, এবং ব্রজরায় মতিরায় প্রভৃতি প্রসিদ্ধ যাত্রাওয়ালাদিগের তুলনায় অত্যন্ত অবনতি ঘটিয়াছে।

এই অবনতির এক প্রধান কারণ কলিকাতার রঙ্গালয়সমূহ। শুনিতে পাই—রমণীয় চিত্রপটে, সুরম্য সাজসজ্জায় ও সুমধুর সঙ্গীতে এবং সর্ব্বোপরি অভিনেত্রীদিগের আকর্ষণে ঐ সকল রঙ্গালয় শিক্ষিত বাঙ্গালীর অতিশয় আদরের সামগ্রী হইয়া উঠিয়াছে। এমন কি, এখন মফস্বলেও নাকি যাত্রার আর তেমন আদর নাই। কেবল ক্রিয়াকর্ম্ম উপস্থিত হইলে তাঁহারা থিয়েটার কোম্পানিদিগকেই সাদরে আহ্বান করেন। কাজেই অনাদরে উপেক্ষায় যাত্রাওয়ালারা নিরাশ ও ভগ্নোদ্যম হইয়া পড়িয়াছে, দেশবিখ্যাত যাত্রার দলগুলির জীবনপ্রদীপ নির্ব্বাণ হইয়া গিয়াছে। তবে এখনও নাকি প্রাচীন রুচিসম্পন্ন সাত্ত্বিক ব্যক্তিদিগের দোকান পাট একেবারে বন্ধ হয় নাই, থিয়েটারের কুহকেও তাঁহাদের চিত্ত আকৃষ্ট হয় নাই; তাই কেবলমাত্র সেই গুটিকয়েক প্রাচীন ব্যক্তি ও অশিক্ষিত লোকদিগের জন্য অদ্যাপি কয়েকটি যাত্রার দল অতিশয় নির্জ্জীবভাবে জীবিত আছে। সুতরাং এই সকল দীনভাবাপন্ন যাত্রাওয়ালাদিগের নিকট নাট্যকলা ও কাব্যসৌন্দর্য্যের অথবা আধুনিকরুচিসঙ্গত সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয়ের প্রত্যাশা করিতে পারি না। অথচ তাহা না হইলেও আমাদের মন কিছুতেই তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না।

এইজন্য মনে হয় শিক্ষিত ব্যক্তিরা পাশ্চাত্য কুহকে আচ্ছন্ন না হইয়া যদি জাতীয়ভাবে অনুরক্ত হন, এবং আধুনিক রঙ্গালয়ের রঙ্গাভিনয়ের পরিবর্ত্তে প্রাচীন যাত্রার উন্নতিকল্পে যত্নপি কিঞ্চিৎ চেষ্টা করেন, তাহা হইলে দেশের যথেষ্ট উপকার হয়। কারণ, সহরে ও পল্লীগ্রামে যাত্রাভিনয় সঙ্গীত, সাহিত্য ও ধর্ম্মপ্রচারের একটি অতি উৎকৃষ্ট উপায়। যদি কোন ধর্ম্মপ্রাণ লেখক এক একটি উৎকৃষ্ট চরিত্র অবলম্বন করিয়া সুমধুর এবং সুপ্রচুর সঙ্গীত সম্বলিত কয়েকটা যাত্রার পালা প্রস্তুত করেন; আর রঙ্গালয়ের শিক্ষিত অভিনেতাগণ কলঙ্কিনীদিগের কুসঙ্গ বর্জ্জনপূর্ব্বক ঐ সকল পালা দক্ষতার সহিত অভিনয় করিতে পারেন, তাহা হইলে প্রাচীনকালের কথকদিগের ন্যায় একটি সুপবিত্র সাহিত্যরসে ও সুনির্ম্মল ঈশ্বরভক্তিতে স্বদেশবাসীদিগকে প্রীত ও পরিতৃপ্ত করিতে পারেন।

শ্রীঅমৃতলাল গুপ্ত।
বাঁকিপুর।

দিল্লী দরবার।

সকলের মুখেই এক কথা, "দিল্লীতে কি দেখিলে?" উত্তর কিন্তু এক কথায় হয় না। যদি সকলে জিজ্ঞাসা করিত, "দিল্লীতে কি খাইলে?" তাহা হইলে না হয় এককথায় বলিতাম, "দিল্লীর লাড্ডু।" কারণ সে 'লাড্ডু' প্রসিদ্ধ; খাইলেও আপশোস, না খাইলেও আপশোস। সেইরূপ এই কর্জ্জনতামাসা না দেখিলে মনে ক্ষোভ থাকিত যে এত বড় কাণ্ডটা দেখা হইল না। দেখিয়া কিন্তু তৃপ্তি হইল না।

দিল্লীতে দেখিবার অনেক রকম জিনিস ছিল। প্রথমতঃ জনতা। সমগ্র ভারতবর্ষের লোক এই তামাসা দেখিতে আসিয়াছিল, বিদেশীয় লোকও অনেক ছিল। এত রকমের লোক আর কখনও বোধ হয় একত্র হয় নাই। কাজেই ভাবুক লোকের পক্ষে এই বিরাট লোকসমাগমই একটা মস্ত দেখিবার জিনিস ছিল। নানাবর্ণের মনুষ্য, নানারূপ পরিচ্ছদে আবৃত, তাহাদের ভাষা নানারূপ, তাহাদের মনোভাব কি বিচিত্র! এই জনতার কিছু আভাস রেলগাড়ীতে উঠিয়াই পাওয়া গেল। গাড়ীতে স্থান পাওয়া কঠিন ছিল, যাহাকে জিজ্ঞাসা কর সেই দিল্লী চলিয়াছে। কয়দিবস ত, 'ফার্ষ্ট ক্লাস্' আরোহিগণ কষ্টে 'থার্ড্ ক্লাসে' স্থান পাইয়াছিলেন। এক এক খানা ফার্ষ্ট-ক্লাস্ গাড়ীতে ১৮।২০ জন করিয়া লোক গিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে আমরা 'কন্‌সেশন্ টিকিট্' ফুরাইয়া যাবার পর গিয়াছিলাম; তাই ফার্ষ্ট ক্লাসে শুইবার স্থান পাইয়াছিলাম। ভিড়ের আর একটি ফল হইয়াছিল এই যে, কোন গাড়ী ঠিক্‌সময়ে দিল্লী পঁহুছায় নাই। আমরা যে গাড়ীতে গিয়াছিলাম তাহার দিল্লী পঁহুছাবার কথা সকাল ৫টার সময়; উহা পঁহুছিল বেলা ১২টায়!

রেলগাড়ীর কথা বলিতে গিয়া ঘোড়ার গাড়ীর কথা মনে পড়িল। কত রকমের ঘোড়ার গাড়ীই দিল্লীতে দেখা গেল! চতুর্দ্দিকে এই কথা রাষ্ট্র হইয়া যায় যে দিল্লীতে অশ্বশকটের অনাটন, ১০০।১৫০ টাকার কমে দিন হিসাবে গাড়ী পাওয়া অসম্ভব। এই জনরব প্রচার হওয়ায় কিন্তু একটা উপকার হইল; দূর দূর সহর হইতে গাড়ীওয়ালারা লাভের আশায় দিল্লীতে ছুটিল। যত রকমের যান ভারতবর্ষে চলিত আছে; প্রায় সব রকমই দিল্লীতে দেখা গেল। 'মোটর কার' হইতে আরম্ভ করিয়া হাতীর গাড়ী, উটের গাড়ী, গরুর রথ, মানুষ টানা রিক্‌শ, কিছুরই অভাব নাই। গাড়ীওয়ালাদের বিশেষ লাভ হউক না হউক, গাড়ী-আরোহীদের সুবিধা হইয়াছিল। আমরা শুনিয়া গিয়াছিলাম যে ১৫০৲ রোজে গাড়ী পাওয়া কঠিন হইবে; আমরা দিল্লী পহুঁছিয়া দেখিলাম যে ১০।১৫৲ রোজে গাড়ী যথেষ্ট পাওয়া যায়। আমরা কিন্তু সেখানে বেশী গাড়ী চড়ি নাই; দিল্লীতে ঘুরিয়া বেড়াইবার জন্য যাওয়া, আমরা ঘুরিতাম অনেক।

তবে দিল্লীর পথে বেড়ান বড় আরামের কারণ ছিল না। দিল্লী সহরে প্রধান প্রধান রাস্তায় জল দেওয়া হইত। সাহেবদের যেখানে তাম্বু পড়িয়াছিল, সেখানে ত জল ঢালিয়া পথে কাদা করিয়া দেওয়া হইত, কিন্তু দিল্লীর ধুলি প্রসিদ্ধ; তাহা কি সহজে যায়! এক একটা পথে ত এমন ধুলা ছিল যে সে পথে ঘুরিতে যাইলে কাল কাপড় সাদা করিয়া বাড়ী ফিরিতে হইত। বিশেষ করিয়া বলিতে গেলে রাজপুতানা ক্যাম্প্ যাইবার পথের ধুলি উল্লেখ-যোগ্য। পথের কিন্তু দোষ দিতে পারি না। একেই ত দিল্লীতে ধুলা বেশী, তার পর ক্যাম্পের রাস্তাগুলি নূতন, ভালরূপ কাঁকর বা রাবিশ্ দেওয়া হয় নাই, আর সেই রাস্তায় ক্রমাগত দিবারাত্রি অসংখ্য গাড়ী, ঘোড়া ও মানুষ চলিতেছে। রাস্তার দোষ কি?

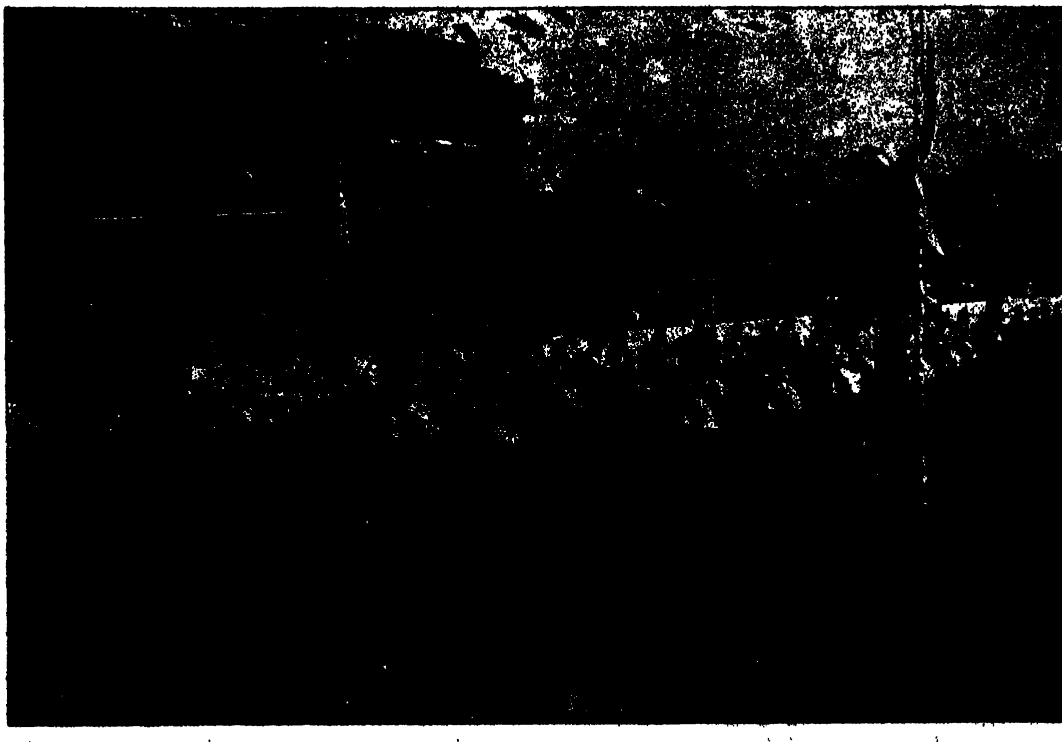
ক্যাম্প্‌গুলির বিষয় এখানে কিছু বলা আবশ্যক। দিল্লীতে চতুর্দ্দিকে এত তাম্বু পড়িয়াছিল যে অনেকে দিল্লীকে এই সময় 'city of tents' অর্থাৎ তাম্বুর সহর বলিতেন। এই বস্ত্রনগরীর মধ্যে দেশী রাজা ও মহারাজাদের তাম্বু সকল দেখিবার সামগ্রী ছিল বটে। আমার এই সকল তাম্বু দেখিতে যাইতে বড় ভাল লাগিত; আমাদের দেশের রাজন্যবর্গ এস্থানে সমবেত ছিলেন, তাঁহাদের দেখিতে, তাঁহাদের ক্রিয়াকলাপ দেখিতে কোন ভারত-সন্তানের ইচ্ছা না হয়? একটা অসুবিধা ছিল; তাম্বুগুলি দিল্লী সহর হইতে অনেক দূরে অবস্থিত ছিল, এবং সব একস্থলে ছিল না। দিল্লী সহরে যাহারা ছিল, তাহারা



২০।২৫ বাইলের চক্র দিলেও একদিনে সকল রাজার ক্যাম্প্ বা পটবাস দেখিয়া উঠিতে পারিত না। এই ক্যাম্প্ সকলের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বরোদা ও কাশ্মীর মহারাজদ্বয়ের ক্যাম্প্। এই ক্যাম্প্ দুইটির মত সুন্দর দৃশ্য এ সমারোহের সময়ও দিল্লীতে বিরল ছিল। বরোদা-মহারাজ গায়কবাড়ের জন্য একটি কাঠের বাড়ী তৈয়ার হইয়াছিল; সেটি দেখিতে একটি ছবির মত। একটি কাঠের সিংহদ্বার, তাহার ভিতর দিয়া ক্যাম্পে প্রবেশ করিতে হয়; সেটি দেখিলে সেকালের মোগল বাদশাহ-দের নির্ম্মিত বড় বড় কটক মনে পড়ে। এই ক্যাম্পের একপার্শ্বে স্বর্ণের এবং রৌপ্যের তোপ দুইটি রাখা ছিল; তাহা দেখিতে প্রত্যহ সেখানে বিস্তর লোকের সমাগম হইত। বরোদাক্যাম্পে কোনরূপ বিলাতী জিনিস ছিল না, সব আসবাব দেশী; অনেক সুন্দর আসবাব শুনা গেল সব বরোদায় তৈয়ার হইয়াছে। বরোদার মহারাজ যে সত্যই দেশহিতৈষী, শুদ্ধ বক্তৃতা করিয়া তুষ্ট নহেন, নিজের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া লোককে শিক্ষা দিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছেন, একথা তাঁহার ক্যাম্পে একবার বেড়াইলে বেশ উপলব্ধি হইত। ধন্য গায়কবাড়! তুমিই যথার্থ শিক্ষিত নরপতি। এ পতিত দেশের যদি কখনও উন্নতি হয়, সে তোমার মত লোক দ্বারাই সাধিত হইবে।

কাশ্মীর ক্যাম্পের সজ্জাও চমৎকার ছিল। সে ক্যাম্পে অবারিতদ্বার, সকলেই মহারাজের বৈঠক পর্য্যন্ত বেড়াইয়া আসিতে পাইতেছিল। সে বৈঠকের অপূর্ব্ব শোভা; সমস্ত শাল ও কার্পেটের কারখানা! সকল পঞ্জাব রাজগণের ক্যাম্পই বড় মনোরম ছিল। এই উৎসবের সময় এই ক্যাম্প্গুলিই দিল্লীতে দেখিবার জিনিস ছিল। দেশীয় রাজাদের ক্যাম্পে বিদ্যুতের আলো জ্বলিত, রাত্রে দৃশ্য বড়ই চিত্তগ্রাহী হইত।

এইবার কর্জ্জনতামাসার বিষয় দুটা কথা বলি। এই



রাজপুত্র সৈন্যদল।

তামাসা দেখিতেই ত আমাদের যাওয়া; তাহার বিষয় কিছু না বলিলে চলিবে কি করিয়া? দেশীলোকের পক্ষে এই তামাসার প্রধান অঙ্গ পাঁচটি ছিল।

(১) নগরপ্রবেশ,

(২) শিল্পপ্রদর্শনী,
(৩) দরবার,
(৪) আতসবাজী,
(৫) সৈন্যপ্রদর্শনী।

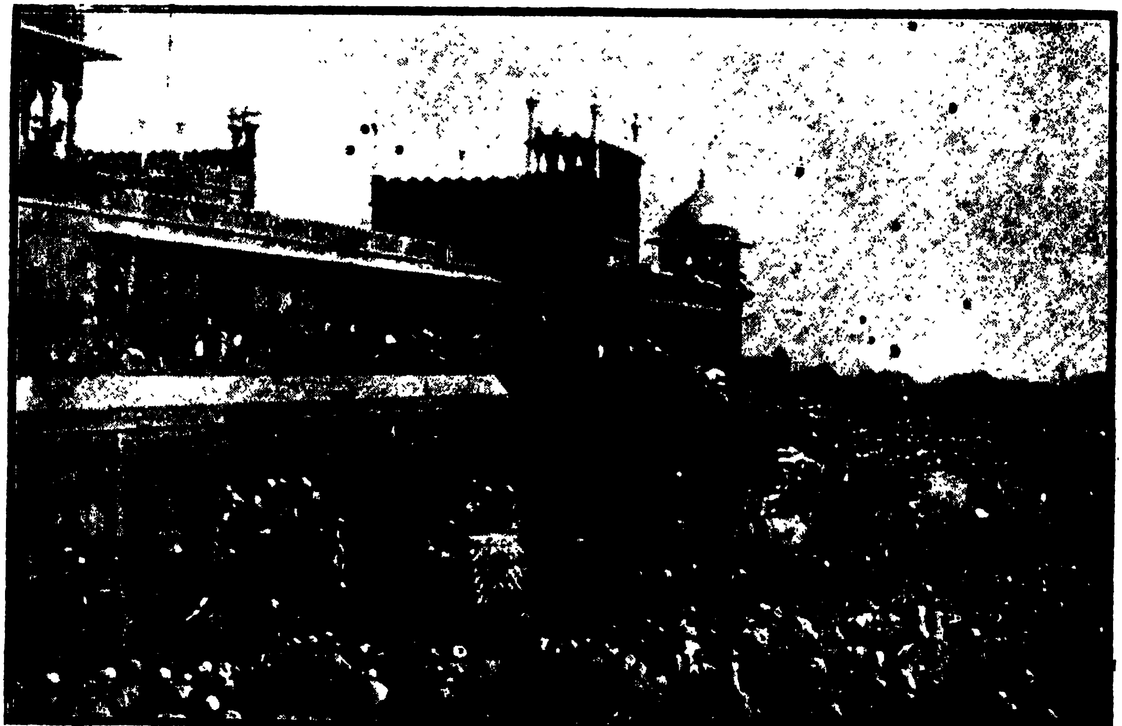
সাহেবদের যে সকল নাচ ও খানা হইয়াছিল, তাহাতে 'নেটিভ'রা বড় স্থান পায় নাই, কাজেই তাহার আলোচনা করিতে আমি অক্ষম। সৈন্যপ্রদর্শনী বা Review আমার দেখা হয় নাই, সেইজন্য তাহার বিষয়েও আমার কিছু বক্তব্য নাই। এই বিরাট তামাসার কোন অঙ্গেরই বর্ণনা লিপিবদ্ধ করা আমার অভিপ্রেত নয়। তাহার কারণ এই সকল ব্যাপারের এত বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে যে পাঠকবর্গ সে সকল পড়িয়া নিশ্চয়ই এতদিন বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছেন। তাহার পর আর এক কথা, এইসকল ব্যাপারের যেরূপ সপ্তমেচড়া বিবরণ সম্বাদপত্রে বাহির হইয়াছে, সেরূপ লেখা আমার অসাধ্য। দেখিতে পাই অনেকেই লিখিয়াছেন যে এরকম কাণ্ড পূর্ব্বে কখনও হয় নাই, ভবিষ্যতে কখনও হবে না,—'চমৎকার!' 'চমৎকার!' এই ধ্বনিই ত চারিদিকে উঠিয়াছে। দুঃখের বিষয় আমি তেমন অসাধারণ কিছুই দেখিলাম না। আমার artistic sense এর বা সৌন্দর্য্যানুভব শক্তির দোষ নিশ্চয়ই হইবে। সে যাহাহউক, আমি যাহা দেখিলাম ও যাহা ভাবিলাম তাহার বিষয়ই দুই চারিটা কথা বলি।

পাঠকপাঠিকারা সকলেই শুনিয়াছেন নগরপ্রবেশের দিন কি হইয়াছিল। দিল্লী ষ্টেশনে লর্ড্ কর্জ্জন্ আসিলে তাঁহাকে সেখানে মহাসমারোহে অভ্যর্থনা করা হয়। দেশী রাজারা সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা পরে এক একটি হাতীতে উঠেন। লর্ড্ ও লেডি কর্জ্জন্ একটি হাতীতে উঠেন, রাজভ্রাতা এবং ভ্রাতৃজায়া আর একটি হাতীতে আরোহণ করেন। তাহারপর হাতীর মিছিল বাহির হয়। অবশ্য দেশী বিদেশী ফৌজও ষ্টেশনের নিকট সমবেত হইয়াছিল, এবং এই হাতীর মিছিলের পূর্ব্বে ও পশ্চাতে তাহারা গিয়াছিল। তবে এই নগরপ্রবেশের প্রধান অঙ্গই ছিল এই হাতীর মিছিল। জাঁক



নগরপ্রবেশ। জুম্মা মসজিদের নিকট হইতে গৃহীত ফটোগ্রাফ।

জমকের কোনরূপ ত্রুটি ছিল না। স্বর্ণ ও রৌপ্য খচিত হাওদায় বসিয়া সারি ২ রাজা মহারাজাগণ সহরের মধ্য দিয়া লাটসাহেবের অনুসরণ করিলেন। হাতীর সাজই বা কেমন! এক একটা সাজের লক্ষটাকা বা তাহার অধিক মূল্যও হইতে পারে। সেই ছেলেবেলায় পড়া গিয়াছিল "the wealth of Ormuz or of Ind;" এই হাতীর মিছিল দেখিয়া (আর পরে দরবার দেখিয়া) সে কথাটা খানিকটা উপলব্ধি করিতে পারিলাম। কিন্তু জিনিসটা হ'ল কি? আমার এই হাতীর মিছিল দেখিয়া Barnum's Show বা 'সার্কস' মনে পড়িল। যেমন 'সার্কসে' নানারূপ জন্তু প্রদর্শিত হয় এবং তাহারা শিক্ষকের ইঙ্গিতে নানারূপ খেলা দেখায়, সেইরূপ আমাদের দেশের সামন্ত নরপতিগণকে সং সাজাইয়া লর্ড কর্জ্জন এই তামাসায় প্রদর্শিত করিলেন! ভারতীয় রাজন্যবর্গের অবস্থা বড়ই হীন; তাঁহারা সরকারি হুকুম অন্যথা করিবেন কি করিয়া? হইবে, স্বর্ণসিংহাসনে বসিলেই বা কি হইবে? হে ভারতের সামন্ত নৃপাল, তুমি আজ লর্ড কর্জ্জনের হাতে পুত্তলিকা মাত্র, তোমাকে তিনি নাচাইতেছেন, তুমি নাচিতেছ! এই লাঞ্ছনার হস্ত হইতে দুইজন মহারাজ রক্ষা পাইয়াছিলেন, উদয়পুর ও বরোদা। উদয়পুরের মহারাণা প্রতাপসিংহের বংশধরের এ মহোৎসবে যোগ দিবার কিছুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। কি করিয়াই বা হইবে? উদয়পুরের মহারাণা কখনও মোগলসম্রাটের নিকটও নতশির হন নাই। লর্ড কর্জ্জন কিন্তু আয়োজন পাকা করিয়াছিলেন, মহারাণার নামে খাস তলব জারি হইয়াছিল। মহারাণাকে দরবার উপলক্ষে আসিতে হইয়াছিল, কিন্তু তিনি পুত্রের অসুখ বলিয়া নগরপ্রবেশে যোগ দেন নাই, এবং নিজের শরীর অসুস্থ থাকায় দরবারে যান নাই। দরবারের দুইদিন পরে তিনি দিল্লী পরিত্যাগ করেন। মহারাজ গায়কবাড় অশৌচের কারণ হাতীর মিছিলে বাহির হন নাই।

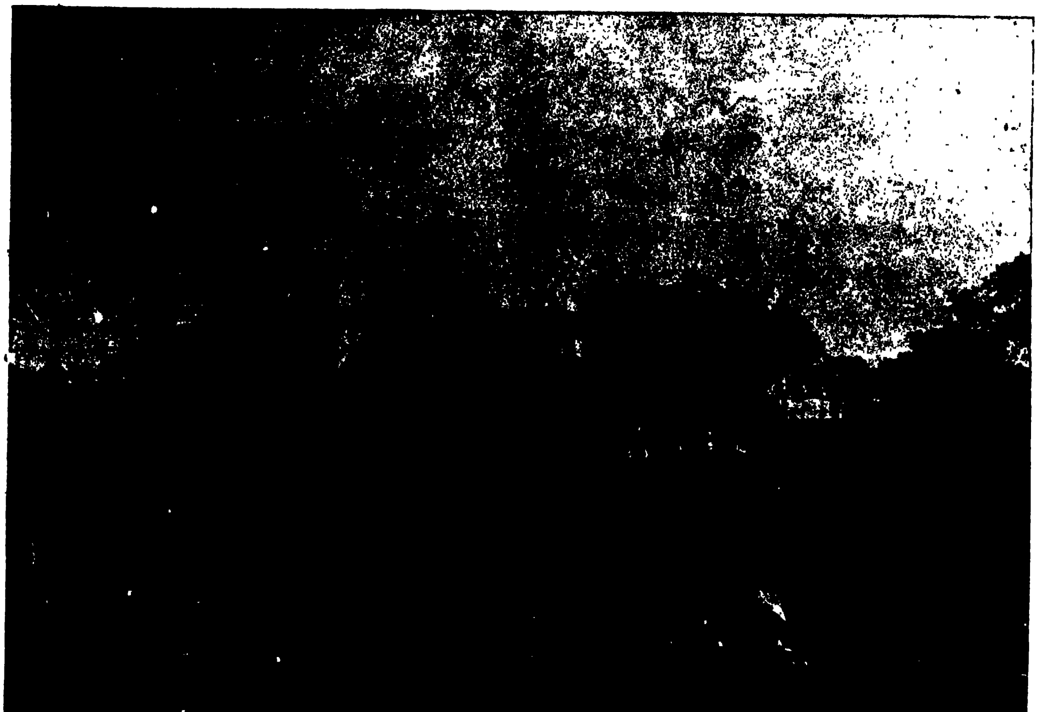


নগরপ্রবেশকালে জুম্মা মসজিদের দৃশ্য

সমগ্র জগৎ সম্মুখে আজ তাঁহারা নিজেদের হীনতা প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলেন। হীরকখচিত মুকুট পরিলে কি লর্ড কিচেনারকে নগরপ্রবেশের দিন ভাল করিয়া চেনা যায় নাই। তিনি আফ্রিকায় যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছেন;

লর্ড কর্জ্জনের তাঁহাকে ঘোড়ায় না চড়াইয়া উটে চড়ান উচিত ছিল।

শিল্পপ্রদর্শনী অবশ্য দেখিবার জিনিস হইয়াছিল। লাট বাহাদুর যে তামাসার আয়োজন করিয়াছিলেন, তাহার



দিল্লী শিল্পপ্রদর্শনী-গৃহ।

মধ্যে শিল্পপ্রদর্শনী অগ্রগণ্য। যথার্থই সুন্দর ২ দ্রব্য এই প্রদর্শনীতে প্রকটিত হইয়াছে। অতি উৎকৃষ্ট শিল্পকার্য্য সকল দেখা গেল, যাহা দেখিলে মনে প্রভূত আনন্দ হয়, স্পর্দ্ধা হয় যে আমাদের দেশ এখনও একেবারে অধঃপতিত হয় নাই, এখনও সেখানে এরূপ শিল্পী আছে যে তাহাদের নৈপুণ্য দেখিয়া সভ্য পাশ্চাত্য জগৎও চমৎকৃত হয়, বিদেশীয় কারিকর নিরাশ হয়। শিল্পপ্রদর্শনীর বাড়ীটিও বেশ মনোরম হইয়াছে, এবং এইস্থানে লর্ড কর্জ্জনের বক্তৃতাও শুনিবার উপযুক্ত হইয়াছিল। রাজপ্রতিনিধি তাঁহার ওজস্বী ভাষায় অনেক করিয়া আমাদের দেশের বড়লোকদের বুঝাইলেন যে ভারতবর্ষের অতুলনীয় শিল্পকার্য্য উৎসাহ অভাবে দিন দিন লোপ পাইতেছে, তাঁহারা যদি মাতৃভূমির মঙ্গল চাহেন তাহা হইলে তাঁহাদের দেশীয় কারিকরকে উৎসাহিত করা নিতান্ত আবশ্যক, বিলাতী আসবাব তাম্রতীয় কারুকার্য্য অপেক্ষা অনেক অংশে নিকৃষ্ট, সে সকল জিনিস তাঁহাদের ক্রয় করা উচিত নহে। আশা করা যাউক যে লাটসাহেবের কথা আমাদের রাজামহারাজারা অগ্রাহ্য করিবেন না। এই শিল্পপ্রদর্শনী দেখিতে যাইয়া দেশীলোক লাঞ্ছিত হইয়াছেন যথেষ্ট। প্রথমদিন এক রাজা সি. এস্. আই. উপাধিধারী Mutiny Veteran একটি চৌকিতে বসিয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি তথাহইতে এক ফৌজিসাহেব কর্ত্তৃক অপমানের সহিত তাড়িত হন। আর একদিন শুনিতে পাওয়া যায় যে একজন যুক্তপ্রদেশের মহারাজ ওক্স্ কোম্পানির লোকেদের দ্বারায় তাড়িত হইয়াছিলেন। ওক্স্ কোম্পানি প্রদর্শনী গৃহমধ্যে একটি 'হোটেল্' খুলিয়াছেন। 'নেটিভ' সাহেবেরমধ্যে প্রভেদ সর্ব্বত্রই ছিল, তবে যেন বোধ হইত এই শিল্পপ্রদর্শনীতে কিছু বেশী। শ্বেতাঙ্গসমাগম হইলে প্রদর্শনীতে 'কালা আদমি' প্রায় ঢুকিতে পাইত না; অনেক ভদ্রসন্তান পয়সা দিয়া ধাক্কা খাইয়া আসিয়াছেন শুনিলাম।

প্রদর্শনীর একটি সচিত্র guide-book প্রস্তুত হইয়াছে, কিন্তু সেটি 'নেটিভকে' বিক্রয় করা হয় না। তাহার পর আর এক কথা, এই শিল্পপ্রদর্শনীতে দেশের কতটা উপকার সাধিত হইবে? বড়লাট বলিলেন, যাহাদের ধন নাই তাহাদের জন্য তিনি এই প্রদর্শনীর অনুষ্ঠান করেন নাই। অবশ্য বড়লোক কবে গরীবের দিকে চাহিয়া থাকে? আর এই দিল্লীর দরবারে, যেখানে লর্ড কর্জ্জন দেশের ধনের একবারে শ্রাদ্ধ করিতে বসিয়াছিলেন, সেখানে ত গরীবের জন্য কোনই স্থান নাই, তাহার সেখানে আসাই ভুল। কিন্তু দেশ যে গরীব, চতুর্দ্দিকে দারিদ্র্য হাহাকার করিতেছে, তাহাকে পায়ে ঠেলিলে কি করিয়া চলিবে? আমাদের কয়জন লোকের কাশ্মীরি শালের বা মর্ম্মরের পুতুলের আবশ্যক? যে জিনিস না হইলে চলে না, তাহা ভারতবর্ষে করাইবার চেষ্টা কোথায়? ঘরে আলো জ্বালিব দিয়াসেলাইটি পর্য্যন্ত বিদেশ হইতে তৈয়ার হইয়া আসিবে; রৌদ্রে বাহির হইব, ছাতাটি পর্য্যন্ত বিদেশ হইতে প্রস্তুত হইয়া আসিবে; পায়ে জুতা পরিব, তাহার ফিতাটি পর্য্যন্ত বিদেশ হইতে আসিবে; ইহা বড় দুঃখের, বড় লজ্জার বিষয়! কাল যদি জাপান বা নরওয়ে হইতে দিয়াসেলাই আসা বন্ধ হইয়া যায়, তাহাহইলে বোধ হয় আমাদের বাড়ীতে আলো জ্বালা হয় না! শুধু সুকুমার শিল্পের প্রদর্শনী করিয়া, সুকুমার শিল্পের উন্নতি করিয়া কি হইবে? যে জিনিস সুন্দর, তাহার আমি কোনরূপ অনাদর করিতে চাহি না, সৌন্দর্য্যপরিদর্শনে, সৌন্দর্য্যচিন্তায় মানসিক ও নৈতিক মহাউপকার হয়। কিন্তু সুন্দরের জন্য আবশ্যকীয় দ্রব্য ত ত্যাগ করা যাইতে পারে না। আবশ্যকীয় জিনিসটি না হইলে যে কাহারও চলে না, সুন্দর দ্রব্য না হইলেও ত অনেকের চলিয়া যায়।

দরবারের কথা আর কি বলিব? ইহাও একটা হাতীর মিছিলের মত আড়ম্বরপূর্ণ অন্তঃসারশূন্য ব্যাপার হইয়াছিল। অধিকের মধ্যে কতকগুলি দেশী রাণীও এই দরবারে পরদার ভিতর উপস্থিত ছিলেন; ভূপালের বেগম ত 'বুর্‌খা' পরিয়া সকলের সমক্ষে বাহিরে বসিয়াছিলেন। সম্রাটের পক্ষ হইতে যে ঘোষণাপত্র পঠিত হইয়াছিল, তাহা মহারাণী ভিক্টোরিয়ার বিখ্যাত ঘোষণার তুলনায় নীরস; রাজপ্রতিনিধির যে বক্তৃতা হইয়াছিল, সে ত একবারে ফাঁকা। লর্ড কর্জ্জনের বলিবার ক্ষমতা অসাধারণ, কাজেই বাক্যবিন্যাসে ও ভাবভঙ্গিতে তাঁহার বক্তৃতা সহজে হার মানে না। কিন্তু এই দরবারের বক্তৃতাটি ভাল করিয়া স্থিরবুদ্ধিতে পড়িয়া দেখ, বুঝিতে পারিবে কেবল শব্দের ঝঙ্কার, ভিতরে কিছুই নাই। ইংলণ্ডের গৌরব, ইংরাজের গৌরব, নিজের গৌরব, ইহাই কেবল রাজপ্রতিনিধি গাহিয়াছেন; এ গৌরব বাড়াইবার জন্য ভারতবাসীর রাজভক্তির যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন; পড়িলে সেই শেক্সপীয়রের কথা মনে পড়ে, "Methinks the lady protesteth too much." কিন্তু সমস্ত বক্তৃতার ভিতর একটা নূতন কথা নাই, একটা প্রজার হিতের কথা নাই, একটা দয়াদাক্ষিণ্যের কথা নাই। এই প্লেগপীড়িত দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট দেশের মঙ্গল বা উন্নতির জন্য কোনরূপ বিশিষ্ট চেষ্টা করিতে লাটবাহাদুর প্রতিশ্রুত হন নাই, কোনরূপ বাঁধাবাঁধি অঙ্গীকার করেন নাই। কেবল বলিয়াছেন কি—ভারি বদান্যতার কথা!—যে যে সকল রাজারা দুর্ভিক্ষের সময় সরকারের নিকট ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের এই মহোৎসব উপলক্ষে তিন বৎসরের সুদ মাপ করা হইল! যথার্থই ইংরাজেরা a nation of shopkeepers! লর্ড কর্জ্জনের বক্তৃতা ফাঁকা আওয়াজ বটে, কিন্তু দরবারও কি একটা ফাঁকা তামাসা মাত্র? লর্ড কর্জ্জন বার বার লোককে বলিয়াছেন, তাহা নহে। সিমলায় বক্তৃতাকালে তিনি বলিয়াছিলেন দরবারের political significance immense, এই মহান্ রাজনৈতিক অর্থ সিদ্ধ করিবার জন্য কোন অর্থব্যয়ই অত্যধিক হইতে পারে না। এই অর্থটি কি, অবশ্য তিনি পরিষ্কার করিয়া কোথাও বলেন নাই, কিন্তু যাহারা দরবার দেখিয়াছে, তাহাদের উহা আর বুঝিতে বাকী নাই। লর্ড লিটন্ কেন প্রথম দিল্লী দরবার করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার জীবনচরিত প্রকাশ হইবার পর আর প্রচ্ছন্ন নাই। পূর্ব্বে ইংরাজদিগের সহিত সামন্ত নৃপতিগণের যে সকল সন্ধি লিপিবদ্ধ হইয়াছে সে সকল অনুসারে এই নৃপতিসমুদয় ইংরাজের অধীন নহেন, তাঁহারা allies বা মিত্র। অবশ্য কোন ভারতীয় নৃপতির এখন এরূপ সামর্থ্য নাই যে ইংলণ্ডের

সহিত তিনি বিরোধ করেন, কিন্তু তিনি সন্ধি অনুসারে অনেকটা স্বাধীন। এই সকল সন্ধি এখন ইংলণ্ডেশ্বর হঠাৎ বদলাইতে পারেন না, অথচ Imperialist দলের বিশেষ ইচ্ছা যে ইংলণ্ড ভারতকে সর্ব্বগ্রাস করেন। এই উদ্দেশ্যে লর্ড লিটন প্রস্তাব করেন যে ইংলণ্ডেশ্বরী 'ভারতবর্ষের সম্রাজ্ঞী' উপাধি গ্রহণ করুন, এবং এই নূতন উপাধি দেশময় ঘোষিত করিবার জন্য ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লীতে দরবার হয়। লর্ড লিটনের উদ্দেশ্য সফল হয়, 'সম্রাজ্ঞী' অর্থে এদেশের লোক সেই পুরাকালের দিল্লীর বাদসাহের মত একজন-সব রাজা মহারাজার উপর কর্ত্রী বা অধিপত্নী বুঝিল। ভারতীয় নৃপতিবৃন্দও তাহাই বুঝিলেন, সেই ভাবেই মহারাণীকে পূজিলেন, সন্ধিঅনুসারে নিজেরা তাঁহার করদরাজগণ অপেক্ষা কতদূর উচ্চে অবস্থিত, তাহা ভাবিলেন না। পাঠকেরা কিন্তু বোধ হয় বুঝিয়াছেন যে দিল্লীদরবারের গূঢ়অর্থ বড় সামান্য নহে। কিন্তু শুদ্ধ সামন্ত নরপতিগণকে লাঞ্ছিত ও প্রতারিত করিবার জন্য হয় নাই। লর্ড কর্জ্জন্ দেশ বিদেশের লোককে এই দরবারে নিমন্ত্রিত করিয়াছিলেন, ভারতীয় রাজাদিগকে হুকুম পাঠাইয়াছিলেন যে তাঁহারা যেন সমস্ত অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া আসেন, বিশেষ আয়োজন করিয়াছিলেন যে এই মহোৎসবে যেন কোনরূপ জাঁকের বা আড়ম্বরের ত্রুটী না হয়। ইহার অর্থ ত আমার বোধ হয় আর কিছুই নয়, কেবল বিদেশীয় লোককে, সমগ্র জগৎকে জানান যে ইংলণ্ডের ভারতরাজ্যে সমৃদ্ধির কিছুমাত্র অভাব নাই, দেশ আনন্দময়, সেখানে টাকার ছড়াছড়ি। কংগ্রেসের বক্তারা প্রায়ই বলেন, লেখেন, যে ভারতবর্ষ দারিদ্রের আবাসভূমি, ভারতবাসীর অভাব দিনদিন অসহনীয় হইয়া উঠিতেছে। লর্ড কর্জ্জন সকলকে ডাকিয়া দেখাইয়া দিলেন যে একথা মিথ্যা, প্রমাণ দেখ হাতীর মিছিল আর দরবার। যে দেশে এক একটা হাতীর গায়ে ৩।৪



মিছিলে দেশীয় রাজগণের হস্তিযূথ।

কাজেই সম্রাট এড্ওয়ার্ডের রাজ্যাভিষেক হইয়া যাইবার পরেও দিল্লীতে দরবার করা যে লর্ড কর্জ্জন আবশ্যক মনে করিবেন, সেটা আর বিচিত্র কি? এ দিল্লীদরবার লক্ষ টাকার সাজ, এক একটা রাজার গলায় ২০।৩০ লক্ষ টাকার হার, সে দেশকে গরীব বল কি করিয়া? ধন্য লর্ড কর্জ্জন! ধন্য তোমার চাতুরি!



আতসবাজিতে রাজা ও রাণী।

আতসবাজির বিষয় আমার বেশী কিছু বলিবার নাই। আতসবাজি অতি সুন্দর হইয়াছিল, এরূপ প্রায় ভারতবর্ষে দেখা যায় না। কিন্তু যে টাকাটা এই বাজি পোড়ানয় খরচ হইয়াছে তাহা ভাবিতে গেলে শরীর শিহরিয়া উঠে। এরকম কোন বাজি পোড়ান হয় নাই যাহা খরচ করিলে ভারতবর্ষে না হইতে পারে, আর সে খরচ কতই বা ? লর্ড কর্জন ভারতীয় শিল্প বিষয়ে সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন কিন্তু ভারতীয় বাজিকরদিগকে উৎসাহ দেওয়া কিছুই আবশ্যক মনে করেন নাই। দেখিলাম কোন কোন বাঙ্গলাকাগজের সম্বাদদাতা সম্রাট সম্রাজ্ঞী প্রভৃতির আগ্নেয় চেহারা দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া গিয়াছেন। কিন্তু ব্রক্ সাহেব সে রাত্রে যাহা দেখাইয়াছিলেন তাহা অপেক্ষা সুন্দর তাজমহল ও এতমদ্দৌলার আগ্নেয় প্রতিকৃতি আমি আগ্রায় দেখিয়াছি। তবে আমাদের দেশের বাজিকরেরা অত দাম পায় না, তত ভাল বারুদ ও মসলা ব্যবহার করিতে পারে না, সেইজন্য তাহাদের বাজিতে একটু বেশী ধূঁয়া হয়, জিনিসটা তত পরিষ্কার হয় না। সে যাহা হউক, লর্ড কর্জনের অনুজ্ঞায় এবং বিলাতী বাজিকরের চেষ্টায় সে রাত্রে দিল্লীতে নিরন্ন দরিদ্র ভারতবর্ষের সহস্র সহস্র মুদ্রা এক ঘণ্টার মধ্যে ধূমে পরিণত হইয়া বায়ুতে মিলাইয়া গেল !

যাউক, আর কর্জনতামাসার আলোচনা করিব না, ভাল কথা ত কিছু বলিতে পারিতেছি না। এইসকল ক্ষণিক চিত্তাকর্ষণের জিনিস দেখিয়া বিরক্ত হইয়া আমরা একদিন চিরন্তন চিত্তাকর্ষণের জিনিস কুতুবমিনার, হুমায়ুনবাদশাহের কবর প্রভৃতি দেখিতে গিয়াছিলাম। সেই পুরাতন দিল্লীর ঐতিহাসিক ভগ্নাবশেষ সকল দেখিয়া আর লর্ড কর্জনের আধুনিক লম্ফঝম্ফ ভাবিয়া Solomon এর কথা মনে পড়িতে লাগিল যে "All is vanity and vexation of spirit here below." এই আজ লর্ড কর্জন রাজাদিগকে হাতী চড়াইয়া নিজের পিছনে পিছনে ছুটাইতেছেন, রাজপুত্রদিগকে নিজের ভৃত্য করিয়া সঙ্গে লইয়া ঘুরিতেছেন, কালের স্রোতে এ সব কোথায় চলিয়া যাইবে! এই দিল্লীসহরে কত কি ঘটিল, আবার কত কি ঘটিবে। ভাব সেই কুরুপাণ্ডবের কথা, পৃথ্বীরাজের কথা, মুসলমান বাদশাহদের কথা, আবার সিপাহীবিদ্রোহের কথা, তার পর ইংরাজি দরবারের কথা ! কিন্তু এখানে বলি যে Imperial cadet-corps রাজপুত্র সিপাহিদল দেখিবার জিনিস বটে।

আমরা যাইবার সময় যা ভিড় দেখিয়াছিলাম, ফিরিবার সময় ততোধিক দেখিলাম। প্রথমে ত ষ্টেশনে প্রবেশ করা মুস্কিল, দ্বিতীয় গাড়ীতে যায়গা পাওয়া দায়। আমাদের পার্সেল বাবুর সহিত আলাপ ছিল, পার্সেল আফিস দিয়া আমরা ঢুকিয়া পড়িলাম। বড় ফটক দিয়া ঢুকিতে গেলে সাহেবকে (military police) কিছু দেওয়া আবশ্যক। আমাদের গাড়ীতে একজন আসিলেন। তিনি

বলিলেন যে সাহেবকে তিনি একবোতল মদ দিয়াছেন, আর একজন বলিলেন ১০৲ ঘুষ দিয়াছেন। আমরা দিল্লী হইতে একখানা ফার্ষ্টক্লাস গাড়ীতে ১৭জন রওনা হইলাম। সৌভাগ্যক্রমে টুণ্ডলায় আসিয়া গাড়ী অনেকটা খালি হইয়া গেল, আমরা ৬জন রহিলাম।

সব লিখিয়া এখন ভাবিতেছি যে 'দিল্লীতে কি দেখিলে?' এ প্রশ্নের বোধ হয় এক কথায় উত্তর দেওয়া যায়। সে উত্তর, "ভারতবাসীর লাঞ্ছনা।"

শ্রীসতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

দিল্লিদরবার।

সম্রাট দীর্ঘজীবী হউন। নানাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া, ইংলণ্ডে তাঁহার অভিষেক অনুষ্ঠান সম্পন্ন হইয়াছিল। ভারতবর্ষেও সেই অভিষেক ঘোষণার দরবার মহাসমারোহে সম্পাদিত হইয়াছে। প্রাচীন ভারতে মগধাতিপতিগণ রাজাধিরাজ হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু কদাপি ভারতের সমগ্ররাজন্যবর্গ তাঁহাদের চরণবন্দনা করেন নাই। "দিল্লিশ্বরোঽবা জগদীশ্বরোঽবা" কথা, যে পাতসাহদিগের গৌরবে উচ্চারিত হইত, কখনও সমগ্র ভারত তাঁহাদের করায়ত্ত হয় নাই। গত দিল্লিদরবারে সম্রাটের প্রতিনিধি যে প্রকার "অশেষনরপতিশিরঃসমভ্যর্চিতশাসনঃ" রূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এমনটি আর কখনও হয় নাই। বহুদিন হইতেই ভারতের রাজমুকুট ভাঙ্গিয়া, ইংলণ্ডেশ্বরের চরণপাদুকা নির্ম্মিত হইয়াছিল, কিন্তু এবার তাঁহার পদতলে সীমান্তোত্তরবাসিগণের সশেখর মস্তক বিলুণ্ঠিত। লর্ড কর্জ্জন সত্যই বলিয়াছেন, যে এমন দরবার আর কখনও হয় নাই।

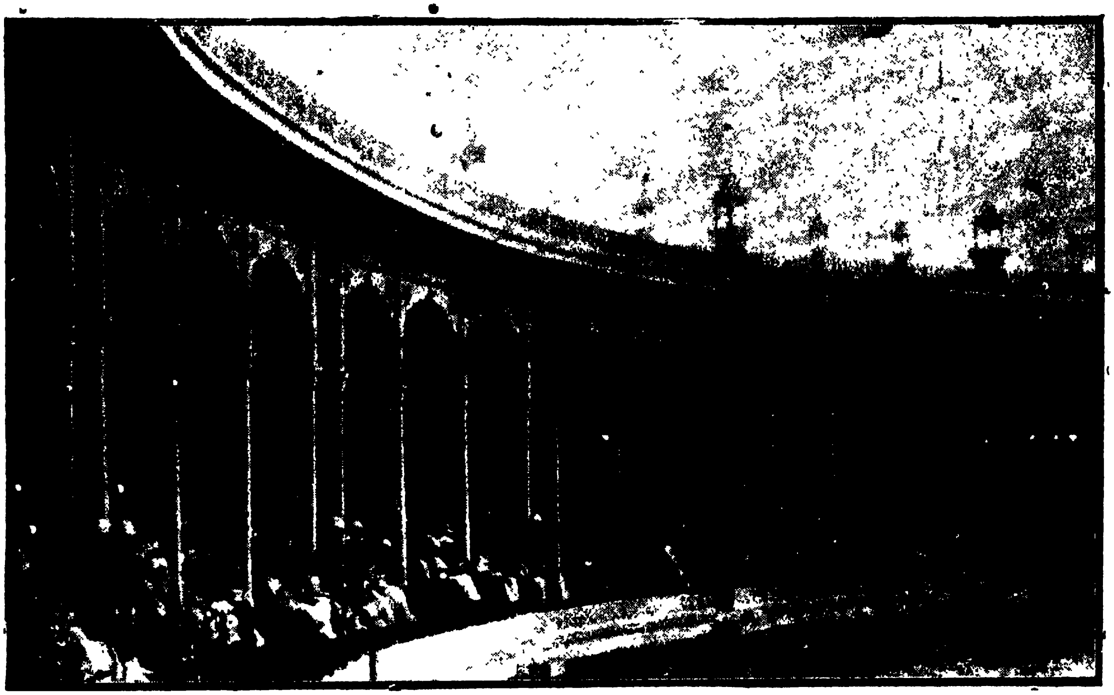
বৃটিষভারতের রাজধানী কলিকাতা। কিন্তু একদিন দিল্লির অদূরবর্ত্তীভূমে হিন্দুরাজার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল —একদিন হয়ত সেখানে কত রাজসূয়যজ্ঞের পূর্ণাহুতি পড়িয়াছিল; একদিন সাজাহানাবাদের দেওয়ানিখাসে, কত রাজামহারাজা আসিয়া কুর্নিশ করিতেন। সেইজন্যই ইংরাজ সম্রাট সেই প্রাচীনক্ষেত্রে উৎসব এবং দরবার করিলেন। যেস্থানে অমঙ্গল বা অশান্তি প্রভৃতি জাত হয়, হিন্দুগণ সেইস্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান; কদাপি ঘুঘুচরাভিটায় আসিয়া মাঙ্গলিক অনুষ্ঠান করেন না। কিন্তু ইংরাজ হিন্দুরমত কুসংস্কারগ্রস্ত নহেন; তাই যে ক্ষেত্রে হিন্দু মুসলমানের সমাধি হইয়াছিল, সেই অতীত গৌরবের শ্মশানক্ষেত্রে, তান্ত্রিকেরমত সাহসপূর্ব্বক, উৎসবক্রিয়া সম্পন্ন করিলেন। ইংরাজ বুঝাইয়া দিলেন, যে হিন্দুমুসলমানের ধ্বংস হইয়াছে বটে, কিন্তু চঞ্চলাদেবীর কৃপা ইংলণ্ডের প্রতি অচলা। এইকথা উচ্চারণ করিয়াই যেন বৃটনের জয়ভেরী, পৃথ্বীরাজ এবং হুমায়ুনাদির নির্জ্জন সমাধিস্থান স্তম্ভিত করিয়া, গম্ভীরনাদে বাজিয়াছিল।

ঐতিহাসিক কারণ যাহাই হউক, দিল্লিতে দরবার না হইলে সমবেত লোকের বাসস্থানের উপযুক্ত ব্যবস্থা হওয়া সুসাধ্য হইত না। দিল্লির চারিদিকে যেমন সুবিস্তীর্ণ প্রান্তর আছে, এমন আর কোথাও দেখিতে পাওয়া যায় না। দিল্লি হইতে থানেশ্বর পর্য্যন্ত যতদূর চলিয়া যাও, দেখিবে, কেবল শূন্যপ্রান্তর ধূ ধূ করিতেছে। কুরুক্ষেত্র, কর্ণাল, পাণিপথ প্রভৃতি সকল যুদ্ধক্ষেত্রই এই প্রান্তরে। এই প্রান্তরেই ভারতের সকল শৌর্য্যবীর্য্যের অভিনয় এবং বিলয়। এই প্রান্তরেই জ্ঞানময়ী শুভ্রতোয়া সরস্বতী অন্তর্হিতা; এবং এই প্রান্তরেই ইষ্টকচূর্ণতলে সৌভাগ্যলক্ষ্মী চিরপ্রোথিতা। দিল্লির দক্ষিণ ও পশ্চিমভাগে যেভাবে নূতন শিবিরনগরী নির্ম্মিত হইয়াছিল, অনেক সংবাদপত্রেই তাহার বিশেষ বিবরণ মুদ্রিত হইয়াছে। অল্প কয়েকদিনের উৎসবের জন্য, প্রভূত অর্থ ব্যয় করিয়া, যে প্রকারে ধনিগণ আবাসস্থান সুসজ্জিত করিয়াছিলেন, সে বিবরণও প্রকাশিত হইয়াছে। ধনিগণের সমাগমে, এবং তাঁহাদের অকাতর অর্থব্যয় দেখিয়া বিশেষ শিক্ষালাভ করিয়াছি। পূর্ব্বে প্রতিবৎসরের দুর্ভিক্ষে অসংখ্যলোকের মৃত্যু দেখিয়া ভাবিতাম, ভারতবর্ষ বুঝি বড় দরিদ্র। কিন্তু লর্ড কর্জ্জনের কৃপায়, এই ধনিগণের ব্যবহার দেখিয়া, সে ভ্রান্তবিশ্বাস চলিয়া গিয়াছে। বুঝিলাম, যাহারা না খাইয়া মরে, তাহারা কেবল বুদ্ধির দোষেই মরে। যাঁহারা মনে করেন, যে দিল্লিতে খরচ না হইলে এই টাকায় দুর্ভিক্ষপীড়িতেরা সাহায্য পাইত, তাঁহারা প্রকৃতপক্ষেই ভ্রান্ত। একটা উপলক্ষ্য ছিল বলিয়াই খরচ হইল; নহিলে কোন দায়ে

ধনিগণ এ অর্থ ব্যয় করিতেন না। রাজভক্তি প্রদর্শন একটা বিশেষ কর্ত্তব্য বলিয়াই, অনেকেই "ঋণংকৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ" সূত্রের অনুবর্ত্তী হইয়াছিলেন। আর একটি কথা। পঞ্জাবের রোহতকে কয়েকবৎসর ধরিয়া দুর্ভিক্ষ লাগিয়া রহিয়াছে; রোহতকের অসংখ্যলোক গাড়ী লইয়া, মজুর হইয়া, দিল্লিতে আসিয়াছিল। দরবারের কৃপায় তাহারাও বাঁচিয়া গেল, বিদেশীয় লোকদিগেরও সুবিধা হইল। দুর্ভিক্ষেরজন্য দরবার বন্ধ না করা ভালই হইয়াছে।

সমবেত লোকদিগের সুখসুবিধার জন্য, লর্ড কর্জ্জন যে প্রকার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, তাহা অতীব প্রশংসনীয়। যে কোন সহরে এতলোক একত্রিত হইলে, কোন না কোন রোগের উপদ্রব উপস্থিত হইত; শত চেষ্টা করিলেও স্বাস্থ্যবিধানের পূর্ণবন্দোবস্ত হইতে পারিত না। কিন্তু বিস্তীর্ণ প্রান্তরের মধ্যে অসংখ্য শিবির সন্নিবিষ্ট হওয়ায়, সুবিধা এবং স্বাস্থ্যের হিসাবে কোন গোল হয় নাই। রাজপথ, জল, আলোক, পাহারা, শান্তিরক্ষা প্রভৃতি সকল বিষয়েই উত্তম বন্দোবস্ত হইয়াছিল। সকল উৎসবেই বিপুল জনতা হইত; তথাপি গাড়ী রাখিবার স্থান, গাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিবার উপায়, এরূপভাবে নির্দ্দিষ্ট হইত, যে কাহারও তিলমাত্র ক্লেশ হইত না। অনেক নূতন রাজপথ প্রস্তুত হইয়াছিল; এবং সর্ব্বত্র জলসেচনের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু সাজাহানাবাদের চিরপ্রসিদ্ধ ধূলি কিছুতেই দূরীভূত হয় নাই। সেজন্য যদি কাহারও অপরাধ থাকে, তাহা দিল্লিসহরের। প্রবাদ আছে, যে পারস্যের রাজদূত পাতসাহ সাজাহানের নবপুরী দেখিয়া যখন প্রত্যাগত হইতে চাহেন, তখন পাতসাহ তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, যে তিনি দিল্লিসহরের কি প্রকার বর্ণনা করিবেন। উত্তরে রাজদূত বলিয়াছিলেন, "জাঁহাপনা, আমি সর্ব্বপ্রথমে বলিব, যে এখানকার মত ধূলা আর কোথাও নাই।" দিল্লির প্রাচীন গৌরব চলিয়াগিয়াছে; কিন্তু সে ঐতিহাসিক ধূলা আজিও আছে। বিলাতি সুন্দরীগণ, কত যত্নে, "রুস্‌ত্ত"—রঞ্জনে শুভ্রকপোলতল সুপক্ক নেস্‌পাতির-মত সুরঞ্জিত করিতেন, কিন্তু নিমেষমাত্রে তাহা ধূলিধূসরিত হইত। বহুমূল্য রত্নকাঞ্চনখচিত রাজপরিচ্ছদের উজ্জ্বলতা, দেখিতে দেখিতে হীনপ্রভ হইয়া যাইত। শ্মশানক্ষেত্রের ধূলি, সকল সৌন্দর্য্য ও দীপ্তি পরাভূত করিয়া নিরন্তর যে শিক্ষা দান করিত, তাহা উৎসবের আনন্দের অনুকূল ছিল না।

প্রজাপুঞ্জের মধ্যে যাঁহারা রাজা, এবং সেই রাজাদিগের মধ্যে যাঁহারা স্বস্বরাজ্য নিজে শাসন করিবার ক্ষমতা পাইয়াছেন, দরবারটি প্রধানতঃ তাঁহাদিগকে লইয়াই হইয়াছিল। একথা লর্ড কার্জ্জন নিজেই বলিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন, যে এই রুলিংচীফ্ বর্গই বৃটিশভারতের স্তম্ভস্বরূপ। দরবারেরদিনে এই রুলিংচীফেরাই (কথাটার বাঙ্গালা না হওয়াই ভাল) লর্ড কার্জ্জন এবং সম্রাটের ভ্রাতার করস্পর্শসুখ লাভ করিয়াছিলেন; এবং ইঁহাদিগেরই মণিমুক্তাখচিত মুকুট, রাজপ্রতিনিধির চরণস্পর্শপূত সিংহাসনের দীপ্তিবিধান করিয়াছিল। জমীদার হউন বা জমিশূন্য হউন, যাঁহারা কেবল উপাধিমাত্রে রাজা বা নবাব, যত বড় ধনী হইলেও, তাঁহারা কেবল অন্য দশজনের মত দর্শকরূপে উপস্থিত ছিলেন; রাজসিংহাসনের নিকটবর্ত্তী হইতে পান নাই। রাজপ্রতিনিধি যেদিন দিল্লি প্রবেশ করিয়া রাজপথ উৎসবময় করিলেন, সেদিন আবার রুলিংচীফ্‌দিগের মধ্যেও যাঁহারা কেবল তোপসম্মানে সম্মানিত, তাঁহারাই অনুযাত্রী হইবার অধিকারী হইয়াছিলেন। ইম্পীরিয়াল কাডেট্ কোর, ইঁহাদিগের বংশধর লইয়াই গঠিত হইয়াছিল; এবং ইঁহাদিগের মধ্য হইতেই লর্ড কর্জ্জন এবং ডিউক অব্ কনটের সখের আরদালি বাছিয়া লওয়া হইয়াছিল। ইঁহাদের সম্মানেই দেশ সম্মানিত; কাজেই কাহারও কোন ক্ষোভের কারণ নাই। সুসজ্জিত হাতীঘোড়া, সৈন্যসামন্ত, এবং রাজামহারাজা লইয়া প্রোসেশ্যান বা নগরযাত্রাটি জাঁকাল করা হইয়াছিল। এদেশীয়দিগের চক্ষে নগরযাত্রায় ততটা চমক্ ছিল না বটে কিন্তু উহাতে শৃঙ্খলার শোভা ছিল। যাহা পুড়িয়া নিঃশেষ হইয়া যায়, চিরদিনই এবং সকল বিষয়েই তাহারই জাঁক বড় জাঁক; আতসবাজীটি সকলেরই প্রায় তৃপ্তিদান করিয়াছিল। সম্রাট, রাজপ্রতিনিধি, ডিউক অব্ কনট প্রভৃতির প্রতিমূর্ত্তি প্রকাশ, এবং জলপ্রপাত মুক্তাপ্রপাত প্রভৃতির দৃশ্য বেশ উজ্জ্বল হইয়াছিল। সৈন্য পরিদর্শন, সৈন্য চালনা,



অশ্বক্ষুরাকার দরবারমঞ্চের পূর্ব্বপার্শ্ব।

কৃত্রিম যুদ্ধ প্রভৃতি দেখিয়া সকলেই বিস্মিত এবং প্রীত হইয়াছিল। বোয়ারযুদ্ধের সময়ে যেপ্রকার শুইয়া যুদ্ধ করা, গুলিচালান এবং পলায়নাদি শিক্ষা হইয়াছে, সেগুলি চমৎকারভাবে প্রদর্শিত হইয়াছিল।

দরবারগৃহটি যেভাবে গঠিত হইয়াছিল, তাহাতে প্রায় ১৪ হাজার লোক স্বীয় আসনে উপবিষ্ট থাকিয়া, সকল দৃশ্য দেখিতে পাইয়াছিল। ভাটের ঘোষণা এবং রাজপ্রতিনিধির বক্তৃতা, এমন তারস্বরে এবং সুস্পষ্টভাবে উচ্চারিত হইয়াছিল, যে কাহারও পক্ষে কিছু শুনিতে বা বুঝিতে ক্লেশ হয় নাই। যখন তোপের গর্জ্জনে আকাশ কাঁপিয়া উঠিল, এবং আকাশে বৃটিষসিংহের গৌরবপতাকা উড়িল; যখন দামামা পড়িল, জয়ধ্বনি উঠিল, এবং বৃটনের জাতীয়-সঙ্গীত বাজিল; তখন সম্রাটের ভ্রাতার দক্ষিণপার্শ্বে রাজপ্রতিনিধিকে দেখিয়া সকলেই ভাবিল, "চমৎকার দরবার-পর বৈঠে ভূপাল"। ভারতে হউক, ব্রহ্মে হউক, আফ্গানসীমান্তে হউক, স্বাধীনতা ত কাহারও নাই; কিন্তু স্বাধীনতা থাকিলেও, সেই গৌরবান্বিত রাজরাজেশ্বরের মূর্ত্তি দেখিয়া, অনেকেরই স্বাধীনতা হারাইতে সাধ যায়। কথাটা কল্পিত নহে; এই প্রসঙ্গে একজন অর্দ্ধস্বাধীন ভূপতির একটি খেয়ালের কথা বলিতেছি। ১৮৭৭ সালের দরবারের সময়, লর্ড লিটন বাহাদুর, অধীন রাজাদিগকে তাঁহাদের বক্ষস্থলের শোভারজন্য, ইংরাজের জয়নিশান পরিতে দিয়াছিলেন। খেলাতের খাঁ তখন স্বাধীন ছিলেন। তিনি আব্দার করিলেন, "আমি একটি নিশান পরিব"। লর্ড লিটন বুঝাইয়া বলিলেন, যে উহাতে তাঁহার স্বাধীনতার পক্ষে বাধাজনক কথা উঠিবে; তাঁহারপক্ষে ফিউডেটরি রাজার চিহ্নধারণ উপযুক্ত হইবে না। সে কথার উত্তরে, ইংরাজগৌরবমুগ্ধ ভূপতি বলিলেন, যে স্বাধীনতা অপেক্ষা ফিউডেটরি হইয়া নিশান পরা অধিক সম্মানের কথা। এবারে সত্য সত্য কাহাকেও নিশান পরিতে হয় নাই; কিন্তু এই দরবারের সময় চীনপাহাড় হইতে গান্ধারাতীত সীমাপর্য্যন্ত সকলস্থলের লোকের বক্ষেই জয়নিশান শোভাভরে উড়িতেছিল। যত বড়বড় রাজামহারাজাই হউন, সকলেই যখন নতশিরে লর্ড কর্জ্জনের পদতলে উপস্থিত

হইতেছিলেন, তখন তাঁহারা সভার গৌরব দেখিয়া নিশ্চয়ই মনে মনে বলিতেছিলেন, "মেরি সুরৎ ফকিরানা, তেরা দরবার শাহানা"। দরবারের এই দৃশ্যই প্রধানদৃশ্য। সম্রাট দীর্ঘজীবী হউন।

দরবার উপলক্ষে যে শিল্পপ্রদর্শনী খুলিয়াছিল, সেটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। যে দেশের লোক এখনও এত কারুকার্য্যকুশল, তাহারা না খাইয়া মরে কেন? লর্ড কার্জ্জনের মুখে ফুলচন্দন পড়ুক; তিনি দেশীয় লোকদিগকে উৎসাহিত করিয়া বলিয়াছিলেন, যে এদেশে এমন সুন্দর সামগ্রী থাকিতে, কাহারও পক্ষে বিলাতি অসার জিনিষ ব্যবহার করা ভাল নহে। দেশীয় লোকেরা যদি স্বদেশীয় পদার্থে অনুরাগী হয়, তাহা হইলে পরম মঙ্গল হয়, সন্দেহ নাই, কিন্তু যে শ্রেণীর জিনিষ প্রদর্শনীতে আসিয়াছিল, তাহার ক্রেতা এদেশে এখন দুর্লভ। অনেক রাজামহারাজারাও যে এখন নিঃস্ব, তাহা তাঁহাদের দরবারি জাঁকজমকের অন্তরাল হইতে ফুটিয়া বাহির হইতেছিল।

To develope the resources of India বলিয়া একটা ইংরাজি কথা আছে। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট নিয়ত তাহার প্রতি যত্নশীল; তবুও যে কেন এদেশের দারিদ্র ঘুচিতেছে না, তাহা বুঝিয়া উঠা দায়। এত খনি এত মণি আবিষ্কৃত হইতেছে, তবুও যেন কি এক শনির দৃষ্টি পড়িয়াছে, যে কোনপ্রকারে এদেশে টাকা দাঁড়ায় না; একেবারে উড়িয়া যায়। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট অনুকূল, আমরাও কিয়ৎপরিমাণে শ্রমশীল হইতেছি, তবুও ঐ শনির দৃষ্টিতে সকলি উড়িয়া পুড়িয়া যায়। প্রদর্শনী হইতে ফিরিবার সময় একদিন এই কথা ভাবিতে ভাবিতে রথের অন্বেষণ করিতেছি, এমন সময় একজন ভদ্রলোক, বিপুল জনতার মধ্যে একটু উৎকণ্ঠিতভাবে, আমার দিকে আসিয়া সরিয়া দাঁড়াইয়া বলিলেন, "A fellow was trying to develop the resources of my pocket;" আমার পকেটেও দু চারিটি টাকা ছিল; একটু সাবধান হইলাম। কিন্তু তাঁহার শ্লেষাত্মক কথাটিতে অসন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি উত্তর না দিয়া চলিয়া গেলেন। পাঠক, আপনারা দুর্মুখের কথায় কর্ণপাত করিবেন না।

একেত আমার বাজে কথা কহিবার অভ্যাস অধিক; তাহার উপর আবার ঠিক দরবার বর্ণনা সংকল্প করিয়াও প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করি নাই। কাজেই, কোন অনুষ্ঠানেরই বিশেষ বিবরণ না লিখিয়া, সম্পাদক মহাশয়ের খাতিরে, তাঁহার পত্রিকার পৃষ্ঠাপূরণরূপ উপকারে, তাঁহাকে উপকৃত করিলাম। যে যাহাই বলুক, শত্রুর মুখে ছাই দিয়া, দরবার নির্ব্বিঘ্নে সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে। সম্রাট দীর্ঘজীবী হউন।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

সূফী সম্প্রদায়।

হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রে কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান তিনটী কাণ্ডের উল্লেখ আছে। যাগ, যজ্ঞ, তপ, আরাধনা প্রভৃতি কর্ম্মকাণ্ড। বৈদিকসময়ে আর্য্য হিন্দুগণ কর্ম্মকাণ্ড লইয়াই ব্যাপৃত ছিলেন। ক্রমশঃ যত উন্নতি সাধন করিতে লাগিলেন, ততই ভক্তি ও জ্ঞানমার্গের সোপানে আরূঢ় হইলেন। প্রহ্লাদচরিত্রে ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাওয়া যায়। অজ্ঞানতা নাশ হইলে যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহাই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। বেদান্ত শাস্ত্রই সেই জ্ঞানমার্গের আদর্শ স্থল। ইহার উপদেশ এই যে যতক্ষণ মানবচিত্ত অজ্ঞানতার অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে, ততক্ষণ জীবাত্মাকে পরমাত্মা হইতে পৃথক মনে করে ও পরমাত্মাকে দেখিতে পায় না; কিন্তু যখন জ্ঞানের সঞ্চার হয়, তখন আর সেরূপ ভাব থাকে না। তখনই সেই দ্বৈতভাব নষ্ট হইয়া যায় এবং মানুষ "সোহং" বা "অহংব্রহ্ম" এই বলিতে পারে।

কর্ম্মপ্রবৃত্তি, ভক্তি ও জ্ঞান এই তিনে মানবচিত্ত গঠিত। পাশ্চাত্য দার্শনিকেরাও মানবচিত্তের (mind) এই তিনটি বৃত্তিকে willing, feeling, knowing নাম দিয়া তাহাদের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। এই তিনটী চিত্তের বৃত্তি সম্যকরূপে সকলেতে বিকশিত হয় না। কাহাতেও বা ইচ্ছাশক্তি, কাহাতেও বা ভাবপ্রবণতা, এবং কাহাতেও বা বুদ্ধির আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। এইহেতু এই জগতে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির লোক, যথা, সাংসারিক বা কর্ম্মিষ্ঠ, ভক্ত বা রসপ্রিয় (যথা কবি, চিত্রকর

ইত্যাদি) জ্ঞানী বা দার্শনিক, দেখা যায়। কেবল ইহাই নহে ; এক জীবনে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থাতে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের প্রকাশ হয়। বাল্য ও কৌমার অবস্থাতে জীব সচরাচর কর্ম্মপ্রিয় হয়। দৌড়াদৌড়ি, ব্যায়াম ইত্যাদিতে বেশী-ভাগ আসক্ত থাকে। যৌবন অবস্থাতে ভাবুক এবং রস-প্রিয় হয়, এবং বার্দ্ধক্য অবস্থাতে জ্ঞানপ্রিয় হইয়া থাকে। ধর্ম্মজগতেও এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। কর্ম্ম, ভক্তি ও জ্ঞান সব ধর্ম্মেই এই তিনটী দিক আছে। ইসলাম ধর্ম্ম আজকাল বেশীরভাগ কর্ম্মপ্রিয় এবং ইহার অবস্থা এখন আর্য্যদের যজ্ঞকালীন কর্ম্মকাণ্ডব্যাপৃত অবস্থার সদৃশ। কিরূপ নমাজ করিতে হইবেক, নমাজের সময় হাত বুকের উপর থাকিবেক কিংবা অধঃস্থলে, কত ওঠা ও বসা করিতে হইবেক ; নমাজের মন্ত্রগুলি উচ্চৈঃস্বরে কি নিম্ন-স্বরে পড়িতে হইবেক, এই সব তর্ক লইয়াই মুসলমান মৌলবীদের পাণ্ডিত্য প্রকাশ পায়। যদিও সচরাচর মুস-লিম কর্ম্মকাণ্ড লইয়া ব্যস্ত, গোমেধ, উষ্ট্রমেধ, অজমেধ তাঁহার ধর্ম্মের ভিত্তিস্থল, তথাপি জ্ঞান ও ভক্তির অঙ্গ কিঞ্চিৎ পরিমাণে তাঁহাদের মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে। এই জ্ঞান ও ভক্তির বিশেষ কোন পৃথক নাম তাঁহাদের মধ্যে নাই। কিন্তু সুফী-মত নামে সচরাচর জ্ঞান ও ভক্তি মার্গ বুঝায়।

সুফীশব্দের ব্যুৎপত্তি লইয়া অনেক বাদানুবাদ চলি-য়াছে। মৌলবীদের মতে সুফনির্ম্মিত বস্ত্র যাঁহারা পরি-ধান করিতেন, তাঁহারাই সুফী আখ্যা প্রাপ্ত হইতেন। আমাদের দেশের চট্ (Jute) সদৃশ মোটা কাপড়কে আরবীভাষায় সুফ (sackcloth) বলা হইত। পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ য়াহুদীধর্ম্মশাস্ত্রে এইরূপ বস্ত্র পরিধান এবং ভস্মলেপনের বিধি আছে। সুফীরা নিজের দীনতা ও হীনতা প্রকাশ করিবার জন্য এইরূপ বস্ত্র পরিধান করি-তেন। বস্ত্রবিশেষে ধর্ম্মসম্প্রদায় বিশেষের নামকরণ আমাদের দেশেও পাওয়া যায়; যথা দিগম্বরী, শ্বেতাম্বরী প্রভৃতি জৈনসম্প্রদায়। কেহ কেহ বলেন যে "সাফ" শব্দ হইতে সুফীশব্দ ব্যুৎপন্ন হইয়াছে। "সাফ্" শব্দের অর্থ পবিত্র অর্থাৎ সুফীরা পবিত্র অন্তঃকরণের বলিয়াই এই আখ্যা পাইয়াছেন।

সুফীশব্দের উপরিলিখিত ব্যুৎপত্তি কাল্পনিক বলিয় মনে হয়। সুফীশব্দ গ্রীক sophos শব্দ হইতে উৎপ হইয়াছে। sophos শব্দের অর্থ জ্ঞান। বিদেশীভাষ হইতে যখন কোন শব্দ নিজের ভাষায় আনীত হয়, তখ প্রায় তাহার ব্যুৎপত্তি লোকেরা নিজের ভাষা অনুযায়ী কল্পনা করে। সংস্কৃতভাষায় গ্রীকভাষা হইতে অনেব শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু পণ্ডিতদিগের নিকট তাহা দের ব্যুৎপত্তি জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা পাণিনির কো না কোন সূত্রের অনুযায়ী তাহাদের অর্থ করিবেন।

সুফীমতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক। জীব পরমাত্মার অংশস্বরূপ। অনাদি অনন্তকাল হইতে এইজগতে একটি নির্দ্দিষ্টঅংশে সিদ্ধপুরুষ মহাত্মাগণের আশ্রম আছে। আর্য্য, য়ীহুদীয়, খৃষ্টীয়, ও অন্যান্য ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সকলের প্রবর্ত্তক এই মহাত্মাগণ। দেশানুসারে ও যুগানুসারে তাঁহারা ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় স্থাপন করিয়াছেন। তাহাদের অস্তিত্ব এতদিন প্রকাশ পায় নাই, যদিও তাহাদের বিষয়ে উল্লেখ প্রায় সকল সম্প্রদায়ের পুস্তকে পাওয়া যায়। থিয়সফিষ্টদের মহাত্মাগণ মেডেম ব্লাভাট্স্কির মনঃ কল্পিত নহেন।

সুপ্রসিদ্ধ পারসীক কবিদিগের কবিতাতে অনেক-স্থলে প্রায় এই সুফীমত প্রকাশ পাইতে দেখিতে পাওয়া যায়। এলাহাবাদে মহারাজ মাধোদাসজী বলিয়া একজন বাঙ্গালী সাধু কীটগঞ্জে বাস করিতেন। দুইবৎসর হইল তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। তিনি ফারসীভাষায় সু-পণ্ডিত ছিলেন। তিনি অনেক কষ্ট স্বীকার করিয়া ফারসী ও উর্দ্দু ভাষার প্রধান প্রধান কবিদিগের সুফীমত-পোষক কবিতাগুলি "বোস্তান এ-মারফত" নাম দিয়া এক-খানি পুস্তকে সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন। এই পুস্তকে মৌলানা রুম, হাফেজ, নিয়াজ, ঘৌস, চিস্তি, খুস্রালী, কলন্দর, শমসে তবরেজ, অত্তার, ফিরদৌসী, নিজামী, সাদী, খকানী, খয়াম প্রভৃতি প্রসিদ্ধ কবিগণের সুফীভাবের কবিতাগুলি সংগৃহীত হইয়াছে। এই পুস্তক হইতে গোটাকতক সুফীমত-পোষক ফারসী কবিতার অনুবাদ দেওয়া যাইতেছে। শমসে তবরেজের একটী কবিতার মর্ম্ম নিম্নে দেওয়া যাইতেছে ঃ—

ওহে ভাই মুসলমান কি উপায় করি?
আমি যে আমাকে জানি না।
খৃষ্টান, য়ীহুদী, মহম্মদী, পারসী
আমিত ইহার কেহই না। ১।
পূর্ব্বে কি পশ্চিমে, স্থলে কি জলেতে,
কোনস্থানে আমি থাকি না।
ইরাক নগরে, খোরাসান দেশে,
কিছুই সম্বন্ধ রাখি না। ২।
ক্ষিতি, অপ, বায়ু আর অগ্নি হইতে
সৃজন আমার হয় নাই।
আদম হব্ববতী জগৎ প্রজাপতি
জনম আমার হয় নাই। ৩।
খুঁজিলে আমারে খুঁজিয়া পাবে না,
নাহিক আমার থাকিবার স্থান,
অশরীরী আমি নহি প্রাণবায়ু,
মগ্ন তাঁ'তে যিনি প্রাণের প্রাণ। ৪।
তিনি হন আদি অন্ত অন্তর বাহির,
তিনি বিশ্বময় সৃষ্টি স্থিতি লয়,
তাঁরে ভিন্ন অন্তে নাহি জানি আমি
একমাত্র সৎ তিনি, অন্য কেহ নয়। ৫।
দ্বৈতভাব যবে করিলাম দূর,
সম্পূর্ণ জগৎ দেখি একময়।
দেখিতেছি এক, খুঁজিতেছি এক,
ডাকি আমি এক, একে হব লয়। ৬।
বলি ওরে শমস কিসের লাগিয়া
এ জগতে তুমি হয়েছ পাগল?
মাতলামি পাগলামি তাঁহার কারণ
তাঁহার প্রেমেতে হয়েছি বিহ্বল। ৭।

প্রেমেতে শরীর প্রাণ হইয়াছে লয়।
আশ্চর্য্য ধরেছি রূপ কোন বস্তু নয়॥ ১।
যেখানেতে যাই প্রেম ডুবায়ে সদাই।
মসজিদ্ মন্দিরে ভেদ দেখিতে না পাই॥ ২।
নিশ্চয় সন্দেহশূন্য সত্যবস্তু তিনি।
নিশ্চয় সন্দেহপূর্ণ মিথ্যাবস্তু আমি॥ ৩॥

যাঁহারা ঈশ্বরের অন্বেষণকারী তাঁহারাই ঈশ্বর; তিনি তোমাদের হৃদয়ের বাহিরে নহেন; তোমরাই তিনি, তোমরাই তিনি। ১।

যেবস্তু কখন হারায় নাই, কেন তাহার অন্বেষণ করিতেছ? ২।

তোমরাই মূলমন্ত্র, তোমরাই ধর্ম্মশাস্ত্র; তোমরাই জবরিল এবং তোমরাই ঈশ্বরের পেগম্বর। ৩॥

তাঁহার অন্য এক কবিতা হইতে নিম্নলিখিত কতিপয় পংক্তির অনুবাদ দিতেছি :—

মরে যাও, মরে যাও, এই প্রেমে ডুবে মর। এই প্রেমে মরিলে তোমরা অমর হইবে। ১॥

এই মৃত্যুকে ভয় করিওনা, এই সংসার হইতে বাহিরে আইস; এবং স্বর্গকে গ্রহণ কর। ২॥

এই ইন্দ্রিয়গণকে বধ কর, কারণ ইন্দ্রিয়েরাই তোমার কারাগার এবং তুমি সেখানে বন্দী। ৩॥

চুপ করিয়া থাক, চুপ করিয়া থাক, চুপ করিয়া থাকাই মরণের জীবন; আসল জীবিত সেই যে চুপ করিয়া থাকে।৪॥

আর এক কবিতায় ভক্তের বিষয় এইরূপ বলিয়াছেন,

আমার হৃদয় বলে যে আমি প্রাণ; কিন্তু ভুল বলিলাম, আমি প্রাণের ঈশ্বর; আইস ও দেখ আমি ইহা ও তাহা হইতে পৃথক॥ ১॥

আমি পৃথিবী, আমি আকাশ, আমি শরীর এবং আমি প্রাণ॥ ২॥

শমস্ তব্‌রেজ কেবল ভক্ত ছিলেন না, কিন্তু তিনি অনেক রোগীকে অলৌকিকরূপে আরোগ্য দান করিতেন। এ বিষয়ে তিনি এরূপ বলিয়াছেন :—

আমি ভিষক্, আমি বৈদ্য, বগদাদনগরীতে আমি আসিয়াছি; অনেক রোগীদের কষ্ট আমি নিবারণ করিয়াছি। ১।

আমরা অতি সুন্দর ভিষক্, আমরা খৃষ্ট ও শিষ্য, আমরা অনেক মৃত দেহকে ছুঁইয়া তাহাতে জীবন সঞ্চার করিয়াছি। ২।

যাঁহারা আমাদের কার্য্য দেখিয়াছেন, তাঁহাদের সব জিজ্ঞাসা কর। তাঁহারা এখনও আমাদের ধন্যবাদ দেন, এবং বলেন, আমরা কোথায় হইতে আসিয়াছি॥ ৩॥

আমরা ঈশ্বরের বৈদ্য, আমরা কাহারও নিকট হইতে দক্ষিণা গ্রহণ করি না। আমরা উচ্চআশার এবং লোভী ও হীন প্রকৃতির লোক নহে। আমরা জ্ঞানীবৈদ্য; আমরা রোগীর প্রস্রাব দেখিয়া তাহার রোগ নির্ণয় করিনা, আমরা রোগীর শরীরে সংকল্প মত প্রবেশ করি। ৪।

অন্যস্থলে তিনি নিজের বিষয়ে এইরূপ বলিয়াছেন :—

হে প্রেমিকগণ, হে প্রেমিকগণ, আমি ধূলাকে মুক্তা করি। হে বাদ্যকরগণ, হে বাদ্যকরগণ, তোমাদের ঢোলককে টাকা দিয়া পূর্ণ করিয়া দিব। ১।

হে তৃষ্ণাতুরগণ, হে তৃষ্ণাতুরগণ, আজ আমি লোকদের জল দান করিতেছি।

এই শুষ্ক ও ধূলিময় পৃথিবীকে নন্দনকানন সদৃশ করিব। ২।

হে দুঃখী সকল, হে দরিদ্র সকল, আনন্দ কর, আনন্দ কর; আজ সমস্ত দুঃখী ও দরিদ্রকে আমি রাজা ও রাজাধিরাজ করিয়া দিব॥ ৩॥

হে রসায়নবেত্তা, হে রসায়নবেত্তা আমাকে দেখ; আমার রসায়ন দেখ।

আমি শত ২ মন্দিরকে মসজিদ করিয়াছি; আমি রোগীকেশান্ত করিয়াছি, পথ হারাকে পথদর্শক করিয়াছি; বিষকে অমৃত করিয়াছি; দুষ্টকে শিষ্ট করিয়াছি। ৪।

হে মনুষ্য! তুমি প্রথমে একবিন্দুমাত্র ছিলে; তাহা হইতে রক্ত হইলে; এবং রক্ত হইতে এইরূপ এক সুন্দর রূপ ধারণ করিয়াছ। হে মনুষ্য! আমার নিকটে আইস, মনুষ্য হইতে আমি দেবতা করিব। ৫।

ব্যথিত।

"স"-গ্রামের মসজিদের নবাগত মৌলবীসাহেব গোঁড়াধর্ম্মবিশ্বাসী মুসলমান ছিলেন। দশবার করিয়া নমাজ পড়া তাঁহার চিরন্তন অভ্যাসের মধ্যে দাঁড়াইয়াছিল। মুসলমান ধর্ম্মের যত কিছু বাহ্য আচার অনুষ্ঠান, তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে সমস্তই পালন করিতেন। সেই ক্ষুদ্র পল্লীর মধ্যে তাঁহার যে মুসলমান ধর্ম্মমণ্ডলটি তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া থাকিত, তিনি তাহাদিগকে ধর্ম্মে গোঁড়াবিশ্বাসী ও আচার অনুষ্ঠান পালনে নিজেরই মত সতত কঠোর-ব্রতসম্পন্ন থাকিতে বলিতেন। "স"-গ্রামের ক্ষুদ্র ধর্ম্মমণ্ডলটি প্রকাশ্যে তাঁহার প্রতি অতিরিক্ত ভক্তি প্রদর্শন করিত। কিন্তু অপ্রকাশ্যে তাঁহার গোঁড়ামির দরুন তাঁহার প্রতি বিদ্রূপ বর্ষণ করিতে ছাড়িত না। তাহারা আরো বলাবলি করিত যে মৌলবীসাহেব ধর্ম্মেতে যেমন কঠোরব্রতপরায়ণ, স্নেহমায়া ইত্যাদি মানবীয় কোমল বৃত্তিগুলি সম্বন্ধে তাঁহার হৃদয়ও তেমনি কঠোরতাপূর্ণ। তাহাদের এরূপ বলার কোন কারণ ছিল না। তাঁহাকে কাহারো প্রতি স্নেহ কি অস্নেহ প্রকাশ করিতে কখন দেখা যাইত না। অথচ কেন যে তাঁহার সম্বন্ধে "স"-গ্রামবাসিগণ এরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিত, তাহার অর্থ বোঝা যাইত না।

তিনি দু তিন বৎসর মাত্র সেই গ্রামে বাস করিতেছিলেন। বহুকাল হইতে তথাকার পুরাতন মসজিদটি জীর্ণ অবস্থায় পতিত ছিল। একদিন রাত্রিকালে বিস্মিত গ্রামবাসিগণ দেখিল যে তাহাদের জীর্ণ মসজিদের বহুকাল অবধি অন্ধকার গৃহটি আজ একটি উজ্জ্বল প্রদীপচ্ছটায় আলোকিত হইয়া উঠিয়াছে। তাহারা ভাবিল কোন মৃত মৌলবীর প্রেতাত্মার এই কীর্ত্তি। কিন্তু তৎপরদিন প্রভাতকালে একজন সৌম্যমূর্ত্তি দীর্ঘাকৃতি যুবা ফকিরকে সেই মসজিদটি দখল করিতে দেখিয়া তাহারা অবাক হইল; এবং ইহার সহিত তাহাদের হৃদয়ে একটু তৃপ্তিরও আবির্ভাব হইল। কেন না, তাহারা বহুদিন হইতে তাহাদের গ্রামের মসজিদের জন্য একজন মৌলবীর বড় অভাব বোধ করিতেছিল। এই সুযোগে তাহারা দলে দলে তাঁহার নিকটে গমন করিয়া গ্রামের মৌলবীর পদ গ্রহণ করিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিল। ফকিরও তাহাদের অনুরোধ পালন করিতে দ্বিধা বোধ করিলেন না।

সেই অবধি জীর্ণ মসজিদের বহুদিনের নীরব প্রাঙ্গণটি প্রভাতে, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যায় কোরানের আহ্বানসূচক প্রার্থণাবাণীর দ্বারা মুখরিত হইতে লাগিল। উপাসনাগৃহে সন্ধ্যা ও নিশীথকালে অন্ধকারের একাধিপত্য রাজত্বেরও অবসান হইল। সতত-কোরান-পাঠ-নিরত ফকিরের গম্ভীর সুন্দর সৌম্যমূর্ত্তি "স"-গ্রামবাসিগণের হৃদয়ে ভক্তির উদ্রেক

করিত। কিন্তু তৎসঙ্গে তাঁহার নিঃসঙ্গপ্রিয়তা, গোঁড়ামি ও মানবজাতির প্রতি একটা বীতশ্রদ্ধ ভাবের দরুণ তাহাদের মনে অসন্তোষের আবির্ভাব হইত। সেইজন্য তাহারা অপ্রকাশ্যে তাহার প্রতি বিদ্রূপ বর্ষণ করিতে ছাড়িত না।

সমাজের মধ্যে এমন কতকগুলি লোক দেখা যায়, যাহারা সচরাচর মানববিদ্বেষী হইয়া থাকে। কিন্তু যদি তাহাদের মানববিদ্বেষের উৎপত্তিস্থান অনুসন্ধান করিয়া আমরা দেখি, তবে অনেক স্থলে ইহাই চোখে পড়ে যে সমাজের নিকট অতিরিক্তরূপে লাঞ্ছিত ও প্রতারিত হইয়া তাহারা এইরূপ মানববিদ্বেষী হইয়াছে। কবি বাইরন মানববিদ্বেষী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার মানববিদ্বেষ কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছিল? শৈশবে মাতার স্নেহ হইতে বিচ্যুতি, যৌবনে সমাজের লাঞ্ছনা ও স্ত্রীর প্রেমশূন্য মমতাহীন ব্যবহার তাঁহার হৃদয়ে মানববিদ্বেষের বীজ উপ্ত করিয়াছিল। এই অদ্ভুত নবাগত মৌলবীটির পূর্ব্ব ইতিহাস কি তাহা "স"-গ্রামের কেহই জানিত না এবং জানিতেও ব্যগ্র ছিল না। তিনিও কাহাকেও কিছু বলিতেন না। তাঁহার হৃদয়ে কখনও যে স্নেহ প্রেম ইত্যাদি কোমল বৃত্তিনিচয় আধিপত্য করিত, তাঁহাকে দেখিয়া ভ্রমক্রমেও তাহা কাহারো মনে উদয় হইত না। তাঁহার সুন্দর গম্ভীর মুখে সর্ব্বদা একটি করুণ বিষাদের ভাব অঙ্কিত থাকিত। কিন্তু স্থির জলাশয়ে যেমন সময়ে সময়ে পবন সঞ্চালনে একটু চাঞ্চল্য দেখা যায়, কিন্তু ক্ষণেকপরে উহা আবার পূর্ব্ববৎ স্থিরভাব ধারণ করে, সেইরূপ তাঁহার গম্ভীরমুখে ক্ষণেকের জন্য মাত্র সময়ে সময়ে ঈষৎ আনন্দের ভাব ব্যক্ত হইত। কিন্তু কেন যে সে আনন্দের ভাব তাঁহার মনে আসিত, তিনি যেন নিজেই তাহা বুঝিতে পারিতেন না। তিনি সর্ব্বদাই পারস্য কবি ফরহুসির কাব্যপুস্তক সকল পাঠ করিতেন। যে স্থানে সেই অতীতকালের মৃত কবির অধিক ভাবাবেশ ব্যক্ত হইয়াছে, সেই সকল স্থানে তাঁহার নয়ন অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিবদ্ধ থাকিত। হয়ত তাঁহার অজ্ঞাতে অধীয়মান স্থানে দুএক ফোঁটা অশ্রু পতিত হইত। কিন্তু পরক্ষণে তিনি চমকিত হইয়া যেন ঈষৎ রোষভরে সে অশ্রু মোচন করিয়া পুনরায় পাঠে নিমগ্ন হইতেন। কতদিন রাত্রে যখন জ্যোৎস্না উদিত হইত, মসজিদের ক্ষুদ্র প্রাঙ্গণটি অস্পষ্ট আলোকদীপ্ত স্বপ্নচ্ছায়াচ্ছন্ন নাট্যপ্রাঙ্গণের ন্যায় প্রতিভাত হইত, তখন ফরহুসির কাব্যপাঠে নিরত এই যুবা ফকিরটির ছায়াখানি মসজিদ-প্রাঙ্গণে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত অচঞ্চলভাবে থাকিতে দৃষ্ট হইত। তখন তাঁহার হৃদয় কত ছায়ালোকাচ্ছন্ন কল্পলোকান্তরে বিচরণ করিয়া বেড়াইত কিনা, তাহা কে বলিবে?

এমনি করিয়া তিন বৎসর চলিয়া গিয়াছে। প্রতি জ্যোৎস্না রাত্রের ন্যায় সেদিনও তেমনি জ্যোৎস্না দূরে নিকটে দিগন্তরে একখানি পূর্ণ সুরের প্লাবনের ন্যায় বহিয়া যাইতেছে। ঠিক যেন দূর চন্দ্ররাজ্যের একটা সৌন্দর্য্যের ঢেউ আসিয়া সুপ্তজগতের উপর একটা আলোকাবরণ টানিয়া দিয়াছে। সে আলোকাবরণখানি মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের ন্যায় কি স্থির ও অবারিত! সন্ধ্যার উপাসনা শেষ হইলে মৌলবী যেমন গৃহে প্রবিষ্ট হইবেন, সহসা তাঁহার নয়ন এই আত্মসৌন্দর্য্যাবিষ্ট প্রকৃতির উপর পতিত হইল। এই মোহাবিষ্ট বাহ্যজগতের উপর তাঁহার দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হইবা মাত্র তাঁহার হৃদয়ে একটা বেদনার অনুভব হইল। হায়! যখন আমাদের জীবন সুখহীন শান্তিহীন ভারবহ হইয়া পড়ে, তখন প্রকৃতির মমতা-ও-সহানুভূতিহীন ভাব, আমরা বড় তীক্ষ্ণরূপে অনুভব করি। শোকার্ত্তের শোকক্লিষ্ট ম্লান ললাটের উপর যখন পূর্ণচন্দ্রের আনন্দরশ্মি পতিত হয়, তখন হৃদয় হইতে স্বতই দীর্ঘনিশ্বাস উত্থিত হয়। সে দীর্ঘনিশ্বাসের অর্থ এই, যে, হায়! বাহ্যজগৎ কি নির্ম্মম! ফকির ললাটে হস্তস্থাপনপূর্ব্বক অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত সেই আত্মসুখাবিষ্ট ধরণীর পানে চাহিয়া রহিলেন। আপনা হইতেই তাঁহার কণ্ঠ হইতে দু একটি কি কথা অস্পষ্ট উচ্চারিত হইল। তাঁহার সেই অস্পষ্ট উচ্চারিত কথা কয়টি নীরব মসজিদ-প্রাঙ্গণে প্রেতাত্মার অতীত জীবনের বেদনাময় কাহিনীর ন্যায় ধ্বনিত হইতে লাগিল। তাহারপর কি যেন একটা মোহবলে, আত্মবিস্মৃতের ন্যায় সহসা তিনি মসজিদ হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। তাঁহার চারিদিকে কি সুখের প্লাবন! কি রূপের উৎসের পর উৎস! দূর দিগন্তে প্রান্তরপরে নদীজলে একি এ মধুর প্রপাত ধারা! হা ঈশ্বর! কেন এই সুখের এই রূপের এই মধুরতার একটা অংশস্বরূপে মানুষকে সৃজন করিলে

না? কেন তাহাকে স্বতন্ত্র স্বাধীন করিলে? খৃষ্টান ধর্ম্ম-শাস্ত্রে বর্ণিত আছে যে ভগবান প্রথমে মানুষকে সরল সুন্দর নিষ্পাপ সুখের আদর্শ স্বরূপ সৃজন করিয়াছিলেন। কিন্তু কুক্ষণে সর্পের প্ররোচনায় অধিকতর জ্ঞান লাভের জন্য জ্ঞানবৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিয়া সে সকলসুখভ্রষ্ট ও মৃত্যুর অধীন হইয়াছে। হায়! সে কোন কুক্ষণ? সেই কুক্ষণ হইতে যে বেদনার নাটজগতে অভিনীত হইয়া আসিতেছে, তাহার শেষ আছে কি? ফকির অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত প্রান্তরে বিচরণ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সম্মুখে নদীজলে কি মধুর সঙ্গীত ধ্বনিত হইতেছিল। যেন কোন দূর অতীতের আহ্বানধ্বনি। সে মধুর ধ্বনি যেন ক্ষণেকের জন্য ফকিরের হৃদয়ে শান্তি সিঞ্চন করিতে লাগিল। তাঁহার দৃষ্টি ক্রমে ক্রমে বর্ত্তমান হইতে ভবিষ্যৎ, ভবিষ্যৎ হইতে অতীতে লুটাইয়া পড়িতে লাগিল। যাও বর্ত্তমান; তুমিও ভবিষ্যৎ, তুমিও সম্মুখ হইতে অপসারিত হও। হায় চিরবাসনার অতীত! সে অতীতে কত ছায়ার পর ছায়া, কত আলোকের পর আলোক। সে ছায়ালোকের মধ্যে ও গো কে তোমরা অভিনেতা? ঐ যে নদী বহিয়া যাইতেছে। উহাতে কোন্ তীরতরুর ছায়া পড়িয়াছে? উহার তরঙ্গে তরঙ্গে কোন্ গীত সুরে সুরে ধ্বনিত হইয়া উঠিতেছে? ঐ যে! ঐ দেখ! দূর দিগন্তে আবার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছে! ঐ যে নদী অদৃশ্য হইল। হা! কোন্ দূর নিশীথের রাজ্যে লুকাইলে তুমি? তুমি কি এখনো জীবিত আছ, জেহেন?

সহসা ফকিরের চিন্তাজাল কাহাদের পদশব্দে ভঙ্গ হইল! তিনি চাহিয়া দেখিলেন যে সেই মায়ালোকসুপ্ত নীরব প্রান্তর সহসা কোন জাদুমন্ত্রবলে সজীব হইয়া উঠিয়াছে। কিছুদূরে একজন পুরুষ ও রমণী বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছে। রমণীর গৌর ললাটে ও দেহে কৌমুদীর কি মধুর আলিঙ্গন লুটাইতেছিল! দুজনে মাঝে মাঝে মৃদুস্বরে কি কথা বলিতেছিল। তাহাদের সেই মৃদু গুঞ্জনধ্বনি ঠিক যেন জাদুমন্ত্রসুপ্ত পুরীতে সহসা কোন মন্ত্রতন্ত্রবিদের সুপ্তপুরীর সুপ্তিভঙ্গসূচক মন্ত্রের মত ধ্বনিত হইতেছিল। সেখানে এই দুটি প্রাণীকে নিদ্রা-পুরীর মাঝে সুখস্বপ্নের আবির্ভাবের মত প্রতিভাত হইতে লাগিল। ফকির দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিলেন। আদি মানবদম্পতি আদম ও ঈভ বোধ হয় তাঁহাদের সর্ব্বপ্রথম বিবাহের রজনীতে এমনি করিয়া সুপ্ত ধরণীর সুখস্বপ্নের মত বিচরণ করিয়াছিলেন। চারিদিকে বৃক্ষদল এমনি করিয়া বুঝি তাঁহাদের মিলন গীতি গাহিয়াছিল। পদতলে নদী এমনি করিয়া একটা সুখের ধারার মত বহিয়া যাইতেছিল। একটি উজ্জ্বল হাস্য রহস্যের মত এমনি করিয়া জ্যোৎস্না ও দূরদিগন্তে নদীজলে লুটাইয়া পড়িতেছিল। ক্রমে পুরুষ ও রমণীটি ফকিরের অতি নিকটে আগমন করিতে লাগিল। ফকির সহসা বক্ষে হস্ত দিয়া চমকিতের ন্যায় স্থির হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। একি এ! একি কোন মিথ্যা নাটকের অভিনয় হইতেছে? না বাস্তব ঘটনা? জেহেন! জেহেন! একি এ? তুমি কোন্ নিশীথের রাজ্য হইতে উঠিয়া আসিয়াছ? ও মহান্ আত্মা আবার এই ঘৃণিত পৃথিবীতে শরীরী হইল কিরূপে? আর তুমি? তুমি কে উহার পার্শ্বে? হা! ঈশ্বর! তুমি কি সেই? ফকিরের দেহ কম্পিত হইতে লাগিল। তাঁহার দৃষ্টি উন্মত্তের ন্যায় পুরুষ ও রমণীটির অনুসরণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। তাঁহার রুদ্ধকণ্ঠে 'জেহেন' শব্দটি বারম্বার অস্পষ্টস্বরে উচ্চারিত হইতে লাগিল। এই সময় বিচরণকারী পুরুষ ও রমণীটি তাঁহার অতি সন্নিকটে আগমন করিল।

প্রতিদিন যেমন প্রভাত হয়, সে প্রান্তরে পরদিন তেমনি স্বর্ণসমুজ্জ্বল প্রভাত যখন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল, তখন ফকির ধীরে ধীরে মসজিদে প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার মুখে কি পরিবর্ত্তনের ছায়া ঘনীভূত হইতেছিল! তাঁহার সুগভীর নয়নে কি উদাসভাব! তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইতেছিল তিনি যেন কোন ঘনীভূতনিশীথরাজ্যের প্রাণী। চারিদিককার আলোক, বর্ণ, আনন্দ, যেন তাঁহার অপরিচিত। ফকির যখন মসজিদে প্রত্যাগমন করিলেন, তখন প্রতিদিন যেমন মসজিদ-প্রাঙ্গণে আলোক ছড়াইয়া পড়ে, সেদিনও তেমনি ছড়াইয়া পড়িতেছিল। ফকির একবার পশ্চাতে দূর প্রান্তরে নীরবে দৃষ্টিপাত করিলেন। তাহার পর গৃহে প্রবেশ করিয়া প্রতিদিন যেমন নিত্য নিয়মিত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, তেমনি নিযুক্ত হইলেন। দিন ঢলিয়া

যাইতে লাগিল। কিন্তু হায়! একদিনকার প্রভাত আর মসজিদ-প্রাঙ্গণে সে সুন্দর যুবার ম্লানললাটে আশীর্ব্বাদালোক বর্ষণ করিতে পাইল না। নীরব মসজিদটি একটা বেদনা-ভরে তাঁহার বিরহে রুদ্ধপ্রাণে সমস্ত দিন পড়িয়া রহিল। সমস্তদিন পরে যখন দিবসের সর্ব্বশেষ কিরণগুলি ধরণীর নিকট বিদায় গ্রহণ করিবার আয়োজন করিতেছিল, তখন মসজিদ-প্রাঙ্গণে গ্রামের কয়েকজন লোক ফকিরের সমাধি-কার্য্য শেষ করিয়া কোরানের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়াসমাধাসূচক প্রার্থনাবাণী উচ্চারণ করিতে লাগিল। ক্রমে যখন সন্ধ্যার অন্ধকার আরো ঘনীভূত হইয়া আসিল, দিবসের সর্ব্বশেষ কিরণটিও যখন মিলাইয়া যাইল, তখন ফকিরের ক্লিষ্ট আত্মাও যেন সেই প্রস্থাননিরত দিবসের শেষ কিরণটির সহচররূপে পৃথিবীকে পশ্চাতে ফেলিয়া কোন্ দূরতর আলোকের রাজ্যে প্রস্থান করিল। ব্যথিত শান্তি পাইল।

আমি মৃত ফকিরের কবরের পার্শ্বে বসিয়া এই গল্প শুনিতেছিলাম। যিনি এই গল্প আমায় বলিতেছিলেন, তিনি "স"-গ্রামের একজন পুরাতন অধিবাসী। যেমন তাঁহার গল্প বলা শেষ হইল, তখন আপনা হইতে আমার নয়ন হইতে কয়েক ফোঁটা অশ্রু সেই ক্লিষ্টপ্রাণ মৃত প্রণয়ীর সমাধির উপর পতিত হইল। আমাকে এইরূপে সেখানে অশ্রুবর্ষণ করিতে দেখিয়া সে ব্যক্তি যেন একটু তৃপ্তির সহিত বলিল যে অনেকে অনেক সময় এই সমাধির উপর ফুলমালা উপহার দিয়া যায় বটে, কিন্তু অশ্রুজলই আমার সেই ব্যথিত বন্ধুর উপযুক্ত উপহার জানিবেন। দেখুন এখানে কি লেখা রহিয়াছে। দেখিলাম কবরের একপার্শ্বে ফারসিভাষায় এই কয়টি কথা লেখা রহিয়াছে :—

"হে বন্ধু! ব্যথিতকে একবিন্দু অশ্রু উপহার দিও।"

লজ্জাবতী বসু।

দিল্লীতে পৌষমাস।

গত পৌষমাসে দিল্লীতে কেবল যে দরবার হইয়াছিল, তাহা নয়, তথায় কয়েকটি জাতীয় অনুষ্ঠানও হইয়া গিয়াছে; যেমন ক্ষত্রী-সমিতির অধিবেশন, মুসলমান-শিক্ষা-সমিতির অধিবেশন, ইত্যাদি। অবশ্য এই অনুষ্ঠান-গুলিকে অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণ অর্থে জাতীয় বলিতে হইবে; কারণ এ গুলি সাম্প্রদায়িক, ভারতীয় সকল ধর্ম্মের বা বর্ণের হিতার্থে এগুলি আরব্ধ বা অনুষ্ঠিত হয় নাই। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হওয়ায় ভারতবাসীরা একতাসূত্রে বদ্ধ হইয়া পরস্পরের সহযোগিতা করিয়া কার্য্য করিতে পারিতেছেন না। ইহাতে যে কেবল শক্তির অপচয় হইতেছে, তাহা নয়। আমাদের হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা বাড়িতেছে, সকলে মিলিয়া কাজ করিলে যে উন্নতিসাধন সম্ভবপর হইত, একা একা কাজ করায় তাহা হইতেছে না। পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা দ্বেষ এবং পরশ্রীকাতরতা বর্দ্ধিত হইতেছে। স্থলবিশেষে অপরের মন্দ করিয়া নিজের ভাল করিবার চেষ্টাও হইতেছে। উত্তর ভারতবর্ষে এইরূপ সঙ্কীর্ণতা এরূপ বাড়িয়াছে যে এখানে কায়স্থসমিতি, বৈশ্য-সমিতি, রাজপুতসমিতি, প্রভৃতি ত আছেই; ইহা অপেক্ষাও ক্ষুদ্র লক্ষ্য লইয়া অনেক সমিতি কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছেন। কায়স্থসমিতিতে সমস্ত কায়স্থ সন্তুষ্ট নহেন, আবার তদুপরি গৌড়কায়স্থসমিতি, প্রভৃতি আছে। সমুদয় ব্রাহ্মণবর্ণের হিতার্থ সমিতি গঠিত না হইয়া কাণ্যকুব্জ ব্রাহ্মণসমিতি, কাশ্মীরী ব্রাহ্মণসমিতি, প্রভৃতি গঠিত হইয়াছে। যাহাই হউক, মন্দের ভাল এই যে প্রত্যেকে "স্বীয় পারিবারিক স্বার্থসিদ্ধিসমিতি" গঠন না করিয়া অনেকে তদপেক্ষা প্রশস্ততর সমিতিতে যোগ দিতেছেন। কিন্তু আশা করি পরিণামে কেহই কথামালার উদর ও অন্যান্য অবয়বের গল্পটি ভুলিয়া যাইবেন না।

ক্ষত্রীসমিতির অধিবেশনে বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ বিজয়চন্দ্ মহতাব্ সভাপতির কার্য্য করিয়াছিলেন। ইনি শিক্ষিত ও সাহিত্যানুরাগী। ক্ষত্রীদিগের হিতার্থে যে সকল প্রস্তাব হইয়াছিল, তৎসমুদয় কার্য্যে পরিণত হইলে তাঁহাদের মঙ্গল হইবে বলিয়া আশা করা যায়।

উপরিলিখিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমিতিগুলি অপেক্ষা মুসলমান-শিক্ষাসমিতির উদ্দেশ্য প্রশস্ততর। এই শিক্ষাসমিতির লোকদের দোষ এই যে তাঁহারা স্বধর্ম্মাবলম্বিগণের শিক্ষা-কার্য্যে সমুদয় শক্তি প্রয়োগ না করিয়া অন্যান্য বিষয়ে মন্তব্য প্রকাশ করেন; কখন কখন কেবল আপনাদিগকেই



বিজয়চন্দ্ মহতাব্।

রাজভক্ত, এবং প্রকারান্তরে হিন্দুগণকে তদ্বিপরীত বলিয়া উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করিতে ভালবাসেন।

পরলোকগত সর্‌সৈয়দ আহমদ ২৬।২৭ বৎসর পূর্ব্বে মুসলমানদিগের শিক্ষোন্নতির জন্য আন্দোলন আরম্ভ করেন। তিনি স্বধর্ম্মীদিগের শিক্ষার জন্য আলিগড়-কলেজ স্থাপন করেন। এই কলেজের বিশেষত্ব দুটি। প্রথম, ইহার ছাত্রগণ অধ্যাপকদিগের তত্ত্বাবধানে কলেজেই বাস করেন, এবং তাঁহাদের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সামাজিক সংমিশ্রণের সুযোগ পান; দ্বিতীয়, ছাত্রগণ নানাবিধ পুরুষোচিত ব্যায়াম ও ক্রীড়ায় বিশেষ পারদর্শী। সর্‌ সৈয়দ আহমদের চেষ্টায় মুসলমানদের শিক্ষার অনেক সুযোগ ও উন্নতি হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার চেষ্টার কুফলও বিস্তর ফলিয়াছে। এই যে দেশে হিন্দুমুসলমানের প্রতি-যোগিতা ও বিদ্বেষভাব বাড়িতেছে, সর্‌ সৈয়দই তাহার জন্য প্রধানতঃ দায়ী। হিন্দুমুসলমান এক হইয়া রাজনৈতিক আন্দোলন করিলে যে কৃতকার্য্যতার আশা করা যাইত, সর্‌ সৈয়দের অদূরদর্শিতা ও কেবলমাত্র স্বজাতিস্বার্থপরতায় তাহা অসম্ভব হইয়াছে। কেবল তাহাই নয়, তিনি মুসল-মানদেরও অনিষ্ট করিয়াছেন। স্বাবলম্বনের মত বন্ধু আর নাই। সৈয়দ আহমদ স্বাবলম্বনের পরিবর্ত্তে মুসলমান-দিগকে অতিরিক্তমাত্রায় সরকার বাহাদুরের অনুগ্রহের ভিখারী করিয়া তুলিয়াছেন। বেশী রাজভক্তি দেখাইতে



সার্‌ সৈয়দ আহমদ।

শিখিয়া মুসলমানেরা স্পষ্টবাদিতা এবং রাজনৈতিক বিষয়ে নির্ভীক সত্যকথনের অভ্যাস লাভ করিতে পারিতেছেন না। এসকল কথা এখন কোন কোন শিক্ষিত মুসলমানও বলিতেছেন।

গত শিক্ষাসমিতিতে বোম্বাইয়ের সম্ভ্রান্ত মুসলমান দলপতি আগা খাঁ (His Highness Sir Aga Sultan Mahomed Shah K.C.I.E.) সভাপতির কার্য্য করেন। ইনি খোজা (Khoja) মুসলমানদিগের ধর্ম্মনেতা। এইজন্য ইঁহার কথার বিশেষ গুরুত্ব আছে, বলিতে হইবে। তাঁহার বক্তৃতায় এমন অনেক কথা ছিল, যাহা কেবল মুসলমানদের নয়, সকলেরই অবধানযোগ্য। তিনি বলেন, "উন্নতির অন্যান্য সুযোগের মত আমরা বাণিজ্যে এবং শিল্পে উন্নতির সুযোগও অবহেলা করিয়াছি।" তাঁহার মতে মুসলমান সম্প্রদায়ের এইরূপ ঔদাসীন্য একটি নৈতিক ব্যাধি। তিনি এই ঔদাসীন্যরূপ নৈতিক ব্যাধির কারণও নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই সকল কারণ তাঁহার মতে মুসলমানধর্ম্মের সহিত অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত নহে, আকস্মিক মাত্র। প্রমাণস্বরূপ তিনি বলেন, হিজ্‌রা অব্দের প্রথম পঁচিশ



আগা খাঁ।

বৎসরে ইস্‌লামের প্রভূত রাজনৈতিক উন্নতি হইয়াছিল; আবু বকর ও ওমারের রাজত্বকালে মুসলমানজনসাধারণের মধ্যে কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, সুনীতি, সত্যবাদিতা, ন্যায়পরতা ও বদান্যতার আদর্শ অতি উচ্চ ছিল। মক্কাজয়ের পূর্ব্বে যে সকল লোক ঐ সহরের অলস,উচ্ছৃঙ্খল সমাজে বাস করিত, কিম্বা বেদুইনদিগের মত প্রতিহিংসাপ্রণোদিত নরহত্যা বা দস্যুতায় ব্যাপৃত থাকিত, মুসলমান ধর্ম্ম সেই সকল লোককে প্রকৃত বীরপদবাচ্য করিয়া তুলিয়াছিল। তাহারা কেবল যে রণক্ষেত্রে বীরত্ব দেখাইয়াছিল তাহা নয়, সুস্থ স্বজাতিপ্রেমিক সমাজে নিত্যপ্রয়োজনীয় দৈনিক স্বার্থ-বলিদানরূপ কঠিনতর বীরত্বও তাহাদের জীবনকে মহিমান্বিত করিয়াছিল।

অতঃপর বক্তা আরও কয়েকটি ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত দিয়া দেখান যে মুসলমানধর্ম্ম মানুষকে উদাসীন ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠাবিহীন করে না। তাহার পর তিনি মুসলমানদের বর্ত্তমান ঔদাসীন্য ও নৈতিক জড়তার চারিটি কারণ নির্দ্দেশ করেন।

প্রথম কারণ। মুসলমানদিগের মধ্যে যাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা ধার্ম্মিক ও সুনীতিপরায়ণ, তাঁহারা সংসারের কার্য্য হইতে অবসৃত হইয়া নিজ নিজ আত্মার কল্যাণার্থ নমাজ, ধ্যানধারণা ও তীর্থযাত্রাদিতে কালযাপন করেন। "সর্ব্বাপেক্ষা খাঁটি ও সুনীতিপরায়ণ মুসলমানেরা অনেক সময় বলেন যে যতক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহারা স্ব স্ব শক্তি নমাজ ও তীর্থযাত্রায় নিযুক্ত করেন, ততক্ষণ তাঁহারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট কার্য্য না করিলেও, অনিষ্টকর কিছু করেন না, ইহা নিশ্চিত। এইরূপে তাঁহারা, যে জীবন স্বজাতির সেবায় উৎসর্গীকৃত হওয়া উচিত, তাহা নমাজ ও তীর্থযাত্রায় ক্ষেপণ করেন।" "হজরত মহম্মদ, এবং আবু বকর, ওমার ও আলির দৃষ্টান্ত হইতে এই সকল সাত্ত্বিক প্রকৃতির মুসলমানগণের মনে এই দৃঢ়বিশ্বাস উৎপন্ন হওয়া উচিত যে মুসলমানের প্রথম কর্ত্তব্য, কেবল নীরব প্রার্থনা না করিয়া, স্বজাতির সেবায় জীবনোৎসর্গ করা।" বৈষ্ণবের ভাষায় ইহাই, "নামে রুচি, জীবে দয়া," খৃষ্টানের ভাষায় Love the Lord thy God with all thy heart and thy neighbour as thyself, বৌদ্ধের ভাষায় মৈত্রী, ব্রাহ্মের ভাষায় তস্মিন্‌প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব।

দ্বিতীয় কারণ। "আমাদের বর্ত্তমান ঔদাসীন্যের দ্বিতীয় কারণ জেনানা ও পর্দ্দা প্রথা—(অর্থাৎ অবরোধ প্রথা) জনিত মুসলমান নারীগণের ভীষণ অবস্থা"। ["A second cause of our present apathy is the terrible position of Moslem women due to the Zenana and Pardah system"]. হিন্দুসমাজে মুসলমানসমাজের মত অবরোধপ্রথার এত বেশী কড়াকড়ি নাই। মহারাষ্ট্রীয় হিন্দুগণের মধ্যে ত মোটেই অবরোধপ্রথা নাই। কিন্তু মুসলমানসমাজে সর্ব্বত্রই অবরোধপ্রথার প্রাদুর্ভাব দৃষ্ট হয়। এ হেন মুসলমানসমাজের অন্যতম নেতা আগা খাঁ এই প্রথার মূলোচ্ছেদ করিতে পরামর্শ দিতেছেন। তিনি বলেন, "প্রায় এক হাজার বৎসর ধরিয়া এই যে ভয়ঙ্কর ব্যাধি মুসলমানসমাজের জীবনীশক্তি নষ্ট করিতেছে, মুসলমানধর্ম্মে, কোরাণে বা হিজরার প্রথম দুই শতাব্দীর দৃষ্টান্তে এমন কোথাও কিছুই নাই, যদ্দ্বারা ইহার সমর্থন করা যায়।"

তাঁহার মতে পারস্তদেশের সাসানীয় রাজাদের দৃষ্টান্ত অনুকরণ করিয়া আব্বাসবংশীয় মুসলমানরাজগণ দাম্পত্য ঈর্ষাবশে পর্দার প্রবর্ত্তন করেন। এই প্রথার ফল, অর্দ্ধেক জাতির চিরস্থায়ী বন্দিদশা এবং দাসত্বে পরিণতি। ("The permanent imprisonment and enslavement of half the nation.") তিনি জিজ্ঞাসা করিতেছেন:—"এরূপ মায়ের সন্তানদের নিকট আমরা কেমন করিয়া উন্নতির আশা করিতে পারি?" তাঁহার বিশ্বাস, এই ভীষণ ব্যাধির উচ্ছেদ সাধন করিতে হইবে; নতুবা মুসলমানজাতির নারীগণের ব্যর্থ জীবন, তাঁহাদের সকলের মানসিক শক্তির বিকাশ ও ব্যবহারের সম্পূর্ণ অভাব, ক্রমে ক্রমে মুসলমানসমাজের বিনাশের কারণ হইবে। বর্ত্তমান প্রচলিত অবরোধপ্রথা মুসলমান ধর্ম্মের অঙ্গীভূত নহে এবং হজরত মহম্মদের মৃত্যুর বহুকাল পরে ইহা প্রবর্ত্তিত হয়। কাদেসিয়া এবং য়ার্মুকের যুদ্ধে মুসলমান নারীগণ যাহা করিয়াছিলেন এবং ঐ দুই যুদ্ধের অবসানে তাঁহারা যে ভাবে আহত ব্যক্তিগণের সেবা করিয়াছিলেন, তাহা হইতে ইহাই প্রমাণ হয় যে বর্ত্তমান অবরোধপ্রথার কথা মহম্মদের সহচরগণ কল্পনাও করেন নাই।

তৃতীয় কারণ। আব্বাসবংশীয় রাজগণের দুরাকাঙ্ক্ষা, ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য বিশ্বাসঘাতকতা, প্রভৃতি তৃতীয় কারণ। এইজন্য মুসলমান ইতিহাসে জাতিদ্রোহিতা, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতি অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়।

চতুর্থ কারণ। অদৃষ্টবাদ চতুর্থ কারণ। পাশ্চাত্য জাতিগণ দুরবস্থাপ্রাপ্ত হইলে আমাদের মত কপালের দোষ দিয়া বসিয়া থাকেন না, অবস্থার উন্নতি করিতে চেষ্টা করেন। উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী, দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি। আগা খাঁ বলেন, কোরানে মানবেচ্ছার স্বাধীনতা, এবং প্রত্যেক ব্যক্তির তৎকৃত কার্য্যের জন্য দায়িত্ব শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, অদৃষ্টবাদ মুসলমানধর্ম্মের অঙ্গীভূত নয়। উপরে উদ্ধৃত শ্লোকসত্ত্বেও হিন্দুরাও ঘোর অদৃষ্টবাদী। অদৃষ্টবাদকে জাতীয় অবনতির কারণ এবং ফল উভয়ই বলা যাইতে পারে। আমরা আহমদাবাদে জাতীয় অনুষ্ঠানের বৃত্তান্তে উল্লেখ করিয়াছি যে গায়কবাড়ও অদৃষ্ট বাদকে জাতীয় হীনদশার একটি কারণ মনে করেন।

বক্তৃতার শেষ অংশে আগা খাঁ এক কোটি টাকা সংগ্রহ করিয়া আলিগড় কলেজকে মুসলমানবিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করিতে পরামর্শ দেন। এত টাকা সংগ্রহ করা যাইবে কি না, এখানে তাহার বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। আমরা সাম্প্রদায়িক বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ বা স্কুলের পক্ষপাতী নহি। জ্ঞান সম্প্রদায়ভেদে ভিন্ন ভিন্ন রকমের নহে। দুই আর দুইয়ে মুসলমানের পক্ষেও চা'র এবং হিন্দুর পক্ষেও চা'র। অধিক শীতে মুসলমানের জলও জমিয়া বরফ হয়, হিন্দুর জলও বরফ হয়। গণিতবিজ্ঞানাদির নিয়ম সকলের পক্ষেই এক। মানব মনের চিন্তার মূল নিয়মগুলিও (the primary lows of thought) সকলের পক্ষে এক। সুতরাং জ্ঞানলাভ ও সত্যান্বেষণার্থ হিন্দু মুসলমানের পৃথক পৃথক বিদ্যালয়ের প্রয়োজন নাই। নৈতিক নিয়মও সকলের পক্ষেই এক। অবশ্য ধর্ম্মবিশ্বাস, মত, ও আচারে উভয়ের মধ্যে প্রভেদ আছে। ধর্ম্মশিক্ষার স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করা দুঃসাধ্য নয়। আর বাস্তবিক বলিতে গেলে প্রকৃত ধর্ম্মশিক্ষা ও ধর্ম্মজীবন গঠন পরিবারের মধ্যেই হয়। তদ্ভিন্ন, ধর্ম্মবিষয়ে হিন্দুমুসলমান পরস্পরের নিকট অনেক শিখিতে পারেন। সংসারের কর্ম্মক্ষেত্রে কোন জাতি বা ধর্ম্মসম্প্রদায় একা একা কাজ করিতে পারেন না। সংসারে সকলকে সকলের সহিত মিশিতে হয়, সকলকে জানিতে হয়, সকলের সাহায্য বা সহানুভূতি প্রার্থী হইতে হয়, পরস্পরের দোষ সহিষ্ণু ও গুণগ্রাহী এবং উদার হইবার প্রয়োজন হয়। সুতরাং শিক্ষাও এই আদর্শের অনুযায়ী হওয়া প্রার্থনীয়। সাম্প্রদায়িক শিক্ষালয় সঙ্কীর্ণতা, ক্ষুদ্রাশয়তা, অহঙ্কার প্রভৃতি দোষ উৎপন্ন করে। তদ্ভিন্ন সকল সম্প্রদায়ের প্রতিভাশালী ছাত্রগণের সহিত প্রতিযোগিতার অভাবে এরূপ শিক্ষালয়ের ছাত্রগণের প্রতিভা ও বিদ্যাবত্তার আদর্শ যথোচিত উচ্চ হয় না। ভারতের অতীত ইতিহাসে দেখা যায় যে হিন্দু প্রভাবে মুসলমানের এবং মুসলমানের প্রভাবে হিন্দুর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখনও তদ্রূপ পরিবর্ত্তন বাঞ্ছনীয়।

মুসলমান শিক্ষাসমিতির একটি অধিবেশনে সিবিলিয়ান শ্রীযুক্ত য়ুসুফআলি একটি উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ পাঠ করেন।

তাহা হইতে কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করিয়া আমরা এই প্রবন্ধ শেষ করিতেছি।

That there are great works in Hindu literature no one will doubt who has felt the charms of that matchless drama, the *Sakuntala*, or those noble epics, the *Ramayan* and the *Maha'bharat* or that full-bodied luscious romance, rich as strong wine, the *Kadambari* of Bana. Why do not Musalman writers and students, by way of variety, study these and a hundred other Hindu works that might be named? Why do they not seek inspiration from the sublime story of Sita's love for her husband or Lakshman's exemplary devotion to his brother? Are they so perfectly acquainted with the drama that they need no guidance, that they can borrow no hints, from plays that savour of the strength of the soil, which have delighted Hindu audiences for centuries past? Think of how much courtesy and grace, how much fellow-feeling and sympathy would be imported into the relations between Hindus and Musalmans when they both learn to admire the same literature and literary ideals and to be sensitive to the same efforts for upward movements in both. Think of all the bitterness it would take away from the Urdu-Nagri controversy when both Urdu and Hindi would tend to assimilate, instead of diverging as they are doing under the present artificial stimulus of racial rivalry. But these after all are secondary considerations. The main point is that we should be cosmopolitan in our literature, and our first duty in fidelity to this idea is to incorporate Hindu literature in our literary foundations, as we have incorporated the Hindi language in our speech,—as the Christian nations of modern Europe have incorporated the so-called Heathen classics of the Greeks and the Romans in their own educational system.

একসময়ে মুসলমানগণ বিজ্ঞান ও সাহিত্যের প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। সুপরামর্শে কর্ণপাত করিলে এখনও তাঁহারা পূর্ব্ববৎ উন্নতি লাভ করিতে পারেন। ভগবানের বিধানে হিন্দুমুসলমান একদেশবাসী, একরাজার অধীন হইয়াছেন। তাঁহারা রাজনীতি, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাহিত্য, সর্ব্ববিষয়ে পরস্পরের সহযোগিতা করিলেই দেশের মঙ্গল। কেহই অন্যনিরপেক্ষ হইয়া উন্নতি করিতে পারেন না। উভয়েরই উভয়ের নিকট শিখিবার ও উভয়কে শিখাইবার অনেক জিনিস আছে। কোন বিষয়েই কোনও সম্প্রদায়ের আদর্শ নিখুঁত বা পূর্ণাঙ্গ নহে। পরস্পরের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে না আসিলে কেমন করিয়া আদর্শের প্রপুষ্টি হইতে পারে?

সুজাতা।*

(বুদ্ধের প্রতি)

কে তুমি হেথা বিজনে বসি ?
নর, কি ঋষি, দেবতা?
অঙ্গছাপি পুণ্যপ্রভা চমকে!
দীপ্ত তব বদন নব,
তপ্ত যেন সবিতা,
নিরখি নর-নয়ন সদা ঝলকে। ১

ক্লান্ত নহে কান্ততনু
করি কঠোর সাধনা;
নহ ত প্রভু তাপস তবে নহ গো!
সুপ্তিহীন নয়নে ঝরে
দীপ্তিমাখা করুণা;
ধেয়ানরত ঋষি ত তুমি নহ গো। ২

দেবতা তুমি জগত ভূমে
এসেছ প্রভু এসেছ,
ফুটাতে প্রীতি কঠোর হৃদি-শিলাতে।
হরিতে পাপ বাসনা-তাপ
এসেছ প্রভু এসেছ,
মরণ নাশি অমৃতরাশি বিলাতে। ৩

* এই কবিতা মধ্যের হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ করিয়া পড়িতে হইবে।

জগত যবে শরণ লবে
চরণে তব কাঁদিয়া,
পিপাসা ক্ষুধা মিটাতে সুধা ঢালিয়া।
বিশ্বপাতা, অন্নদাতা!
পূজিব তবে কি দিয়া?
লবে কি এহি অন্ন কৃপা করিয়া? ৪

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

বর্ত্তমান সংখ্যার চিত্র।

শাক্যসিংহ বহুবৎসর ধরিয়া চিন্তা করিয়া মানবের মুক্তির পথ আবিষ্কার করেন এবং তৎপরে বুদ্ধনামে পরিচিত হন। তিনি এই তপশ্চর্য্যার কয়েকবৎসর সেনানী নামক গ্রামের নিকট যাপন করেন। সুজাতানাম্নী সাধুশীলা নারী এই গ্রামের ভূম্যধিকারীর পত্নী ছিলেন। তাঁহার সন্তান না হওয়ায় তিনি বনদেবতার নিকট মানসিক করিয়াছিলেন যে পুত্রলাভ হইলে বনদেবতার পূজা দিবেন। কিছুদিন পরে তাঁহার একটি পুত্র ভূমিষ্ঠ হইল। শিশুটি তিনমাসের হইলে তিনি স্বহস্তে পায়স প্রস্তুত করিয়া বনদেবতাকে দিতে যাইবার আয়োজন করিলেন। নিকটবর্ত্তী অরণ্যে যে বনস্পতি দেবতাকর্ত্তৃক অধ্যুষিত বলিয়া লোকে মনে করিত, সুজাতা তাহার সম্মুখস্থ ভূমি পরিষ্কার করিতে ও তাহার কাণ্ডের চারিদিকে রক্তবর্ণ সূত্র জড়াইতে রাধানাম্নী পরিচারিকাকে প্রেরণ করিলেন। রাধা তরুতলে ধ্যাননিরত সৌম্যমূর্ত্তি বুদ্ধদেবকে দেখিয়া তাঁহাকেই বনদেবতা মনে করিয়া সুজাতার গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইল, এবং কহিল, "বনদেবতা সাক্ষাৎ তরুতলে আবির্ভূত হইয়াছেন।" তাহা শুনিয়া সুজাতা বনস্পতিসমীপে গিয়া প্রণামানন্তর বুদ্ধদেবকে ভক্তির সহিত পায়সের পাত্র অর্পণ করেন। বুদ্ধদেব বহুকাল উপবাসের পর পায়স ভক্ষণ করিয়া বল লাভ করেন। তৎপরে তাঁহার সহিত সুজাতার কথোপকথন হয়। এই সমস্ত বিস্তৃতভাবে সুললিতভাষায় এড্‌উইন আর্ণল্ডপ্রণীত লাইট অব্ এশিয়া নামক গ্রন্থের ৬ষ্ঠ সর্গে বর্ণিত আছে। এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে চিত্র আঁকিয়াছেন, আমরা তাহার প্রতিলিপি দিলাম।

পুণ্যশ্লোক ঈশ্বরচন্দ্রবিদ্যাসাগর মহাশয় প্রণীত বেতালপঞ্চবিংশতির প্রথম উপাখ্যান এইরূপে আরব্ধ হইয়াছে।

"বারাণসী নগরীতে, প্রতাপমুকুট নামে, এক প্রবলপ্রতাপ নরপতি ছিলেন। তাঁহার মহাদেবী নামে প্রেয়সী মহিষী ও বজ্রমুকুট নামে হৃদয়নন্দন নন্দন ছিল। একদিন রাজকুমার, একমাত্র অমাত্যপুত্রকে সমভিব্যাহারে লইয়া, মৃগয়ায় গমন করিলেন। তিনি নানা বনে ভ্রমণ করিয়া পরিশেষে এক নিবিড় অরণ্যে প্রবেশপূর্ব্বক, ঐ অরণ্যের মধ্যবর্ত্তী অতি মনোহর সরোবর সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন; দেখিলেন, ঐ সরোবরের নির্ম্মল সলিলে হংস, বক, চক্রবাক প্রভৃতি নানাবিধ জলচর বিহঙ্গমগণ কেলি করিতেছে; প্রফুল্ল কমলসমূহের সৌরভে চারিদিক আমোদিত হইয়া আছে; মধুকরেরা মধুগন্ধে অন্ধ হইয়া, গুন্ গুন্ ধ্বনি করত, ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছে; তীরস্থিত তরুগণ অভিনব পল্লব, ফল, কুসুমসমূহে সুশোভিত রহিয়াছে; উহাদের ছায়া অতি স্নিগ্ধ; বিশেষতঃ শীতল সুগন্ধ গন্ধবহের মন্দ মন্দ সঞ্চার দ্বারা, পরম রমণীয় হইয়া আছে; তথায় উপস্থিতি মাত্র, শ্রান্ত ও আতপক্লান্তব্যক্তির শ্রান্তি ও ক্লান্তি দূর হয়।

"এই পরম রমণীয় স্থানে, কিয়ৎক্ষণ সঞ্চরণ করিয়া, রাজকুমার অশ্ব হইতে অবতীর্ণ হইলেন, এবং সমীপবর্ত্তী বকুলবৃক্ষের স্কন্ধে অশ্ববন্ধন ও সরোবরে অবগাহনপূর্ব্বক, স্নান করিলেন; অনন্তর অনতিদূরবর্ত্তী দেবাদিদেব মহাদেবের মন্দিরে প্রবেশপূর্ব্বক, দর্শন, পূজা ও প্রণাম করিয়া, কিয়ৎক্ষণ পরে বহির্গত হইলেন। ঐ সময় মধ্যে এক রাজকন্যাও, স্বীয় সহচরীবর্গের সহিত, সরোবরের অপর পারে উপস্থিত হইয়া, স্নান ও পূজা সমাপনপূর্ব্বক বৃক্ষের ছায়ায় ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। দৈবযোগে, তাঁহার ও বজ্রমুকুটের চারিচক্ষু একত্র হইল। তদীয় নিরুপম সৌন্দর্য্য দর্শনে নৃপনন্দন মোহিত হইলেন। রাজকুমারীও বজ্রমুকুটকে নয়নগোচর করিয়া, কৃতার্থম্মন্য হইয়া, শিরঃস্থিত পদ্ম হস্তে লইলেন; অনন্তর কর্ণসংযুক্ত করিয়া, দন্তদ্বারা ছেদনপূর্ব্বক, পদতলে নিক্ষিপ্ত করিলেন;

পুনর্ব্বার গ্রহণ ও হৃদয়ে স্থাপন করিয়া, বারংবার রাজতনয়ের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিতে করিতে, স্বীয় প্রিয় বয়স্যাগণের সহিত স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন"।



শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অবনীন্দ্রবাবু এই দৃশ্যের যে ছবি আঁকিয়াছেন, তাহাও বর্ত্তমানসংখ্যায় প্রদত্ত হইল। তাঁহার অঙ্কিত মূল ছবি দুইখানি নানাবর্ণে রঞ্জিত। এইজন্য আমাদের প্রদত্ত প্রতিলিপি হইতে চিত্রদ্বয়ের সৌন্দর্য্য সম্পূর্ণ বুঝা যাইবে না। হাভেল সাহেব গত অক্টোবর মাসের ষ্টুডিওতে অবনীন্দ্রবাবুর চিত্রসমূহ সম্বন্ধে লিখিয়াছিলেন যে "অবনীন্দ্রবাবু মোগল শাসনকালের ভারতীয় চিত্রকরগণের শিল্পে নিজ প্রতিভাবিকাশের উপযোগী উপাদান পাইয়াছেন; কিন্তু তা বলিয়া তিনি বিলোপপ্রাপ্ত চিত্রাঙ্কণরীতিবিশেষের অনুকারী মাত্র নহেন।" অর্থাৎ তাঁহার প্রতিভার স্বাতন্ত্র্য আছে। হাভেল সাহেব আরও লিখিয়াছেন:—"While he is as yet far from achieving the marvellous certainty of line and the daintiness of finish found in the best Mogul work, there are a poetic charm and sentiment in the treatment of the old-world stories he delights to illustrate which are peculiarly his own" ষ্টুডিওতে প্রকাশিত ছবিগুলি দেখিয়া পাইয়োনীয়র লিখিয়াছেন:—"The reproductions given in the *Studio* of this artist's work are very fascinating. They reveal no a trace of English influence..........In their *naive* grace of line, they suggest the art of Japan; but there is no mistaking their Indian origin (*Pioneer*, January 3, 1903). আমরা ভবিষ্যতে অবনীন্দ্রবাবুর আরও চিত্র প্রকাশিত করিব।

মহাভারতের বনপর্ব্বান্তর্গত কিরাত-প্রকরণে কথিত আছে যে মহর্ষিগণ অর্জ্জুনকে উগ্র তপস্যায় প্রবৃত্ত দেখিয়া মহাদেব সমীপে গিয়া নিবেদন করেন, "তিনি যে কি অভিপ্রায়ে তপস্যা করিতেছেন, তাহা আমরা কেহই অবগত নহি। তিনি ঐ তপস্যা দ্বারা আমাদিগের সকলকে উৎকণ্ঠিত করিয়াছেন; আপনি তাঁহাকে সাধুরূপে নিবারণ করুন।" শিব তাঁহাদিগকে বিষণ্ণ হইতে নিষেধ করিয়া অর্জ্জুনের অভিলাষ জানিবার জন্য কিরাত-বেশ ধারণপূর্ব্বক সমান-বেশ ও সমান-ব্রতধারিণী পার্ব্বতীর সহিত অর্জ্জুন সন্নিধানে গমন করেন। বোম্বাইয়ের প্রসিদ্ধ ভাস্কর গণপৎ কাশীনাথ ম্হাত্রে শবরীবেশধারিণী পার্ব্বতীর মূর্ত্তি নির্ম্মাণপূর্ব্বক দিল্লীদরবারপ্রদর্শনীতে পাঠাইয়াছিলেন। এই মূর্ত্তির জন্য তিনি প্রশংসা ও পুরস্কার লাভ করিয়াছেন। এই সুন্দর মূর্ত্তিটির চিত্র আমরা প্রকাশ করিলাম। দিল্লীতে এই মূর্ত্তিটি যাঁহারা দেখিয়াছেন, তাঁহারাই একবাক্যে ইহার প্রশংসা করিয়াছেন।

শেক্‌সপীয়রের "বীনিস্‌নগরের বণিক" নাটক সুপরিজ্ঞাত। এই নাটকের দুইটিদৃশ্যের দুখানি চিত্র আমরা মুদ্রিত করিলাম। ঐশ্বর্য্যশালিনী পোর্ষিয়ার পাণি-গ্রহণার্থ নানাদেশ হইতে সম্পন্ন, অভিজাত ও রাজকুলোদ্ভব অনেক লোক আসিয়াছিলেন। তন্মধ্যে বাসানিয়ো একজন। পোর্ষিয়ার পিতা মৃত্যুর পূর্ব্বে এইরূপ আদেশ দিয়া যান যে তাঁহার পরিত্যক্ত তিনটি কৌটার মধ্যে যেটিতে পোর্ষিয়ার ছবি আছে, তাহা যিনি নির্ব্বাচন করিবেন, তিনিই পোর্ষিয়াকে বিবাহ করিতে পারিবেন। বাসানিয়ো এই কৌটাটি মনোনীত করেন। পোর্ষিয়া ও বাসানিয়ো পরস্পরকে ভাল বাসিতেন। সুতরাং বাসানিয়ো সিদ্ধকাম হওয়ায় উভয়েই আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইলেন। এখন কেবল গির্জ্জায় গিয়া বিবাহিত হইতে বাকী রহিল। কিন্তু এমন সময়ে এক



পোর্শিয়া ও বাসানিয়ো।

জি, এস্, নিউটন আর, এ, কর্ত্তৃক অঙ্কিত ছবি হইতে।

KUNTALINE PRESS.

বিষাদজনক ব্যাপার ঘটিল। বাসানিয়ো পোর্ষিয়ার প্রাসাদে আসিবার সময় সাজসজ্জার মূল্য, ভৃত্যাদির খরচ প্রভৃতি আণ্টোনিয়ো নামক বন্ধুর দ্বারা শাইলক নামক সুদখোর য়িহুদীর নিকট ধার করাইয়া আনেন। সর্ত্ত এইরূপ ছিল যে আণ্টোনিয়ো যথাসময়ে ঋণশোধ করিতে না পারিলে, শাইলক তাঁহার শরীরের যে কোন অংশ হইতে আধসের মাংস কাটিয়া লইবে। এখন খবর আসিল যে আণ্টোনিয়ো যথাসময়ে টাকা দিতে না পারায় শাইলক ঐ মাংস চাহিতেছে। চিত্রে, বাসানিয়ো চিঠিতে লিখিত এই সংবাদ পড়িতেছেন, এবং তাঁহার মুখভাবের হঠাৎ পরিবর্ত্তন দর্শনে পোর্ষিয়া উৎকণ্ঠিত হইতেছেন, এইরূপ অঙ্কিত আছে। ছবিখানি বিখ্যাত চিত্রকর জি, এস্, নিউটন আর, এ, কর্ত্তৃক অঙ্কিত।

শাইলকের জেসিকা নামে এক কন্যা ছিল। তাহার মা ছিল না, শাইলক জেসিকাকে বাড়ীর চাবি বুঝাইয়া দিয়া নিমন্ত্রণ খাইতে যাইতেছে। ঘরদ্বার বন্ধ করিয়া রাখিতে বলিতেছে। বলিতেছে, "টাকার থলিয়ার স্বপ্ন দেখিয়াছি, বোধ হয় কোন বিপদ ঘটিবে।" ইহাই দ্বিতীয় ছবিটির বিষয়। উহাও প্রসিদ্ধ চিত্রকর জি, এস্, নিউটন আর, এ, কর্ত্তৃক অঙ্কিত।

সামাজিক শক্তির ঘাত প্রতিঘাত।

দ্বিতীয় প্রস্তাব।

কোনও সমাজ মধ্যে কোনও প্রকার সামাজিক পাপ প্রবিষ্ট হওয়া যেন ইষ্টকনির্ম্মিত প্রাচীরের উপরে অশ্বত্থ বা বটবৃক্ষ বসার ন্যায়। লোকে প্রথমে সামান্য বোধে তাহাকে উপেক্ষা করে, দেখেও দেখে না; কিন্তু অবশেষে তাহা যখন শাখা প্রশাখা সমন্বিত মহাবৃক্ষে পরিণত হয়, যখন তাহার মূল বহুদূরে প্রবেশ করে এবং বহুপরিসর ভূমির উপরে ব্যাপ্ত হয়, তখন তাহাকে উৎপাটিত করা এক ব্যক্তির সাধ্যায়ত্ত থাকে না; একাধিক ব্যক্তিকে সে, কাজে নিযুক্ত হইতে হয়।

পাপ বা দুর্নীতি যখন সমাজ মধ্যে বদ্ধমূল হইয়া বহুজনের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইতে থাকে, তখন তাহা সামাজিক শক্তির আকার ধারণ করে, অর্থাৎ তখন তাহাকে বাধা দিতে গেলে বহুজনের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে হয়; এবং তাহাকে উন্মূলন করিবার জন্য সামাজিক শক্তির অর্থাৎ বহুজনের সমবেত শক্তির প্রয়োজন হয়। জনসমাজের বহুদিনের সঞ্চিত ও বহুজনের দ্বারা অনুষ্ঠিত যে কোনও পাপ বা দুর্নীতি উন্মূলিত হইয়াছে, তাহার অধিকাংশ স্থলেই সামাজিক শক্তির সমবায় দ্বারাই হইয়াছে। মানব-সমাজের চিন্তা ও ভাবের উন্নতি দ্বারা স্বাভাবিক প্রক্রিয়াতে অনেক প্রাচীন দুর্নীতি তিরোহিত হইয়াছে বটে, কিন্তু অনেক স্থলেই দেখিতে পাই উক্ত উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য ব্যক্তিগত শক্তিকে পুঞ্জীকৃত করিয়া প্রবল সামাজিক শক্তির অবতারণ করা প্রয়োজন হইয়াছে। এই যে সামাজিক শক্তি-সংঘাতের দ্বারা সামাজিক ব্যাধির প্রতিবিধান, ইহা অনেকের মতে নির্দ্দোষ প্রণালী নহে। ইহাতে মানবচিত্তে একদেশদর্শিতার ও মানব-চরিত্রে বিবাদ-পরায়ণতার সৃষ্টি করে, এবং উৎকট ও তীব্র বিদ্বেষের পরিবর্ত্তে উৎকট ও তীব্র বিদ্বেষ উৎপন্ন করিয়া অনেক মানুষকে প্রাচীন দুর্নীতিতেই সংলগ্ন রাখে। তৎপরিবর্ত্তে মানব সমাজের চিন্তা ও ভাবের উন্নতির উপরেই যদি সর্ব্ববিধ সামাজিক ব্যাধির প্রতিবিধান রাখা যায়, তাহা হইলে কালক্রমে সকল প্রকার পাপই অজ্ঞাতসারে তিরোহিত হয়, বিবাদ বিসম্বাদের প্রয়োজন হয় না।

পূর্ব্বোক্ত যুক্তির মধ্যে যে কিছু সত্য নাই, তাহা বলিতেছি না। এ কথারও প্রমাণ মানব-ইতিবৃত্তে ভূরি পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটী বিষয়ের উল্লেখ করা যাইতেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এদেশবাসী ইংরাজদিগের স্বভাব চরিত্র যে প্রকার ছিল, তাহা পাঠ করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়! ফিলিপ ফ্রান্সিস্ সুপ্রসিদ্ধ গবর্ণর জেনারেল হেষ্টিংসের মন্ত্রিসভার একজন সদস্য ছিলেন। মাদাম গ্রাণ্ড নাম্নী একটী ১৭।১৮ বর্ষীয়া বালিকাকে তাহার পতির অগোচরে বিপথে লইয়া যাওয়াকে তিনি নিন্দনীয় কার্য্য মনে করিলেন না; এবং আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে তাঁহার বন্ধুগণ এই কার্য্যে তাঁহার সহায়তা করিলেন। মাদাম গ্রাণ্ড চন্দননগরে উপনিবিষ্ট একজন ফরাসিসের এদেশীয়াগর্ভজাত কন্যা

ছিলেন। গ্রাণ্ড নামক একজন ভদ্রলোক তাঁহাকে বিবাহ করেন। মাদাম গ্রাণ্ডের বয়ঃক্রম যখন ১৭।১৮ বৎসরের অধিক হইবে না, তখন তাঁহার উপরে ফ্রান্সিসের চক্ষু পড়ে। ফ্রান্সিস্ তাঁহাকে আপনাতে আসক্ত করিবার জন্য অনেক কৌশল অবলম্বন করেন। ইহাতে গবর্ণমেণ্টের উচ্চকর্ম্মচারী কয়েকব্যক্তি তাঁহার সহায় হন। একদিন গ্রাণ্ডের অনুপস্থিতিকালে ফ্রান্সিস গ্রাণ্ডের ভবনের প্রাচীরে সিঁড়ী লাগাইয়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করেন। গ্রাণ্ডের ভৃত্যগণ জানিতে পারিয়া ফ্রান্সিসকে ধৃত করে এবং গ্রাণ্ডের নিকট সংবাদ প্রেরণ করে। গ্রাণ্ড আসিলেই দেখা গেল যে সেই সিঁড়ী দিয়া আরও কয়েকজন বড়লোক ফ্রান্সিস্‌কে উদ্ধার করিবার জন্য আসিয়াছিলেন, ভৃত্যেরা তাঁহাদিগকেও বন্ধন করিয়া রাখিয়াছে। অবশেষে এই বিষয় লইয়া তদানীন্তন সুপ্রিম কোর্টে মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। গ্রাণ্ড বিরক্ত হইয়া স্বীয় পত্নীকে পরিত্যাগ করেন। ফ্রান্সিস তাঁহাকে লইয়া চুঁচুড়াতে রাখেন। এই মাদাম গ্রাণ্ড অবশেষে ফরাসিদেশে গিয়া অনেক খেলা খেলে; নানাজনের সহিত সংযুক্ত হইয়া অবশেষে নেপলিয়নের সুপ্রসিদ্ধ মন্ত্রী ট্যালেরাণ্ডকে বিবাহ করে ও মাদাম ট্যালেরাণ্ড নামে সুপ্রসিদ্ধ হয়।

ফ্রান্সিসের ন্যায় প্রধান রাজপুরুষদিগের যে নীতি দেখা যাইতেছে, সাধারণ ইংরাজমণ্ডলীর নীতিও তদপেক্ষা অধিক উন্নত ছিল না। প্রাচীন কলিকাতার বিবরণ পড়িতে পড়িতে দেখিতে পাওয়া যায়, একবার একজন বিবাহার্থিনী ইংরাজ মহিলা কলিকাতাবাসিনী তাঁহার এক মহিলাবন্ধুর বাড়ীতে আসিলেন। এই সংবাদে বিবাহার্থী ইংরাজপুরুষগণ তাহার সহিত দেখা করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে একজনকে উক্ত নবাগতা মহিলার মহিলাবন্ধু তাঁহারই সমক্ষে একদিন জিজ্ঞাসা করিলেন—"শুনেছি তুমি নিজ বাড়ীতে ১৬ জন দেশীয় স্ত্রীলোক রাখিয়াছ। এত স্ত্রীলোক লইয়া কি করিয়া চালাও?" সে ব্যক্তি হাসিয়া বলিল,—"কিছুই মুস্কিল হয় না। তাহাদিগকে খাইতে পরিতে দি, মাসে মাসে প্রত্যেকের হাতে কিছু কিছু দি, তারা মনের সুখেই আছে।"

ইহাতে সকলেই বুঝিতে পারিতেছেন, সেকালে এদেশবাসী ইংরাজেরা কোন কোনও স্থলে নবাবদিগের অবরোধের ন্যায় নিজ নিজ অবরোধ এদেশীয় স্ত্রীলোকে পূর্ণ করিয়া রাখিতেন এবং তাহা স্বীকার করিতে লজ্জা পাইতেন না। ব্রহ্মদেশে এরূপ প্রথা সেদিন পর্য্যন্ত ছিল। গবর্ণমেণ্টকে রাজবিধির দ্বারা তাহা নিবারণ করিতে হইয়াছে।

কিন্তু ভারতযাত্রা সুগম হইয়া দলে দলে ইংরাজ মহিলাগণ যখন এদেশে আসিতে লাগিলেন, এবং ইংলণ্ডীয় সমাজের প্রভাব এদেশীয় ইংরাজ সমাজে বিস্তৃত হইতে লাগিল, তখন এদেশবাসী ইংরাজপুরুষদিগের হৃদয় মনের উন্নতি হইয়া তাঁহাদের নীতি বিশুদ্ধ হইয়া উঠিল। সকল সমাজেই দেখিতে পাই, যে নারীচরিত্রের প্রভাবেই পুরুষচরিত্র উন্নত হইয়া থাকে। ৫০।৬০ বৎসর পূর্ব্বে কর্ম্মোপলক্ষে যে সকল বাঙ্গালি উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে বা পঞ্জাবে গিয়া বাস করিয়াছিলেন, তাঁহাদের স্বভাব চরিত্র অতীব শোচনীয় ছিল। কিন্তু রেলওয়ে স্থাপিত হইয়া যাতায়াতের সুবিধা হওয়াতে অনেকে সপরিবারে গিয়া ঐ সকল স্থানে বাস করিয়াছেন, বঙ্গমহিলাদিগের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে প্রবাসবাসী বাঙ্গালিসমাজের রীতি নীতি বহুল পরিমাণে বিশুদ্ধ হইয়াছে।

অধিক দূরে যাইতে হইবে না। চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে আমরা দেখিয়াছি, গবর্ণমেণ্টের এদেশীয় কর্ম্মচারীদিগের মধ্যে অনেকেই উপপত্নীরত ও উৎকোচগ্রাহী ছিলেন। স্ত্রীলোক রাখেন নাই বা ঘুষ লন না, এরূপ কর্ম্মচারী খুঁজিয়া বাহির করিতে হইত। কিন্তু ইংরাজী শিক্ষা বহুল-প্রচার হওয়াতে, এবং ইংরাজীশিক্ষিত ব্যক্তিগণ রাজকার্য্যের সকল বিভাগে প্রবেশ করাতে, এই অখ্যাতি প্রায় বিলুপ্ত হইয়াছে।

অতএব জনসমাজের চিন্তা ও ভাবের উন্নতিসহকারে যে অনেক সামাজিক পাপ ও দুর্নীতি অন্তর্হিত হয়, তাহা নিশ্চিত। এই জন্য জনসমাজের রীতি নীতি উন্নত করিবার প্রধান উপায় সেই সমাজমধ্যে জ্ঞানালোচনার (Culture) ও ধর্ম্মশিক্ষার উপায় বিধান করা। কেবল মাত্র জ্ঞানের বিস্তৃতি ও হৃদয়ের প্রশস্ততা দ্বারা মানুষ অনেক প্রকার ক্ষুদ্রাশয়তাকে অতিক্রম করিতে পারে। ধর্ম্ম শিক্ষা সেই চরিত্রকে উন্নত ও দৃঢ় করে।

কিন্তু জনসমাজের গতিবিধি অনেকাংশে বল্‌গাবিহীন অশ্বের গতিবিধির ন্যায়। অশ্বকে বল্‌গা-বিহীন করিয়া যদি ছুটিতে দেও, তাহা হইলে সে যে তোমার অভীষ্ট পথে যাইবে, এরূপ বলিতে পার না। সে নিজের অভীষ্ট পথে যায়। তেমনি জনসমাজের মধ্যে অতি অল্প লোকেই চিন্তা করে; অতি অল্প সংখ্যক ব্যক্তি গতানুগতিকের রেখার বাহিরে যায়; অধিকাংশ লোকেই যাহা দশজনে করে, তাহাই করিয়া থাকে। সুতরাং যে পাপের আচরণ সামাজিক রীতির মধ্যে দাঁড়াইয়া যায়, তাহা দশজনের দেখা দেখি প্রত্যেকেই করিয়া থাকে। তাহাদের গতিরোধ না করিলে, তাহারা সেই আচরণেই রত থাকে।

সময়ে সময়ে মানুষকে এই চিন্তাবিহীনতা ও অনুকৃতিলব্ধ আচরণ হইতে জাগ্রত করা আবশ্যক হয়। তাহাদের হৃদয়-দ্বারে আঘাত করিয়া, স্বাভাবিক স্থিতিশীলতা হইতে তাহাদিগকে উদ্বুদ্ধ করিয়া সত্যবিশেষের প্রতি মনোনিবেশ করিতে বাধ্য করা প্রয়োজন হয়। তদ্ভিন্ন বহুদিনের সঞ্চিত সংস্কার বা পাপকে উন্মূলিত করিতে পারা যায় না। ইহাই হইল সামাজিক শক্তির ঘাত প্রতিঘাতের দ্বারা সামাজিক ব্যাধির প্রতিবিধান। এতদ্দ্বারা সমাজ মধ্যে আংশিকরূপে অনর্থ উপস্থিত হইলেও তাহা সামাজিক ব্যাধির অনিবার্য্য প্রতিক্রিয়া বলিয়া গ্রহণ করিতে হয়। দেখা গিয়াছে, এইসকল আধ্যাত্মিক বিপ্লবের দ্বারা জনসমাজের আধ্যাত্মিক বায়ু পরিষ্কৃত হয়, এবং প্রাচীন-পাপের পুনরাবৃত্তি অনেক পরিমাণে কঠিন হইয়া উঠে। ইহাও এক মহোপকার বলিতে হইবে। কিন্তু সামাজিক শক্তির দ্বারা সামাজিকব্যাধির প্রতিক্রিয়া যখন আরম্ভ হয়, তখন পুঞ্জীকৃত ব্যক্তিগত শক্তি ঘনীভূত হইয়া স্বকার্য্য সাধনে প্রবৃত্ত হয়। ইহা সামাজিক ইষ্ট সাধনের একটী প্রধান সঙ্কেত।

ইহারও ভূরি ভূরি নিদর্শন মানব-ইতিবৃত্তে পাওয়া গিয়াছে। প্রধানরূপে ইংলণ্ড ও আমেরিকার ক্রীতদাস প্রথার উন্মূলনের উল্লেখ করা যাইতে পারে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংলণ্ডে দাসত্ব প্রথার উন্মূলনের জন্য আন্দোলন উপস্থিত হয়। ঐ আন্দোলন প্রথমে গ্রানভিল শার্পের ন্যায় অতি অল্পসংখ্যক সামান্য মানুষের হৃদয়ে উত্থিত হয়। ক্রমে তাহা সহস্র সহস্র গণ্যমান্য ব্যক্তির হৃদয়ে ছড়াইয়া পড়ে। গ্রানভিল শার্প একজন সামান্য কেরাণী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার হৃদয়ে পরদুঃখকাতরতা প্রচুর পরিমাণে ছিল। প্রথমে একজন হতভাগ্য কাফ্রী ক্রীতদাসের দুর্দ্দশা দেখিয়া দাসত্ব প্রথার প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। তৎপরে এই প্রথার নৃশংসতা লক্ষ্য করিয়া ইহার উন্মূলনের জন্য তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন; এবং সেই কার্য্যে আপনার দেহমনপ্রাণ নিয়োগ করেন। অপকট মানুষের দেহমন নিয়োগের এমনি গুণ যে অল্পকাল মধ্যেই শার্পের হৃদয়ের অগ্নি শত শত হৃদয়ে ছড়াইয়া পড়ে; এবং ইংলণ্ড ব্যাপিয়া তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। সেই প্রবল সামাজিক শক্তির আঘাতে ইংলণ্ডীয় সমাজ কাঁপিয়া উঠে; এবং দাসত্বপ্রথা চিরদিনের মত ইংলণ্ডের রাজ্য হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়। যদি শার্প প্রতিবাদপরায়ণ হইয়া প্রবল সামাজিক শক্তির সৃষ্টি না করিতেন, তাহা হইলে উইলবার্ফোর্স, বক্‌ষ্টন প্রভৃতি এই আন্দোলনের রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হইতেন না, এবং ইংলণ্ডের লোকের মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইত না।

আমেরিকার দাসত্বপ্রথা তিরোহিত হওয়ার ইতিবৃত্তও এইরূপ বিস্ময়জনক। এই দাসত্বপ্রথা উন্মূলনের জন্য আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সের উত্তর ও দক্ষিণ বিভাগের মধ্যে যে সমরানল প্রজ্জ্বলিত হয়, তাহা স্মরণ করিলেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। এরূপ গৃহবিচ্ছেদ ও অন্তর্বিবাদ ইতিবৃত্তে অল্পই ঘটিয়াছে। সৌভাগ্যক্রমে লিঙ্কন তখন সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে আমেরিকার কপাল-ফলকে দাসত্বপ্রথার কলঙ্করেখা থাকিতে দিবেন না। তাই সমরানল প্রজ্জ্বলিত দেখিয়াও তিনি পশ্চাৎপদ হইলেন না। হতভাগ্য ক্রীতদাসগণকে স্বাধীন করিবার জন্য তরবারি ধরিলেন। এই যুদ্ধে উভয়পক্ষে এত মানুষ হত হইয়াছিল যে তাহাদিগের মৃতদেহ একত্র করিলে উন্নতগিরিশৃঙ্গ সমান হয়। কিন্তু এই মহাসমর ও এই সামাজিক শক্তির ভীষণ ঘাত প্রতিঘাত একদিনে ঘটে নাই। প্রথমে এই আন্দোলন উইলিয়াম লয়েড গ্যারিসন প্রভৃতি কপিতয়

সামান্য মনুষ্যের হৃদয়ে উঠে। গারিসন ছাপাখানাতে সামান্য প্রিণ্টারের কাজ করিতেন, আর ছাপাখানার টেবলের উপরে পড়িয়া পড়িয়া হতভাগ্য ক্রীতদাসদিগের কথা ভাবিতেন। তৎপরে তাঁহার হৃদয়ের অগ্নি-শত শত হৃদয়ে ছড়াইয়া পড়িল। অবশেষে তাহা মিসেস্ ষ্টৌর ন্যায় সুলেখক ও থিওডোর পার্কারের ন্যায় সুবাগ্মী ধর্ম্মাচার্য্যদিগকেও অধিকার করিল। দেখিতে দেখিতে ঐ আন্দোলন প্রচণ্ড বাত্যার ন্যায় উঠিয়া সমগ্র আমেরিকাকে আমূল কাঁপাইয়া তুলিল। তাহারই ফলস্বরূপ অন্তর্বিবাদ ঘটিয়া সমরানল প্রজ্জ্বলিত হইল। এইরূপ সামাজিক-শক্তির সংঘাত কেহ কখনও দেখে নাই। এই ঘাত প্রতিঘাতের কম্পন এখনও আমেরিকার সমাজবক্ষে রহিয়াছে, এবং এখনও ইহা স্বীয় কার্য্য সাধন করিতেছে।

কেবল যে সামাজিক অনিষ্ট নিবারণের জন্যই সামাজিক শক্তির সৃষ্টির ও প্রয়োগের প্রয়োজন তাহা নহে, সামাজিক ইষ্ট সাধনের জন্যও ব্যক্তিগত শক্তিকে পুঞ্জীকৃত করা আবশ্যক। দুই এক ব্যক্তির মনে একটা মহা সত্য জাগিতে পারে, একটা মহা আকাঙ্ক্ষার উদয় হইতে পারে; কিন্তু যদি তাহা দুই এক ব্যক্তির অন্তরেই আবদ্ধ থাকে, তাহা হইলে তাহাদের অন্তর্দ্ধানের সঙ্গে সঙ্গে তাহা জনসমাজ হইতে অন্তর্হিত হইয়া যায়। এই কারণে ব্যক্তিবিশেষের হৃদয়-নিহিত মহা ভাব বা আকাঙ্ক্ষাকে সামাজিক শক্তিরূপে পরিণত করিয়া মূর্ত্তিধারণ করান আবশ্যক। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় যদি তাঁহার হৃদয়স্থিত মহা ধর্ম্মভাবকে একটা সমবিশ্বাসী মণ্ডলীর মধ্যে নিহিত করিয়া সামাজিক শক্তিরূপে পরিণত না করিতেন, তাহা হইলে কি আজ ব্রাহ্মসমাজকে ভারতের সংস্কার-ক্ষেত্রে দেখিতে পাইতাম? জন ওয়েসলি যদি তাঁহার সাধনালব্ধ ধর্ম্মভাবকে সামাজিক শক্তির আকারে পরিণত না করিতেন, তাহা হইলে কি মেথডিষ্ট সম্প্রদায়ের অদ্ভুত ধর্ম্মোৎসাহ ও সদনুষ্ঠানপ্রবৃত্তি দেখিতে পাইতাম? জন হেনরি নিউম্যান প্রভৃথ কতিপয় ধর্ম্মভাব-সম্পন্ন অক্‌সফোর্ডবাসী যুবক নবধর্ম্মভাবের অবতারণা করিয়া যদি আপনাদের হৃদয়স্থিত ভাবকে প্রবল সামাজিক শক্তিরূপে পরিণত না করিতেন, তাহা হইলে কি আজ হাইচার্চ দলের এত প্রভাব লক্ষিত হইত?

পূর্ব্বোক্ত যুক্তিপরম্পরা হইতে ভাবী উন্নতি ও কল্যাণের পক্ষে এই এক মহোপদেশ লাভ করা যাইতেছে যে যাহাদের অন্তরে কোনও উচ্চ ভাব বা মহৎ আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছে, তাঁহারা যেন তাহাকে নির্জ্জনে ভোগ করিবার সম্পত্তি না ভাবিয়া দশ হৃদয়ে ব্যাপ্ত করিয়া সামাজিক শক্তির আকারে পরিণত করিবার চেষ্টা করেন। ভাল কাজের অভাব নাই, দেশের দুঃখদুর্গতিরও অন্ত নাই। যদি কোথাও দেশের দুর্গতি দূর করিবার জন্য শত সহস্র দেশহিতৈষী ব্যক্তির সমবায় ও অবিশ্রান্ত চেষ্টার প্রয়োজন থাকে, তাহা এই ভারতক্ষেত্রে। কিন্তু আমরা আপনাকে ভুলিতে পারি না, অকপটে মহা সংকল্পে আত্মসমর্পণ করিতে পারি না বলিয়াই অপর হৃদয়কে উদ্দীপ্ত করিতে পারি না। সেই জন্যই এক হৃদয়ের অগ্নি দশ হৃদয়ে ছড়াইয়া পড়ে না। সেই জন্যই কোনও মহা কার্য্য সাধনের জন্য প্রবল সামাজিক শক্তির সৃষ্টি করিয়া তুলিতে পারি না। সেই জন্যই এদেশের এই দুরবস্থা।

ব্রহ্ম-প্রবাসে।

মাঝেতে গভীর সিন্ধু কল্লোলিয়া চলে
এক পারে তুমি তার অন্যপারে আমি;
তবুও মনের গতি দূরত্বে কি রোধে?
প্রিয়জন করে দেখা হৃদয়মন্দিরে।
আমি এই ব্রহ্মদেশে দূর সিন্ধু পারে
ভাসমান কালস্রোতে মানব-বুদ্বুদ!
দিবসান্তে একদিন বসি' সন্ধ্যারাতে
হেরিতেছি নগরীর শোভা; হাসিতেছে
পূর্ণিমার চাঁদ; তরল কিরণ-স্নেহে
চুমিতেছে ধরণীর প্রফুল্ল আনন।
পথে চলিয়াছে যত ব্রহ্মের রমণী
সুন্দর সুঠাম কায়া, সুবেশে ভূষিতা,
স্বর্ণগিরি প্যাগোডার সুবর্ণ মন্দিরে,
ধ্যানমগ্ন বুদ্ধদেবে পুষ্পাঞ্জলি দানে।

অদূরে শোভিছে হোথা ইরাবতী-তীরে
ব্রহ্মরাজধানী ঐ মাণ্ডালা নগরী,
অপরূপ রাজপুরী দুর্গ অভ্যন্তরে,
শত শত রম্য হর্ম্ম্য কাষ্ঠ বিনির্ম্মিত
সুমণ্ডিত কলেবর মণি ও কাঞ্চণে।
ব্রহ্মের সে আধিপত্য শাসন ভীষণ,
সম্মান, সম্পদ, দণ্ড, রাজসিংহাসন,
চির স্বাধীনতা ধন নয়নের মণি,
এইস্থানে হারায়েছে মাতা ব্রহ্মভূমি।
জ্যোৎস্নাপ্লাবিত কায়া ধায় ইরাবতী
উছলি পুলকভরে অম্বুনিধি মুখে;
পার্শ্বে শোভে অভ্রভেদী উচ্চ শৈলরাজি
দীর্ঘ তরুরাজি কত বক্ষেতে ধরিয়া;
বিবিধ কুসুম রাশি স্তবকে স্তবকে
ফুটিছে অচল গাত্রে, মন্দ সমীরণ
"অহিংসা পরমধর্ম্ম" করিছে ঘোষণা।
ধীরে ধীরে জনস্রোত হতেছে বিলীন
সুবিস্তীর্ণ রাজপথে আসিতেছে কানে
বিদেশী-পথিককণ্ঠ-সঙ্গীতলহরী
রজনীর মৃদুকণ্ঠ পবনহিল্লোলে।
সুষুপ্তির পূর্ব্বরাগ নগরীর মুখে
ভাসিছে কোমল স্নিগ্ধ মধুর আভায়।
আমি এই সব শোভা দৃশ্যাবলী মাঝে
সুদীর্ঘ রজনী ব্যাপি রহিনু বসিয়া,
জীবনের কত কথা ভাবিতে ভাবিতে।
কত রাগ অনুরাগ, কত সুখ দুঃখ,
ধরণীতে এতদিন সঙ্গী যাহাদের
তাহাদের কত কথা, স্নেহ প্রীতি স্মৃতি
মানস বীণার তন্ত্রী ধ্বনিল মধুরে!
এই সুখ দুঃখ মাঝে ভাসায়ে জীবন
নাহি জানি চলেছি কোথায়? নাহি জানি
কোথায় ভিড়িবে তরি—কোথা তার শেষ?
হায় এই মানব জীবন বিধাতার
সৃষ্টির চরম! অবরুদ্ধ আঁধারের
বুকে, বায়ুস্তরে ঢাকা ধরণীর সম!
আছে কি আলোক এই আঁধারের পারে?
যুগান্তর হ'তে যে সেতু বাঁধিছে সুধী,
জীবনের পরলোক দেখাতে মানবে
জ্ঞান-ভক্তি-কর্ম্ম উপাদানে রচি, হায়
তাহাওত সীমাবদ্ধ শক্তির প্রয়াস,
কল্পনার মোহজালে সজ্জিত সুন্দর!
জানিনা জানিনা আমি কোথা আছ তুমি,
হে অজ্ঞাত, হে অনন্ত, অচিন্ত্য রহস্য!
ধারণা করিতে তোমা শক্তি নাহি মম;
লীলাময় তুমি, না জানি কি খেলা প্রভু
খেলিছ, বিরলে বসি শিশুটীর মত
আপনাতে আপনি ভুলিয়া! কি কারণে
এ মহা অপূর্ব্ব সৃষ্টি রচনা তোমার!
অনন্ত কালের সিন্ধু কল্লোলিয়া চলে
পুরোভাগে; আমরা বসিয়া তার কূলে
করিতেছি খেলা, বিজ্ঞানদর্পিত শিশু
বাহুবলে জ্ঞানহীন। ভাঙ্গিতেছি কত
পুরাতন কথা, রচিতেছি বালুকার
স্তরে নবীন কাহিনী কত! ধর্ম্মাধর্ম্ম
মনোমত করিতেছি কতই সৃজন!

* * * *

সিন্ধু পরপারে ওই শোভে বঙ্গদেশ,
চিরপ্রিয় জন্মভূমি সুজলা সুফলা,
আবৃত সুতনু যার স্বর্ণশস্যাঞ্চলে।
কনক কিরীট শিরে অভ্রভেদী গিরি
হিমালয়, হৃদিমাঝে সুরধুনী হার,
মুখর মঞ্জীররূপে কল্লোলিছে সিন্ধু
চরণেতে। চিরপ্রিয় স্বদেশ আমার!
ভাসে মনোনেত্রে তোমার মুরতি আজি
কতদিন দেখি নাহি যাহা। হেরিতেছি
গিরি নদী দ্রুমরাজি তড়াগ প্রান্তর
মন্দির নগর পল্লী, স্বদেশ আমার।
বিমল গঙ্গার জল উথলিছে প্রাণে
আত্মীয় বান্ধব স্মৃতি করিছে আকুল।
যে স্নেহবন্ধনে মাগো! বাঁধিয়াছ তুমি,

পারি কি ভুলিতে তাহা জীবন থাকিতে ?
যদিও জননী আমি অবসন্ন মনে
জীবিকার অন্বেষণে এসেছি এবাসে,
তবুও তবুও তুমি জন্মভূমি মম
স্বর্গাদপি গরীয়সী ! ও চরণে যেন
শত ডোরে বাঁধা থাকে হৃদয় আমার,
কায়মন মিশে থাকে তোমার রেণুতে।
হাস মা দীনের প্রতি সুপ্রসন্ন হাসি
একবার, ওই দেখ হাসিতেছে উষা
রাজলক্ষ্মীরূপে। তনয়ের অভিলাষ
পুরাও জননী ; এই সাধে নিবেদিনু
তপ্ত হৃদয়ের এই রক্ত অশ্রুধারা !
কেন এ দুঃখের গান এ সুখ নিশীথে ?
হাসে আমোদিনী মহী জলে স্থলে কিবা !
শারদ উৎসবে মত্ত স্বদেশ আমার
ধরারাণী সাজিয়াছে সুন্দর বসনে
রূপে দিক্ আলো ক'রে ; নরনারী প্রাণে
আনন্দ উৎসাহধারা বহিছে হিল্লোলে !
প্রবাসে দৈবের বশে নির্ব্বাসিত আমি
সেই সুখ মনে আনি, ভাবিতেছি আজ
অতীতের কত শত মধুর কাহিনী,
তোমাদের প্রীতিভরা মুখ, স্নেহবাণী।
প্রবাসীরে মনে কোর এ সুখের দিনে
যবে আলিঙ্গিবে পরস্পরে ; ক'রো মনে
আর সেও তোমাদের ভাবিছে প্রবাসে
কবে তোমাদের পুনঃ সম্ভাষিবে হেসে।

শ্রীগিরীন্দ্রনাথ সরকার, ব্রহ্মদেশ।

মুক্তি।

নিরজন তটিনীর তীরে
উচ্চশৃঙ্গ শৈলপাদমূলে
বাঁধি এক পরণকুটীর
রহিয়াছি—এ সংসার ভুলে ;

রোপিয়াছি শত ফুলতরু
বিজন কুটীর চারিধারে,
সম্মুখেতে অতিমুক্তলতা
উঠিয়াছে বেড়ি সহকারে।

উষারাগরঞ্জিত প্রভাতে
কুসুমবাসিত সন্ধ্যাবায়
কাননের মধু-কণ্ঠ পাখী
ধীরে গান শুনাইয়া যায় ;

জ্যোছনা প্লাবিত রজনীতে
তটিনীর মৃদু-কলস্বরে
কণ্ঠ মিশাইয়া গাহে পিক
ঝঙ্কারে ঝঙ্কারে সুধা ঝরে ;

ধীরে বায়ু ঘুমাইয়া পড়ে
লতাকুঞ্জে—কুসুম শয্যায়,
ধীরে ধীরে হৃদয়ে আমার
জাগিয়া উঠয়ে "হায়, হায়" ;

কি এক উদাসভরা ভাব,
কি এক আকুলকরা তান,
উচ্চাটক প্রাণ উন্মাদক
কি এক বিষাদমাখা গান,

হৃদয়ের কোন নিরজনে
অজ্ঞাত বাসনারাশি লয়ে
মুক্ত সৌন্দর্য্যের মাঝখানে
ব্যথা লয়ে উঠয়ে জাগিয়ে।

ছিঁড়ে এনু সহস্র বন্ধন
আশা করি মুক্তি লভিবার,
লভিনু কি এই মুক্তি শেষে
প্রাণে ল'য়ে দীপ্ত হাহাকার !

---

* এই কবিতা শারদীয় উৎসবের পূর্ব্বে লিখিত হয়।

বন্ধন ছিঁড়িতে চাই আমি,
প্রাণ চায় পরিতে বন্ধন,
আমি চাই মুছিবারে স্মৃতি,
স্মৃতি ল'য়ে করে সে ক্রন্দন।

কি ভাল বুঝিতে নাহি চাই
হৃদিহীন মুক্তি কি বন্ধন ;
মনে পড়ে শুধু শৈশবের
প্রীতিস্নিগ্ধ পল্লী সুশোভন।

চারিদিকে ভাইবন্ধুদের
ফিরে দাও স্নেহের বন্ধন ;
ক্ষুদ্রনর বাঁধনের মাঝে
খেটে যাব নরের কারণ।

শ্রীসত্যকিঙ্কর সাহানা।

নিবেদন।

আমার অযুত বাসনা বিলাস,
শত সুখ, আশা, প্রিয়তম !
রহুক্ তোমার চরণে মিশায়ে
দীন এ ধরার ধূলিসম ;
তোমার অমর প্রেমরবি-রাগে
শিরায় শিরায় যেন প্রীতিজাগে
তোমার হিয়ার প্রান্ত প্রদেশে,
বিন্দু আবাস রহে মম,
আমার সকল রহুক্ মিশায়ে
চরণে তোমার প্রিয়তম !
তোমার শুভ্র শরত-চাঁদের
কিরণ-কণিকা দিও দিও,
নীহার-শীতল পরশে তোমার
বেদনা মুছিয়া নিও নিও ;
হে পূর্ণ ! মম তনুতে তনুতে
তন্ত্রীর প্রতি অণুতে অণুতে
আমার বুকের তমাল-লতায়
ফুল হ'য়ে ফুট' মনোরম ;—
ব্যাকুল হিয়ার নিবেদন মোর
ভালবেসে ল'য়ো প্রিয়তম !

শ্রীগিরিজাকুমার বসু।

কাচপোকা।

কুমীরা পোকার বিষয় প্রসঙ্গে আমরা কাচপোকার উল্লেখ করিয়াছিলাম। অদ্য কাচপোকার কার্য্যাবলী পর্য্যবেক্ষণের সামান্য ফল পাঠকবর্গকে উপহার দিতে আসিয়াছি। পূর্ব্বেই আমরা বলিয়াছি যে এইরূপ পর্য্যবেক্ষণে যেরূপ পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান আবশ্যক, নানাকারণে সম্পূর্ণ ইচ্ছা সত্ত্বেও তাহা ঘটিয়া উঠে না। তথাপি যতটুকু জানিতে পারি, সেই ফলই সাধারণ্যে প্রকাশিত করিলে অস্মদপেক্ষা যোগ্যতর ব্যক্তির দ্বারা অন্ততঃ ভ্রম প্রমাদাদিরও অপনোদন হইতে পারে ; এবং আরও নানারূপে এ বিষয়ে সাধারণের একটু মনোযোগ আকৃষ্ট হইতে পারে, এই আশাতেই আমাদের এই উদ্যোগ।

প্রাণিতত্ত্বের আলোচনায় আমাদের দেশীয় জনসাধারণের কথা দূরে থাকুক, শিক্ষিতগণেরও অনেকেরই অনুরাগ মাত্রও দেখা যায় না। রীতিমতভাবে প্রাণিতত্ত্ব আলোচনা করা অবশ্য সহজ সাধ্য নহে, তাহাতে রীতিমত গবেষণা, পরিশ্রম, অধ্যয়ন ইত্যাদি বিশেষরূপেই আবশ্যক। সে কথা ছাড়িয়া দিলেও ইতর প্রাণিগণের কার্য্যাবলী পর্য্যালোচনাতেও যে অনেক প্রকার জ্ঞান লাভ করা যায় একথা অনেকে স্বপ্নেও মনে করেন না ; এবং যে সময়টা এইরূপ বৃথা (?) পর্য্যবেক্ষণে অপব্যয় করিলে সে সময়টা সুকোমল শয্যায় শয়ান হইয়া উপাধানাবলম্বনে কাটাইয়া দেওয়া অধিকতর লাভজনক বলিয়া বোধ করেন। বলিতে কি যাঁহাদের এইরূপ পর্য্যবেক্ষণের "বাতিক" (!) আছে, তাঁহাদিগকে অনেক সময় তাঁহাদের শিক্ষিত বন্ধুগণের উপহাসাস্পদও হইতে হয়, একথা আমরা স্বীয় অভিজ্ঞতা হইতেই বলিতেছি। সময় সময় বন্ধুগণ ঐ সমস্ত বাতিকগ্রস্তগণকে উপহাস দ্বারা সংবর্দ্ধিত করাই যথেষ্ট মনে করেন না, তাঁহাদিগকে "উনপঞ্চাশ" উপনাম প্রদানেও স্বীয় উদারতা প্রকাশ করিয়া থাকেন।

যাহা হউক প্রাণিতত্ত্বালোচনা যদি এরূপ উপহাসের বিষয় হইত, তাহা হইলে পাশ্চাত্য মনীষিবর্গের অনেকে এতদালোচনায় স্বীয় অমূল্য জীবন ক্ষেপণ করিতেন না এবং তজ্জন্য অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিতে প্রস্তুত হইতেন না। এই সমস্ত বিষয় পরিদর্শনে যে নির্ম্মল আমোদ এবং সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানানন্দ উপভোগ করা যায় তাহা পরচর্চ্চা, কুৎসিত আমোদ এবং গল্প অপেক্ষা শতগুণে শ্রেষ্ঠ। এতদালোচনায় অপূর্ব্ব কৌশলী সেই অনন্ত শিল্পীর বিস্ময়কর চাতুর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হইতে হয়, বৃথা আত্মাভিমান খর্ব্ব হয়, ভগবানের প্রতি ভক্তির উন্মেষ হয়, আর সাংসারিক বহুবিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভেরও সাহায্য হয়।

আমরা ভরসা করি আমাদের দেশীয় শিক্ষিত ভ্রাতৃগণ এ বিষয়ে একটু মনোযোগ দিবেন, এবং তাঁহাদের মূল্যবান্ সময়ের কিয়দংশ এই আলোচনায় ব্যয় করিয়া দেখিবেন তাঁহারা ইহাতে আমোদ উপভোগ করিতে পারেন কি না এবং এতদ্দ্বারা জীবনের নৈতিক উন্নতির সাহায্য হয় কি না।

কাচপোকার বিষয় সামান্য দুইচারি কথা বলিতে আসিয়া বেশী উপক্রমণিকা করা আমাদের ভাল দেখায় না। তবে বড় মনঃকষ্টেই এই কথাগুলি নিবেদন করিতে হইল।

আমরা যাহাকে কাচপোকা বলিতেছি অথবা আমরা যাহাকে কাচপোকা বলিয়া জানি, সকলদেশেই তাহাকে কাচপোকা বলে কি না, তাহা আমরা অবগত নহি, এজন্য কাচপোকার আকৃতির পরিচয় প্রদান করা যেন আবশ্যক বলিয়া বোধ করিতেছি।

কাচপোকাকে আমাদের অভিজ্ঞতায় কুমীরাপোকার স্বজাতীয় বলিয়াই বোধ হয়। কুমীরাপোকাও আমরা তিন চারি প্রকারের দেখিয়াছি; তাহাদের এক প্রকারের বিষয় আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। অন্য দুই তিন প্রকারের পোকাও আমরা দেখিয়াছি কিন্তু তাহাদের আকৃতিগত কিঞ্চিৎ বৈসাদৃশ্য বা বিশেষত্ব ব্যতীত আমরা আর কোন বিভিন্নতা দেখিতে পাই নাই। আমরা যে প্রকার কুমীরাপোকার কথা বলিয়াছি, তদপেক্ষা ঈষৎ খর্ব্বকায় এক প্রকারের পতঙ্গ আছে; তাহাদের গায়ের রং পূর্ব্ববর্ণিত পোকার ন্যায়, তবে পক্ষপুট এবং মস্তক চকচকে কাল। পক্ষদ্বয়ও অপেক্ষাকৃত খর্ব্ব, আর উত্তমাঙ্গ এবং অধমাঙ্গের সংযোগস্থান কুমীরাপোকার মত অতটা লম্বা এবং সরু নহে। গরুর গায় যে এক প্রকার বড় বড় মক্ষিকা (দংশ বা ডাঁশ) বসিয়া তাহাদিগকে বিরক্ত করে, এই মক্ষিকাগুলির আকৃতি কতকটা সেইরূপ। ইহাদের পদের সংখ্যা ছয়খানিই, তবে তাহাও অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র। ইহাদের বাসাও একই প্রণালীতেই নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

অন্য আর এক প্রকারের কুমীরাপোকার আকৃতি কিছু সরু, দৈর্ঘ্যে কুমীরাপোকা অপেক্ষা কিছু ছোট, আর ইহাদের রং ফিকে কাল, শুঁড়টি একটু বেশী লম্বা; ইহাদের বাসা ছোট ছোট আকারের হইয়া থাকে, এবং তাহা কতকটা দরজির আংঙ্স্ত্রার (অঙ্গুলীত্রাণ) মত।

আমাদের কাচপোকাও এই জাতীয় মক্ষিকাপর্য্যায়ভুক্ত বটে, তবে ইহার শাখা একটু বিভিন্ন এই যা প্রভেদ। কাচপোকাগুলি বোধ হয় লম্বায় এক ইঞ্চির অধিক হইবে না, ইহাদের দেহও মোটা নহে সুতরাং দেখিতে ইহাদিগকে অতি ক্ষীণজীবী বলিয়াই বোধ হয়। ইহাদের মুখ এবং পদের গঠন সর্ব্বাংশেই প্রায় কুমীরাপোকার মত; বাহ্যতঃ দেখিয়া যেরূপ এবং যতখানি অনুমান করিতে পারা যায় আমরা তাহার উপর নির্ভর করিয়াই বলিতেছি, আণুবীক্ষণিক পরীক্ষার সুবিধা আমাদের ঘটে নাই। ইহাদের গায়ের রং কুমীরাপোকার রং হইতে সম্পূর্ণ পৃথক। চাকচিক্যময় চিক্কণ হরিদাভাযুক্ত পক্ষপুট এবং অনির্ব্বচনীয় হরিদ্বর্ণ দেহচ্ছটায় ইহাদিগকে দেখিতে বড়ই সুন্দর বোধ হয়। মস্তকের রংএ সবুজের সঙ্গে ঈষৎ কৃষ্ণাভা আছে। ইহাদের দেহের অন্যান্য আকৃতির সহিত কুমীরাপোকার আকৃতির বিশেষ সাদৃশ্য আছে। উত্তমাঙ্গ এবং অধমাঙ্গের সংযোগপ্রণালীও পূর্ব্ববর্ণিত কুমীরাপোকার ন্যায়। ইহাদের দৈহিক চাকচিক্যটিই ইহাদের একটা প্রধান বিশেষত্ব এবং সে শোভা যেন বিশেষরূপ নয়নরঞ্জিনী এবং ভগবানের কারু কৌশলের পরিচায়িকা। কুমীরাপোকারও একটা চাকচিক্য আছে বটে কিন্তু তাহা এতাদৃশ উজ্জ্বল এবং নয়নাকর্ষক নহে। হরিদ্বর্ণও এইরূপ ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধির একটি কারণ বলিয়া আমাদের মনে হয়। কারণ সাধারণতঃ অন্য বর্ণ অপেক্ষা



শাইলক ও জেসিকা।

জি, এস্, নিউটন আর, এ, কর্ত্তৃক অঙ্কিত ছবি হইতে।

UNIALINE PRESS.

হরিদ্বর্ণ অধিক মৃদু এবং অধিক নয়নরঞ্জন; অধিকক্ষণ ইহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকিলেও যেন কোন নেত্র-পীড়া উপস্থিত হয় না। এই জন্যই বোধ হয় ভগবান্ তাঁহার উদ্ভিদ্‌রাজ্যে এই হরিদ্ বর্ণের আধিক্য করিয়া দিয়াছেন। কাচের ন্যায় চাকৃচিক্যসম্পন্ন দেহ বলিয়াই বোধ হয় ইহাদের কাচপোকা নাম হইয়াছে।

ইহাদের বাসা নির্ম্মাণের কৌশলও কুমীরাপোকার ন্যায়। তবে কাচপোকার বাসার আকৃতি কুমীরাপোকার বাসার আকৃতি হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন এবং তাহা কুমীরার বাসা অপেক্ষা অধিক শিল্পনৈপুণ্যের পরিচায়ক।

কাচপোকাও কুমীরাপোকার ন্যায় মৃত্তিকা দ্বারাই বাসা নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। ইহাদের বাসার নির্ম্মাণ প্রণালীও কুমীরাপোকার ন্যায়। তবে কুমীরাপোকা যেমন প্রায়ই সমতলের সহিত সংলগ্ন আর একটু উচ্চস্থান-যুক্ত ক্ষেত্রই বাসার জন্য নির্ব্বাচন করিয়া থাকে, কাচ-পোকা সেরূপ করে না। ইহারা সম্পূর্ণ সমতল ক্ষেত্রেই প্রায় বাসা নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। দেয়ালের গায়, বাক্স কি সিন্দুকের পার্শ্বে কি এইরূপ সবস্থানেই ইহারা বাসা নির্ম্মাণ করে। কুমীরাপোকাও যে একেবারে সমতল স্থানে বাসা নির্ম্মাণ করে না তাহা নহে, তবে আমাদের বোধ হয় যে একান্ত অভাবপক্ষেই তাহারা সমতল আশ্রয় করিয়া থাকে। এজন্য প্রায়শঃই এরূপ স্থলে তাহা-দের বাসা দেখা যায় না। আমরা এ পর্য্যন্ত এইরূপ একটি মাত্র বাসা দেখিয়াছি।

বসন্তকালই কাচপোকার বাসা নির্ম্মাণ সময়। ফাল্গু-নের শেষ ও চৈত্রেই ইহাদের বাসা নির্ম্মাণের ধুম পড়িয়া যায়। বলা বাহুল্য ইহারা কেবল ডিম্ব প্রসবের সময় বাসা নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। কীট, পতঙ্গ ও ইতর জাতীয় অনেক জন্তুই এই নিয়মের অনুবর্ত্তী।

কাচপোকাও কুমীরার ন্যায় আর্দ্র মৃত্তিকা মুখ ও পদ সাহায্যে বহন করিয়া আনিয়া দেয়ালের উপর ক্রমশঃ স্থাপনপূর্ব্বক বাসা নির্ম্মাণ করিতে থাকে। কিন্তু কুমীরা যেমন করিয়া একটা মাটির স্তূপ মত প্রস্তুত করিয়া মধ্যে একটি মাত্র ছিদ্র রাখে, ইহারা তাহা করে না। কুমীরা-পোকার কার্য্য দৃষ্টে বোধ হয় যে তাহারা যেন একই বাসায় একাধিক ডিম্ব প্রসব করে না, প্রত্যেক ডিম্বের জন্য স্বতন্ত্র বাসা নির্ম্মাণ করে। আমরা ইহাদের প্রত্যেক বাসায় একটি মাত্র ডিম্ব ও একটি মাত্র পতঙ্গই দেখিয়াছি। কিন্তু কাচপোকার একটি বাসায় অনেকগুলি প্রকোষ্ঠ থাকে; এই সব প্রকোষ্ঠের প্রত্যেকটিতে তাহারা একটি করিয়া ডিম্ব স্থাপন করে। প্রকোষ্ঠগুলি সাধারণতঃ এক ইঞ্চি পরিমাণ দীর্ঘ হয় এবং ইহাদের মধ্যস্থ ছিদ্র পথে আমাদের কনিষ্ঠাঙ্গুলীর অগ্রভাগও প্রবিষ্ট হয় না; শিশুগণের কনিষ্ঠাঙ্গুলী বোধ হয় প্রবেশ করিতে পারে। আমরা যে লেখনী সাহায্যে এই প্রবন্ধ লিখিতেছি তাহার হ্যাণ্ডেলটির অগ্রভাগ ঠিক ঐ সব প্রকোষ্ঠে প্রবেশ করান যায়, সুতরাং তাহাদের আভ্যন্তরীণ আয়তন এইরূপই হইবে। প্রকোষ্ঠগুলির আকৃতি ঠিক অতি ক্ষুদ্রীকৃত পিপার ন্যায় বা ছেলেদের খেলিবার ঢোলের লিলিপুটিয়ান সংস্করণের ন্যায়। একটি বাসায় পাঁচ, সাত, দশ, বার বা ততোধিক প্রকোষ্ঠও দেখা যায়; আমরা পনর, যোল, কি আঠার প্রকোষ্ঠযুক্ত বাসাও দেখিয়াছি। তবে সাধারণতঃ দশ বারটা প্রকোষ্ঠ যুক্ত বাসাই দেখা যায়।

ইহাদের বাসার আকৃতি বুঝিতে হইলে কল্পনা সাহায্যে উক্তরূপ লিলিপুটিয়ান ঢোল ৫।৭টি একসারি সজ্জিত করিয়া তাহাদের উপর আর একথাক, তদুপরি আর একথাক সাজাইয়া দিলেই বুঝা যাইবে। এই সব প্রকোষ্ঠ মাটির দ্বারা পরস্পর দৃঢ় সংযুক্ত থাকে।

ইহাদের বাসার এই সব প্রকোষ্ঠ বেশ পালিশ করা এবং দেখিতে অতি সুদৃশ্য। বাসার প্রকোষ্ঠগুলি সব নির্ম্মাণ শেষ হইলে কাচপোকা ইহার উপর চারিদিকে ভ্রমণ করিয়া একবার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া লয় এবং কোন স্থানে কোন অভাব কি অসম্পূর্ণতা লক্ষিত হইলে তাহা সংশোধন বা পরিপূরণ করে। তারপর ডিম্বপ্রসবের সময় উপস্থিত হয়। তখন তাহারা জীবদেহ অন্বেষণে ব্যাপৃত থাকে। এই পোকার যতগুলি বাসা আমরা দেখিয়াছি, তাহার সকলগুলিতেই একই প্রকারের জীবদেহ দেখিতে পাইয়াছি। ইহাদের ডিম্ব মাকড়সার দেহে পরিপুষ্ট হয়। সাধারণতঃ যে ছোট ছোট কাল কাল দেহের উপর কিঞ্চিৎ সবুজ চাকচিক্যযুক্ত মাকড়সা দেয়াল প্রভৃতির কোণে

জাল বিস্তার করিয়া থাকিতে দেখা যায়, সেই সব মাকড়সাই কাচপোকার বংশের পরিপোষণে দধীচিরন্যায় স্বীয় দেহ অর্পণ করিয়া থাকে। তবে প্রভেদ এই যে দধীচি স্বেচ্ছায় মলবাহী শরীর পরার্থে উৎসর্জ্জন করিয়াছিলেন, আর এই সব মাকড়সা কাচপোকার প্রতাপে বাধ্য হইয়া স্বদেহ বিসর্জ্জন করে। এই ক্ষুদ্র কাচপোকা স্বদেহাপেক্ষাও অধিক গুরুভার এই সব মাকড়সাকে কেমন কৌশলে আক্রমণ করিয়া, আয়ত্ত করে তাহা একটা দেখিবার বিষয় বটে। ইহাদের কোনও ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা আছে, তদ্দ্বারা ইহারা মাকড়সাগুলিকে এরূপ অভিভূত করিয়া ফেলে যে তাহারা আর পলায়নদ্বারা আত্মরক্ষা করিতে পারে না, স্বেচ্ছায় যেন তাহারা স্বীয় দেহ কাচপোকার করে সমর্পণ করে। নৈসর্গিক বোধ প্রভাবে মাকড়সাকুল কাচপোকাকে বড় ভয় করে এবং ইহাদিগকে আসিতে দেখিলেই হৃতবল লূতাতন্তু স্বীয় বাগুরা জাল পরিত্যাগ করিয়া পলায়নপর হয়। আহা, তাহার তাৎকালিক ভাব দেখিয়া তাহার মানসিক অবস্থা পরিষ্কার বুঝিতে পারা যায় যে বেচারী কিরূপ ভীতিবিহ্বল হইয়া শমনসদৃশ কাচপোকার দৃষ্টি অতিক্রম করিতে চাহিতেছে! কিন্তু হায় তাহার সব চেষ্টাই বিফল হয়; নিয়তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া জয়ী হইবার সাধ্য কাহার? কাচপোকা অবসর প্রতীক্ষা করিতে থাকে এবং সুযোগ বুঝিয়া একবার তাহার উপরে গিয়া পতিত হয় আর অমনি মাকড়সার যেন জীবনীশক্তি লোপ হইয়া যায়, সে একেবারে জড়বৎ নিশ্চল ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে। বুঝি কাচপোকার স্পর্শ 'বিষকন্যা'র স্পর্শের ন্যায় কার্য্য করিয়া থাকে, বুঝি কাচপোকার দেহের কোন বৈদ্যুতিব বা ঐন্দ্রজালিক মোহকরস্পর্শে মাকড়সা মুগ্ধ হয়। যাহাই হউক কাচপোকা একবার যাহাকে স্পর্শ করিতে পারিয়াছে তাহার আর উদ্ধার নাই।

আমাদের যতদূর বিশ্বাস ও অভিজ্ঞতা তাহাতে বোধ হয় কাচপোকার পশ্চাতের হুলের এমন মোহকর কোন বিষ আছে যাহার প্রবেশে মাকড়সা এরূপ স্তব্ধীভূত হইয়া পড়ে। কারণ কয়েক স্থলে আমরা এইরূপ হুলফুটাইতে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয়।

এইরূপ মোহমন্ত্রে মাকড়সাকে বশীভূত করিয়া কাচপোকা মাকড়সার মুখের শুণ্ড বা পদ স্বীয় মুখদ্বারা ধরিয়া টানিয়া স্বীয় অভীষ্ট স্থানের দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, সমর্থ হইলে সে পদ সাহায্যে তাহাকে লইয়া উড়িয়াও যাইতে পারে। এইরূপ মাকড়সা টানিয়া লইয়া যখন কাচপোকা যাইতে থাকে অথবা উচ্চ সমতল দেয়ালের গায়ে উঠিতে থাকে তখন তাহার ক্ষিপ্রকারিতা ও চাঞ্চল্য দেখিয়া বিস্মিত হইতে হয়। তাহার অধ্যবসায়ও বড় কম নহে। কতকদূর উঠিয়া হয়ত মাকড়সা মুখভ্রষ্ট হইয়া নিম্নে পতিত হইল, অমনি কাচপোকাও সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুদ্‌বেগে নামিয়া আসিয়া আবার তাহাকে ধরিয়া নব উদ্যমে দ্বিগুণ উৎসাহে দেওয়ালে আরোহণ করিতে লাগিল। যতক্ষণ পর্য্যন্ত সে মাকড়সাটিকে অভীষ্ট স্থানে উত্তোলন করিতে না পারিল, ততক্ষণ পর্য্যন্ত সে চেষ্টায় বিরত হয় নাই। এই সামান্য পতঙ্গের এইরূপ ঐকান্তিকতা কি সাংসারিক মানবকে কোন শিক্ষাই প্রদান করে না? ইহার চেষ্টা দেখিয়া কি কোনও শুভ মুহূর্ত্তে কোনও নিরাশাক্লিষ্ট অবসন্নমন আবার নববলে বলীয়ান্ হইয়া দ্বিগুণ তেজে স্বীয় অকৃতকার্য্যতাকে পরাস্ত করিতে কৃতসংকল্প হইতে পারে না?

এই মক্ষিকাদিগের বাসা পরীক্ষা করিয়া আমরা দেখিয়াছি যে ইহাদের যতগুলি ডিম্ব প্রসব করা প্রয়োজন তদপেক্ষা ইহাদের বাসায় একটি প্রকোষ্ঠ বেশী থাকে। আমরা যতগুলি বাসা দেখিলাম সবগুলিতেই এইরূপ অতিরিক্ত প্রকোষ্ঠ দেখিতে পাইয়াছি। এই প্রকোষ্ঠ গুলিতে ইহারা মাকড়সা আহরণ করিয়া রাখিয়া দেয় বলিয়া বোধ হয়, কারণ অনেক বাসায় আমরা এই প্রকোষ্ঠটি মাকড়সা পূর্ণ দেখিয়াছি। বোধ হয় এখান হইতে ইহারা ক্রমে ক্রমে অন্যান্য প্রকোষ্ঠে মাকড়সা লইয়া যায় এবং পুনরায় অন্য মাকড়সা আনিয়া এখানে সঞ্চয় করে। ডিম্বের প্রকোষ্ঠগুলির মধ্যে মাকড়সা সঞ্চিত করিয়া তাহাতে ইহারা ডিম্ব প্রসব করে এবং তদুপরি আরও দুই চারিটা মাকড়সা দিয়া তাহার ছিদ্রপথ শেষে রুদ্ধ করিয়া দেয়। এ বিষয় কুমীরাপোকার সহিত ইহার সম্পূর্ণ সাদৃশ্য দেখা যায়, সুতরাং সবিস্তাররূপে বলা বাহুল্য।

তার পর ক্রমে কুমীরাপোকার ন্যায় ইহাদের ডিম্ব মাকড়সার দেহ হইতে রস আহরণ করিয়া পুষ্ট হইতে

থাকে। ইহাদের ডিম্বের আকৃতিও গঠন প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত ঠিক বোলতার ডিম্বের ন্যায়। ইহারাও ঠিক সেইরূপ হেলিতে দুলিতে থাকে, মুখের নিকট ঠিক সেইরূপ কৃষ্ণবর্ণ এবং সেইরূপ শুণ্ডাদির অস্তিত্ব সম্পন্ন। তবে এই সব ডিম্ব অতি সূক্ষ্ম চর্ম্মাবরণ দ্বারা আবৃত হয়। এই চর্ম্মাবরণের রং ঘোর খদিরের রংএর ন্যায়। কোথা হইতে স্বতই এই চর্ম্মাবরণ আসিয়া ডিম্বগুলিকে আবৃত করে তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়; আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে ডিম্বের অপুষ্টাবস্থায় এই চর্ম্মাবরণ ভেদ করিয়া তাহার মধ্য হইতে ডিম্ব বহিষ্কৃত করিলে সেই চর্ম্মপুটের নিম্নে মাকড়সার দেহাবশেষ প্রাপ্ত হওয়া গিয়া থাকে। সুতরাং আশ্চয্য নৈসর্গিক ক্রিয়া প্রভাবে ঐ মাকড়সার দেহধাতু দ্বারাই যে এই চর্ম্মাবরণ প্রস্তুত হয় এরূপ অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত নহে। ভগবানের যে বিচিত্র অচিন্তনীয় কৌশল প্রভাবে কঠিন আবরণ মধ্যস্থ সামান্য জলীয় পদার্থ হইতে রক্ত মাংস অস্থি পক্ষ প্রভৃতি সমন্বিত পক্ষিদেহ নির্ম্মিত হয়, যে বিস্ময়কর নৈপুণ্যবলে সামান্য জলীয় পদার্থ হইতে মাতৃগর্ভে ভ্রূণ সঞ্জাত হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, বিশ্বকর্ম্মার সেই কৌশলে সেই নৈপুণ্যে যে মাকড়সার দেহ কাচপোকার দেহে পরিণত হইবে, তাহা হইতে সামান্য একটা চর্ম্মাবরণ উদ্ভূত হইয়া অপক্ক ডিম্ব রক্ষা করিবে, ইহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি? এইসব এবং এতদপেক্ষাও বিস্ময়কর সৃষ্টিতত্ত্ব সমূহ পর্য্যালোচনা করিলে স্বীয় পাণ্ডিত্যাভিমান, স্বীয় কৌশলের গরিমা, স্বীয় স্থাপত্যকৌশল কত নিম্নে অধিক্ষিপ্ত হয়, মানবের ক্ষুদ্রত্ব কি পরিমাণে উপলব্ধি হয়!

যাহা হউক ভস্ত্রার মধ্যস্থ ডিম্ব পরিপুষ্ট হইলে ক্রমে তাহাতে পতঙ্গের দেহের অনুরূপ আকৃতির লক্ষণ দেখা যায় এবং ক্রমে ক্রমে তাহা পরিস্ফুট হইয়া কাচপোকার অনুরূপ একটি মৃতবৎ পতঙ্গের উদ্ভব হয়। তখন তাহাকে দেখিয়া জীবিত বলিয়া নির্দ্ধারণ করা যায় না। ক্রমে ইহার জীবনের লক্ষণও প্রকট হয়। ইহাদের পরিপুষ্টির ক্রমোন্নতিও ঠিক বোলতা, মধুমক্ষিকা প্রভৃতি অন্যান্য মক্ষিকাকুলের ন্যায়ই হইয়া থাকে। ইহাদের গায়ের রং, প্রথম প্রথম প্রায় বোলতার অনুরূপই থাকে বা তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক ঘোরাল রং হয়।

ডিম্ব প্রসবের পর হইতে পতঙ্গের সম্পূর্ণ পরিপুষ্টি সাধনে ন্যূনাধিক মাসদ্বয় প্রয়োজন হয়। প্রকোষ্ঠাভ্যন্তরস্থ কীট সম্পূর্ণ পরিপুষ্টি লাভ করিলে অবসর বুঝিয়া স্বীয় প্রকোষ্ঠের মৃন্ময় আবরণ ভেদ করিয়া মুক্ত বায়ু ও আলোকের মুখ দর্শন করে; এত দিনের বাসস্থান এই বাসাটির প্রতি আর ফিরিয়াও চাহে না, মহানন্দে স্বাধীন জীবন যাপন করিবার জন্য আকাশমার্গে প্রস্থান করে। আহা! মানবমাত্রেরই যদি এইরূপ মনের গতি হইত! সংসারের সঙ্কীর্ণ প্রকোষ্ঠে অবিদ্যার আবরণে বদ্ধ জীব যদি স্বীয় ধ্যান ধারণার বলে সেই অবিদ্যার বন্ধন ছিন্ন করিয়া সঙ্কীর্ণ প্রকোষ্ঠের মায়া কাটাইয়া মুক্ত পুরুষ হইয়া এইরূপ ঊর্দ্ধগামী হইতে পারিত! বলা বহুল্য একই, সময়, সমুদয় ডিম্ব ফুটিয়া উঠে না, সুতরাং সমুদয় কীটই একই সময় জন্মস্থল পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় না।

এস্থলে একথাও বলিয়া রাখা ভাল যে আমরা আর এক প্রকার কাচপোকাও দেখিয়াছি, সেগুলি বর্ত্তমান প্রবন্ধোক্ত কাচপোকা অপেক্ষা যেন কিঞ্চিৎ বৃহৎ এবং দেহশোভায় সমধিক চাকচিক্য সম্পন্ন। ইহারা মাকড়সাকেও আক্রমণ করে কিন্তু তেলাপোকা বা উচুঙ্গা এবং ঘুগ্‌রে পোকাকেই ইহারা বেশী আক্রমণ করিয়া থাকে। ইহারাও অত্যন্ত বেশী চঞ্চল, এবং অত্যন্ত ক্ষিপ্রকর্ম্মা। ইহাদের আক্রমণে এতবড় তেলাপোকা ও ঘুগ্‌রেপোকাকে একেবারে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। ইহারা অনেক সময়ই মাটির মধ্যে গর্ত্ত খনন করিয়া তাহার মধ্যে স্বীয় বাসা নির্ম্মাণ করে। অন্ততঃ আমরা, ইহাদিগকে স্বীয় স্বীয় শিকার লইয়া মাটার মধ্যের গর্ত্তে যাইতে দেখিয়াছি এবং সেই সব গর্ত্ত যে তাহাদের স্বকৃত তাহাও আমরা জানি। ইহাদেরও বশীকরণ মন্ত্র বা তাহার ঔষধ জানা আছে। ইহাদের বাসা প্রভৃতি সম্বন্ধে আমরা এখনও বিশেষ তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে পারি নাই। তবে অনুমান হয় যে ইহারাও এইরূপেই বাসা করিয়া থাকে, এবং ইহাদের ডিম্বাদিও এইরূপ জীবদেহ সংশ্রবেই পরিপুষ্ট হয়। এই বিষয় হইতেই কাচপোকার বাসায় গিয়া ভাবিতে ভাবিতে উচুঙ্গা কাচপোকায় পরিণত হয় এই প্রবাদ প্রচলিত আছে। উচুঙ্গা যে কি ভাবে বিভোর হয়, কি চিন্তা করে, তাহার

রহস্ত বোধ হয় ইহাদ্বারা আংশিক উদ্‌ঘাটিত হইল। জগতে যে কিরূপ ভাবে জীবস্রোতঃ প্রবাহিত হইতেছে, কত প্রকার কৌশলে সৃষ্টি, স্থিতি, লয় কার্য্য সমাহিত হইতেছে, কিরূপে একের লয়ে অন্যের সৃষ্টি এবং অপরের পুষ্টি হইতেছে, এইরূপ সব আলোচনা হইতে তাহার অতি সামান্য আভাস পাওয়া যায়।

শ্রীযদুনাথ চক্রবর্ত্তী।

পুরাতত্ত্বের কয়েকটি কথা।

প্রাচীন ভারতে স্ত্রীশিক্ষা—গ্রীক ঐতিহাসিক ষ্ট্রাবো তাঁহার পুস্তকে ভারতপ্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে ভারতীয় রমণীগণকে অধ্যাত্মতত্ত্ব শিক্ষা দেওয়া হইত না। তিনি ইহার একটা কারণও নির্দ্দেশ করিতে ছাড়েন নাই। তিনি বলেন, পাছে রমণীগণ শিক্ষিতা হইয়া 'সুখ-দুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভে জয়াজয়ৌ' 'সংসার ব্যাপারে অজ্ঞ' ও বীতস্পৃহ হইয়া উচ্ছৃঙ্খলভাব ধারণ করে, ও পুরুষের অনুশাসন মানিয়া না চলে, এই ভয়ে পুরুষগণ স্ত্রীগণকে অধ্যাত্মবিষয়ে শিক্ষা দিতে বিরত থাকিতেন। ইহা হইতে এমন বোধ হয় না যে তাঁহারা মোটেই শিক্ষা পাইতেন না। অতএব যাঁহারা এই মতকে ভিত্তি করিয়া ভারতের স্ত্রীচিত্তকে অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্ন বলিতে চাহেন, তাঁহাদিগকে একদেশদর্শী বলিতেই হইবে।

স্ত্রী ধর্ম্মপত্নী, স্বামীর ধর্ম্মকর্ম্মে সঙ্গিনী। 'সস্ত্রীকো ধর্ম্মমাচরেৎ' ইহা প্রাচীন ভারতেরই অনুশাসন। যাঁহারা মুনি, ঋষি ও মুমুক্ষুব্যক্তিবর্গের ধর্ম্মসহায় হইতেন, তাঁহারা যে অশিক্ষিতা ছিলেন, তাহা কেমন করিয়া বিশ্বাস করিব? যখন ভারতের অধঃপতনের সঙ্গে অবরোধের সৃষ্টি হইল, তখনই পিঞ্জরাবদ্ধ রমণীগণ, উন্মুক্ত সর্ব্বত্রবিহারী স্বামীদিগের ধর্ম্ম ও কর্ম্মে সহায়তা করিতে বঞ্চিত হইয়াছিলেন। সেই দুষ্ট প্রভাব আজ পর্য্যন্ত আংশিক রহিয়া গিয়াছে।

পূর্ব্ব মীমাংসায় স্ত্রীপুরুষের একত্র যজ্ঞানুষ্ঠান বিধি আছে। প্রসিদ্ধ সায়নাচার্য্য তাহার সমর্থনকল্পে 'বিশ্বা. মিথুনা অবস্তবঃ' (তোমার সাহায্য ইচ্ছা করিয়া, হে চন্দ্র, মিথুন তোমাকে স্তব করিয়াছে) এই ঋক্ ও ৬৫সঙ্গে ব্রাহ্মণ, শ্রুতি ও স্মৃতি হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া স্ত্রীর সহধর্ম্মিণীত্বের প্রমাণ করিয়াছেন। সায়নাচার্য্য বলিতে চাহেন যে, বৈদিককালে স্ত্রীগণ শিক্ষিতা হইয়া স্বামীর ধর্ম্মসাধনের সহায় হইতেন, এবং স্বামীগণেরও অন্তরীক সাধন সফল হইত না। সায়ণ ব্রাহ্মণ হইতে 'অগ্ন্যাধান মন্ত্র' উদ্ধৃত করিয়াছেন,—'জায়াপতী অগ্নিমাদধীয়ীতাম্' (জায়াপতি একত্র অগ্নিরক্ষা করিবে)। আশ্বলায়ন-শ্রৌত-সূত্র ১।২ হইতে উদ্ধৃত করিয়াছেন,—'বেদং পত্‌ন্যৈ প্রদায় বাচয়েৎ' (বেদ পত্নীকে দিয়া পড়াইবে বা বলাইবে)। ইহার দুইটি অর্থ হইতে পারে—(১) বেদ পত্নীর হস্তে দিয়া, তাহাকে দিয়া পড়াইবে বা (২) বেদ তাহার হাতে দিয়া নিজে পড়িয়া তাহাকে বলাইবে! বেদ যখন হাতে দেওয়া হইতেছে, তখন পত্নীর স্বয়ং পাঠ করাই সঙ্গত। অশ্বলায়নের সময় তাহা হইলে বেদ লিখিত অবস্থায় (অন্ততঃ কিয়দংশও) ছিল। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলর অশ্বলায়নের সময় বেদ লিখিত ছিল ইহা স্বীকার না করিয়া 'বেদ' অর্থে 'কুশমুষ্টি' করিতে চাহেন; কারণ 'বেদ' ও 'বেদিঃ' (তৃণনির্ম্মিত বেদী) ঘনিষ্ঠাকারের। বেদিঃ মানে তৃণবেদি যে কেন হইবে তাহা বুঝিতে পারিলাম না। উহা কষ্টকল্পনা বলিয়াই মনে হয়। আরো আমি দেখাইয়াছি (লিখন-সৃষ্টির ইতিহাস, ভারতী ১৩০৮ চৈত্র) যে সূত্রকালে লিখনপ্রথা অল্পবিস্তর প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল ও হইতেছিল। সায়ণাচার্য্য মনুস্মৃতি ৫।১৫৫ হইতে 'নাস্তি স্ত্রীণাং পৃথগ্ যজ্ঞঃ' উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহারও দুইপক্ষে অর্থ করা যাইতে পারে! স্ত্রীদিগের স্বামীর সহিত ভিন্ন স্বতন্ত্র যজ্ঞ করিবার অধিকার নাই, ইহাতে কি বুঝিব যে তাঁহাদের বেদবিহিত মন্ত্রোচ্চারণে অধিকার নাই,—না, অধিকার আছে, কিন্তু সর্ব্বদা যজ্ঞানুষ্ঠানে ব্যাপৃত থাকিলে গৃহবন্ধন শিথিল হইয়া পড়িবে বলিয়া উহা একটি প্রতিষেধক। আমাদের ত' শেষোক্ত মতই সমীচীন বলিয়া মনে হয়। রমণীগণ পুস্তক পাঠ করিলে স্বামীর আয়ুক্ষয় হয়, এই যে সম্ভূত বাঙ্গালা প্রবাদ, তাহারও মধ্যে কি ঐরূপ একটা নিগূঢ় তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন ছিল না? জ্ঞানবৃদ্ধ সায়ণাচার্য্যের উক্তি-পরম্পরা হইতে আমার ইহাই অনুমান হয় যে, প্রাচীন ভারতে স্ত্রীশিক্ষা প্রচলিত ছিল, কিন্তু সামাজিক বিশৃঙ্খল-

তার ভয়ে নানা অনুশাসন দ্বারা তাঁহাদিগকে সংযমের গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ রাখা হইত।

ঋগ্বেদে বহু রমণী ঋত্বিকের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে বিশ্ববরা, লোপামুদ্রা, মমতা ও শাশ্বতী অনেকের নিকট পরিচিত। ইহা হইতে তাঁহাদের শাস্ত্রজ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্য-পত্নী মৈত্রেয়ী স্বামীর সহিত বহু অধ্যাত্মতত্ত্বের আলোচনা করিতেছেন। ঐ উপনিষদেই জনকের সভায় গার্গী বহু পণ্ডিতকে বিচারে পরাস্ত করিয়া কিরূপে পণ-রক্ষিত গাভী জয় করিয়াছিলেন, তাহার বর্ণনা আছে।* মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব্বে বিদুলানাম্নী 'রাজসমাজবিশ্রুত বহুশাস্ত্রাভিজ্ঞ কামিনীর উল্লেখ দেখা যায়। মনু বিধান দিয়াছেন 'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ'। ভারতের বিরুদ্ধবাদিগণ 'শিক্ষণীয়' অর্থে discipline ও নীতি ধর্ম্মশিক্ষা বলিতে চাহেন, লেখাপড়া নহে। কিন্তু ধর্ম্মনীতি শিক্ষা দিতে হইলেও সাধারণ শিক্ষার একান্ত প্রয়োজন। গ্রীক দূত মেগাস্থিনিস ভারতভ্রমণ কাহিনীতে বলিয়াছেন যে বেদ ও শাস্ত্রবিচারও স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে নিষেধ ছিল না। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত তাহার প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে ও মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ইতিহাসে প্রাচীন ভারতের স্ত্রীশিক্ষার বিষয় সমর্থিত হইয়াছে। এল্‌ফিনষ্টোন্ ও হণ্টার সাহেবও ইহা স্বীকার করিয়াছেন।

উত্তর চরিতের দ্বিতীয়াঙ্কের বিষ্কম্ভকে আত্রেয়ী নাম্নী তাপসী যখন বলিলেন '(অগস্ত্যপ্রমুখঋষিভ্যঃ) অধিগন্তুং নিগমান্তবিদ্যাং (বেদান্ত শাস্ত্রং) ইহ পর্য্যটামি', তখন বনদেবী, স্ত্রীলোক বেদান্তবিদ্যার্থিনী বলিয়া, কোনই বিস্ময় প্রকাশ করেন নাই। ভবভূতির আবির্ভাব কাল খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দী, তখনও ভারত একেবারে অধঃপাতে যায় নাই। মধ্যযুগে খনা ও লীলাবতীর নামও এই প্রসঙ্গে সর্ব্বদা স্মরণীয়। ইতিহাসহীন ভারতে যুগযুগান্ত ধরিয়া এতগুলি শাস্ত্রজ্ঞানসম্পন্না বিদুষী মহিলার নাম আজও জীবিত রহিয়াছে।

ভারতবাসীর য়ুরোপ যাত্রা—অনেকের ধারণা পূজ্যপাদ রাজা রামমোহন রায়ই প্রথম য়ুরোপযাত্রী ভারতবাসী। বর্ত্তমান যুগের তিনিই নেতা হইলেও তাঁহার বহুপূর্ব্বে কয়েকজন ভারতবাসীর য়ুরোপ যাত্রা সম্বন্ধে প্রমাণ বর্ত্তমান আছে। ইহাঁদের প্রাচীনতম শর্ম্মণাচার্য্য। তিনি গ্রীসের রাজধানী এথেন্স নগরে প্রাচীন ভারতের প্রথানুসারে অগ্নিপ্রবেশ করিয়া আত্মনাশ করেন।* গ্রীকগণ তাঁহার চিতাভস্মের উপর এক সমাধি নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে লিখিয়া রাখিয়া দেন, "এখানে ভারতীয় শর্ম্মণাচার্য্য (sarman cheya) প্রোথিত হইলেন। তিনি বারিগাজা † হইতে আসিয়াছিলেন এবং প্রাচীন ভারতীয় প্রথানুসারে অমরত্ব লাভের প্রয়াসী হইয়াছিলেন।"

তৎপরে সেকেন্দর ভারতবিজয়ান্তে প্রত্যাবর্ত্তনকালে নানা প্রলোভনে বশীভূত করিয়া ভারতজয়ের নিদর্শনস্বরূপ ও স্বদেশীয়ের প্রীতিসাধন মানসে 'কল্যাণ' (গ্রীকগ্রন্থে kalanas লিখিত আছে) নামক এক ব্যক্তিকে স্বদেশে লইয়া যান। মেগাস্থিনিস লিখিয়াছেন যে 'কল্যাণ' ঐ কারণে স্বদেশীয় বন্ধুবর্গের নিকট বিশেষ অপদস্থ হইয়া শর্ম্মণাচার্য্যের পদানুসরণে প্রসগদ (?) নামক জনপদে অগ্নিপ্রবেশ করেন। কল্যাণের বন্ধুগণ তাহার উপর বিরক্ত হইয়াছিলেন কি জন্য? ম্লেচ্ছদেশে যাওয়ার জন্য? কালিদাসের রঘুও ত' ম্লেচ্ছ পারসীক রাজ্য জয় করিতে গিয়াছিলেন। সমুদ্রযাত্রাও তৎকালে নিষিদ্ধ ছিল না।‡ আমার বোধ হয় সামান্য প্রলোভনের বশবর্ত্তী হইয়া হেয়,

* কলিকাতা জাতীয় মহাসমিতির সহিত যে স্বদেশীয় শিল্পপ্রদর্শনী গঠিত হইয়াছিল, তাহাতে উহার একখানি চিত্র দেখিয়াছিলাম। নগ্নী গার্গীর জ্ঞানের 'আভায় মলিন লজ্জা পলকে মিলায়ে যায়'; সভাস্থলে দাঁড়াইয়া বিচার করিতেছেন। সে দৃশ্য কি আশঙ্কিত মূঢ়ভারতের?

* সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক এল্‌ফিন্‌ষ্টোন্ সাহেব সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যের মধ্যে এই প্রথার উদ্দেশ পান নাই বলিয়া, পণ্ডিত কোলব্রুকের কথায় সন্দেহ জ্ঞাপন করিয়াছেন। দশরথকর্ত্তৃক পুত্র সিন্ধু হত হইলে, সপত্নীক অন্ধকমুনিও অগ্নিপ্রবেশ করিয়াছিলেন।

† Barigaza লাটিন নাম, ইহার সংস্কৃত নাম 'ভৃগুকচ্ছ', তৎপরে প্রাকৃতে হয় 'ভরুকছ' এবং বর্ত্তমান গুজরাটী ভাষায় ইহার নাম 'ভড়োচ'। ইহা গুজরাটের অন্তর্গত একটি জনপদ। এখানেই প্রহ্লাদের বাড়ী ছিল।—মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

‡ বামনপুরাণে প্রথম নিষেধ দেখা যায়, এবং তাহা খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর পরের রচনা।

ঘৃণা 'তামাসা' হইয়া য়ুরোপে যাওয়াতেই নির্লোভ ভারতবাসীর মর্য্যাদায় আঘাত লাগিয়াছিল।

তৎপরে প্রথম মহারাষ্ট্র যুদ্ধের সময় ১৭৭৬ সালে পেশোয়া রঘুনাথ রাও'র তরফ হইতে দুইজন ব্রাহ্মণ তাঁহার নালিশ বিলাতের মহাজনসভায় (Parliament) বুঝাইবার জন্য ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়াছিলেন। সেখানে তাঁহাদের বিপদে বাগ্মী এড্‌মণ্ড্‌ বার্ক কিরূপ সাহায্য করিয়াছিলেন, তাহা ইতিহাসজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেই অবগত আছেন। তাঁহারা সেখানে স্বহস্তপক্ক আহার্য্য আহার করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিলে, তাঁহাদের জাতিপ্রশ্ন লইয়া তুমুল আন্দোলনে মহারাষ্ট্ররাজ্য সংক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু তখন সেদেশে প্রকৃত স্বধর্ম্মী রাজা ছিলেন, সেই রাজার শাসনে সমাজ নতশির হইয়া ব্রাহ্মণদ্বয়কে স্বশ্রেণীতে গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিল। তাঁহাদের শুদ্ধিভোজে প্রসিদ্ধ রাজনৈতিক ব্রাহ্মণ নানা ফড়নবীসও উপস্থিত ছিলেন। আমাদের দেশে স্বধর্ম্মী রাজা থাকিলে আমাদের বিলাতপ্রত্যাগত বন্ধুদিগকে এত অসুবিধা ভোগ করিতে হইত না। এখন সমাজের শুধু ক্রূরতা আছে, উত্তমের পক্ষপাতিত্ব ও সরলতার লেশমাত্র নাই। তাহার নির্জীব বাধাবিপত্তিগুলি আছে, অথচ তাহার সজীব আত্মোন্নতি-চেষ্টা বহুকাল গত হইয়াছে। কবে ফিরিবে কে জানে।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

কুমারিকা অন্তরীপে।

কলুর চোখঢাকা বলদের মত ঘুরিতে ঘুরিতে সুদূর মাদ্রাজনগরে উপনীত হইলাম। বাঙ্গালাভাষায় যাহাকে আমরা মাদ্রাজ এবং ইংরাজিতে ম্যাড্রাশ বলি, মহাভারতোক্ত তাহাই প্রকৃত মদ্ররাজ্য। মাদ্রাজে অবস্থান করিতে করিতে কুমারিকা অন্তরীপ (Cape Comorin) দেখিবার ইচ্ছা বলবতী হইয়া উঠিল। অনিকেতনী পরিব্রাজকেরা কাহারও আয়ত্তাধীন নহে, সুতরাং অন্ধকারময়ী রজনীর দ্বিপ্রহরে জলে ভিজিতে ভিজিতে এগ্‌মোর (Egmore) ষ্টেশনে ত্রিনেবেল্লী (Tinevelly) নগরীর টিকিট লইয়া রেলওয়ে শকটে আরোহণ করিলাম। মাদ্রাজ হইতে ত্রিনেবেল্লী যাইতে হইলে আঠার ঘণ্টার অধিক সময় লাগে না। ত্রিনেবেল্লী নগরী ভারতবর্ষের দক্ষিণ দিকে সর্ব্বশেষ বৃটিশ ডিস্ট্রিক্ট (জেলা)। ইহার পরে ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজার রাজ্য আরম্ভ হইয়াছে, তাহার পরে কোচিনের মহারাজার অধিকার, তাহার পরে ভারতমহাসাগর; এইস্থানেই সুবিশাল ভারতবর্ষের শেষ সীমা। ত্রিনেবেল্লী নগরী তাম্রপর্ণী নদীর তীরে অবস্থিত, এখানে বারমাস আম পাওয়া যায়। নারিকেল, সুপারি এবং আম এদেশে খুব সস্তা; জলবায়ু বঙ্গদেশাপেক্ষা উষ্ণতর। এই নগরী দক্ষিণ পথের রেলওয়ে লাইনের শেষ সীমা। এখানে অনেকগুলি বলদশকটের (Travancore Bullock Train Company) আফিস আছে। ইহাদের শকটে আরোহণ করিয়া ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে যাওয়া যায়। কুমারিকা নগরী ত্রিবাঙ্কুর মহারাজার অধিকারভুক্ত। ত্রিনেবেল্লী হইতে একেবারে কুমারিকা অন্তরীপের টিকিট পাওয়া যায় না; যে আড্ডার টিকিট প্রথমে পাওয়া যায়, তাহা দেড়দিনে পৌঁছিতে হয়। আমরা একটা আফিস টিকিট খরিদ করিয়া দেড়দিনে যে স্থানে পৌঁছিলাম, সেস্থানে একটা সুবৃহৎ গ্রাম ছিল; সেইগ্রামে বিশ্রামলাভ করিয়া, কেবল মুড়ি, মুড়কি ও চিঁড়ে ভিন্ন তথায় আর কিছু পাওয়া যায় না বলিয়া, তাহাতেই তৃপ্তির সহিত উদর পূরণ করিলাম। এই গ্রামের পার্শ্বে একটা খুব প্রাচীন কালীমন্দির আছে। এক সময়ে সেখানে নরবলি ও নরমেধ যজ্ঞ হইত, এখন আর তাহা হইতে পায় না। গ্রামের ভিতর আর একটা বৃহৎ মন্দির আছে। তাহার প্রাঙ্গণে তৈলের খনি দেখিয়াছিলাম। খনির আকার ঠিক কূপের মত; কূপের তৈল দেখিতে মলিন হইলেও তাহাতে দুর্গন্ধ ছিল না। ভাল ভাল লোকের মুখে শুনিয়াছি এই তৈলকূপে স্নান করিয়া বহুসহস্র কুষ্ঠরোগী আরোগ্য হইয়া গিয়াছে। এজন্য নানাস্থান হইতে সেখানে সচরাচর পথিকেরা আগমন করিয়া থাকে। এইগ্রামে দুইদিন মাত্র অবস্থান করিয়া আমরা আবার টিকিট খরিদ করতঃ দেড়দিনে আর একটা গ্রামে পৌঁছিলাম। সেখানে আমরা মোটে দশঘণ্টার অধিক ছিলাম না।

পুনরায় নূতন বলদশকটে আরোহণ করিয়া দেড়দিবসে নাগরকোয়েল নগরে উপস্থিত হইলাম। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে নাগরকোয়েল একটা বড় সহর এবং একটী বড় ডিষ্ট্রীক্ট (জেলা), এখানে মহারাজার নানাবিধ কাছারী এবং স্কুল আছে, তদ্ভিন্ন বৃটীশ গভর্ণমেণ্টের পোষ্টাফিশ এবং টেলিগ্রাফ ষ্টেশন দেখিতে পাওয়া যায়। নাগরকোয়েলের জলবায়ু অতীব স্বাস্থ্যকর, প্রাকৃতিক দৃশ্যও বেশ সুন্দর। এখানে দেখিবার অনেক পদার্থ আছে। এই নগরের সর্ব্বত্র "নাগ" (সর্প) পূজা হইয়া থাকে, বোধ হয় তজ্জন্য ইহার নাম নাগরকোয়েল। এখানকার সম্মুখস্থ পর্ব্বতও দেখিতে ঠিক নাগের (সর্পের) ন্যায়। এখানে বহুসংখ্যক খৃষ্টান বাস করে। খৃষ্টের দ্বিতীয়শতাব্দীর সিরিয়ান (Syrian) খৃষ্টানের বংশ এখানে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রটেষ্টাণ্ট খৃষ্টানাপেক্ষা রোমান কাথলিক দিগের সংখ্যা প্রায় দশগুণ অধিক। তাহাদের এখানে খুব বড় বড় গির্জ্জা আছে এবং সেই সকল গির্জ্জার মাঠে প্রতিবৎসর বড়দিনের (Xmas Day) পর্ব্বের সময় খুব ধুমধামের সহিত মেলা হয়। যে সকল দেশীয়খৃষ্টানের আদিপুরুষ ব্রাহ্মণ ছিল, তাহারা কপালে শ্বেতচন্দন বা রক্তচন্দনের ফোটা ও তিলক ব্যবহার করে, গলায় মালা পরে, কেহ কেহ উপবীত রক্ষা করিয়া থাকে এবং "ব্রাহ্মণ-খৃষ্টান" বলিয়া পরিচয় দেয়। নিরামিষাশী ব্রাহ্মণ-খৃষ্টানবৃন্দ নিম্নজাতীয় খৃষ্টানের সহিত আহার করে না এবং কন্যাপুত্রের বিবাহ দেয় না। নাগরকোয়েল হইতে প্রায় ছয় মাইল দূরে প্রসিদ্ধ পদ্মনাভপুর গ্রাম। এখানে পদ্মনাভনামে অতি প্রাচীন মূর্ত্তি এবং সুবৃহৎ মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। প্রবাদে আছে, "ভোজনে জনার্দ্দন এবং শয়নে পদ্মনাভ" এই মন্দির সেই পদ্মনাভের মন্দির। ত্রিনেবেল্লী হইতে নাগরকোয়েল পর্য্যন্ত আমরা পথের দুইধারে কেবল মাঠ বন এবং বড় বড় পর্ব্বত দেখিয়াছিলাম, মধ্যে মধ্যে দূরে দূরে দুই একটা গ্রামও ছিল। নাগরকোয়েল পৌছিতে যখন দুইমাইল বাকি ছিল তখন একটা বৃহৎ গ্রাম দেখিয়াছিলাম, এই গ্রামের পার্শ্বে একটা খুব উচ্চ পর্ব্বতের নিকটে একটি বৃহৎ এবং সুন্দর জলপ্রস্রবণ আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইয়াছিল। শুনিয়াছি, পর্ব্বতের গাত্র হইতে চব্বিশ ঘণ্টাকাল অতীব শীতল, সুস্বাদু এবং স্বাস্থ্যকর সলিল নির্গত হইয়া থাকে। পর্ব্বতের চারিদিকে মহাবন, সেই বনে ভয়ানক ভয়ানক দ্বিহন, দ্বিপী, রৌহিষী, শার্দ্দুল সর্প এবং সিংহ বিচরণ করে। নাগরকোয়েল হইতে কুমারিকা অন্তরীপ তিনক্রোশের অধিক দূরবর্ত্তী নহে।

একজন উচ্চপদস্থ রাজপুরুষের সহায়তায় আমি নাগরকোয়েল হইতে (তাহারই বলদশকটে) কুমারী অন্তরীপাভিমুখে রওয়ানা হইলাম; পথের দুই পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সুন্দর গ্রাম, মনোহর শস্যক্ষেত্র এবং নানাপ্রকার সুন্দর সুন্দর তরুলতার কুঞ্জাবলী দেখিয়া নিরতিশয় আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম। কুমারিকা একখানি ক্ষুদ্র গ্রাম মাত্র, অধিবাসীর প্রায় তের আনা ব্রাহ্মণ। অতি সামান্য মাত্র লোক এখানে বাস করে। ভারতমহাসাগরের তটের উপরে এই গ্রাম অবস্থিত। সমুদ্র হইতে গ্রাম, পঞ্চাশহস্তের অধিক দূরবর্ত্তী নহে, কিন্তু সমুদ্র হইতে গ্রাম অধিকতর উচ্চ বলিয়া সমুদ্রের তরঙ্গে ইহা ডুবিয়া যায় না। কুমারিকার তটে দাঁড়াইয়া ভারতমহাসাগরের অতীবসুন্দর নীলোর্ম্মিমালা দর্শন করিলে মনপ্রাণ বিমোহিত হয়। সমুদ্রের শোভা বর্ণনাতীত; তাহা স্বচক্ষে না দেখিলে সাধ মিটে না। ভারতমহাসাগরের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে মহাকবি কালিদাসের "শ্রীবিশালা বিশালা" শ্লোকটি মনে পড়ে। আমি কুমারিকা গ্রাম হইতে ভারতমহাসাগরের যে অপূর্ব্ব দৃশ্য অবলোকন করিয়াছি, তাহা জীবনে কখনও ভুলিতে পারিব না। কুমারিকা গ্রাম, "কুমারী" মূর্ত্তি ও তাঁহার মন্দিরের জন্য বিখ্যাত। প্রবাদ আছে, রঘুকুলতিলক ভগবান শ্রীরামচন্দ্র যখন সাগরবন্ধনে হতাশ্বাস হয়েন তখন এইস্থানে উপবেশন করিয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে ভগবতীর আরাধনা করিয়াছিলেন। যেস্থানে মহামায়া ভগবতী কমললোচন রামকে কুমারীকন্যাবেশে দর্শন দিয়া অভয় দান করিয়াছিলেন, ঠিক সেইখানে ভগবতীর কুমারীমূর্ত্তি ও মন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। মন্দির খুব বড় নহে কিন্তু ঠিক সমুদ্রের কিনারায় অবস্থিত। সাগরের তটদেশ সমূহ বড় বড় প্রস্তর দিয়া বাঁধান এবং মন্দিরের সম্মুখে অতি সুদৃঢ় এবং সুন্দর ঘাট আছে। সেই ঘাটে বসিলেই মহাসাগরের

তরঙ্গরাশি আসিয়া উপবিষ্ট মনুষ্যের দেহকে ধৌত করিয়া দেয়। এইজন্য অনেকে জলে নামিয়া স্নান করিবার আদৌ আবশ্যকতা দেখেন না, কিন্তু অবতরণ ও অবগাহন করিয়া সমুদ্রজলে স্নান না করিলে সাগরজলের উপকারিতা অনুভব করা যায় না। প্রবল তরঙ্গের আঘাতে সাগরের তীরে প্রতিমুহূর্ত্তে নানাজাতীয় শংখ, শম্বুক, মৎস্য প্রভৃতি জীবসমূহ আসিয়া পৌছে। সমুদ্রের জল খুব লবণাক্ত, পানের পক্ষে নিতান্তই অনুপযুক্ত।

"কুমারী" মূর্ত্তি ঠিক বালিকামূর্ত্তির ন্যায়। মূর্ত্তিখানি সুবর্ণ পরিচ্ছদে আগাগোড়া আবৃত। মূর্ত্তি দেখিতে অতি সুন্দর। এই অপরূপ লাবণ্যময়ী দেবীমূর্ত্তির এক-হস্তে শাণিততরবারী এবং অপর হস্তে শংখ। সেই শাণিত তরবারী হস্তে বিস্ফারিত লোচনে "কুমারী" দেবী সুবিশাল ভারতমহাসাগরেরদিকে অনিমেষ দৃষ্টিপাত করিয়া আছেন। দেখিলে বোধ হয়, ভারতের উত্তরদিকে কৈলাসাচলে মহাদেব যেমন নন্দী ভৃঙ্গী লইয়া ভারতের একদিকের সীমা রক্ষা করিতেছেন, আর একদিকে (দক্ষিণে) যেন মা ভগবতী কুমারী কন্যা বেশে খড়্গহস্তে, হীনতেজ ভারতকে প্রহরিণীরূপে রক্ষা করিয়া "মাতা" নামের সাথকতা সম্পাদন করিতেছেন। আমি পৃথিবীর আর কোনও স্থলে, মহাসাগরের এত সুন্দর শোভা আমার জীবনে দেখি নাই।

কুমারিকায় তিন দিবস অবস্থান করিয়া আমরা নাগরকোয়েলে ফিরিয়া আসিলাম। নাগরকোয়েল হইতে অন্যত্র যাইবার সময় ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজার টাকা দেখিবার ইচ্ছা ছিল। বলা বাহুল্য, এদেশে পয়সা চলে না, এদেশের মুদ্রা রৌপ্যনির্ম্মিত। এক টাকায় "চক্রম" নামে প্রায় একশত অতি ক্ষুদ্র রৌপ্য খণ্ড পাওয়া যায়, তাহাই পয়সারূপে এদেশে চলিয়া থাকে; টাকা ও আধুলির একদিকে শঙ্খ মূর্ত্তি এবং অপরদিকে নারিকেল গাছের আকৃতি। ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের সর্ব্বত্র তাল, নারিকেল, সুপারি এবং আমগাছ সুপ্রচুর। এখানকার ভাষার নাম "মালয়ালী" কিন্তু ইংরাজী শিক্ষিত লোক সর্ব্বত্র পাওয়া যায়। কুমারী অন্তরীপে স্কুল বা ডাকঘর নাই। সেখানকার ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কেহই ইংরাজী জানে না।

শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাভারতী।

ক্ষণিকের।

ক্ষণতরে বসন্তের দেখা
মরুময় জীবনের তীরে,
সুখের সে মলয় আভাষ
স্বপনও ক্ষণিকের তরে।

ক্ষণ তরে সন্ধ্যাতারকার
ঢেউপরে কিরণ চুম্বন,
ক্ষণতরে স্তব্ধতার সনে
নিশীথের সঙ্গীত মিলন।

ক্ষণতরে হৃদয় বীণায়
দুএকটি সুস্বর-কাহিনী,
সুনীরব ঘুমের মাঝারে
ক্ষণতরে স্বপনের ধ্বনি।

ক্ষণতরে অন্তর ব্যথার
দুএকটি কথা প্রতিদান,
ক্ষণতরে মরম মন্দিরে
পূজিবার দেবতার স্থান।

ক্ষণিকের যৌবন কাহিনী
ক্ষণিকের মধুর স্বপন,
ক্ষণিকের দুটি প্রেমবাণী
তারপরে সব সমাপন!

ক্ষণতরে জীবনের পথে
উচ্ছ্বসিত মিলনের গান,
তারপরে কে কোথায় রয়,
দীর্ঘশ্বাসে সব অবসান!

ক্ষণিকের কথাত কেবল
পরাণের কাহিনী নূতন,
যবে, হায়! সে গান ফুরায়
জাগে চির কথা পুরাতন।

জীবনের মধুর সকল
ক্ষণিকের সঙ্গীত কেবল,
নিশীথের স্বপ্নচ্ছায়া মত
মুহূর্ত্তের ভ্রান্তি আর ছল।

লজ্জাবতী বসু

৫নং শিবনারায়ণ দাসের লেন, কুন্তলীন প্রেস হইতে শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত।



প্রবাসী

দ্বিতীয় ভাগ। { চৈত্র, ১৩০৯। { ১২শ সংখ্যা।

কাব্যযুগ।

(ভূমিকা)।

ভারতবর্ষের প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শন আছে, কিন্তু ইতিহাস নাই। যে সভ্যতা হইতে বৈদিকসাহিত্য প্রসূত, এবং ঋষিদিগের পুণ্যসঙ্গীতে যে আনন্দময় দেবলীলার অভিব্যক্তি, সেই সভ্যতা এবং লীলা কতদিনে এবং কিপ্রকারে বিকশিত হইয়াছিল, যথেষ্ট অনুসন্ধানেও তাহার কিছুমাত্র আভাস পাওয়া যায় না। বেদ এবং ব্রাহ্মণ হইতে বৈদিকযুগের ছবি তুলিবার যে চেষ্টা হয়, তাহা চেষ্টা মাত্র। পরবর্ত্তী সময়ের ইতিহাস সম্বন্ধেও প্রায় সেই-কথা। প্রতাপশালী কয়েকজন রাজার নাম, অথবা কয়েকজন কবির কীর্ত্তি, অসীম কালসাগরের বক্ষে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের মত ভাসিতেছে।

পণ্ডিতেরা ভারতের প্রাচীন ইতিহাস উদ্ধার করিতেছেন। কোথাও বা দুচারিটি প্রাচীন স্তোত্র, তত্ত্বজিজ্ঞাসা বা কবিতা লইয়া, কোথাও বা ভগ্নপ্রস্তরের অতি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশের দু চারিটি বর্ণমালা পড়িয়া, কোথাও বা বিহার, চৈত্য এবং মন্দিরের ইষ্টক কণা দেখিয়া, এই ইতিহাস সংগৃহীত হইতেছে। এক একবার মনে হয়, যে যাহাদের গৌরব গিয়াছে, শৌর্য্যবীর্য্য গিয়াছে, তাহাদের আবার ইতিহাস কেন? বিশেষ এই ইতিহাস রচনার ছলে, অনেক পণ্ডিত, ভারতের মৃতশবের উপর যে অসি প্রহার করেন, তাহা মড়ার উপর খাঁড়ার ঘা বলিয়াই বুঝান যাইতে পারে। এই ইতিহাসলেখকদিগের মধ্যে অনেক সহৃদয় সুবুদ্ধি ব্যক্তিও আছেন। তাঁহারা আছেন বলিয়াই, ভারতের প্রত্নতত্ত্ব, আলোচনার যোগ্য হইয়াছে।

পণ্ডিতেরা সুবিধা এবং উপযোগিতা লক্ষ্য করিয়া, ভারতের প্রাচীন ইতিহাসকে বৈদিকযুগ, মন্ত্রযুগ, বৌদ্ধযুগ, পৌরাণিকযুগ প্রভৃতি কতকগুলি যুগের সীমায় বদ্ধ করিয়াছেন। এইসকল বিভাগ দেখিয়া যদি কাহারও ধারণা হয়, যে প্রাচীনকালে আর্য্যেরা কিছুদিন পর্য্যন্ত কেবল ঋক্ রচনাই করিয়াছিলেন; তাহার পর মন্ত্রসংগ্রহ করিলেন এবং তাহার পর আবার সূত্র লিখিতে বসিয়া গেলেন; তাহা হইলে বিষম ভ্রান্তিতে পড়িতে হয়। কোনদেশের ইতিহাসেই যখন এপ্রকার বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায় না, এবং কোনজাতির ক্রমবিকাশেই যখন এপ্রকার অবস্থা স্বাভাবিক নহে, তখন যদি কেবল উপযুক্ত উপাদানের অভাবে বলিতে হয়, যে বৈদিকযুগে দেবস্তোত্র ভিন্ন কবিতা ছিল না, অথবা তত্ত্ববিজ্ঞানের যুগে ললিত কলার আদর ছিল না, তাহা হইলে আর্য্যজাতির মানসিক প্রকৃতিতে একটা অস্বাভাবিক নূতনত্বের আরোপ করিতে হয়। ঋক এবং মন্ত্রাদি হইতেও বৈদিককালের সমাজের যে অস্ফুট ছবি পাওয়া যায়, তাহাতে যে ঐযুগে বহুবিধ কলার বিকাশ হইয়াছিল, তাহা বুঝিতে পারা যায়। ললিত কলা ছিল, কিন্তু ললিত সাহিত্য ছিল না, একথা বিশ্বাস হয় না।

কিন্তু কালের প্রভাব পরাভূত করিয়া যে সকল ললিত সাহিত্য একাল পর্য্যন্ত রহিয়া গিয়াছে, সে সকলগুলিই রামায়ণ এবং মহাভারত রচনার পরে সৃষ্ট। সেকালের

এবং একালের অনেক সাহিত্যেরই আখ্যানবস্তুর উৎস, এই রামায়ণ এবং মহাভারত। ভারতের কথঞ্চিৎ জ্ঞেয় কাব্যযুগের আদিতে, এই দুইখানি জগৎপ্রসিদ্ধ মহাকাব্য।

মহাভারতকে ইতিহাসই বলি, আর যাহাই বলি, উহা যে মহাকাব্য, তাহা সৌতি নিজেই স্বপ্রণীত অনুক্রমণিকায় স্বীকার করিয়াছেন। এরূপস্থলে ইয়ুরোপীয়েরা ইহাকে 'এপিক' বলিয়া, কেন যে বঙ্কিমবাবুর বিচারে দোষভাগী হইয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারি নাই। রামায়ণ সম্বন্ধেও রচয়িতার কথায় উল্লিখিত হইয়াছে :—

রসৈঃ শৃঙ্গার করুণহাস্য রৌদ্র ভয়ানকৈঃ
বীরাদিভি রসৈর্যুক্তং কাব্যমেতদগায়তাম্।

ধর্ম্মগ্রন্থ বলিয়া পূজিত হইলেও রামায়ণ মহাকাব্য; পঞ্চমবেদ বলিয়া কীর্ত্তিত হইলেও মহাভারত মহাকাব্য। প্রাচীন আলঙ্কারিকেরাও উভয়গ্রন্থকে মহাকাব্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।

সৌতি বলিয়াছেন, যে মহাভারতের আখ্যাত কথা লইয়া অনেক কাব্য সৃষ্ট হইয়াছে, এবং ভবিষৎকালে আরো হইবে। ভবিষৎকালে যাহা হইয়াছে এবং হইতেছে, তাহার সহিত বরং কিছু পরিচয় আছে; কিন্তু সৌতিবিরত মহাভারত রচিত হইবার পূর্ব্বে, জৈমিনি পৈল প্রভৃতির মহাভারত অবলম্বন করিয়া হউক, যে সকল ললিত সাহিত্য সৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া আভাস পাইতেছি, সেগুলির স্মৃতি পর্য্যন্ত বিলুপ্ত। সেইজন্যই বলিয়াছি, যে কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ে কাব্যযুগ কল্পনা করা যুক্তিসিদ্ধ নহে। তবে উপাদানের অভাবে সৌতি-বিবৃত মহাভারত এবং প্রচলিত সপ্তকাণ্ড রামায়ণ হইতেই, জ্ঞেয় কাব্যযুগের আরম্ভ ধরিয়া লইতে হইতেছে। মহাভারত এবং রামায়ণ, অতি প্রাচীনকালের কথা লইয়া রচিত হইলেও, অথবা পূর্ব্বে ঐবিষয়ে আর কোন গ্রন্থ প্রচলিত থাকিলেও, প্রচলিত মহাকাব্যদ্বয় যে অনেক পরবর্ত্তী সময়ে রচিত, সে কথায় কাহারও সন্দেহ নাই।

কিন্তু সে কথা বলিলেও সময় সম্বন্ধে কিছু বলা হইল না। ঐ উভয়গ্রন্থের মধ্যে কোন্‌খানি প্রথমে রচিত, এবং কোন্‌খানি আনুমানিক কোন্‌সময়ে রচিত, একথাগুলির বিচার করিবার প্রয়োজন। এই বিচারের পথে প্রথম বাধা এই, যে স্বদেশীয় বিদেশীয় সকল পণ্ডিতেরাই স্বীকার করিতেছেন, যে উভয় মহাকাব্যেই এবং বিশেষতঃ মহাভারতে, অনেক প্রক্ষিপ্ত অধ্যায় আছে। যতদিন এই প্রক্ষিপ্ত অধ্যায়গুলি বিশেষভাবে চিহ্নিত না হয়, ততদিন পর্য্যন্ত আভ্যন্তরিক লক্ষণ দ্বারা কাল নির্ণয় বা পূর্ব্ব-পরবর্ত্তিতা স্থিরীকৃত হওয়া সুকঠিন।

একটি কথা হয়ত সাহস করিয়া বলা যাইতে পারে। যে অধ্যায়গুলি কেহই যুক্তিদ্বারা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া প্রমাণ করেন নাই, সেগুলি পাঠ করিলেও বুঝিতে পারা যায়, যে উভয় মহাকাব্যই বেদ, ব্রাহ্মণ, কতকগুলি উপনিষৎ, ধর্ম্মসূত্র, নীতিসূত্র, ষড়দর্শন প্রভৃতি রচিত হইবার পরে রচিত। উভয়গ্রন্থেই ঐ সকল সাহিত্যের অথবা তদন্তর্গত মতবাদের ভূয়োভূয়ঃ উল্লেখ আছে। জৈমিনি পতঞ্জলি প্রভৃতির পরবর্ত্তী গ্রন্থ, যে বৌদ্ধধর্ম্মের আবির্ভাবের অনেকপরে রচিত, তাহা হয়ত বলিতে হইবে না। পতঞ্জলি খৃঃ পূঃ ২য় শতাব্দীতে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। এ সকল কথার প্রমাণ, পরে আরো বিশেষভাবে দেখাইবার প্রয়োজন হইবে। তথাপি এখানে আরও দুইএকটি কথার সাধারণ উল্লেখ করিয়া রাখি। চৈত্য এবং বিহার বৌদ্ধদিগের সামগ্রী; মহাভারতের অনেকস্থানে উহার উল্লেখ আছে। সভাপর্ব্বে একথাও উল্লিখিত আছে, যে শ্রীকৃষ্ণ হিমালয়ের উত্তরদেশে তপস্যা করিয়া যখন সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, তখন ব্রাহ্মণদিগকে চৈত্যদান করিয়াছিলেন। সময়টা বৌদ্ধযুগের পরবর্ত্তী, অথচ হিন্দুদিগের নূতন মন্দিরগঠনযুগের পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়া মনে হয়। এ সম্বন্ধেও বিশেষ বিচারের প্রয়োজন হইবে। সম্ভবতঃ বৌদ্ধযুগেই এদেশে প্রস্তরলিপির আরম্ভ; অন্ততঃ এ পর্য্যন্ত যাহা জানা গিয়াছে, তাহাতে তাহাই মনে হয়। উদ্যোগপর্ব্বের ৮৬ অধ্যায়ে প্রস্তরফলকস্থিত লেখার কথা দেখিতে পাই। শান্তিপর্ব্বের ২১৮ অধ্যায়ে, সাংখ্য মতের ব্যাখ্যা, নাস্তিক মত খণ্ডন এবং "ক্ষণিক বিজ্ঞানবাদী সৌগত" দিগের মতের নিন্দা আছে। অনুশাসন পর্ব্বের ১৪২ অধ্যায়ে, মুণ্ডিতমস্তক কষায়ধারী (বৌদ্ধ) ভিক্ষুদিগকে স্বেচ্ছাচারী তপস্বী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। রামায়ণের অযোধ্যা কাণ্ডের ৪৬ সর্গে রাবণকে

(বৌদ্ধ) ভিক্ষু সাজান হইয়াছে ; এবং ৭৩ ও ৭৪ সর্গে সিদ্ধা শ্রমণীর কথা আছে। অযোধ্যাকাণ্ডের ১০৯ সর্গে, বৌদ্ধদিগের প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপর গালিবর্ষণ করিতে গিয়া, যে দিঙ্‌নাগের ন্যায়শাস্ত্রের উপর কটাক্ষ করা হইয়াছে, তাহাতে যেন আর সন্দেহ থাকে না। কেহ কেহ বলিতে চাহেন, যে এসর্গটি প্রক্ষিপ্ত। জাবালির কথা সম্বলিত ১০৮ সর্গ যদি প্রক্ষিপ্ত না হয়, তাহা হইলে পরবর্ত্তী সর্গ কি করিয়া প্রক্ষিপ্ত হইবে ? ঐ উভয় সর্গ বাদ দিলে, যে যুক্তির বলে রাম গৃহপ্রত্যাগত হইলেন না, তাহা বাদ যায়। এরূপস্থলে প্রক্ষিপ্তের কথাটা জোর করিয়া না বলাই ভাল। ঐ ১০৯ অধ্যায়ে শ্রীরামচন্দ্র তাঁহার বক্তৃতার "পেরোরেশুনে" বলিতেছেন :—

যথাহি চোরঃ স তথাহি বুদ্ধ
স্তথাগতং নাস্তিক মত্র বিদ্ধি।
তস্মাদ্ধি যঃ শক্যতমঃ প্রজানাং
স নাস্তিকে না ভিমুখো বুধঃ স্যাৎ।

অন্য রামায়ণ ছিল কি না, অন্য মহাভারত ছিল কি না, সেসকল কথার বিচার পরিত্যাগ করিয়া, যাহা দেখিতে পাই, তাহা এই, যে রামায়ণ ও মহাভারত বৌদ্ধ-ধর্ম্মের অভ্যুদয়ের পরে রচিত। এখন একথায় পণ্ডিত-মণ্ডলীর মধ্যে মতদ্বৈধও নাই। কিন্তু সেকথা বলিলেও সময় নির্ণয় হইল না ; অর্থবা ঐ উভয় মহাকাব্যের মধ্যে কোন্‌খানি প্রথমে রচিত, তাহাও বুঝিতে পারা গেল না।

আমি সুবিধার হিসাবে, প্রথমতঃ রামায়ণ এবং মহাভারতের মধ্যে, কোন্‌খানি প্রথমে রচিত হইয়াছিল, এইকথার যথাসাধ্য বিচারের পর, উভয়গ্রন্থের রচনা-কাল নির্ণয়ের চেষ্টা দেখিব।

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার।

খাসিয়াজাতি।

আকৃতি ও বস্ত্রপরিধান-প্রণালী।

পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে খাসিয়াগণ মঙ্গোলীয় বংশ-সম্ভূত। মঙ্গোলীয় আকৃতি তাহাদের মুখের উপর সুস্পষ্ট-ভাবে মুদ্রিত রহিয়াছে। তাহাদের ললাট উচ্চ ও প্রশস্ত, নাসিকা খর্ব্বাকৃতি, কপোলাস্থি অত্যুন্নত, চক্ষু নাতি-ক্ষুদ্র নাতিবৃহৎ এবং শ্মশ্রু বিরলকেশ। সর্ব্বদা উচ্চ-স্থান আরোহণে জঙ্ঘাদ্বয় নিতান্ত স্থূলাকার ধারণ করিয়াছে। বিদেশীয়গণের সংমিশ্রণে যেসকল বর্ণ-শঙ্করের উৎপত্তি হইয়াছে, তাহাদের মুখাকৃতির অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে এবং তাহাদের পুত্রপৌত্রাদি বংশ-পরম্পরায় এই পরিবর্ত্তনের ভাব আরও বর্দ্ধিত হইয়া গিয়াছে। বর্ণশঙ্করের সংখ্যা এই জাতির মধ্যে নিতান্ত কম নহে। গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ লোক খাসিয়াদিগের মধ্যে অধিক দৃষ্ট না হইলেও একবারে বিরল নহে। খাসিয়াগণ সাধারণতঃ মধ্যাকৃতি। তাহাদের মধ্যে নিতান্ত দীর্ঘাকার ও স্থূলকায় লোক একবারেই দেখা যায় না। দুইজন মাত্র স্থূলকায় লোক দেখিতে পাইয়াছি, কিন্তু বঙ্গদেশ বা উত্তরপশ্চিম প্রদেশের ধনীদিগের ন্যায় ভুঁড়িবিশিষ্ট লোক কখনও আমার নয়নপথে পতিত হয় নাই। একদিকে শীতপ্রধানদেশ এবং অন্যদিকে দরিদ্রতা তাহাদিগকে সর্ব্বদা কঠোর পরিশ্রম ও নানাস্থান ভ্রমণে বাধ্য করি-য়াছে ; সুতরাং উদর স্থূলাকার ধারণ করিবার অবসর পায় নাই। তাহারা সাধারণতঃ বলিষ্ঠকায় হইলেও চির সুস্থ ও দীর্ঘজীবী নহে। অধিকবয়স্ক বৃদ্ধের সংখ্যা বড় দেখিতে পাওয়া যায় না।

সভ্যতার আলোকপ্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বে খাসিয়াগণ নিতান্ত সামান্যরূপ বস্ত্র পরিধান করিত। ৩ বা ৪ হাত দীর্ঘ এবং অর্দ্ধ হস্ত পরিসর একখণ্ড মোটা কার্পাসবস্ত্র কৌপীনরূপে ব্যবহৃত হইত এবং সেইরূপ আর এক খণ্ড অনেকেই মস্তকে পাগড়ী বাঁধিত। এই পাগড়ীর পরি-বর্ত্তে কেহ কেহ একপ্রকার কিম্ভূতকিমাকার টুপী ব্যবহার করিত। একখানা দুইহাত লম্বা তোয়ালে দুই পাট করিয়া সেই ভাঁজের মধ্যস্থানে কতকটা ছিঁড়িয়া তাহার মধ্যে মাথা প্রবেশ করাইয়া দিলে এবং শরীরের উভয় পার্শ্বস্থ তোয়ালের দুই কিনারা একত্র সেলাই করিলে যেরূপ দেখায়, একপ্রকার মোটা কাপড়ে সেইরূপ আকারের অঙ্গ-রক্ষক প্রস্তুত করিয়া ইহারা পরিধান করিত।* ২০।২৫ বৎসর পূর্ব্বে খাসিয়াপুরুষগণের এই বেশ ছিল, এবং এখনও

* এইরূপ একটি জামা আমি লেখকমহাশয়ের নিকট উপহার পাইয়াছিলাম। সম্পাদক

পাহাড়ের অন্ততঃ একদশমাংশ লোকে এই বেশ ব্যবহার করিতেছে। "আদিম বেশে খাসিয়া" বলিয়া যে চিত্র মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাও বর্ত্তমানসময়ের লোকের প্রতিকৃতি। বেশ আবার ভিন্ন সময় ও অবস্থার জন্য ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ছিল। কোথায়ও যাইবার সময় এই অঙ্গরক্ষকের উপর একখানা মোটা কার্পাস চাদর বা এণ্ডিবস্ত্র ব্যবহৃত হইত। নৃত্যকালে খাসিয়াগণ সুরঞ্জিত মূল্যবান অঙ্গরক্ষক মোগার (তসরের) ধুতি ও পাগড়ী, প্রবাল-মালা, কুণ্ডল প্রভৃতি অলঙ্কার, শরপূর্ণ তূণ, ঢাল তরবার প্রভৃতি অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইত এবং এখনও সেইরূপ হইয়া থাকে। যোদ্ধৃবেশও স্বতন্ত্র প্রকারের ছিল।

পূর্ব্বে রমণীগণের বস্ত্রপরিধানপ্রণালী সুরুচিসম্পন্ন ছিল না। একহস্ত পরিসর ও দুইহস্ত দীর্ঘ ডোরা ডোরা বিশিষ্ট একখণ্ড মোটা বস্ত্রে তাহারা কটিদেশ বেষ্টন করিয়া তাহা রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিত। আর একখণ্ড ২॥ হাত দীর্ঘ মোটা রেশমের কাপড় লম্বালম্বি সম্মুখ দিকে ঝুলাইয়া দিয়া তাহার একপ্রান্ত একহস্তের নীচে দিয়া লইয়া বিপরীতদিকের স্কন্ধের উপর অপরপ্রান্তের সঙ্গে গ্রন্থি বন্ধন করিত। এইরূপ আর একখণ্ড অপরদিকের স্কন্ধের উপরও গ্রন্থিবদ্ধ হইত। দীর্ঘ বস্ত্র হইলে তাহার দুইপ্রান্ত দুইস্কন্ধের উপর গ্রন্থিবদ্ধ হইয়া শরীরের দুইপার্শ্বে পড়িত। তাহার উদ্বৃত্ত অংশ অবশ্য পৃষ্ঠেরদিকে থাকিত। এই বস্ত্রে অবশ্য অনেক সময় উপযুক্তরূপ লজ্জা নিবারণ হইত না। অবস্থাপন্ন স্ত্রীলোকেরা একখানা এণ্ডির চাদর দুই ভাঁজ করিয়া পশ্চাদ্দিক হইতে শরীর বেষ্টন করিয়া সম্মুখের দিকে গলার নিম্নে দুইপ্রান্ত বন্ধন করিয়া দিত। পূর্ব্ব সময়ের এই বস্ত্রপরিধান প্রণালী এখনও অনেক পল্লীগ্রামবাসিনী রমণীগণের মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে। পুরুষদিগের ন্যায় রমণীগণও সময়োপযোগী ভিন্ন ভিন্নরূপ বস্ত্র পরিধান করিত। কয়েকপ্রকারের স্বর্ণ ও রৌপ্যনির্ম্মিত অলঙ্কার তাহারা ব্যবহার করিত। অন্যান্যজাতির ন্যায় কাঁসাপিত্তলের অলঙ্কারের প্রচলন তাহাদের মধ্যে ছিল এরূপ কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রবাল-মালাই তাহাদের প্রধান অলঙ্কার। ইহার নিকৃষ্ট একছড়া



অবস্থাপন্ন খাসিয়া রমণী (নর্ত্তকীবেশে)।

মালার মূল্য অন্ততঃ ৫০।৬০ টাকা এবং অত্যুৎকৃষ্ট ৭।৮০শত টাকার কমে পাওয়া যায় না। একটি প্রবালের পর একটা স্বর্ণের দানা এইরূপ পর্য্যায়ক্রমে মালা গ্রথিত হয় এবং প্রবালের আকার যত বড় হয়, তদনুসারে স্বর্ণদানার আকারও বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। খাসিয়াগণ খ.টিস্বর্ণ ব্যতীত প্রায়ই ব্যবহার করিত না।

যদিও আদিম বেশভূষা একবারে পাহাড় হইতে উঠিয়া যায় নাই, কিন্তু যে সকল স্থানে সভ্যতার আলোক প্রবেশ করিয়াছে, অথবা যে গ্রামের লোকে দুই একবার সহরে বা কোনও সভ্যগ্রামে আসিয়াছে, তথাকার লোকের বস্ত্রপরিধানপ্রণালীর আমূল পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। পুরুষদিগের মধ্যে অধিকাংশ লোকে থানফাড়া ধুতি, এবং কেহ কেহ পেড়ে ধুতি ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে। কামিজ ও সাহেবী কোট মোটা অঙ্গরক্ষককে সুদূরবর্ত্তী গ্রামে তাড়াইয়া দিয়াছে। ওয়েষ্টকোটও যথেষ্ট প্রচলিত হইয়াছে। পাগড়ী বা টুপী মস্তক অধিকার করিয়াছে এবং বিলাতী নানাপ্রকারের বস্ত্র অথবা এণ্ডির চাদর গাত্রবস্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইতেছে। অবস্থাপন্ন লোকে জুতা ও মোজা পরিতে আরম্ভ করিয়াছে। খৃষ্টান ও নখৃষ্টান কতকগুলি ব্যক্তি কোট পেণ্টুলেন আশ্রয় করিয়াছে, এবং হ্যাটও একবারে বাদ যায় নাই। সময়ে সময়ে দুই একটা গাউন এবং বনেটও চক্ষে পড়িয়া থাকে।

বস্ত্রপরিধান প্রণালীর যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে। বিশেষতঃ খাসিয়ারমণীগণ সেমিজ, জ্যাকেট এবং অন্যান্য বস্ত্র সকল এরূপ প্রণালীতে পরিধান করিতে শিক্ষা করিয়াছে যে তাহা সুরুচি এবং সৌন্দর্য্যে অনেক সভ্য রমণীদিগের বস্ত্রপরিধানপ্রণালীকে পরাস্ত করিয়াছে। খাসিয়াগণ এ সম্বন্ধে বিলাসিতার উচ্চসোপানে আরোহণ করিয়াছে। যাহারা সভ্য হইয়াছে তাহাদের অনেকেই অবস্থার অতীত অর্থ বস্ত্রের জন্য ব্যয় করিয়া থাকে। জোয়াই, চেরাপুঞ্জী এবং শিলঙে এত প্রকার বিলাতী সুন্দর বস্ত্র পাওয়া যায় যে বঙ্গদেশের অনেক সহরে তাহা মিলে না। অনুকরণপ্রিয়তা এতই প্রবল হইয়াছে যে নূতন একটা কিছু দেখিলে তাহা ব্যবহার করিতেই হইবে। একবার বার টাকা বেতনের এক যুবক কলিকাতার এক বিলাতী দোকান হইতে ডাকে ১৬৲ টাকা মূল্যের একযোড়া বুট কিনিয়াছিল। এদিকে পরিধানে ৬।৭ হাত দীর্ঘ ও দুইহাত প্রস্থ মলিন থান এবং তদুপযোগী জামা ও পাগড়ী, তাহার সঙ্গে এই বুটের সম্মিলনে যে দৃশ্য হইয়াছিল, তাহা না দেখিলে ধারণা করা যায় না।

খাদ্যদ্রব্য ও রন্ধনপ্রণালী।

পরিধেয় ব্যাপারে খাসিয়াগণ যতদূর উন্নতি করিয়াছে, খাদ্যদ্রব্য এবং রন্ধনপ্রণালী সম্বন্ধে তাহারা ততদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। ভাত, মৎস্য এবং মাংসই তাহাদের প্রধান খাদ্য। টাট্কা মৎস্য অনেকসময় এবং অনেকস্থানে পাওয়া যায় না বলিয়া শুষ্ক মৎস্য বা শুঁটকী যথেষ্ট ব্যবহৃত হইয়া থাকে। সুবিধার জন্য শুষ্ক মাংসও তাহারা ব্যবহার করিয়া থাকে। যাহারা সভ্য হইয়াছে তাহারা অনেকে সকল প্রকার মাংস ভোজন করেনা বটে, কিন্তু সাধারণ লোকের সে সম্বন্ধে বিশেষ কোনও আপত্তি নাই। বাল্যকালে আমার একবন্ধু পরিহাসছলে বলিতেন যে খেচরের মধ্যে ঘুঁড়ী, ভূচরের মধ্যে খাট এবং জলচরের মধ্যে নৌকা এই কয়টা ব্যতীত আর সকলই তিনি আহার করিয়া থাকেন। পল্লীগ্রামবাসী অনেক খাসিয়া সম্বন্ধে একথা খাটে। খেচরের মধ্যে খাসিয়াদিগকে কাক ও চিল ব্যতীত আর কিছু বাদ দিতে দেখি নাই। জলচরের মধ্যেও কিছু বাদ যায় না। ভেক অবশ্য মৎস্যের মধ্যেই গণ্য। তবে ভূচরের মধ্যে কিছু কিছু বাদ যাইতে দেখা যায়। আমার এক ১৪।১৫ বৎসর বয়স্ক ভৃত্য ছিল। অপর এক বালক তাহার সঙ্গে খেলা করিতে আসিত। একদিন সন্ধ্যাকালে তাহারা অনেক দৌড়াদৌড়ী করিয়া একটা চামচিকা ধরিয়া চিমনীর আগুনে পোড়াইয়া ভক্ষণ করিল। পরবর্ত্তী আর এক ভৃত্যের বৃদ্ধা মাতামহী আছে। সে বিড়াল-পরিত্যক্ত ইন্দুর পাইলে পরমানন্দে রন্ধনপূর্ব্বক ভোজন করে। শোঁয়াপোকার ন্যায় এক প্রকার পোকা সরল গাছে (pine) জন্মিয়া থাকে। তাহা ভাজিয়া বাজারে বিক্রয় করা হয়। বলা বাহুল্য তাহার ক্রেতারও অভাব নাই। কিন্তু শুকর মাংসকেই সকলে উৎকৃষ্টতম খাদ্য বলিয়া থাকে। একজন খাসিয়া এক বড় ইংরাজ কর্ম-

চারীর খানসামারূপে ব্রহ্মদেশ ও ভারতবর্ষের অনেকপ্রধান স্থান ঘুরিয়া আসিয়াছিল। সে একদিন তাহার সঙ্গীদিগকে বলিতেছিল, "অনেকপ্রকার খাদ্যদ্রব্য খাইয়াছি। কিন্তু যাহাই বল ভাই, শূকরমাংসের ন্যায় কিছুই আর পৃথিবীতে দেখি নাই।" শূকরের গাত্রের লোমগুলি মাত্র পোড়াইয়া ফেলে, নতুবা আর কিছুই বাদ যায় না। গরুর সিং, দাঁত এবং চর্ম্ম মাত্র পরিত্যক্ত হইয়া থাকে। অন্ত্র সকল হইতে মল বাহির করিয়া তাহা জলে ধৌত করা হয় এবং পরে রন্ধন করা হইয়া থাকে। তাহারা বিন্দুমাত্র রক্ত ফেলিয়া দেয় না। তাহাতে ভাত পাক করে, অথবা তাহা নাড়ীর ভিতর প্রবেশ করাইয়া তাহার দুইপ্রান্ত বাঁধিয়া সিদ্ধ করিয়া ভোজন করে।

বাঙ্গালাদেশে যেমন লোকে তাড়াতাড়ি কোথায়ও যাইবার প্রয়োজন হইলে অথবা বিদেশে পথেঘাটে কোথায়ও রন্ধন করিতে হইলে সুবিধার জন্য ভাতের সহিত আলু বা অন্য কিছু সিদ্ধ করিয়া ভোজন করে, খাসিয়াগণ সেইরূপ শুঁটকী মৎস্য পোড়াইয়া তাহা লবণ ও লঙ্কা সহযোগে ভাতের সহিত পরম তৃপ্তিপূর্ব্বক আহার করে। কেবল সুবিধার জন্যই যে তাহারা এরূপ ভোজন করে তাহা নহে, কিন্তু দরিদ্র সাধারণ লোকদিগের অনেকের প্রাত্যহিক আহার্য্যই অনেক সময়ে এইরূপ হইয়া থাকে। কৃষিক্ষেত্র, কর্ম্মস্থান এবং অন্য কোনও দূরবর্ত্তী স্থানে যাইবার সময় তাহারা সুপারীগাছের খোলায় করিয়া ভাত ও দগ্ধ শুঁটকী অথবা অন্য মৎস্য লইয়া যায়। তাহাদ্দারাই তাহাদের জলযোগের কার্য্য চলিয়া যায়। দগ্ধ করিবার জন্য শুষ্ক মৎস্য যখন চুল্লিতে নিক্ষিপ্ত হয়, তখন তাহার গন্ধ অন্যের নিকট অসহনীয় বোধ হইলেও খাসিয়াগণ কোনও অসুবিধা অনুভব করে না। বর্ত্তমান সময়ের সভ্য খাসিয়াগণও দগ্ধ শুঁটকীর স্বাদ বিস্মৃত হইতে পারে নাই। শুঁটকী পোড়াইলে তাহা এত কঠিন হইয়া যায় যে কখন কখন খাইবার সময় মুখ ক্ষত বিক্ষত হইয়া রক্ত বাহির হইয়া থাকে। তাহারা যে কেবল শুঁটকী পুড়াইয়া থাকে তাহা নহে, কিন্তু তাহার দ্বারা ব্যঞ্জনও রন্ধন করিয়া থাকে। নিম্নশ্রেণীর খাসিয়াকে দুইএকস্থলে সূর্য্যদগ্ধ ক্ষুদ্র মৎস্য খাইতে দেখিয়াছি। কয়েকবৎসর পূর্ব্বে আমার এক বন্ধুর গৃহে কয়েকজন খাসিয়া কুলি কাজ করিতেছিল। তাহাদের মধ্যে এক রমণী শুঁটকী দগ্ধ করিবার জন্য তাহার পতির নিকট অগ্নি চাহিল। তখন গৃহে অগ্নি না থাকাতে সেই রমণী শুঁটকী মৎস্য কক্ষপুটে কিয়ৎক্ষণ রাখিয়া তাহা একটু উষ্ণ হইলে ভাতের সহিত ভক্ষণ করিল। এরূপ অপূর্ব্ব চুল্লীর ব্যবহার অবশ্য আমি নিজে কখনও দেখি নাই। এরূপ ঘটনা তাহাদের মধ্যে নিতান্ত বিরল বলিয়া মনে হয়; সম্ভবতঃ সেই রমণীর অত্যধিক বুভুক্ষা এবং তৎসঙ্গে অগ্নির অভাবই তাহার মধ্যে এইরূপ উদ্ভাবনীশক্তিকে জাগ্রত করিয়া দিয়াছিল।

শ্রীহট্টবাসী নিম্নশ্রেণীর মুসলমানদিগের রন্ধনপ্রণালী এবং খাসিয়াদিগের রন্ধনপ্রণালীর মধ্যে অনেক সাদৃশ্য আছে। খাসিয়াগণ সাধারণতঃ লঙ্কা, লবণ ও কাঁচা হরিদ্রা মশলারূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। কেহ কেহ গোলমরিচও ব্যবহার করে। কোন কোনস্থানের লোকের মধ্যে তৈলের প্রচলন প্রায়ই নাই। যাহারা এখনও আদিম অবস্থাতে রহিয়াছে, তাহারা রন্ধনের সময় ব্যঞ্জনের মধ্যে একটু লবণ ও কয়েকটি লঙ্কা ছিঁড়িয়া দিয়া থাকে। কোন কোনস্থানের লোকের মধ্যে এরূপও দেখা যায় যে সুবিধার জন্য অথবা শীঘ্র শীঘ্র কার্য্য শেষ করিবার জন্য তাহারা দুই একখণ্ড কাঁচা হরিদ্রা চর্ব্বণ করিয়া তাহার নিষ্ঠীবন ব্যঞ্জনে মিশ্রিত করিয়া লয়। সভ্য খাসিয়াগণের রন্ধনপ্রণালী অবশ্য অনেকাংশে শ্রেষ্ঠতর। অগ্নির উত্তাপে অর্দ্ধসিদ্ধ মৎস্য (খারাং) এবং ভর্জিত মৎস্যখণ্ডও (খাড়ুকি) বাজারে বিক্রয় হইয়া থাকে।

খাসিয়াগণের মধ্যে কোনও রূপ মিষ্টান্ন পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল না। তণ্ডুল ও শূকরচর্ব্বির দুইচারিপ্রকার পিষ্টক বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। তাহারা দুগ্ধঘৃতাদি খাইতে জানিত না। যাহারা সভ্যতার আলোক প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা অল্পে অল্পে দুগ্ধাদি ব্যবহার করিতে শিখিতেছে। পূর্ব্বে খাসিয়াগণ গাভীদোহন করিত না। বিক্রয়ের জন্য গবাদি পালন করিত এবং মাংসভোজনের জন্যই প্রধানতঃ তাহা ব্যবহৃত হইত। এখনও কেবল সভ্যগ্রাম ও তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানের লোকে দুগ্ধ দোহন করিয়া থাকে। সভ্য খাসিয়াগণ চা-



৺মোহন রায় ও তাঁহার পরিবারবর্গ।

পান করিতে শিক্ষা করিয়াছে, এজন্য তাহাদের দুগ্ধের প্রয়োজন হইয়াছে। খাসিয়ারা নূতন যাহা কিছু শিক্ষা করে, তাহার অত্যাধিক ব্যবহারই করিয়া থাকে। অত্যধিক চা-পান-জনিত রোগও সুভ্য খাসিয়াগণের মধ্যে দেখা দিয়াছে। কয়েকবৎসর হইল এক খাসিয়ারমণীর অত্যন্ত সর্দ্দি হইয়াছিল। সে শুনিয়াছিল যে চা খাইলে সর্দ্দি সারিয়া যায়। তাই সে জলের সঙ্গে কয়েক পয়সার চা ও চিনি মিশাইয়া তাহাতে ২।৩টা ডিম্ব ভাঙ্গিয়া দিয়া চুল্লীতে অনেকক্ষণ রন্ধন করিয়াছিল। বলাবাহুল্য যে এই চা সে গলাধঃকরণ করিতে সক্ষম হয় নাই। যাহা-হউক অল্প কয়েকবৎসরের মধ্যে চা'র ব্যবহার খুব বাড়িয়া যাইতেছে।

খাসিয়াপাহাড়ের উপত্যকাসকলের মধ্যে অনেক-প্রকার ফল জন্মিয়া থাকে এবং খাসিয়াগণ ফল মূল খাইতে অতিশয় ভালবাসে। দরিদ্রলোকে ফল মূল খাইয়া দিন কাটাইয়া দিতে পারে। অনেক পল্লীগ্রামের দরিদ্র লোকে সকল সময়ে অন্নাহার করিতে পারে না। তাহারা ভুট্টা, পার্ব্বত্য জোয়ার (Job's tears) এবং অন্যান্য স্থানীয় শস্যের চাষ করিয়া থাকে। এই সকল শস্য, কচু, ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের আলু এবং মাংসাদির দ্বারা তাহারা উদর পূর্ত্তি করিয়া থাকে। এইরূপ ভোজনে অভ্যস্ত বলিয়াই দরিদ্র খাসিয়াদিগকে প্রায়ই দুর্ভিক্ষের প্রকোপে নিপতিত হইতে হয় না।

কার্য্য, ব্যবসায় ইত্যাদি।

শিক্ষিত খাসিয়াগণের মধ্যে কয়েকজন শিলং সহরে সরকারী আফিসে কার্য্য করিতেছে। একব্যক্তি পূর্ত্তবিভাগে সুপারভাইজরের পদ (Supervisor) প্রাপ্ত হইয়াছে। পুলিস বিভাগে ৫ জন সবইনস্পেক্টরের কার্য্য এবং কয়েকজন হেড ও রাইটর কনষ্টেবলের কার্য্য করিতেছে। ডহরীনামক একজন বি, এ, উপাধিধারী যুবক সবডেপুটী কলেক্টরের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন। ইঁহার

পূর্ব্বে মোহন রায় নামক একব্যক্তি পুলিস সবইনেস্পেক্টরের পদ হইতে ইহাতে উন্নীত হইয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহারই পদে ডহরী নিযুক্ত হইয়াছেন। সুসভ্য খাসিয়াগণের কথা বলিতে গেলে সর্ব্বাগ্রে জীবন রায়ের বিষয় উল্লেখ করা প্রয়োজন। আপনার প্রতিভাবলে সামান্তপদ হইতে তিনি একষ্ট্রা আসিষ্টান্ট কমিশনারের (ডেপুটী মেজিষ্ট্রেটের) পদে আরোহণ করিয়াছিলেন। কয়েকবৎসর হইল তিনি পেন্সন গ্রহণ করিয়া কার্য্য হইতে অপসৃত হইয়াছেন। নিজ দেশের উন্নতিসাধনের জন্ত কোন কোন জনহিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। ইনি গভর্ণমেণ্টের নিকট হইতে চূণপাথরের খনি লইয়াছেন এবং আপনার শিক্ষাপ্রাপ্ত পুত্রগণকে সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত না রাখিয়া তাহাদিগকে চূণপাথরের সুবৃহৎ কারবারে নিয়োজিত করিয়াছেন।

স্থানীয় খৃষ্টিয়ান মিশনের অধীনে অন্যূন তিন শত লোক শিক্ষকতা-কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। তাহাদের সকলেই খৃষ্টিয়ান ধর্ম্মাবলম্বী। শিক্ষকতাকার্য্যের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদিগকে ধর্ম্মপ্রচারও করিতে হয়। দুইজন খাসিয়া স্কুল সবইনস্পেক্টরের পদও প্রাপ্ত হইয়াছে। দেশীয় রাজাদিগের অধীনেও অল্পসংখ্যক লোকে চাকুরী করিতেছে। যাহারা সরকারী বা অন্ত কোনওরূপ চাকুরী প্রাপ্ত হয় নাই, তাহারা ব্যবসায় বা ঠিকাদারের (Contractor) কার্য্যে লিপ্ত আছে।

অশিক্ষিত খাসিয়াগণ কৃষিকার্য্য, মজুরী, ব্যবসায়, ভৃত্যের কার্য্য, সূত্রধর, রাজমিস্ত্রী, বাহক, ঠিকাদার প্রভৃতি নানাপ্রকার কার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে। অন্তদেশে যে ব্যক্তি সূত্রধরের কার্য্য করে, সে রাজমিস্ত্রী বা ঘরামীর কাজ জানে না। কিন্তু এরূপ অনেক খাসিয়া দেখা যায়, যাহারা প্রত্যেকেই ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করিতে জানে। তাহাদিগকে Jack of all trades (সর্ব্বকর্ম্মান্বিত) বলা যাইতে পারে। কার্য্যের অভাবই তাহাদিগকে নানা ব্যবসায় শিক্ষা করিতে বাধ্য করিয়াছে। যদ্যপি তাহারা কেবল এক ব্যবসায়ের উপর নির্ভর করিত, তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে জীবিকার্জ্জন করা নিতান্ত কঠিন হইত। খাসিয়াগণ প্রস্তরের দেয়াল ও পোল নির্ম্মাণ এবং পার্ব্বত্য প্রদেশে রাস্তা প্রস্তুত করিতে, বিশেষ পটু; এজন্য সময়ে সময়ে তাহাদিগকে অধিক বেতন দিয়া নাগা ও লুসাই পর্ব্বত এবং মণিপুর প্রভৃতি স্থানে প্রেরণ করা হইয়া থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে রোগাক্রান্ত হইয়া তখন অধিকাংশ লোকই মৃত্যু-মুখে নিপতিত হয়।



কাষ্ঠবহন।

চূণপাথরের খনিতে কাজ করিয়া অনেক লোকে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে। অনেকস্থানের লোকে সম্পূর্ণভাবে কৃষিকার্য্যের উপরে নির্ভর করিয়া থাকে। জয়ন্তীয়া পাহাড়ের অনেকস্থানে প্রচুর পরিমাণে ধান্ত উৎপন্ন হয়। খাসিয়াপাহাড়ের অনেক পল্লীগ্রামে লোকে ভুট্টা, জোয়ার এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পার্ব্বত্য শস্ত উৎপাদন করিয়া থাকে। কিন্তু গোলআলুর চাষই সর্ব্বাপেক্ষা লাভ-

জনক। খাসিয়াপাহাড়ের আলু বঙ্গদেশের অনেক স্থানে রপ্তানি হইয়া থাকে। বৎসরে ২।৩ বার আলুর চাষ হইয়া থাকে। গভর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে ভিন্ন ভিন্ন দেশ হইতে আলু আনিয়া বীজের জন্য তাহা উপযুক্ত লোকদিগকে বিনা-মূল্যে প্রদান করিয়া থাকেন। আলুর ব্যবসায়ে এবং বহনকার্য্যে শত শত লোকের জীবিকা অর্জ্জিত হইয়া থাকে। তুলা, তেজপত্র, মরিচ, দারুচিনি, মধু প্রভৃতি অন্যান্য অনেক পাহাড়-জাত পণ্য দ্রব্য আছে। খাসিয়াপাহাড়ের কমলা চিরপ্রসিদ্ধ। উপত্যকাবাসিগণ কমলা, পান, সুপারী, কদলী, কাঁঠাল, লঙ্কা, হরিদ্রা প্রভৃতির চাষ করিয়া যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিয়া থাকে। তাহাদের অবস্থা সাধারণতঃ অনেক পরিমাণে সন্তোষজনক বলা যাইতে পারে। খাসিয়াপাহাড়ে স্ত্রীস্বাধীনতা থাকাতে রমণীগণ কার্য্যক্ষেত্রে পুরুষের সহযোগিনীরূপে নানা প্রকারের কার্য্য করিয়া থাকে। পক্ষান্তরে পুরুষগণকে আবার গৃহকার্য্যে রমণীদিগের সহায়তা করিতে দেখা যায়। কৃষিকার্য্য, ব্যবসায়, মজুরী এবং ভৃত্য ও বাহকের-কার্য্যই প্রধানতঃ রমণীগণের অবলম্বন। কতকগুলি খৃষ্টিয়ান রমণী শিক্ষয়িত্রীরূপে স্থানীয় ওয়েলস্ মিশনের অধীনে কার্য্য করিতেছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীনীলমণি চক্রবর্ত্তী।

পাশ্চাত্যদেশে সংস্কৃতভাষার চর্চ্চা।

ইউরোপবাসীদিগের ভিতর সংস্কৃতভাষার চর্চ্চা হইবার নিম্নলিখিত তিনটী কারণ প্রধান :—

১। ধর্ম্মবিষয়ক তর্ক।

২। হিন্দু-আইন-সংক্রান্ত মোকদ্দমার বিচার।

৩। ভাষাতত্ত্ব নির্ণয়।

যখন সমুদ্রপথদ্বারা পোর্টুগীসজাতির সুবিখ্যাত



কালিকটের জামোরীনের দরবারে ভাস্কো ডি গামা।

নাবিক ভাস্কো ডি গামা ভারতে আইসেন এবং যখন ক্রমশঃ এই দেশের কিয়দংশ ঐজাতির করায়ত্ত হয়, তখন তাঁহারা এইদেশে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে কৃতসংকল্প হন। ঐজাতি রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ভুক্ত খৃষ্টান।

ফ্রান্সিস্ জেভিয়ার নামক পোর্টুগীসজাতির প্রথম রোমান ক্যাথলিক পাদরী ১৫৪৫ খৃষ্টাব্দে এইদেশে আসেন। নিজের পবিত্র চরিত্রের বলে ও অসাধারণ অমায়িকতার গুণে তিনি অনেককে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করিতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি এদেশের কোন ভাষায় ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে 'I do not understand that people nor do they understand me.'

তাঁহার পর ১৬০৬ খৃষ্টাব্দে রবার্ট ডি নোবিলি নামধারী একজন পাদরী দক্ষিণভারতে মাদুরানামক স্থানে নিজ কার্য্যক্ষেত্র মনোনীত করেন। ভারতবাসীরা অজ্ঞ নহে; বিশেষতঃ হিন্দুদিগের ভিতর ব্রাহ্মণেরা অত্যন্ত বিদ্বান্ ও বুদ্ধিমান্। ধর্ম্মবিষয়ে তর্ক করিয়া তাঁহাদিগকে পরাজয় করা যে নিতান্ত কঠিন ব্যাপার, তাহা তিনি ভালরূপে অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। ভারতে বৌদ্ধধর্ম্মের লোপ পাইবার একটী প্রধান কারণ এই উল্লিখিত হইয়াছে

যে তাহাদিগের ভিক্ষুরা ধর্ম্মতর্কে পরাজিত হইলে মন্দির ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইতেন। *

যেস্থলে (অর্থাৎ মাদুরায়) নোবিলি নিজ কার্য্যক্ষেত্র স্থাপন করিয়াছিলেন, সেখানকার অধিবাসীদিগের মধ্যে গত শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত ধর্ম্মতর্কে পরাজিত বৌদ্ধদিগের উপর ব্রাহ্মণেরা যেরূপ ভীষণ অত্যাচার করিয়াছিলেন, তাহায় প্রবাদ ভালরূপে প্রচলিত ছিল। টেলর নামক একজন ইংরাজ তাঁহার প্রণীত Catalogue of Oriental Miss অর্থাৎ প্রাচ্যপুঁথির তালিকার তৃতীয়ভাগের ৫৬ ও ১৪৪ পৃষ্ঠায় এই বিষয়ের উল্লেখ করিয়াছেন। The memory of the impaling of the Buddhists of Madura by the Brahmans is still fresh. অর্থাৎ মাদুরার ব্রাহ্মণেরা যে বৌদ্ধদিগকে শূলে চড়াইয়া বধ করিতেন, তাহা এখনও লোকের মনে আছে। অতএব ইহা অনুমান করা যাইতে পারে যে নোবিলি এই সকল প্রবাদ শুনিয়া যাহাতে তিনি ধর্ম্মতর্কে ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক পরাজিত না হন, অপরন্তু তাহাদিগকে পরাস্ত করিতে পারেন, তজ্জন্য সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করেন। ইউরোপীয়দিগের ভিতর ইনি সর্ব্বপ্রথম সংস্কৃত শিক্ষা করেন। বেদের দোহাই না দিলে হিন্দুরা কোন ধর্ম্মকথা শুনিতে চায় না, তাহা তিনি ভালরূপে জানিতেন। এইহেতু তিনি আপনাকে, ব্রাহ্মণ ও পাশ্চাত্যদেশ হইতে ভারতে বেদপ্রচার করিতে আসিয়াছি, বলিয়া পরিচয় দিতেন। হিন্দুদিগের উপর আধিপত্য লাভ করিবার জন্য তিনি নিজের নাম তত্ত্ববোধস্বামী রাখিয়াছিলেন। কিন্তু যখন দেখিলেন যে ইহাতেও তিনি কৃতকার্য্য হইলেন না, তখন এক মহা জালসাজী করিলেন। এজুর্বেদ নামক তিনি একটী পঞ্চম বেদ প্রচার করিলেন। এই পুস্তকটী যে তাহার নিজের রচনা, তাহার কোন প্রমাণ নাই। *

যাহাহউক এই জাল বেদ যদিও হিন্দুদিগকে খৃষ্টধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট করিতে সমর্থ হয় নাই, তথাপি ইহা পাশ্চাত্যদেশে অনেককে মোহিত করিয়াছিল। ইহার পাণ্ডুলিপি কিছুকাল পণ্ডীচেরীতে রক্ষিত ছিল। ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে উহা ফরাসীভাষায় অনুবাদিত হইয়া বিখ্যাত ভলটেয়ারের নিকট প্রেরিত হয়, এবং তিনি উহা পারিসনগরের রাজপুস্তকালয়ে দান করেন। ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে উহা মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়। ভলটেয়ারের মত সংশয়বাদী ব্যক্তিও এই পুস্তকদ্বারা প্রতারিত হইয়াছিলেন। ইহা পাঠ করিয়া তিনি খৃষ্টধর্ম্ম অপেক্ষা হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা স্বীকার করেন ও ইহাকে "The most precious gift for which the west has ever been indebted to the East" বলিয়া জ্ঞান করেন। ১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে নোবিলি মানবলীলা সংবরণ করেন।

এখন জার্ম্মনজাতির কেহ কেহ সংস্কৃতভাষায় মহাপাণ্ডিত্য লাভ করিয়াছেন। ঐ জাতির যিনি প্রথমে এই ভাষা শিক্ষা করেন, তাঁহার নাম Heinrich Noth। তিনি ১৬৬৪ খৃষ্টাব্দে ব্রাহ্মণদিগের সহিত তর্ক করিবার নিমিত্ত সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করেন। কিন্তু তিনি যে

* এই সম্বন্ধে একজন ইংরাজ লেখক এইরূপ বলিয়াছেন:-

"The prosperity of a monastery depended on the argumentative power of its chief. The champion talker of the monastery was treated with the highest honor. He was liable to be challenged by any stranger, and, as was the practice in the times of European chivalry, if the champion was beaten his whole party was at the conqueror's mercy. A monastery that had lasted for ages was sometimes deserted from the result of a single dialectic duel. This system undermined the strength of Buddhism in two ways. It loosened the monk's hold on the people and it divided the monasteries, changing them from practical teachers and helpers into isolated unsympathetic theorists. The Brahmans were little behind the Buddhists in their zeal for oratory. * * In the eighth century, when the great Brahman champion Shankaracharya arose the Buddhists trembled. They knew they would be challenged, they knew his arguments, and knowing no answer they shrank away leaving their monasteries empty."

* এই বিষয়ে ভট্ট মোক্ষমূলার এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছেন:—

"It Seems quite certain that the notorious Ezour-veda was not his work. This Ezour-veda was a poor compilation of Hindu and Christian doctrines mixed up together in the most childish way and was probably the work of a half-educated native convert at Pondicherry."

উহাতে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় না।

১৬৯৯ খৃষ্টাব্দে Henxleden নামক একজন জর্ম্মনদেশবাসী রোমান ক্যাথলিক পাদরী মালাবার কূলে আসিয়া এদেশে প্রায় ত্রিশবৎসর পর্য্যন্ত খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার কার্য্যে রত ছিলেন। তিনি সংস্কৃতভাষা ভালরূপে শিখিয়াছিলেন এবং ঐভাষার ব্যাকরণ ও শব্দকোষ রচনা করিয়াছিলেন। নোবিলির জাল বেদ দ্বারা ইউরোপের বিদ্বন্মণ্ডলী যে বিমোহিত হইয়াছিলেন, তাহা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। তখনকার পোপের দৃষ্টিও তদ্দ্বারা সংস্কৃতভাষার প্রতি আকর্ষিত হয়। সুবিখ্যাত রোমান ক্যাথলিক পাদরী কার্ডিন্যাল ওয়াইজম্যান বলিয়াছেন যে "It was in Rome that the languages and literature of the Hindus were first systematically studied in Europe." অর্থাৎ ইউরোপের মধ্যে রোমেই প্রথমে হিন্দুদিগের ভাষা ও সাহিত্যের রীতিমত অনুশীলন হয়। পৌলিন্স্ নামক একজন অষ্ট্রীয়াদেশবাসী রোমান ক্যাথলিক পাদরী ১৪ বৎসর ভারতে থাকিয়া ১৭৯০ খৃষ্টাব্দে রোমনগরে গিয়া বাস করেন। তৎকালীন অন্য কোন পাশ্চাত্যদেশবাসী সংস্কৃতভাষায় তাঁহার সমান অধিকার লাভ করিতে পারে নাই। রোমে তিনি পোপ কর্ত্তৃক এক উচ্চপদে নিযুক্ত হন। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৭৯০ খৃষ্টাব্দ হইতে তাঁহার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত তিনি ২০ খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ঐ সকল পুস্তকে ভারতবর্ষীয় ভাষা ও ধর্ম্ম প্রভৃতি বিষয় লিখিত আছে। তিনি অমরকোষের অনুবাদ ও সংস্কৃতের একটী ব্যাকরণ রচনা করিয়াছিলেন।

এ পর্য্যন্ত যে সকল পাশ্চাত্যদেশবাসী পাদরীগণ সংস্কৃতের চর্চ্চা করিয়াছিলেন, তাহা কেবল ধর্ম্মতর্কের জন্য, তাহাতে যে জগতের কোন বিশেষ উপকার সাধন হইতে পারে, তাহা তাঁহারা স্বপ্নেও ভাবেন নাই।

ভারতে ব্রিটিশরাজ্য স্থাপন হইলে যে ইংরাজদিগের ভিতর সংস্কৃতভাষার চর্চ্চা হয়, যাহাতে এদেশে ভালরূপে ন্যায় বিচার হয়; তাহাই তাহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। *

১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে এলাহাবাদে যে সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয়, তদ্দ্বারা বাঙ্গালা, বেহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানী ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানি প্রাপ্ত হন। ১৭৭৬ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেনহেষ্টিংসের রাজশাসনকালে, হিন্দুদিগের মধ্যে ন্যায় বিচারের জন্য the Code of Gentoo Law নামক পুস্তকের সংকলন হয়। ইহার সংকলনকর্ত্তার নাম নাথানিয়াল ব্রাসি হালহেড্। তিনি সংস্কৃত জানিতেন না। মুসলমানদিগের আমলদারীতে এদেশের আদালতসমূহের ভাষা ফারসী ছিল। এইজন্য তৎকালীন রাজকর্ম্মচারীদিগকে ফারসী ও আরবী ভাষা বাধ্য হইয়া শিখিতে হইত। হালহেড্ সাহেব ফারসী জানিতেন। তাঁহার সুবিধার জন্য বঙ্গদেশের প্রধান প্রধান পণ্ডিতেরা সংস্কৃত ভাষায় যে ব্যবস্থা দিয়াছিলেন, তাহারই ফারসীভাষায় অনুবাদ হয়। সেই অনুবাদ অবলম্বন করিয়া তিনি যে ইংরাজী ভাষায় অনুবাদ করেন, তাহাই 'the Code of Gentoo Law' নামে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকের অনুক্রমণিকায় সংস্কৃতভাষা সম্বন্ধে একটী সুদীর্ঘ প্রবন্ধ ছিল। সংস্কৃতভাষার বিষয়ে ইংরাজী ভাষায় ইহাই সর্ব্বপ্রথম লিখিত প্রবন্ধ।

যে ইংরাজ সর্ব্বপ্রথমে সংস্কৃত ভাষা ভালরূপে শিক্ষা করেন, তাঁহার নাম উইল্কিন্স্। তিনি ভগবদ্গীতা সর্ব্বপ্রথম ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। ভগবদ্গীতার ইংরাজী অনুবাদ ওয়ারেন হেষ্টিংস্ সাহেব বিলাতে প্রেরণ করিয়া ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির কর্ত্তৃপক্ষদিগকে তাহা প্রকাশ করিতে অনুরোধ করেন। †

---

* এসম্বন্ধে অধ্যাপক জলী (Professor Jolly) তাঁহার প্রদত্ত Tagore Law Lectures এর প্রারম্ভে এইরূপ বলিয়াছেন :—

"In modern times, after the establishment of the British rule in India, the hold of the early native institutions over the Indian mind was found to have remained so firm, that it was considered expedient to retain the old national system and adoption amidst the most sweeping changes which had been introduced in the administration of the country and in judicial procedure. It was the desire to ascertain the authentic opinions of the early native legislators in regard to these subjects which led to the discovery of the Sanskrit literature. European Sanskrit Philology may be said then to owe a debt of gratitude to the memory of the ancient Sanskrit Lawyers of India."

† তিনি এ সম্বন্ধে যে পত্র লেখেন, তাহার কিয়দংশ এ স্থলে উদ্ধৃত করা গেল :—

"Every accumulation of knowledge, and especially such as is obtained by social communicatoin

ভগবদ্‌গীতার ইংরাজী অনুবাদ বিলাতে ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ভারতবাসীরা যে অসভ্য নহে, তাহারা যে উচ্চ দার্শনিক সত্য সকল অনুভব করিতে সক্ষম, তাহা এই অনুবাদ পড়িয়া বিলাতের লোকেরা জানিতে পারিল। এই অনুবাদ হইতেই প্রথমে ফরাসী ও জার্ম্মান ভাষায় গীতার অনুবাদ হইয়াছিল।

১৭৮৪ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় আসিয়াটিক সোসাইটি নামক সভা স্থাপিত হয়। ইহার স্থাপন হওয়াতে জগতে যুগান্তর ঘটিয়াছে। এই সভা স্থাপনের সহিত সার উইলিয়ম জোন্সের নাম অভিন্নভাবে সংযুক্ত আছে। সার



সার্ উইলিয়ম জোন্স্।

উইলিয়ম জোন্স ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে কলিকাতার সুপ্রিমকোর্টের জজ নিযুক্ত হইয়া আসেন। তিনি বিলাতে ফারসী, আরবী, হিব্রু প্রভৃতি অনেকগুলি প্রাচ্য ভাষা শিখিয়াছিলেন। কিন্তু তখন বিলাতে সংস্কৃত ভাষা শিখিবার কোনি উপায় ছিল না বলিয়াই তাঁহার তাহা শিক্ষা হয় নাই। ভারতে আসিয়া তিনি সংস্কৃত ভাষা শিখিতে যত্নবান্ হইলেন। আসিয়াটিক সোসাইটির স্থাপনকালে তিনি যে বক্তৃতা দেন, তাহাতে ঐ সভা স্থাপন করিবার উদ্দেশ্য স্পষ্টরূপে বর্ণন করিয়াছিলেন। যে যে উদ্দেশ্য লইয়া ঐ সভা স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা যে পূর্ণরূপে সিদ্ধ হইয়াছে, তাহা যাঁহারা ঐ সভার কার্য্য অবগত আছেন, তাঁহারা ভালরূপে জানেন।

with people over whom we exercise a dominion, founded on the right of conquest, is useful to the state: it is the gain of humanity; in the specific instance which I have stated, it attracts and conciliates distant affections, it lessens the weight of the chain by which the natives are held in subjection, and it imprints in the heart of our own countrymen the sense and obligation of benevolence."

সার উইলিয়ম জোন্স সংস্কৃত হইতে অনেকগুলি পুস্তকের ইংরাজি অনুবাদ করেন। কালিদাসের শকুন্তলা নাটকের অনুবাদ পাশ্চাত্য দেশের সাহিত্যিক মণ্ডলীকে মোহিত করিয়া দিয়াছিল। জার্ম্মান দেশের প্রধান কবি Goethe ইহা পড়িয়া এইরূপ লিখিয়াছিলেন :—

"Would'st thou the young year's blossom and the fruits of its decline,
And all by which the soul is charmed, neraptured, feasted, fed?
Would'st thou the earth and heaven itself in one sole name combine?
I name thee, O Sakuntala! and all at once is said."



কবি গেটে।

জার্ম্মান দেশবাসী কোন কোন পণ্ডিত যে এক্ষণে আগ্রহের সহিত সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা করিতেছেন; তাহার একটি

প্রধান কারণ বলিতে গেলে কবিবর Goethe এর শকুন্তলার প্রশংসা।

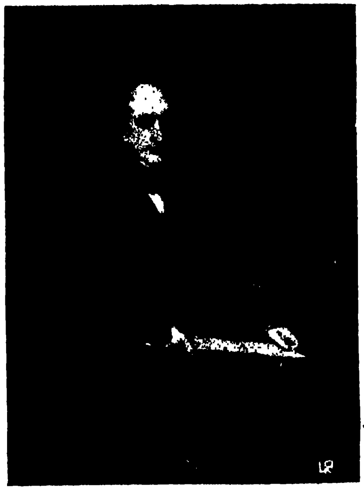
আসিয়াটিক সোসাইটি Asiatic Researches (আসিয়াসম্বন্ধিনী গবেষণাবলী) নামে ২১ খণ্ড বই প্রকাশ করেন। ইহা নানাবিধ বিষয়ের গবেষণা ও তত্ত্বানুসন্ধানে পরিপূর্ণ। ইহা সুসভ্য জগতে যুগান্তর আনয়ন করে। বর্ত্তমান সময়ে যে ভাষাতত্ত্বের সম্যক্ আলোচনা হইতেছে, আর্য্যজাতির আদিম নিবাস স্থান ও অবস্থা জ্ঞাত হওয়া গিয়াছে, তাহার মূল কারণ এই আসিয়াটিক সোসাইটি ও তৎপ্রকাশিত Asiatic Researches.

সার উইলিয়ম জোন্সের মৃত্যুর পর যাঁহাদের গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধে Asiatic Researches সুশোভিত হইত এবং যাঁহারা আসিয়াটিক সোসাইটির গৌরব সুসভ্য জগতে বৃদ্ধি করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে হেনরী টমাস কোলব্রুক এবং হোরেস হেম্যান উইলসনের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।



অধ্যাপক কোলব্রুক।

কোলব্রুক কর্ত্তৃক ইংরাজী ভাষার প্রথম সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রকাশিত হয়, এবং ইংরাজদিগের মধ্যে তিনিই প্রথম বেদ অধ্যয়ন করেন। এই দেশে তিনি অনেক সংস্কৃত পুঁথির পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। সেইগুলি তিনি বিলাতে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে দান করেন। তাঁহার অধ্যবসায়ে ও যত্নে বিলাতে Royal Asiatic Society স্থাপিত হয়।



হোরেস্ হেম্যান উইলসন।

হোরেস্ হেম্যান উইলসন সাহেব ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে ভারতে ডাক্তার হইয়া আসেন। এদেশে আসিয়া তিনি সংস্কৃত ভাষা ভালরূপে শিক্ষা করিয়াছিলেন। তিনিই সর্ব্ব প্রথমে এদেশের প্রচলিত ধর্ম্ম সম্প্রদায়গুলির বিবরণ সঙ্কলন করেন; এবং তৎকর্ত্তৃক প্রথম সংস্কৃত-ইংরাজী কোষ রচিত হয়।

যাহাতে, ইংলণ্ড হইতে যে সকল পাদরী খৃষ্টধর্ম্ম প্রচার করিতে ভারতে আসেন, তাঁহারা সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিয়া ভালরূপে প্রচার কার্য্য সম্পাদন করিতে পারেন, তজ্জন্য কর্ণেল বোডেন (Colonel Boden) নামক এক জন ইংরাজ অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি সংস্কৃত অধ্যাপকের পদ সৃষ্টির নিমিত্ত ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে নিজের সব সম্পত্তি উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেন। এই পদের সৃষ্টি হইলে উইলসন সাহেব ইহার প্রথম অধ্যাপক মনোনীত হন। এইজন্য তিনি ১৮৩২ খৃষ্টাব্দে ভারত হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া প্রায় ৩০ বৎসর ঐ অধ্যাপকের কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া অনেক পুস্তক রচিত ও সম্পাদিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি সর্ব্বপ্রথমে ঋগ্বেদের ইংরাজী অনুবাদ করেন।

১৮০০ খৃষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলি কর্ত্তৃক কলেজ অব্ ফোর্ট উইলিয়ম স্থাপিত হয়। বিলাত হইতে যে সকল

রাজ কর্ম্মচারী এদেশে নিযুক্ত হইয়া আসিতেন, তাঁহাদিগকে প্রাচ্যদেশীয় ভাষাগুলিতে শিক্ষাদান করাই এই কালেজের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এই কালেজের সংস্কৃত অধ্যাপক সুবিখ্যাত পাদরী কেরী (Carey) সাহেব ছিলেন।



পাদ্‌রী কেরী।

তিনি ভারতের অনেকগুলি প্রচলিত ভাষা জানিতেন এবং বঙ্গভাষায় গদ্যে একজন প্রথম লেখক। তিনি একটি সংস্কৃত ব্যাকরণ রচনা করেন এবং ভারতপ্রবাসী ইংরাজদিগের ভিতর সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা বিস্তার কার্য্যে অনেক পরিমাণে কৃতকার্য্যতা লাভ করেন।

ভাষাতত্ত্ব-নির্ণয় হেতু জার্ম্মান দেশের পণ্ডিতগণের দৃষ্টি সংস্কৃত ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হয়। তাঁহাদের ভারতের সহিত কোনরূপ রাজনৈতিক সংস্রব নাই। অতএব ইহা স্বীকার করিতে হইবেক যে তাঁহারা নিঃস্বার্থভাবে কেবল বৈজ্ঞানিক উন্নতির নিমিত্ত সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা করেন।

জার্ম্মান জাতি কর্ত্তৃক বর্ত্তমান সময়ে ভাষাতত্ত্ব (Comparative Philology) বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর স্থাপিত হয়। লাইবনিজ নামক একজন জার্ম্মান এই বিষয়ের প্রথম পথপ্রদর্শক। অঙ্কশাস্ত্রে গবেষণার জন্য তিনি বৈজ্ঞানিক জগতে সুপরিচিত। তাঁহার সময়ে ইউরোপে সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা ছিল না বলিয়া তিনি সম্যকরূপে ভাষাতত্ত্ব নির্ণয় করিতে অসমর্থ হন। তখন এই রকম ভ্রান্ত বিশ্বাস ছিল যে জগতের অন্য সমস্ত ভাষা হিব্রু ভাষা হইতে উৎপন্ন।

সার উইলিয়ম জোন্স, সংস্কৃত, গ্রীক, লাটিন ও ফারসী ভাষায় যে অনেকগুলি কথার সাদৃশ্য ও সমার্থকতা আছে, তাহা অনুভব করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু জার্ম্মান-দেশীয় পণ্ডিত ফ্রেড্রিক শ্লেগল ইহা দেখাইলেন যে ঐ সকল ভাষার কথাগুলিতেই কেবল সাদৃশ্য নাই, পরন্তু তাহাদিগের ব্যাকরণের গঠনও একরূপ। বলিতে গেলে তাঁহার 'On the Indian Language, Literature and Philosophy' নামক ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত প্রবন্ধ জগতে যুগান্তর আনয়ন করে। *

* তিনি সংস্কৃত পড়িয়া এত মুগ্ধ হন যে তাহার উক্ত প্রবন্ধের প্রায় প্রারম্ভেই এইরূপ বলিয়াছেন :—

"I must, therefore, be content in my present experiments to restrict myself to the furnishing of an additional proof of the fertility of Indian literature, and the rich hidden treasures which will reward our diligent study of it; to kindle in Germany a love for, or at least a prepossession in favor of that study; and to lay a firm foundation, on which our structure may at some future period be raised with greater security and certainty."

"The study of Indian literature requires to be embraced by such students and patrons as in the fifteenth and sixteenth centuries suddenly kindled in Italy and Germany an ardent appreciation of the beauty of classical learning and in so short a time invested it with such prevailing importance, that the form of all wisdom and science, and almost of the world itself, was changed and renovated by the influence of that reawakened knowledge. I venture to predict that the Indian study if embraced with equal energy, will prove no less grand and universal in its operation, and have no less influence on the sphere of European intelligence."

সংস্কৃত হইতে ভাষাতত্ত্ব নির্ণয় পক্ষে যে উপকার দর্শিবে, তৎসম্বন্ধে তিনি এইরূপ মত প্রকাশ করিয়াছিলেন :—

"The old Indian language, *Sanskrit*, that is, the *formed* or perfect, * * has the greatest affinity with the Greek and Latin, as well as the Persian and German languages. This resemblance, or affinity does not exist only in the numerous roots, which

এস্থলে ইহা বলা কর্ত্তব্য যে তিনি যাহা যাহা বলিয়া গিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার পরবর্ত্তী বিদ্বন্মণ্ডলীর গবেষণায় অনেকাংশে প্রমাণিত হইয়াছে।

তাঁহার সময় হইতেই জার্ম্মানদেশে রীতিমত সংস্কৃত-ভাষার চর্চ্চা আরম্ভ হয়। যে সকল জার্ম্মানপণ্ডিতের সংস্কৃতচর্চ্চা দ্বারা বৈজ্ঞানিক জগতে বিশেষ উপকার লাভ হইয়াছে, তাঁহাদিগের মধ্য হইতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণের নাম উল্লেখযোগ্য।

উইলিয়ম ভন্ হম্বোল্টের নাম তাঁহার ভ্রাতা আলেক-জণ্ডরের মত সুপরিচিত নহে। কিন্তু তিনি ভাষাতত্ত্ব নির্ণয়ে অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন।

বপ্ কর্ত্তৃক প্রণীত Comparative grammar of the Aryan languages" নামক পুস্তক ভাষাতত্ত্ব নির্ণয় বিষয়ে অনেক উপকার সাধন করিয়াছে।

বুন্‌সেন জার্ম্মান দেশের দূত হইয়া ইংলণ্ডে বাস করেন। তাঁহার নিকট ভাষাতত্ত্ববিজ্ঞান অনেক পরিমাণে ঋণী। আমরাও তাঁহার নিকট ঋণপাশে বদ্ধ। কারণ তাঁহার সাহায্য ও উত্তেজনা ভিন্ন ভট্ট মোক্ষমুলার ইংলণ্ডে আসিয়া বাস ও ঋগ্বেদ সম্পাদন ও প্রকাশ করিতে সমর্থ হইতেন না। ভারত দেখিবার জন্য বুন্‌সেনের কিরূপ লালসা হইয়াছিল তাহার ভট্ট মোক্ষমুলার এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন :—



বুন্‌সেন।

it has in common with both those nations, but extends also to the grammar and internal structure; nor is such resemblance a casual circumstance easily accounted for by the intermixture of the languages; it is an essential element clearly indicating community of origin. It is further proved by comparison, that the Indian is the most ancient, and the source from whence others of later origin are derived. * *

"The great importance of the comparative study of language, in elucidating the historical origin and progress of nations, and their early migration and wanderings, will afford a rich subject for investigation * * *

"Of all the existing languages there is none so perfect in itself, or in which the internal connection of the roots may be so clearly traced as in the Indian. * *.

"The Indian grammar offers the best example of perfect simplicity, combined with the richest artistic construction."

"How strong a desire had been awakened in Germany at that time for a real and authentic knowledge of the Veda, I learnt from my dear old friend Bunsen, when I first made his acquaintance in London in 1846. He was then Prussian Minister in London. He told me that when he was quite a young man, he had made up his mind to go himself to India, to see whether there really was such a book as the Veda, and what it was like. But Bunsen was then a poor student in Gottingen. * * * What did he do to realize his dream? He became tutor to a young and very rich American gentleman, wellknown in later life as one of the American millionaires, Mr. Astor. Instead of accepting payment for his lessons, he stipulated with the young American, who had to return to the United States, that they should meet in Italy and from thence proceed together to India on a voyage of literary discovery. Bunsen went to Italy, and waited for his friend, but in vain. Mr. Astor was detained at home. * * Brilliant as Bunsen's career became afterwards he always regretted the failure of his youthful scheme. 'I have been stranded, he used

to say, 'on the sands of diplomacy; I should have been happier had I remained a scholar.

"When I called on him as Prussian Minister to have my passport *Vise* in order to return to Germany, and when I explained to him how I had worked to bring out an edition of the text and commentary of the Rig-veda from Mss scattered about in the different libraries in Europe, and was now obliged to return to Germany, unable to complete my copies, and collations of manuscripts, he took my hand, and said, 'I look upon you as myself, young again. Stay, in London, and as to ways and means, let me see to that."

পাশ্চাত্যদেশবাসীদিগের ভিতর যাঁহাকে সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শিতার জন্য সর্ব্বোচ্চ স্থান দেওয়া যাইতে পারে এবং যাঁহার নিকট ভারতবর্ষ বিশেষরূপে ঋণী, তিনি জার্ম্মান দেশীয় সুবিখ্যাত পণ্ডিত ভট্ট মোক্ষমূলার। ইহাঁ-কর্তৃক ঋগ্বেদ সর্ব্বপ্রথম সম্পাদিত হয়। এবং ইহাঁর প্রণীত পুস্তকগুলি দ্বারা ভাষা ও জাতি তত্ত্ব নির্ণয়ের অনেক সুবিধা হইয়াছে।

হোরেস হেম্যান উইলসনের মৃত্যুর পর তিনজন সংস্কৃতজ্ঞ ইংরাজের নাম উল্লেখ যোগ্য। উইলসন সাহেবের মৃত্যুর পর মনিয়র উইলিয়ম্‌স (Monier Williams) তাঁহার পদে অক্‌সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে নিযুক্ত হন। তাঁহার Sanskrit-English Dictionary অতি উপকারী পুস্তক। ইহা ভিন্ন তিনি Indian Wisdom, Religious Life and thought in Modern India প্রভৃতি অনেকগুলি ভারতবর্ষসম্বন্ধীয় পুস্তক লিখিয়াছেন।

অধ্যাপক কাওয়েল (Cowell) সাহেব কলিকাতার সংস্কৃত কালেজের প্রিন্সিপ্যালের পদ হইতে অবসর লইয়া কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। তিনি হিন্দুদিগের দর্শন ও বৌদ্ধদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র ভালরূপে পাঠ করিয়াছিলেন ও তৎসম্বন্ধে অনেকগুলি পুস্তক রচনা করেন। সম্প্রতি তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

ডাক্তার মিয়র সাহেব এতৎপ্রদেশীয় ভূতপূর্ব্ব ছোট লাট স্যর্‌ উইলিয়ম মিয়র সাহেবের ভ্রাতা। তিনি এদেশে থাকিয়া সংস্কৃত শিক্ষা করিয়া পরে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংস্কৃত ভাষার অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। তাঁহার Original Sanskrit Texts সংস্কৃতজ্ঞদিগের সুপরিচিত। আমেরিকাতেও সংস্কৃতের চর্চ্চা আছে। কিন্তু তদ্দেশীয় হুইটনী সাহেব ভিন্ন আর কাহারও নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য নহে।

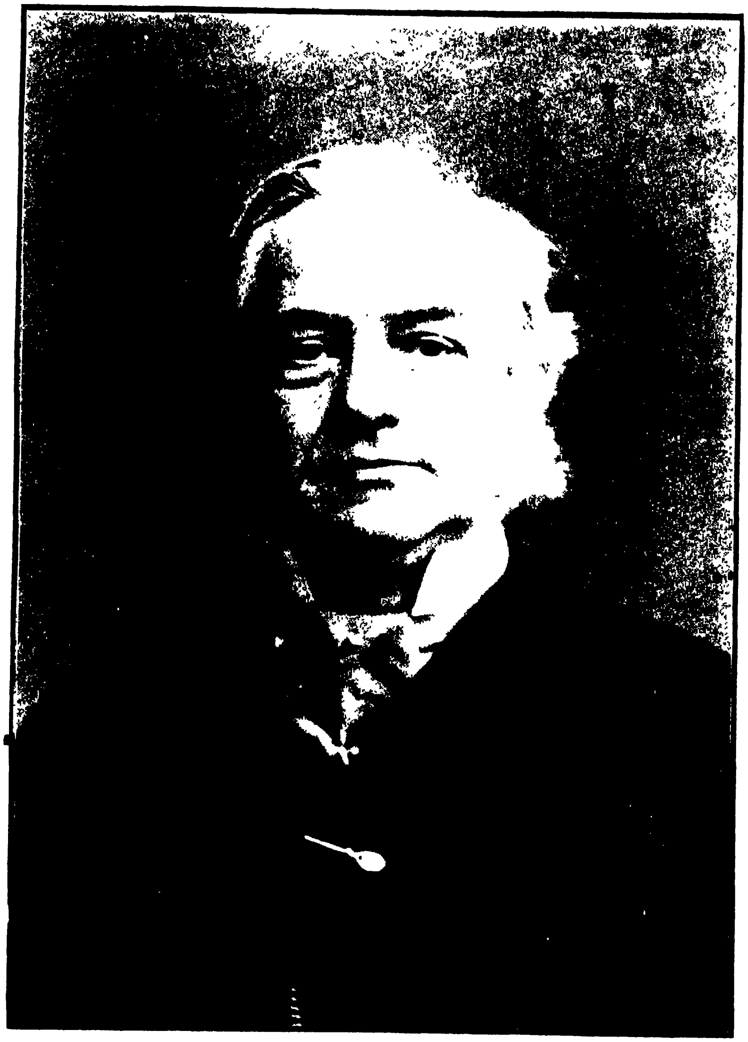
সংস্কৃত ভাষার চর্চ্চা দ্বারা জগতের যে উপকার হইয়াছে ও হইতে পারে, তাহা ভট্ট মোক্ষমূলার "India, what can it teach us" নামক গ্রন্থে সুন্দররূপে বর্ণন করিয়াছেন। তাহা হইতে কয়েকটি পংক্তি নিম্নে উদ্ধৃত করা যাইতেছে :—

"If I were asked under what sky the human mind has most fully developed some of its choicest gifts, has most deeply pondered on the greatest problems of life, and has found solutions of some of them which well deserve the attention of those who have studied Plato and Kant, I should point to India. And if I were to ask myself from what literature we, here in Europe, we who have been nurtured almost exclusively on the thoughts of Greeks and Romans, and one Semitic race, the Jewish, may draw that corrective which is most wanted in order to make our inner life more perfect, more comprehensive, more universal, in fact more truly human, a life not for the life only,—but a transfigured and Eternal life—again I should point to India."

শ্রীবামনদাস বসু।

স্বপ্নচ্যুত।

কাল দেখেছিনু সাঁঝে পথিক নূতন,
পথ-কোলাহল দূরে মিশেছে তখন।
সেই শেষ যাত্রী শুধু, নিশব্দ পথের
বিজন রাগিণী গান শেষ দিনান্তের
সম, জেগেছিল সেথা। ছায়ার সঙ্গীত
সন্ধ্যা রচেছিল বসি; আবেশে চকিত
হ'তেছিল বায়ু তারি চরণের গানে।
মগ্ন হয়ে পড়েছিল কি এক স্বপনে
নগ্ন নির্জ্জনতাখানি পথের দুধারে।
কি এক কুহকভারে শিরর উপরে
নত হয়ে পড়েছিল সান্ধ্যমেঘ-ছায়া।
তাহারি কাহিনী যেন তরুরা গাহিয়া



ভট্ট মোক্ষমূলার।

KUNTALINE PRESS.

কহিতে আছিল অতি ধীরে পরস্পরে,
দূর বাঁশীধ্বনি মৃদু অভিমান ভরে
গাহিতে আছিল তারি সাধনার গান,
নীরব পূজায় পথ ছিল মুগ্ধপ্রাণ।
(আমি) সঙ্গীহীন পান্থে হেরি সজল নয়নে,
সারাদিবসের গাঁথা মালাটি যতনে,
চাহিলাম দিতে যবে খুলি বাতায়ন,
সহসা স্বপনচ্যুত দেখিনু তখন
কোথা পান্থ, সন্ধ্যাছায়া গিয়াছে মিলায়ে,
দূর দিগন্তের পথে অন্ধকার-ছায়ে।

লজ্জাবতী বসু।

রাণী তুই সাধনার মোর।

রাণী তুই সাধনার মোর,
স্মিরিতির স্বপন উজ্জল,
আমরণ সাথী প্রেম তোর,
চিন্তা তোর পূণ্যতীর্থস্থল।
সুমধুর কাহিনীটি তোর
জীবনের কবিত্ব আমার,
পরাণের বসন্ত সুন্দর
বাসনার অমর নির্ঝর।
এ যৌবন-বসন্তের মোর
অভিনব হরিত কল্পনা,
মোহমুগ্ধ হৃদয়-তন্ত্রের
সৌন্দর্য্যের সঙ্গীত জল্পনা।
শুভ্র এই জীবন-উষার
সুমহান্ আলোক-স্বপন,
ধন্য করে এজীবন মম
দেবতার আশিষ মতন!
উথলিত হৃদয়-তটিনী
তোর গানে ব্যাপ্ত নিরন্তর,
হৃদাকাশ তোর পূজাবাণী
গাহি নিত্য সুপবিত্রতর।

লজ্জাবতী বসু।

গিলগিটের পুরাতন রাজ্য-শাসনপ্রথা।

(১৮০ পৃষ্ঠার পর)

"ইয়ারফায়" আয়ের হিসাব নিম্নে দেওয়া হইল।

(১) রাজার খাসজমীর ফসল কাটিয়া এবং ঝাড়িয়া খামারে বিছাইয়া দেওয়া হইলে, জমীর সমতল হইতে ১ফুট উচ্চ পর্য্যন্ত যত শস্য থাকিত, তাহা ইয়ারফার প্রাপ্য ছিল। বক্রি রাজভাণ্ডারে যাইত। (২) কোন অপরাধে যদি রাজা কোন প্রজার জমি ক্রোক করিয়া অন্য প্রজাকে প্রদান করিতেন, তবে নূতন স্বত্বাধিকারী ১তুলু সোণা ইয়ারফাকে দিলে সেই জমী দখল করিতে পারিত। এইপ্রকারে অর্দ্ধেক সম্পত্তি ক্রোক করিয়া অন্যকে দিলে অর্দ্ধতুলু সোণা ইয়ারফার প্রাপ্য হইত। (৩) ইয়ারফাকে আপন জমীর জন্য কর দিতে হইত না।

ত্রাংফার আয়ের তালিকাও নিম্নে দেওয়া যাইতেছে।

(১) আপনগ্রামের প্রত্যেক স্বর্ণধৌতকারী দলের নিকট একমাসা সোণা ত্রাংফার প্রাপ্য ছিল। (২) ত্রাংফা আপনগ্রামের "মকদ্দম" ও কোটোয়ালদিগকে পদচ্যুত করিতে পারিত। নূতন কর্ম্মপ্রার্থী ত্রাংফাকে "বাগালো" (৪মাসা সোণা) দিয়া "মকদ্দমের" পদ পাইত। নূতন কোটোয়ালকে ২মাসা সোণা দিতে হইত। (৩) "মারে" কর হইতে "রা" ত্রাংফাকে বৎসরে ২টী ছাগ দিতেন। (৪) আপনগ্রামের কোন দুইজন প্রজার "খুটুকুন" করের সমস্তই ত্রাংফার প্রাপ্য ছিল। (৫) কেল্লা তৈয়ার করিবার কার্য্যে কোন প্রজা আসিতে অক্ষম হইলে উজির যেরূপ "বাগালো" আদায় করিতেন, "রা"র হুকুম হইলে ত্রাংফাও সেইপ্রকার "বাগালো" আদায় করিতে পারিত। (৬) আপনগ্রামের কন্যার অন্যগ্রামের লোকের সহিত বিবাহ হইলে, বর পক্ষ হইতে ৬রতি সোণা ও ৪ গজ কাপড় ত্রাংফার প্রাপ্য ছিল। (৭) গ্রামের যে সকল লোক কাপড় বুনিত, তাহারা প্রত্যেকে বৎসরে ৮ গজ কাপড় ত্রাংফাকে দিতে বাধ্য ছিল। (৮) রাজার স্বর্ণকর (Gold tax) আদায় করিবার জন্য স্বতন্ত্র ত্রাংফা নিযুক্ত হইত। সে স্বর্ণধৌতকারীদিগের নিকট

হইতে "বাগালো" আদায় করিত। (৯) ব্রাংফাকে কোন কর দিতে হইত না।

"বাড়ো" বা "মকদ্দমের" কোন আয়ই ছিল না। তবে তাহাদিগকে রাজস্ব দিতে হইত না। "কারেগারি" হইতেও তাহারা মুক্ত ছিল।

কোটায়াল ও যাইতুর আয়ও মকদ্দমের মত। ইহাদিগকে কর দিতে হইত কিন্তু "বেগার" খাটিতে হইত না। যদি কোন লোকের গোমেষাদি অন্য কাহারও শস্যের ক্ষতি করিতেছে, ইহা কোটোয়াল দেখিতে পাইত, কোটোয়াল সেই গরুকে ধরিয়া আনিয়া তাহার পালকের নিকট হইতে ১টোপা (অর্দ্ধসের) দানা আদায় করিত।

উপরিলিখিত বিবরণ হইতে বুঝা যাইবে যে অধুনা যাহাকে "অর্থ" বলে, পুরাকালে গিলগিটে সে জিনিষটী ছিল না। রাজা হইতে প্রজা পর্য্যন্ত সকলকেই আপনাপন জমীর উৎপাদিকাশক্তির উপর নির্ভর করিয়া জীবনধারণ করিতে হইত। অর্থের ভিতর কিছু সোণা ছিল, কিন্তু অতি অল্প। টাকা পয়সার আদান প্রদান কখনই ছিল না। যদি বিদেশীয় কোন দ্রব্য, যথা কাপড়, আমদানি করিতে হইত, তবে এই সামান্য সোণা বা ছাগমেষাদির পরিবর্ত্তে তাহা আনা হইত।

(গ) বিচার।

যেমন বিচার ছিল, তেমনই আইনও কতকটা ছিল, কিন্তু আদালত ছিল না বা আবশ্যক হইত না। পঞ্চায়েতের দ্বারাই তাহাদের বিচার হইত। অপরাধের গুরুত্বানুসারে পঞ্চায়েত নিযুক্ত হইত। গুরুতর অপরাধ করিলে রাজা ও উজির বিচার করিতেন। অপরাধের গুরুত্ব অপেক্ষাকৃত কম হইলে, উজির ও যেগ্রামের অপরাধী, সেইগ্রামের ব্রাংফা বিচার করিতেন। কিন্তু সাধারণতঃ অপরাধের সমষ্টি ও গুরুত্ব কম থাকায়, আপনাপন গ্রামের ব্রাংফা, মকদ্দম ও কয়েকজন মোড়ল লইয়া বিচার হইত।

দূরগ্রাম হইতে কোন লোকের কোন মোকর্দ্দমায় উপস্থিতির আবশ্যক হইলে তাহাকে ডাকিয়া আনা হইত এবং "পেয়াদাকে" (যেলোক ডাকিয়া আনিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছিল) বাদী ও প্রতিবাদী উভয়পক্ষ হইতে কিছু "খরচা" দেওয়া হইত। উভয়পক্ষের সাক্ষী উপস্থিত হইলে পঞ্চায়েত বিচার করিতে বসিত ও যতদিন তাহারা মোকর্দ্দমার রায় দিতে না পারিত, প্রত্যহ ১ঘন্টা করিয়া বিচার করা হইত। রায় দেওয়া হইলে সকলে আপনাপন স্থানে চলিয়া যাইত এবং বাদী ও প্রতিবাদীকে সেই রায় শিরোধার্য্য করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতে হইত। পঞ্চায়েত মোকর্দ্দমা যে কোনপ্রকারেই নিষ্পত্তি করুক না কেন, তাহার বিরুদ্ধে আপিল ছিল না।

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে নরহত্যা, "রা"র বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র প্রভৃতি সর্ব্বাপেক্ষা গুরুতর অপরাধের বিচার রাজা নিজেই করিতেন; সুতরাং সেখানে কোন আইনকানুন ছিল না। রাজার "জো হুকুম," সেই আইন। তবে কতকগুলি সামাজিক আইন ছিল, যাহা লোকদিগকে মান্য করিয়া চলিতে হইত। এই সকল আইনের উল্লেখ করিবার পূর্ব্বে কতকগুলি দণ্ডের উল্লেখ করা যাইতেছে। নচেৎ বারম্বার এক কথার অবতারণা করিতে হইবে। এই দণ্ডগুলিই সাধারণতঃ প্রধান।

১। "সিলেন"—প্রতিবাদী বাদীকে একতুলু সোণা বা একখানি তরবারি দিবে। আরও তাহাকে একটী ছাগ জবাই করিয়া সমাবিষ্ট পঞ্চায়েতদিগকে ভোজ দিতে হইবে। অপরাধ অতি সামান্য হইলে বাদী ঐ সোণা বা তরবারি প্রতিবাদীকে তৎক্ষণাৎ প্রত্যর্পণ করিত।

(২) "মাত্‌স"—ইহাকে পুরাতন ইংলণ্ডের Ordeal বলা যাইতে পারে। যখন কোন লোককে অপরাধী বা নিরপরাধ সাব্যস্ত করা পঞ্চায়েতের বুদ্ধির বহির্ভূত হইয়া পড়িত, তখন "মাত্‌সের সাহায্যে সেই সন্দেহের মীমাংসা করা হইত। নিম্নলিখিত প্রকারে "মাত্‌সের" কার্য্য করা হইত। একখণ্ড লৌহকে আগুনে উত্তপ্ত করিয়া আসামী বা প্রতিবাদীর হস্তে অল্পক্ষণ রাখা হইত। যদি লোকটী অপরাধী হইত তাহার হস্ত দগ্ধ হইত, নিরপরাধ হইলে উত্তপ্ত লৌহ তাহার কোনই ক্ষতি করিতে পারিত না!

(৩) "কোমোরি"—যেসকল লোক "কোমারির" ডিক্রি পাইত বা অন্য কোন অবস্থায় "কোমোরি" পাইবার অধিকারী হইত, অপর পক্ষ হইতে তাহার নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি বাৎসরিক প্রাপ্য ছিল। গম ১মণ, যব ১ মণ,

ফলেরবৃক্ষ ১ (ইহা কেবল প্রথম বৎসরেই দিতে হইত), ভেড়া ১টা (কেবল ১ম বৎসর); কাপড় ৬মাসের উপযোগী, এবং বাস করিবার বাটী ১খানি।

এখন নিম্নে কতকগুলি আইন (অথবা সামাজিকরীতি) দেওয়া হইল; এবং সেই সকল আইন ভঙ্গ করিলে কি কি দণ্ড দেওয়া হইত তাহাও ইহা হইতে বুঝিতে পারা যাইবে।

(অ) বৈবাহিকআইন।

কোন বালিকা বয়স্থা হইলেও আপন পিতামাতা বা অভিভাবকের অনুমতি ব্যতিরেকে কোন পুরুষকে বিবাহ করিতে পারিত না। বিবাহের পর স্ত্রীপুরুষের মতানৈক্য হইলেও বিবাহবন্ধনচ্ছেদ হইতে পারিত না। বরকন্যা উভয়ই যদি একইগ্রামের ও একই শ্রেণীর (Community) হইত, তবে কন্যার পিতা বরের পিতার নিকট হইতে পণস্বরূপ ৫ তুলু সোণার অধিক লইতে পারিত না। কিন্তু যদি অন্যগ্রামের লোকের সহিত কেহ আপন কন্যার বিবাহ দিতে ইচ্ছা করিত, বরকর্ত্তার নিকট হইতে কন্যার পিতা ১২তুলু পর্য্যন্ত সোণা লইতে পারিত। একবার বিবাহকার্য্য সম্পন্ন হইলে স্ত্রীপুরুষ মধ্যে পরস্পরের বিচ্ছেদ হইতে পারিত না, এমন কি যদি উভয়ের মধ্যে কেহ অতি বৃদ্ধ বা অতি শিশুও হইত তথাপি বিবাহ বন্ধন অক্ষুণ্ণ থাকিত। স্ত্রীপুরুষের মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাইয়া দিবার পরামর্শ দেওয়াও আইনবিরুদ্ধ ছিল।

কেহ যদি প্রথম স্ত্রীর জীবদ্দশায় দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে ইচ্ছুক হইত, তবে তাহাকে প্রথম স্ত্রীর অনুমতি লইতে হইত। প্রথম স্ত্রী অনুমতি না দিলে তাহার পিতামাতাকে "সিলেন" দিয়া দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে হইত।

বিধবা স্ত্রী মৃতস্বামীর আত্মীয়বর্গের বিনা অনুমতিতে দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে পারিত না। যদি কোন বিধবা, পুত্র থাকিতে পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিত, তবে সে আপন মৃতস্বামীর আত্মীয়ের মধ্যে কাহাকেও বিবাহ করিতে পারিত এবং এঅবস্থায় সেই স্ত্রীলোকের তাহার মৃতস্বামীর জমীর উপর দখল থাকিত। কিন্তু যদি তাহার মৃতস্বামীর আত্মীয় তাহাকে বিবাহ করিতে অনিচ্ছুক হইত বা সেরূপ কোন আত্মীয় না থাকিত, তবে সে তাহার মৃতস্বামীর যে কোন নিকট আত্মীয় থাকিত, তাহার অনুমতি লইয়া অন্যকে বিবাহ করিতে পারিত। তাহার নূতন "খসম"কে পুরাতন খসমের বাটী আসিয়া, যতদিন পর্য্যন্ত তাহার পুরাতন স্বামিজাত পুত্র সাবালক না হয়, তাহার জমীর চাষবাস করিতে হইত। পুত্র সাবালক হইলে তাহার মাতা তাহার নূতন পিতার সহিত তাহাদের নূতন বাটীতে যাইতে পারিত। পুত্র তাহার আপন পিতার জমী লইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিত।

যদি কোন স্ত্রীলোকের স্বামী মরিয়া যাইত, ও তাহার ভরণপোষণের কোন উপায় না থাকিত, অথচ সে নূতন স্বামী পাইতে ইচ্ছা করিত না, এঅবস্থায় সেই বিধবা আপন পিত্রালয়ে আসিয়া বাস করিতে পারিত। যতদিন সে জীবিত থাকিত, তাহার পিত্রালয় হইতে তাহাকে "কোমোরি" দেওয়া হইত। যদি সে বিধবার কোন সন্তান থাকিত, সে মাতুলালয় হইতে কোন সাহায্যের দাওয়া করিতে পারিত না।

(আ) ঝগড়া।

যদি কোন লোক অন্যকে গালি দিত, তাহা হইলে, তাহাকে "সিলেন্" দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইত, অপিচ যাহাকে গালি দিয়াছে পঞ্চায়েতের সম্মুখে তাহার ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইত। যদি স্ত্রীলোকে স্ত্রীলোকে ঝগড়া হইত, তাহার কোন দণ্ড ছিল না। তবে যদি একপক্ষে অধিক স্ত্রীলোক এবং অপর পক্ষে কম থাকিত, তবে পরিপুষ্ট দলকে "সিলেন" দিতে হইত।

(ই) ব্যভিচার।

যদি কেহ আপন স্ত্রীকে অন্যপুরুষের সহিত ব্যভিচারে প্রবৃত্ত দেখিতে পাইত, সে তৎক্ষণাৎ উভয়কে হত্যা করিতে পারিত, ইহাতে তাহার কোন পাপ বা অপরাধ ছিল না। কিন্তু যদি স্ত্রীকে ছাড়িয়া কেবল তাহার উপপতিকেই হত্যা করিত, তবে হতব্যক্তির আত্মীয়স্বজনেরা সুবিধা পাইলে হত্যাকারীকে হত্যা করিতে পারিত, ইহাতে তাহাদেরও অপরাধ ছিল না। এরূপ অবস্থায়ও যদি তাহারা হত্যাকারীকে কোন কারণে হত্যা করিতে ইচ্ছা না করিত, তবে তাহারা তাহার নিকট হইতে ১০০ তুলু সোণা হত্যাকারীর জীবনের মূল্যস্বরূপ আদায়

করিতে পারিত। আপন স্ত্রীর দুশ্চরিত্রতার জন্ত কেহ পঞ্চায়েতের নিকট নালিশ করিতে পারিত না, কিন্তু দুশ্চরিত্রাকে তালাক বা পরিত্যাগ করিতে পারিত। তালাক হইবার পরও সেই স্ত্রীলোক আপনার পূর্ব্বস্বামীর অনুমতি ব্যতীত তাহার আপন প্রণয়ী বা, যাহার চরিত্রের উপর সেই স্ত্রীর পূর্ব্বস্বামীর সন্দেহ আছে, এরূপ কাহাকেও বিবাহ করিতে পারিত না। যদি করিত, তবে তাহার নূতন স্বামী পুরাতন স্বামীকে ১২ তুলু ও "রা"কে ১২তুলু সোণা দিতে বাধ্য হইত। কিন্তু যদি সেই স্ত্রীলোক কোন সচ্চরিত্র পুরুষকে বিবাহ করিতে চাহিত, তবে তাহার পুরাতন "খসম" ইহাতে কোন বাধা দিতে পারিত না।

যদি কোন পুরুষ কোন স্ত্রীর সহিত ব্যভিচারে লিপ্ত থাকিত, অথচ তাহার যথেষ্ট প্রমাণ না পাওয়া যাইত এবং সেই পুরুষ আপনাকে নিরপরাধ বলিতে চাহিত, তবে তাহাকে "মৎস" সাহায্যে পরীক্ষা করা হইত, কিম্বা সেই স্ত্রীরস্তনে ঐ পুরুষের মুখ স্পর্শ করাইয়া ইহাই সকলকে জানান হইত, যে উভয়ের মাতাপুত্র সম্বন্ধ।

(ঈ) পোষ্যপুত্র।

কোনলোক পোষ্যপুত্র লইতে ইচ্ছা করিলে আপনার নিকট আত্মীয়ের পুত্রকে গ্রহণ করিতে হইত। কিন্তু তাহা না করিয়া যদি কেহ অপরলোকের পুত্রকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিত, তবে তাহাকে আপন আত্মীয়দিগের অনুমতি লইতে হইত, নচেৎ পোষ্যপুত্র লওয়া আইনসঙ্গত হইত না। পোষ্যপুত্র লইতে হইলে সেই পুত্রের পিতামাতাকে "সিলেন্" দিয়া অনুমতি লইতে হইত। যদি কেহ পোষ্যপুত্র গ্রহণ করিয়া তাহার প্রত্যাখ্যান করিতে চাহিত, তবে সেই পুত্রের পিতামাতাকে ১২ তুলু ও 'রা'কে ১২ তুলু সোণা দিতে হইত।

(উ) উত্তরাধিকার আইন।

মৃতব্যক্তির পুত্র থাকিলে সে পিতার সম্পত্তির অধিকারী, নচেৎ কন্যা। জামাতাকে শ্বশুর বাড়ী থাকিয়া জমীর তত্ত্বাবধান ও চাষবাস করিতে হইত। যদি জামাতা অন্ত বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিত ও অনুমতি পাইত, তবে তাহার প্রথম স্ত্রীর সম্পত্তিতে তাহার কোন অধিকার থাকিত না।

(ঊ) সাধারণ কার্য্যে সাহায্য না করা।

পয়নালি, রাস্তা বা ঝুলা তৈয়ার করিতে হইলে সেই নিকটবর্ত্তী গ্রামের প্রত্যেক ঘর হইতে বিনা বেতনে একজন লোক সেইকার্য্যে নিযুক্ত থাকিত। যদি কেহ না পারিত, তবে প্রত্যহ ৬ সের দামা জরিমানা দিতে হইত। যে সকল লোক কাজে নিযুক্ত আছে, তাহাদের মধ্যে এই জরিমানা ভাগ করিয়া দেওয়া হইত।

(ঋ) বৃদ্ধের বিশেষ অধিকার।

কেহ বৃদ্ধ হইলে এবং কার্য্যোপযুক্ত না থাকিলে সে আপন পুত্রের বা পুত্রদিগের নিকট হইতে "কোমোরি" পাইত। যদি কোন বৃদ্ধার আপন পুত্র না থাকিত, তবে সে আপনস্বামীর অন্তস্ত্রীর গর্ভজাত পুত্রের নিকট হইতে "কোমোরি" পাইত।

শ্রীসতীশচন্দ্র হালদার।

কোষকীটের ব্যাধি ও বিপদ।

অন্যান্য প্রাণীর ন্যায় গুটীপোকারও নানাপ্রকার ব্যাধি হইয়া থাকে। এই ব্যাধি সাধারণতঃ দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। পৈত্রিক ও স্বকৃত ব্যাধি। পৈত্রিক ব্যাধি একবার হইলে সেই সকল ব্যাধিগ্রস্ত কীট হইতে যত কীটাণু বাহির হইবে, তাহারা ও তাহাদের বংশপরম্পরা সকলকেই সেই পীড়ায় আক্রান্ত করিতে পারে। এই ব্যাধির মধ্যে "কটা" (Pebrine) নামক রোগ সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল। স্বকৃত ব্যাধি তত ভয়ানক নহে। কীট পালনের সময় আহার ও জলবায়ু সম্বন্ধে একটু লক্ষ্য রাখিলে, এইসকল ব্যাধি বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে না। সাধারণতঃ চারিপ্রকার কারণে, এই সকল ব্যাধির উৎপত্তি হইয়া থাকে। (১) অস্বাস্থ্যকর আহার, (২) অনিয়মিত ও অপরিমিত ভোজন, (৩) অস্বাস্থ্যকর জলবায়ু এবং (৪) সংক্রামক রোগবীজের আমদানী।

অস্বাস্থ্যকর আহার ও অপরিমিত ভোজন এই দুই কারণে "রসা" নামক (grasseri) ব্যাধির উৎপত্তি হইয়া

থাকে। এইব্যাধি সংক্রামিক নহে এবং ইহাকে পৈত্রিক-ব্যাধির মধ্যেও গণ্য করা যাইতে পারে না। বাঙ্গালায় এইব্যাধি হইতে অনেক ক্ষতি হইয়াছে বটে; কিন্তু ইউরোপে ইহার সম্বন্ধে কেহ তত লক্ষ্য করে না, ও তথায় তাহার প্রয়োজনও হয় না। কারণ এইব্যাধি তথায় এত অনিষ্টকর নহে। ফরাসীরা বলে "pass de gras pas de cocons" অর্থাৎ যেখানে রসা রোগ নাই সেখানে গুটীও তেমন হয় না। ইহাকে একরূপ অনিবার্য্য রোগ বলিয়া গণনা করিলেও, কীটপালনগুণে বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারে না। স্পর্শদোষে এবং অস্বাস্থ্যকর আর্দ্র-স্থানে ফুলা নামক (muscardine) একপ্রকার রোগ জন্মিয়া কোষকীটের মড়কের উৎপত্তি করে। এইব্যাধি হইবামাত্রই যে গুটীপোকা নষ্ট করে এমত নহে; প্রায়ই গুটী করিবার অবস্থা প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই নষ্ট করে। আর যে সমস্ত ব্যাধিগ্রস্ত পোকা নষ্ট না হয়, তাহারাও এত-দূর নির্জ্জীব হইয়া পড়ে যে আর ভালরূপ গুটী প্রস্তুত করিতে সমর্থ হয় না।

যদি প্রথমে নষ্ট হয়, তাহা হইলে ঐ সকল পোকার জন্য বিশেষ খরচ করিতে হয় না। খরচ খরচান্তের পরে নষ্ট হয়, ইহাই বিশেষ ক্ষতিজনক। যাহাতে এই সকল ব্যাধির ও ইহার উৎপত্তির কারণ নির্ণীত হয়, এবং যাহাতে ইহা প্রশমিত হইতে পারে, এইবিষয়ে বহুদিন হইল অনেক পণ্ডিতমণ্ডলী বহুবিধ চেষ্টা ও চিন্তা করিতেছেন। স্বাস্থ্যকর স্থানে রাখিয়া ভালরূপে খাওয়াইতে পারিলে স্বকৃত ব্যাধি অনেকাংশে প্রশমিত হইতে পারে। কিন্তু পৈত্রিক ব্যাধি সেরূপ নহে। ১৮৬৬ সালে পাস্তর সাহেব যে বীজ নির্ব্বাচন প্রণালী আবিষ্কৃত করেন, তাহা এই শ্রেণীর রোগ নিবারণের পক্ষে অনেক পরিমাণে উপকারী। তাঁহার মতে স্ত্রীপতঙ্গ ডিম্ব প্রসব করিবার পরে তাহার রস (serum) অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরীক্ষা করিতে হয়। যদি স্ত্রীপতঙ্গের কোনরূপ পৈত্রিক ব্যাধি থাকে, তাহা অবশ্যই পরবর্ত্তী কীটে সংক্রামিত হইবে। তজ্জন্য যদি কোনপ্রকার ব্যাধির সন্ধান পাওয়া যায়, তবে সেইপোকা যে সকল ডিম্ব প্রসব করিয়াছে তাহা নষ্ট করা কর্ত্তব্য। এইরূপ করার নাম বীজ-নির্ব্বাচন (seed selecting)। পৈত্রিক ব্যাধির প্রকোপ হইতে অব্যাহতি পাইবার পক্ষে এই বীজ নির্ব্বাচন প্রণালী বিশেষ উপকারজনক, তাহাতে সন্দেহ নাই। অণুবীক্ষণ যন্ত্রে রস পরীক্ষা করিলে, তাহাতে বহুবিধ আকার দেখা যায়। এইসকল আকার দেখিয়া, কোন প্রকার ব্যাধি হইয়াছে কি না এবং যদি হইয়া থাকে তবে কোন প্রকার তাহা নির্ণয় করা সম্ভব। এই কার্য্য বিশেষ কঠিন নহে, কারণ এক এক প্রকার ব্যাধির এক এক প্রকার আকার। যদি পোকা সুস্থ থাকে, তাহা হইলে তাহার রস অন্যরূপ আকার ধারণ করে। তজ্জন্য আকার দেখিলেই জানা যাইতে পারে যে কোনপ্রকার ব্যাধি হইয়াছে কি না এবং হইয়া থাকিলে কি রোগ হইয়াছে। পাস্তর সাহেব এই নিয়ম আবিষ্কার করিয়া ইউরোপে প্রভূত উপকার সাধন করিয়াছেন। নচেৎ এতদিন ইউরোপের সমস্ত পোকা ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া বিনষ্ট হইত। কীট পালন করিতে হইলে ব্যাধির উৎপত্তি অনিবার্য্য। তাহার নিবারণের প্রয়াস বিফল। কিন্তু যাহাতে ব্যাধির উপশম হইতে পারে, তাহাই করা কর্ত্তব্য; এবং উপশম করিয়া যাহাতে আর অধিক না হয়, তাহারই চেষ্টা করা উচিত। সাধারণতঃ লোকের বিশ্বাস যে "কটা" রোগ আমাদিগের দেশে ছিল না; গত পঁচিশ বৎসর হইল ইউরোপ হইতে এদেশে আসিয়াছে। কিন্তু এ বিশ্বাস সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া বোধ হয় না। ইহার পূর্ব্বেও যে এই ব্যাধি ছিল, বৃদ্ধ কীটপালকদিগের নিকট তাহা শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু একালে বিশেষ প্রবল হইয়াছে। এই ব্যাধি আরণ্য রেশম কীটের মধ্যেও হইয়া থাকে। তবে একথার কোনই ভুল নাই যে "ফুলা" রোগ বাঙ্গলার কীট পালকদিগের বিশেষ ক্ষতি করিয়াছে। তাহাদের বিশ্বাস এই ব্যাধি অসাধ্য। একবার হইলে আর আরোগ্যের কোনই উপায় নাই; কিন্তু এই বিশ্বাসের মূলে অজ্ঞতা ও কুসংস্কার ভিন্ন কোন বৈজ্ঞানিক সত্য আছে বলিয়া বোধ হয় না। এইরূপ বিশ্বাস ক্ষতিজনক। এক্ষণে জানা গিয়াছে যে, গন্ধকের ধূম এই ব্যাধির উৎকৃষ্ট ঔষধ। ইহা ভালরূপ ব্যবহার করিতে পারিলে আর ভয় নাই। আরোগ্যের বিশেষ আশা করা যাইতে পারে।

"কালশিরা" নামক আর একপ্রকার ব্যাধি আছে।

সাধারণতঃ কীটপালকদিগের বিশ্বাস, ইহা পৈত্রিক ব্যাধির অন্তর্ভূত। এই বিশ্বাসের মূল এই যে, এই ব্যাধি হইতে "কটা" রোগ ভয়ঙ্কর রূপে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ফুটিবার পূর্ব্বে ডিম্বগুলি তুতিয়ার জলে (sulphate of copper) ধৌত করিয়া লইলে, এই ব্যাধি প্রায়ই উপশমিত হইয়া থাকে। এই সকল বিষয় কীটপালকদিগের কারখানায় না দেখিলে ভালরূপ জানা যাইতে পারে না। বিশদরূপে জানিতে ইচ্ছা করিলে শিবপুরের কৃষিবিদ্যালয়ের সুযোগ্য অধ্যাপক শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত নিত্যগোপাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের রেশমকীটতত্ত্ববিষয়ক পুস্তক অধ্যয়ন করা আবশ্যক।

চেষ্টা করিলে এই সকল ব্যাধি যাহাতে না হয়, তাহার বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে; কিন্তু একবার হইলে ব্যাধি দূর করা বড়ই কঠিন। কীটগুলি যাহাতে অধিক পরিমাণে পীড়িত না হয়, তাহার জন্য বন্দোবস্ত রাখা উচিত। তজ্জন্য যে গৃহে সহসা কোন প্রকার প্রাণী বা পদার্থ প্রবেশ করিতে না পারে, সেই সকল স্থানে কীট পালন করা প্রয়োজন, ও বীজ নির্ব্বাচন করা আবশ্যক। এত পরীক্ষা করার পর যদি পালিত কীটের মধ্যে কোনও ব্যাধির সন্ধান পাওয়া যায়, তখনি তাহার জন্য বিশেষ বন্দোবস্ত করা উচিত। স্বাস্থ্যকর স্থানে স্বাস্থ্যকর খাদ্য যথাসময়ে যথানিয়মে প্রদান করা, এবং সর্ব্বদা গৃহ পরিষ্কার রাখা বিশেষ আবশ্যক। ইহাতেই ব্যাধির হস্ত হইতে অনেক পরিমাণে অব্যাহতি পাওয়া যায়।

শত্রুর হস্ত হইতে কাহারও নিস্তার নাই। ব্যাধির হস্ত হইতে নিস্তার পাইলেই যে সকল আশঙ্কা দূরীভূত হইল, এরূপ কখনও বিবেচনা করা যাইতে পারে না। বাহিরে রাখিলে নানারূপ শত্রু, আবার গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিলেও মক্ষিকা প্রভৃতি অনেক প্রাণীতে অনিষ্ট করে।

তন্মধ্যে মক্ষিকাতেই বিশেষ অনিষ্ট করিয়া থাকে। এই সকল মক্ষিকার হস্ত হইতে ইহাদিগকে রক্ষা করা বড়ই কঠিন। এই সকল মক্ষিকা আকারে গৃহস্থিত সাধারণ মক্ষিকার ন্যায় নহে, ইহারা রেশম পোকার জীবন নষ্ট করিয়া স্বকীয় অস্তিত্ব রক্ষা করে। যে সময় রেশম পোকা কলেবর পরিবর্ত্তন করিতে থাকে, সেই সময় হইতেই এই সকল মক্ষিকা তাহাদিগের জীবনীশক্তি প্রাপ্ত হয়। পরে কোষ প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বেই মক্ষিকা রেশম পোকার শরীরে ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ডিম্ব প্রসব করে। ছিদ্র শীঘ্রই বিলুপ্ত হয় বটে, কিন্তু ঐ সকল ডিম্ব দিন দিন রেশম পোকার শরীরাভ্যন্তরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। পরে উপযুক্ত সময়ে, শরীর হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পোকারূপে বাহির হয়। এই সময় রেশম পোকার শরীর ফাটিয়া যায়, এবং তাহাতেই রেশম কীটের মৃত্যু হয়। এইরূপে এক একটা মক্ষিকা শত শত রেশম পোকা নষ্ট করিতে পারে। ইহারা রেশম পোকার শরীর ব্যতীত অন্য কোথায়ও ডিম্ব প্রসব করে না। ১৮৮৭ সালে বহরমপুরে পরীক্ষা করিয়া দেখা হইয়াছিল যে এই মক্ষিকা অন্য কোথাও ডিম্ব প্রসব করে কি না। তজ্জন্য সদ্য কাটা মাংস, ভূমিলতা, বিষ্ঠা এবং মধু দেওয়া হয়। কিন্তু কোনও পদার্থের উপরেই ইহা প্রসব করিল না। কেবল রেশম পোকা তসর পোকা এবং এড়ি পোকার শরীর ছিদ্র করিয়া ডিম্ব প্রসব করিল। যেরূপ এই মক্ষিকা গৃহে অনিষ্ট করিয়া থাকে, তদ্রূপ যদি আরণ্য গুটী পোকারও অনিষ্ট করিত, তাহা হইলে বনে গুটী পোকা কখনই থাকিতে পারিত না। কিন্তু বিধাতার বিচিত্র শক্তির পরিচালনায় তাহা ঘটিতে পারে না। রেশম পোকার শত্রু যেমন মক্ষিকা, মক্ষিকার শত্রুও সেইরূপ উলিপোকা ও পাখী। তাহারা ইহাদিগকে দেখিলেই ধরিয়া ভক্ষণ করে। তজ্জন্য বনে রেশম পোকার সংখ্যা হইতে মক্ষিকার সংখ্যা অনেক অল্প। তন্নিমিত্ত বনে মক্ষিকা রেশম পোকার বিশেষ অনিষ্ট করিতে পারে না। কিন্তু যে সকল স্থানে রেশম পোকার চাষ হয়, সেই স্থানে রেশম পোকার সঙ্গেই মক্ষিকাও তাহাদিগের শত্রুর হস্ত হইতে আপনাদিগকে রক্ষা করিতে সক্ষম হয়। পরে দিন দিন সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া বিশেষ অনিষ্টের আশঙ্কা উপস্থিত করে। যাহাতে এই মক্ষিকা কোন প্রকারে গৃহে প্রবেশ করিতে না পারে, তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। একবার প্রবেশ করিলে আর উপায় নাই, কিছু না কিছু অনিষ্ট করিবেই। কিন্তু চেষ্টা করিলেই যে মক্ষিকা গৃহে প্রবেশ করিবে না এরূপ নহে। ইহারা অনেক সময়ে মনুষ্যের সকল যত্ন

বিফল করিয়াও গৃহে প্রবেশ করিয়া থাকে। যখন আর কোন উপায়ান্তর না দেখে, তখন যে স্থান হইতে তুত পাতা আনয়ন করা হয়, সে সমস্ত বাগানে গিয়া মক্ষিকাগুলি পাতার মধ্যে লুকাইয়া থাকে। বিশেষ দৃষ্টি না করিলে তাহা বাহির করা যায় না। পরে সুযোগ পাইলে গৃহে প্রবেশ করিয়া ডিম্ব প্রসব করে। আবার কখনও কখনও পরবর্ত্তী পোকা পালন করিতে যে সকল বীজ কোষ রক্ষা করা হয় (seed cocoon) তন্মধ্যেও লুকাইয়া গৃহে প্রবেশ করিয়া গৃহের কোন এক নিভৃত কোণে থাকে। প্রসবসময়ে, রেশম পোকার শরীর ছিদ্র করিয়া ডিম্ব প্রসব করে।

শ্রীপ্রমদাগোবিন্দ চৌধুরী।

ব্রহ্মবালিকা ও তাহার প্রণয়কাহিনী।

ব্রহ্মদেশীয়কে যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, ব্রহ্মদেশে সমাজের মধ্যে রমণী কোন্ স্থান অধিকার করে, তাহা হইলে সে হতবুদ্ধি হইয়া থাকিবে। তাহার সমাজে রমণীর কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান নাই। পুরুষ হইতে তাহারা পৃথক। পুরুষ পুরুষ, স্ত্রী স্ত্রী। ইহা ব্যতীত পুরুষে এবং স্ত্রীতে অন্য কোনো সম্বন্ধ যে থাকিতে পারে, তাহা সে জানে না। তবে এ কথা সে বলিবে যে উভয়ের মধ্যে অনেক পার্থক্য আছে। পুরুষ কোনো বিষয়ে শ্রেষ্ঠ, এবং স্ত্রী অন্য কোনো বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। সুতরাং পুরুষ এবং স্ত্রীর মধ্যে ইতরবিশেষ নির্দ্দেশ করা সুকঠিন।

যদি বলা যায় যে এদেশের ধর্ম্ম পর্য্যালোচনা করিলে ইহাদের পার্থক্য নির্ণীত হইতে পারে তাহা হইলে ইহা ব্রহ্মদেশীয়ের কাছে নিতান্ত হাস্যকর হইয়া দাঁড়ায়। সে বলিবে নরনারীর সম্বন্ধ নির্ণয় করিয়া দেওয়া ধর্ম্মের কার্য্য নহে। ধর্ম্ম আত্মার উন্নতিসাধক—তাহার সহিত এ সকল বিষয়ের কোন সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। যদি বলা যায় যে এ দেশের আইনাদি আলোচনা করিলে এ তথ্য নিরূপিত হইতে পারে, তাহা হইলে উত্তরস্বরূপ সে বলিবে যে ধর্ম্মের মত আইনেরও উক্ত বিষয়ের সহিত কোনো সম্বন্ধ নাই। আইনের চক্ষে পুরুষও যেমন স্ত্রীও তেমনি। পুরুষের জন্য একপ্রকার এবং স্ত্রীলোকের জন্য স্বতন্ত্র প্রকার আইন থাকিতে পারে না।

বুদ্ধদেবের জীবনীতেও উক্ত প্রকার কোন প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যায় না। পুরুষ শ্রেষ্ঠ কি নারী শ্রেষ্ঠ, এ সম্বন্ধে সেই গুরুপ্রধান কোনো মতামত প্রকাশ করিয়া যান নাই। তাঁহার শিষ্যমণ্ডলীর মধ্যে পুরুষও ছিলেন, স্ত্রীও ছিলেন। তিনি উভয়কেই সমান মর্য্যাদা দান করিতেন। তাঁহার যে সকল আদেশ আছে তাহার একটিতেও তিনি পুরুষ ও স্ত্রীতে কোনো প্রকার পার্থক্য প্রদর্শন করেন নাই। রমণীতে পুরুষের যে এক প্রবল আকর্ষণ আছে তাহা হইতে এমন কথা বলা যাইতে পারে না যে নারী সয়তানী। পুরুষে নারীরও প্রবল আকর্ষণ আছে। তাহা দ্বারাও প্রতিপন্ন হয় না যে পুরুষেরা প্রেতের মত তাহাদিগকে আবিষ্ট করিয়া রাখে। পাপেচ্ছা ত আপনার অন্তঃকরণে। এমন কেহ যদি থাকেন যিনি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন যে রমণীতে তাঁহার আকর্ষণ আদৌ নাই—যাহা ছিল তাহা এককালেই মৃত হইয়াছে—তবে তিনি রাত্রিদিনই নারীকুলের প্রতি চাহিয়া থাকিতে পারেন। রমণী ত শত্রু নহে—ভোগবাসনাই শত্রু। সুতরাং নীতিমার্গে কাহারও পদস্খলন হইলে নারী যে তাহাকে পেছন হইতে ধাক্কা দিয়া ফেলিয়াছে এ কথা যেমন খাটে না তেমনি পুরুষকে সুপথপ্রবণ করিয়াছে বলিয়া প্রশংসার পাত্রও সে হইতে পারে না। সে বাহিরের অজ্ঞাত একটা প্রভাব মাত্র, এইটুকু ভিন্ন অন্য কোনো প্রশংসা তাহার প্রাপ্য হইতে পারে না।

মনুমেণ্টের উপরে উঠিয়া নীচের দিকে চাহিলে যে মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইবার উপক্রম হয়, এইজন্য কি মনুমেণ্টের উচ্চতাকে দোষ দিতে হইবে, না আমাদের মস্তিষ্কের দৌর্ব্বল্যই নিন্দনীয় হইবে? স্ত্রী সম্বন্ধেও সেই কথা। পুরুষের হৃদয়ে অদম্য বাসনার উদ্রেক সেই করাইয়া দেয়—এই বলিয়া তাহাকে নিন্দা করা তাহারও কর্ত্তব্য নহে। ব্রহ্মদেশের সমাজনীতি এই কারণে স্ত্রী ও পুরুষে কোনো পার্থক্য দেখিতে পায় নাই।

শাসনবিধি উভয়েরই পক্ষে সমান হইলেও কার্য্যতঃ তাহার অনেক ব্যতিক্রম দেখা যায়। নারীদেহের মূল্য

পুরুষদেহের অপেক্ষা অল্প বিবেচিত হইয়া থাকে। সেইজন্ত নারীকে হত্যা করিলে অপেক্ষাকৃত অল্প অর্থদণ্ড দিয়া অপরাধী নিষ্কৃতিলাভ করে। ইহার কারণ এই যে ব্রহ্মদেশীয়ের চক্ষে নারীর প্রয়োজনীয়তা পুরুষের অপেক্ষা অনেক বিষয়েই কম। তাহারা দুর্ব্বল—কার্য্যে অপটু—ইত্যাদি। অতএব এই প্রভেদের ভিত্তি প্রয়োজনীয়তার উপরে, কোনো মতামতের উপর নহে। ব্রহ্মদেশে আইনসমূহ যুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। অন্ত সমস্ত গুণ যুদ্ধপটুতার নীচে স্থান পায়। সুতরাং রমণী যুদ্ধনিপুণ নহে বলিয়াই সমাজে তাহার অধিকার খর্ব্ব করা হইয়াছে।

শুনা যায় অনেক ব্রহ্মরমণী নিজমুখেই স্বীকার করিয়াছে যে তাহাদের ধৈর্য্য পুরুষের অপেক্ষা কম। তথাপি দেহের দুর্ব্বলতা এবং ধৈর্য্যের কিঞ্চিৎ অভাব, এই দুই বিষয় ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে তাহারা যে পুরুষের অপেক্ষা হীন, এ কথা কোনো ব্রহ্মদেশীয়ই স্বীকার করিবে না।

এইজন্যই ব্রহ্মরমণীকে কোন বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিতে হয় না। ইচ্ছামত খাতে সে আপনার জীবনের প্রবাহটুকু ঢালিয়া দিতে পারে। বহুদিন মৃত অতীতের জমাটবাঁধা আদর্শখণ্ড সম্মুখে রাখিয়া জীবনের সাদা খাতায় চিরকাল ধরিয়া তাহাকে হাত পাকাইতে হয় না। জগতের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সে আপনাকে ইচ্ছামত পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে পারে। বাস্তবজগতে সে প্রশস্ত স্থান অধিকার করিয়া লইতে পারে। তাহাকে কল্পনার রজ্জু ধরিয়া সারাজন্ম শূন্যে ঝুলিতে হয় না। যে কারণে সে হীন বিবেচিত হইয়াছে সেই কারণেই রক্ষা এবং চালনার দ্বারা ব্রহ্মরমণী সম্মানিত হইয়াছে। ভারতবর্ষে ইহাই সনাতনপ্রথা যে মহিলাকুল সযত্নবর্দ্ধিত উদ্যানলতার মত অন্তঃপুরকে আপন আপন পুণ্যশ্রীর দ্বারা নিত্যোৎসবে পূর্ণ করিয়া রাখিবেন—তাঁহাদের কোমল গাত্রে বাহিরের উত্তপ্ত ঘূর্ণাবাতাস লাগিবে না—বহির্জগতের ক্রূর আঘাত হইতে তাঁহাদের পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ থাকিবে। কিন্তু ব্রহ্মরমণীর পক্ষে ব্যবস্থা অন্যবিধ। সে আপন চিন্তা আপনি করিবে। গৌরবলাভ তাহার পক্ষে যেমন স্বেচ্ছাধীন দুঃখের অর্জ্জনও তেমনি। এ দেশের আইনকে দুইদিকে ধার বিশিষ্ট তরবারির মত মনে হয়। মন্দ করিতে যদি স্বাধীনতা দেওয়া হয় তবে ভাল করিতেও সমান স্বাধীনতা দেওয়া হউক। একটি ছাড়িয়া দিলে অন্যটিকে পাওয়া যায় কই? ব্রহ্মরমণীকে তাই দুই দিকই দেওয়া হইয়াছে। আদর্শ শুভ এবং অশুভ দুই-ই আছে। এই শুভাশুভ বিচারের কর্ত্তা সে নিজে—পুরুষ নহে। তাহার যাহা কিছু যতটুকু আছে—তাহা সে নিজে করিয়া লইয়াছে। জীবনের অবস্থাভেদে তাহার পক্ষে যাহা কল্যাণকর তাহা সে নিজে নির্ব্বাচিত করিয়াছে। ইহাই বর্ত্তমান ব্রহ্মরমণীর প্রকৃত চরিত্র চিত্র।

এদেশে বালিকারা বালকগণের সহিত একত্রে লালিত হইয়া থাকে। নগ্ন সৌন্দর্য্যে মনোরম এই ক্ষুদ্র শিশুবৃন্দ মনের মুক্ত উল্লাসে উদ্যানের ধূলায় গড়াগড়ি দিয়া প্রখর সূর্য্যকিরণে গ্রাম্য কুক্কুরের গ্রীবা বেষ্টন করিয়া আনন্দে এবং রঙ্গে বর্দ্ধিত হইতে থাকে। বালকেরা বিদ্যালয়ে যায়, বালিকাদিগকে কোথাও যাইতে হয় না। পুরুষকে যেমন বাধ্য হইয়া প্রচার ব্রত গ্রহণ করিতে হয়, স্ত্রীলোককে তেমন হয় না। সেইজন্য বালিকাগণের জন্য বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা নাই। মাতার কাছে কোন কোন বালিকা লিখিতে পড়িতে শিক্ষা করে—কিন্তু অধিকাংশ বালিকাই অশিক্ষিত থাকে। লেখাপড়ার পরিবর্ত্তে তাহারা গৃহকার্য্য শিক্ষা করে। তাহারা বস্ত্রবয়ন, গোমেষাদি-চারণ, জলাহরণ এবং ইন্ধন সংগ্রহ করিতে শিক্ষা করে। শৈশব হইতেই তাহারা এইসকল কার্য্যে এরূপ অভ্যস্ত হইয়া পড়ে যে পরিশ্রমে তাহাদের কখন কোন অনিষ্ট না হইয়া বরং লাভই হইয়া থাকে।

উচ্চশ্রেণীর বালিকারা কৃষিকর্ম্ম করে না। তাহারা গৃহে লেখাপড়া, বয়নকার্য্য এবং জলাহরণ প্রভৃতি শিক্ষা করে। গ্রামের মধ্যে একই কূপ হইতে জলাহরণ করিতে আসিয়া অনেকের পরস্পরের সহিত সাক্ষাৎ হয়। কূপের বেষ্টনীতে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া তাহারা বিবিধ কথায় সময়ক্ষেপ করে। নূতন সংবাদ কি—কোথায় কি গণ্ডগোল হইয়াছে—কাহার গৃহে এতটুকু কলঙ্কের কথা শুনা গিয়াছে—ইত্যাদিই তাহাদের কথোপকথনের বিষয়।

সকল বালিকাই বয়ন করিতে জানে। তাহারা পিতামাতার এবং আপনাদের পরিচ্ছদ বুনিয়া লয়। কেহ



রাফেএল কর্ত্তৃক অঙ্কিত।] পূতশীলা কাথারিন [KUNTALINE PRESS.

বা বাজারে বিক্রয়ার্থ পোষাক প্রস্তুত করে। কেহ চাউল হইতে তুঁষ পৃথক করে। কেহ বা চুরুট প্রস্তুত করে। ধনীর কন্যাদিগকে এ সকল করিতে হয় না। কিন্তু তাহারা আলস্যে কখন কালক্ষেপ করে না।

কলাবিদ্যায় তাহারা নিপুণ নহে। তাহারা গাহিতে জানে না, অভিনয় করে না, চিত্রাঙ্কনে অপটু। এ সকলে বৃথা সময় ক্ষেপ করিতে তাহারা প্রস্তুত নহে। সারাদিনব্যাপী গৃহকার্য্যেই তাহাদের সমস্ত অবসর শোষণ করিয়া লয়।

আট হইতে চৌদ্দ বৎসরের মধ্যে বালিকাদের কর্ণবেধ সংস্কার সম্পন্ন হয়। যাহার যেমন অবস্থা এই শুভ কর্ম্মে সে তেমনই ব্যয় করিয়া থাকে। ধনীরা এই উপলক্ষে প্রচুর আহার্য্য ও বহুবিধ উপহার দ্রব্য বিতরণ করে। সন্নিকটে প্রবাহিত নদীবক্ষ আলোকমালায় সুসজ্জিত করে। বালিকাজীবনে এই একটিমাত্র উৎসব ক্রিয়া আছে বলিয়াই ইহা সমারোহের সহিত সম্পন্ন হয়।

এমনি শান্ত, এমনি সংযতভাবে নির্জ্জনে তাহার চতুর্দ্দিকে প্রশান্ত দৃষ্টিপাত করিতে করিতে ব্রহ্মের বালিকা বর্দ্ধিত হইতে থাকে। বালিকাবয়সেই সে বহির্জ্জগতের ব্যাপারে কত অভিজ্ঞতালাভ করে তাহা দেখিলে বিস্ময়ান্বিত হইতে হয়। বিশ্বসংসার তাহার কাছে এক অসীম রহস্যের মত কল্পনাতীত সৎ অথবা অসতে পূর্ণ বলিয়া প্রতিভাত হয় না। সে বুঝে যে এই সংসার তাহার শিক্ষার বস্তু। এখানে সুখ এবং দুঃখ কখনো অবিমিশ্র থাকিবে না। তাহার কাছে পুরুষ, দেবতাও নহে, প্রেতও নহে;—মানুষ। তাই এই পৃথিবী তাহার জন্য নৈরাশ্যের বেদনা বহন করিয়া আনে না। স্বপ্ন তাহার আছে, একথা সত্য। সে যাহাকে ভালবাসিয়াছে, যে তাহাকে ভাল বাসে, যে তাহার সমস্ত জীবনটিকে একটি সমুজ্জল প্রেম-রেখাপাতে গৌরবদীপ্ত করিয়া তুলিবে, তাহার কথা সে না ভাবিয়া কেমন করিয়া থাকিবে? তাহার স্বপ্ন যে মুগ্ধ বালিকার কল্পনার সঙ্গে মিশিয়া যাইবে, ইহা আর বিচিত্র কি? কিন্তু এ ত শুধু নিরর্থক স্বপ্ন নহে। ইহা বাস্তবিকতায় পরিণত হইতে পারে, এমন সম্ভাবনাও আছে। অজ্ঞতা দিয়া সে কখনো নিজের আদর্শ গঠন করিয়া তাহাকে ভাল বলিয়া বিবেচনা করে না। প্রত্যেকদিনটি তাহার কাছে যে বাস্তবসৌন্দর্য্য বহন করিয়া আনে তাহাই তাহার কাছে মহিমাময়। তাহাকেই সে নির্নিমেষ নেত্রে দেখিতে দেখিতে মুগ্ধ বিস্মিত হইয়াথাকে। এ কথা সে হৃদয়ঙ্গম করিয়াছে যে জীবিত প্রেমিক আদর্শ প্রেমিক হইতে শ্রেষ্ঠ এবং বাস্তবজগতে বাস্তবজীবনেরই মূল্য বেশী।

প্রেমিকও যথাসময়ে উপস্থিত হয়। বিলাতি কোর্টশিপের মত ব্রহ্মবালিকার বিবাহের পূর্ব্বে এক উৎসবক্রিয়া সম্পন্ন হয়। শুক্লপক্ষের রাত্রি নয়টা হইতে দশটা এই উৎসবের কাল। জ্যোৎস্নাপুলকিত নিশীথে যখন সমস্ত পৃথিবী রজতচ্ছটা-সম্পাতে নিদ্রামগ্ন হয়, পুষ্পগন্ধে ভারাক্রান্ত মৃদুমন্দ বসন্তপবন তখন প্রেমিকার গণ্ডে মৃদু হস্তস্পর্শ করে এবং জীবনের সৌন্দর্য্য নিঃশেষে পান করিবার জন্য হৃদয় কণ্ঠাগত হয়।

প্রতিগৃহের সম্মুখে একটি করিয়া বারান্দা আছে। ভূমি হইতে তাহা অর্দ্ধহস্ত উচ্চ। এই বারান্দায় দাঁড়াইয়া ব্রহ্মবালিকা তাহার পাণিগ্রহণেচ্ছু সমাগত যুবকবৃন্দের সহিত সাক্ষাৎ লাভ করে। তাহারা প্রেমিকের অর্দ্ধভগ্ন ভাষায় যে কথাবার্ত্তা কহে বালিকা তাহা সযত্নে শুনিতে থাকে। সকলকেই সে আদর অভ্যর্থনা করে। সকলেরই সঙ্গে কথা কহে, হয় ত কাহারও কাহারও কোনো বিশেষত্ব দেখিয়া মৃদুহাস্যে তাহাকে অনুগৃহীত করে। স্বহস্তনির্ম্মিত চুরুট উপহার দিয়া বালিকা সকলেরই মর্য্যাদা রক্ষা করে, এবং হয় ত একজনের জন্য নিজে চুরুটটি ধরাইয়া দেয়। চুরুটকে প্রতিনিধি করিয়া সেই ভাগ্যবান যুবককেই বালিকা চুম্বন করে। এইরূপ স্বাধীনতার সহিত বালিকা স্বীয় পতি নির্ব্বাচন করিতে পারে। তাহার পিতামাতা একথা বুঝে যে প্রেম শিশুর ক্রীড়াবিষয়ীভূত ব্যাপার নহে। তথাপি কন্যাকে তাহারা এই উদ্দাম মনোবৃত্তি দমন বিষয়ে শিক্ষা দিবার কথা মনেও আনে না।

প্রতিদিনই সন্ধ্যার অস্পষ্ট ছায়ালোকে কখনো কূপের পার্শ্বে কখনো তালনিকুঞ্জের ঘন অন্ধকারে, কখনো বা নদীতীরে সমুজ্জল চন্দ্রালোকে কত প্রেমলীলার অভিনয় সম্পন্ন হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে কতকগুলি মিলনে মধুর, কতক বা ভীষণ বিয়োগান্ত। প্রেমলুব্ধা বালিকার

মনোবৃত্তিসমূহ অতিশয় উদ্দাম। তাহার ভাষা ছোট ছোট প্রেমগীতিকায় পূর্ণ। প্রেমিক প্রেমিকায় কত প্রেমপত্র, কত পুষ্পোহার চলিতে থাকে, তাহার ঠিকানা করা দুরূহ। বিশ্বস্ত দূতীদ্বারা এই সকল উপহার গোপনে প্রেমিকের কাছে প্রেরিত হয়। পিতামাতা এসকল দেখিয়াও দেখে না। বরং কন্যার মনোমত পতির হস্তে তাহাকে অর্পণ করিতে পারিলে তাহারা সুখী হয়। যৌবনের মর্ম্ম তাহারা বেশ বুঝে—এমনও মনে করে যে তাহারা বুঝি চিরযৌবনে থাকিবে। তাই তাহারা কন্যার প্রেমলীলায় অন্তরায় হইতে রাজি নহে। ভৃত্যগণও গৃহস্বামীর জামাতৃত্বে বৃত হইতে পারে। কিন্তু সকলসময়েই এই স্বাধীন প্রেম-বৈচিত্র্য শুভ ফল প্রদান করে না। কখনো কখনো কন্যারা অজ্ঞাতবাস করিয়া পিতার মর্য্যাদা ও গৌরবে কলঙ্কক্ষেপণ করে। বিবাহ অবধি বিলম্বেও ধৈর্য্যচ্যুত উত্তপ্ত যৌবন অজ্ঞাতসারে এই বিপদ উপস্থিত করে।

বালিকা বলে জীবন কয় দিনের? আজিকার দিন আমার হাতে আছে বলিয়া কাল কি হইবে কে বলিতে পারে? সেও আমাদিগকে বলিতে চাহে —"হেসে নাও, দু'দিন বৈ ত নয়।" শুক্লপক্ষে তাহার রাত্রি হয় না, সে বলে দিবসের রৌপ্যালোক এখন স্বর্ণালোকে পরিণত হইয়াছে মাত্র। বনভূমি আনন্দে উচ্ছলিত হইয়াছে, কোমল তৃণশয়নে বনস্পতি মূর্চ্ছাগত ছায়াখানি প্রসারিত করিয়া দিয়াছে। পল্লবের অবকাশপথে চন্দ্ররশ্মি নামিয়া তাহার সর্ব্বদেহে জ্যোৎস্নাসিঞ্চন করিতেছে। সেখানে আহারাদির ব্যবস্থাও আছে। দুজনের কত আহার্য্য প্রয়োজন হইতে পারে?

বনভূমি সেই প্রেমিকার কুন্তল-শোভা বন্ধন করিতেই যেন পুষ্পভার বহন করিতেছে। এই ইন্দ্রজালবেষ্টিত প্রেমনিকুঞ্জের মধ্যে তরুণ দম্পতীর প্রেমপ্রবাহ বহিয়া যায়। কোন বিশ্বস্ত বন্ধু আসিয়া যখন বিবাহার্থে তাহাদিগকে গৃহে গমন করিতে বলে, তখন তাহারা এই অভিনব স্বপ্নলোক ছাড়িয়া যাইতে মর্ম্মে মর্ম্মে ব্যথা পায়।

বালিকাদের এই প্রেমাভিনয়ে সকল শেষ অঙ্কই মিলনরসে আপ্লুত হয় না। পিতামাতা কখন কখন ইহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়—এবং বালিকা যথেচ্ছ গমন করিতে পারে না। সে তাহার প্রেমের প্রতিদান হইতে বঞ্চিত হয় এবং অকিঞ্চিৎকর বোধে সে জীবন বিসর্জ্জন করে। ক্ষুদ্র হৃদয় প্রবল দুঃখের আঘাত পাইয়া তাহাকে নদীতীরে লইয়া যায় এবং অত্যুগ্র নৈরাশ্যকে আপনার জীবনের সঙ্গে কাল জলের গভীর বিস্মৃতির মধ্যে চিরনির্ব্বাসিত করে। সংসারে প্রেমহীন হইলে সে আর থাকিতে চাহে না। তাই ব্রহ্মবালিকা সমস্ত দেশকেই উচ্ছ্বসিত প্রেমের সুরম্য উপন্যাসে পূর্ণ করিয়া রাখে। তাহার হৃদয় কেবলি কোমল স্নেহে পূর্ণ নহে। পুরুষোচিত উত্তপ্ত প্রেম এবং সাহসিকতার অভাব তাহাতে নাই। শুনা গিয়াছে পুরুষ-বেশে প্রেমবিহ্বলা বালিকা সৈন্যশিবির মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে এবং মূঢ় সৈন্যদল শত্রু বোধে তাহাকে বধ করিয়াছে। পুরুষবেশের অভ্যন্তরে সযত্নগোপিত রমণীহৃদয়ের প্রেমাভিঘাত কে বুঝিবে!

পূর্ব্বে যে প্রেমগীতির উল্লেখ করিয়াছি, তাহাতে ছন্দের ঝঙ্কার—মিষ্ট শব্দের বহুপ্রয়োগ এবং অনাবশ্যক তোষামোদ অত্যধিক পরিমাণে বর্ত্তমান থাকিলেও তাহা মর্ম্মস্পর্শী। তাই এইস্থলে একটি প্রেমগীতিকার অনুবাদ প্রদত্ত হইল। ইহা হইতে তাহার সৌন্দর্য্য কতক কতক অনুভূত হইতে পারিবে।

নায়িকার প্রতি প্রেমিক।

নিশীথে চন্দ্র একদা কুমুদিনীর কানে কানে প্রেমের কথা বলিয়া তাহার চিত্ত হরণ করিয়াছিল। কুমুদিনী তাই চন্দ্রকে বিবাহ করিল। আমার এই প্রেমবিহ্বল হৃদয়টি তাহাদেরই শিশু। মধুযামিনীর মধ্যভাগে কোরক-গুলি ফুটিয়া উঠিল—পত্রগুলি কম্পিত হইল—এবং আমার হৃদয় জন্মগ্রহণ করিল।

সকল কোরকগুলি অপেক্ষা সুন্দর আমার হৃদয়—প্রদোষের মত কোমল তাহার মুখখানি। গিরিবক্ষে প্রসারিত রজনীর মত কাল তাহার কেশদাম—হীরার মত উজ্জ্বল দেহবর্ণ। স্বাস্থ্যে সে চিরলোভমান—রোগ তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

খরপবন বহিলে আমার ভয় হয়—মৃদু বায়ুতেও আমি ভীত হই। ভয় হয় পাছে দক্ষিণবায়ু আসিয়া তাহাকে হরণ করিয়া লয়—পাছে সন্ধ্যার মৃদুলশ্বাস তাহাকে আমা

হইতে বিচ্ছিন্ন করে। সে এমনই পেলব—এমনই মধুর তাহার রূপ। তাহার পরিচ্ছদ স্বুবর্ণরচিত—মাঝে মাঝে রেশমী আভা। বিশুদ্ধ স্বর্ণে তাহার বলয় নির্ম্মিত—তাহার কর্ণে হীরকের ফুল। কিন্তু তাহার চক্ষু!—কি এমন রত্ন আছে যাহা তাহাকে সাজাইতে পারে?

সে বড় গর্ব্বিতা—সে আমার প্রেয়সী। সমস্ত মনুষ্যে তাহাকে ভয় করে। সে এত সুন্দর—এত গর্ব্বিত, যে তাহার কাছে সকল লোক ভয় পায়। সমস্ত পৃথিবীতে কোথাও এমন কিছু নাই, যাহা তাহার উপমা হইতে পারে।

শ্রীনরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য।

প্রাচীনকালের জন্তু।

এই পৃথিবী একটি বিরাট নাট্যশালা। যুগযুগান্তর ধরিয়া ইহাতে কত প্রাণীর জীবনের অভিনয় চলিয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। সাধারণ নাট্যশালার সহিত ইহার একটা প্রভেদ আছে। সাধারণ নাট্যশালায় অভিনেতৃগণকে বার বার প্রবেশ ও প্রস্থান করিতে দেখা যায়; কিন্তু পৃথিবীরূপ নাট্যশালায় নিষ্ক্রান্তের পুনঃ প্রবেশ নিষেধ। পৃথিবীর ইতিহাসের ভিতরে যে জন্তু একবার অন্তর্হিত হয়, সে চিরকালের জন্যই যায়, তাহাকে আর ফিরিয়া আসিতে দেখা যায় না।

পৃথিবীতে এখন যেরূপ জীব জন্তু দেখা যায়, আমরা অনেক সময় হয়ত মনে করি যে তাহারা চিরকালই এইরূপ ছিল, এবং ভবিষ্যতেও চিরকাল এইরূপই থাকিবে। "অহন্যহনি ভূতানি" প্রভৃতি জ্ঞানগর্ভ বাক্য আমরা ব্যক্তিগত ভাবেই বলিয়া থাকি। তখন আমরা কেবল এই কথাই মনে ভাবি যে আমরা কেহই চিরদিন পৃথিবীতে থাকিতে পাইব না। কিন্তু এ কথা বলিবার সময়ে হয়ত আমাদের আশা থাকে যে আমরা চলিয়া গেলেও জীব প্রবাহ এইরূপ ভাবেই চিরকাল পৃথিবীতে বহিবে। আমরা না থাকি, অন্য মানুষ থাকিয়া পৃথিবীতে মনুষ্য নাম বজায় রাখিবে। যাহা হউক পৃথিবীর প্রাচীনকালের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে আমরা চৈতন্য লাভ করি। তখন, মনুষ্য যে চিরদিন পৃথিবীতে প্রভুত্ব করিবেন সে সম্বন্ধে গুরুতর সন্দেহ উপস্থিত হয়। কারণ, এ পর্য্যন্ত পৃথিবীতে কোন জাতীয় জন্তুই চিরস্থায়ী হয় নাই। আমরা এখন যে সকল জন্তু দেখিতে পাই, তাহারা পৃথিবীর বয়সের তুলনায় নিতান্তই আধুনিক; অপেক্ষাকৃত পুরাতন প্রস্তরাদিতে ইহাদের কোন চিহ্ন পাওয়া যায় না। আবার তাহাতে যে সকল জন্তুর চিহ্ন পাওয়া যায় তাহাদের কেহই এখন বাঁচিয়া নাই।

জন্তুর পায়ের দাগ, হাড়, দাঁত, অঙ্গাদির ছাপ অথবা ছাঁচ ইত্যাদিরূপ চিহ্ন অনেক সময়ই প্রস্তরাদিতে দেখিতে পাওয়া যায়। এ সকল চিহ্ন দেখিয়া জন্তুর রূপ কল্পনা করা সহজ কাজ নহে, ইহাতে পণ্ডিতদিগেরও অনেক সময় ভুল হয়। অশিক্ষিত সাধারণ লোকে তাহার কিরূপ অর্থ করে তাহার একটি নমুনা দেওয়া যাইতেছে।

আমি একদিন কলিকাতার যাদুঘর দেখিতে গিয়াছিলাম। যাদুঘরের একটা কামরায় অনেক প্রাচীন হস্তীর হাড় এবং দাঁত রাখা হইয়াছে। এই সকল হাড় এবং দাঁত দেরাধুনের নিকটবর্ত্তী শিবালিক পর্ব্বতে পাওয়া গিয়াছিল। হাড়গুলির অধিকাংশই এখন পাথর হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহাদের অবয়ব বিকৃত হয় নাই; আর দাঁতগুলি প্রায়ই অবিকল রহিয়াছে।

একটি গ্রাম্য লোক ঐ হাড়গুলি দেখিয়া বলিল "পাথরের আবার দাঁত! পাথরের আবার মুখ!"

এই কথা শুনিয়া তাহার সঙ্গীয় একটি বৃদ্ধ বলিল "জীয়ন্ত পাথর যখন ছিল, উয়া খে'ত ত সব! আহার কো'ত্ত! দেখ কেমন সব দাঁত গোটা মেরে রয়েছে।"

কেবল আমাদের দেশেই যে এ সকল বিষয়ে লোকের এরূপ ভ্রান্ত সংস্কার, তাহা নহে। ইউরোপেও আগে পাথরে কোনরূপ জীবের চিহ্ন পাইলে তাহাকে লোকে—এমন কি পণ্ডিতেরাও—"প্রকৃতির খেলা" (freak of Nature) বলিয়া অবহেলা করিতেন।

মাঝে মাঝে উহাদের এক একটা অদ্ভুত অর্থও বাহির হইত। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর হইল, ইংলণ্ডের চেসায়রের পাথরে মনুষ্যের পদচিহ্নের ন্যায় কতকগুলি চিহ্ন পাওয়া যায়। শত শত লোক এই সকল চিহ্ন দেখিতে আসিত। তাহাদের এই বিশ্বাস জন্মিয়াছিল যে বাইবেল শাস্ত্রোক্ত

নোয়াহ্ নামক মহাপুরুষ জল প্লাবনের পরে ঐ স্থানে সপরিবারে জাহাজ হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন, ঐ সকল পদচিহ্ন তাঁহাদেরই।

অষ্ট্রিয়ার অন্তর্গত ক্লাগেনফর্ট নামক নগরের কোন ফোয়ারায় বৃহৎ শৃঙ্গ এবং ছয়টি পদবিশিষ্ট একটা "ড্রাগনের" মূর্ত্তি আছে। প্রবাদ এই যে উক্ত ড্রাগন মাঝে মাঝে একটা গুহার ভিতর হইতে বাহির হইয়া দেশ উৎসন্ন এবং লোকের ত্রাস উৎপাদন করিত। জনৈক অশ্বারোহী বীর ড্রাগনটিকে বধ করেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহারও প্রাণ যায়। তৎপরে ঐ ড্রাগনের মাথা আনিয়া তথাকার "হোটেল দে ভিল্" নামক প্রাসাদে রাখা হয়, এবং উক্ত ফোয়ারায় স্থাপিত মূর্ত্তির শিল্পী ঐ মাথা দেখিয়াই সেই মূর্ত্তির মাথা গঠন করেন। হের্ উঙ্গের্ নামক ভিয়ানা নিবাসী পণ্ডিত সেই মাথাটা দেখিবামাত্রই বুঝিতে পারিলেন যে উহা "রিনোসেরস্ টিকরিনস্" নামক লোমবিশিষ্ট লুপ্ত গণ্ডারের মাথা ভিন্ন আর কিছুই নহে।

পণ্ডিতদিগেরই যেখানে ভুল হয়, সাধারণ লোকের ত সেখানে ভুল হইবার কথাই। কিন্তু এই দুই শ্রেণীর লোকের ভুল হওয়ার কারণ বিভিন্ন। সাধারণ লোকে ভুল করে এইজন্য যে তাহারা বিজ্ঞানকে ছাড়িয়া কল্পনার পথে সত্যের অন্বেষণ করিতে যায়। উল্লিখিত তিনটি দৃষ্টান্তই ইহার প্রমাণ।

লুপ্ত জন্তুর বিবরণ সংগ্রহ করিতে গিয়া পণ্ডিতদিগের যে ভুল হয়, তাহার কারণ অন্যরূপ। একটা সহজ কারণের উল্লেখ করা যাইতেছে। প্রস্তরাদিতে জন্তুর শরীরের কোমল অংশের কোনরূপ চিহ্ন থাকা সহজ নহে। এরূপ কোন চিহ্ন যে কখনও পাওয়া যায় না, একথা বলিতেছি না; কিন্তু যাহা পাওয়া যায় তাহা অতি সামান্য। আমরা এরূপ অনেক জন্তুর বিশেষ বিশেষ অবয়বের কথা জানি, যাহার কথা পূর্ব্বে না জানা থাকিলে শুদ্ধ কঙ্কালমাত্র দেখিয়া অনুমান করিয়া লওয়া অসম্ভব। দৃষ্টান্ত স্বরূপ গরুর গলকম্বল এবং ককুদের কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই জন্তুর কথা পূর্ব্বে না জানা থাকিলে কেবলমাত্র উহার কঙ্কাল দেখিয়া উহার অবিকল মূর্ত্তি কল্পনা করিয়া লওয়া কতদূর কঠিন তাহা সহজেই অনুমেয়।



পূর্ব্বে ইক্থিয়োসরসের ছবি এইরূপ আঁকা হইত।

এ অবস্থায় গরু আঁকিতে গেলে তাহা ককুদ এবং গলকম্বল বর্জ্জিত এক অদ্ভুত জন্তুর ছবি হইয়া পড়িবে।

এইরূপ কারণে এক এক সময় এক একটা জন্তুর চেহারা আঁকিতে কতখানি ভুল হইতে পারে, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে। প্রাচীনকালে মৎস্য এবং কুম্ভীর উভয়ের লক্ষণ বিশিষ্ট একটা অতি ভীষণ এবং বৃহৎ জলজন্তু ছিল। পণ্ডিতেরা ইহার নাম ইক্থিয়োসরস্ (মৎস্যকুম্ভীর) রাখিয়াছেন। ইহার কঙ্কাল মাত্র দেখিয়া প্রথমে চিত্রকরেরা ইহার কিরূপ ছবি আঁকিতেন, কোন প্রসিদ্ধ পণ্ডিতের পুস্তক হইতে তাহার নমুনা দেওয়া গেল। এই ছবিতে ইহাকে মোটামুটি কুম্ভীরের মতন করিয়াই আঁকা হইয়াছে।

উক্ত পুস্তক প্রকাশিত হইবার অনেকদিন পরে, ১৮৯২ সালে জর্ম্মাণি দেশে একটি ইক্থিয়োসরসের কঙ্কাল আবিষ্কৃত হয়। এই কঙ্কালের সঙ্গে সঙ্গে ঐ জন্তুর শরীরের

বহিরবয়বের সুচনা (outline) স্পষ্ট রহিয়া গিয়াছে। তাহাতে দেখা যায় যে উহার মস্তক ভিন্ন শরীরের অবশিষ্ট অংশ প্রায় মাছের মতনই ছিল। কুম্ভীরের সহিত উহার কোন সাদৃশ্য ছিল না।



ইক্‌থিয়োসরসের যথার্থ মূর্ত্তি এইরূপ ছিল।

যাহা হউক সকল জন্তুরই যে কঙ্কালের সহিত বাহ্যিক আকৃতির সম্বন্ধ এত কম থাকে তাহা নহে। সুতরাং কঙ্কাল দেখিয়া অনেক স্থলেই জন্তুর চেহারার একটা স্থূল আভাস পাওয়া যাইতে পারে।

কঙ্কাল দেখিয়া জন্তুর স্বভাব নির্ণয় করা সম্বন্ধেও ঐ কথা। এ বিষয়েও মাঝে মাঝে ভুল না হয় এমন নহে। অনেক সময় এরূপ ভুল অনিবার্য্য হইয়া উঠে। তথাপি ভ্রমের অপেক্ষা যথার্থ অনুমানের সংখ্যাই অধিক বলিতে হইবে।

বাস্তবিক রূপ অপেক্ষা স্বভাবের কথা নির্ণয় করা অনেক সময় অপেক্ষাকৃত সহজ হয়, কারণ তাহাতে ভুলের সম্ভাবনা কম থাকে। গরুর কঙ্কাল দেখিয়া তাহার গলকম্বলের কথা বলা যতই কঠিন হউক না কেন, ঐ জন্তু যে নিরামিষাশী তাহা নিশ্চয় বলিতে পারা যায়, কারণ শৃঙ্গ এবং ক্ষুর বিশিষ্ট জন্তু মাংসাশী হয় না।

এ বিষয়ে একটি কৌতুকাবহ গল্প আছে। আমরা যে শাস্ত্রের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছি, প্রসিদ্ধ ফরাসি পণ্ডিত ব্যারণ্‌ কুভিয়ে তাহাতে অদ্বিতীয়—এমন কি, বলিতে গেলে তাহার প্রবর্ত্তক—ছিলেন। কুভিয়ের অনেক শিষ্য ছিলেন, তাঁহাদের একজনের মাথায় হঠাৎ একদিন এই খেয়াল চাপিল যে "গুরুদেবকে গুরুতর ভয় দেখাইয়া কিঞ্চিৎ কৌতুক করিতে হইবে।" এই উদ্দেশ্যে তিনি এক রাত্রিতে বিশাল শৃঙ্গ এবং ভীষণ ক্ষুর বিশিষ্ট বিকট বেশ ধারণ পূর্ব্বক নিদ্রিত কুভিয়ের শয়নকক্ষে উপস্থিত হইয়া বলিতে লাগিলেন "কুভিয়ে! তোমাকে ভক্ষণ করিতে আসিয়াছি।" বলা বাহুল্য, ইহাতে কুভিয়ের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। কিন্তু তিনি ভয় পাইলেন না। তিনি সেই অদ্ভুত জন্তুকে ক্ষণকাল নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন "কি? তোমার এমন ক্ষুর আর শিং রহিয়াছে, তুমি আমাকে খাইবে? অসম্ভব।" সুতরাং সে রাত্রিতে শিষ্যপ্রবরের আশানুরূপ আমোদ লাভ হইল না।

পণ্ডিতদিগের ভুল হইবার আর একটি কারণ এই যে, অনেক সময় জন্তুবিশেষের শরীরের অতি সামান্য অংশ মাত্র দেখিয়া তাহার স্বভাব সম্বন্ধে বিচার করিতে হয়। অবশ্য এ বিষয়ের বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ জন্তুর এক খণ্ড অস্থি অথবা একটি দাঁত মাত্র পরীক্ষা করিয়াই তাহা হইতে এত তত্ত্ব সংগ্রহ করিতে পারেন যে তাহা অতীব বিস্ময়জনক। কিন্তু এরূপ করিতে গিয়া যে তাঁহারা অনেক সময় ভ্রমে পতিত হয়েন, একথাও সত্য।

প্রাচীনকালের জন্তুগুলির মধ্যে এক এক সময় একাধারে এত বিভিন্ন গুণের সমাবেশ দেখা যায়, যে আজ কাল সে সকল গুণ এক জন্তুর ভিতরে থাকে না। এ কারণেও অনেক সময় পণ্ডিতেরা প্রতারিত হইয়াছেন। ইগুয়ানোডন্‌ নামক জন্তুর আবিষ্কারের বিবরণ পাঠ করিলে এ বিষয়ের উদাহরণ পাওয়া যায়।

[ক্রমশঃ]

শ্রীউপেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী, বি, এ।

পুরাতত্ত্বের কয়েকটি কথা।

প্রাচীন ভারতে বহুবিবাহ—প্রাচীন ভারতেও বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। সায়ণাচার্য্য ইহার সাক্ষ্য দিয়াছেন। পরাশর সংহিতার টীকা ব্যপদেশে তিনি বলিয়াছেন,—'বেদেপ্যেবং শ্রূয়তে একস্য বহ্ব্যো জায়া সন্তি, নৈকস্যা এব বহবঃ পতয়ঃ সন্তি।' একের বহুজানিত্বের পরিচয় সংহিতা প্রভৃতির কালে ত' আছেই, বেদেও নাকি আছে; বহুপতিত্বের একমাত্র উদাহরণ দ্রৌপদী। পাণিনীয় ব্যাকরণে মহাভারতোক্ত বহুনামের উল্লেখ সত্ত্বেও দ্রৌপদীর নামোল্লেখ দেখা যায় না, পরন্তু

সুভদ্রার আছে (৪।২।১৬; ৪।৩।৮৭)। এস্থলে প্রক্ষিপ্ত মতের আশ্রয় গ্রহণ করা সুবিধাজনক কি না, অনুসন্ধেয়।

প্রাচীন ভারতে সহমরণ—ঋগ্বেদে (১০ম মণ্ডল ২য় অনুবাক ২য় ঋক) 'আরোহন্তু জনয়ো যোনিম্ অগ্নেঃ' দেখিতে পাওয়া যায়। জননীগণ অগ্নির মধ্যে প্রবেশ করুন। ইহার কি অর্থ হইবে, সন্তানশালিনী রমণী স্বামীর অনুগমন করিবে? সম্ভব, কারণ অপুত্রকন্যাকা রমণীর পুনর্ব্বার বিবাহ করিয়া সংসারী হইবার পক্ষে তৎকালে কোন অন্তরায় ছিল না। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলর স্বমতের সহিত সামঞ্জস্য করিতে না পারিয়া প্রক্ষিপ্তমতবাদের আশ্রয় লইয়াছেন। ঐতিহাসিক এল্‌ফিনষ্টোনও ঐ মতবাদী। তাঁহারা বলেন বস্তুতঃ উক্ত ঋকের পাঠ 'আরোহন্তু জনয়ো যোনিম্ অগ্রে' (জননীগণ অগ্রে যোনি অর্থাৎ গৃহ প্রবেশ করুন)। ধূর্ত্ত ব্রাহ্মণগণ পশ্চাৎকালপ্রবর্ত্তিত প্রথা সমর্থনের জন্য 'অগ্রে' শব্দকে 'অগ্নে' করিয়া দিয়াছেন। পরিবর্ত্তন কথিত ও লিখিত উভয় কালেই সহজসাধ্য সন্দেহ নাই। কিন্তু বাস্তবিক প্রকৃত ঘটনা ইহাই কি না, পণ্ডিতগণ যথাস্থানে পূর্ব্বাপর বিচার ও অর্থসামঞ্জস্য করিয়া দেখিলে খাঁটি সত্য লাভ দুষ্কর হইবে না বোধ হয়।

অধ্যাপক উইল্‌সন বলেন (R. As. Soc. Journ. Vol XVI. P. 203.) যে ঋগ্বেদে আর কুত্রাপি উক্ত প্রথার উল্লেখ দেখা যায় না। যে ঋকটি উদ্ধৃত করিয়াছি, তাহার পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঋক সকলের সহিত মিলাইয়া অর্থ করিলে উহার অর্থ হয়—'অবিধবা, সৎপতিসংযুক্তা জননীগণ দধি প্রভৃতি মাঙ্গল্য দ্রব্যের সহিত দুঃখহীন ও অশ্রুহীন হইয়া গৃহপ্রবেশ করুন।' ইহাই যদি হয়, তাহা হইলে উক্ত ঋকের সহিত বিধবার কোনই সম্বন্ধ নাই। এই অনুবাকের একটি পরবর্ত্তী ঋকে স্বামীর সৎকারকালে বিধবা পত্নীকে "উঠিয়া জীবিতরাজ্যে প্রবেশ কর" বলিয়া অনুজ্ঞা করা হইয়াছে এবং আনুসঙ্গিক কার্য্যকলাপ হইতে বোধ হয় যে তাঁহাকে গৃহে ফিরাইয়া লইয়া যাওয়া হইত। আমার বোধ হয় যে স্বামীর চিতায় পত্নীকে শয়ন করাইয়া পরে তাঁহাকে ডাকিয়া গৃহে লওয়া হইত; এই অনুগমনের ভাণ হইতে পরে বাস্তবিক সহমরণ প্রথার আবির্ভাব হইয়াছে।

মনুতে সহমরণ প্রথার কোন উল্লেখ নাই, অপরপক্ষে বিধবাদিগের ব্রহ্মচর্য্য পালনের নিয়ম লিখিত আছে (৫।১৫৬—১৫৮)।

মহাভারতে মাদ্রী পাণ্ডুর অনুগমন করিয়াছিলেন, ইহা সর্ব্বজনবিদিত। তদ্ভিন্ন উক্ত মহাগ্রন্থের আদিপর্ব্বে লিখিত দেখা যায় 'মরণান্তে আর কিছুই অনুগামী হয় না, কেবল পতিব্রতা পত্নীই সহগামিনী হইয়া থাকেন।' ইহা হইতে তৎকালে উক্ত প্রথার অস্তিত্বই প্রমাণিত হইতেছে।

যাস্ক বিধবা শব্দের বি+ধব (পতি) ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন। বপ্, পট্, কারসিয়ন প্রভৃতি প্রসিদ্ধ ভাষাতত্ত্ববিদ্‌গণ ঐ ব্যুৎপত্তিই গ্রাহ্য করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত রথ্, বিন্ধ্ ধাতু হইতে ব্যুৎপাদিত করিতে চাহেন। বিন্ধ্ অর্থে তিনি হীনত্ব বা শূন্যত্বের আভাস (without anything) দিয়াছেন। যাহা হউক উভয় অর্থই সমার্থক। অধ্যাপক ম্যাক্সমূলর বলেন বিধবার্থবোধক শব্দ প্রত্যেক আর্য্যভাষাতেই বর্ত্তমান আছে, অতএব উক্ত সংজ্ঞার প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ নাই। তাঁহার বিবেচনায় যদি আর্য্যকালে সহমরণ প্রথা থাকিত, তবে সকল পতিহীনাই পুড়িয়া মরিত, কেহ বৈধব্য ভোগ করিত না, এবং বিধবা সংজ্ঞারও আবশ্যক হইত না। কিন্তু সহমরণ প্রথা প্রচলিত থাকিলেই যে সকলকেই মরিতে হইবে, তাহার এমন কি মানে আছে? এবং পতিহীনা মরিয়া যাইলেও সে বিধবা আখ্যা কেন পাইতে পারিবে না, তাহা আমরা ঠিক বুঝিতে পারিলাম না। বিধবা স্বামীর দাহকাল পর্য্যন্ত নিজের সৌভাগ্যচিহ্ন ত্যাগ করেন না বটে, সহমরণে যাইবার কালে সধবার সাজেই চিতারোহণ করার কথা শুনা গিয়াছে সত্য, কিন্তু সেটা বিধবা আখ্যা দেওয়ার পক্ষে বিশেষ অন্তরায় কি না বিচার্য্য।

মেগাস্থিনিস (৩০০ খৃ পূ) ভারতে সহমরণ প্রথা প্রচলিত দেখিয়া গিয়াছেন এবং তৎবর্ণন প্রসঙ্গে গ্রীকদিগের প্রিয়পত্নীর ভর্ত্তানুগমন প্রথার উল্লেখ করিয়া তুলনায় সমালোচনা করিয়াছেন।

হ, জ, বুবরী সাহেব বলেন যে য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণ বহু অনুসন্ধান দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে প্রাচীন ভারতে সহমরণ ধর্ম্মশাস্ত্রানুমোদিত ত ছিলই না, বরং কঠিন অনু-

শাসনে তাহা বারিত ছিল। কিন্তু যাহা বারিত ছিল, তাহা যে একেবারে অসম্ভাবও ছিল না, তাহা তৎসহজেই প্রমাণিত ও বোধগম্য হইতেছে।

এই প্রথা ভারতে ক্রমশঃ ছাইয়া এতদূর বহুপ্রচারিত হইয়াছিল, যে জাহাঙ্গীর বাদশাহ উক্ত প্রথার নিষেধ প্রচার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু সে নিষেধ বিশেষ ফলপ্রদ হয় নাই। সে গৌরবমুকুট বঙ্গবাসী ও ইংরাজের জন্য বহুদিন অপেক্ষা করিয়াছিল।

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

নিয়ে যাও পারে।

মোরে নিয়ে যাও তব ওই পরপারে,
এবে অতল বহিছে জল;
এপার ওপার বারিরাশি করে
একাকারে ছলছল।
পাখী উড়ে এসে গায়
...রের শাখাদলে,
পড়িয়াছে আসি
...র ফুলে কুলে।
...ী ওপারের ঢেউ
...রজল,
...রের তটে আসিছে কল্লোল
ওপারের কলকল।
মনে হইতেছে অতি কাছে যেন
ওপারের তীররেখা,
রৌদ্র ছায়ালোক স্বর্ণ সীমন্তটি
সব যাইতেছে দেখা।
এনদীর যেন অতি নিকটের
ওই পরপার একা,
ক্ষণিক যাত্রার পথখানি মর্ত্ত
মাঝে শুধু জল লেখা।
...রি পারে লইয়াছে ... ...
... ঢেউরাশি কোলাহল,
প্রীতি মুহূর্ত্তের যৌবনের স্রোতে
দুর্ব্ব দুইকুল সুঅতল।
দেখ ওই তটে নবদিনখানি
করে অপেক্ষায় জলজল,
তবে নিয়ে যাও মোরে ত্বরা পরপারে
চৌদিকে বারি করে ছলছল।

লজ্জাবতী বসু।

প্রবাসে বঙ্গসাহিত্যের চর্চ্চা।

দিল্লী।

গতবৎসর সরস্বতীপূজার দিন ডেপুটী কন্ট্রোলার আপিসের কতকগুলি বাবু দিল্লীতে একটি বান্ধবসমিতি স্থাপন করিয়াছেন। ইহা তিন ভাগে বিভক্ত। প্রথম বিভাগে পুস্তকালয় ও পাঠাগার ও দ্বিতীয় বিভাগে ব্যায়ামশালা আছে। তৃতীয় বিভাগে সঙ্গীতের আলোচনা ও তাস দাবাদি খেলা হইয়া থাকে এবং সুবিধামত প্রীতিভোজন সম্পন্ন হয়।

১ম বিভাগ।—অনেকগুলি ইংরাজী ও বাঙ্গলা কাগজ রাখা হয়;—সঞ্জীবনী, বঙ্গবাসী, হিতবাদী, বসুমতী, প্রবাসী, মুকুল, মারহাট্টা, মর্ণিংপোষ্ট, বেঙ্গলী, পায়োনিয়ার ইত্যাদি। পুস্তকালয় নির্ম্মিত হইতেছে।

২য় বিভাগ।—প্রাতে এবং বৈকালে সুবিধামত ব্যায়াম করা হয়। শ্রীযুক্ত বাবু চিন্তামণি ঘোষ ইহার ভার লইয়াছেন। স্যাণ্ডোর নিয়মানুসারে ব্যায়াম করান হয়।

৩য় বিভাগ। শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এই সমিতির সহকারী সভাপতি। তাঁহার যত্নে সমিতির সঙ্গীত বিভাগ সুন্দররূপে পরিচালিত হইতেছে। তিনি গান বাঁধিয়া দিয়া থাকেন ও শ্রীযুক্ত বাবু মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় ও কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দিগের দ্বারা সুরলয়ে গ্রথিত হইয়া গীত হয়।

পুস্তকালয় ও পাঠাগার "বঙ্গসাহিত্যসভা" এই নামে শ্রীযুক্ত বাবু ...গোপাল ভট্টাচার্য্য ও অবিনাশচন্দ্র ... প্রভৃতি বাবুদিগের যত্নে ও উদ্যমে পরিচালিত হইতেছে

এই বাঙ্গালীটি ডেপুটি কলেক্টারের আপিসের শ্রীযুক্ত বাবু যতীন্দ্রলাল মিত্রের আন্তরিক নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টায় স্থাপিত হয়। তিনি কলিকাতায় বদলী হইলে পর ঐ আপিসের শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্যান্য এক জন বাবু মিলিয়া বালকদিগের কার্য্য চালাইতেছেন। প্রথমে যে বঙ্গবিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছিল, তাহা কেবল বাবু আশুতোষ মিত্র ও যতীন্দ্রলাল মিত্রের যত্নে সুচারুরূপে চলিতেছিল; কিন্তু যতীন্দ্র বাবু বদলী হওয়ায় অর্থের অভাবে উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট দয়া করিয়া ৫০২ টাকা মাসিক সাহায্য করিতে প্রস্তুত হওয়ায় বিদ্যালয়টির অকালমৃত্যু ঘটিল না। মাঘ মাসের প্রবাসীতে প্রকাশ্য অম্বুবাবু যে লিখিয়াছেন দিল্লীর বাঙ্গালীদিগের শীর্ষস্থানীয় ডাক্তার হেমচন্দ্র সেন বাবুর যত্নে এই বিদ্যালয়টি চলিতেছিল, তাহা সত্য নহে। বাঙ্গালী শিশুদিগের জন্য যে বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহা কেবল বাবু আশুতোষ মিত্র ও যতীন্দ্রলাল মিত্র এই উভয়ের ঐকান্তিক উৎসাহ ও যত্নে, এবং সেইজন্য ঐ উভয়েই সাধু [illegible] সমগ্র প্রবাসী বাঙ্গালীর ধন্যবাদের পাত্র। দিল্লীর প্রবাসিগণের মধ্যে অনেক "বঙ্গ-সাহিত্যানুরাগী" আছেন ও তাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তির 'অভাব' হয় নাই। যাহা কিছু সমিতি, সভা, পূজা, বাঙ্গালীর মিলন, দিল্লীতে হইয়াছে, তাহা ডেপুটী কলেক্টারের আপিসের বাবুদিগের অক্লান্ত উদ্যোগ চেষ্টায়।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

[শ্রীযুক্ত সারদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ও এই মর্ম্মে আমাদের সংবাদ দিয়াছেন। অনাবশ্যক বোধে তাঁহার পত্র ছাপিলাম না। প্রবাসী-সম্পাদক।]

"দহমাসী"র অর্থ।

"একখানা প্রাচীন দলিলে" ব্যবহৃত "দহমাসী" কথাটির অর্থ শ্রীযুক্ত শশধর মুখোপাধ্যায় বরিশাল হইতে লিখিয়া পাঠাইয়াছেন। তাঁহার মতে 'দহমাসী'র অর্থ "দশমাসী" অর্থাৎ দশ মাসা ওজনের। "তৎকালে দশ মাসা ওজনের টাকা প্রচলিত ছিল।" প্রমাণ বাহির করিয়া দিতে প্রস্তুত আছেন। তিনি বলেন [illegible] কোন স্থানে "শ" এর পরিবর্ত্তে "হ" উচ্চারণ হয়, সেজন্য "দশমাসী" "দহমাসী" হইয়াছে।